অনুসন্ধান।

২য় বর্ষ
শ্রাবণ ১২৯৫ — আষাঢ় ১২৯৬

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

অনুসন্ধানের লেখকগণ।

দ্বিতীয় বর্ষের অনুসন্ধানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লিখিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত; প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা; শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত বাবু রামদয়াল মজুমদার এম, এ; পণ্ডিত কামিনীমোহন শাস্ত্রী-স্বরস্বতী; পণ্ডিত শ্রীনাথ বেদান্তবাগীশ; ডিটেক্‌টিভ-পুলিসের শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়; কবিতা-লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল; শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য; বেদব্যাস-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-পুষ্পাঞ্জলীর ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব; কর্ণধার-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত; শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সান্যাল বি এ, বি এল; শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ; শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম এ; শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এ; শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধায় বি এ; গান ও গল্পের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ; শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ শর্ম্মা; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মজুমদার; শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কল্পনার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত রসিক-লাল দে ও সম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী,
অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ।
৫৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনুসন্ধান-সমিতির নিয়মাবলী।

১। সমিতির মেম্বরগণের সুবিধা।—কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্যে মেম্বরগণ যাহাতে না ঠকেন, সমিতি হইতে সেইরূপ চেষ্টা পাওয়া হয়। অর্থাৎ সমিতি হইতে মেম্বরকে কোন্ দ্রব্যের কিরূপ ন্যায্য দর, ব্যবসায়ীদের মধ্যে কে সৎ ও কে অসৎ ইত্যাদি জ্ঞাপন, এবং কোনস্থলে কোনরূপে তাঁহারা প্রতারিত হইলে, চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ও বরাতি টাকা-কড়ি আদায় ও অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যাদি করা হয়। তা'ছাড়া, মেম্বরগণকে বিনা-মূল্যে অথচ নিয়মিতরূপে এই 'অনুসন্ধান' পত্র এবং নানাবিধ সন্ধানাদি দেওয়া যায়। এ সকল ভিন্ন, অন্যান্য সুবিধার বিষয়, মেম্বর ভুক্ত হইলে, কার্য্যসূত্রে ক্রমে জানা যায়।

২। মেম্বর-ভুক্ত হইবার নিয়ম।—ভদ্রলোক মাত্রেই সমিতির মেম্বর হইতে পারেন। সমিতির ব্যয়-নির্ব্বাহ-হেতু সাহায্যার্থ অগ্রিম বার্ষিক ১২্ বার টাকা চাঁদা দিলে প্রথম শ্রেণীর, ৬্ ছয় টাকা চাঁদা দিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ৩্ তিন টাকা চাঁদা দিলে তৃতীয় শ্রেণীর মেম্বর হওয়া যায়। অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ও সুবিধা, তিনি সেই শ্রেণীর মেম্বর ভুক্ত হইয়া এই সদনুষ্ঠানের সহায় হইতে পারেন।

৩। এবার হইতে মেম্বর হইলে আরও এক নূতন সুবিধা।—অর্থাৎ সমিতি হইতে যত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইবে, মেম্বর হইলে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মেম্বরগণ তাহা 'বিনা মূল্যে' পাইবেন; এবং তৃতীয় শ্রেণীর মেম্বরদিগকে তাহা অর্দ্ধমূল্যে দেওয়া যাইবে।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, কার্য্যাধ্যক্ষ,
৫৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় বর্ষের

'অনুসন্ধান' পত্রের

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অতীতের নিবেদন	৪০
অদ্ভুত জুয়াচোর	১৩২
অদ্ভুত প্রত্যুপকার	২৬৪, ৩০১
অদ্ভুত রাণী	৩৪৫
অসাধারণ আত্মত্যাগ	২৪৭
অহংজ্ঞান	৮
আত্ম-দৃষ্টান্ত	২০৯
আত্ম-রক্ষা	১৪০
আনন্দময়ীর আগমনে	৭৩
আমায় এখানে কে আনিল ...	৩১০
আমি বড়	২৪০
আর সহেনা যাতন	২৩০
ঈশ-মহিমা	৩৪৫
উৎকলের আংশিক বিবরণ ...	১৭২
উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ	১১৯
এবার আমার পূজা হইল যেমন ...	৯৩
এড়ি-রেশমের চাস	২৯৩, ৩১৫, ৩৬০, ৩৭৩
ওলা-উঠা	১৫৭, ১৭৮
ওস্তাদী জুয়াচুরী	২৯১
কপট সন্ন্যাসী	৭৪
কলিকাতার ঝি	৩৬৩
কাচের মোহর প্রস্তুত-প্রণালী ...	১৬
কালিদাসের জীবন-বৃত্তান্ত ...	৪৩
কালী-কীর্ত্তন	১১১
কেনারাম বাবুর দুর্গাপূজা ...	১০৭
কোথা যাই	৩৪০
গান	৫৫
চিতানল	১৫৪
চোর-গ্রন্থকার	১২৯
চোরের গাড়ি-চড়া	৩৭
চোরের তত্ত্ব-লওয়া	৫৫
জগৎ-পথে	১০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
জীবের দায়িত্ব	২৩০, ২৪১, ২৫৮, ২৭৫, ২৯৭, ৩১২, ৩৩৩, ৩৪৬, ৩৭৬
জুয়াচুরীর চূড়ান্ত	৭৬, ৯৫
জুয়াচুরীর পরিচয়	৩০৯
~~জুয়াচোরের তীর্থযাত্রা ...~~	~~২৫৭, ২৭৩~~
জুয়াচোরের নূতন ক্রিয়া ...	২, ২১
~~জুয়াচোরের বাহাদুরী~~	~~৩২৭, ৩৫৩, ৩৮১, ৩৯৯~~
টোট্‌কা-টুট্‌কী	৩৩, ১০৮
কুকুরের বিষ নিবারণের উপায়, গরলের ঔষধ ইত্যাদি	......৩৩
আমাশায় ও কাটাস্থানের রক্ত-বন্ধের ঔষধ ইত্যাদি	......১০৮
তরঙ্গ	১৮৩
তুমি মরিবেনা কেন	২৮০
দস্যুর আত্মকথা	৩৯৩, ৪১৩
দুই খানিছবি	৩১৮, ৩৭১, ৩৯১, ৪০৯
দূরবন্ধুর্গতোঽহম্	২৭৯
ধর্ম্মধ্বজীগণের ধর্ম্মছালা	২১১
নমঃশূদ্র জাতি	৩৬৯
নববর্ষ	১
নিত্য-প্রয়োজনীয় বিষয়	৫০, ৩২১
রৌপ্যনির্ম্মিত এবং মার্ব্বল-নির্ম্মিত দ্রব্য পরিস্কার করিবার, মার্ব্বল-নির্ম্মিত দ্রব্যের দাগ তুলিবার উপায়; এবং কাচ বা চীনার বাসন জুড়িবার আটা	.........৫০-৫১
১মতঃ।—টোট্‌কা-টুট্‌কি—প্লিহা-যকৃত, রাতকাণা, মাথা-ধরা, হিক্কা, ছুলি, অর্শ, বৃশ্চিক-দংশন প্রভৃতির ঔষধ। ২য়তঃ। – সখের জিনিস—milk powder, চুলের কলপ, কল ব্যতীত লেমনেড-প্রস্তুত, ছারপোকা মারার ঔষধ প্রভৃতি	...৩২১-২৩
পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি	২৬৮, ৩২৩, ৩৪২
পাপীর আত্মকথা	১৬৫, ১৮৩, ২০১, ২১৯
প্রকৃতি-লীলা	৩২৭
প্রতারণা-প্রবঞ্চনা	১৭, ৩৫, ৫৩, ৭১, ৮৯, ১০৮,

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
	১২৭, ১৪৪, ১৬২, ১৮০, ১৯৮, ২১৬, ২৩৪, ২৫২, ২৭০, ২৮৮, ৩০৬, ৩২৪, ৩৪২, ৩৬০, ৩৭৯, ৩৯৬, ৪১৫
প্রতিহিংসা ...	১২৯, ১৩৬
প্রাচীন ভারতের অধিবাসীর প্রকৃতি	৮১
প্রার্থনা ...	৩৬৩, ৩৯৯
প্রেম-ফুটা	১৬৫
প্রেমিকের গান	২৭৩
প্রেমময় নাথ	১৯
ফুলরেণু (পদ্য)	২৫০, ২৫৭, ৩৭৫, ৪০৯
হিমালয়, দুঃখিনীর কথা	২৫০-৫১
ভক্তি-উপহার, পরিতাপ'র রোদন	২৫৭-৫৮
বিরহ, বর্ষা	৩৭৫
কণ্টক-বৃক্ষে লতিকা, গান ...	৪০৯
বারমুখী বেশ্যা	৩১৬
বারাঙ্গনার অভিসম্পাত	৩৩৫, ৩৪৮
বিদুষী অবিয়ার	৩০০
বিরাট উপহার	২৮৬
বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেসান ...	৬৯
বৈজ্ঞানিক চোর	২৩৭
বৈদিক মন্ত্র ...	১৩.৩০, ৪২, ৬১, ৮৪
ভক্তি-উচ্ছ্বাস	৩৭
ভক্তি ও ভক্ত	৫৭
ভক্তি-সঙ্গীত	১২৯
ভক্তের গান	২৫৫
ভবিষ্যতের খেদ	৩৬৬
ভারতবর্ষ	৬, ২৬, ৭৯
ভাস্করাচার্য্য	২২৯
মঙ্গলময় শ্রীহরি	৩৯৯
মতামত ...	৫২, ৬৯, ৮৮, ১০৫ ১৪৪, ১৯৬ ২১৪, ২৩৩, ২৫১, ২৬৯, ৩০৬, ৩২৩, ৩৭৭, ৩৯৪, ৪১৪
মরামানুষ বেঁচে ওঠে ...	৯৪
মলয়াবতী	১৭৫
মহাপুরুষই বটে	২৫৫
মানুষ কি স্বাধীন	২২
মানুষ ভাবে কেন	১৫৮
মা, মা, আয় মা	৭৩
মুষ্টিযোগ	৬৮, ১৪৩
কুকুরের বিষ, কুম্ভীর-ভয় এবং মশা, ইন্দুর প্রভৃতি নিবারণের উপায়	৬৮-৬৯
গৃহিণী, পেটের অসুখ, অপরিপাক ইত্যাদি এবং মেদ, শরীর দুর্ব্বল ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক ঔষধ ...	১৪৩
যমালয়ের ফেরতা মানুষ ...	৩, ১৯, ৩৯, ১০৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
যাতনার হাসি	১৪৭
রঙ্গরস	৩৩
রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত প্রণালী ...	১০১
রাজপুত-সতী	১৪
রাজসই জুয়াচুরী	১১২
রাধারাণী ...	৩২, ৪৭, ৬৮, ৯৮
রাধিকার বিরহ	২১৫
রাণা সঙ্গ	২৮, ৬৭
রায় বণিয়ারগড়	২২৭
শাস্ত্র-তত্ত্ব ...	২৪৫
শিক্ষা	৫
শীলাদেবী	৬২
শুকুলি জাতি	২৭৮
শ্যামা-সঙ্গীত	২৯১, ৩০৯
শ্যামাসুন্দরী	৮৫
শ্রীচৈতন্যের বিশ্বজনীন প্রেম ...	৯৬
সকলেরই আবশ্যকীয়	১৯৭, ২১৩
রবার-ষ্ট্যাম্পের কালী ও প্যাড প্রস্তুত, কাচ ও পিত্তলের উপর খোদাই, ফ্রেঞ্চ পালিস প্রস্তুত, কাপড়ে লিখিবার কালী, কৃত্রিম স্বর্ণ এবং কৃত্রিম রৌপ্য প্রস্তুতের প্রণালী ইত্যাদি	১৯৭-৯৮
বালকের কৃমিজনিত রক্তামাশয়ের, হিক্কারোগের, পায়ে পাঁকুই বা হাজার, শুঁও-পোকা লাগার, সর্পদংশনের, জোঁকে ধরার, ঔষধ মর্দ্দনে জ্বর-আরোগ্যের, শিশুর ম্যালেরিয়ার, জ্বরের সহিত রক্তভেদের, এবং জীর্ণজ্বরের সহিত কাশী প্রভৃতির ঔষধ	২১৩-১৪
সংবাদ	১৮, ৩৬, ৫৪, ৭২, ৯২, ১০৯, ১২৮, ১৪৬, ১৬৪, ১৮২, ২০০, ২১৭, ২৩৫, ২৫৪, ২৭২, ২৮৯, ৩০৭, ৩২৫, ৩৪৩, ৩৬১, ৩৮০, ৩৯৭, ৪১৬
সংসারবিরাগী যুবক	১৯০
সঙ্গীত-শাস্ত্রের শ্রাদ্ধ	৮২
সৎ ও অসৎ গ্রাহক	৩২৫
সত্যানন্দ	৩৩১, ৩৫৬, ৩৮৫, ৪০৪
সাঁওতাল, তাল ও ভেয়ার ...	৩৪
সাঁওতাল-পরগণা	১০, ২৪, ১২৪, ১৪৩, ১৫২, ১৯৪
সাধক-সঙ্গীত	২০১, ২১৯
সাধু বামাচরণ	২৬০
স্তোত্র	৩৮১
স্বাধীন-বৃত্তি	১৭৩
স্বভাব-সঙ্গীত	২৩৭
হাতিয়াগড়	১৩৩
হালালী ও হারামী	১১৫
হৃদয়ের ভিত্তি কোথায়	১৩৯

অনুসন্ধান

—০:(০):০—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৫ সাল। [১ম সংখ্যা

ওঁ শ্রীশ্রীহরি।

নববর্ষ।

অনাদিমধ্যান্তমজম্ অবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

'যাঁহার আদি মধ্য অন্ত নির্ণয় হয় না, যাঁহার জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় ও বিনাশ নাই, যিনি সকল কারণের কারণ, সেই মহাত্মাকে প্রণাম করি।'

পরমপিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে শরণ লইয়া নববর্ষে নব-অনুরাগে আবার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। কার্য্যক্ষেত্র সুবিশাল, কর্ম্মকাণ্ড দুরারাধ্য, শঙ্কট-ভয় পদে পদে; কিন্তু আশা অনন্ত। তাই সেই অনন্তদেবের চরণে আশ্রয় লইলাম। দয়াময় তিনি: অধীনের ত্রাণকর্ত্তা তিনি; আশ্রয় দিয়াছেনও তিনি। তাই সম্পূর্ণ ভরসা, আজীবন আশ্রয় দিবেনও তিনি। তিনি না আশ্রয় দিলে গতিশীল জগতে কে দাঁড়াইতে পারিত? তিনি আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়াই নভোমণ্ডলে সূর্য্যের চ্ছটা; নিশাকালে চাঁদের হাসি। তাঁহার আশ্রয় পাইয়াই প্রগাঢ় আকাশে সুচারু নক্ষত্র ফুটিতেছে; জ্বলন্ত নভোস্থল হইতেও দিগন্ত-স্নিগ্ধকারী মুক্তা-জল ঝরিতেছে। তবে আমরাই বা তাঁহার অনন্ত চরণপ্রান্তে স্থান না পাইব কেন?

স্থান পাইবার আশাতেই আবার সাহস করিয়া কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিলাম। যে কর্ত্তব্যের জন্য জগতে কত মহাজন প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছেন, সে কর্ত্তব্যের নিকট আমরা তো ক্ষুদ্র কীটানুকীট। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও, চেষ্টার ক্রটী করিব না। চেষ্টায় না হইতে পারে কি? তাই সেই কর্ণধারের রাতুল চরণ দু'খানি ভরসামাত্র করিয়া কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইলাম। এখন, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় মঙ্গল করুন, এই প্রার্থনা। তিনি প্রসন্ন থাকিলেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি; তাঁহার করুণা-কণা পাইলেই জগৎ পরিতৃপ্ত। তাই আমাদেরও অন্তরের নিবেদন,—

"যতঃ প্রধান পুরুষৌ যতশ্চৈতৎ চরাচরম্।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥"

জুয়াচোরের নূতন ক্রিয়া।

১

রামহরি বাবুর সপ্তম বর্ষ বয়স্ক পুত্র যদুনাথ স্কুলে পড়িতে যাইতেছে; তাহার সঙ্গে বাড়ির ঝি,—তাহাকে স্কুলে রাখিতে চলিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা ছাড়াইয়া তাহারা কলেজ-ষ্ট্রীটের চৌরাস্তায় যায় যায়, এমন সময় একটী বাবু শশব্যস্তে তাহাদের নিকট আসিলেন; আসিয়াই ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঝি, রাম বাবু কোর্টে গিয়াছেন কি?"

ঝি।—"হঁা, এই এখনই যাচ্চেন। তবে যাবার সময় আপনাদের আসার কথাও সরকার মহাশয়কে বলে গেলেন!"

বাবু।—"কি বলে গেলেন?"

ঝি।—"এই বলে গেলেন যে, সকালে যে বাবুরা এসেছিলেন তাঁরা এলেই যেন শীগ্‌গীর তাঁদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।"

বাবু।—"মকর্দ্দমার কথা আর কিছু বলে গিয়েছেন কি?"

ঝি।—"বলে গিয়েছেন যে, আপনাদের মকর্দ্দমা প্রথমে আরম্ভ হ'বে।"

বাবু।—(অতি ভনিতার সহিত)—"দেখ ঝি, তবে তুমি এক কাজ কর; নৈলে আমার মকর্দ্দমাটী মাটী হয়! তুমি ঝাঁ করে একবার বাড়ীতে গিয়ে সরকার মশাইকে কোর্টে পাঠিয়ে দেওগে; বলগে, আমি রাস্তা থেকেই এগিয়ে চল্লেম।"

ঝি।—"তা মশায়, খোকা বাবুকে স্কুলে না দিয়ে তো যেতে পারিনে! তা আপনি এগিয়ে যান; আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেব।"

বাবু।—"তা' হলে তো চল্‌বে না; তাঁকেই বিশেষ দরকার। আচ্ছা, তুমি না হয়, যদুনাথকে আমার সঙ্গে দেও; আমি ওকে স্কুলে দিয়ে যাচ্ছি। আর, আমি এই ।০ চার আনার পয়সা দিচ্ছি; তুমি না হয় ঐ মোড়ের কাছ থেকে গাড়ি ভাড়া ক'রেই একটু শীগ্‌গীর যাতে যেতে পার, তা'ই কর।"

পয়সা চারি আনা হাতে লইয়া ও স্কুল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, ঝি সুতরাং বড়ই বাধিত হইল। সে আর দ্বিরুক্তিটীও করিল না। "আচ্ছা, তাই যাচ্চি"—এইমাত্র কথাটি বলিয়া সে সটান সোজা পথে চলিতে লাগিল। আর, বালকটিও বাবুকে পূর্ব্বে দুই একবার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখায়, পরিচিত ভাবিয়াই তাঁহার সহিত চলিল।

২

বাবুটি অতঃপর বালকটিকে সঙ্গে লইয়া যা'বার সময় তাহাকে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। পাঠকগণের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য সে কথাবার্ত্তারও কিঞ্চিৎ আভাস এস্থলে প্রদত্ত হইল। বাবুটি প্রথমে বলিলেন,—"আচ্ছা যদু, তুমি হাবড়ার পুল দেখেছ কি?"

বালক।—"এক দিন ছেলেবেলায় বাবুর* সঙ্গে দেখেছিলাম বটে; কিন্তু সে কথা ত মনে হয় না। তবে আর এক দিন বাবু নিয়ে যাবেন বলেছিলেন; কিন্তু তা আর যান নাই।"

বাবু।—"আচ্ছা, তোমার তা আর দেখ্‌তে ইচ্ছা করে?"

বালক।—"করে বই কি; কিন্তু কে দেখায়?'

বাবু।—"আচ্ছা, তুমি হাবড়ার রেলের গাড়ি দেখেছ?"

বালক।—"না, তা দেখিনি। তবে ক্লাসের ছেলেদের কাছে শুনেছি, সে গাড়ি গড় গড় ক'রে চলে। তা'ও দেখ্‌তে কিন্তু ইচ্ছে করে।"

বাবু।—"আজ তুমি সেই হাবড়ার পুল আর রেলের গাড়ি দেখ্‌তে ইচ্ছা কর কি?

*কলিকাতার সুসভ্য সমাজের ছেলেরা 'বাবা' বলার পরিবর্ত্তে এইরূপ 'বাবুই' প্রয়োগ করিয়া থাকে।

আমি তা' হ লে তোমায় না হয় দেখিয়ে আন্‌তে পারি।"

বালক।—"তবে স্কুলে না গেলে বাবা বক্‌বেন যে!"

বাবু।—"তা আমার সঙ্গে যাবে, তা'তে আর ভয় কি?'

বলা বাহুল্য, এরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর স্কুলে যাওয়ার পরিবর্ত্তে বাবুটী বালককে হাওড়ার পুল ও রেলগাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলেন।

৩

যা'বার সময় রাস্তায় বাবুটীতে ও বালকটীতে একটী বড়ই নূতনতর সম্পর্ক পাতান হইল। বাবুটী বালককে বলিলেন,—"পুলের আসে পাশে রেলের ধারে গোরা খালাসিরা আছে। পরের সঙ্গে গেলে তা'রা ছেলেপিলের উপর বড়ই উৎপাৎ করে। সেইজন্য, তোমায় আমি একটা কথা বলি, তুমি এখন হইতে আমায় 'বাবা' বলিয়া ডাকিও; তাহা হইলে তোমায় আর কেহই কিছু বলিবে না। উপরন্ত, আমার সহিত তাহাদের সকলের আলাপ থাকায়, তাহারা তোমায় যত্নই করিবে।'

ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালকও অতঃপর তাহাতেই সম্মত হইল। পরে পুলের রাস্তার দিকে যাইতে যাইতে ক্রমে বাবুটী একবার বড়বাজারের কাপড়ের দোকানের দিকে যাইতে লাগিলেন; বালককে বলিলেন,—"এই, বাড়ার জন্যে জোড়া কএক কাপড় লইয়াই পরে পুলটুল দেখিতে যাইতেছি। এস, একবার দোকান হইতে ঘুরিয়া আসি।"

৪

বালককে এইরূপ বুঝাইয়া পরে বাবুটী ও বালকটীতে একটী কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে কিনিবার জন্য নানারূপের কাপড় বাহির করাইলেন। ক্রমে কাপড়গুলি বাছিয়া লইয়া দোকানদারকে বলিলেন,—"মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আপনাদের একজন লোক আমার সঙ্গে দেন; বাড়ী হইতে এই কাপড়গুলি পছন্দ করিয়া আনাই। আর, আমার এই ছেলেটী এখানে থাকিল, দেখিবেন; বাড়ী হইতে কাপড় পছন্দ করাইয়া আনিয়াই উহাকে পুল দেখাইতে লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া একটী মুটে ডাকিয়া বাবুটী তাহাকে কাপড়ের মোট মাথায় লইতে বলিলেন। আর কাপড় পছন্দ করাইয়া আসিয়াই পুল দেখাইতে যাইবেন, বালককে এই কথায় আশ্বস্ত করিলেন। বলা বাহুল্য, বাবুর কথা বার্ত্তায় এবং এইরূপ সরল ব্যবহারে দোকানদার তাঁহার সঙ্গে আর দোকানের লোক পাঠান আবশ্যক বোধ করিলেন না; বিশেষ, সে সময় দোকান ছাড়িয়া তাঁহাদের কাহারও যাওয়ার সুবিধাও হইল না। অধিকন্তু পুত্রকে দোকানে বসাইয়া রাখিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা আর কোন দুশ্চিন্তা মনেও স্থান দিতে পারিলেন না। ক্রমে মুটের মাথায় কাপড়ের মোট বোঝাই দিয়া বাবুটী যথাস্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তার পর যাহা হইল, তাহা আর এবার নহে।

যমালয়ের ফেরতা মানুষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফরিয়াদির এজাহার।

সেখ নসিরুদ্দিন এখন ভবানীপুরের এক জন মধ্যবিৎ প্রজা। গত তিন বৎসর হইতে কণ্ট্রাক্টের কর্ম্ম করিয়া যেমন হউক দশ টাকার সংস্থানও করিয়াছেন; কিন্তু অদ্য তিনি বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্থ। সুতরাং থানায় আসিয়া যেরূপ এজাহার দিতেছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই

স্থানে পাঠকগণকে অবগত করাইব। নসিরুদ্দিন বলিতেছেন,—"মহাশয়গণ,প্রায় তিনমাস অতীত হইল, আমি এক জন পোদ্দারকে প্রায় ছয়সাত শত টাকা মুল্যের কতকগুলি সোনার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলাম এবং অনেকবার তাগাদা করা স্বত্বেও ঐ সকল গহনা আমি পাই নাই। কিন্তু গত কল্য দিবা ১০টার সময়, যখন আমি আফিস-অঞ্চলে যাইতেছিলাম সেই সময়ে, ঐ পোদ্দার আমাকে ডাকিয়া সমস্ত গহনাগুলি প্রদান করিয়া বলিয়া দিল যে,—"আমি এখন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দেশে যাইতেছি, প্রায় দুই তিন মাস ভিন্ন ফিরিয়া আসিতে পারিব না। এখন, আপনি গহনাগুলি লইয়া যাউন; আমি ফিরিয়া আসিয়া হিসাব পত্র করিয়া দেনা পাওনা স্থির করিব।" সুতরাং আমি গহনাগুলি গ্রহণ করিলাম ও কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, গহনাগুলি সঙ্গে করিয়া আফিস অঞ্চলে যাই, কি আবার বাটী ফিরিয়া গিয়া উহা রাখিয়া আসি! আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় গোলাম হোসেনের পুত্র কাছেম আলিকে দেখিতে পাইলাম। উহাকে অনেক দিবস হইতে ভাল লোক বলিয়া জানি; বিশেষ, আমার বাটীর নিকটেই উহাদিগের বাসস্থান। আমি কাছেম আলিকে ডাকিলাম; সে নিকটে আসিল। আমি গহনাগুলি তাহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিয়া দিলাম, তুমি ইহা লইয়া যাও, আমার বাটিতে গিয়া আমার ভ্রাতার নিকট দিও। সে সম্মত হইল, ও গহনাগুলি লইয়া সেই স্থান হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। আমিও আফিস-অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার সময় এখন বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া গহনার কথা জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, কাছেম আলি কোন গহনা আনিয়া বাটিতে দেয় নাই। পরে কাছেম আলির অনুসন্ধান করিলাম ও তাহার পিতা গোলাম হোসেনের নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, সে তাহার গুরুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অদ্য গমন করিয়াছে। গহনার কথা জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধ গোলাম হোসেনও তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। এখন, মহাশয়েরা একটু অনুগ্রহ না করিলে আর আমার কোনরূপ উপায় হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি আপনারা উহাকে সন্ধান করিয়া না ধরেন তবে আমার ছয় সাত শত টাকা একেবারেই লোকসান হইয়া যাইবে। আমি উহার উপর বিশ্বাস-ঘাতকতার নালিশ করিতেছি; এখন আপনাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তদারকে গুপ্ত-কথা প্রকাশ।

পুলিশ-কর্ম্মচারী ফরিয়াদির এজাহার লইয়া তদারকে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে কাছেম অলির বাটিতেও গমন করিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা গোলাম হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাহার নিকট জানিতে পারিলেন যে, কাছেম আলি তাহার গুরু একজন ফকিরের সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবার নিমিত্ত কল্য গমন করিয়াছে; তবে সে ফকির কে, কোথায় থাকে, তাহাও বৃদ্ধ কিছুমাত্র অবগত নহে। যাহাহউক,ইহাতেপুলিশ-কর্ম্মচারী কিন্তু অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং বৃদ্ধকে বারবার অনুরোধ করায় সে তাহার বাটির ভিতর গমন করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়া প্রকাশ করিল যে, কাছেম আলির মাতার এবং স্ত্রীর গহনার বাক্সও নাই; সিন্দুকের তালা খোলা রহিয়াছে। তখন বৃদ্ধ একেবারে অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল,—"এখন বোধ হইতেছে, কাছেম আলি আমার পুত্র নহে।"

পুলিশ-কর্ম্মচারী ইহা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন ও বৃদ্ধকে বারবার জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধ যাহা বলিল, তাহা শুনিলে চমকিত হইতে হয়; তাহা বড়ই অদ্ভুত কথা। বৃদ্ধ বলিল,—"এখন আমার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছে। যখন আমার বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর, সেই সময়ে অনেক আরাধনার পর আমি একটীমাত্র পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, এত দিবস পরে ঈশ্বরের কৃপায় আমার যাহা কিছু বিষয়াদি আছে তাহা উপভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র পাইলাম। কিন্তু আমার সে আশা অতি অল্পদিন মধ্যেই সমূলে নির্ম্মুলিত হইল। উহার বয়ঃক্রম ছয় মাস উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আমাদিগের সকল ভরসার স্থল সেই পুত্ররত্ন সমন সদনে প্রস্থান করিল। আমরা অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে করিতে আমাদিগের ধর্ম্মানুযায়ী উহার সমাধি-কার্য্য সমাধা করিলাম; ও হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত দুঃখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিতে করিতে আরও প্রায় পোনের-ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। প্রায় চারি বৎসর হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় আমি আমার 'দলিজে' বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিতেছি, এমন সময় ঐ কাছেম আলি, যাহার বয়ক্রম তখন ১৬ বৎসর, আস্তে আস্তে আমার নিকট আসিল; ও ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক আমাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া বলিল,—'পিত! আমি আসিয়াছি।'

আমি উহার কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাপু, তুমি কে আমাকে পিতৃ সম্বোধন করিলে?' তাহাতে কাছেম আলি বলিল,—'পিত, আমার নাম কাছেম আলি, আমি আপনার পুত্র। আপনার বোধ হয় মনে আছে যে, প্রায় ষোল বৎসর উত্তীর্ণ হইল, আপনার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে; আমি আপনার সেই সন্তান। আমার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, এক দিবস তাঁহার ক্রোড় হইতে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম; আমার কপালের সেই দাগ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। যখন আমার বয়ঃক্রম ছয় মাস মাত্র হইয়াছিল, সেই সময় আমার অতিশয় পীড়া হয়; তাহাতে সকলেই মনে করেন যে, আমি মরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিক আমি মরি নাই। আমাকে মৃত মনে করিয়া আপনারা কবরে প্রোথিত করেন। কিন্তু সেই সময় একজন ফকির সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি সমস্ত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে পান। আপনারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিলে তিনি আমাকে কবর হইতে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যান ও বহু যত্নে আমাকে রোগ হইতে মুক্ত করেন। ইহাও আপনার বোধ হয় বেশ মনে আছে যে, পর দিবস প্রাতঃকালে আপনি কবর দেখিতে গিয়া উহা খোদিত অবস্থায় দেখিতে পান। তাহাতে শৃগাল কর্তৃক এইরূপ অবস্থা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া আপনি সুহস্তে উহা ঠিক করিয়া দেন। আমি গত ষোল বৎসর পর্য্যন্ত সেই ফকিরের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া এত বড় হইয়াছি; নানা দেশ দেশান্তর তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই সকল গূঢ় রহস্যও তাঁহারই নিকট অবগত হইয়াছি। প্রায় এক মাস অতীত হইল, ফকির সাহেব এলাহাবাদের নিকট একটী পর্ব্বতে গমন করিয়া সেই স্থানে ঈশ্বরের ধ্যানে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট অতিবাহিত করিবেন মনস্থ করিয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, তুমি যদিও এখন সংসারে প্রবেশ করিতে চলিলে, কিন্তু একেবারে সংসারের মায়ায় অভিভূত হইও না। মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার

সহিত সাক্ষাৎ করিও। আর, তোমার বৃদ্ধ পিতাকেও বলিও যে, কোন না কোন সময় আমি যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিয়া আসিব।'

এই সকল কথা শুনিয়া আমার চক্ষু দিয়া দর দর বেগে জল পড়িতে লাগিল; আমার অন্তরের সহিত সমস্ত কথা মিলিল দেখিয়া,আমি আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম; সেও বাহিরে আসিয়া সকল শুনিয়া সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিল এবং কাছেম আলির মুখ চুম্বন করিয়া যত্নের সহিত বাটীর ভিতর লইয়া গেল। আমিও হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। ক্রমে পাড়ার লোকজনও আসিয়া তাহাকে দেখিল ও সকলেই তাহার কথায় অতিশয় বিশ্বাস করিল। সেই পর্য্যন্ত আমি উহারে আমার পুত্র জানিয়া এত দিবস ভরণ পোষণ করাইয়া আসিতেছি; সদ্বংশজাত সুপাত্রীর সহিত উহার বিবাহও দিয়াছি। এই তাহার স্ত্রী; এই তাহার দুইটী পুত্র। সে প্রায়ই দুই চারি মাস অন্তর সেই ফকিরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত বিশ-পঞ্চাশ টাকা লইয়া এলাহাবাদের নিকট পর্ব্বতে গমন করে এবং দশ-পনের দিবস তথায় থাকিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে। গত কল্য সে সেইরূপই গিয়াছে; কিন্তু এবার তাহার স্ত্রীর ও মাতার সমস্ত গহনাগুলি লইয়া গিয়াছে, বোধ হইতেছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

পুলিশ-কর্ম্মচারী এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু এলাহাবাদে সে প্রকার কোন ফকিরের সন্ধানই পাওয়া গেল না। কিন্তু তিনি যখন তিনি কলিকাতায় গুপ্ত-অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে এক দিবস মেছুয়াবাজারে জানিতে পারিলেন যে, তাহার প্রকৃত নাম কাছেম আলি নহে ও তাহার বাটী কানপুরের নিকট একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন ও ক্রমে তথায় তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন। প্রায় সমস্ত গহনাও তাহার নিকট পাওয়া গেল এবং জানিতে পারিলেন যে, তাহার পিতা, মাতা, স্ত্রী ও একটী পুত্র সেই স্থানে আছে। আরও জানিলেন, উহারা এক দল এইরূপে ভারতবর্ষের ভিতর পর্য্যটন করিয়া নানারূপ জুয়াচুরী ব্যবসা অবলম্বন পূর্ব্বক আপন-আপন জীবিকা-নির্ব্বাহ ও পরিবার-প্রতিপালন করিয়া থাকে। ফকির প্রভৃতি সকলই মিথ্যা। মধ্যে মধ্যে ফকির-দর্শন করিব বলিয়া আপন বাটীতে যাইত ও যাহা কিছু সংস্থান করিয়া লইয়া যাইত তাহা উহাদিগকে দিয়া পুনরায় প্রস্থান করিত। যাইহোক, পরে পুলিশ-কর্ম্মচারী উহাকে লইয়া ভবানীপুর আসিলেন। তাহার বৃদ্ধ পিতা ও মাতা সকল শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল; তাহার স্ত্রী ও মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া বসিয়া পড়িল। অতঃপর মকর্দ্দমা আদালতে প্রেরিত হইলে আদালতও লোকে লোকারণ্য হইল। যে শুনিল, সেই 'যমের বাড়ীর ফেরতা মানুষ' দেখিতে আসিল।

ভারতবর্ষ।

(পৌরাণিক ভারত)

পুরাণে লিখিত আছে, পৃথিবী সাতটি সাগর বেষ্টিত দ্বীপের সমষ্টি। জম্বুদ্বীপ ঐ সাতটির একটি। ইহা পদ্মকোষ-মধ্যবর্ত্তী কোষের ন্যায়, ইহা লক্ষ যোজন বিস্তৃত এবং পদ্ম পত্রের ন্যায় সমবর্ত্তুল। লক্ষ যোজন লবণ সমুদ্র ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহা নববর্ষে বিভক্ত; ভারতবর্ষ সেই নববর্ষের অন্যতম। ভারতবর্ষ বলিলে এক্ষণে পেশাবর

(Peshawar), সুলেমান ও হালা হইতে ব্রহ্মদেশ হইয়া সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে বুঝায়। ভারতবর্ষ-বিচার নামক পুস্তকের প্রণেতা বলেন পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বলিলে আধুনিক পৃথিবীর সমস্ত বুঝাইত। ইহার সংস্কৃত নাম ভারত বা ভারতবর্ষ। ভূপতি ভারত হইতে ইহার এই নাম হইয়াছে। গ্রীক প্রভৃতি জাতিরা ইহাকে ইণ্ডিয়া (India) বলিত; সেইজন্য এক্ষণে ইহার ইংরাজী নাম ইণ্ডিয়া হইয়াছে। পারসিকেরা ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশকে হপ্তহিন্দু, হিব্রুগ্রন্থে হদ্দু (Hoddu), সিরীয় জাতিরা হেন্দু (Hendu), আরবীয়েরা হিন্দ্ (Hind) বলিত। সংস্কৃত সিন্ধু শব্দ হইতেই পারসিক হিন্দু, হিব্রু হদ্দু, বা হন্দু, সিরীয় হেন্দু, আরবীয় হিন্দ্, গ্রীক ইন্দস্ (Indos), চৈন সিন্-তু (Shin-tu), লাতিন সিন্দস্ (Sindus) প্রভৃতি হইয়াছে; এবং তাহা হইতেই হিন্দুস্থান (Hindustan) শব্দের উৎপত্তি।

পুরাণে লিখিত আছে, হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত অবস্থিত ভূভাগের নাম ভারতবর্ষ। যথা,—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণং।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি॥"
(বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩।১)

সুতরাং পৌরাণিক ভারতবর্ষ যে সমগ্র আধুনিক পৃথিবী নয়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যুত, আমরা যাহাকে এখন পৃথিবী বলি, তাহাই যে পৌরাণিকগণের ত্রিভুবন তাহা প্রবন্ধান্তরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পুরাণে ভারতবর্ষের (এবং সকল স্থানের) পরিমাণাদির যেরূপ উল্লেখ আছে আধুনিক পরিমাণ-সম্বন্ধে তাহার সহিত মিল হয় না বটে; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা এ প্রবন্ধে কিছু না বলিয়া প্রবন্ধান্তরে আমাদের বক্তব্য বলিব। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,ভারতবর্ষের পরিমাণ ৯০০০ যোজন; এই বর্ষে মহেন্দ্রাদি সপ্তকুলাচল আছে। এই সপ্তকুলাচল সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য গতবর্ষের অনুসন্ধানের ২৪৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

সপ্তকুলাচল-মণ্ডিত ভারতবর্ষ নয়ভাগে বিভক্ত। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ ও সাগরবেষ্টিত (কুমারাখ্য) আর একটি দ্বীপ এই নয় ভাগে বিভক্ত। যথা—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিশময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান, তাম্রবর্ণো গভস্তিমান॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ।৬।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ॥৭॥
(বিষ্ণুপুরাণ, ২।৩)

আর বামন পুরাণে আছে,—
"কুমারাখ্যপরিখ্যাতোদ্বীপোঽয়ংদক্ষিণোত্তরঃ।"

ভারতবর্ষ-বিচার-রচয়িতা সমগ্র পৃথিবীকে ভারতবর্ষ বলিয়া, ইন্দ্রদ্বীপ=ইংলণ্ড; কশেরুমান্=দুর্গ বা রাবনাবাস লঙ্কা; তাম্রবর্ণ=গ্রীনল্যাণ্ড বা আমেরিকার নিকট কোন দ্বীপ; গভস্তিনাম=মরীচদ্বীপ (Mouritious); নাগদ্বীপ বা নাকদ্বীপ=নাকরদ্বীপ; সৌম্য=নিউহলণ্ড; গান্ধর্ব্ব=সিংহল; বারুণ=আফ্রিকা সন্নিহিত কোন দ্বীপ; আর কুমার দ্বীপ=আমেরিকা, বলিয়াছেন। ইহাতেই সমস্ত পৃথিবী ফুরাইল?

কিন্তু পুরাণের শ্লোক দুইটি যদি স্থির চিত্তে অর্থ করা যায়, তাহাহইলে, দেখা যাইবে যে, কেবল নবম ভাগটিকেই ব্যাসদেব সাগরমধ্যস্থ দ্বীপ বলিয়াছেন। অপরগুলি তাহা নয়; পৌরাণিক ভারতের বিভাগমাত্র।

পুরাণে যে সকল পর্ব্বত নদী প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহার অনেক আজিও পূর্ব্ব নামে প্রচলিত আছে। দেখা যায়, দাক্ষিণাত্যের নদী প্রভৃতির নাম অধিকংশই ঠিক আছে; কিন্তু অর্য্যাবর্ত্তের নদী প্রভৃতির নাম অনেক স্থলে

স্থির করা দুরুহ। ইহাতে এই বোধ হয় যে, অর্য্যাবর্ত্তে নানা জাতির উপদ্রবে নামসকল গোলোযোগ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তত অধিক উপদ্রব হয় নাই বলিয়াই সেদিকে নামের তত গোলোযোগ ঘটে নাই। নদী ও পর্ব্বতাদির বিষয় বারান্তরে আলোচ্য। ✓

অহংজ্ঞান। ✓

"জগৎ মজ্‌ল অহংজ্ঞানে,
আমি কে 'আমায়' কেউ না জেনে।"

কবি যথার্থই প্রাণের কপাট খুলিয়া গভীর উচ্ছ্বাসে এ গভীর মর্ম্ম-গীতি গাইয়াছেন। বিশাল-সংসারের যে দিকে চাই, সেই দিকেই এই অনন্ত বিস্ময়—এই অদ্ভুত রহস্যে বিমোহিত হই। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাণু হইতে বিশাল বারিধি-সীমা সুদূর শৃঙ্গধর চূড়ায় এ বিচিত্র ভাব দেদীপ্যমান। ধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—প্রকৃতির বিশাল বিশ্ব-রাজ্যের চরাচর, স্থাবর, জঙ্গম, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহউপগ্রহাদিতেও এই অব্যক্ত ভাব অচিন্ত্যরূপে ওৎপ্রোত ভাবে সমাবিষ্ট। কূল নাই—শেষ নাই—সীমা নাই—যে দিকেই চাই, সেই দিকেই এ মহাভাবের পূর্ণ বিকাশ। ভাষায় নাই—বর্ণনায় নাই—এভাব এক অতি গভীরতর স্থানে অবস্থিত। নির্লিপ্ত হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী; নিরাকর হইয়াও সাকারত্বের পূর্ণ সীমায় বিরাজিত—ভাবরূপ অব্যক্ত। এ গভীর রহস্য—এ অনন্ত-বিস্ময় ভেদ করিতে কতশত মহা মহা পণ্ডিতের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছে, কতশত দার্শনিকের দর্শনতত্ত্ব পরাভব মানিয়াছে, কতশত নৈয়ায়িকের ন্যায়শাস্ত্র গভীর কল্পনা-জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

ভাবরূপ অব্যক্ত। প্রকৃতই এ অহংজ্ঞান, 'ভাবরূপ অব্যক্ত।' মানুষের দৃষ্টি, বিচারশক্তি বা ভাবময়ী কল্পনার তীব্র অনুসন্ধান, এ গভীর রহস্যের শীর্ষস্থানে উপনীত হইতে পারে না। ইহার মূল কি, ভিত্তি কোথায় কে বলিবে? যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখ, শেষে অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই অনুমান হইবে না। কি বিশ্বজনীন উদার কল্পনা! কি অলৌকিক রহস্য! ইহা এক পক্ষে যেরূপ উদার ও মহান্, অন্য পক্ষে আবার তেমনি ক্ষুদ্র ও হীনভাবাপন্ন। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফল লাভ হয়, অন্য দিকে আবার তেমনি পাপ, অনর্থ ও নরকের পথ প্রসারিত হইয়া থাকে। এই অহংজ্ঞান এক পক্ষে আলোক, অন্য পক্ষে দুঃখ; এক পক্ষে ধর্ম্ম, অন্য পক্ষে পাপ; এক পক্ষে স্বর্গ ও অন্য পক্ষে নরক। এই-ই বিধাতার সৃষ্টি-রহস্য। এক বস্তু সকল সময়ে সকল অবস্থায় সমান ফল দিতে পারে না। দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে পৃথক পৃথক ফল ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই পাপও সময় বিশেষে পুণ্য এবং পুণ্যও অবস্থা-ভেদে পাপ কার্য্যে পরিণত হয়। যিনি অনন্ত ভগবানের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে সমগ্র মানবজাতিকে এক চক্ষে দেখিয়া থাকেন; এমন কি, ক্ষুদ্র তৃণটিকে পর্য্যন্তও আপন 'আমিত্ব'-জ্ঞানে দৃষ্টি করেন, সে মহাপুরুষের পক্ষে এ 'অহংজ্ঞান' কত মহামূল্য!—কত দুষ্প্রাপ্য! আবার বিষয়-বিষ-জর্জ্জরিত অতি ক্ষুদ্রচেতা সংসার-কীট যখন (অন্য দূরের কথা) আপন সহোদর বা পিতা-পুত্রকে পাপ 'অহংজ্ঞানে' মত্ত হইয়া নির্য্যাতন করে, তখন সে 'অহংজ্ঞানের' পরিণামই বা কি শোচনীয়! প্রথমোক্ত অহংজ্ঞানোন্মত্ত কয় জন? সংসারে শুকদেব বা জনকরাজ, চৈতন্য বা বুদ্ধ কয় জন জন্মিয়াছেন? মহর্ষি নারদ বা অদ্বৈতগুরু শঙ্করাচার্য্য, বিশ্বপ্রেমিক কবির বা শিখগুরু নানক কয়জন মিলিয়া থাকে? খলমতি দুর্য্যোধন ও শকুনির ভাগই ত অধিক! তাই বলিতে ছিলাম যে, এই বিশ্ববিধ্বংশী, করালরূপী

'অহংভাব' মানুষের পরম শত্রু! এ শত্রুকে দমন না করিলে আর ভদ্রস্থতা নাই। অহংভাব স্বাভাবিক। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ইহা মানুষের হৃদয়-ক্ষেত্রে অল্পাধিক পরিমাণে রোপিত হইয়া আসিতেছে। মানস-কৃষকের কর্ষণগুণে ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। দুগ্ধপোষ্য অপোগণ্ড শিশু—যে সংসারের কিছুই জানে না, তাহার নিকটও যাইয়া দেখ, দেখিবে, সেও এই অহংজ্ঞানের আস্বাদন বুঝিয়াছে। তাহাকে একটু আদর কর, দু'টা মিষ্ট কথা কও, সে তোমার কোলে উঠিবে, মধুর হাসি হাসিয়া প্রাণমুগ্ধকর অতীব সুন্দর অস্পষ্ট বাক্য-লহরী তুলিয়া ক্ষণকালের জন্য তোমায় মোহিত করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তুমি কৃত্রিমভাবে তাহার প্রতি একটু কোপ প্রকাশ কর, দু'টা রূঢ় কথা কও, দেখিবে, সেই সংসার-জ্ঞান-রহিত অবোধ শিশুও তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে,—ঠোঁট ফুলাইয়া গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া তখনই কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। যখন অপোগণ্ড শিশুতেও এই অহংভাব দেখিতে পাই, তখন মানুষ উন্নত হইয়া কেন বা না 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিবে?

"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ" ইহা কবির কল্পনা নহে—সাধকের হৃদিগত অতি সত্য কথা! কামাদি অন্যান্য রিপুগণ কালে অবস্থা-ভেদে বশীভূত হয়, কিন্তু এই দুর্দ্দমনীয় প্রবল রিপু (অহংজ্ঞান) জয় করা অতীব সুকঠিন; এমন কি, রক্তমাংসনির্ম্মিত-দেহ মানুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

"আমি কম বুঝি" বিশ্ব-সংসারে কয়জন ইহা স্বীকার করে? তুমি বড় চাপিয়া ধরিলে, না হয় মুখে স্বীকার করিল; কিন্তু অন্তরে 'আমি যে একজন মস্ত বুদ্ধিমান' এ 'অহংজ্ঞান' অবশ্যই পোষণ করিবেই করিবে। "আমার আর কোন গুণ নাই" বলিয়া সহস্র দোষ নিজমুখে অকপট ভাবে স্বীকার করিতে পারে; কিন্তু 'অহংজ্ঞান' এমনই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে যে, ইহা সরল ভাবে স্বীকার করিলেও কি জানি কেন মনের নিভৃত প্রদেশে তাহার কণাংশও অতি অস্পষ্ট ভাবে লুক্কায়িত রহিয়া যায়। "সবাই সবারে বুঝে ভুল" ইহা প্রকৃতির নিয়ম। এই 'অহংজ্ঞান' বা 'আমিত্ব ভাব' জড়জগতের পদার্থত্রয়ে (চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্) পরস্পর কি মহান শক্তি-প্রভাবে মহাসূত্রে সম্বন্ধ! কি মহামিলন! কি সুন্দর বিচিত্র ভাব! কিন্তু হায়! আমরা এ মহান্ 'আমিত্ব'-ভাবের আস্বাদন না বুঝিয়া ক্ষুদ্র 'আমিত্বের' দাস হইয়া সংসারে অহর্নিশি কি ভীষণ হলাহলই সেবন করিতেছি! এ অহংজ্ঞানে কত যোগীর যোগ ভঙ্গ হইতেছে, কত সাধকের কঠোর তপস্যা পণ্ডশ্রম হইয়া যাইতেছে, কত নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিকের ব্রাহ্মচর্য্য কর্ম্মনাশার গভীর জলে ডুবিয়া যাইতেছে! ধন, মান, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ইহা ত পার্থিব; ইহাতে ত অভিমান হইবেই। কিন্তু অপার্থিব ধন ধর্ম্মকর্ম্মেও যখন এ প্রবল শত্রুর ঈদৃশ ভীষণ প্রকোপ, এ অব্যর্থ অমোঘ প্রতাপ, তখন মানুষের আর পরিত্রাণ কোথায়?—কুল-সীমা বিবর্জ্জিত এ অসীম ভবার্ণবে অবলম্বন কি?—দাঁড়াইবে কোথা? এ মহা অন্তরায়ে মানুষের সকলি 'ভূতের ব্যাগার' হইতেছে। এই 'অহংজ্ঞানের' বশীভূত হইয়া সংসার ছারখার-প্রায়। পাপের পূর্ণ কলায় ধরয়িত্রী ব্যথিতা হইয়া যেন রসাতলে যাইতে উদ্যোগ করিতেছে। তাই এ ভীষণ দুর্দ্দিনে কবি প্রাণের কপাট খুলিয়া গভীর উচ্ছ্বাসে গাইতেছেন ঃ—

"জগৎ মজ্‌ল অহংজ্ঞানে,
আমিকে—'আমায়' কেউ না জেনে।" ✓

জগৎ-পথে।

ভিজে ভিজে ফের বেরুলুম
মুখে ল'য়ে শ্রীহরি!
এস যে যার কাজ করি।

জগৎ-পথে এগিয়ে থাক,
মেঘ দেখে ভাই পিছিও নাক,
পিছনেতেও অকূল পাথার
সাম্‌লে থাক হাল ধরি'—
মুখে ল'য়ে শ্রীহরি!

জলের পানে চেয়ে চল,
চলতে চলতে পাবে আলো,
ভাবলে ব'সে দুকূল যাবে
লও বুকে সাহস ভরি'—
মুখে বল শ্রীহরি!

হাঙর কুমীর জলের বাঁকে
হাঁ ক'রে সব ব'সে থাকে,
হেতের গুলো শাণিয়ে রাখ,
সাম্‌লে বেয়ে যাও তরি—
মুখে ল'য়ে শ্রীহরি!

একলা গেলেই চল্‌বে নাক,
আশে পাশেও তাকিয়ে দেখ,
বিপন্ন পাও দেখ্‌তে যদি
লও সাথে আপন করি—
মুখে ব'লে শ্রীহরি!

এ দুর্য্যোগেও গাঁতে গাঁতে
বম্বেটে রয় সাথে সাথে,
জোর্‌সে বেয়ে যেতে যেতে
শিখিয়ে দাও তাদের ধরি—
মুখে ল'য়ে শ্রীহরি!

শ্রীনঃ—।

সাঁওতাল পরগণা।

সাঁওতালদিগের ধর্ম্ম।

এইরূপে পরে মৎস্যোপজীবি কাওরা, বাগ্দি, জোলা প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট শঙ্কর জাতি, অনন্তর কৃষি-উপজীবি বৈশ্য ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে বঙ্গদেশে প্রবেশ করাতে, সাঁওতালেরা আস্তে আস্তে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া, চারিদিকের জঙ্গলে প্রবেশ করিতে লাগিল। পরিশেষে যখন ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালায় আইসেন (পাণ্ডবগণের বাঙ্গালায় পদার্পণ করার পরই সম্ভব হয়) তখন সাঁওতালগণের চিহ্ন বঙ্গদেশে ছিল কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডববর্জ্জিত দেশকে ঘৃণা করেন; সুতরাং অর্জ্জুন আসিয়া মণিপুর-রাজ-কন্যার পাণিগ্রহণের পর ব্রাহ্মণগণের বাঙ্গালায় বাস করা সম্ভব; তৎপূর্ব্বে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, আর্য্যগণ বসতি করিতে পারেন। বাঙ্গালায় এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিকৃষ্ট জাতি হইতে ক্রমে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জাতির উপনিবেশ স্থাপন হওয়া-সম্বন্ধে পাঠকগণকে আরও দুই একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাঠকগণ সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আসামদেশে এক জাতি লোক আছে; তাহারা 'কোল্‌টা' নামে পরিচিত। কেহ কেহ 'কুললুপ্ত' হইতে 'কোল্‌টা' শব্দ উৎপন্ন করেন। সে যাহাই হউক, কোল্‌টারা প্রকৃত কি জাতি, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে কহে যে, তাহারা ক্ষত্রিয়; এবং তাহাদের প্রথম বাসস্থান, মগধের অন্তর্গত ত্রিহুত অঞ্চলে ছিল; আসামরাজ ভগদত্তের সময়েও তাহারা আসামে বাস করিত। ঐ কোল্‌টাদিগের যজ্ঞোপবীত নাই। যদি প্রকৃত কোল্‌টারা ক্ষত্রিয় হয়, তবে যে সময় তাহারা মগধ হইতে একদল আসামের দিকে যাইয়াছিল, সেই সময় কতক ক্ষত্রিয়ের উত্তর-বাঙ্গালায় প্রবেশ করাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে। আরও প্রবাদ আছে, যখন রামচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষ রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভগদত্তের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন ঐ কোল্‌টাগণ আসাম-রাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু কথা হইতেছে, সেই সব ক্ষত্রিয়গণের পৈতা কোথায় গেল? যজ্ঞোপবীত না থাকাতেই ত, তাহাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বঙ্গদেশেও কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে

সাহসী হয়েন। ক্ষত্রিয়ের শোণিত, আসামের কোল্‌টা ও বাঙ্গালার কায়স্থগণের শরীরে থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা অমিশ্র কি না তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে।

তবে ভগদত্তের প্রাগ্‌জ্যোতিষে আসামের যে স্থলে রাজধানী ছিল, সেখানে যে ব্রাহ্মণগণ তৎকালে বাস করিতেন অর্থাৎ সেই স্থল যে পাণ্ডববর্জ্জিত ছিল না, তাহার সঙ্কেত এই পাওয়া যায় যে, যখন ভগদত্ত রঘুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন তখন তিনি আপনাকে হীনবল দেখিয়া কতকগুলি সৈন্যের গলায় পৈতা দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রভাগে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন। এবং 'ব্রাহ্মণ অবধ্য' এই ভয়ে রঘুও সমর হইতে নিরস্ত হন। ইহাতে বোধ হয় যে, যেখানে ভগদত্তের রাজধানী ছিল সেখানে ব্রাহ্মণদিগেরও গতায়াত থাকিতে পারে; ব্রাহ্মণের গতায়াত না থাকিলে যুদ্ধস্থলে ব্রাহ্মণবেশে সৈন্যগণকে দাঁড় করাইয়া কখন রণে জয়ী হইতে তিনি সাহসী হইতেন না। আর সেই অবধি আসামের অনেক শূদ্রও ব্রাহ্মণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহাতে দেখা যায় যে, রামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও ভীমার্জ্জুনের দিগ্বিজয়ের পর ব্রাহ্মণগণ বঙ্গবদ্বীপে নাই আসুন, অন্ততঃ উত্তর-বঙ্গ ও নিম্ন-আসামেও বাস করিতে আসিয়াছেন। এবং ক্ষত্রিয়েরা ও বৈশ্যেরা, ব্রাহ্মণগণের আসিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ উত্তর-বাঙ্গালায় যে আসিয়াছিলেন তাহাও কতক বিশ্বাস হয়। ক্ষত্রিয়গণ আসিয়া সাঁওতালগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন ও বৈশ্যগণ জঙ্গল কাটাইয়া চাষ আরম্ভ করিলেন। তাহার একটী যুক্তিসঙ্গত কথা এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় 'ডাকা' (আহ্বান) একটী কথা আছে, তাহা বোধ হয় সাঁওতালী 'দাকা' কথার অপভ্রংশ। দাকা অর্থে অন্ন, ভাত বুঝায়। বোধ হয়, বৈশ্যগণ বাঙ্গালায় আসিয়া অন্নের প্রলোভন দেখাইয়া, সাঁওতালগণের দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া লইতেন এবং তদবধি অন্নের প্রলোভন দেখান হইতে 'ডাকা' কথা হইয়াছে। আমি যে সময়ের কথা, কহিতেছি ইহা পাণ্ডবদিগের মণিপুর আসিবার পূর্ব্বের কথা; কিন্তু ভগীরথের গঙ্গা আবিষ্কারের পরের কথা। শিবের উত্তর-বাঙ্গালায় গতায়াত, কামাখ্যা-স্থাপন ও হিরাকোচিনীকে লইয়া কুচবিহারের অরণ্যে আমোদ-প্রমোদ, ভীমের সহিত হিড়িম্বার বিবাহ, তাহার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম এবং সেই ঘটোৎকচের বংশধর কাছাড়ী জাতি (যাহারা অদ্যাপিও গোয়ালপাড়া হইতে হিমালয়ের পূর্ব্ব-দোয়ার পর্য্যন্ত বাস করিতেছে দেখা যায় ও যাহাদের হইতে কোঁচ হইয়া থাকে), সতীর নীলাচল পর্ব্বতোপরি যোনিপীঠ সংস্থাপন ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা লোচনা করিলে, পাণ্ডবদিগের বঙ্গে আগমনের পর হইতে ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

সাঁওতালদের ধর্ম্মের কথা কহিতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার তাহাদের দেবতাগণের বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উপরিউক্ত 'চাঁদোবঙ্গা' ও 'মরাংবুরু' ভিন্ন আরও তিনটী বঙ্গা আছে; তাহাদের নাম 'জাহের অ্যাড়া', 'মরাংকুদ্রুইকো' এবং 'হর'। চাঁদোবঙ্গার পূজার সাধারণ ঘর প্রত্যেক সাঁওতালী গ্রামের মধ্যে থাকে। কিন্তু অপর কএকটী বঙ্গার স্থল গ্রামের নিকটবর্ত্তী শাল বা অন্য কোন বনে হইয়া থাকে; এবং যে বনে ঐ শেষোক্ত বঙ্গা কএকটীর পূজা হয় তাহাকে 'জাহেরথান' কহে। বঙ্গার পূজা কখনও জাহেরথানের একটী বৃক্ষমূলেও হয়, কখনও সাঁওতালদের নিজের নিজের গৃহমধ্যেও হয়, কখনও বা শিলাতলেও হইয়া থাকে। ঐ

সকল বঙ্গার নিকট কুক্কুট, মেষ, শূকর, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি বলিদান হইয়া থাকে। মেষ ও ছাগ এক চোপেই ছিন্ন করা হয়, কিন্তু শূকর ও মুরগী মুসলমানদের মত জবাই করা হইয়া থাকে। ইহা দেখিলে বোধ হয় যে, বলিকার্য্য সাঁওতালগণ হিন্দু হইতে এবং জবাইকার্য্য মুসলমান হইতে শিখিয়াছে। পূজার পদ্ধতিও আছে; আমাদের যেমন সর্ব্বাগ্রে গণেশ ও গ্রহাদির পূজা, পরে অন্যান্য দেবতার; সেইরূপ সাঁওতালদের প্রথমে চাঁদোবঙ্গার পূজা ও তাহার পর অন্যান্য বঙ্গার পূজা করিতে হয়। বঙ্গার পূজার মন্ত্র এইরূপ, যথা,—"ও অমুক বঙ্গা! আমি তোরে এই পূজা কর্‌ছি; তুই আমার ঘরে ও গ্রামে কোন পীড়াকে প্রবেশ করিতে দিবি না; আমি কিছু জানি না, ঝুঁকি তোর উপর।" এক্ষণে পাঠক দেখুন, মনুষ্যের আদিম অবস্থায় দেবতার পূজার ভাব কেমন থাকে। একেবারে ঈশ্বরে সমস্ত নির্ভর—যেন পীড়াদিও না হয়। বঙ্গার পূজা করিবার পূর্ব্বে স্থল গোময় দিয়া লেপন করিতে হয় ও পূজার সময় বঙ্গাকে তৈল সিন্দুর দিতে হয়। এখন আপনারা বলুন দেখি, এইরূপ পূজাপদ্ধতি হিন্দুগণের সঙ্গে থাকিয়া সাঁওতালগণের শিক্ষা করা সম্ভব, অথবা তাহাদিগের হইতে দূরে ও পৃথক থাকিয়া স্বভাবতঃ শিক্ষা করা সম্ভব? বঙ্গার পূজা যাহার যখন ইচ্ছা সে তখনই করিতে পারে; কিন্তু প্রায় ধান্য বপন, ধান্য ছেদন প্রভৃতি কার্য্যের সময়ই উহাদের পূজা হইয়া থাকে। বঙ্গা, সাঁওতালগণের আদি দেবতা; উহারা পৃথিবী সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আছে। পূর্ব্বে যে সকল বঙ্গার নামোল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে প্রবাদ এই যে, যখন পৃথিবীতে জল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না তখন মরাংবুরু ও মরাংদুদরুইকো দুইজনে চাঁদোবঙ্গার নিকট যাইয়া কহিল যে, হে চাঁদোবঙ্গা! আমাদের সেবা (পূজা) হইতেছে না, অতএব আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। তখন চাঁদোবঙ্গা (সূর্য্যদেব) মরাংবুরুকে কহিলেন যে, দেখ দেখি, কোন স্থানে মাটী আছে কি না? তখন মরাংবুরু সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া অল্প মাটী আনিয়া চাঁদোবঙ্গাকে দেখাইল। তখন চাঁদোবঙ্গা কহিল—"আচ্ছা, দেখ কে পৃথিবীকে সমুদ্র হইতে তুলিতে পারে।" অনন্তর সমুদ্র গর্ভে তিনটী প্রাণী দেখিতে পাইল, তন্মধ্যে একটী কাছিম ও আর একটী কেঁচো। তখন ঐ তিনটী প্রাণীর মধ্যে কাছিম ও তৃতীয়টীকে পৃথিবীকে উত্তোলন করিতে বলায় তাহারা চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইল। পরিশেষে কেঁচোকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—"আমি তুলিতে পারি; কিন্তু একটা স্থির স্থলের প্রয়োজন করে, তাহা না হইলে মাটী দাঁড়াইবে কিসে! কারণ, হর (একটী বঙ্গার নাম) পাতালে বাস করিয়া ক্রমাগত এ-পাশ ও-পাশ করিতেছেন; অতএব হর্‌কে সর্ব্বাগ্রে স্থির করিতে হইবে। সেই হরের চারি পা, ও মুখ সর্পাকৃতি (হিন্দুদের বাসুকীর ধরণ)।" এই কথা শুনিয়া মরাংবুরু আবার চাঁদোবঙ্গার নিকট যাইয়া কেঁচোর ঐ সকল কথা বলাতে, চাঁদোবঙ্গা শিকল দিয়া হরের চারি পা এমন করিয়া বাঁধিলেন যে, আর সে কোন দিকে না টলিতে পারে। এইরূপ করাতে কেঁচো, তখন সমুদ্রের তল হইতে মাটী খাইয়া খাইয়া সেই হরের পৃষ্ঠোপরি পুরীষ ত্যাগ করিতে লাগিল এবং সেই পুরীষ পর্ব্বতাকার হইয়া সমুদ্রের তল হইতে উঠিল। পরে মরাংবুরু তাহার উপর তৃণাদি রোপণ করিয়া সেই মৃত্তিকাকে সমুদ্রের প্রবল বেগ হইতে রক্ষা করিলেন। এইরূপে সাঁওতালদের ধর্ম্মে পৃথিবীর সৃষ্টি প্রকরণ কথিত আছে। ইহা তাহাদের কোন গ্রন্থে নাই; পুরুষানুক্রমে

প্রবাদে চলিয়া আসিতেছে। কোন সাঁওতালকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার নিকট হইতে বঙ্গার বৃত্তান্ত বাহির করিতে পারিবেন না; 'জানি না' বলিয়া উড়াইয়া দিবে। কিন্তু সাঁও-তালদের সঙ্গে সাঁওতাল হউন, তাহাদের সঙ্গে সরল ব্যবহার, আমোদ আহ্লাদ করুন, তাহাদের আপন ভায়ের মত দেখুন, তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া তাহাদের বাটীতে যাউন, বসুন, গল্প করুন, এইরূপে তাহাদের মনে আপনার উপর প্রীতি জন্মাইলে তখন তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা আধটা কথা বলিবে। নচেৎ আপনাকে "দিকো" বলিয়া ঘৃণা করিয়া তাহাদের কোন কথাই আপনাদের কাছে ব্যক্ত করিবে না। (ক্রমশঃ)

বৈদিক মন্ত্র।

বহুদিবসাবধি আমাদের দেশে বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহার কারণ চিত্তশুদ্ধি নাই, দ্রব্যশুদ্ধি নাই, মন্ত্রশুদ্ধি নাই। যদ্যপি কেহ চিত্তশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মন্ত্রশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই বিফল হইয়া যায়। আমাদের দেশে যে সকল বৈদিকমন্ত্র প্রচলিত আছে, সেই সকল মন্ত্র কেবল কর্ম্মকাণ্ডের পদ্ধতিতে দেখা যায়। তাহাতে টীকা নাই এবং সেই সকল মন্ত্রের অর্থ জানিবার জন্য কেহ চেষ্টাও করেন না। অর্থ না জানিলে সুতরাং এক দিকের বর্ণ আর এক দিকে লইয়া পড়িতে হয়। যেমন 'ঘটকচূড়ামণি' এই কথাটি যদ্যপি কোন ব্যক্তিকে পড়িতে দেওয়া হয় ও তিনি যদি অর্থ না জানেন, তাহাহইলে তিনি 'ঘট-কচু-ডামণি' এইরূপ করিয়া পড়িয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদের দেশে প্রচলিত বেদমন্ত্রও এইরূপ হইয়াছে; সুতরাং মন্ত্রসকল যে নিমিত্তে উচ্চারণ করা হয়, তাহা সিদ্ধ হয় না।

এই কারণে বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত ও সায়ণাচার্য্যকৃত টীকাসমেত প্রচলিত মন্ত্রসকল, সকলের গোচরার্থে বাঙ্গালা অক্ষরে পত্রিকায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদ্যপি লোকের সুবিধা বোধ করি, তাহা হইলে পরে বেদের অন্যান্য বিষয়ও জানাইতে বাসনা রহিল।

অথ প্রথমা, ১ম মন্ত্র।*

হরিঃ ওঁ। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাত্।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥

সর্ব্বপ্রাণিসমষ্টিরূপো ব্রহ্মাণ্ডদেহো বিরাড়াখ্যো যঃ পুরুষঃ সোহয়ং সহস্রশীর্ষা। সহস্রশব্দস্য উপলক্ষণত্বা-দনন্তৈঃ শিরোভির্যুক্ত ইত্যর্থঃ। যানি সর্ব্বপ্রাণিনাং শিরাংসি তানি সর্ব্বাণি তদ্দেহান্তঃপাতিত্বাৎতদীয়ান্যে-বেতি সহস্রশীর্ষত্বম্। এবং সহস্রাক্ষত্বং, সহস্রপাদত্বঞ্চ। স পুরুষো ভূমিং ব্রহ্মাণ্ড গোলকরূপাং বিশ্বতঃ সর্ব্বতো বৃত্বা পরিবেষ্ট্য দশাঙ্গুলপরিমিতং দেশমত্যতিষ্ঠ দতি-ক্রম্য ব্যবস্থিতং দশাঙ্গুলমেত্যুপলক্ষণম্। ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরপি সর্ব্বতো ব্যাপ্যাবস্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ সায়ং

যিনি সর্ব্বজীব-সমষ্টিস্বরূপ, যাঁহার শরীর ব্রহ্মাণ্ড, যিনি বিরাট্ নামধারী মহাপুরুষ, যাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-শরীরে জীবরাশি বিরাজিত হই-তেছে, যাঁহার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য চরণ, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড-গোলক পরিবেষ্টন করিয়া গোলকের অভ্যন্তরে ও বাহে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১ ॥ বাং

অথ দ্বিতীয়া, ২য় মন্ত্র।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

যদিদং বর্ত্তমানং জগৎসর্ব্বং তৎপুরুষএব। যচ্চ ভূত-মতীতং জগৎ, যচ্চ ভব্যং ভবিষ্যজ্জগত্তদপি পুরুষএব। যথাস্মিন কল্পে বর্ত্তমানাঃ প্রাণিদেহাঃ সর্ব্বেহপি বিরাট-পুরুষস্যাবয়বাঃ তথৈবাতীতাগামিনোরপি কল্পয়োর্দ্রষ্টব্য-মিত্যভিপ্রায়ঃ। উত অপিচ অমৃতত্বস্য দেবত্বস্যায়মীশানঃ স্বামী। যদ্ যস্মাৎ কারণাৎ অন্নেন প্রাণিনামন্নেন ভোগ্যেন নিমিত্তেনাতিরোহতি স্বকীয়াং কারণাবস্থামতিক্রম্য পরিদৃশ্যমানাং জগদবস্থাং প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ প্রাণিনাং কর্ম্মফলভোগায় জগদাবস্থাস্বীকারান্নেদং তস্য বস্তুত্ব-মিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ সায়ং

---

* এই প্রথম ১৬টী মন্ত্রের নাম, পুরুষসূক্ত। পুরুষ, দেবতা; ঋষি, নারায়ণ; ছন্দ, ১ম হইতে ১৫শ পর্য্যন্ত অনুষ্টুপ্ ও ১৬শটী ত্রিষ্টুপ্।

যাহা অতীত হইয়াছে, যাহা হইবে এবং যাহা বর্ত্তমানরূপে প্রতীত হইতেছে সকলই সেই পুরুষ; অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল জগৎই বিরাটরূপী মহাপুরুষের অবয়ব। তিনি মোক্ষের স্বামী, অর্থাৎ জগদাতীত। যেহেতু, তিনি স্বকীয় কারণাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া, জীবগণের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত, ভোগ্য-বস্তুরূপে জগদাবস্থা স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ এই জগদবস্থা তাঁহার বাস্তবিক স্বরূপ নহে ॥ ২ ॥ বাং

অথ তৃতীয়া, ৩য় মন্ত্র।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥৩॥

অতীতানাগতবর্ত্তমানরূপং জগৎ যাবদস্তি এতাবান সর্ব্বোঽপি অস্য পুরুষস্য মহিমা স্বকীয় সামর্থ্য বিশেষঃ নতুতস্য বাস্তবং স্বরূপং, বাস্তবস্তু পুরুষঃ অতোমহিম্নোঽপি জ্যায়ানতিশয়েনাধিকঃ। এতচ্চোভয়ং স্পষ্টীক্রিয়তে। অস্য পুরুষস্য বিশ্বা সর্ব্বাণি ভূতানি কালত্রয়বর্ত্তীনি প্রাণি জাতানি পাদশ্চতুর্থাংশঃ, অস্য পুরুষস্যাবশিষ্টং ত্রিপাৎস্বরূপ মমৃতং বিনাশরহিতং সৎ দিবি দোতনাত্মকে স্বপ্রকাশ স্বরূপেব্যবতিষ্ঠত ইতি-শেষঃ। যদ্যপি "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাম্নাতস্য পর ব্রহ্মণ ইয়ত্তারা অভাবাৎ পাদচতুষ্টয়ং নিরূপয়িতুমশক্যং তথাপি জগদিদং ব্রহ্ম-স্বরূপা পেক্ষয়াল্পমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ পাদত্বোপন্যাসঃ॥ ৩॥ সায়ং

যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়বর্ত্তী জগৎ, সকলই মহাপুরুষের মহিমা, অর্থাৎ জগতের ত্রৈকালিক অবস্থা দর্শন করিলে মহাপুরুষের ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই অনুভব হয় না; এই জগৎ তাঁহার বাস্তবিক স্বরূপ নহে। সুতরাং সেই মহাপুরুষ তাঁহার মহিমা হইতেও অতিরিক্ত। যদ্যপিও "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, পরব্রহ্ম পরমাত্মার ইয়ত্তা করা যাইতে পারে না, তথাপি কালত্রয়বর্ত্তী জগৎ ব্রহ্মস্বরূপাপেক্ষায় যে ন্যূন, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি ব্রহ্মাপেক্ষায় জগৎ ন্যূন হইল, তাহা হইলে কত ন্যূন হইবে?—এই আশঙ্কা করিয়া বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার অংশ কল্পনা করা হইয়াছে। কালত্রয়বর্ত্তী জীব জাত, তাঁহার চতুর্থাংশমাত্র; আর মহাপুরুষের নিত্য, অবিনাশী অবশিষ্ট স্বরূপ-অংশত্রয়, স্ব-প্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ॥ ৩ ॥ বাং

রাজপুত সতী।

সুপ্রসিদ্ধ আকবর সাহেব জীবনী পাঠ করিলে সকলেরই মনে ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। সদয়-ব্যবহারে তিনি রাজপুতগণের উপর যেরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রবল প্রতাপশালী উত্তরাধিকারীগণ বাহুবলেও সেরূপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায়-বিচারে কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে, সেহেন সর্ব্ব-সম্মানিত নৃপতিকেও কলঙ্কের কালিমায় কলুষিত হইতে হইয়াছিল। বড়ই অনুশোচনার কথা যে, যে ভারতের একছত্রী সম্রাট অসংখ্য নৃপতিগণকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন, তিনি স্বীয় রিপুগণকেও আয়ত্বাধীন করিতে পারেন নাই। আর, সেই জন্যই এত শৌর্য্য বীর্য্য সত্বেও তিনি রাহুস্পর্শী চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্কিত!

'খুস্‌রোজ' উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরই রাজ-ভবনে এক বৃহৎ প্রদর্শনী হইত। এই মেলায় উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত সভাসদ্‌দিগের মহিলাগণ একত্রিত হইতেন। সম্রাটের আদেশে সে স্থানে কোন পুরুষ প্রবেশ করিতে পারিত না। বণিক-পত্নীগণ নানা দেশজাত দ্রব্যাদি তথায় বিক্রয় করিত; রমণীগণই তাহা ক্রয় করিতেন। কিন্তু সকলের অলক্ষিতে এক দিন সেই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণের সহিত একটি

পুরুষ স্ত্রীবেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। সেখানে পুরুষের সমাগম অসম্ভব এরূপ বিশ্বাসে রমণীগণ অকুণ্ঠিত ভাবে দ্রব্যাদি দেখিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে এক সুন্দরীর রূপ ছদ্মবেশীর চিত্ত আকর্ষণ করিল। পাঠক! শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, এই রমণী পবিত্র বিকানিয়ারের রাজবধূ; রাজকুমার পৃথ্বীরাজের পত্নী। যাইহোক, সেই রমণীকে কৌশল দ্বারা স্বীয় ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত করাইবার অভিপ্রায়ে পরে ছদ্মবেশী তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমে মেলা শেষ হইল; বণিকপত্নীগণ বিক্রয়াবশিষ্ট আপন-আপন দ্রব্যাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। রাজপুত-মহিলাগণও একে একে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছদ্মবেশীর চিত্ত যাঁহার লাবণ্যে উন্মত্ত হইয়াছিল তিনি যখন রাজভবনের প্রাঙ্গন অতিক্রম করিবেন, তখন সহসা দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি পথের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার গতিরোধের অভিপ্রায়ে দাঁড়াইয়া আছেন। যাইহোক, রাজপুত রমণী নির্ভয় চিত্তে দ্বারমুক্ত করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু ছদ্মবেশী মধুর বচনে উত্তর করিলেন— "হে সুন্দরী! দিল্লীশ্বরের কোষাগারসহ মহামূল্য রত্ন কি তোমার আদরণীয় নহে!"

এই কথা শুনিয়া রমণীর চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল; তাঁহার ক্ষীণ তনুতে যেন সিংহের বল সঞ্চার হইল। তিনি আরক্তিম লোচনে জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,— "পাপমতি, এখনও শুভ কামনা করিস্ তো দুয়ার হইতে সরিয়া যা'।" উচিত উত্তর পাইয়া অতঃপর ছদ্মবেশী বাহুবল-প্রয়োগের অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারিত করিলেন। কিন্তু ঊর্দ্ধফণী বিষধর সর্প যেমন অস্ত্রবলে মস্তক অবনত করে সেইরূপ তাঁহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইতে হইল। রমণী কটিদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার্থ-নিভৃতে-আনীত তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া কহিলেন,—"রে দুরাচার! তুই এইরূপে অনেক রাজপুত-কুল-লক্ষ্মীর সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়াছিস্; আয়, আজ তোকে তার সমুচিত প্রতিফল দিই।"

এই বলিয়া রমণী তাঁহার বক্ষে ছুরিকা প্রয়োগ করিবার উদ্যোগ করায় ছদ্মবেশী কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলশায়ী হইলেন; পদানত হইয়া কাতরস্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন; বলিলেন,— "যে পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আপনি আমার জননী; আজ দয়া করিয়া আমায় প্রাণদান করুন। আমি আর কখনও এরূপ দুষ্ক্রিয়া মনেও স্থান দিব না।" সাধ্বী রাজপুত-মহিলা অবশেষে দয়া করিয়া অভাগাকে আর কিছু বলিলেন না; "যা' পাপিষ্ঠ! এবারও তোকে মাপ করিলাম" এই —বলিয়া তিনি অতঃপর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এখন, পাঠক, ভাবুন দেখি, এ ছদ্মবেশী পাপাশয় কে? কাহার এমন সাধ্য যে, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হিন্দু-ললনার পবিত্র ধর্ম্ম এইরূপে নষ্ট করিতে সাহসী হয়? কিন্তু নাম করিতেও লেখনী কম্পিত হয় যে, এ ছদ্মবেশী স্বয়ং সম্রাট আকবর সাহা। কি কলঙ্কের কথা!— স্বয়ং 'দ্বীল্লিশ্বরে বা জগদ্বীশ্বরো' বলিয়া যাঁহার গৌরব, তাঁহার এই কাজ!*

---

* মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, দ্রব্যাদির যথার্থ মূল্য-নিরূপণ ও রাজ-কর্ম্মচারীদিগের বিষয়ে রমণীগণ কিরূপ মতামত প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার জন্য সম্রাট ছদ্মবেশে প্রদর্শনী স্থলে বিচরণ করিতেন। কিন্তু বিকানিয়ারের রাজকুমার সুকবি পৃথ্বিরাজ বলেন যে, খুস্‌রোজ উৎসবের মেলায় অনেক রাজপুত রমণীকে সতীত্ব বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে।

কাচের মোহর প্রস্তুত-প্রণালী।

কিছু দিবস পূর্ব্বে সকলেই পিত্তলের মোহর ব্যবহার করিতেন। এখন, কি গবর্ণমেণ্টের আফিসে, কি বড় বড় হৌসে, কি জমিদারি সেরেস্তায় সকল স্থানেই রবারের মোহর ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় অনেকে রবারের মোহর প্রস্তুতের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জনও করিতেছেন। পিতল অপেক্ষা রবারের মোহর ব্যবহার করিতে সুবিধা আছে, এবং ইহাতে দাগ পরিষ্কার উঠে। এজন্য পিত্তলের মোহর অপেক্ষা রবারের মোহর সাধারণে যে অধিক পছন্দ করিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। রবারের মোহর উত্তম হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটী প্রধান অসুবিধা আছে। এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক কাল এ মোহরগুলি ভাল থাকে না। সম্প্রতি আমেরিকায় রবার, পিতল বা লোহার মোহরের পরিবর্ত্তে নূতন প্রণালীতে কাচের মোহর প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ভারতবর্ষে কাচের মোহর প্রস্তুতের প্রণালী এখন পর্য্যন্তও চলে নাই; কিন্তু সম্ভবতঃ শীঘ্রই আমেরিকা বা বিলাত হইতে কোন সাহেব ইহার একটী কল আনাইয়া এই নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দিন কতক বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইবেন। কিন্তু ইহার প্রস্তুত প্রণালী যেমন সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য, তাহাতে কোন বিলাতি কলের সাহায্য না লইয়াও যে কেহ অনায়াসে বাড়ীতে বসিয়া কাচের মোহর প্রস্তুত করিতে পারেন। কি প্রণালীতে কাচের মোহর প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহার সঙ্কেত এস্থলে আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমতঃ পিত্তলের তামার বা লোহার নক্সা বা প্রয়োজনীয় অক্ষরগুলি ইচ্ছামত সাজাইয়া লইতে হইবে। পরে চারি দিকে বেষ্টন দিয়া উত্তমরূপে শক্ত সূতা দিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর প্লাষ্টার অব্ পারিস দিয়া ছাঁচ তুলিয়া লইতে হইবে। প্লাষ্টার অব্ পারিস, সিমেণ্টের মত এক প্রকার মাটী; ইহা কলিকাতার চিনা বাজারে অতি অল্প মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়; ছাঁচ উঠিলে উহার উপরিভাগে একটু তেল মাখাইয়া একটু গরম করিয়া ছাঁচটি এক দিকে রাখিয়া দিয়া, একটি উনানে এক খণ্ড পাতলা কাচ লোহার চিমঠা দিয়া ধরিয়া গরম করিয়া লইতে হইবে। কাচ গরম হইয়া যখন লাল হইবে, তখন নামাইয়া আনিয়া ধীরে ধীরে ছাঁচের উপর রাখিয়া উপরে কোন ভারি বস্তুর চাপ দিতে হইবে। চাপ দেওয়ার জন্য একটী স্ক্রুপ্রেশ ব্যবহার করিতে পারিলেই ভাল হয়; আর, এই চাপ দেওয়ার জন্যই যা' কলের প্রয়োজন। তবে প্রেশ না পাইলেও ক্ষতি নাই; অন্য কোন বস্তুর চাপ দিলেও নরম কাচ প্লাষ্টার অব্ পারিসের ছাঁচের দাগে দাগে বসিয়া যাইবে। এই ভাবে কিছুক্ষণ রাখিলে যখন কাচ শীতল হইয়া আসিবে, তখন তুলিয়া জল দিয়া ধুইয়া লইলেই মোহর হইল। মোহরের চারি কিনারা এবং অক্ষরের উপরিভাগটী বালী দিয়া পাথরের উপর কিছুক্ষণ ঘসিয়া লইলে কালি লাগার পক্ষে সুবিধা হয়। এই মোহর দেখিতেও যেমন সুন্দর ছাপিতেও তেমনি সুবিধা, এবং ইহা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এইরূপ কাচের মোহর পরিস্কার করাও অতি সহজ; গরম জলের মধ্যে ফোটাকতক সালফিউরিক এ্যাসিড দিয়া তাহার মধ্যে মোহরটী একবার ডুবাইয়া ধুইয়া লইলেই নূতনের মত হইবে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বিশ্বাসজীর মুখে অবিশ্বাসের কথা।

আজকাল সঞ্জীবনী প্রভৃতি পত্রিকায় কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঠিকানা হইতে 'পাগলিনী' নামক এক উপন্যাস-সম্বলিত সচিত্র মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। সে বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে.—"বঙ্কিম বাবু *** প্রভৃতি ইহার লেখক। উপ-মাশুল (!) সমেত মোট ১৸০ সাত সিকা জমা দিলে ৩৵০ মূল্যের *** পুস্তক উপহার পাইবেন।" ফলতঃ বিজ্ঞাপনটীতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি ঐ পত্রিকার লেখক। কিন্তু আমরা বিজ্ঞাপনদাতাকে জিজ্ঞাসা করি, এরূপ করিয়া পাঠককে প্রতারিত করা কি ভদ্রলোকের কাজ! বলি বঙ্কিম বাবুকে কি তাঁহার কাগজ লিখাইবার কথা স্বীকার করান হইয়াছিল? না, আসমান হইতে ঐরূপে নামটী বসাইয়া বিজ্ঞাপনের চটক বাড়ান হইয়াছে? যাইহোক পাঠক এখন হইতে অগত্যা স্মরণ রাখুন যে, বিজ্ঞাপনদাতার নাম, লালমোহন বিশ্বাস, ঠিকানা কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

নবযুগের জুয়াচুরী।

গত কএক মাস পূর্ব্ব হইতে পটলডাঙ্গা চিন্তামনি দাসের লেন ঠিকানা হইতে বাবু বিপিনবিহারী মিত্র কার্য্যধ্যক্ষ এই নাম দিয়া নবযুগ নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের বড়ই জাঁকাল জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হইতে থাকে। বিজ্ঞাপনে লিখিত পত্রিকার লেখকগণের নামের তালিকার চটকে ও আড়ম্বরময় বাগ্জালে অনেককেই মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু সে ঘনঘটাপূর্ণ বিজ্ঞাপনের ফল এই ফলিয়াছে যে, দুই এক সংখ্যা মাত্র ক্ষুদ্র এক খণ্ড পত্র বাহির করিয়াই প্রকাশক ও সম্পাদক একেবারে ডুব দিয়াছেন। বাবু বিধুভূষণ মিত্র নামক যিনি ঐ নবযুগের সম্পাদক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তিনি কএক বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গ দর্শনের দেখা দেখি 'হিন্দুদর্শন' নামে এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারও তিনি শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। সে সম্বন্ধেও সমিতিতে মধ্যে মধ্যে দুই এক অভিযোগ পত্র আসে। এখন আবার তাঁহাদের আর এক নূতন কীর্ত্তি জাহির হইতে চলিল। তবে গ্রাহকগণ এখন আমাদিগের নিকট অভিযোগ না করিয়া, ঐ পত্রিকার জন্য টাকা পাঠাইবার পূর্ব্বে যদি সমিতিতে ঐ বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন তাহা হইলে আর এরূপ পরিতপ্ত হইতে হইত না। যাইহোক, সম্পাদক বা প্রকাশক এখনও এসকল কলঙ্কের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার চেষ্টা পান, এই বাসনা।

জুয়াচুরীর পরিচয়।

ইতিপূর্ব্বে একজন জুয়াচোর পুস্তকাদির নানারূপ লোভপূর্ণ বিজ্ঞাপন দ্বারা লোক ঠকাইতে থাকে ও ক্রমে সমিতির সন্ধানে তাহার গুপ্ত কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন, সে সমিতির নিকট তাহার জুয়াচুরীর যেরূপ পরিচয় দেয়, তাহা সকলের জানিয়া রাখা অনাবশ্যকীয় নহে। সে বলে,—আমি যখন অপরের যে পুস্তক খানির কাট্তি দেখিয়াছি, তখনই সেই নামের একটু-আদটু এদিক-ওদিক করিয়া এক পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিয়াছি। বিজ্ঞাপনটীও আমাকে লিখিবার জন্য কষ্ট পাইতে হয় নাই; পরের বিজ্ঞাপনই একটু-আদটু বাদসাদ দিয়াই ছাপাইতে দিয়াছি। তার পর, পুস্তক প্রকাশের সময়ে পুরাতন পঞ্জিকার রচনাদি এবং ঐরূপ যা' তা' দিয়া এক ক্ষুদ্র বই ছাপাইয়া লোককে দিয়াছি। মফঃস্বলের লোকে ভ্যালুতে ঢাকা পুস্তক দেখিয়া ঠিক

ঠিক পুস্তক পাঠাইতেছি ভাবিয়া তাহা গ্রহণ করিত ও শেষে প্রতারিত হইত। আরও, ভ্যালুতে পুস্তক পাঠাইবার সময় প্যাকেট বড় দেখাইবার জন্য প্রেরিত পুস্তকের সহিত বাজে কাগজ বা পুরাতন পঞ্জিকা প্রভৃতি নানা অদরকারী দ্রব্যাদিও দিয়া প্যাকেট বড় করিয়া দিতাম। এবং তাহাতে প্রকাণ্ড পুস্তক ভাবিয়া গ্রাহকগণও টাকা দিয়া প্যাকেট লইত।" এইরূপ আরও নানা কথা সে ঐরূপে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছে। সুতরাং পাঠক দেখুন দেখি, প্রতারণার কি ফন্দি!

আমের চারা বিক্রয়ে জুয়াচুরী!

কলিকাতার পোস্তায় যেখানে আম্র বিক্রয় হইয়া থাকে সেখানে কতকগুলি দোকানদার আম্রের চারা বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ চারাগুলিতে টিকিট দেওয়া থাকে,—'ফজিলি', 'ভাদুরে', 'ন্যাংড়া', 'পশ্চিম মুজপ্পের হইতে চালান' 'মালদহ হইতে চালান' ইত্যাদি। কিন্তু উহার অধিকাংশই মিথ্যা। যে সে আমের চারায় জুয়াচোরেরা ঐরূপ টিকিট মারিয়া অধিক দরে বিক্রয় করিতেছে ও তাহাতে নিয়তই লোকে প্রতারিত হইতেছেন*। সুতরাং সাধারণে এখন হইতে বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া ঐরূপ সকল চারা ক্রয় করেন, এই বাসনা।

সংবাদ। ✓

—সাপের প্রতিহিংসা বৃত্তি বড়ই ভয়ানক! সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক সাহেব তিনটী সাপের প্রতি বড়ই আঘাত করেন। তন্মধ্যে দুইটী সাপ একেবারে মরিয়া যায় এবং একটী অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোনরূপে পলায়ন করে। কিন্তু তার পর দুই প্রহরের সময় সাহেব যেমন আপিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় তাঁহাকে কাপড়ের মধ্য হইতে অলক্ষ্যে কিসে যেন কমড়াইল। তিনি কাপড় ঝাড়িয়া দেখেন, প্রাতঃকালের সেই অর্দ্ধমৃত সাপ! বলা বাহুল্য, কিরূপে সাপ কাপড়ে ঢুকিল এবং কিরূপেই সে পুনরায় চিনিয়া আসিল, এই ভাবিতে ভাবিতেই সাহেব ক্রমে অবসন্ন হইলেন।

—স্ত্রী মদের পয়সা দেয় না, বেশ্যালয়ে যাইলে খিট্ খিট্ করে, এই অপরাধে হাবড়া জেলার এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে হত্য করিয়া স্বাধীন হইতে চায়। কিন্ত কি দুর্ভাগ্য, এখন পুলিষের হাতে পড়িয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধীন হইতে হইয়াছে।

—শিখাইলে কুকুরেও বিদ্যা শিখিতে পারে স্যার জন লিউবেক নামক এক মহাত্মা সম্প্রতি এই এক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার একটী টেরিয়ার কুকুর ছিল; সেই কুকুরটীকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য চেষ্টা পাইয়া তিনি যতদূর কৃতকার্য্য হন, তাহা এইরূপ:— 'খাদ্য', 'জল', 'চা', 'মাংস' এইরূপ এক এক দ্রব্যের নাম লেখা এক এক খানি তাস তিনি প্রথমতঃ প্রস্তুত করিয়া লন। পরে ঐ তাস ঐ সকল দ্রব্যের উপর রাখিয়া দিয়া ক্রমশঃ তিনি সেই দিকে কুকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করান; কুকুরও ঐরূপে দুই দশ দিন দেখিতে দেখিতে তাসগুলি ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতঃ চিনিয়া লয় অর্থাৎ জিনিস ই তাহার উপকার তাস বেশ বুঝিতে পারে. এমন কি, পরে আপনিই জিনিসের উপর তাস রাখিয়া আসিতে বা তাস দেখাইলে জিনিস আনিতে সক্ষম হয়। সভ্যজগতে বোবা ও বধিরদিগকেও এইরূপে বিদ্যা শিখান হয়। বলা বাহুল্য, সেই দৃষ্টান্তেই ডাক্তার সাহেব কুকুরের জন্য এইরূপ চেষ্টা পান। এখন যাই হোক, কুকুরে বিদ্যা শিখিয়া কি শুধু বসিয়া থাকিবে, না চাকুরীরও চেষ্টা পাইবে! তা হইলেই তো চাকুরে বাবুদের বড়ই বিপদ দেখিতেছি!

—ইতিমধ্যে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের একটী প্রদর্শনী হইয়াছিল। অর্থাৎ যত লোকের যত সুন্দরী স্ত্রী ছিল, সকলেই সারি সারি বসিয়া আসর জমকাইয়া ছিলেন; আর, পুরুষেরা তাহা দেখিয়া কে অধিক সুন্দরী স্থির করিয়াছিলেন।

---

*এইরূপ কলমের চারার এক জুয়াচুরীর বিষয়ও প্রথম বর্ষের অনুসন্ধানের ৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আছে।

কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, সকল সংবাদপত্রেই একবাক্যে প্রশংসিত।

দ্বাদশ নারী।

বারটী হিন্দু-নারীর জীবন-চরিত ও কয়েকটীর প্রতিমূর্ত্তিসম্বলিত প্রায় ১৪০ পৃষ্ঠার উৎকৃষ্ট স্ত্রী-পাঠ্যপুস্তক। মূল্য, স্বর্ণাক্ষর-খোদিত সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই ৸৹ বার আনা; কাগজের মলাট ।৵৹ দশ আনা। ডাঃ মাঃ ⁄১০।

"The author of the present biographical treatise deserves our warmest thanks for having rendered into Bengali the eventful characters of some of the exemplary females of Inda. We request the Educational authorities to introduce this entertaining, as well as instructive biographical reader as atext book for the girls of this province."—The News of the day, 29th Augnst, 1885.

"The treatise is written with care and good taste can be confidently recommended to Hindu ladies."—The Indian Nation, 1st June, 1885.

"A work of the nature is a real necessity of the day, the author deserves praise for all that he has done."—The Indian Mirsor, 6th June, 1885.

নির্ব্বাণ-জীবন।

কবি গ্রে-রচিত এলিজির বাঙ্গালা-কবিতা। মূল্য ৵৹ আনা। ডাঃ মাঃ ১০ আনা।

"আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি; গ্রন্থকার গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি গ্রে-রচিত "Elegy written in a Country Church-yard" নামক মনোহর কবিতাটীকে ভাষান্তরিত করিয়া তাহার মৌলিক ভাব ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।" —সঞ্জীবনী।

ভারতে দুর্গোৎসব।

"ভগবতীর আগমনে লোকের মনোভাব ও কার্য্যভাব কিরূপ হয়, তাঁহার ভাবশুদ্ধ, সুশ্রাব্য, অথচ স্বভাবসঙ্গত কাব্য।"—সময়। মূল্য ⁄৹ এক আনা, ডাঃ মাঃ ১০।

শ্রীগুরুদাসচট্টোপাধ্যায়।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আদর্শচরিত

বা

স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী।

"মহতের জীবনচরিত পাঠে যে কত উপকার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। জীবন-চরিত যেমন মনুষ্যের চারিত্রগঠনের পক্ষে সহায়তা করে এমন আর কিছুতেই নহে। বিশেষ কৃষ্ণমোহন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, যেরূপে সুপরিচিত হন, তাহা বালক যুবকবৃদ্ধ সকলেরই জানিবার জিনিস।"

এই পুস্তকের মূল্যও অতি অল্প
৹ চারি আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ⁄৹ এক আনা।
আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরভি ও পতাকা।

রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ পূর্ণ উচ্চ অঙ্গের সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে।

অধিকাংশ সুলেখকগণই এই পত্রিকার লেখক। ইহার বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রেই ৪৲ চারি টাক; যাণ্মাষিক ২৲ টাকা।

জি সি বসু এণ্ড কোং।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৩নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

OPINIONS OF THE PRESS &c.

"The *Surabhi* is conducted on a new plan. It is an acquisition to the native Press."—*The Indian Mirror.*

"সুরভিতে নানা বিষয় থাকে; রাজনীতি, সমাজনীতি, উপন্যাস, চুটকি গল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে সুরভি পরিপূর্ণ। ভাষা সরল। সুরভিপাঠে অনেক শেখা যায়।"—বঙ্গবাসী।

কলিকাতা

হোমিওপ্যাথিক স্কুল।

১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।

কলিকাতার মধ্যে একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যালয়। ১৫ই জুন স্কুল খুলিয়াছে। স্কুলের নূতন অনেক সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। জুলাই মাস পর্য্যন্ত ছাত্র ভর্ত্তি করা যাইবে। রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাদি শিক্ষা দিবার জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইতেছে।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে স্কুলের নিয়মাবলীর পুস্তক প্রাপ্তব্য। ডাক্তার শ্রীজগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী,

১০১ নং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

১০১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী কৃত পুস্তকাবলী।

১। জ্বর-চিকিৎসা—জ্বর-চিকিৎসা বিষয়ক অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক; ইহাতে ১২ খানি চিত্র আছে। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩॥০ টাকা, ডাঃ মাঃ ।০।

২। নর-শারীর-তত্ত্ব—(ফিজিওলজি)—শতাধিক চিত্রে সুশোভিত; শ্বাসক্রিয়া, রক্ত ও রক্তসঞ্চালন, খাদ্য ও পরিপাকক্রিয়া, ইত্যাদি অতি সবিস্তারে লিখিত। মূল্য ৪৲ টাকা; ডাঃ মাঃ ।৵০।

৩। গৃহ-চিকিৎসা—প্রত্যেক গৃহস্থেরই উপযোগী, এরূপ ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পুস্তক ইহাই প্রথম। মূল্য ॥০ আনা; ডাঃ মাঃ ৵০।

৪। হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন—হোমিওপ্যাথিবিষয়ক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক চিকিৎসক, চিকিৎসাশিক্ষার্থী ও গৃহস্থেরই অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ।৵০; ডাঃ মাঃ ৴০।

অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে বাঙ্গালা ক্যাটালগ (ঔষধ ও পুস্তকাদির-মূল্য-নিরূপণ পুস্তক) প্রাপ্তব্য।

BUND & Co.,

Order-Suppliers & Commission Agents,

19 Jhamapukur Lane.

Goods of all Descriptions sent to all parts of India on receipt of Cash Remittances or by Value-Payable Parcels.

RATES.

Half-anna per Rupee

Over 100 Rupees. 2½ per cent.

„ 500 „ 2 „ „

CALCUTTA,
The 1st April 1888.

J. N. MITRA;
C. C. DUTTA,
Managers.

দি গ্রেট ইণ্ডিয়াণ

হোমিওপ্যাথিক

লেবরেটরি।

ডবলিউ, সি, পাল এণ্ড কোং

৭।১ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের

মূল্যের তালিকা।		১ড্রাম	২ ড্রাম
মাদার টিংচার	...	॥০	... ৸০
১ হইতে ৩ ডাইলিউসন ...		।৶	... ॥০
ট্রাইটুরেশন বা চূর্ণ ১ হইতে ৬ ডাইলিউসন	...	॥০	... ৸০

ওলাউঠা-চিকিৎসার উৎকৃষ্ট বাক্স। ১ ড্রাম ১৬ সিসি ঔষধ, ১ সিসি ক্যাম্ফর ও চিকিৎসোপযোগী

১খানা পুস্তকসহ মূল্য	...	... ৫৲
ঐ ২৪ সিসি	...	... ৯৲

গৃহ চিকিৎসার বাক্স। ১ ড্রাম ২৪ সিসি ঔষধ এবং চিকিৎসোপযোগী ১ খানি পুস্তকসহ মূল্য ... ৮॥০

ঐ ৩০ সিসি	...	... ১০৲
ঐ ৪৮ ঐ	...	... ১৬৲
ঐ ৬০ ঐ	...	... ২২
ঐ ৮০ ঐ	...	... ২৮৲

এক কালীন যদি কেহ পাঁচ টাকা বা ততোধিক টাকার ঔষধ লয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শতকরা ১২॥০ সাড়ে বার টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে। চিকিৎসক বা যাহারা ঔষধ বিক্রয়ার্থ আমাদিগের নিকট হইতে লইবেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে।

অনুসন্ধান

:০(০):

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩২এ শ্রাবণ, ১২৯৫ সাল। [২য় সংখ্যা

প্রেমময় নাথ!

কোথা প্রেম-ডোর, কিসে বাঁধিব তোমায়!
পাপের সংসার, পাপে ভরা মন
রোষ-হিংসা-দ্বেষে মত্ত অনুক্ষণ;
তপ, জপ, পূজাবিধি শিখিব কোথায়?

কুসুম-বর্ষণ সম শিশির সুন্দর,
চাঁদিমার হেন নিদাঘের তাপ,
প্রাণ-স্নিগ্ধকর বরিষার দাপ
ভাবিতে পারিনা; তেঁই হ'লে তুমি পর?

না—না, তা'হ'লে হ'বে না অগতির গতি!
মায়ার সাগরে মোহিনী মায়ায়
ডুবায়েছ জীবে,—মগ্ন সবে তা'য়;
আগে নাথ! দেহ তাহে উঠিতে শকতি।

মিই হাসাও, তুমিই কাঁদাও চরাচরে।
হাসাইছ তুমি হাসে তাই ফুল,
ফুটাইছ তাই ফুটে তারাকুল,
বিরহে কাঁদিছে অলি তাই গুণ-স্বরে।

কারণ না বুঝি তার, ক্ষুদ্রবুদ্ধি তেঁই;
তত্ত্বজ্ঞানী তুমি, মোরা জ্ঞানহীন,
দয়া-মায়াময়, আমরা সুদীন,
বুঝাইয়া দেও নাথ! ভাল মন্দ দুই।

তা' না হ'লে এ কেমন দয়া দয়াময়!
নিজেই ভুলা'য়ে রেখে,
পাষাণ চাপা'য়ে বুকে,
নিজেই আবার দে'ও নিরয়ে আশ্রয়?

যমালয়ের ফেরতা মানুষ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এজলাসে।

আদালতে মকর্দ্দমার বিচার হইতেছে, এমন সময় আদালতের বাহিরে একটী বৃক্ষের নীচে অতিশয় গোলযোগ উত্থিত হইল। সেই গোলযোগ দেখিবার নিমত্ত সকলে আদালত হইতে বহির্গত হইয়া সেই দিকে ছুটিল। দেখিল, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ করিয়া রোদন করিতেছে। তাহার আর্ত্তনাদে হাকিমেরও আসন টলিল। তিনি চাপরাসী পাঠাইয়া দিয়া উহাকে আপন এজলাসে ডাকাইলেন ও তাহার আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা আসামীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—"এই-ই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই-ই আমাকে পথের ভিখারী করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে জানিতে না পারিয়া ইহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম বলিয়াই আমার এই দশা ঘটিয়াছে।"

হাকিম ইহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। যে মকর্দ্দমার বিচার করিতেছিলেন, তাহা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধার কথা শুনিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, এ জগতে আমাকে আপন বলে এখন এমন কেহই নাই। যখন আমার স্বামী পরলোক গমন করেন, সেই সময় আমার নিকট সোণা, রূপা ও নগদে প্রায় দুই সহস্র টাকা রাখিয়া যান। আমার আত্মীয়-স্বজন কেহই ছিল না; কেবল আমার দশ বৎসর বয়স্ক একমাত্র বংশধর পুত্র শ্রীমান রামধনিয়ারই মুখের দিকে তাকাইয়া সকল দুঃখ ও কষ্ট নিবারণ করিয়া আসিতেছিলাম। তাহাকে স্কুলে বিদ্যা-শিক্ষার্থ দিয়াছিলাম। সে প্রত্যহই স্কুলে গমন করিত এবং নিয়মিত সময়ে ফিরিয়া আসিত। এক দিবস সে স্কুলে গেল, কিন্তু আর ফিরিল না। তাহার অনেক সন্ধান করিলাম; থানা পুলিশে সংবাদ দিলাম; কত স্থানে যে তল্লাস করিলাম তাহা আর কি বলিব? কিন্তু কোন স্থানেই আমার ধনের আর সন্ধান পাইলাম না। তখন আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া কেবল আপন ঘরে শুইয়া শুইয়া রোদন করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় বৎসর অতীত হইয়া গেল।

"একদিন অতি প্রত্যূষে আমি আমার বিছানায় শুইয়া রোদন করিতেছি, এমন সময়ে বাহির হইতে এই আমাকে 'মা! মা!' বলিয়া ডাকিতে লাগিল; বলিল,—'মা, আমি রামধনিয়া আসিয়াছি।' আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম; আসিয়াই উহাকে দেখিলাম। তখন উহার বয়স ১১ বৎসরের অধিক নহে, উহার চেহারাও কতক অংশে আমার রামধনার মতন। ও আমাকে বলিল,—'মা, আমাকে ভুলাইয়া কুলি আপিসে লইয়া গিয়া আমাকে চার-মুলুকে পাঠাইয়া দেয়। পরে সেই স্থান হইতে পলাইয়া একটী ভদ্র লোকের সাহায্যে পুনরায় আপনার চরণ দেখিতে সমর্থ হইলাম।' আমি রামধনাকে দেখিয়া ও উহার কথা শুনিয়া অধিক আর কিছু ভাবিবার সময় পাইলাম না। আনন্দে মন শিহরিয়া উঠিল; উহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলাম। আমার এত দিবসের দুঃখ ও কষ্ট দূর হইল; উহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলাম।

"এক দিবস আমাদিগের বাটীতে একটী অতিথি আসিল; সে আমাদিগের দেশস্থ লোক বলিয়া পরিচয় দিল। আমি তাহাকে যত্নের সহিত আহারাদি করাইয়া বাহিরের বারান্দায় শয়ন করিতে স্থান দিলাম। আমি ও আমার পুত্র আমাদিগের ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। কিন্তু প্রাতঃকালে যখন আমার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন দেখিলাম, ঘরে আমার পুত্র নাই; বাহিরে অতিথি নাই; দরজা ও বাক্সের চাবি খোলা। দ্রব্যাদিও কিছুই নাই; আমাকে পথের ভিখারী করিয়া উহারা চলিয়া গিয়াছে। তখন আমার মনে সন্দেহ হইল, থানায় সংবাদ দিলাম। তদারক হইল, কিন্তু কিছুই হইল না। উহাদিগকে আর পাওয়া গেল না; দ্রব্যাদিরও কোন সন্ধান হইল না। সেই অবধি আমি পাগলের মত হইয়াছি; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। কল্য শুনিলাম যে, সে ধরা পড়িয়াছে। কেবলমাত্র আমার দ্রব্যাদি চুরি করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করে নাই; আমার জাতিধর্ম্ম সকলই নষ্ট করিয়াছে; মুসলমান হইয়া হিন্দু-পরিচয়ে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ও আমার পুত্র নহে; এখন, ধর্ম্মাবতার আপনি ইহার বিচার করুন। আমার আর কেহই নাই; এখন আমার ধন, ধর্ম্ম ও পুত্র তিনই গিয়াছে। আরও এখন আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উহারাই ষড়যন্ত্র করিয়া আমার পুত্রকে কোনরূপে বিপদস্থ করিয়াছে।"

জুয়াচোরের নূতন ক্রিয়া।*

৫

চোরবাগানের একটী সঙ্কীর্ণ গলি। গলির ভিতর একটী দ্বিতল বাড়ী। এতক্ষণ বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ ছিল। এখন, মুটিয়া সহিত বাবুটী আসিয়া দুয়ারে ধাক্কা দিলেন এবং "রামচরণ, রামচরণ" বলিয়া বেহারাকে ডাকিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই দুয়ার খুলিয়া শশব্যস্তে রামচরণ বাহির হইল। অতঃপর মুটিয়ার মাথা হইতে কাপড়ের মোট লইয়া রামচরণ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল এবং "খাড়া রহ; পয়সা লেকে আতা হ্যায়" বলিয়া বাবুটীও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন।

মুটিয়া অনেকক্ষণ দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু বাবু আর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইলেন না। কাজেই তাহাকে ডাক দিতে হইল; কিন্তু তাহাতেও উত্তর নাই। তখন মুটিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল; সজোরে দুয়ারে ধাক্কা দিতে লাগিল। কিন্তু একমাত্র প্রতিধ্বনি ব্যতিত তাহারও আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। অধিকন্তু সে কোলাহলে ক্রমে পাড়ার লোক আসিয়া জমায়েৎ হইলেন এবং সকলেই 'ব্যাপার কি' শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তন্মধ্যে কেহ বলিলেন,—"সরকারদের বাড়ী তো অনেক দিন থেকেই প'ড়ে রয়েছে। কই এখানে তো লোকজন আসেই না। বিশেষ, সরকারেরা নিজে যদি কেহ কোন দিন আসেন, তা' পশ্চিমদিগের সদর দরজা দিয়েই আসেন। এদিকের পাছ দুয়ার তো কই এপর্য্যন্ত আর খুল্‌তে দেখিনি।" ঐরূপ আর এক জন বলিলেন,—"আর এক দিন এক জহুরীর দোকানের দরওয়ান এসেও এইরূপ চীৎকার আরম্ভ করে ছিল। শেষে পুলিশ-পাহারা এসেও লোকের খোঁজ পায়নি।"

৬

এইরূপে নানা লোকে নানা গোলমাল করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে দেখিতে ক্রমে পল্লীর পাহারওয়ালা বাবুও আসিয়া জুটিলেন। ব্যাপার শুনিয়া, অধিক আর কিছু না বলিয়া, কেবল "গোল ছোড়, গোল ছোড়" বলিতে বলিতে ক্রমে তিনি লোক-কোলাহল কমাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওয়ালাজীর মধুর কণ্ঠে মুটিয়া 'উল্লুক কাঁহেকা' প্রভৃতি" বিশেষণে আদৃত হইল।

যাহাহোক, মুটিয়া আর কি করিবে? অতঃপর সে ম্লানমুখে বড়বাজারের সেই কাপড়ের দোকানের দিকেই চলিল। মনে মনে স্থির করিল,—"বাবুর ছেলে তো দোকানে আছে। ছেলে আনিতে গেলেই কান ধরিয়া পয়সা আদায় করিব।"

মুটিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে হইতেই এদিকে দোকানেও গোল বাধিয়াছে। দোকানে লোকে লোকারণ্য; বালক কাঁদিতেছে। তখন সে খোলসা করিয়া বলিতেছে,—"ও-লোক আমার বাপ নহে। স্কুলে যাইবার সময় আমাকে হাবড়ার পুল ও রেলগাড়ী দেখাইবে বলিয়া ভুলাইয়া আনিয়াছে। বাপ বলিতেও রাস্তায় শিখাইয়া দিয়াছে।" এমন সময় মুটিয়া ফিরিল; মুটিয়ার কথায় বাজার শুদ্ধ সকলেই স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি।

৭

এদিকে রামহরি বাবুর বাড়ীতেও এতাধিক গোলযোগ। সকালে বালক স্কুলে গিয়াছে; কিন্তু এখন সন্ধ্যা হয় হয়!—তবু দেখা নাই। বিশেষ ছুটীর সময় স্কুলেও বাড়ীর চাকর পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু সেও দেখা পায় নাই। কাজেই বাড়ী শুদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলেই বিষম শঙ্কিত এবং তাহাকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকেই লোকজন প্রেরিত হইতেছে। পুলিশে-পুলিশে থানায়-থানায়ও খবর দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যার পর রামহরি বাবুর নিকট

* ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত অংশের পর।

সংবাদ আসিল, তাঁহার পুত্র বড়বাজারের এক কাপড়ের দোকানে। অগত্যা লোকজন সহ তিনি বাহির হইলেন এবং তথায় গিয়া সকল শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আর তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার পুত্র অমনি তাড়াতাড়ি "বাবা! বাবা!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রোড়ে উঠিল। বলা বাহুল্য, তখন তিনি কতক কতক বুঝিলেন যে, প্রাতে তাঁহার মক্কেলের সহিত যে লোক গিয়াছিল, সেই সেই ছদ্মবেশী প্রতারক।

৮

যাইহোক, অতঃপর দোকানদারেরও বিস্তর টাকা লোকসান যায় বুঝিয়া রামহরি বাবু একটু সুবিবেচনা করিলেন। দোকানদার যত টাকার মাল দিয়াছিল, তাহার অৰ্দ্ধেক টাকা তিনি তাহাকে প্রদান করিলেন "এবং অৰ্দ্ধেক টাকা দোকানীর জলে গেল। আরও, তদবধি সেই প্রতারকের সন্ধানের জন্য পুলিসও নিযুক্ত হইলেন।

অধিকন্তু যে বাড়ী দিয়া প্রতারক বাবুটী প্রবেশ করেন, তাহা অনেক দিনের পড়ো বাড়ী বলিয়াই প্রমাণিত হইল।

মানুষ কি স্বাধীন?

বিশ্বস্রষ্টা অনন্ত ভগবানের বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে মানুষ সৰ্ব্বপ্রধান। কি নৈতিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল বিষয়েই মানুষের অসাধারণ প্রভাব ও অলৌকিক কাৰ্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। ধাতার অপূৰ্ব্ব সৃষ্টি চরাচর, স্থাবর, জঙ্গম, পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূৰ্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি অনন্ত জড়জগৎ; প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর পদার্থত্রয়—চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ্—সমগ্র বস্তুতেই মানুষের অধিকার ও আধিপত্য অমোঘ প্রতাপে স্বকীয়ায়ত্তাধীন। যোগ, তপ, আরাধনা, অৰ্চ্চনা, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে মানুষ অবস্থাভেদে সময়ে ঈশ্বরেরও সমতুল্য হইতে সমর্থ হয়। এক কথায় যাহা কিছু বিস্ময়কর, অপূৰ্ব্ব-প্রতিভা-সম্পন্ন, অলৌকিক শক্তিবিশিষ্ট, অসাধারণ কাৰ্য্য-কৌশল-সমুদ্ভূত, যাহাতে জগৎ মোহিত হয়, দর্শন-তত্ত্ব পরাভব স্বীকার করে, জ্ঞানালোকে প্রফুল্ল দৃশ্যে প্রকৃতি হাসিতে থাকে, সে সমস্তই মানুষের করতলস্থ। সাধারণের কল্পনার অতীত, জ্ঞানের অতীত, বিচার-মীমাংসার অতীত ঈদৃশ অসামান্য অত্যদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া এখন জিজ্ঞাস্য,—মানুষ কি বিন্দুমাত্রও স্বাধীন?

বড়ই সমস্যা—বড়ই কঠিন প্রশ্ন! ইহার উত্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত শত শত কণ্ঠ তারস্বরে বলিবে,—"হাঁ, মানুষ স্বাধীন—সম্পূর্ণ স্বাধীন!" কিন্তু একটু স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে ধীরভাবে আলোচনা করিলে আমাদের অভিমত নিতান্ত কল্পিত ও অসারপূর্ণ না হইতেও পারে। ভাই বৈজ্ঞানিক, ভাই দার্শনিক! মনকে একটু চোখ ঠারিয়াও দেখ দেখি, আমরা কত হীন, কত ক্ষুদ্র, কত পরাধীন! এ কথায় হয়ত তুমি বলিবে,--"হলেম বা আমরা ক্ষুদ্র! দেহে কিবা আসে যায়!—আমাদের মন ত সম্পূর্ণ স্বাধীন! (Free Will)" কিন্তু এ কথার উত্তরেও আমরা বলি,—মনও আমাদের স্বাধীন নয়। আমরা কি বাহ্যেন্দ্রিয় কি মানসিক বৃত্তি, সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ পরাধীন। তাহা যদি না হইবে, তবে আমরা যাহা মনে করি, তাহা সিদ্ধ হয় না কেন? যদি বল,—"আমাদের শক্তির অভাব; সুতরাং দেশকালপাত্র-ভেদে আমরা আপনাপন ক্ষমতানুযায়ী অভিলাষ সিদ্ধ করিয়া থাকি!" ভাই তাহা হইলে এই খানেই তোমারে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। স্বাধীন শব্দের প্রকৃত অর্থ আপন অধীন—আর কাহারও নয়। কিন্তু আমরা যদি আপন ইচ্ছানুযায়ী

কাৰ্য্যের কিয়দংশ মাত্র সম্পন্ন করি, বাকিটুকু বিশেষ ইচ্ছাসত্ত্বেও না করিতে পারি, তবে আমরা পরাধীন নই কিসে? উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়, ক্ষমতা, সময় প্রভৃতি একটা না একটার অন্তরায় ঘটিবেই ত! সেই যে অন্তরায়—সেই যে অসম্পূর্ণতা, তাহাতেই আমাদের স্বাধীনত্ব লোপ পায়; সেইখানেই আমরা পরাধীন হই। আর যেটুকু স্বাধীনতা আছে, তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রকৃত স্বাধীন বাচ্য হইতেও পারে না। সকলই ভগবানের ইচ্ছা, সকলই তাঁরই হাত। মানুষ নিমিত্তমাত্র —ঈশ্বরের যন্ত্র-পুত্তল। তিনি যে দিকে ফিরান, যে পথে লইয়া যান, যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। মানুষের সাধ্য কি তাহার গতিরোধ করে— তাহার অন্যথাচরণে সমর্থ হয়! পূৰ্ব্ব জন্মে যে যেমন দিয়াছে, যে যেমন করিয়াছে, ইহজন্মে সে সেইমত পাইবে, সেইমত করিবে। তজ্জন্যই বলি, আমরা যে একটুকু স্বাধীনতার ছায়া দেখিতে পাই, তাহাও তাঁহার করুণা। সৰ্ব্বমঙ্গলময়ের সকলই শিব, অশিব কিছুই নাই। আমরা মানুষ; আমাদের 'সু-কু' জ্ঞান থাকিবেই ত! আমাদের নিকট আলোক-আঁধার—পাপপুণ্যের বিচার থাকিবেই ত! মানুষের যখন জীবত্ব নাশ হইয়া শিবত্ব লাভ হইবে, তখন তাহার প্রভেদ-জ্ঞানও লোপ পাইবে। বল দেখি, কে সে অবস্থায় জ্বলন্ত আগুণে ঝাঁপ দেয়? কে আপন অনর্থ আপনি আহ্বান করে? কাহার না ইচ্ছা, দশের মধ্যে একজন হই—সরল পথে বিচরণ করি? কিন্তু তাহা হয় না কেন? সকলই ঈশ্বরের খেলা; সকলই তাঁহারই 'লীলা—তিনি ইচ্ছাময়! এ বিচার, এ তর্কের সময় এখন নয়; কথা হইতেছে, মানুষ স্বাধীন কি না? পূৰ্ব্বে বলিয়াছি, অসম্পূর্ণ ভূমিতে আমরা দাঁড়াইয়া আছি—অসম্পূর্ণত্ব আমাদের প্রাণ। অসম্পূর্ণ হৃদয় কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। সুতরাং যে বলে—"মানুষ স্বাধীন", আমরা বলি, সে মানব-ইতিহাস কিছুই বুঝে নাই, প্রকৃতির অভিধান সে পাঠ করে নাই—আদৌ দেখে নাই। বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমা, শিক্ষা করা দূরে থাকুক, সে আপন জীবন-গ্রন্থের এক পৃষ্ঠাও আবৃত্তি করে নাই। ভাই বল দেখি, জননী-জঠোর হইতে সংসারে আসিয়া, আজ কোন্ বিষয়ে তুমি আপন ইচ্ছানুযায়ী পথে চলিতে সমর্থ হইয়াছে? কোন্ কার্য্যে তোমার স্বাধীনতা রক্ষা পাইয়াছে? যখন অপোগণ্ড শিশু ছিলে, তখন জনকজননী বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছ। যতক্ষণ তাঁহারা আহার না দিয়াছেন, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া না গিয়াছেন, ততক্ষণ তোমার অভিপ্সীত কোন কাৰ্য্যই সাধন হয় নাই। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সহিত পাঠাভ্যাস, বিহার, লোকাচার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই তোমায় অন্যের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম, আচার, ব্যবহার, কর্ত্তব্য-পালন, দাম্পত্য প্রণয়, এক কথায় এপৰ্য্যন্ত যাহা কিছু তোমার পুঁজী হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা তোমার নিজের কিছুই নয়, সমস্তই অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্য। যদি তুমি লোকালয়েই না জন্মিয়া নির্জ্জন অরণ্যে বা তদপেক্ষা অধিক কোন নিভৃত স্থানে জন্মিয়া বৰ্দ্ধিত হইয়া থাক, তাহা হইলেও যে তুমি স্বাধীন—অন্যের মুখাপেক্ষী নও—একথা বলিতে পারি না। তুমি মানুষের দ্বারা যদি সাহায্য না-ই পাইয়া থাক, তবে তোমায় একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তুমি বিশাল প্রকৃতির এক জন শিষ্য—প্রধান উপাসক। সেই জগদ্‌গুরুরই কৃপায় তুমি মানুষ হইয়াছ, তাঁরই অধীনে তুমি আপন জীবন গঠন করিয়াছ। সুতরাং তুমি স্বাধীন নও। তার্কিকের অহঙ্কার শুনিতে

চাহি না, বৈজ্ঞানিকের দন্ত-চুক্তি লইব না, পাশ্চাত্য-শিক্ষার আলোক-প্রাপ্ত সাম্যবাদীর গলাবাজীর প্রতাপেও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, মনুষ্য স্বাধীন নয়—ঘোর পরাধীন! সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভাই, বল দেখি, কে আমাদিগকে তাহার আপন রাজ্যে টানিতেছে—আপন দখলে লইয়া যাইতেছে? ভাই! বল দেখি, কে তোমার-আমার ইচ্ছাকে প্রতি লহমায় শতখণ্ডে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে? সময়ের—নশ্বর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভাই! বল দেখি, কে আমাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া সুদূরে নিক্ষেপ করিতেছে? পাই পাই—পাই না কেন? ধরি ধরি—ধরা দেয় না কেন? যাই যাই—পার মিলে না কেন? কি বিচিত্র রহস্য—কি গভীর ভাব! যদি সর্ব্বশক্তিমানের সমতুল্য শক্তি মানুষের সম্ভবপর হয়, যদি মানুষ ও ঈশ্বরে প্রভেদ না থাকে, যদি মহাপ্রাণের সহিত ক্ষুদ্র প্রাণ মিশিয়া এক হয়, তবে সেই দিন মানুষ স্বাধীন হইবে—সেই দিন স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ মানুষ বুঝিবে। নচেৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, দুর্ব্বলতর হইতে দুর্ব্বল, প্রতিপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ, চির অধীন মানুষ যদি আপনাকে স্বাধীন বলিয়া আত্মশ্লাঘা করে, তবে তাহাপেক্ষা আর বাতুলতা কি!—তাহাপেক্ষা আর হাস্যকর বিষয় কি হইতে পারে?

জননী-জঠোর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সংসারে প্রথম প্রবেশের দিনে যখন একবার অস্পষ্ট ভাষায় কাঁদিয়াছ, চিরদুর্ব্বলতার নিদর্শন দেখিয়াছ, পরাধীনতার সজীব দৃশ্য প্রকাশ করিয়াছ, তখন আর তুমি তদপেক্ষা কিছু বড় হইয়া বৃথা কেন "স্বাধীন স্বাধীন" বলিয়া চীৎকার কর? ভাই! তোমার বিক্রম ও প্রভাবের পরিচয় সেই সূতিকা-গৃহেই যথেষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে! কবি গাইয়াছেন,—"মানব-জীবন শুধু কাঁদিবার তরে!" বরং পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীগণের মধ্যে এই স্বাধীন ভাব বাহ্যাংশে কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু মানুষের সমান অধীন জীব বুঝি বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই। একটি গো-বৎস্যেই এই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। দেখ, গাভী প্রসব হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে আপনি স্তনপান করিতে পারে—দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। দুই চারি দিনের মধ্যেই সে স্বেচ্ছামত বিচরণ করে ও আপন দলে মিশিয়া যায়। মন্দ অভিপ্রায়ে তাহাকে ধরিতে চাও, সে ধরা দিবে না,—তোমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিবে। কিন্তু একটি অপোগণ্ড মানব-শিশুতে কি এত স্বল্পকাল মধ্যে এত শিক্ষা বা স্বাধীন ভাব দেখিতে পাও? কখনই নয়। তাই বলিতেছিলাম, মানুষ! তোমার আর গর্ব্ব কি? তোমার তুল্য পরাধীন আর কে আছে?

সাঁওতাল পরগণা।

সাঁওতালদিগের ধর্ম্ম।

সাঁওতালদের এরূপ বিশ্বাস যে, ঐ তিনটী বঙ্গার পূজা না করিলে শরীরে পীড়া হয়। বঙ্গা ব্যতীত আজিকালি কেহ কেহ কালীপূজাও করিয়া থাকে। সাঁওতালেরা কালীর কোন মূর্ত্তি করে না এবং যে স্থলে তাহারা কালীকাদেবীর পূজা করে, সেই স্থল গোময় লেপন করিয়া প্রথমে শুদ্ধ করিয়া লয়। কালীকার নিকট শূকর, কুক্কুট বলিদান না করিয়া উহারা মেষ, ছাগ, মহিষ বলি দিয়া থাকে। বলিদানের পশু, স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক, উভয়বিধই হইয়া থাকে। কালীপূজা ব্যতীত কেহ বা আজিকালি এক খণ্ড শীলাকে ধর্ম্মঠাকুর বলিয়া পূজা করে। এরূপ একটী ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ডুমকার নিকটে একটী সাঁওতাল প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ বসাইয়া রাখিয়াছে। বৎসরান্তে চৈত্র মাসের শেষে তাহার

পূজা হইয়া থাকে। সেই সময় সাঁওতালগণের তথায় এক মেলা হইয়া থাকে। ভবিষ্যৎকালে এই ঠাকুরের উদ্ভব সম্বন্ধে কত কথাই উঠিবে। যে সাঁওতাল ঐ ধর্ম্ম-ঠাকুর বসাইয়াছে সে প্রচার করিয়াছে যে, তাহাকে স্বপ্নাদেশ হওয়াতে সে ঐ ঠাকুর পাইয়াছে। পাঠকগণ এখন বিবেচনা করুন, সাঁওতালগণ কালীপূজা ও ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা কি হিন্দুগণের নিকট হইতে অতি অল্পকাল যাবৎ শিখিয়াছে, কি তাহারা যখন হিমালয়-প্রদেশে বাস করিত তখন হইতে শিখিয়াছে? আমার এখানে ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ কেহ সাঁওতালগণকে আর্য্যজাতি বলিয়া থাকেন ও সাঁওতালগণের ভাষায় গুটিকতক কথা সংস্কৃত কথার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া একেবারে স্থির করিয়াছেন যে, সাঁওতালগণও আর্য্যগণের সঙ্গে, কি তাহার কিছু পূর্ব্বে, হিন্দুকুশের দিক হইতে ভারতে আগমন করে। পূর্ব্বে যাহা যাহা লিখা হইল, অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে, কি তাহার আরও পূর্ব্বে, যখন বঙ্গ-বদ্বীপ কেবলমাত্র সমুদ্রের আবর্ত্ত ছিল, যখন ভগীরথ গঙ্গা আবিষ্কার করিতে আইসেন, যখন আর কোন আর্য্যবংশীয় লোকের মগধ পর্য্যন্ত আসিবারও কোন সঙ্কেত পাওয়া যায় না, তখনও যে সাঁওতালগণ অসুর নামেই হউক, কিম্বা আর্য্যগণ উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করার পর "বঙ্গাল" নামেই হউক, আর্য্যজাতির নিকট অভিহিত ছিল, তদ্বিষয়ের অনেক আলোচনা করা গিয়াছে। আর্য্যজাতির উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের বঙ্গে প্রবেশ করিবার কাল, শিবের কামাখ্যা পর্য্যন্ত পর্য্যটন, নীলাচল পর্ব্বতোপরি যোনীপীট সংস্থাপন, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুধন্বার পাণিগ্রহণ ও বভ্রুবাহনের জন্ম, হিড়িম্বার সহিত ভীমের সহগমন ও কাছাড়ী জাতির পূর্ব্বপুরুষের জন্ম; উত্তরবঙ্গে বিরাট রাজার রাজ্য-সংস্থাপন (বর্ত্তমান দিনাজপুর), যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রাগ্জ্যোতিষের কামরূপ পর্য্যন্ত গমন ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিলে স্থির হইতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক কালের পূর্ব্বে যে অন্যান্য নিকৃষ্ট আর্য্যসন্তান উত্তর বাঙ্গালা, এমন কি আসাম পর্য্যন্ত আইসে নাই, তাহা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারেন না! পৌরাণিক কালে বাঙ্গালার জঙ্গল যে সভ্য আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অনেক পরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাও বলিতে পারা যায়; এবং অরণ্য-বাস-প্রিয় সাঁওতালগণ যে তৎকালে তথা হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল, তাহাও অনুমান করা যায়।

সাঁওতালগণের পর্ব্বের মধ্যে "বাঁধনা" পর্ব্বই প্রধান। এই পর্ব্ব পৌষমাসে সম্পন্ন হয়। আমরা যেমন দুর্গোৎসবে উন্মত্ত হই, খোট্টারা যেমন হোলিতে উন্মত্ত হয়, মুসলমানগণ যেমন মহরমে উন্মত্ত হয়, সেইরূপ সাঁওতালগণও "বাঁধনা" পর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহার যে দিনে ইচ্ছা হইত সে সেই দিনে বাঁধনা পর্ব্ব করিত। কিন্তু এক্ষণে ডেপুটী কমিসনার সাহেব পরোয়ানা বাহির করিয়া পৌষমাসে একটী দিন স্থির করিয়া দিয়াছেন; সেইদিনে সকল সাঁওতাল এই পরগণায় উৎসব সমাধা করে। বাঁধনা পর্ব্বের দিন, যে পথটী সাঁওতাল-গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে সেই পথের আরম্ভে 'কুলি-মুড়ায়' (কুলি—পথ; মুড়া—আরম্ভ অথবা মূর্দ্ধা।)' গ্রামে যতগুলি গৃহস্থ থাকে সকলের বাটী হইতে পুরুষগণ এক একটী কুক্কুট ও নিজের নিজের আহারের মত চাউল সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হয়। তদনন্তর সেই গ্রামের মণ্ডল, যাহাকে "মাঝি" কহে, সেই আসিয়া প্রথমে চাঁদোবঙ্গার পূজা করে, পরে অন্যান্য বঙ্গার পূজা করিয়া ও বঙ্গার নিকট কুক্কুট জবাই করিয়া, ও বঙ্গাদিগকে 'হাড়িয়া' (পাঁচুই মদ) উৎসর্গ করিয়া

দিয়া সকলে সেইখানে অন্নপাক করতঃ মহা আমোদে মদ্যপান ও আহার করিয়া থাকে। গৃহে সাঁওতালিনীগণও মদ্যপান, নৃত্যাদি ও গীত দিবারাত্রি করিতে থাকে। বঙ্গাগণের পূজা হইলে তৃতীয় দিবসে সেই স্থলে দুইটী কুক্কুট ডিম্ব স্থাপন করিয়া, গ্রামের সকল গৃহস্থ স্ব স্ব গো ও মহিষদিগের রজ্জু মোচন করিয়া দিয়া সেই ডিম্বের উপর দিয়া তাড়াইতে থাকে। যে গরুর বা মহিষের পদাঘাতে ডিম্ব প্রথমে ভগ্ন হইবে সেই গরুটী কিম্বা মহিষকে সকলে যত্ন করিবে ও তাহার শৃঙ্গে তৈল ও সিন্দুর প্রদান করিয়া থাকে। এরূপ করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগত হইলে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া পাঁচুই মদ খাইতে আরম্ভ করে ও 'মাদল' বাজাইয়া যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে উন্মত্তভাবে অহোরাত্র নৃত্য-গীত করিতে থাকে। বাঁধনা পর্ব্বের সময় সকল সাঁওতালেরই ঘরে ঘরে পাঁচুই প্রস্তুত করিবার হুকুম আছে। সাঁওতালগণ বাঁধনা পর্ব্বে গো ও মহিষের আদর করে। বঙ্গদেশেও গবাদির গাত্রে তৈল, হরিদ্রা ও ছাপ দিয়া সম্মানিত করার প্রথাও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করুন, এই প্রথা হিন্দু হইতে সাঁওতালগণ শিক্ষা করিয়াছে, না সাঁওতালগণ হইতে হিন্দুরা শিখিয়াছেন? সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিসনর সাহেবের হুকুমমতে এখানে বাঁধনা তিন দিন মাত্র হইয়া থাকে এবং এই জেলায় সকল সাঁওতালকেই ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে 'বাঁধনা' করিতে হইবে। বোধ হয়, আবগারীর লোকসান বিবেচনায় এরূপ হুকুম জারি হইয়া থাকে; কারণ, ঐ তিন দিন সকলেই বিনা লাইসেন্সে স্ব স্ব গৃহে পাঁচুই মদ প্রস্তুত করিয়া থাকে। অধিক দিন ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন দিনে হইলে মদ চোরাই প্রস্তুত করার জন্য আবগারীর ক্ষতির সম্ভাবনা। বাঁধনার প্রথম দিবসে পূর্ব্বোক্তরূপে 'কুলি মুড়ায়' আহারাদি কার্য্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দিবসে সাঁওতালগণ গোয়াল ঘরে স্ব স্ব গরুর পূজা করে ও নিজেরা প্রথম দিবসের ন্যায় মদ্যপানে উন্মত্ত হয়। তৃতীয় দিবসে পথে ডিম্ব স্থাপন ও গবাদির বন্ধন উন্মোচন ও চালন কার্য্য হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ।

(পৌরাণিক ভারত) *

পুরাণাদি গ্রন্থে অসংখ্য নদী পর্ব্বতাদির নাম উল্লিখিত আছে। সেই সমুদায়ের অবস্থান নির্দ্দেশ এইক্ষণে এক প্রকার দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। হিমালয় প্রভৃতি কতিপয় বৃহৎ পর্ব্বত এবং সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান নদনদী অদ্যাপি প্রাচীন নামেই খ্যাত আছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন আর সকলগুলি এক প্রকার দুর্নির্ণেয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমতঃ যে গুলির অবস্থান নির্দ্দেশ সম্ভব সে গুলির অবস্থান স্থান উল্লিখিত হইতেছে; তৎপরে যে গুলির অবস্থান স্থান আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই সে গুলির নাম লিপিবদ্ধ করিব।

হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় আজিও এই নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মৈনাক—শোণ নদের একটী নাম মৈনাকপ্রভ। সুতরাং শোণ নদের উৎপত্তি স্থান মৈকাল (Maikal) পর্ব্বতই মৈনাক পর্ব্বত।—চট্টগ্রাম প্রদেশেও মৈনাক নামে এক পর্ব্বত আছে।

ঋষভ—হিমালয় পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গ।—রামরসায়ণ গ্রন্থে লিখিত আছে কৈলাস পর্ব্বতের নিকট ইহা অবস্থিত। রামায়ণাদি গ্রন্থে আরও অনেক গুলি ঋষভ পর্ব্বতের বিষয় উল্লিখিত আছে।

*২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর।

কুটক—মধ্যভারতে যে পর্ব্বতকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এক্ষণে কোটগল (Kotgal) বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাহাই কুটক পর্ব্বত।

কর্ণ—নৌগং প্রদেশের কর্ণাখ্য (Karnakhyu)।

কোল্লক—মান্দ্রাজের সালেম প্রদেশের Kolla Malais এই অঞ্চলের অধিকাংশ পর্ব্বতশৃঙ্গের শেষে Malais শব্দ যোজিত আছে।—(Smith's Geography of India)

দেবগিরি—রৈবতক পর্ব্বতের নামান্তর। কর্ণেল টড অরাবল্লী পর্ব্বতকে রৈবতক বলিয়াছেন। ইলোরা পর্ব্বত গুহায় অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে বলিয়া তাহাকেও দেবগিরি বলে।

ঋষ্যমূক—পূর্ব্বঘাট ও নীলগিরি নামক পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হইতে কাবেরী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে। রামায়ণে লিখিত আছে, পলসাও এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। এখানে মতাঙ্গ মুনির আশ্রম ও সুগ্রীবের গুপ্তাবাস ছিল। সুতরাং কূর্গ প্রদেশে এই পর্ব্বত অবস্থিত বলিতে হইবে।

শ্রীশৈল বা শ্রীপর্ব্বত—মান্দ্রাজের মহবর প্রদেশের Seeru Malais হওয়া সম্ভব।

বেঙ্কট—মান্দ্রাজের নেলোর অঞ্চলে। এই পর্ব্বতে অদ্যাপি বেঙ্কটাগিরি নামে এক পার্ব্বত্য নগরী বিদ্যমান আছে।

বারিধার—কাটিবার প্রদেশের বারদা পর্ব্বত হওয়া অসম্ভব নহে।

মঙ্গলপ্রস্থ—দরং প্রদেশের মঙ্গলদায়ী (Mangaldai) পর্ব্বত হইতে পারে।

চিত্রকূট—বুন্দেল খণ্ডের চিত্রকোট।

গোবর্দ্ধন—মথুরার ৬৷৹ ক্রোশ পশ্চিম।

ককুভ—বোম্বাই প্রদেশের ককুভাই (Kakubai) পর্ব্বত।

নীলপর্ব্বত—উড়িষ্যারসন্নিহিত পর্ব্বতবিশেষ।

নীলগিরি—আজিও দাক্ষিণাত্যে নীলগিরি নামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

গোধন—রোটাখ প্রদেশে গোহন (Gohana) পর্ব্বত হওয়া অসম্ভব নহে।

ইন্দ্রকীল—হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ।

রামগিরি—নাগপুর-সন্নিহিত রামতেক পাহাড়।

দর্দ্দুর—হায়দারাবাদ প্রদেশের দারুর (Daroor) হওয়া অসম্ভব নহে।

বৈদ্যুত—মহীশূর প্রদেশের বিদ্যুতপুর (Bettudpoor)।

তুঙ্গপ্রস্থ—বোম্বাই প্রদেশের টাঙ্গা (Tangha)।

মন্দর—ভাগলপুর সন্নিহিত মন্দরগিরি।

নাগপর্ব্বত—রাজপুতানার তারাগড় দুর্গের নিকট নাগ পাহাড় আছে। আসামের নাগাপাহাড় হওয়াও অসম্ভব নহে।

বোধন—সুরাটের নিকট।

পাণ্ডুর—মধ্যভারতের পাণ্ডুরনা (Pundurna)।

জয়ন্ত—আসামের জয়ন্তীয়া পাহাড়।

অর্ব্বুদ—আবু পর্ব্বত।

গোমন্ত—গোয়া সন্নিহিত ঘাটপর্ব্বতের অংশ বিশেষ।

কুটশৈল—মান্দ্রাজ প্রদেশের নীলগিরি অঞ্চলের কোটগিরি (Kotagiri)।

হীরক ও কালনাগ—মণিপুর প্রদেশে।

ত্রিশূল ও নন্দকূট পর্ব্বত—কুমায়ুণ প্রদেশে।

সীতাগিরি—নাগপুর প্রদেশের সীতাপাহাড়।

এই প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন, Prof Wilson's বিষ্ণুপুরাণ, *G. Smith's* Geography of India, *I. W. McCrindles* Anciant India as described by *Ptolemy* এবং *Col Tod's* Rajsthan.

রাণা সঙ্গ।

মোগল-সাম্রাজ্যের সংস্থাপনকর্ত্তা স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন,—"মিবারাধিপতি রাণা সঙ্গের অশেষ উন্নতির কারণ, তাঁহার অদ্ভুত সাহস ও দুর্জ্জয় তরবারি।" বস্তুতঃ তাঁহার সময়েই মিবার সমৃদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সহসা তাঁহার মৃত্যু না হইলে, দিল্লিশ্বরকে আরও কিছুকাল বিষম উদ্বেগে কালাতিপাত করিতে হইত। বাল্যাবস্থায় নানা প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়ায় তিনি কখনও যুদ্ধ-ক্লেশে কাতর হইতেন না; এমন কি, কষ্টসহ পার্ব্বতীয় মোগল সৈন্যগণও তাঁহার অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত হইত। সঙ্গের সহিত যদ্যপি তাঁহার বীরবাহু ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের প্রণয় থাকিত, তাহাহইলে বাবরকে অধিক কাল দিল্লির সিংহাসন ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু অনৈক্যতাই রাজপুতগণের অধোগতির প্রধান কারণ। প্রণয় দূরে থাকুক, পৃথ্বীর নৃশংস ব্যবহারে সঙ্গকে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনেক কাল গুপ্তভাবে থাকিতে হইয়াছিল।

সঙ্গ বীরপুরুষ, সদ্বিবেচক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। পৃথ্বী তৎকালীন নৃপতনয়গণের মধ্যে প্রবল প্রতাপশালী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্ধত প্রকৃতি সকল সদ্গুণকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তি যদিও অনেক উপন্যাসে বর্ণিত আছে, তথাপি মিবার তাঁহার বাহুবলে কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। রাজ্যেশ্বর হইবার বাসনা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরিত ছিল; সুতরাং সঙ্গ তাঁহার চক্ষের শূল হইয়াছিলেন। এক দিন সঙ্গ, পৃথ্বী, জয়মল্ * ও তাঁহাদের পিতৃব্য সূর্য্যমল্ একত্রে বসিয়া আছেন, এমন সময় কথা প্রসঙ্গে পৃথ্বীরাজ বলিলেন;—"আমার এই যে পরাক্রান্ত বাহুযুগল দেখিতেছ, বিধাতা রাজ্য-শাসনের জন্যই ইহা আমাকে দিয়াছেন; মিবারের সিংহাসন আমারই হইবে।" সঙ্গ এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"ভাল, তোমার প্রতি ভাগ্য যদি এতদূর সদয় থাকেন, তাহা হইলে তুমিই আমাদের ভাবী অধীশ্বর; কিন্তু অদূরে গিরিশিখরস্থ অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে যাইলে আমাদের কাহার অদৃষ্টে কি আছে জানিতে পারিব।" সঙ্গের বাক্যে সকলেই একমত হইয়া মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পৃথ্বী ও জয়মল্ প্রথমে দেবীর গৃহে প্রবেশ করিলেন; তৎপরে সঙ্গ ও সূর্য্যমল্ তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। মন্দিরের ভিতর এক খানি শার্দ্দুল-চর্ম্ম বিস্তৃত ছিল, সঙ্গ তাহার উপর উপবেশন করিলেন। সূর্য্যমল্ মৃত্তিকার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন; কিন্তু তাঁহার একটী হাঁটু চর্ম্মের উপর পড়িল। তৎক্ষণাৎ ভবিষ্যদ্বাণী হইল, যিনি এই চর্ম্ম অধিকার করিয়াছেন তিনিই মিবারের ভাবী অধীশ্বর। সূর্য্যমল্ও রাজ্যের কিয়দংশ ভোগ করিতে পাইবেন।"

পৃথ্বীরাজ পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার রাজ্য-লোভে অন্ধ হইয়া ভ্রাতৃস্নেহ ও আত্মীয়তা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দেবীর বাণী শুনিয়া তিনি ঈর্ষায় অধীর হইলেন; এবং তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। সূর্য্যমল্ সঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; সুতরাং পৃথ্বী ও সূর্য্যের সঙ্গে তুমল যুদ্ধ বাধিল। উভয়ের অঙ্গই অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইল। পরে সঙ্গ পলায়ণ করিলেন বটে, কিন্তু তীর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার একটী চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন হইল; এবং অঙ্গেও চারি পাঁচটী অস্ত্রাঘাত লাগিল।"

ঈদৃশ ঘটনায় সঙ্গ ভীত হইলেন। ভ্রাতা যে সুবিধা পাইলে তাঁহার জীবন হন্তারক হইবেন, এ সন্দেহ তাঁহার মনে দূরীভূত

* সঙ্গের অপর এক ভ্রাত।

হইল। এদিকে পৃথ্বীরও অঙ্গের ক্ষত আরোগ্য হইতে লাগিল, আর সঙ্গও পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শত্রুর ভয়ে পলায়ণ করা রাজপুতের কর্ম্ম নহে; কিন্তু জীবনের মায়া কি ভয়ানক! যে রাণা সঙ্গের নামে ফর্গনাধিপতি সুলতান বাবর কম্পিত হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গ প্রাণ ভয়ে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন! প্রথমে কোথায়ও তাঁহার ভাগ্যে নিরাপদ আশ্রয় জুটিল না। অবশেষে তিনি এক ছাগরক্ষকের শরণাগত হইলেন। তাঁহার জীবনের এই অংশ আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। বিধাতার যে কি উদ্দেশ্য তাঁহা কে বুঝিতে পারে! যে হস্ত তিনি মিবারের রাজদণ্ড ধারণের জন্য সৃজন করিয়াছিলেন, সেই হস্ত-দ্বারা তাঁহারই ইচ্ছায় এক সময়ে সামান্য ছাগ-রক্ষকের গৃহে কত নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদিত হইল। সঙ্গের আশ্রয়দাতা একদা তাঁহাকে পিষ্টক প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন। কিন্তু তিনি রাজপুত্র; কখনও পাচকের কার্য্য করেন নাই। সুতরাং আশ্রয়দাতার আজ্ঞা পালনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ইহাতে ছাগ-রক্ষক তাঁহাকে তিরস্কার করায় তাঁহার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ বোধ হইল। কিন্তু কোথায় যাইবেন? লোকে যদি তাঁহাকে রাণা রায় মলের পুত্র সঙ্গ বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ, পৃথ্বী কখনই তাঁহার অনুসন্ধান করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না। যাহাহোক, ভাগ্যক্রমে সঙ্গকে অধিক দিন এইরূপ হীন অবস্থায় থাকিতে হইল না। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত তাঁহাকে দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া শ্রীনগরস্বামী রাও করিমচাঁদের নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীনগরে সৈন্যনায়ক নিযুক্ত হইয়া তিনি দিন দিন বীরত্বের প্রচুর প্রমাণ দিতে লাগিলেন।

এই স্থান হইতেই তাঁহার ভাগ্য ফিরিতে আরম্ভ হইল। প্রায় প্রত্যহই তিনি দলবল সমভিব্যাহারে শত্রুপুরী আক্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন। একদিন তিনি আক্রমণের পর ফিরিয়া আসিবার সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় পথিমধ্যে শ্রান্তিদূর করণার্থ এক বিশাল বটবৃক্ষ-তলে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রচণ্ড আতপ-তাপে তাঁহাকে এতদূর হতবীর্য্য করিয়াছিল যে, তিনি সেই স্থানেই তরবার মস্তকের উপাধান করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার অশ্ব যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিল এবং অনুচরগণ আহারপ্রস্তুতের জন্য ব্যস্ত হইল। এইরূপে শয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সঙ্গ ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। এক অজাগর বিষধর শরীর কুণ্ডলিত করিয়া সেই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিল। প্রচণ্ড আতপ-তাপে ও পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হওয়ায় সঙ্গ কোন দিক্ না দেখিয়াই শয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং সর্প তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ক্রমে তিনিও নিদ্রায় অভিভূত হইলেন, আর সর্পও তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। যদ্যপি সেই সময়ে তাঁহার অরক্ষিত বক্ষের উপর দংশন হইত, তাহাহইলে যুদ্ধে বাররকে আর ভগ্নোৎসাহ মোগল সৈন্য লইয়া বিপদগ্রস্ত হইতে হইত না। কিন্তু ভগবানের কৃপা থাকিলে অনিষ্টের কারণও ইষ্ট-সাধন করে। বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া যে সূর্য্য-রশ্মি তাঁহার মুখের উপর পতিত হইয়াছিল, বিষধর স্বীয় ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া তাহা নিবারণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে একটী পক্ষী আসিয়া তাহার ফণার উপর বসিয়া আপন ইচ্ছায় চীৎকার করিয়া উঠিল। ইহাতে সঙ্গের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; সর্প ও পক্ষী উভয়ে আপন-আপন স্থানে পলায়ন করিল।

বিস্মিত হইয়া তিনি ভূমিশয্যা ত্যাগ করিলেন; কিন্তু দুই এক পা অগ্রসর হইতে

না হইতে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে বলিল—"হে ভাগ্যবান! ঈশ্বর আমায় পক্ষীর ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। সুতরাং যে চীৎকারে আপনার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তাহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার যত শত্রুই থাকুক না কেন, একদিন না এক দিন আপনি মিবারের বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পাইবেন। আপনিই আমাদের ভাবী অধীশ্বর; আজ আপনি যাঁহাকে প্রভু বলিতেছেন, তিনিও আপনার অধীন হইবেন।" এই কথা বলিয়া সেই ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবার উদ্যম করিল। কিন্তু সঙ্গ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন,—"নিয়তির গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। তুমি আমার মঙ্গল কামনা করিতেছ; ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।" এই কথা বলিয়া সঙ্গ অশ্বারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে করিমচাঁদের কর্ণগোচর হইল যে, তাঁহার সেনানায়ক রাজবংশসম্ভূত এবং মিবারের ভাবী অধীশ্বর। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সঙ্গের বিবিধ সদ্গুণে তাঁহার প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার মনে বড় ইচ্ছা হইত যে, স্বীয় কন্যার সহিত সঙ্গের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধে বদ্ধ করিবেন। কিন্তু তাঁহার কুলশীল কিছুই জ্ঞাত না থাকায় উদ্দেশ্য সফল করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারায় তিনি অসীম আনন্দের সহিত কন্যাকে সঙ্গের হস্তে অর্পণ করিয়া আপন কুলগৌরব বর্দ্ধিত করিলেন এবং যাহাতে জামাতার কুলশীল অপর কাহারও জ্ঞানগোচর না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইলেন। (ক্রমশঃ)

বৈদিক মন্ত্র।

অথ চতুর্থী, ৪র্থ মন্ত্র।

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥৪॥

যোঽয়ং ত্রিপাৎ পুরুষঃ সংসারস্পর্শরহিতঃ বহুলস্বরূপঃ সোঽয়মূর্দ্ধ উদৈৎ অস্মাদজ্ঞানকার্য্যাৎ সংসারাদ্বহির্ভূতঃ অত্রত্যৈগুণদোষৈরস্পৃষ্ট উৎকর্ষেণ স্থিতবান্ স্থিতস্য তস্য যোঽয়ং পাদো লেশঃ সোঽয়মিহ মায়ায়াং পুনরভবৎ সৃষ্টিসংহারাভ্যাং পুনঃ পুনরাগচ্ছতি। অস্য সর্ব্বস্য জগতঃ পরমাত্মলেশত্বং ভগবতাপ্যুক্তং,— "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি গীঃ ১০। ৪২। ততো মায়ায়ামাগত্যানন্তরং বিষ্বঙ্ দেবতির্য্যগাদিরূপেণ বিবিধঃ সন্ ব্যক্রামৎ ব্যাপ্তবান্। কিং কৃত্বা সাশনানশনে অভি অভিলক্ষ্য সাশনং ভোজনাদি ব্যবহারোপেতঃ চেতনং প্রাণিজাতং, অনশনং তদ্রহিতং অচেতনং গিরিনদ্যাদিকং তদুভয়ং যথাস্যাত্তথা স্বয়মেব বিবিধো ভূত্বা ব্যাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ সায়ং।

যিনি এই ত্রিপাৎ পুরুষ, যাঁহাকে সংসারজনিত গুণ-দোষাদি স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি বহুলস্বরূপ, তিনিই, এই অজ্ঞানবিলসিত সংসারিক সুখদুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বোন্নতরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বোন্নতরূপে অবস্থিত সেই মহাপুরুষের চতুর্থাংশ, সৃষ্টিসংহার দ্বারা বারম্বার মায়াসঙ্গ লাভ করিয়া স্বয়ং চেতন ও অচেতন বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়াছেন। ৪। বাং

অথ পঞ্চমী, ৫ম মন্ত্র।

তস্মাদ্বিরাড় জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ ।৫।

বিষ্বঙ্ ব্যক্রামদিতি যদুক্তং তদেবাত্র প্রপঞ্চ্যতে তস্মাদিতি। তস্মাদাদিপুরুষাদ্বিরাড় ব্রহ্মাণ্ডদেহোঽজায়ত, উৎপন্নঃ। বিবিধানি রাজন্তে বস্তুনাত্রেতি বিরাট্ বিরাজো অধি বিরাড়্দেহস্যোপরি তমেব দেহমধিকরণং কৃত্বা পুরুষঃ তদ্দেহাভিমানী কশ্চিৎ পুমান জায়ত সোঽয়ং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যঃ পরমাত্মা। সএব স্বকীয়য়া মায়য়া বিরাড়্দেহং ব্রহ্মাণ্ডরূপং সৃষ্ট্বা তত্র জীবরূপেণ প্রবিশ্য ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীবোঽভবৎ। এতচ্চ আথর্ব্বণিকা উত্তর তাপনীয়ে বিস্পষ্ট মমানন্তি "সবাএষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্টা প্রবিশ্য মূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহারান্নাস্তে মায়য়ৈব" ইতি। সজাতো বিরাট্ পুরুষোঽত্যরিচ্যত, অতিরিক্তোঽভূৎ দেবতির্য্যঙ্ং মনুষ্যাদিরূপোঽভূৎ। পশ্চাদ্দেবাদি জীবভাবাদূর্দ্ধং ভূমিং সসর্জ্জেতিশেষঃ। অথো ভূমেঃ সৃষ্টেরনন্তরং তেষাং জীবানাং পুরঃ সসর্জ্জেতি শেষঃ। অথো ভূমেঃ সৃষ্টে রনন্তরং তেষাং জীবানাং পুরঃ সসর্জ পুর্য্যান্তে সপ্তভির্ধাতুভিরিতি পুরঃ শরীরাণি। ৫। সাং

"মহাপুরুষের চতুর্থাংশ বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া বিস্তীর্ণতালাভ করিয়াছেন"—এই যাহা উক্ত আছে, এই মন্ত্রে তাহাই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। সর্ব্ববেদান্ত-বেদ্য সেই পরমাত্মা হইতে বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড দেহ) উৎপন্ন হইয়াছে (বিরাট্—যাহাতে বিবিধ বস্তু বিরাজিত হয়) এবং তিনি স্বয়ং স্বকীয় মায়াদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ দেহ সৃজন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডশরীরাভিমানী পুরুষ (জীব) হইয়াছেন; অপিচ কেবল বিরাট্ জীব নহেন, তদতিরিক্ত দেব তির্য্যক্-মনুষ্যরূপেও জীব হইয়াছেন। দেবাদি জীবগণ হইবার পর, ভূমি (জীবের থাকিবার স্থান) সৃজন করিয়াছেন; তৎপরে জীবগণের শরীর সৃজন করিয়াছেন।৫। বাং

অথ ষষ্ঠি, ৬ষ্ঠ মন্ত্র।

যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরদ্ধবিঃ ॥৬॥

যদ্ যদা পূর্ব্বোক্তক্রমেণ দেবশরীরেষূৎপন্নেষু সৎসু দেবা উত্তরসৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থং বাহ্যদ্রব্যস্যানুৎপন্নত্বেন হবিরন্তরাসম্ভবাৎ পুরুষ স্বরূপমেব মনসা হবিষ্টেন সঙ্কল্প্য পুরুষেণ পুরুষাখ্যেন হবিষা মানসং যজ্ঞমতন্বত অন্বতিষ্ঠন্। তদানীমস্য যজ্ঞস্য বসন্তো বসন্তর্ত্তুরেবাজ্যমাসীদভূৎ তমেবাজ্যত্বেন সঙ্কল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ। এবং গ্রীষ্ম ইধ্ম আসীৎ তমেবেধ্মত্বেন সঙ্কল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা শরদ্ধবিরসীৎ তামেব পুরোডাশাদি হবিষ্টেন সঙ্কল্পিতবন্ত ইত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বং পুরুষস্য হবিঃ সামান্যরূপত্বেন সংকল্পঃ অনন্তরং বসন্তাদীনাং আজ্যাদিবিশেষরূপত্বেন সঙ্কল্পঃ ইতি দ্রষ্টব্যম ॥ ৬ ॥ সাং।

যখন, দেব-শরীর উৎপন্ন হইবার পর দেবতারা অপর অপর পদার্থের সৃষ্টির উদ্দেশে, হবন-দ্রব্যের অভাববশতঃ সেই পুরুষকে, সামান্যতঃ হবন-দ্রব্যরূপে কল্পনা করিয়া মানস-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন (ফলতঃ যজ্ঞ ব্যতিরেকে শরীর রক্ষা হয় না, আর হবনাদি দ্রব্য ব্যতিরেকে যজ্ঞ হয় না। সুতরাং দেবগণ অপর অপর পদার্থের সৃষ্টির আবশ্যক বিবেচনায়, "আপনিই হবন দ্রব্য" এইরূপ বলিয়া মনের দ্বারা তাঁহার আরাধনারূপ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন), তখন বসন্ত ঋতু ঘৃতরূপে কল্পিত হইল এবং গ্রীষ্ম কাষ্ঠরূপে, শরৎ পুরোডাশাদিরূপে (হোমীয় পিষ্টকাদি বিশেষ) কল্পিত হইল। ।৬। বাং

রাধারাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নৌকাডুবি।

আনন্দময় নদীয়ায় হাহাকার উপস্থিত। গভীর নিশীথে দুরন্ত যবনসৈন্য নগরী আক্রমণ করিয়াছে। বৃদ্ধ নৃপতি লক্ষ্মণ সেন প্রাণভয়ে রাজপুরীর পশ্চাৎ দ্বার দিয়া সপরিবার পলায়ন করিয়াছেন; সুতরাং নগর-রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই। এখন প্রতিগৃহে শোকোচ্ছ্বাস; নরনারী সকলেই প্রাণ লইয়া বিব্রত। বিশেষ, হিন্দুপল্লী—বৈষ্ণব-পল্লী আরও শোকমগ্ন; পুরীর কোথাও অগ্নি জ্বলিতেছে—ধূ-ধূ-ধূ; কোথাও দুরন্তগণ 'কৃষ্ণ'-বুলির পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবের মুখে বলাইতেছে—'আল্লা—আল্লা।' যবনস্পর্শের আশঙ্কায় কোথাও সাধ্বী স্ত্রী জলন্ত অনলে জীবনাহুতি দিতেছেন; 'কাফের বধ্য' বলিয়া কোথাও নরমুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে।

একটী দরিদ্র পরিবার এতক্ষণও নীরবে ছিলেন। ঘুমঘোরে এ ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু পার্শ্বোত্থিত ভীষণ আর্ত্তনাদ এখন তাঁহাদিগকে জাগাইল। উঠিয়াই দেখিলেন, তাঁহাদের রন্ধনগৃহ জ্বলিতেছে; শয়নগৃহেরও দক্ষিণ পার্শ্ব অগ্নিসংলগ্ন হইয়াছে। আরও শুনিলেন, চারিদিকেই হাহাকার; কেবলই 'কাফেরে মার, কাফেরে মার' এই রব। দরিদ্র গৃহস্বামীর তখন আর কিছুই

বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলই বুঝিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া প্রাণভয়ে তিনি ব্যাকুল হইলেন। পুত্র কাঁদিতেছে: পত্নী বাক্যহীন, নিস্তব্ধে কি ভাবিতেছেন। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া গৃহস্বামীও "কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন স্বামীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া স্ত্রী বলিলেন,—"নাথ! এ সময় ব্যাকুল হইলে চলিবে কেন? চলুন—চলুন, উহাকে কোলে লইয়া আমরা পলাইয়া যাই।"

স্বামী।—"সে কি ক'রে হয়! কোন্ দিক দিয়ে যা'ব! এদিকে আগুন, ও-দিকে মুসলমানের কোলাহল। এদিকে যাইলে আগুনে পুড়িব; ও—দিকে যাইলে দুরন্তগণ জীবন্তে কাটিবে। তা'র চেয়ে যা'করেন ভগবান, এই খানে বসিয়াই না হয় তাই হোক।"

স্ত্রী।—"না—না, সে কি কথা! দাঁড়াইয়া পুড়িয়া মরার চেয়ে একবার আসুন না কেন, চেষ্টা ক'রে দেখি। তা'তেও যদি মরিতে হয়, তখন মনকে তো প্রবোধ দিতে পারিব।"

স্বামী।—"আমি কিছু বুঝিতেছি না। যা' ভাল বোঝ, কর। আমি তা'তেই রাজি আছি।"

স্ত্রী।—"তবে চলুন। দ্রব্যাদি সব থাক; তিনটী প্রাণ বাঁচাইতে কোনরূপে চেষ্টা পাওয়া যাক্।"

স্বামী!—"তবে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে!"

স্ত্রী।—"এদিকে তো আগুন জ্বলিতেছে! চলুন, সম্মুখ দুয়ার দিকেই যাওয়া যাক। তার পর, অদৃষ্টে যা' আছে, তা'ই হবে।"

এইরূপে কথাবার্ত্তার পরই স্ত্রীলোকটী সন্তানকে ক্রোড়ে লইলেন এবং স্বামীর সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই বড় সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের গৃহত্যাগের পরই গৃহে যবনগণ প্রবেশ করিল। ক্ষণেক বিলম্ব করিলেই তাঁহাদিগকেও সে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিধির কৃপা বলিতে হইবে যে, ততদূর অনর্থ এখন আর তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। বাটীর বাহির হইয়াও তাঁহাদিগকে বিশেষ আর কোন নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইল না। আসিবার সময় পথে তাঁহারা নানা প্রাণান্তক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রতি আর কোন লক্ষ্য করিল না। ক্রমে তাহারা অনতিদূরস্থ গাঙ্গিনীর পবিত্র তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদের গঙ্গাতীরে পৌঁছিবার সময়, এরূপ অনেক লোকই প্রাণ লইয়া সেইদিকে ছুটিতেছিল; আর, সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যবনগণও আক্রমণ-জন্য ধাবমান হইতেছিল। যাইহোক, তাঁহাদের কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট হইল না। তাঁহারা তীরে নামিয়াই দেখিলেন, একখানি নৌকা লোক লইয়া পরপারে পলায়ন করিতেছে। তাঁহারা তাঁহাদিগকে অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। সুতরাং সে নৌকার যাত্রীগণ তাঁহাদিগকেও নৌকায় উঠিতে দিলেন। এবং তাঁহারা উঠিলেই নৌকা ছাড়িল।

নগর-লুণ্ঠনেই মুসলমানগণ ব্যস্ত ছিল তন্মধ্যে দুই একজন যা' যাত্রীর অনুসরণে ধাবিত হয়। নৌকার ঈদৃশ পরপারে গমন দেখিয়া,"না জানি নৌকায় করিয়া রাজবাড়ীরই বা কোন মালামাল স্থানান্তরিত হইতেছে" —এই ভাবিয়া সেই দিকে অতঃপর তাহাদের লক্ষ্য পড়িল। তাহাদের জন কএক তীরস্থ অপর কোন নৌকায় আরোহণ করিয়া সেই যাত্রী-নৌকার অনুগমন করিল। নৌকার মালামাল লুণ্ঠন করিবে, এই তাহাদের বাসনা।

এ কি দুর্ভাগ্য! দেখিতে দেখিতে গঙ্গামধ্যে নৌকায় হাহাকার! যাত্রীর নৌকার পার্শ্বে

নৌকা লইয়া গিয়া মুসলমানগণ যাত্রীদের প্রতি পীড়ন আরম্ভ করিল। স্ত্রীপুরুষ সকলেই "প্রাণ যায়! প্রাণ যায়!!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সন্তান-সন্ততি, নৌকায় যাহারা ছিল, সকলেই জ্ঞানহারা হইল। অবশেষে, দুরন্তগণ তাহাতেও তৃপ্ত হইল না। 'কাকের বধ্য' এই নীতির অনুসরণে তাহারা নৌকা ডুবাইয়া দিল; নৌকা-মধ্যস্থ নরনারীর হাহাকার জল-কোলাহলে মিশিয়া গেল।

টোট্‌কাটুট্‌কি।

কুকুরের বিষ নিবারণের উপায়।—কুকুরের দ্বারা দংশিত হইলে, তাহার উপরে একটি বাঁধন অবিলম্বে দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষত স্থান উত্তম করিয়া ধোয়া উচিত এবং রক্তস্রাব বন্ধ করা অবৈধ। যত শীঘ্র পারা যায়, এক খণ্ড লৌহ বিলক্ষণ উত্তপ্ত করিয়া ক্ষতস্থানে পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পুনঃ পুনঃ নাইট্রেড অব সিলভার দিলেও ফল পাওয়া যায়। দংশনের পর যদি অধিক সময়গত হইয়া থাকে, তাহাহইলে নাইট্রিক অথবা কারবলিক এসিড দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই সম্বন্ধে কেহ বলেন, ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগালের বিষের আর একটি অতি সহজ ঔষধ আছে। ফরাসডাঙ্গার গোঁদল পাড়ায় কুকুর শৃগালে কাটা ক্ষিপ্তের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক এক ব্যক্তি আছেন। নানা দেশ দেশান্তর হইতে তাঁহার নিকট বহুতর লোক এই জন্য যাইয়া থাকে। তাঁহার ঔষধে অনেকেই বিশেষ ফল লাভ করে। তাঁহার ঔষধ সাধারণে প্রকাশ নাই। আমরা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি গোলমরিচ সাতটা এবং কেন্নো পোকা কিঞ্চিৎ কাটিয়া লইয়া এই দুই জিনিস বাটিয়া রোগীকে একবার খাওয়াইয়া দিলেই শরীর হইতে ক্ষেপা শৃগাল কুকুরের বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

গরলের ঔষধ।—গরল নানা প্রকার আছে এবং তাহার ঔষধও নানা প্রকার। কিন্তু একটী সাধারণ ঔষধ আছে যাহাতে সকল প্রকার গরল শীঘ্র আরাম হয়। ঐ ঔষধে নালী ঘা পর্য্যন্ত আরাম হইতে দেখা গিয়াছে। পানমরিচ নামে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ পল্লিগ্রামে পুষ্করিণীর ধারে পাওয়া যায়; উহার পাতা সরু এবং লম্বা। একঠা পিতলের বাটী করিয়া কতকটা ঘৃত আগুণে চড়াইবে। যখন সেই ঘৃত ফুটিবে, তখন তাহাতে কতক গুলি পানমরিচের পাতা ফেলিয়া দিবে। ঐ পাতাগুলি যখন ঘৃতে ভাজা হইয়া চুঁইয়া যাইবে, তখন সেই ঘৃতের বাটী আগুণ হইতে তুলিয়া, ঠাণ্ডা হইলে অঙ্গুলি দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িলে পাতাগুলি গুঁড়াইয়া ঘৃতের সহিত মিশিয়া যাইবে, সেই ঘৃত প্রতি দিবস ৩ বার করিয়া গরলে লাগাইয়া দিবে। যখন ঘৃত লাগাইবে, তখনই গরম করিয়া লাগাইবে।

রঙ্গরস।

চাষার ডাক্তারী-চিকিৎসা।—একজন চাষার কএক দিন হইতে জ্বর হওয়ায় সে একদিন ডাক্তার মহাশয়ের নিকট আসিলে, তিনি তাহাকে তিন পুরিয়া ঔষধ খাইতে দিলেন; বলিয়া দিলেন, সে যেন বিজ্বরাবস্থায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক একটী পুরিয়া ঔষধ খায় এবং তার পরদিন কিরূপ থাকে, তাহা জানাইয়া যায়। তদনুযায়ী পরদিন সংবাদ দিতে আসিলে ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে, কেমন আছিস্।" উত্তর।—"আছি বটে; তবে এমন ঔষধ আর দিবেন না মশায়। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি!"

ডাক্তার।—"সে কিরে! প্রাণ নিয়ে টানাটানি কি!"

উত্তর।—"আর ম'শায়, তা'র আর বল্‌বো কি! কাল ওসুদ গলায় বেধে দম আট্‌কে যাই আর কি! শেষে কত তেল জল মাখিয়ে তবে ধড়ে প্রাণ এল।"

ডাক্তার।—"কি বলিস্ বেটা, বোঝা যায় না যে।"

উত্তর :—"তা আর বুঝবেন কি করে! ম'শায়, আপনি যেমন করে খেতে বলেছিলেন, সেই মতই আগে মুখের মধ্যে জল দিয়ে তারপর ওষুধটো দিয়ে যেই গিল্‌তে গেলাম্, আর অমনি ম'শায় গলায় এইটে (পুরিয়ার কাগজ খানা দেখ'ইয়া) আট্‌কে গেল। তা'রপর দম আট্‌কে মরি আর কি! যাই-হোক, এবার তো ধম্মো ধম্মো রক্ষে পেয়েছি। নাকে কানে খত আর ওষুধ খাব না।"

মোসাহেবীর কর্ম্ম খালি —একজন জমীদারের একজন মোসাহেবের আবশ্যক হওয়ায় বিজ্ঞাপন মত কএক জন লোক কর্ম্মপ্রার্থী হন। কে কিরূপ মোসাহেবী করিতে পারিবে এই বুঝিবার জ্যন জমীদার মহাশয় পরপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"কি হে, মোসাহেবী পারিবে তো!"

উত্তর।—পারিব বই কি!'

জমীদার।—'না, বোধ হয়, পারিবে না।'

উত্তর।—"সে কি বলেন ম'শায়! পার্‌বো বই কি!"

জমীদার।—"না পারিবে না" বলিয়া জবাব দিলেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ উত্তর ও জবাবই অনেকের ভাগ্যে ঘটিল।

পরে শেষের একজনকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন পারিবে তো।"

সে উত্তর দিল,—"হাঁ পারিব।"

জমীদার।—"না, পারিবে না বোধ হয়।"

কর্ম্মপ্রার্থী।—"তবে বোধ হয় পারিব না।"

জমীদার।—"আমার বোধ হইতেছে পারিবে।"

কর্ম্মপ্রার্থী।—'তবে পারিব 'বইকি!"

অতঃপর জমীদার আর কোন কথাই বলিলেন না। সকলকে ফেলিয়া তাহাকে কর্ম্ম দিলেন।

সাঁওতাল, তাল ও তেয়ার।

প্রতিবাদ ও তদুত্তরের পর।

যদি "তাল" অর্থে পর্ব্বত বা ভূতরঙ্গ বুঝায়, তাহাহইলে সাঁওতাল পরগণা-লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ই সঙ্গত এবং যিনি তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনি সে ভাব সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ প্রবন্ধ-লেখক যে কহিয়াছেন, "তড়াগ, হ্রদ প্রভৃতি তাল বা তালাও শব্দের অর্থাপবাদ মাত্র"; ইহা কোন ক্রমেই যৌগিক বা আভিধানিক বলিয়াবোধ হয় না। "তালাও" শব্দ "তেরায়" হইতে উৎপন্ন হয় নাই। পর্ব্বতের নিম্নভাগের নাম তল যৌক্তিক বটে। কিন্তু তেরায় অর্থ স্বতন্ত্র। "তরাই" শব্দের মূল "তৎরাই" (উতর্ণা=নামিয়া আসা)। পর্ব্বতে ক্রম-নিম্ন পার্শ্বদেশ যে স্থানে সমতল দেশের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বতবাসীদিগকে দেশে (Plains) আসিবার পথ প্রদর্শন করে, তাহাকেই "তরাই" (Terai) কহে। এইজন্য চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত পরিবেষ্টিত স্থান, নিম্ন হইলেও তাহাকে "তরাই" বলা যায় না; বরং "তল" পদে বাচ্য। এইরূপ স্থান (তল) পর্ব্বতবেষ্টিত অথচ নিম্ন হওয়াতে পার্ব্বতীয় সমস্ত ধারা (Stream) প্রভৃতির আধার হয়। ইহাকেই পাহাড়ীরা "তাল" কহিয়া থাকে। হিন্দি ভাষায় "তালাও", ও উর্দ্দু ভাষায় "তলাব" শব্দের প্রকৃত অর্থ জলাশয়। সুতরাং "তালাও"এর প্রকৃত অর্থ যে হ্রদ তড়াগ ইত্যাদি, ইহাতে কোন সংশয় নাই। "নাইনিতাল" বা "সুখাতাল" তরাই মধ্যে নহে। ইহারা যে প্রত্যেকেই এক একটী পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদ তাহাও আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং ইহারা যে "তরাই"এর অপর প্রান্ত হইতে ১০।১২ মাইল দূরবর্ত্তী অনুগ্রহ করিয়া (Terai District) মানচিত্র দর্শন করিলেই অনুভূত হইবে। অপর দেখা যাইতেছে যে "তাল"-ভাগান্ত যাবতীয় শব্দ (হাঁসপাতাল ভিন্ন) যে যে স্থানকে বুঝায়, সেই সেই স্থানেই এক একটী হ্রদ আছে। অথচ নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতময় কিন্তু হ্রদপরিশূন্য কোন স্থানেরই নাম তাল-ভাগান্ত শব্দরভাব-ব্যঞ্জক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। লেখক মহাশয় কহিয়াছেন, পাহাড়ের নিম্ন স্থানকে তল কহে! শুদ্ধ তাহাই নহে! পাহাড়ী ভাষায় উহাকে সম্মন্ বা সমৃথন্ (সংস্কৃত সমতল) কহিয়া থাকে। পর্ব্বতের উচ্চতর স্থানাবলম্বীরা যে উক্ত স্থানকে (সাঁওতালপরগণাকে) সম্মন বা সমৃথন্ কহিয়া থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। সাঁওতাল শব্দ ও সমৃথন্ এর অপভ্রংশ মাত্র।

শ্রী—চৌধুরী।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বাবু রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ

বটতলার একজন পুস্তকবিক্রেতা; আজ-কাল একটা 'জগৎবাসী' কাগজ বাহির করিয়াও পরিচিত হইতে অভিলাষী। কিন্তু সকলই বড় আনন্দের কথা হইত, যদি ইনি সৎপথে থাকিয়া কাজ করিতেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে (১) প্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসীর' পশার দেখিয়া তদনুকরণে ইনি 'বঙ্গবাসিনা' কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, তাহার শেষ রক্ষা হয় নাই। তারপর অন্যান্য নানা কার্য্যের মধ্যেও (২) ইনি বিনামূল্যে—কেবলমাত্র ডাকমাশুল টুকু লইয়া 'সর্ব্বযোগ-জ্যোতিষ-তন্ত্রসার-সংগ্রহ' নামক এক মহারত্ন দান করিতে চান; অনেক রাজারাজারায় সাহায্যে তিনি যে ঐ অতি বৃহৎ দানব্যাপা র লিপ্ত হইয়াছেন, বিজ্ঞাপনের অন্যান্য নানা চটকের সঙ্গে সে কথাও প্রকাশ থাকে। অধিক কি, এক সর্ব্বযোগ-জ্যোতিষ-তন্ত্রসার-সংগ্রহ নামেই লোককে মজিতে হয়। কিন্তু শুনিলে পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, রাজেন্দ্র বাবু ডাকব্যয় বলিয়া যাহা গ্রহণ করেন, পুস্তক পাঠাইতে তাহার অনেক কম ডাক-খরচা পড়ে। অধিক কি, সেরূপ আকারের পুস্তক ছাপাইয়া দাম বলিয়া লইলেও, রাজেন্দ্রলালের ডাকমাশুল অপেক্ষা অল্প লওয়া যাইতে পারে। তা'ছাড়া, সেহেন বহ্বাড়ম্বরপূর্ণ পুস্তকের কাগজ ও ছাপাই তথৈবচ; সংগ্রহাদির কথও অধিক কিছু বলিতে চাই না; পাঠকগণ বুঝিয়া লউন। ফলতঃ মাশুলস্বরূপ পাঠাইয়া ঐ পুস্তক পাইয়া অনেক পাঠকই বিরক্ত দেখিতেছি এবং সমিতির দ্বারা পুস্তক ফিরাইয়া দিতে চান। আজকালও ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সুতরাং পাঠক বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া কাজ করুন, এই ।।৩৮।।৮। (৩) ইহার পর রাজেন্দ্র বাবু টালার ঠিকানা দিয়া বা অন্য রকমওয়ারী যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আর বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাঁর ভ্রাতা সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ গিরীন্দ্রলাল দাস ঘোষের সহযোগীতাও ইনি করিয়া থাকেন, শুনা যায়। (৪) অধিকন্তু এদানীং ইনি যে 'জগৎবাসী' বাহির করিতে বসিয়াছেন, তাহারও অনেক গূঢ় কথা শুনা যায়। ইনি জগৎবাসীর সহিত কতকগুলি পুস্তক উপহার দিতে চান, কিন্তু সেগুলিও তথৈবচ বটতলার পুস্তক। আরও এক কথা, সে উপহার পাওয়াও যে আবার অনেক গ্রাহকের ভাগ্যে ঘটে না, তাহাও জানিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যেই সমিতিতে অভিযোগ আসে। যাইহোক, অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না। এখনও ইহাঁর মতি ফিরে, এই বাসনা।

'ব্রহ্মাণ্ড-বাজারের' প্রতারণা।

কলিকাতা, ৬৮ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট হইতে বাবু চণ্ডীচরণ বসু 'ব্রহ্মাণ্ড-বাজার' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতঃ প্রথমে লক্ষ ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিতরণ করিবেন বলেন। কিন্তু শেষে ১।০ সিকা না পাইলে নিয়মিত কাগজ পাঠাইতে চান না। যাই-হোক, তদনুযায়ী এবং উপহার পাইবার লোভে অনেকেই মূল্য পাঠাইয়া পত্রিকার গ্রাহক হন। কিন্তু কএকমাস পত্রিকা দিয়া এখন আর উচ্চবাচ্য নাই; লোকে টাকা দিয়া পত্রিকা না পাইয়া এখন নিয়তই সমিতিতে অভিযোগ করিতেছে। সন্ধানে লোক যাইলে, ঠিকানায় কাহারও সন্ধান নাই; কাগজ-পত্রও 'মালিকের সন্ধান নাই' বলিয়া ফেরত আসে।

দ্বারভাঙ্গা ট্রেডিং কোংর অপযশ।

দ্বারভাঙ্গা হইতে এক ট্রেডিং কোম্পানীর নাম শুনা গিয়াছিল; উক্ত কোম্পানী ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিবার বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু টাকা দিয়া এখন সকলে পুস্তক পান না, এইরূপ নানা অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। বাবু প্রিয় নাথ দত্ত নামক ঐ কোম্পানীর এক ম্যানেজারের নাম শুনা যায়। যাইহোক, এ কলঙ্ক হইতে তিনিও এখন নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা পান, এই ইচ্ছা।

গ্রাহকগণও উপেক্ষার নহেন।

আজকাল গ্রাহকের প্রতারণাতেও যে অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হন, একথা ব্যবসায়ীমাত্রেই জানেন। ভ্যালুপেয়েবেল ডাকে দ্রব্যাদি পাঠাইতে বলা ও ব্যবসায়ী যেরূপে হউক তাহা সংগ্রহ করিয়া ঘর হইতে মাশুল দিয়া পাঠাইলেও গ্রাহক হইতে তাহা ফেরত আসা, এরূপ প্রবঞ্চনা তো সচরাচরই ঘটিয়া থাকে। প্রমাণে আমরা এমনও দেখিতে পাই যে, মফঃস্বলের কতকগুলি গ্রাহকই এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীকে ঠকাইয়া আসিতেছেন; ব্যবসায়ীকে ভিন্ন ভিন্ন জাল নামের পত্রাদি লিখিয়াও কারবারে ক্ষতিগ্রস্থ করিতেছেন। এরূপ অনেক প্রতারক ক্রেতার নাম আমরা সংগ্রহ করিয়াছি; সময়ান্তরে ভদ্র লোক মাত্রকেই তাঁহাদের পরিচয় দিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু সম্প্রতি অনুসন্ধানের একজন গ্রাহক যেরূপ নূতনতর ফন্দী খাটাইয়াছেন, তাহাতে কিছু নূতনতর আছে বলিয়া সে ফন্দী সাধারণকে, বিশেষতঃ সম্পাদকগণকে, জ্ঞাত করা আবশ্যক বোধ করি। বাবু লালবিহারী মিত্র ২৮৬নং বৌবাজার ষ্ট্রীটের হোমিওপ্যাথিক ডিপজিটারী হইতে অনুসন্ধানের গ্রাহক হন ও আপনাকে উক্ত ফারমের ম্যানেজার বা সত্বাধিকারী বলিয়া পরিচয় দেন। এবং প্রথমকার সকল সংখ্যা গ্রহণ করিয়া তদপর তাঁহার নামীয় কাগজ 'সরসুনা, বেহালা' ঠিকানার তাঁহার নিজ বাটীতে পাঠাইতে বলেন। মূল্য অগ্রিম দেয় হইলেও, তিনি এক নির্দ্দিষ্ট দিনে দিবেন বলিয়া বিলের পিঠে লিখিয়া দেন ও পছন্দ হওয়ায় খাতাতে সহি করিয়া কাগজ লন। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, মূল্য দিবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকার তাগাদা হইলে প্রথমে ফেরাফিরি হাঁটাহাঁটি করাইয়া শেষে পুস্তক ফেরত দিতে চান। এখন, পাঠক ভাবুন দেখি, পড়া শেষ করিয়া, পুস্তক পুরাতন করিয়া ফেরত দেওয়া কতদূর ভদ্রতার কাজ? বিশেষ, অন্য লোকে এরূপ ব্যবহার করিলে আমরা কোন কথাই বলিতাম না; কিন্তু ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি যখন এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেছেন, তখন তো আর কথা নাই।

সংবাদ

—নাগা-পু একজন ডাকাইতের সর্দ্দার; তার দলে প্রায় তিন শত ডাকাইত। ইংরাজকে ব্রহ্মদেশে সে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সংপ্রতি ইংরাজের লোভানিতে পড়িয়া তাহার দলস্থ একজন আত্মীয় কৌশলে তাহার মুণ্ড কাটিয়া আনিয়া ইংরাজকে প্রদান করিয়াছে! ঘর-বিভীষণ এতই ভয়ানক!

—সভ্যদেশে ভিক্ষুকদেরও আদব-কায়দা আছে। সম্প্রতি ভিক্ষুকদিগের ভিক্ষাকার্য্যের সুবিধার্থ ইউরোপে এক ডাইরেক্টরী বাহির হইয়াছে। তাহাতে তত্রত্য যাবতীয় দাতার নাম ও ঠিকানা; কোন্ দাতা কোন্ জিনিস দান করিতে পছন্দ করেন; অন্ধ, খঞ্জ, স্থবির, বালক বা বৃদ্ধ কিরূপ প্রকৃতির ভিক্ষুকের প্রতি কোন্ দাতার কিরূপ দয়া; বিদ্যা শিখাইতে, আহার দিতে বা অন্নবস্ত্র দিতে কোন্ দাতা কিরূপ ইচ্ছুক; কোন্ দাতার নিকট কোন্ সময়ে যাইলে কিরূপে ভিক্ষা পাওয়া যায়; ইত্যাদি ভিক্ষুকের জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই লিখিত আছে। ঐরূপ এক এক খানি পুস্তক থাকিলে, খুঁজিয়া ২ দাতা সংগ্রহ করা প্রভৃতি কষ্ট হইতে নিস্কৃতি আছে। তাই শুনা যায়, ঐ পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত গৃহীত হইতেছে এবং উহার লিখিত বৃত্তান্ত, যে সকল ভিক্ষুক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, তাহারাও বিশেষ পুরস্কৃত হইতেছে।

—ফরাসী-রাজ্য ৩ কোটী ৯০ লক্ষ প্রজা; কিন্তু শিক্ষার গুণে তার্কিক হইয়া তাহার প্রায় ৭৬ লক্ষ প্রজা পৃথিবীর কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাই লইয়া বড়ই হুলুস্থূল পড়িয়াছে।

—গত বৎসর প্রায় ৪০৭৭০০৲ টাকার শাল এদেশ হইতে ইউরোপে রপ্তানী হইয়াছে।

—আজমীরের এক ফিরিঙ্গি সাহেব সে দিন তত্রত্য আদালতে এক বড়ই মজাদার মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইতেছে, এই তাঁহার অভিযোগ! সাক্ষীসাবুদও একবাক্যে ঐ কথাই বলেন। কিন্তু যাহাকে 'আমার স্ত্রী' বলিয়া তিনি আদালতে উপস্থিত করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আর একজন সাহেবের স্ত্রী বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। কাজেই ফিরিঙ্গিজীর মকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্; উপরন্তু মিথ্যা মকর্দ্দমার জন্য তিনি আদালতে দণ্ডিত হইলেন।

—ফুলমনী নামক শিবপুরের একজন ধাত্রীকে গর্ভিণীর চিকিৎসা করাইব বলিয়া লইয়া গিয়া, কএক জন গুণ্ডা তাহার গায়ের গহনাপত্র সকল কাড়িয়া লইয়াছে। এবং সহজে গহনা প্রভৃতি খুলিয়া না দেওয়াতে প্রহারও দেয়। একেই বলি, চোরের ডাক্তার-ডাকা।

—গত বৎসর ইউরোপে হইতে ৮ লক্ষ, ৫১ হাজার ১২ টাকার পুস্তক এদেশে আমদানী হইয়াছে এবং ২ লক্ষ ৫।৬ হাজার ৫৫৪ টাকার পুস্তক এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

অনুসন্ধান।

—:০(০)০:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

[২য় খণ্ড।] ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৫ সাল। [৩য় সংখ্যা।

ভক্তি-উচ্ছ্বাস।

[গান।]

১।

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

অনন্ত পূরায়ে—অনন্ত মাতায়ে
উঠে হরিধ্বনি—অনন্ত কাঁপায়ে,
তুমি কেন মন—জড়ের মতন
নিঝুমে রহ রে অনিবার। (মন)
শুন মন ওই মানস-শ্রবণে
উঠে সপ্তস্বরে অনন্ত বিমানে
সুগভীর রোল—হরি হরিবোল
পীযুষ-পূরিত গীতসার। (মন)
নিত্যানন্দ-ভাবে হলে মন ভোর
ভাঙিবে কল্পনা—মোহ-ঘুম-ঘোর
পুড়িবে কামনা ৫ মাগুণে তোর
কি আছে সুখ এ হতে আর॥ (মন)

২।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ত্যেজি অভিমান, এক করি মনপ্রাণ,
রিপুচয়ে বলিদান কর যদি মন ওরে।
'সরল বিশ্বাসী হয়ে, কূট-তর্ক ত্যেয়াগিয়ে,
ভকতি সার করিয়ে—যদি সদা ভজ তাঁরে।
তৃণাপেক্ষা লঘু হ'য়ে, তরুর সম সহিয়ে,
তাঁরোপরে সমর্পিয়ে—রাখ জীবন্ যদি রে।
তবেই তরিবে ভবে, নবজীবন-প্রভাবে,
ইহ-পরলোকে পাবে—নিত্যানন্দ শান্তি রে।

৩।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(হরি!) অপার অনন্ত তুমি তব তত্ত্ব বুঝা ভার।
স্থূল হ'তে স্থূল তুমি—সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর।
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি, অনন্ত তোমার শক্তি,
প্রেমিকের অনুরক্তি—তুমি হে সম্বল তার।
অনন্ত তব করুণা, তুমি হে তোমার তুলনা,
তরে যাহে পাপীজনা—হ'তে লোভের আগার॥

চোরের গাড়ি-চড়া।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতার একজন জানিত জুয়াচোর। ইনি ২।১ বার শ্রীমন্দিরে বাস করিয়াও আসিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা ইহাঁকে না জানেন, তাঁহারা কেহই ইহাঁর চেহারা দেখিয়া বা ইহাঁর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, ইনি জুয়াচোর। ইহাঁর বয়স এখন ২৭।২৮ বৎসর; বর্ণ পরিষ্কার গৌর; মুখশ্রী মনোহর, সকল সময়েই ইনি উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকেন; ইহাঁকে হঠাৎ দেখিলে কোন ভদ্রবংশসম্ভূত ধনশালী ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। ইহাঁর বাসস্থান অতি নীচস্থানে; হাড়কাটাগলির একটী হতভাগিনীর সংসর্গে ইহাঁর মন কলুসিত হইয়াছে। এবং ইহাতে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,

ইনি ঐ হতভাগিনীর সহিত এক পাত্রে আহারাদিও করিয়া থাকেন; ও নানা প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া 'তাহার' মনস্তুষ্টি করিয়া আসিতেছেন।

অদ্য 'তাহার' হুকুম হইল যে, একটী সিল আংটী চাই। হরিমোহনকে তাহা আনিয়া দিতেই হইবে। হরিমোহন বলিলেন,—"আচ্ছা।" কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"হাতে একটীও পয়সা নাই। এখন কি উপায় অবলম্বন করি? যাহা হউক, দেখা যাউক, কতদূর কি করিয়া উঠিতে পারি!" এইরূপ ভাবিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। হাড়কাটা গলি হইতে বহির্গত হইয়া আস্তে আস্তে বহুবাজারের চৌমাথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই স্থানে তিন চারি মিনিট দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় পূর্ব্বদিক হইতে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পাস গাড়ি অর্থাৎ যাহাতে সহিস থাকেনা, আসিয়া সেই স্থানে পৌঁছিল। গাড়োয়ান বাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু গাড়ি চাই!" হরিমোহন বলিলেন,—"হাঁ চাই!" গাড়ি দাঁড়াইল; হরিমোহন পকেট হইতে ঘড়িটী বাহির করিয়া বলিলেন,—"তিনটা বাজিতে এক পোয়া বাকী আছে।" এই বলিয়া গাড়িতে উঠিলেন; গাড়ি উত্তর মুখে চলিল। পরে হরিমোহন সেই গাড়িতে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা ৫টার সময় তালতলায় একজন পোদ্দারের দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, ও তাহার দোকান হইতে পছন্দ-মতন একটী সিল আংটী লইয়া তাহার দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। পোদ্দারও সুযোগ বুঝিয়া ও বড়মানুষ দেখিয়া, বড়মানুষী দর বলিতেও ভুলিল না। হরিবাবুও ১০৲ টাকার আংটী ১৫৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং পোদ্দারকে বলিলেন,—"আমার সহিত এখন টাকা নাই। আপনি একটী লোক আমার সহিত দেন; তিনি আমার বাটীও দেখিয়া আসিবেন ও ইহার দাম লইয়া আসিবেন।" পোদ্দার একবারে ৫৲ পাঁচ টাকা অধিক পাইতেছে; সুতরাং সে প্রলোভন ছাড়িতে না পারিয়া তাহাতেই সম্মত হইল।

অতঃপর দোকানের একজন সরকারকে তাঁহার সঙ্গে দেওয়া হইল। কিন্তু পোদ্দার তাহাকে কানে কানে যেন কি বলিয়া দিল। আংটী হরিমোহনের হাতেই রহিল। সরকার হরিমোহনের সহিত তাঁহার সেই গাড়িতে উঠিল। গাড়ি ধর্ম্মতলার দিকে চলিল, ও ক্রমে চাঁদনী বাজারের দক্ষিণের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিমোহন গাড়ি হইতে নামিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বাজারের ভিতর প্রবেশ করিলেন; সরকারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। হরিমোহন বাজারের ভিতর একটী কাপড়ের দোকানে বসিয়া নানা প্রকার কাপড় দর করিতে ও দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এক খানিও তাঁহার পছন্দ হইল না। এমন সময় যেন তাঁহার শরীর একটু খারাপ হইয়াছে ও তাঁহার বমি হইবার উপক্রম হইতেছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন এবং পকেট হইতে একটী পয়সা বাহির করিয়া সরকারের হস্তে দিলেন। বলিলেন,—"শীঘ্র এক পয়সার পান আন।"

সামান্য-বুদ্ধি সরকার অত কিছু বুঝিতে না পারিয়া পান আনিতে দ্রুতপদে গমন করিল ও শীঘ্র পান সহ ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া আর বাবুকে দেখিতে পাইল না। শেষে গাড়ির নিকট যাইল; সেখানেও তাঁহাকে পাইল না। বাজারের ভিতর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু, অনুসন্ধান মাত্রই হইল। আর তাঁহার দেখা পাইল না। তখন সে আর কি করিবে! আর কোন উপায় না দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিল,—"যখন সেই বাবু তোর গাড়িতে আমাদিগের দোকানে গিয়াছিলেন, তখন তুই নিশ্চয়ই তাঁহার বাটী জানিস। তোকে তাঁহার বাটী দেখাইয়া দিতে হইবে।" গাড়োয়ান বলিল,—"তুই যখন আমার গাড়িতে চড়িয়াছিস, তখন আমার সমস্ত ভাড়া তোর নিকট হইতে আদায় করিব।"

এইরূপে উভয়ে ক্রমে বকাবকি করিতে করিতে গালাগালি সুরু হইল। ক্রমে হাতাহাতিও হইতে লাগিল। তাহার পরে উভয়েই সরকারী রাস্তার উপর মারামারি করা অপরাধে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থানায় প্রেরিত হইল।

যমালয়ের ফেরতা মানুষ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুনঃ অনুসন্ধান।

বৃদ্ধার কথায় হাকিমের মনে অতিশয় দুঃখ ও দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি মকর্দ্দমার বিষয় ১৫ দিবসের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়া পুলিসের হস্তে পুনরায় উহাকে অর্পণ করিলেন; এবং বলিয়া দিলেন, যাহাতে বৃদ্ধার পুত্রের অনুসন্ধান হইতে পারে সেই বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়া অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পুলিষ-কর্ম্মচারী উহাকে লইয়া ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। উহাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উহার নিকট হইতে আর কোন প্রকার সন্ধান না পাইয়া শেষে সেই অতিথির অনুসন্ধানে লিপ্ত হইলেন। ক্রমে এক দিন দুই দিন দশ দিন অতীত হইয়া গেল; অতিথির বা পুত্রের কোন সন্ধান পাইলেন না। দেখিতে দেখিতে আরও চারি দিবস হইল, তথাপি কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

মকর্দ্দমার নিয়মিত দিনে উহাকে হাকিমের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল ও পুনরায় ১৫ দিবসের নিমিত্ত মকর্দ্দমার বিষয় স্থগিত রহিল। আসামী পুলিসের জিম্মাতেই রহিল। এইবার কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে অতিথির সন্ধান হইল, তাহার নাম প্রকাশ হইল, তাহার বাসস্থান নিরূপিত হইল। তাহার অনুসন্ধানে পুলিস-কর্ম্মচারীও ছুটিলেন। সাহাবাদ জেলার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহার বাটীর ভিতরেই তাহাকে পাওয়া গেল। সে সমস্ত কথা অস্বীকার করিল। তাহার বাটীর তল্লাসীও লওয়া গেল, কিন্তু কোন দ্রব্যাদি পাওয়া গেল না। কেবলমাত্র কতকগুলি পুরাতন জীর্ণ কাগজপত্র পাওয়া গেল। তাহার কতক অংশ পড়িতে পারা যায় না; কোন স্থান একেবারে নাই, পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহার একখানির শেষ অংশ, যাহা নষ্ট হয় নাই, তাহা এই স্থানে প্রকাশিত হইল। প্রথমাংশ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। তার সে শেষ অংশ এই—

"আমার মনে অতিশয় কষ্ট হওয়াতে আমি লিখিতেছি। আমি যাহা লিখিলাম, ইহা যদি প্রকৃত হয়, তবে হয় তুমি আমার নিকট আসিবা না হয় অন্য লোককে পাঠাইয়া দিবা। কিন্তু আমার এই পত্র তাহাকে দিবা; তাহা হইলে আমি জানিতে পারিব যে, সে তোমার লোক। আমি তোমার অপেক্ষায় এখানে ১৫ দিবস অপেক্ষা করিব মাত্র। কিন্তু তাহার পর যে কোথায় যাইব, তাহা এখন বলিতে পারিতেছি না।

শ্রীরামচন্দ্র দাস,
মোকাম ৺বৃন্দাবনধাম,
মহাবীর প্রসাদ বাবাজীর কুঞ্জ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরিদ্বারে।

এই পত্র পাঠে পুলিস কর্ম্মচারীর মনে অতিশয় সন্দেহ হইল। সেই অতিথিকে ঐ পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে যে প্রকার উত্তর

করিল, তিনি তাহা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন,—"এ সামান্য লোক নহে।" সে বলিল,—"আমি এখন তোমার নিকটে আসামী-শ্রেণীতে কয়েদ অবস্থায় আছি। এখন আইনমত আমার মুখ বন্ধ; আমার কিছু বলিবার অধিকার নাই; থাকিলেও আমি বলিব না। কারণ, তোমার কর্ম্ম অনুসন্ধান করা; তুমি ইহার রহস্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। আমি কিছু বলিব না।"

এই কথা শুনিয়া অনুসন্ধানকারীর সন্দেহ আরও বাড়িল। তিনি আর কিছু না ভাবিয়া বৃন্দাবনধাম-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া মহাবীর প্রসাদের সন্ধান পাইলেন; কিন্তু রামচন্দ্র দাসের আর সাক্ষাৎ পাইলেন না। শুনিলেন, তিনি হরিদ্বার-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কর্ম্মচারীও তাঁহার উদ্দেশে অতঃপর সেই দিকে গমন করিলেন। পরে বহু অনুসন্ধানের পর রামচন্দ্র দাসের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে সেই পত্র দেখাইলেন। তাঁহার নিকট হইতে যে সকল বিষয় অবগত হইলেন, তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন, দুরাচারদিগের অসাধ্য এ জগতে কিছুই নাই, বা তাহারা না করিতে পারে এরূপ কার্য্য ভাবিয়াও স্থির করা সুকঠিন।

অতীতের নিবেদন।

আমি অতীত, আমার সহিত বর্ত্তমানের যে সম্পর্ক, ভবিষ্যতের সহিত সে সম্পর্ক নহে। যখন বর্ত্তমান স্বীয় সীমা ছাড়াইয়া আমার আখ্যা প্রাপ্ত হয়, তখন বর্ত্তমান আমার জনক; কিন্তু যখন সে ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে নিহিত থাকে ও পরে বর্ত্তমান নাম প্রাপ্ত হয়, তখন আমিই তাহার জনক, সে আমার সন্তান। অতীতের ক্রমিক উন্নতি বা অবনতির নামই বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমানের অপরিস্ফুটিতাবস্থাই ভবিষ্যৎ।

আমার বিষয়ে মানব অতি অল্পই ভাবে, অতি অল্পই দেখে। মানব ভবিষ্যৎ জানিতেই ব্যস্ত। তাহারা যখন যাহা চিন্তা করে, যাহা করিব বলিয়া স্থির করে বা যাহা করে, তাহার ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, পরিণামে কি দাঁড়াইবে, সর্ব্বাগ্রে তাহারই একটা মীমাংসা করিয়া লয়। ইহা মানবের একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। মানব কার্য্য করিবার পূর্ব্বে স্ব স্ব মনোমত একটি ভবিষ্যচ্চিত্র অঙ্কিত করিয়া লয় বটে, কিন্তু সে চিত্র কেবল কল্পনার ছায়া মাত্র। কল্পনার পরিণাম যাহা ঘটে, স্বভাবের পটে যে চিত্র আপনি ফুটিয়া উঠে, তাহার সহিত মানবের কল্পিত চিত্র মিলে না—মানুষে যে ফল ইচ্ছা করে তাহা ফলে না। দু' এক স্থলে হয়ত তাহাদের ঈপ্সিত ফল ফলিতে পারে; কিন্তু তাহা সাধারণ ফল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য মানুষ যতদূর পারে ততদূর চেষ্টার ক্রুটী করে না; কিন্তু সে চেষ্টায় যে ফল ফলে তাহার সহিত ভবিষ্যৎ ফল মিলে না কেন? কারণ, তাহাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই। অনাগত অদৃশ্য আবরণে ভবিষচ্ছবি আবরিত; কল্পনার সাহায্যে সে আবরণ দূর করিতে যতই চেষ্টা করা যায়, আবরণ ততই দৃঢ় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং ভবিষ্যৎ দেখিতে না পাইয়া কল্পনায় যাহা বলে, আশা যে দিকে চালায়, সেই দিকে চলিয়া মানুষ এক সতন্ত্র পথে উপস্থিত হয়; সে পথেও মনোমত পরিণাম দেখিতে পায় না। অনেক সময়ে এক কার্য্য করিতে গিয়া দুই জনে দুই বিভিন্ন পথে উপনীত হয় ও তাহাদের পরিণামও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। এই সকলের মীমাংসার্থ প্রত্যেক লোককে মত জিজ্ঞাসা করিলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-অনুসারে প্রত্যেকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উত্তর পাওয়া যায়। অটল-বিশ্বাসী হিন্দু বলিবেন, অদূরদর্শীতা; বিষয়ী বলিবেন, অজ্ঞতা; আর, সাধারণ মত এই যে, লোকটা একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করে না। এইরূপ যতই জিজ্ঞাসা করা যাইবে, ততই বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য শুনিতে পাওয়া যাইবে। এক্ষণে বিবেচ্য যে, এই অনভিপ্রেত ফল ফলিবার কারণ কি এই ভিন্ন ভিন্ন মন্তব্যগুলি, না, ইহার মূল আর কিছু আছে?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানবে কল্পনার সাহায্যে ভবিষ্যতের ছবি যেরূপে অঙ্কিত করে, তাহার মূল কল্পনায় নহে, পরিণাম চিন্তাতেও নহে বা ভবিষ্যতের গর্ভেও নিহিত নাই। তাহার মূল—আমাতে—এই অনন্ত বিষয়াধার অতীত-গর্ভে। কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে মানুষে একবার আমার বিষয় ভাবে, আমার গর্ভে কিছু পাওয়া যায় কি না তাহা একবার অনুসন্ধান করে। তৎপরে কিছু প্রাপ্ত হউক বা না হউক এতটা অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের মনে একটা জ্ঞান বা ভাব সঞ্চিত হয়। এই জ্ঞান বা ভাবের উপর নির্ভর করিয়া কল্পনার সাহায্যে ভবিষ্যৎ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু ভবিষ্যতের আবরণ সরাইতে না পারিয়া নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। সুতরাং আমার বিষয় ভাবিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া যে যে প্রকার জ্ঞান বা ভাব সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার ভবিষ্যচ্চিত্রও তদনুরূপ হয়।

মানুষে যে কার্য্য করুক না কেন, তাহা হয় নিজের বা আত্মীয়ের অথবা সমাজের উন্নতিকল্পেই করিতে চায়। সুতরাং কি আত্মোন্নতি, কি সমাজোন্নতি, যাহাই হউক না কেন, সমস্তই আমার উপর নির্ভর করিতেছে—একমাত্র আমি 'অতীতই' শিক্ষা-বিধাতা। অনেকের মত, একমাত্র অতীতালোচনায় কোন ফল হয় না, সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহারা ধীরভাবে একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান আলোচনায় উন্নতির মূল শিক্ষা কিছুই হয় না—শিক্ষা আমাতে। বর্ত্তমান কি? বর্ত্তমান অতীতের ক্রমিক উন্নতি বা অবনতি মাত্র। অতীতের মূলও বর্ত্তমানে নহে। পরম পুরুষ অতীত প্রধান; বিশ্বস্রষ্টাই অতীতের মূল। পুরাণে তিনি পুরাণ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু অতীত নহেন, প্রত্যুত তিনি চির-বর্ত্তমান। যাহা চিরবর্ত্তমান, তাহা একমাত্র অতীত কেন, সমস্ত বিষয়েরই মূল। যাহা এক মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান ও তৎপর মুহূর্ত্তে অতীত-মধ্যে নিবিষ্ট, তাহা অতীতের মূল নহে; তাহা অতীতের সন্তান। বর্ত্তমান মানুষের সম্মুখে অতীতের ভাবী দৃশ্য প্রদর্শন করে, হৃদয়ে অতীতের নূতন ভাবের আবির্ভাব করে; কিন্তু সে দৃশ্য, সে শিক্ষা কোথায়? যতক্ষণ সেই দৃশ্য বা ভাব বর্ত্তমান বলিয়া অভিহিত হয়, ততক্ষণ তাহাতে শিক্ষা নাই, কেবল দর্শন আছে, ভাব আছে। যাহা আজ আমার গর্ভে তাহাও ত একদিন বর্ত্তমান ছিল; তখন তাহাতে নূতন দৃশ্য, নূতন ভাব ব্যতীত আর কি ছিল? কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহা আমার গর্ভে আশ্রয় পাইল—অতীত বলিয়া গণ্য হইল, অমনি তাহাতে আলোচনার সামগ্রী, শিক্ষণীয় বিষয় ভাসিয়া উঠিল। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় যাহা বর্ত্তমানে ছিল কিন্তু এক্ষণে আমার গর্ভে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র সার ছিল না বলিয়া অতীতের গর্ভে পড়িয়াই বিলীন হইয়া গিয়াছে। কোন কোন ক্ষুদ্র বিষয় হইতে পরে এক একটি মহদ্বিষয় সংঘটিত হয় বটে; কিন্তু যতক্ষণ সেই মহদ্ব্যাপার না ঘটে, ততক্ষণ তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ও অল্প থাকে। আমি বর্ত্তমানের সার। বর্ত্তমানের যাহা কিছু সারবান বস্তু তাহাই আমার গর্ভে স্থান পায় ও অনুসন্ধান করিলে তাহাদেরই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু

অসার তাহা আমার গর্ভে প্রবেশ করিয়াই আমাতে মিশাইয়া যায়। যাহাহউক, উন্নতির মূল শিক্ষা ; সেই শিক্ষাই আমাতে। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনা করা অপেক্ষা অতীতালোচনাই বিশেষ ফল-প্রদ। অতীতালোচনা করে বলিয়াই এজগতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিকগণ অপরাপর শ্রেণী হইতে অধিক সম্মানার্হ। শিক্ষার ফল উন্নতি লাভের জন্য, মানুষে যে ভবিষ্যৎ জ্ঞানের জন্য লালায়িত, সেই ভবিষ্যতেরও মূলে আমি—বর্ত্তমান নহে।

আমি—আমি বর্ত্তমানের সারসংগ্রহকারী, মানবের শিক্ষাবিধাতা, মানবের ভবিষ্যচ্চিত্রের মূল—আমি অতীত। জগতে আমা দ্বারা যথেষ্ট কার্য্য হয়, কিন্তু আমি কোন কার্য্যের মূল নহি। সমস্ত কার্য্যই সেই অতীতের অতীত ; চিরবর্ত্তমান পুরাণ পুরুষ, সর্ব্ব নিয়ন্তা জগদীশ্বর কর্ত্তৃক উপলক্ষমাত্র অবলম্বনে সম্পন্ন হয় ; সেই উপলক্ষের মূলে আমার বাস। মনুষ্যের উন্নতির মূল যে শিক্ষা তাহা আমার করায়ত্ত ; আমিই লোকসমাজকে শিক্ষিত করিয়া জগতের উন্নতি বিধান করি।

বৈদিক মন্ত্র।

অথ সপ্তমী, ৭ম মন্ত্র।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

যজ্ঞম্ যজ্ঞসাধনভূতম্ তম্ পুরুষম্ পশুত্বভাবনয়া যূপেবদ্ধম্ বর্হিষি মানসে যজ্ঞে প্রৌক্ষন্ প্রোক্ষিতবন্তঃ। কীদৃশমিত্যত্রাহ, অগ্রতঃ সর্ব্ব সৃষ্টে পূর্ব্বম্ পুরুষম্ জাতম্ পুরুষত্বেনোৎপন্নমেতচ্চ প্রাগেবোক্তম্ "তস্মাদ্বিরাড় জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ" ইতি। তেন পুরুষরূপেণ পশুনা দেবা অযজন্ত মানসযাগম্ নিষ্পাদেতবন্ত ইত্যর্থঃ। কে তে দেবা ইত্যত্রাহ সাধ্যাঃ সৃষ্টিসাধনযোগ্যাঃ প্রজাপতি প্রভৃতয়ঃ তদনুকূল। ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারশ্চ যে সন্তি তে সর্ব্বেঽপ্যযজন্তেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ সাম্—

দেবগণ, সকল সৃষ্টির অগ্রজাত যজ্ঞ-সাধনভূত সেই বিরাট্‌পুরুষকে যূপবদ্ধ পশুরূপে ভাবনা করিয়া, মানস-যজ্ঞে প্রোক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে সেই প্রোক্ষিত পুরুষ পশু দ্বারা মানস-যাগ করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ "যজ্ঞসাধনভূত পশুসৃষ্টির আবশ্যক বিবেচনায় আপনিই আমাদের যূপবদ্ধ প্রোক্ষিত পশু হইলেন" এইরূপে প্রার্থনা করিয়া সেই কল্পিত পুরুষ পশু দ্বারা মানস-যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দেবগণ কে ?—এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা সৃষ্টিকারী প্রজাপতিগণ ও তৎসহকারী ঋষিগণ ॥ ৭ ॥ বাং

অথাষ্টমী, ৮ম মন্ত্র।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশুন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮॥

সর্ব্বহুতঃ সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষো যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে সোঽয়ম্ সর্ব্বহুৎ তাদৃশা তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ মানসাদ্যজ্ঞাৎ পৃষদাজ্যম্ দধিমিশ্রাজ্যম্ সম্ভৃতম্ সম্পাদিতম্। দধিচাজ্যম্ চেত্যেবমাদিভোগ্যজাতম্ সম্পাদিতমিত্যর্থঃ। তথা বায়ব্যান্ বায়ুদেবতাকান্ তান্ লোকপ্রসিদ্ধান্ আরণ্যান্ পশূন্শ্চক্রে উৎপাদিতবান্। আরণ্যা হরিণাদয়স্তথা যেচ গ্রাম্যা গবাদয়স্তানপি চক্রে। পশূনামন্তরীক্ষদ্বারে বায়ুদেবতাত্বম্ যজুর্ব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে "বায়বস্থেত্যাহ বায়ুর্বা অন্তরীক্ষস্যাধ্যক্ষা অন্তরীক্ষদেবত্যাঃ খলু বৈ পশবঃ বায়ব এবৈ নান্ পরিদদাতি" ইতি ॥ ৮ ॥ সাম্—

সর্ব্বময় সেই বিরাট্‌পুরুষকে হোমীয় দ্রব্য কল্পনা করিয়া যে মানস-যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ মানস-যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু সমূহ উৎপন্ন হইল এবং তিনি গ্রাম্য ও বন্যরূপে বায়ব্য পশুও সৃজন করিলেন, ॥ ৮ ॥ বাং—

অথ নবমী, ৯ম মন্ত্র।

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥

সর্ব্বহুতস্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ যজ্ঞাৎ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে উৎপন্নাঃ। তস্মাৎ যজ্ঞাচ্ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি জজ্ঞিরে। তস্মাদ্যজ্ঞাদাজুরজায়ত ॥ ৯ ॥ সাং

সর্ব্ব হোমময় পূর্ব্বোক্ত তাদৃশ যজ্ঞ হইতে ঋক্‌সমূহ (মন্ত্রভাগ) ও সামসমূহ (গেয়ভাগ) উৎপন্ন হইল। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ সকলও তথা হইতে প্রকাশিত হইল। যজুও (ক্রিয়া সম্পাদক বেদভাগ) তাহা হইতে আবির্ভূত হইল। ॥ ৯ ॥ বাং।

অথ দশমী, ১০ম মন্ত্র।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহজজ্ঞিরে, তস্মাত্তস্মাজাতা অজাবয়ঃ ॥১০॥

তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদ্যজ্ঞাৎ অশ্বা অজায়ন্ত উৎপন্নাঃ। যে কে চাশ্বব্যতিরিক্তা গর্দ্দভা, অশ্বতরাশ্চো ভয়াদত ঊর্দ্ধধো ভাগয়োর্দন্তযুক্তাঃ সন্তি তেঽপ্যজায়ন্ত। তথা তস্মাদ্যজ্ঞাৎ গাবশ্চ জজ্ঞিরে। কিঞ্চ তস্মদ্যজ্ঞাদজা অবয়শ্চ জাতাঃ ॥ ১০ ॥ সাং।

সেই পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ হইতে অশ্বসমূহ ও অপরাপর দন্তপঙক্তিদ্বয়-বিশিষ্ট পশুসমূহ জন্মগ্রহণ করিল, এবং সেই যজ্ঞ হইতে গো সকল জন্মিল। ছাগ ও মেষগণও উৎপন্ন হইল ॥ ১০ ॥ বাং।

স্বর্গীয় মহাকবি

কালিদাসের জীবনবৃত্তান্ত

বা কালিদাস উপন্যাস।

(সমালোচনা)

পুস্তকখানি হস্তে পতিত হইবা মাত্র কিন্তু প্রীত হইতে হয়। বাহ্য সৌন্দর্য্য, ছাপা, কাগজ সকলি উত্তম। গ্রন্থকারের নাম * দেখিয়াও তাঁহাতে বিদ্বান পণ্ডিত বলিয়াই বোধ হয়।

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় কবি কালিদাস সম্বন্ধে একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে, আমরা বাছা বাছি না করিয়া তাহা হইতে নমুনা-স্বরূপ প্রথম দু'টি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। কবিতার নমুনা,—

"কালিদাস. কবি, "বড় বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদ মস্তক্ গুণ রতনে মণ্ডিত্।" *

তৎপরে তৃতীয় পৃষ্ঠা হইতে 'কালিদাস উপন্যাস' আরম্ভ হইয়াছে। পুস্তকারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, "স্বর্গীয় কবি কালিদাসের ভূমিষ্ঠ হইতে পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত সকল লিখিবার আবশ্যক না থাকায় লেখণী নিবৃত্ত হইলেন।" সেইজন্য আমরা গ্রন্থকারের গদ্যরচনার ও গবেষণার নমুনাস্বরূপ তাঁহার পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠা ও পঞ্চম পৃষ্ঠা হইতে কালিদাসের পঞ্চমবর্ষ বয়সের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিলাম,—

"তবে স্বর্গীয় কবি কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে অনেক সংগ্রহ থাকায় সুতরাং বৃত্তান্ত সকল ব্যক্ত করিয়া গ্রাহকবর্গকে তৃপ্তি মানসে স্বর্গীয় কালিদাসের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম, কলিরাজ্যের প্রথম অবস্থাতে পরম পবিত্র উজ্জয়িনী নগরের নিকটবর্ত্তী পৌণ্ড্র নামক গ্রামে সদাশিব ন্যায়বাগীশ নামে এক অতি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিতের পুত্র স্বর্গীয় কালিদাস পাঁচ বৎসরের সময় এক দিবস পিতার হাত হইতে 'দা' নামক অস্ত্রখানি কাড়িয়া লইয়া ইচ্ছা মতন কার্য্যে বৃতি হইলে অর্থাৎ পিতার অতিরিক্ত বয়সের এক পুত্র কালিদাস, কালিদাস ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা করেন তাহাতে পিতার দ্বিরুক্তি নাই কালিদাস 'দা' লইয়া প্রলাপিত এক বাঁস কাটিয়া মৎস্য ধরিবার জন্য ন্যায়বাগীশ পিতার নিকট আবদার করিয়া সুতা বার্ব্বির পয়সা লইয়া সিপ প্রস্তত পূর্ব্বক নিত্য প্রাতে ও আহারান্তে মৎস্য ধরিয়া মায়ের নিকট আনিয়া দেন কিন্তু মাতা বলেন যে দেশের ব্যভিচার ধর্ম্ম অতএব তুমি মৎস্য ধরিও না আর পিতা পড়াইবার জন্য

---

* জেলা ২৪ পরগণা সবডিবিজান বারাসতস্থ রাজীবপুর-গ্রামনিবাসিনঃ শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদরত্ন ভট্টাচার্য্যেণ প্রণীত প্রকাশিতঞ্চ।

* উদ্ধৃত অংশে আমরা চিহ্ন প্রভৃতিরও কোনরূপ ব্যত্যয় করিব না। পুস্তকে যে স্থানে যেরূপ আছে সেইরূপই রাখিব।—(সমালোচক)

অনেক অনুরোধ করেন তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া আপন ইচ্ছায় চলিয়া জান, কালিদাসের যে নগরে বাস দিঘি পুষ্করিণী প্রচুর আছে, মৎস্য ধরিবার চিন্তা নাই, কিছু দিন পরে ন্যায়বাগীশ মহাশয় স্ত্রী ও কালিদাস পুত্রকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলে কালিদাসের মা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার পর নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালিদাসকে উপদেশ দিতেন, যে কর্ত্তা এই নগরের প্রধান প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত ছিলেন অতএব "বাবা কালী" তুমি কিছু কিছু লেখা-পড়া শিক্ষা কর আর আহারাদির আয়োজন কর তাহাহইলে কোন কালে আমাদের দুঃখ বিমোচন হইয়া আমরা সুখী হইব, ইহা শ্রবণে কালিদাস লেখা পড়া করিতে তত যত্নবান না হইয়া প্রাতঃকালে মার নিকট হইতে কুঠার ও দা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া প্রথমে কাষ্ঠ ও ডুম্বুর প্রভৃতি আহারাদির পরিচর্য্যায় থাকিয়া মধ্যাহ্ন কার্য্য সমাপনান্তে নিত্য মৎস্য ধরিতে যান।"

অনেকটা উদ্ধৃত করা গেল। কিন্তু কি করি পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত না তুলিলে ভাল হয় না বলিয়া এতটা তুলিতে হইল। গ্রন্থকার মহাশয় দুইটি বিষয়ে সন্দেহ রাখিয়া গিয়াছেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয় বঙ্গদেশ হইতে পৌণ্ড্র নগরে গিয়াছিলেন কি না তাহা লেখেন নাই। আর এই এক দাঁড়িতে শেষ বাক্যটির মধ্যে কত বৎসরের ঘটনা বর্ণনা করিলেন, তাহাও কিছুই বলেন নাই। সুতরাং মহাকবি যে কত বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপে ছয় পৃষ্ঠা শেষ হইলে কালিদাসের মাতা পুত্রকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি কিঞ্চিদধিক চারি পৃষ্ঠা পদ্যে উপদেশ দিয়া, তৎপরে সাত পৃষ্ঠা গদ্যে উপদেশ দিয়াছেন। স্থানাভাব প্রযুক্ত সে উপদেশের নমুনা তুলিতে পারিলাম না। এই উপদেশে কলিদাসের কিছুই হইল না। তারপর চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠা হইতে উনপঞ্চাশের পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আরও অনেক অপূর্ব্ব জিনিষ আছে; কিন্তু উহা কালিদাসের মাতার উপদেশ কি না, গ্রন্থপাঠে বুঝায় না। যাহা হউক, উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচরার্থে লিখিত হইল। প্রথমতঃ উহা যোগ দীক্ষা বলিয়া আরম্ভ হইল। দেড়পৃষ্ঠার পরে দেখি লেখা আছে—"গোসাঞীজী এই বার নূতন নূতন ধরণে এখানে আসিয়া অনেক লোককে যোগ শিক্ষা ও মন্ত্র শিক্ষা দিয়া উদ্ধার করিয়াছেন।" তার পর গোসাঞীজীর বেশ ভূষা, "গেরুয়া বর্ণের পিরহান গায়ে" ইত্যাদি এবং তাঁহার "উপাসনার সময় হরিবোল আল্লা তোবা তাল্লা বল মন এই শব্দ" ইত্যাদির বিষয় বলিয়া কীর্ত্তনের সময় তাঁহার ভাব লাগার কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্তের পর "কলুটোলা সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান কবিরাজ বাবু চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় সোমলতা আনাইয়াছেন এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে খোলা ভাটিরও আদেশ হওয়ায় সুধার বড় অপ্রতুল হইবে না" ইত্যাদি নানা প্রকারে গ্রন্থ-কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। যাহা হউক কালিদাসের জীবনী বা কালিদাস উপন্যাস লিখিতে লিখিতে ঐ সকলের অবতারনায় লেখক যে যথার্থই 'বেদরত্ন' তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। যে পুস্তকে যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহা দ্বারাই তিনি গ্রন্থ-কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। 'বিপরীতকরণ মুদ্রা' 'শক্তিচালন মুদ্রা', 'ভোগ বিঘ্ন', 'ধর্ম্মবিঘ্ন' 'জ্ঞানবিঘ্ন', 'যোগচতুষ্টয়', 'যোগক্রম', 'মানবতত্ত্ব' 'নূতন ধরণের হরপার্ব্বতী সম্বাদ,' এমন কি কালিদাসের বিবাহ উপলক্ষে শোভাবাজারের সুবিখ্যাত সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহাশয়ের শব্দকল্পদ্রুম হইতে সমগ্র "বিবাহ" শব্দের ব্যাখ্যা অর্থাৎ শব্দকল্পদ্রুমের ৪৩৯০ হইতে ৪৩৯০পৃষ্ঠার প্রথমস্তম্ভের কয়েক পংক্তি পর্য্যন্ত

এক দফা ও ৮৩৯০ হইতে ৪৩৯৩ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দফায় উদ্ধৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা এণ্ট্রান্স কোর্স, প্রসিদ্ধ শ্রেণীপাঠ্য গ্রন্থ-লেখক দ্বারকানাথ রায় প্রণীত পুস্তক এবং পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতির গ্রন্থ হইতেও নানা বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন বোধ হয়, অন্যের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন একথা জানিতে পারিলে লোকে তাঁহার পাণ্ডিত্য-বিষয়ে সন্দেহ করিবে, এই ভয়ে ও-কথার কোন উচ্চবাচ্যও করেন নাই। যাহা হউক, উদ্ধৃত-করণ বিষয়েও আমরা তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়াছি। পাঠকগণকেও আশ্চর্য্য করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। শব্দকল্পদ্রুম হইতে দ্বিতীয় দফা উদ্ধারের সময় পণ্ডিত মহাশয় 'সম্প্রদাতা' ও 'জামাতা' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রাজা' ও 'কালিদাস' শব্দ বসাইয়াছেন। তাহাতে কিরূপ হইয়াছে, পাঠক দেখুন,—

"রাজা ওঁ সাধু ভবানাস্তামিতি পৃচ্ছেৎ। কালিদাস ওঁ সাধ্বহ মাসে ইতি বদেৎ। রাজা ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং ইতি প্রশ্নেৎ। ইত্যাদি" আমরা তো ইহা বুঝিতে পারি নাই, পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন কি?

কালিদাস বাসরগৃহ হইতে বনগমন করিলে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ অশ্বারোহী ও পদচারীগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। লোকসকল প্রেরিত হইলে কালিদাসের শ্বশুর ধান্ধা মহারাজ অমাত্যবর্গ ও বন্ধুগন লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত! "দেওয়ান মহাশয় বলিলেন। হরি! হরি! তাহারা কোথায় যাইবে? একি ছেলের হাতে পিটে? এই বৃষ্টিতে বাটীর বাহির হওয়া যায় না। আমি এইটুকু আসিতে আসিতে এক শত আছাড় খাইয়াছি, রাস্তা জল-প্লাবিত, গঙ্গাসাগর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একবার আমি ভ্রমবশতঃ একটী দিঘিতে পড়িয়া গিয়া এক জালা জল খাইয়া ফেলিলাম। এমন সময়ে আমার সৌভাগ্যক্রমে শ্যামী ধোপানী ঘাট করিতে আসিয়াছিল। অবশেষে সে আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার চুলের টিকি ধরিয়া টানিয়া তুলিল।" ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধান্ধা বাহাদুরের সভায় কি কিছুর আড্ডা ছিল?

পুস্তকের গুণের কথা এইরূপ আর কত বলিব? বলিতে স্থানও নাই। উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলে পুস্তকের আগাগোড়া সর্ব্বত্রেই সমান। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পুস্তক খানি 'চানাচুর'—ইহাতে গদ্য আছে, সাহিত্য আছে, বিজ্ঞান আছে, বক্তৃতা আছে, যোগশাস্ত্র আছে, তন্ত্রশাস্ত্র আছে, মাথামুণ্ডু ছাইভস্ম সকলই আছে; কেবল পড়িবার কিছুই নাই। /

শিক্ষা।

জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশই শিক্ষা। সাধারণতঃ শিক্ষা দুই প্রকারঃ—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। পার্থিব ও নশ্বর সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা ইহলৌকিক এবং অপার্থিব ও অবিনশ্বর ঐশ-তত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা পারলৌকিক শিক্ষার মূল ভিত্তি। উভয় শিক্ষারই পরিণাম আত্মোন্নতি; বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি ইহজাগতিক শিক্ষা, অনিত্য অসার; যোগ, তপ, আরাধনা, আত্মচিন্তা প্রভৃতি পরজাগতিক ঐশ-তত্ত্ব-জ্ঞান নিত্য-সারবান। যে শিক্ষায় কেবলই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ ও নশ্বর সুখ উপভোগ করা যায়, সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা করিলে, তাহা কখনই উন্নতি পদ বাচ্য নহে। যাহা সীমাবদ্ধ অস্থায়ী, তাহা মানুষকে প্রকৃত পথে চালাইতে পারে না। যে শিক্ষা সূক্ষ্মদৃষ্টিহীন, সত্য ও ন্যায়-

মর্য্যাদারহিত, তাহার মাঙ্গলিক ফল কিরূপে সম্ভবে? যাহাতে মানুষ আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না—অধিকন্তু আসুরিক তমোগুণের অধীন হইয়া ধরয়িত্রীকে বিষম ভারবহ করে, দুর্দ্দমনীয় করাল রিপুগণের তীব্র উত্তেজনায় অহরহ বসুন্ধরায় পাপ-স্রোত প্রসারিত করিয়া থাকে, তাহা শিক্ষা নহে—শিক্ষা নামের কলঙ্ক! কিন্তু যে শিক্ষায় আত্মত্যাগ, ঐহিক ভোগবাসনা-বর্জ্জন, তত্ত্বজ্ঞান-লাভ, সদাচার, বিনয়, অলৌকিক দূরদর্শিতা প্রভৃতি অমূল্য বিষয়ের অধিকার হয়, তাহার পরিণাম কত মনোহর—কত শুভপ্রদ! কিন্তু হায়! বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী মূর্ত্তিমান দম্ভের স্তম্ভস্বরূপ কি ভীষণ ভাব পরিগ্রহ করিয়া মানুষকে উত্তরোত্তর গভীর নীরয়-কূপে লইয়া যাইতেছে!

পূর্ব্বকালে সকল শ্রেণীর লোকের শিক্ষা-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, যাহার যে বিদ্যালাভের প্রয়োজন, তাহাকে তদনুযায়ী কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইত। এতদ্ব্যতীত আর একটি বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় সে শিক্ষার পরিণাম বড়ই হিতকরী ছিল; যাহার প্রভাবে অদ্যাপিও সেই বিলুপ্তপ্রায় ঐশ-বিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভের তলে বসিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সুসভ্য দেশীয় (?) অধিবাসীগণ মুদিত নেত্রে গভীর ধ্যানযোগে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইতেছেন। সে প্রভাব আর কিছু নহে; তাহা ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক শক্তি—যাহার বলে মানুষ দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতেও সমর্থ হয়। এই ধর্ম্ম বলে বলীয়ান না হইলে মানুষের শুধু শিক্ষা কেন, সকল বিষয়েরই অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়। ধর্ম্ম সকল বিষয়েরই মূল—অনন্ত বিশ্বের প্রাণ! সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করিলে, মানুষের সকলই যে পশুপ্র হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? সেই জন্যই পুরাকালে সকল বিদ্যারই মূলে এই ধর্ম্মভাব বিশেষরূপ সন্নিবিষ্ট ছিল যে, যে বিদ্যা শিক্ষা করুক না কেন, অগ্রে তাহাকে মঙ্গলাচরণস্বরূপ গুরুপাদ-বন্দনা, উপাস্য দেবতার আরাধনা প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া করিতে হইত। পরে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের প্রতি উর্দ্ধে লক্ষ্য রাখিয়া বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসরপূর্ব্বক আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিত। এ কারণ তাহার পরিণামও শুভপ্রদ ছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালীর দুর্দ্দমনীয় অহংজ্ঞানে সে সকলই কালের করাল কবল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়াছে!

বর্ত্তমান শিক্ষার চরম লক্ষ্য অর্থোপার্জ্জন। তা' যেরূপেই হোক, তুমি চুরি করিয়া পার, ডাকাতি করিয়া পার, আর সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদার অপলাপ করিয়া মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া কৃতকার্য্য হও, এসব দোষ এখন ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বরং যিনি প্রকৃত কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন, তিনিই অকর্ম্মণ্য ও অসার বলিয়া পরিগণিত হন। জানি না, আর কতদিন এ পবিত্র আর্য্যস্থানের সন্তানসন্ততি বিজাতীয় পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিভ্রাটে পড়িয়া, বাহ্যিক আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া এইরূপে আত্মহারা হইবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি উপাধিধারী হইলেই শিক্ষা হইল না। যাহার পরিণাম, আত্মম্ভরিতা, পরছিদ্রান্বেষণ, পরপীড়ন, পাশব-ইন্দ্রিয় চরিতার্থ, পরশ্রীকাতরতা, তাহা শিক্ষা নহে—শিক্ষা নামের কলঙ্ক।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, আমাদের দেশের যুবকগণ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের একটু আলোক প্রাপ্ত হইতে না হইতেই, স্বধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা, স্বদেশের আচার-ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা-প্রকাশ, দেশীয় পরিচ্ছদ ও খাদ্য-দ্রব্যাদিতে অসন্তোষ, গুরুজনের প্রতি উদ্ধত ও নীচব্যবহার, হিন্দু-দেবদেবীর প্রতি অনাস্থা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রভৃতি আরও কত শত পৈশাচিক তমোগুণের অধীন হইয়া আপনাদিগকে একজন মস্ত লোক মনে করেন। কিন্তু যে শিক্ষায় চরিত্র ও মানসিক প্রভাব বিকাশ না হইয়া উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তাহা যদি শিক্ষা হয়, তবে মূর্খতা আর কি?—তাহা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে অধর্ম্ম কি?

পুথিগত বিদ্যায় পারদর্শী হইলেই শিক্ষা হয় না। বহুজন-সমাকীর্ণ সভায় অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতে পারিলেই পণ্ডিত হয় না। সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে সক্ষম হইলেই শিক্ষার শেষ হইল না। যাহা প্রকৃত শিক্ষা, তাহা প্রাণের বস্তু—সাধনার ধন। লোকাচারে ও মানব-সমাজে তাহার পরীক্ষা হয় না; হইতে পারেও না। সাধনা চাই—ধ্যান চাই। মানব-চরিত্র অধ্যয়ন, ভগবান বিশ্বেশ্বরের বিশাল বিশ্বরাজ্যের প্রত্যেক বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া তাহার কারণ-নির্ণয়, প্রকৃতির অভিধান পাঠ, বহু দেশ-পর্য্যটন, সদ্গুরুর আশ্রয়, আত্ম-চিন্তার অভাবে ইহলোক ও পরলোকের বৈষম্য, জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ প্রভৃতি গভীর ও সূক্ষ্মভাবের আলোচনায় ঐকান্তিকভাবে আত্ম মন প্রাণ সমর্পণ করিলে যাহা লাভ হয়, তাহাই শিক্ষা। তাহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য, তাহাই চরাচর বিশ্বের ধর্ম্ম। যিনি এ শিক্ষার শিক্ষিত, যিনি এই বিদ্যায় সুপণ্ডিত, যিনি এই ভাবে বিভোর, তিনি—সেই মহাত্মাই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; তিনিই শিক্ষার মহাত্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই জগতের আদর্শস্থানীয়। নতুবা দেশ-কালপাত্র-ভেদে যে শিক্ষা, তাহা শিক্ষা নহে, শিক্ষা নামের কলঙ্ক।

যিনি ধর্ম্মশিক্ষায় আত্মভোলা, তিনিই শিক্ষার যথার্থ উদারতা ও গভীর ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। এ শ্রেণীর শিক্ষিত কখনও নীচ অহংজ্ঞানে অন্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব বিস্মৃত হন না। এ শ্রেণীর শিক্ষিত মহাত্মাগণ যতই অনন্ত-শিক্ষা পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে আপন অসম্পূর্ণত্ব উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ যতই লাভ হয়, ততই যেন কিছুই হইল না, বোধ হয়। এ শিক্ষায় বিজাতীয় আশ্রয় লইতে হয় না, রাশি রাশি কূট-তর্ক-সিদ্ধ গ্রন্থ অভ্যস্থ করিতে হয় না, স্বজাতির উপর বীতশ্রদ্ধা ও স্বধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল সমাজের নেতা হইবার আবশ্যক করে না। ভাই! যদি আপন মঙ্গল চাও, পরলোক ও ঈশ্বরে অনুরাগী হইতে অভিলাষ থাকে, ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে শান্তিলাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-সমাজ ও সমগ্র জীবমণ্ডলীকে আপন সহোদর জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা কর, তবে আত্মধর্ম্মনিরত মনিষীসম্পন্ন মহাত্মার পদাশ্রয়ে আত্ম-জীবন বিক্রয় করিয়া উর্দ্ধলক্ষ্যে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। নতুবা ভাই, তোমার সমস্ত আশা ভরসা, যত্ন অধ্যবসায়, আপাতঃ মধুর প্রেম ও ভালবাসা, বালির বাঁধের ন্যায় অনন্ত অবিদ্যা মহাসাগরের অনন্ত জল রাশির মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে; তাহার স্মৃতি মাত্রও রহিবে না।

রাধারাণী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যুদিগের শ্মশান-কালী-পূজা।

জলে মৃতদেহ ভাসিতেছে! একে বনদেশ, তায় অদূরে শ্মশানক্ষেত্র। সুতরাং তীরে নরমুণ্ড, জলে শবকঙ্কাল। জনপ্রাণীর

সমাগম নাই, চারিদিক নিস্তব্ধতাময়। রাত্রিও প্রায় তৃতীয় প্রহর। মধ্যে মধ্যে শিবাগণই যা'কিছু প্রহরীর কার্য্য করিতেছে; অথবা কোথাও নিভৃত শবকঙ্কাল পাইয়া আপনা-আপনিই শান্তিভঙ্গের কারণ হইতেছে। তদ্ভিন্ন ঝিল্লি!—এত রাত্রি জাগিয়া আপন মনে বকিয়া বকিয়া তাহারও স্বরভঙ্গ হইয়া আসিতেছে। তবে একটী শব্দ আছে,—সেটী সেই কুলকুল ধ্বনি—গাঙ্গিনীর অস্ফুট বাণী। সে বাণী এখন যেন শশব্যস্তে তরু-লতাকে বলিতেছে,—'রক্ষা কর—রক্ষা কর—প্রাণে বাঁচাও।' এতক্ষণ একটী বৃক্ষ তীর হইতে পতিত হইয়া জলমধ্যে নমিত ছিল; সে যেন ঐ অনুরোধ রক্ষার জন্যই বাহু প্রসারণ করিল। তখন, ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া কি যেন কি একটা আজানিত দ্রব্য তরুর আশ্রয় পাইল। জগৎ বুঝিল, প্রকৃতির দয়া এইরূপ নিঃশব্দেই বিতরিত হয়!

যাইহোক, ইহার পরই কিন্তু সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। প্রায় দশ বার জন ষণ্ডাকৃতি কৃষ্ণকায় পুরুষকে মহা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সেই গাঙ্গিনী-তট-অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। তাহাদের দুই জনের হস্তে দুইটি মশাল জ্বলিতেছে; আর, চারি পাঁচ জনের কাহারও হস্তে, কাহারও মস্তকে নানারূপের মোটমাট রহিয়াছে। অপর কএক জন কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; তাহাদের হস্তে তরবারী বা বল্লভ ও পৃষ্ঠে ঢাল ঝুলিতেছে। তীরে পৌঁছিয়াই তাহারা সকলে সমস্বরে তিনবার চিৎকার করিয়া উঠিল,—"জয় কালী মায়ী কি জয়! জয় কালী মায়ী কি জয়! জয় কালী মায়ী কি জয়!" তাহার পর, সকলে অবতরণ করিয়া কেহ বা স্থান-পরিষ্কার, কেহ বা প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা কেহ বা পূজার আয়োজন এইরূপ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কথাবার্ত্তায় ও তাহাদের ভাবে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহারা ডাকাইত; প্রথম রাত্রে তাহারা কোন স্থলে ডাকাতি করিতে গিয়াছিল এবং সে সময় কার্য্যোদ্ধার হইলে ষোড়শোপচারে শ্মশান-কালীর পূজা দিবে, এইরূপ মানস করিয়াছিল। আর, এখন কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়া তাহারা সেই পূজা দিতে বসিয়াছে।

পূজা আরম্ভ হইয়াছে। ঘন ঘন শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিতে স্থান প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দস্যুগণ ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে মহামায়ার অর্চ্চনা করিতেছে। এমন সময় দস্যু-দলপতি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমার প্রতি মহামায়ার প্রত্যাদেশ হইতেছে, দস্যুগণ, তোমরা শীঘ্র যাও। গঙ্গাতীর হইতে একটী শবকঙ্কাল আনয়ণ করিয়া মহামায়ার সম্মুখে এখনই প্রজ্জ্বলিত কর।" সর্দ্দারের আদেশ, তায় মহামায়ার প্রত্যাদেশ কাজেই তিন চারিজন দস্যু একটী মশাল হস্তে শবদেহ অন্বেষণ করিতে ছুটিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শবকঙ্কাল অন্বেষণ করিতে গিয়াই তাহাদের কাণে যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—"বাপসব, তোরা কে?—আমায় রক্ষা কর। প্রাণ যায়—রক্ষা কর।"

এই শুনিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দস্যুগণ চারিদিকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিতে লাগিল। বহু লক্ষ্যের পর শেষে তাহারা দেখিতে পাইল, গঙ্গাজলশায়ী একটী বৃক্ষের উপর একটী অর্দ্ধবস্ত্র নরদেহ যেন শায়িত রহিয়াছে। আর, সেইদিক হইতেই যেন উচ্চারিত হইতেছে,—"বাপ সব, আর বাঁচি না—প্রাণ যায়—রক্ষা কর।" অতপর কাতরোক্তি শুনিয়া দস্যুগণ সেইদিকে আরও লক্ষ্য করিল; বিশেষ করিয়া মশাল ধরিয়া দেখিতে লাগিল, সেটী কি? তাহাতে শেষে স্পষ্টই অনুভূত হইল, সেটী একটী স্ত্রী-দেহ

এইরূপে বৃক্ষবদ্ধ হইয়া কাতোরক্তি করিতেছে। সকলে বুঝিল, কোনরূপে বিপদস্থ হইয়া স্ত্রীলোকটী এইরূপে বৃক্ষাশ্রয় পাইয়াছে এবং এখন প্রাণ-প্রত্যাশায় সকলের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে। যাইহোক, ইহাতে কিন্তু দস্যুদের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। অতঃপর তাহারা অভাগিনীকে রক্ষা করাই স্থির করিল।

ক্রমে দুইজন দস্যু সন্তরণ করিতে করিতে সেই জলমগ্ন বৃক্ষের সমীপে উপনীত হইল। এবং রমণীকে বলিল,—"আয় মা, আমরা তোর সন্তান; তোকে তীরে লইয়া যাই।" এই বলিয়াই পরে তাহারা রমণীকে পৃষ্ঠোপরি স্থাপন করিয়া সন্তরণ-বলে আবার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন, রমণী অতিশয় কাতর; এক প্রকার উত্থান-শক্তি-বিরহিত। যাইহোক, দস্যুগণ কিন্তু ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে অগ্রে দস্যু-দলপতির সম্মুখে লইয়া যাওয়াই যুক্তি-সিদ্ধ জ্ঞান করিল। তদনুযায়ী রমণী ক্রমে সেই পূজা ক্ষেত্রে নীত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যু-গৃহে।

পূজায় আর দস্যুদের মন লইল না। মহামায়ার সম্মুখে শবকঙ্কাল প্রজ্জ্বলিত করা আর ঘটিয়া উঠিল না। এখন, সকলে সেই রমণীর শুশ্রূষাতেই ব্যাপৃত হইল। আরও, সকলেরই জানিবার বাসনা হইতে লাগিল যে, এ রমণী 'কে! কিন্তু তা' আর জানা হইল না। শুশ্রূষা করিতে করিতেই "বাপ আমার! কোথায় তুই" এই বলিতে বলিতেই ক্ষণে ক্ষণে রমণী মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন। সুতরাং রমণীকে লইয়া সে শ্মশানক্ষেত্রে আর বিলম্ব করিতে দস্যুগণের কষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা অতঃপর স্বীয় বনমধ্যস্থ কুটীরে লইয়া পরিবারবর্গের দ্বারা রমণীর শুশ্রূষা করানই স্থির করিল। তদনুযায়ী পূর্ব্বরূপে কএকজন দস্যু রমণীকে লইয়া চলিল এবং অপর সকলেও পূজা-সমাপনান্তে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

অরণ্যের পর বৃহদারণ্য; বৃক্ষের পর বৃক্ষ-শ্রেণী; লতাকুঞ্জের পর লতাকুঞ্জ। এইরূপে বহুদূর অতিক্রম করিয়া বনমধ্যস্থ এক প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দৃষ্টিগোচর গেল। সেই স্তূপ-রাশির উপরে তালপত্রনির্ম্মিত কএকখানি ক্ষুদ্র কুটীর। দূর হইতে কেহই সে কুটীর দেখিতে পায় না। এপর্য্যন্ত পুলিশের লোকেও ঐ বন-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পল্লীর কোনই অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। দস্যুগণ ক্রমে সেই অর্দ্ধ-জ্ঞানহারা রমণীকে লইয়া সেই পল্লীতে প্রবেশ করিল।

দস্যু-দলপতির আবাসস্থান। পল্লীর অন্যান্য গৃহ অপেক্ষা এটী কিছু প্রশস্ত ও বৃহৎ। বাটীর অন্দর-বাহিরও আছে। বাহিরের এক চালাঘরে কতকগুলি লোক শুইয়া রহিয়াছে। তবে সমস্ত রাত্রির মধ্যে তাহারা যে ঘুমায় কি না, তাহার ঠিক নাই। তাহাদেব গুড়ুক টানার শব্দ ও নানারূপ গানগল্পই সর্ব্বদা শুনা যায়। বিশেষ, শেষ রাত্রিতে তাহারা বিশেষ সজাগই থাকে। দস্যুগণ কর্ম্ম সারিয়া আসিলে তাহাদিগের শুশ্রূষা করিবে বা তাহাদের কোনরূপ বিপদের সংবাদ পাইলে তদুদ্ধারের উপায়ন্তর চেষ্টা পাইবে, সম্ভবতঃ এই জন্যই তাহারা বিশেষ উৎকণ্ঠা থাকে। তদ্ভিন্ন, তাহাদের উৎকণ্ঠার আরও এক কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়; দস্যুগণ কিরূপ কি লুণ্ঠন করিয়া আনে ও তাহারা কিরূপ ভাগ পরে, এই বুঝিবার জন্যই তাহাদের প্রধান উৎকণ্ঠা। যাইহোক, ক্রমে দস্যুগণ রমণীকে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল।

দস্যুগণ পৌঁছিতেই অন্দরে সংবাদ গেল, একটী স্ত্রীলোকের শুশ্রূষা আবশ্যক। সংবাদ-

মাত্রেই ভিতর হইতে দুই চারি জন স্ত্রীলোক বাহিরে আসিল ও রমণীকে লইয়া পুনরায় বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। জলে পড়িয়া রমণীর অঙ্গ বিশেষ শীতল হইয়াছিল; সুতরাং রমণীগণ অগ্নিসেক দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে লাগিল। পরে তাহারা আহরিত ফলমূল ও দুগ্ধাদি রমণীকে প্রদান করিতে গেল; কিন্তু রমণী "না, আমার প্রাণ আর কেন বাঁচাইবার চেষ্টা পাও! পতিপুত্র যেখানে, আমাকে সেই খানেই যাওয়া শ্রেয়ঃ আমি আর কিছু—।" "এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে পুনঃ মূর্চ্ছিত হইলেন।

নিত্য-প্রয়োজনীয় বিষয়।

রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্য পরিষ্কার করিবার উপায়।—রূপার অলঙ্কার বাসন ইত্যাদি দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে মর্‌চা ধরিয়া বিবর্ণ হইয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্য ভালরূপ পরিষ্কার করা নিতান্ত সহজ নহে। নিম্নে যে দুইটি উপায় লিখিত হইল, তাহার যে কোনটী দ্বারা পরিষ্কার করিলে ঐ সকল পুরাতন দ্রব্য পুনরায় নূতনের ন্যায় উজ্জ্বল ও দেখিতে সুন্দর হইবে। প্রথম উপায়।—পরিষ্কার চা-খড়ি এক পুয়া, টারপিন তৈল এক ছটাক, খাঁটি সুরা আধ ছটাক, কর্পূরের স্পিরিট এক কাঁচ্চা, লাইকর এমোনিয়া এক কাঁচ্চা; এই-গুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া শিশির মধ্যে ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। যখন কোন পুরাতন রূপার জিনিষ পরিষ্কার করিতে হইবে, তখন এই আরক অল্প পরিমাণে, তুলি বা স্পঞ্জ করিয়া ঐ সকল জিনিষের উপর লাগাইবে। শুষ্ক হইলে পর, ব্রস বা মোটা কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। দ্বিতীয় উপায়।—সায়ানাইড অব পটাসিয়ম (Cyanide of Potasium) দেড় পুয়া পরিমাণ লইয়া তিন পুয়া জলে মিশ্রিত করিবে। এই আরকে পুরাতন রূপার জিনিষ ডুবাইয়া মোটা ব্রস বা খুঁচি দিয়া পরিষ্কার করিবে। পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া শুখাইয়া লইবে। তখন দেখিতে ঠিক নূতন রূপার জিনিষের ন্যায় হইবে। এই সকল দ্রব্য বড় বড় ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্যও অধিক নহে। এই সকল উপায় দ্বারা পুরাতন রূপার জিনিস পরিস্কার করিয়া রূপার অলঙ্কার বিক্রেতারা সহজে পুরাতন দ্রব্য নূতনের মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন এবং গৃহস্থেরাও আবশ্যক মত পুরাতন রূপার অলঙ্কারাদি উক্ত উপায়ে পরিস্কার করায় নূতনের ন্যায় ব্যবহার করিতে পরেন।

মার্ব্বল-নির্ম্মিত দ্রব্য পরিষ্কার করিবার উপায়।— মার্ব্বল পাথরের মেজে, মার্ব্বল পাথরের টেবেল, ও অন্যান্য দ্রব্য তৈল, ধুনা বা ময়লা লাগিয়া সর্ব্বদা অপরিষ্কার হইয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্য পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমতঃ খানিকটা জলে অধিক পরিমাণ সাবান গুলিয়া তাহার সহিত খানিক কলি চুণ মিশ্রিত করিবে। যখন দেখিতে ঠিক দুধের ন্যায় হইবে, তখন উহা ঐ সকল মার্ব্বল নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর ২৪ ঘণ্টা কাল মাখাইয়া রাখিবে। পরে সাবান ও জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। শুখাইলে দেখিতে ঠিক নূতন মার্ব্বলের ন্যায় রং হইবে। আরও উজ্জ্বল ও মসৃণ করিতে হইলে অক্সাইড অব্ টিন (Oxide of Tin) এবং সুইট অএল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা কিছুক্ষণ ঘসিতে হইবে। অক্সাইড অব্ টিন ও সুইট অএল ডাক্তারখানায় ও কলিকাতার চিনে বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়।

মার্ব্বল-নির্ম্মিত দ্রব্যের দাগ তুলিবার উপায়।—মার্ব্বল-নির্ম্মিত টেবেল ও অন্যান্য দ্রব্যের

উপর কোন প্রকার দাগ পড়িলে সহজে তোলা যায় না। নিম্নলিখিত উপায়ে ঐ সকল দাগ অতি সহজে তোলা যায়। (১) দুই ভাগ সোডা, এক ভাগ পিউমিস্ ষ্টোন চূর্ণ এবং এক ভাগ চা-খড়ি চূর্ণ। পিউমিস ষ্টোন স্পঞ্জের এক ন্যায় প্রকার হাল্‌কা পাথর; ইহা কলিকাতায় কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার অভাবে আমাদের দেশের বেলে পাথর দিলেও চলিতে পারে। প্রথমতঃ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম চালনি বা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। পরে আবশ্যক মত জলে গুলিয়া ঐ সকল দাগের উপর উত্তমরূপে ঘসিতে থাকিবে। মোটা ব্রস বা খুঁচি দিয়া পরিষ্কার করিবে। কিছুক্ষণ ঘসিলেই ঐ সকল দাগ সহজে উঠিয়া যাইবে। তখন সাবান ও জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। শুকাইলে পর দেখিতে অতি সুন্দর ও মসৃণ হইবে এবং দাগের কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না। (২) প্রথমতঃ জলমিশ্রিত লবণদ্রাবক (Acid Hydrochloric dil) কিম্বা সাবান ও ভিনিগার গরম করিয়া তাহা দ্বারা ঐ সকল দাগ পরিষ্কার করিবে। পরে ৵৩ সের জল গরম করিয়া তাহাতে তিন পুয়া পরিমাণ সাজ্জিমাটি গুলিবে এবং উহার সহিত আধ সের মোম মিশ্রিত করিয়া আধ ঘণ্টাকাল জ্বাল দিবে। ঠাণ্ডা হইলে মোম উপরে ভাসিতে থাকিবে। ঐ মোম তুলিয়া পাথরের খলে অল্প অল্প জল দিয়া মাড়িতে থাকিবে। যখন ঘন ক্ষীরের মত হইবে তখন উহার খানিকটা লইয়া ঐ সকল দাগের উপর কিছুক্ষণ লাগাইয়া রাখিবে। শুষ্ক হইলে ফ্ল্যানেল বা অন্য কোন পশমী কাপড় দ্বারা ঘসিতে হইবে। ঘসা শেষ হইলে ঐ মার্ব্বল দেখিতে ঠিক নূতনের ন্যায় চক্‌চকে হইবে এবং ঐ সকল দাগের কোন চিহ্ন থাকিবে না।—শি কৃ প।

কাচ বা চীনার বাসন জুড়িবার উপায়।—(১) শামুকের খোলা আগুণে পুড়াইলে যখন লাল হইবে, তখন তাহা তুলিয়া লইবে এবং উহার কাল অংশ পরিত্যাগ করিবে। এখন এই লাল অংশ উত্তমরূপে খিচশূন্যভাবে গুঁড়া কর। এদিকে গুঁড়ার পরিমাণ বুঝিয়া ডিমের শ্বেতাংশ সংগ্রহ কর। এই শ্বেতাংশের সহিত শম্বুকচূর্ণ উত্তমরূপে মাড়িয়া লও। ইহাতে যে আঠা হইবে, তদ্দ্বারা চীনাবাসন কিম্বা কাচপাত্র জুড়িলে তাহা দৃঢ়রূপে আঁটিয়া যাইবে। (২) ভাল বোতলচূর্ণ ডিম্বের সহিত মাড়িয়া চীনাবাসন জুড়িলে আর খুলিয়া যাইবে না। (৩) শিরিষ জ্বাল দেওয়া ঘন জল আট ভাগ এবং তার্পিণ কিম্বা মসিনার তৈলের বার্ণিস এক ভাগ একসঙ্গে মিশাইয়া আগুণে ফুটাইবে। ফুটিবার সময় ঘন ঘন কাটির দ্বারা নাড়িতে থাকিবে! গাঢ় হইলেই নামাইয়া লইবে। এই আঠা জোড়মুখে লাগাইয়া আঁটিয়া দিবে। আটচল্লিশ ঘণ্টা উহা আর নাড়িবে না। কাচ ও চীনার বাসন প্রভৃতি আঁটিবার পক্ষে ইহা অতি উত্তম উপায়। (৪) দুই ভাগ নিষাদল এবং চারি ভাগ গন্ধক একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া অল্প জলে মাখিয়া শক্ত গোছের ঢেলা করিয়া রাখিবে। যখন কোন পাত্রাদি জুড়িবার প্রয়োজন হইবে, তখন ঐ দ্রব্যাদি অম্ল (লেবু কিম্বা তেঁতুল মিশ্রিত) জলে গুলিয়া লৌহার গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা কোন পাত্রাদি জুড়িলে পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিবে। সঃ।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

সুরাপান।—আশাদলের জনৈক সভ্য প্রণীত। এইপুস্তকখানির উদ্দেশ্য ভাল,সংক্ষেপতঃ মাদক-সেবনের অপকারিতা দেখাইয়া লোককে মাদক-সেবনে বিরত করা। সুরাপানে ক্ষতি, ক্ষতির হিসাব ও দৃষ্টান্ত,সুরাপান-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদির তালিকা, সুরাপান নিবারণের বিবিধ উপায় প্রভৃতি ইহাতে লিখিত আছে। পুস্তকখানির সকল অংশ সরস বা কাজের কথায় পূর্ণ তাহা বলি না ; তবে এরূপ পুস্তক প্রকাশ অবশ্যই কর্ত্তব্য বটে। বিশেষ, সুরাপান নিবারণ প্রস্তাবের মধ্যে ১৪৯ পৃষ্ঠার ১৮শ উপায় হইতে ১৫৩ পৃষ্ঠার ৩০ উপায় প্রভৃতি রূপ অংশ বিশেষ আবশ্যকীয় বটে। শেষ কথা, পুস্তকখানির অন্ততঃ প্রচারের জন্যও,মূল্য কিছু কম করিলে ভাল হইত।

শাস্ত্র প্রকাশ ও মহাভারত।—বঙ্গবাসী আপিস হইতে প্রকাশিত শাস্ত্র-প্রকাশ শেষ হইয়া আসিল ; অধ্যক্ষগণ এখন আবার মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। কএক বর্ষ পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে যে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছিল, বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ সমস্ত বজায় রাখিয়া সেই মহাভারত প্রকাশ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। অধ্যক্ষগণ বলেন,—"এই বঙ্গানুবাদ এত বৃহৎ যে, ডিমাই ৮ পেজী ফর্ম্মার প্রায় ৮০০০ আট হাজার পাত হয়। মূল্য ২৫৲ টাকা করিলেও তাহা অধিক হইতে পারে না।" একথা প্রকৃতই বটে। স্বর্গীয় ৺কালী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মহাভারতের অনুবাদ করাইয়া স্বর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন ; আর, বর্দ্ধমানের রাজসংসার বলিয়াই তথা হইতে প্রস্তাবিত মহাভারত প্রকাশ হইয়াছিল। সুতরাং এহেন বৃহদ্ব্যপা… হাত দেওয়া অবশ্যই অধ্যক্ষগণের গৌরবে… কথা। বিশেষ, ৫৷৹ স'পাঁচ টাকা মাত্র লইয়া… প্রকাণ্ড গ্রন্থ উহাঁরা প্রদান করিবেন, এও … সাহসের কথা নহে। যাইহোক, আম া ঈশ্বরে… নিকট প্রার্থনা করি,শাস্ত্র-প্রকাশের ন্যায় নির্দ্দি… সময়েই উহাঁরা মহাভারত-প্রকাশে কৃতকা… হউন।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

আর্য্য নাট্য-সমাজ।—সম্প্রতি, উ… সমাজ সেক্ষপীয়রের কমেডি অব্ এররস্… "Comedy of Errors এর" অনুবাদ, 'বিদ্যা… সাগর মহাশয়ের "ভ্রান্তি-বিলাস" নাটকাকা… গ্রথিত করিয়া অভিনয় করিতেছেন। অভি… দর্শনে দর্শকবৃন্দের ঘন ঘন করতালি ও উ… হাস্যে রঙ্গগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়াছি… আর,প্রকৃত হাস্যরসোদ্দীপক নাটকের অভি… দেখিয়া আমরাও অনেক দিন এরূপ বি… আনন্দ উপভোগ করি নাই। প্রথম অভি… যে একটু আধটু ক্রটী হইয়াছিল, তাহ… ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তবে নাটক-সম্ব… দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। বিজাতীয়… বিধর্ম্মীয় আচার ব্যবহার, আমাদের দে… আচার ব্যবহার হইতে অনেকাংশে ভি… আমাদের বিবেচনায়, উপস্থিত নাটকক… সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ছি… আর, সেই জন্যই শেষ মিলন-দৃশ্যটি… কেমন কেমন হইয়াছে।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—এক একখানি ন… নাটক খুলিয়া বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি আজকাল … হইতে বেশ বাহাদুরী লইতেছেন। প্রহ্ল… প্রভাস, নন্দ-বিদায় তিন খানিই ইহাঁ… গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতেছে।

———o———

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বিনামূল্যে 'মৃণালিণীর' লোভানি।

'সমীরণ'-পত্রে 'বিনামূল্যে মৃণালিণী" দানের এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। ৶৹ তিন আনা ডাকমাশুল সহ পত্র লিখিলে 'মৃণালিণী' পাওয়া যাইবে, এই সে বিজ্ঞাপনের কথা। বিজ্ঞাপন দেখিয়া বঙ্কিম বাবুর 'মৃণালিণী' কেবলমাত্র ডাকব্যয় দিয়া পাইব, এই ভাবিয়া অনেকেই প্রতারিত হইতে পারেন। কিন্তু সাধারণে সাবধান যে, বঙ্কিম বাবুর পুস্তক বিতরিত হইবার জিনিস নহে। আর সকলের স্মরণ থাকে যেন, বিজ্ঞাপনটী জে, এন, শর্ম্মা অন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া—এই প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বাহির হইতেছে। 'আন্দুলবেড়িয়ায়' এ কি হইতে চলিল! চুয়াডাঙ্গর পুলিসের অতঃপর ও-দিকে দৃষ্টি পড়ে, এই আমাদের বাসনা।

বিজলী-সম্পাদকের আর এক লীলা।

বিজলীর সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের কীর্ত্তি কাহিনীর কথা আর প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়। সম্প্রতি আবার ১০৮।১ মেছুয়াবাজার রোড, ঠনঠনে, কলিকাতা ঠিকানা হইতে 'রায় এণ্ড কোং' নামে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। যে বিজ্ঞাপনটি ইতিপূর্ব্বে 'দে এণ্ড কোম্পানী'* নাম দিয়া বাহির হইয়াছিল,এটিও ঠিক সেই বিজ্ঞাপন। কেবল দে-কোম্পানীর গূঢ় রহস্য সমিতি হইতে সাধারণে প্রতারিত হওয়ায়, তৎস্থলে রায় এণ্ড কোং হইয়াছে। কার্য্যলয়ের ঠিকানা, পূর্ব্ববৎই সেই পূর্ণ গুপ্তের বাসা ; দোকানের চিহ্নও সেই আধা-খোলা আধা-ইট নির্ম্মিত বাড়ী। যাইহোক, সাধারণে এখনও বুঝিয়া চলেন, এই বাসনা। বিজ্ঞাপন সুলভ সমাচার, রঙ্গপুর-দিকপ্রকাশ ও মুর্শিদাবাদ পত্রিকা প্রভৃতিতে বাহির হইতেছে।†

বাবু প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় ১৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে বঙ্গবাসীতে বিজ্ঞাপন দেন যে,'সংসার দর্পণ' নামক মাসিক পত্রিকার যাঁহারা শ্রাবণ মাস হইতে গ্রাহক হইবেন, ২৷৶৹ দিলে তাঁহাদিগকে বিনা মূল্যে এক বৎসর কাল সংসারদর্পণ দিব। আর, 'হরিদাসের গুপ্তকথা'-প্রণেতা ভুবন বাবুর ভারতী, অদ্ভুত গুপ্তকথা, যোগিনী-জীবন উপন্যাস, পীযূষ-ভাণ্ডার ও হরিসাধন প্রভৃতি ৮৶৹ আনার পুস্তক উপহার দিব। পুস্তকগুলির পাতার সংখ্যা মোট ১৩০০ শত পৃষ্ঠা। এইত বিজ্ঞাপনের কথা। কিন্তু এক ব্যক্তি ঐ আশায় গ্রাহক হইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—"আমাকে কলির ভূষণ্ডী, সম্ভোগরত্ন, নারীদেহতত্ত্ব, হতভস্ম, পশ্চিমে বাঙ্গালী ও জীবনসহচরী নামক ৬ খানি পুস্তক পাঠাইয়াছেন। কোথায় ১৩০০ পৃষ্ঠা ভুবন বাবু প্রভৃতির পুস্তক পাইব ; না প্রসাদ বাবুর বন্ধুবর্গের হতভস্ম প্রভৃতি মোট ৪৩০ কি ৪০ পৃষ্ঠার এই ছাইভস্ম পাইলাম।" প্রসাদের কাণ্ডকারখানার কথা পূর্ব্বেও কএকবার জানান গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি লোকে তাঁহাকে চিনিলেন না, এই ক্ষোভ। যাহা হউক, প্রসাদ বাবুর শুভ কামনা করিয়া এখনও আমরা বলি, তিনি গ্রাহকদিগকে যে কোনরূপে তুষ্ট করুন ; নতুবা এখনও যখন তাঁহাকে বিজ্ঞাপন দিয়া পুস্তক বেচিতে হয়, তখন ক্রমে এ সকল কথা রাষ্ট্র হইলে, সে ব্যবসায়েরই যে ক্ষতি হইবে!

পূজার বাজারে সাবধান।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে অনেক মফঃসলবাসী কলিকাতায় আসেন। সুযোগ বুঝিয়া এ সময় জুয়াচোরগণও তাঁহাদিগকে নানারূপে ঠকাইয়া থাকে। রাস্তার সোনা কুড়াইয়া পাওয়া, গাঁটকাটা, দালাল হইয়া জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে যাওয়া প্রভৃতি নানারূপের প্রতারণাই এ সময় ঘটিয়া থাকে। জিনিসের ভেলের তো কথাই নাই ; এক জিনিস বলিয়া আর এক জিনিস দেওয়া এত সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আরও নানারূপের জুয়াচুরী আছে ; সময়ান্তরে আমরাও তাহা সাধারণকে জানাইতে চেষ্টা পাইব।

---

* প্রথম বর্ষের ২২শ সংখ্যা অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য।

† এ প্রস্তাব লেখার পরই, এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল যে, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ সম্প্রতি ফৌজদারী-সোপরদ্দ হইয়াছেন। মকর্দ্দমা বিচারাধীন ; সুতরাং আমরা আপাততঃ আর কিছু বলিতে চাহি না।

গ্রাহকগণের দৌরাত্ম্য।

মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেডিক্যাল ডিস্পেন্সারী, নাজিরাট পোঃ, যশোহর, এই ঠিকানা হইতে 'অনুসন্ধানের' গ্রাহক হইতে চাহিয়া এক পত্র আসে। পত্রে এরূপও লেখা থাকে যে, দুই চারি সংখ্যা কাগজ নমুনা-স্বরূপ পাঠাইলে সেখানে বিস্তর গ্রাহক হইতে পারে। তা'ছাড়া, পত্র-প্রেরক পত্রে স্বীয় ভদ্রতারও বিস্তর পরিচয় দেন। তদনুসারে প্রথম দুই চারি বার পুস্তক ও পত্র পাঠাইলে কোন গোলই হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে,যেই টাকার তাগাদা হইল—টাকা আদায়ের জন্য ভ্যালুডাকে পুস্তক গেল, আর অমনি "এ এলাকার ঐনামের কোন লোক নাই"ডাক-পিওনের এইরূপ মন্তব্য-সহ প্যাকেট ফেরত আসিল। এক ভূপেন্দ্র নহে; অগ্রিম মূল্য ভিন্ন পত্র না দেওয়ায় মফঃস্বল হইতে মধ্যে মধ্যেই আমাদিগকে এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তবে অন্য সম্পাদকগণ বর্ষ যাবৎ কাগজ যোগাইয়া শেষে এই দশা প্রাপ্ত হন; কিন্তু কঠোর নিয়ম-হেতু আমাদিগকে আর ততদূর যাইতে হয় না। সম্প্রতি সহযোগী সুলভ, সময় ও শ্রীমন্ত এই বিষয় হইয়া বড়ই দুঃখ করিয়াছেন। যাইহোক, সম্পাদকগণ এখনও সকলে এক হইয়া ইহার কোন প্রতিকারের উপায় করেন, এই আমাদের ইচ্ছা।

সংবাদ।

—এক অন্ধ চসমার দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। **কিন্তু হঠাৎ এক দিন** তাঁহার বাড়ীর নিকট বজ্রপাত **হওয়াতে, চসমার** কাচে বজ্রের জ্যোতি পড়ায় তিনি **দৃষ্টিশক্তি** পাইয়াছেন। এরূপ অদ্ভুদ ঘটনা আর কখন **শুনা** যায় নাই।

—ষ্টেসনের বিশ্রাম-ঘরে কএকটী ভদ্র লোক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নিকট একটী টাকার **তোড়া ছিল;** বেঞ্চের উপর তোড়াটী রাখিয়া তিনি তৎপার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। এমন সময় অপর একটী ভদ্র লোকের পকেট ছিঁড়িয়া যেন টাকা, দুয়ানি ও সিকি প্রভৃতি কতকগুলি কি পড়িয়া গেল। সুতরাং উপস্থিত সকল লোকেরই সেই দিকেই দৃষ্টি পড়িল এবং যাঁহার পার্শ্বে টাকার তোড়া ছিল, তিনিও তাহা দেখিতে উঠিলেন। ইত্যবসরে যে লোকটীর পকেট ছেঁড়ার ভাব প্রকাশ পাইল, তিনি সকলের অলক্ষিতে সেই বাবুটীর টাকার তোড়াটী লইয়া চম্পট দিলেন। তারপর, সকলে তো অবাক; জুয়াচোরের সন্ধানও মিলিল না।

—চিকাগো সহরে সম্প্রতি এক জুয়াচোর ধৃত হইয়াছে। এ ব্যক্তি আপনাকে উচ্চ বংশজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া বিবাহ করিত এবং বিবাহান্তে দু'পাঁচ দিন মেশা মিশির পরই পত্নীর যাবতীয় অলঙ্কারাদি চুরী করিয়া তথা হইতে চম্পট দিত। এইরূপে ২৩টী বিবাহ করিয়া, সকলকেই এ ব্যক্তি ঠকাইয়াছিল। এক স্ত্রী অন্য বিবাহের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পায় নাই। কিন্তু ধরা পড়ায় এখন সকল বাহির হইতে চলিল।

—পত্নীকে শ্বাশুড়ী কি দোষে ঘা'কতক মারিয়াছিলেন; সেই শোকে ভাগলপুরের একজন যুবক গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছেন!

—অষ্ট্রেলিয়ার একজন পাদরীর ঘোটকের নাম ছিল, 'বিশপ'। একদিন পাদরী সাহেব তাঁহার উর্দ্ধতন ধর্ম্মযাজক বিশপের সহিত আহারে বসিয়া নানারূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার সহিস আসিয়া বলিল,—"আজ বড় গরম; কলসী দুই জল দিয়া 'বিশপের' গা ধুইয়া দিব!" সহিসের কথায় ধর্ম্ম-যাজক বিশপের তো চক্ষুস্থির!

—আগ্রা-ব্যাঙ্কে সে দিন এক ব্যক্তি ১৫ হাজার টাকার একখানি চেক ভাঙ্গাইতে যান ও চেক দিয়া টাকা লইতে একটু বিলম্ব বুঝিয়া, মিনিট কএক মাত্র একবার বাহিরে আসেন। এমন সময় চেকের টাকা দিবার ডাক হইলে অপর এক ব্যক্তি পূর্ব্বরূপ পরিচয় দিয়া, টাকা লইয়া সটান হয়। সুতরাং ক্ষণপরেই টাকা লইতে গিয়া তিনি তো হতভম্ব!

—তীব্বত-ইংরাজের যুদ্ধ ক্রমেই গুরুতর হইতে চলিল। সম্প্রতি তীব্বতীয়গণ ১৩,৫০০ সৈন্য লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে। শীঘ্রই ইংরাজ-দুর্গ আক্রমণ করিবার সংকল্প আছে। ইংরাজেরাও যে প্রস্তুত হইতেছেন না, এমন নহে। এ পক্ষেরও তদনুরূপ যোগাড়যন্ত্র হইতেছে। মধ্যে একদিন "এই তীব্বতীয়গণ দার্জ্জিলিঙ্গ আক্রমণ করিল' এই এক গুজব উঠে এবং অনেক ইংরাজ ভয়ে দার্জ্জিলিঙ্গ ত্যাগ করেন। যাইহোক, বিবাদ ক্রমে বাড়িল, এই ক্ষোভ!

—চট্টল-গেজেট সম্পাদকের কারাদণ্ড হওয়ায় আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় 'বঙ্গবাসীর প্রতি নিবেদন' শীর্ষক যে আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, তাহা পড়িলে বাস্তবিকই অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ন্যায় ও সত্য রক্ষার জন্য সৎসাহসে কার্য্যে করিতে থাকিলে অনেক সময়ই এইরূপে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যাইহোক, 'চট্টল-গেজেট' বিপদে পড়িয়া অর্থাভাবে এখন জীবনলীলা শেষ না করেন, এজন্য দেশের কোন ধনী লোকের একবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। নতুবা দেশের এ কলঙ্ক আর রাখিবার স্থান থাকিবে না।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩১এ ভাদ্র, ১২৯৫ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

গান।

অমল ধবল কমল কোলে
অমল ধবল কমল দোলে
উজল বিমল আঁচল ঝোলে
উজল বিমল কর নিকলে।
পরিমলাকুল কাল অলিকুল
খেলয়ে দুলা'য়ে এ ফুল ও ফুল
অনিল চলয়ে মৃদুল মৃদুল
দোলে ফুলমালা বাণীর গলে।
জল ঢল ঢল করে অবিরল
শতদল দল করে টলমল
সচল অনিলে সলিল অচল
সচল চঞ্চলে হেলে হিলোলে;
বরষের পরে হরসের ভরে
ও চরণ ধরি' এ শির উপরে
ভাঙ্গা বীণা পুন লইনু এ করে
বাজা'তে ও রাঙা চরণ-তলে॥

চোরের তত্ত্ব লওয়া। ✓

কৃষ্ণবল্লভ বাবু দরজার পার্শ্বে বসিয়া তামাকু হুঁকিতেছেন, আর শ্যামা খানসামাকে বাজারের পয়সা দিতেছেন। এমন সময় ডাক-পিওন আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পোষ্ট-কার্ড প্রদান করিল। সুতরাং বাবু বাজারের পয়সা দেওয়া একটু স্থগিত রাখিয়া বাটীর ভিতর হইতে শ্যামাকে চসমাখানি আনিতে বলিলেন। পরে চসমা আনা হইলে পড়িতে লাগিলেন,—"সবিনয় নিবেদন, বৈবাহিক মহাশয়! শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে ও শ্রীমান জামাতা বাবাজীকে দেখিয়া আসিবার জন্য আগামী কল্য গরলা ঝিকে মহাশয়ের কলিকাতার বাটীতে পাঠান যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে জামাতা বাবাজীর শরীর কিছু অসুস্থ শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখানকারও অবস্থা ভাল না থাকায় স্বয়ং যাইতে পারিলাম না। তবে ঝি একবার দেখিয়া আসিলে তার পর পূজার কাছাকাছি নাগাইদ যাইব, স্থির করিয়াছি। অদ্য গরলার মারফং যৎকিঞ্চিৎ পূজার তত্ত্বাদি পাঠান যাইতেছে। যৎকিঞ্চিৎ হইলেও,অনুগ্রহ করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন। অত্রস্থ মঙ্গল; ঈশ্বর-সমীপে আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি ২৮এ ভাদ্র। লিখিতং শ্রীরামসেবক শর্ম্মণঃ।

পুনশ্চ, গরলা তত চালাক চতুর নহে; আর কলিকাতায়ও পূর্ব্বে কখনও যায় নাই। সুতরাং তাহাকে রাস্তাঘাট দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।"

পত্রখানি পড়িয়া কৃষ্ণবল্লভ বাবু বুঝিলেন, সম্ভবতঃ সন্ধ্যার ট্রেণেই গরলা ঝি পূজার তত্ত্ব লইয়া আসিতেছে। সুতরাং তিনি উঠিয়া

বাটীর ভিতর গিন্নি ঠাকুরাণীকে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বধুমাতাকে সংবাদ দিতে গমন করিলেন।

সংবাদ পাইয়া বধুমাতার তো আর আনন্দের সীমা রহিল না। যদিও গরলা ঝিকে তিনি কখনও দেখেন নাই, তথাপি গরলা নাম্নী এক নূতন বিশ্বাসী ঝি যে তাঁহার পিতৃগৃহে বর্ষযাবৎ নিযুক্ত হইয়াছে, এ সংবাদ পূর্ব্বেই এক পত্র দ্বারা পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া কতই মনের কথা বলিবেন, কতই সুখ-দুঃখের কথা কহিবেন, তাহাই স্থির করিতে লাগিলেন। বিশেষ, আজ কএক দিন হইতে তাঁহার স্বামীও মাতুলালয়ে গমন করিয়াছেন; সুতরাং একরূপ তিনি সমস্ত রাত্রিই নির্জ্জনে গরলার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, স্থির করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শিয়ালদহের ষ্টেষনে ট্রেণ আসার শব্দ শুনা গেল। গরলা ঝি তত চালাক-চতুর নহে ও সে কলিকাতার রাস্তাঘাট চেনে না;—এই পত্র পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণবল্লভ বাবু তাঁহার শ্যামা খানসামাকে ষ্টেষনে পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং ট্রেণ আসার সে এখন গরলার তল্লাযে ষ্টেষনের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। গত রথযাত্রার উপলক্ষে তত্ত্ব লইয়া গিয়া, সেদিন সন্ধ্যার সময় শ্যামা গরলাকে দেখিয়া আসিয়াছিল; কাজেই তাহার কতকটা ভরসা ছিল যে, সে গরলাকে চিনিয়া লইবে। কিন্তু তাহাকে আর বড় চিনিবার কষ্ট পাইতে হইল না। ট্রেণ হইতে নামিয়া গরলা নিজেই শ্যামার নিকট আসিয়া বলিল,—"কি হে শ্যামসুন্দর যে! আমাকে এগিয়ে নিতে এয়েছ নাকি!"

চাকরী করিতে আসিয়া অবধি অনেক দিন হইতে শ্যামা 'শ্যামসুন্দর' নাম শুনিতে পায় নাই। এখন গরলার মধুর কণ্ঠে সে নাম শুনিয়া শ্যামা পরিতৃপ্ত হইল। বিশেষ, গরলার সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ, হাসিমাখা মুখখানি দেখিয়া সে যেন গলিয়া গেল। তাহার মনে আর কোন ভাবেরই উদয় হইল না। তবে সে একবারমাত্র কেবল পরিহাস-ছলে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও, গরলা! এস—এস! তোমাকে আমি চিনিতেই পারছিলেম না। তুমি এই ক'দিনের মধ্যেই দেখচি যে, বেস মুটিয়ে উঠেছ।"

গরলা।—"তা' ভাই, আর চিন্‌তে পারবে কেন? আর কি আমার সে কাল আছে যে, তোমরা আমায় চিনে নেবে! এখন আমিই তোমাদের চিন্‌তে ব্যস্ত।"

শ্যামা তো হাতে স্বর্গ পাইল। সে গরলাকে সঙ্গে করিয়া বিশেষ যত্নের সহিত বাড়ীতে লইয়া গেল। যা'বার সময় রাস্তায়ও তাহাদিগের কত কি কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। তবে সে সকল কথা আমরাও আজিপর্য্যন্ত শুনিতে পাই নাই; সুতরাং পাঠককেও শুনাইতে পারিলাম না।

শ্যামা-গরলা ক্রমে বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিল। বাড়ীর সকলেই গরলাকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। শ্যামাও গরলাকে যত্ন করিবার জন্য বাড়ীর সকলকেই নানারূপ অনুরোধ করিতে লাগিল; বলিল,—"রথের সময় আমি তত্ত্ব লইয়া যাইলে, গরলা আমার বড়ই যত্ন করিয়াছিল। সুতরাং গরলাকেও আপনারা বিশেষ খুসী করিবেন।" কাজেই গরলার আর আদর দেখে কে! বিশেষ, তত্ত্বের দ্রব্যাদিও এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং ইস্তক কর্ত্তা-গিন্নি হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর চাকর-বাকর পর্য্যন্ত সকলেই গরলাকে আদর করিতে লাগিল।

* * *

এতক্ষণ বধুমাতার সহিত গরলার বিশেষ কোন আলাপাদি হয় নাই। সুতরাং আহারাদির পর আপন গৃহে লইয়া গিয়া তিনি একবার গরলার সহিত মনের কথা কহিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তদনুযায়ী বধুমাতার ঘরে শয়ন করাই গরলার স্থির হইল। পরে গরলা শুইতে যাইলে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। বাড়ীর কুশল-অকুশলের কথা, সুখদুঃখের কথা এক এক করিয়া ক্রমে সকল কথাই হইল। বধুমাতা গরলাকে পাইয়া যেন স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। বিশেষ, কি তাহার সুমধুর স্বর, কি তাহার সুকোমল অঙ্গভঙ্গি, কি তাহার সুচারু চাহনী! সকলই বধুমাতাকে আত্মভোলা করিল। ক্রমে তিনি গরলাকে আরও সকল প্রাণের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। গরলার প্রশ্নোত্তরে ক্রমে বলিতে লাগিলেন, তাঁহার এ পর্য্যন্ত কি কি গহনা-পত্র হইয়াছে, সে সব কোথায় থাকে, কিরূপে থাকে! অধিক কি, বাক্স খুলিয়া ক্রমে সে সকল গরলাকে দেখাইতেও লাগিলেন। ফলতঃ গরলা যেন তাঁহার প্রাণে মিশিয়া বসিল।

গরলার সহিত এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ক্রমে রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়া আসিল। তখন হাই তুলিতে তুলিতে বিশেষ ঘুমঘোর প্রকাশ করিয়া গরলা কহিল,—"বড় ঘুম পাইতেছে; এস, এখন ঘুমান যাউক। কাল আবার কথাবার্ত্তা কহা যাইবে।" কাজেই বধুমাতাকেও শুইতে হইল। কিন্তু বধুমাতার তখনও ঘুম আসিল না। তিনি তখনও শুইয়া শুইয়া 'গ্রামের এ কেমন আছে—সে কেমন আছে' এই ভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গরলা আর কথা কহা ভাল বোধ করিল না। বধুমাতার আগেই সে যেন বেস্ একটু ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন—বধুমাতা গাঢ় নিদ্রায় যখন অভিভূত হইলেন—তখন, গরলার জাল নিদ্রা ভাঙ্গিল। সে উঠিল। উঠিয়াই, বধুমাতা যেখানে গহনার বাক্সের চাবি রাখিয়াছিলেন সেখান হইতে ধীরে ধীরে সে চাবি গ্রহণ করিল। চাবি লইয়া ধীরে ধীরে গহনার বাক্স খুলিল; বাক্স খুলিয়া ধীরে ধীরে এক এক করিয়া বাড়ীর সকল দরজাগুলি খুলিল। দরজা খুলিয়া ক্রমে ক্রমে বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া তারপর যে সে কোন্ দিকে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার আর সন্ধান হইল না। তবে এ বিষয় লইয়া শেষে যখন পুলিস পর্য্যন্ত টানাটানি হইয়াছিল, তখন নাকি একজন পাহারওয়ালা সাক্ষী দিয়াছিল যে, শেষরাত্রে বাটীর একটী পুরুষ ভোরের ট্রেণে পশ্চিম যাইবেন বলিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া আনিয়াছিলেন; ও পরে ঐ বাড়ীর একটী স্ত্রীলোককে লইয়া ষ্টেষনের দিকেই গমন করিলেন।

যাইহোক, পরদিন প্রাতে কৃষ্ণবল্লভ বাবুর বাটীতে তো মহা-হুলস্থূল! চারিদিকে লোক ছুটিতেছে, পুলিসে পুলিসে সংবাদ যাইতেছে। এদিকে বৈবাহিক বাটীতেও টেলিগ্রাম গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে লোকও ছুটিয়াছে। ফলতঃ বিষম বিভ্রাট!—গরলা-বেশী রাক্ষসী প্রায় সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ণ করিয়াছে! কিন্তু তার আর কি হইবে! ক্রমে সন্ধানে জানাগেল, সে স্ত্রীলোকের এক বাক্যও সত্য নহে। সে বৈবাহিক বাটীর গরলা নহে—তাহাকে তত্ত্ব দিয়াও বৈবাহিক মহাশয় কলিকাতায় প্রেরণ করেন নাই। অধিকন্তু কৃষ্ণবল্লভ বাবুর নিকট যে পোষ্টকার্ড আসিয়াছিল, তাহাও সেখান হইতে আসে নাই। তাহার সকলই জাল! গরলার সকলই জুয়াচুরী!

ভক্তি ও ভক্ত।

সাত্বিক গুণসমূহের মধ্যে ভক্তি একটি অমূল্য বস্তু। জন্ম জন্মান্তরীয় বহু পুণ্যের ফলে মানুষ এ অপার্থিব ধনের অধিকারী হয়। লৌকিক জগতে ইহার আদর নাই, মানবসমাজ ইহার মর্য্যাদা বুঝে না। ইহার

মর্য্যাদা, ইহার আদর, ইহার অনন্ত-সৌন্দর্য্য সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য, জ্ঞানের অতীত, বিচার শক্তিরও বহির্ভূত। ভক্তির অলৌকিক মাহাত্ম্য ভক্ত ব্যতীত কে বুঝিবে—কে জানিবে—কে মীমাংসা করিবে! ইহার জাতি ও বর্ণগত পার্থক্য নাই, সুন্দর বা কুৎসিতের ভেদাভেদ নাই, পণ্ডিত বা মুর্খের ইতর-বিশেষ নাই। মূলকথা, ভক্তি পরিমিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বিশ্বজনীন ও সার্ব্বভৌতিক। ভক্তের হৃদয় অতি মহৎ—অনন্ত—মহান্—অদ্ভুত উদারতায় বিভূষিত। ভক্ত ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, লোকবল, বাহু-বল, কিছুই চায় না,—চায় কেবল বিমল প্রেম। যে প্রেমে সে কখন হাসে—কখন কাঁদে—কখন গান গায়—কখন প্রলাপ বকে—কখন নিত্যানন্দ-ভাবে বিভোর হয়! ভক্তের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলের তুলনা নাই। তুমি আমি দশ জনে—শতেক জনে যাহা সম্পন্ন করিতে না পারি, যাহার ভরে ব্যথিত হই, যাহার পীড়নে যন্ত্রণা ভোগ করি, ভক্ত তাহা চক্ষের নিমিষে—ফুৎকারে সে অভাব দূর করিতে পারে। সে শত জনের কল্পনার অতীত, অসাধ্য কাজ হাসিতে হাসিতে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। ভক্তের একবিন্দু দীর্ঘশ্বাসযুক্ত উষ্ণ অশ্রু-জলে যাহা হইবে, একটুমাত্র ব্যথিত হৃদয়ে তোমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া যে ফল উৎপাদন করিবে, একবার মাত্র সর্ব্ব-মঙ্গল্যের করুণাময় নাম উচ্চারণে যাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে, আমরা শতবল একত্র হইলে তাহার কণাংশও সমাধা করিতে পারিব না। তাই বলিতেছি ভাই! ভক্তির মাহাত্ম্য শিক্ষা কর—ভক্তের আদর্শ ধ্যান করিতে যত্ন-বান হও। অতি দীনহীন—মানব-সমাজ-লাঞ্ছিত অথচ ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত ভক্ত সাধু পুরুষ—শত সহস্র বিষয়-মদিরা পানোন্মত্ত বিপুল ধনাধিপতি হইতেও গরীয়ান। এক চন্দ্রেই ভুবন আলোকিত করে, কোটী কোটী নক্ষত্র কোন্ কালে সেই চন্দ্রের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়? একটি মাত্র ভক্তের অব-স্থানে দেশ পবিত্র, সমাজ সুশৃঙ্খলিত ও জগৎ পূজিত হইয়া থাকে। একমাত্র ভক্তের আবি-র্ভাবে সমগ্র পৃথিবীতে—অনন্ত ধর্ম্ম-সংসারে যুগান্তর উপস্থিত হয়; আনন্দের রোল উঠিয়া থাকে। ভক্তের রোদনে—ভক্তির অপব্যব-হারে দেশ ছারখার—সমাজ শ্মশানতুল্য—ধরিত্রী নীরয়গামী হয়। ভক্তের সাধনায়—ভক্তির পূর্ণবিকাশে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, দেবের দেবত্ব, ধর্ম্মের সিংহাসন, টলমল করিতে থাকে। ভক্তির উৎস—ভক্তের প্রভাব অসাধারণ; তাহাতে যাবতীয় অত্যদ্ভুত অলৌ-কিক ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে। তাই আবার বলিতেছি ভাই! ভক্তির সাধনা কর, ভক্তের দাস হও, ভক্তি-স্রোতে জীবন-তরি ভাসাইয়া দাও। ভাই, ইহার আস্বাদ ত পাইয়াছ,—মানুষ হইয়া যখন এ সংসার পথের পথিক হইয়াছ, তখন ত মূর্ত্তিমতী মায়ের ভক্তি-সুধা পান করিয়াছ। মাতৃদুগ্ধে কে কবে বঞ্চিত হইয়াছে? তাই বলিতেছিলাম, ভাই, ভক্তি-রূপিনী মায়ের অবমাননা করিয়া সংসারে আর হলাহল সেবন করিও না,—নরকের পথ আর প্রশস্ত হইতে দিও না—সুদুর্লভ মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া আর পৈশাচিক রঙ্গরসে মজিও না। কবি প্রাণের গভীর আবেগে গাহিয়াছেন ঃ—

"পেয়েছ দুর্লভ দেহ মনুষ্য আকার;
চাহ ভাই আপনার পানে।
তুমি ভিন্ন বিশ্বে নাহি কিছু আর;
মনুষ্যত্ব কর উপার্জ্জন—।
'শেষ দিন সম্মুখে' স্মরিয়া!"

কেবলমাত্র ভক্তের ভেকধারণ করিলেই আর সাধু হয় না; কেবলি ভক্তির বাহ্যিক অনুকরণ-ক্রিয়া সাধনা করিলেই আর ভক্তির পরাকাষ্ঠা হইল না। যাহাতে ভক্তি ও ভক্তের

প্রকৃত মাহাত্ম্যের পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা নিম্ন-লিখিত কোন সাধুর শ্রীমুখাৎ শ্রুত এই পৌরা-ণিক আখ্যায়িকাটী আলোচনা করিলে কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। গল্পটীর সারাংশ এই ঃ—

একদা মহর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে ভগবান শ্রীহরির দর্শনাভিলাষে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে একটি লোক অবস্থান করিতেছে। তাঁহার পরিচ্ছদ ও বেশভূষা মহাজনোচিত; কৌপিন বসন পরিধান; সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-পরি-লেপিত; মস্তকে দীর্ঘ জটাজুট-পরিশোভিত। পবিত্র শার্দ্দূল-চর্ম্মোপরি যোগাসনে উপবেশন করিয়া তিনি তন্ময়চিত্তে অনন্ত ভগবানের চিন্তায় বিভোর—সেই চিদানন্দ-প্রেমে আত্মহারা। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ হৃষ্টচিত্তে উক্ত মহাজন-বেশ-ধারী সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বিনয়নম্র বচনে নারদকে কহিলেন,—"মহর্ষে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পরম করুণাধার। সর্ব্বস্থানেই আপনার গতিবিধি আছে। যদি এ দীনের প্রতি কৃপা করিয়া একবার ভগবানের নিকট আমার প্রার্থনা নিবেদন করেন, তবেই আমার সমস্ত কষ্টের সার্থক হয়। দেখুন, আমি সংসার আশ্রম, ধন জন, স্ত্রীপুত্র সমুদয় ত্যাগ করিয়া কেবলি তাঁহারই ধ্যানে জীবন অতি-বাহিত করিতেছি—তাঁহারই চিন্তায় ঐহিক সুখ তুচ্ছ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। অতএব যাহাতে তিনি সত্বরই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপা-কটাক্ষ করেন, আপনি সে বিষয়ে একটু মনো-যোগী হইবেন এবং আমার হইয়া দুই চারিটা কথা বলিবেন।" মহর্ষি নারদ উত্তর করিলেন,—"হাঁ অবশ্য, তা'ত বটেই। তিনি পরম দয়ালু; তোমার এ ঐকান্তিক আত্ম-মনপ্রাণ সমর্পণের ফল কি নিষ্ফল হইতে পারে? আমিও তাঁহার দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠে যাইতেছি। আমার সাধ্যানু-সারে তোমার হইয়া বলিব। আর তাহা হই-লেই তোমার মনস্কামনাও পূর্ণ হইবে।"

সন্ন্যাসী মুখে কতই অনুনয়-বিনয় করি-লেন; আকার-ইঙ্গিতে কতই কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দেখাইলেন। নারদও যথাবিহিত আপ্যায়িত ও আশ্বস্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এমন সময়ে অনতিদূরে একটি তিন্তিড়ি-বৃক্ষ-তলে একটী অপবিত্র, অনাচারী, কুৎসিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। এই ব্যক্তিটী নারদকে দেখিবামাত্র একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উগ্রভাবে কর্কশস্বরে কহিল, "বলি, তুমি না নারদ ঋষি? তুমি ত বৈকুণ্ঠে যাচ্ছ! আচ্ছা, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করো দেখি, কত দিনে তাঁকে পাবো? কেমন, মনে থাকবে ত?"

মহর্ষি নারদ তাহার ভাবগতিক দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই কিছু চটিয়াছিলেন। এক্ষণে ঈদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া, মনে মনে একটু ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্য করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আচ্ছা, তোমার কথাও বলবো।"

"বড় আচ্ছা নয়। না বল্লে কিন্তু টের্‌টা পাবে।"

মহামুনি নারদ আর কোন উত্তর না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"হাঁ, ভগবানের ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তিনি তোমার জন্যে ভেবে মচ্ছেন আর কি!"

যথাসময়ে মহর্ষি বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইলেন; এবং যথাবিহিত পরস্পরের স্বাগত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসার পর নারদ পথিমধ্যের সেই বটবৃক্ষমূলস্থ সন্ন্যাসীটীর কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর! আপনি কি নিষ্ঠুর! আহা, যে আপনার জন্যে সমস্ত বিভব, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে, আপনার ধ্যানজ্ঞান যার সর্ব্বস্ব, তার প্রতি আপনি একবার চেয়ে দেখচেন না! যাহোক ঠাকুর, আপনি খুব দয়ালু!"

গোলকপতি ভগবান এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নারদ, তুমি পথিমধ্যে আর কাহাকেও দেখেছ?"

"কৈ, আর বড় কিছু একটা ত দেখিনি।"

"একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি, আর কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করেছিল কি না?"

নারদ একটু ইতস্ততঃ করিলেন। ক্ষণপরে কহিলেন,—"কৈ আর ত কিছু দেখ্‌তে পাইনে। তবে হাঁ—হাঁ—একটা লোক কিছু বল্‌তে ব'লেছিল বটে; তা—তা—সেকথা আপনার শুনে কাজ নেই।"

"আঃ—বল নাই কেন হে!"

"মহাশয়, সে শুনে আর আপনার কি হ'বে? সেটা কিছু নয়—কিছু নয়। আরে ছ্যা! সেটা একটা বিট্‌কেল, কিম্ভূত-কিমাকার কদাচারী জানোয়ার। সে কিনা আমায় বলে,—'ওরে তোর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিস্‌, আমি কদ্দিনে তাঁকে পাব।' রাম রাম, বিষ্ণু বিষ্ণু!!"

"বলি, তার উপর অত ঘৃণা কচ্ছ কেন? সেত একথা জান্‌তে চেয়েছিল বটে!"

"আজ্ঞে হাঁ, তা আপনার কাছে বল্‌তে বলেছিল বটে। কিন্তু সেটা যে আপনার কাছে একটা বল্‌বার মত কথা, তা আমি ভাবিনে; আর আমার মনেও ছিল না। তবে হাঁ, ঐ সন্ন্যাসীর কথা বল্‌বার উপযুক্ত বটে।"

"আচ্ছা দেখ, তুমি এক কাজ কর। তুমি এখনই আবার সেই পথে গিয়া তাদের দু'জনকেই বলগে,—'যে যে গাছের তলায় আছে, তাকে সেই সেই গাছের পাতার সংখ্যানুযায়ী তত বৎসর তপস্যা করতে হবে। তবে আমাকে পাবে—তবে আমি তাদের দেখা দেবো।"

নারদও এই কথামত ত্বরিত গমনে পূর্ব্বোক্ত পথিমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং অগ্রে সেই সন্ন্যাসীবেশী মহাপুরুষের(!) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সন্ন্যাসী হৃষ্টচিত্তে নারদকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাত্মন্‌, দীনের প্রার্থনা কি পূর্ণ হইয়াছে?"

নারদ একটু ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন,—"হাঁ বাপু, ভগবান বলিলেন যে,—'এই বটগাছের যত পাতা, তত বৎসর যদি তপস্যা করিতে পার, তবে তিনি দেখা দিবেন। এর কমে তিনি কিছুতেই রাজি হন না।"

সন্ন্যাসী।—"বুঝেছি—যথেষ্ট হয়েছে বাবা! আর আমার তাঁকে পেয়ে কাজ নেই বাপু! আমি চল্লেম। এতদিন অন্য কাজ করলে আমার ঢের উপকার দেখ্‌ত! এই প্রণাম বাবা!" এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ তল্পী-পুঁটলি বাঁধিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি নারদও একটু বিস্মিত হইয়া আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তির উদ্দেশে সেই তেঁতুল বৃক্ষের নিকটে আসিলেন। সে ব্যক্তি তখনই তাহার সেই স্বাভাবিক রুক্ষস্বরে নারদকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন হে ঋষি, তুমি ত বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলে! আমার খবর কি?—ঠাকুর কি বল্লেন, বল!" মহর্ষি নারদ কহিলেন,—"ঠাকুর এই কথা বলেন যে, যদি তুমি এই তেঁতুল গাছের যত পাতা এত বৎসর তপস্যা করতে পার, তবে তাঁকে পাবে—তবে তিনি তোমায় দর্শন দেবেন।"

"এই বইত নয়। তপস্যা কল্লে এতদিন পরে তাঁকে পা'ব ত!—তিনি তবে দেখা দেবেন?—তাঁকে তবে আমি পাবো?"

সেই প্রকৃত ভক্তরূপী মহাপুরুষ এই বলিতে বলিতে আনন্দবিভোর প্রাণে কাঁদিয়া ফেলি-লেন। হর্ষের পূর্ণোচ্ছ্বাস রোধ করিতে তাঁহার আর সামর্থ্য রহিল না। তাই আন-ন্দাশ্রু-মিশ্রিত গদ্গদস্বরে কহিলেন,—"আঃ—

তিনি তবে দেখা দেবেন, তাঁকে তবে আমি পাবো?"

ধন্য ভক্তি—ধন্য ভক্তির মহিমা—ধন্য ভক্তহৃদয়! এইবার ভক্তের আশা বলবতী হইল; দ্বিগুণ উৎসাহে সেই আদর্শ ভক্ত যোগাসনে উপবেশন করিলেন। নারদ হত-বুদ্ধিপ্রায় হইয়া বৈকুণ্ঠনাথ ভগবানকে কহি-লেন,—"প্রভু! এ আপনার কেমন লীলা? এমন সাধু, সে বটগাছের অত বড় বড় পাতা দেখে তল্পী তাল্পী গুটিয়া পালাল; আর, আমি যাকে পাষণ্ড মনে ক'রে অবজ্ঞা করেছিলেম, সেই কিনা তেঁতুল গাছের অত ছোট ছোট পাতা দেখেও আনন্দে কেঁদে ফেলে বল্লে—'আঃ,—তিনি তবে দেখা দেবেন, তাঁকে তবে আমি পাবো!' প্রভু, এই জন্যেই কি তোমার নাম লীলাময়? হরি! হরি! কি চমৎকার! বটের বড় পাতা দেখে একজন ওঠে; আর তেঁতুলের খুদে পাতা দেখে একজন বসে! বলিহারি মহিমা!"

ভগবান কহিলেন,—"নারদ, লোকের বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলিও না। ভক্তির পাত্রাপাত্র নাই, ভক্তের ইতর-বিশেষ শ্রেণী নাই। এখন যাও, উহার জন্য আমার এখানে স্বতন্ত্র স্থান প্রস্তুত হইয়াছে, উহাকে এইখানে আন।"

বাস্তবিক গল্পটীর মধ্যে বড় মর্ম্মস্পর্শী সত্য ও অলৌকিক শিক্ষা নিহিত আছে। আমরা কোন ছার, মহর্ষিরও মতিভ্রম হয়! তাই বলিতেছিলাম, ভক্তের মহিমা কয়জনে বুঝিতে পারে? ভক্তিতত্ত্ব অনুসন্ধানে কয়জন সক্ষম হয়? ভক্তিই ধর্ম্ম, ভক্তিই জগতের প্রাণ, ভক্তিই জীবের অবলম্বন। ভক্তিহীন মানুষ মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত হিংস্র পশুবিশেষ মাত্র। ভক্তি জগতের গুরু; সমগ্র জীবমণ্ডলীর পূজ্য; অনন্ত বিশ্বের আরাধ্য বস্তু! ভক্তি ও ভক্তের মহিমা সেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হরি বিনা আর কে জানিবে?

বৈদিক মন্ত্র।

অথৈকাদশী, ১১শ মন্ত্র।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরুপাদা উচোতে ॥১১

প্রশ্নোত্তররূপেণ ব্রাহ্মণাদিসৃষ্টিম্ বক্তুম্ ব্রহ্মবাদিনাম্ প্রশ্না উচ্যন্তে। প্রজাপতেঃ প্রাণরূপা দেবা যদাদা পুরুষম্ বিরাড়্‌রূপম্ ব্যদধুঃ সঙ্কল্পেনোৎপাদিতবন্তঃ। তদানীম্ কতিধা কতিভিঃ প্রকারৈঃ ব্যকল্পয়ন্ বিবিধম্ কল্পিতবন্তঃ। অস্য পুরুষস্য মুখম্ কিমাসীৎ, কৌ বাহূ অভূতাম, কৌ উরূ, কৌচ পাদৌ উচ্যেতে। প্রথমম সামান্যরূপাঃ প্রশ্নাঃ পশ্চাদ্বিশেষম্ কিমিত্যাদিনী বিশেষবিষয়াঃ প্রশ্নাঃ। ॥১১॥ সায়ন্

যখন দেবগণ, কল্পনা দ্বারা পুরুষকে বিরাট-রূপে উৎপন্ন করিলেন, তখন কত প্রকার করিয়া উৎপন্ন করা হইল? কে ইহাঁর মুখ হইল? কেই বা দুই হস্ত, দুই উরু, দুই চরণ হইল?। ১১। বাং

অথ দ্বাদশী, ১২শ মন্ত্র।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২॥

ইদানীম্ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নানামুত্তরাণি দর্শয়তি। অস্য প্রজাপতের্ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টঃ পুরুষো মুখ-মাসীৎ মুখাদুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যোঽয়ম্ রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্ব জাতিবিশিষ্টঃ স বাহূকৃতঃ বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ বাহুভ্যা-মুৎপাদিত ইত্যর্থঃ। তৎ তদানীমস্য প্রজাপতেঃ যৎ যাবুরূ তদ্রূপো বৈশ্যঃসম্পন্নঃ উরুভ্যামুৎপাদিত ইত্যর্থঃ। তথা অস্য পদ্‌ভ্যাম্ শূদ্রঃ শূদ্রত্বজাতিমান্ পুরুষোঽজায়ত। ইয়ংচ মুখাদিভ্যো ব্রাহ্মণাদীনামুৎপত্তির্যজুঃ সংহিতায়াম্ সপ্তমকাণ্ডে "স মুখতস্ত্রিবৃতম্ নিরমিমীত" ইত্যাদৌ বিস্পষ্ট মাম্নাতা। অতঃ প্রশ্নোত্তরে উভে অপি তৎপরতয়ৈব যোজনীয়ে। ১২। সায়ন্

এই বিরাট্ পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ হইল, ইহাঁর বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয় হইল, উরুদ্বয় বৈশ্য হইল, পাদদ্বয় শূদ্র হইল*। ১২। বাং

* ফলতঃ মুখের কার্য্য বেদাদি উচ্চারণপূর্ব্বক কর্ম্ম-কাণ্ড নির্ব্বাহ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই বিরাটপুরুষের মুখ বলিয়া কল্পনা করা

অথ ত্রয়োদশী, ১৩শ মন্ত্র।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩॥

যথা দধ্যাজ্যাদি দ্রব্যাণি গবাদয়ঃ পশব, ঋগাদিবেদাঃ ব্রাহ্মণাদয়ো মনুষ্যাশ্চ তস্মাদুৎপন্নাঃ, এবম্ চন্দ্রাদয়ো দেবা অপি তস্মাদেবোৎপন্না ইত্যাহ। প্র[জা]পতের্মনসঃ সকাশাৎ চন্দ্রমা জাতঃ। চ[ক্ষ]োঃ চক্ষুষঃ সূর্য্যোঽপ্যজায়ত। অস্য মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ দেবাবুৎপন্নৌ। অস্য প্রাণাৎ বায়ুঃ অজায়ত ॥১৩॥ সায়ন্

সেই প্রজাপতি বিরাট্ পুরুষের মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল। ফলতঃ দধি, ঘৃত, গো প্রভৃতি পশু সকল এবং ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য সকল যেরূপে কল্পিত হইয়াছে, চন্দ্রাদি দেবগণও সেই বিরাট্ পুরুষ হইতে সেইরূপে কল্পিত হইল। ১৩। বাং

অথ চতুর্দ্দশী, ১৪শ মন্ত্র।

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্‌ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা
লোকান্ অকল্পয়ন ॥ ১৪ ॥

যথা চন্দ্রাদীন্ প্রজাপতের্মনঃ প্রভৃতয়োঽকল্পয়ন্ তথান্তরিক্ষাদীন্ লোকান্ প্রজাপতের্নাভ্যাদয়ো দেবা অবয়বা অকল্পয়ন্নুৎপাদিতবন্তঃ। এতদেব দর্শয়তি। নাভ্যাঃ প্রজাপতের্নাভেরন্তরিক্ষম্ আসীৎ। শীর্ষ্ণঃ শিরসঃ দ্যৌঃ সমবর্ত্তত উৎপন্না। অস্য পদ্‌ভ্যাম্ পাদাভ্যাম্ ভূমিরুৎপন্না। অস্য শ্রোত্রাৎ দিশঃ উৎপন্নাঃ ॥১৪॥ সায়ন্

চন্দ্রাদি দেবগণ, সেই প্রজাপতি বিরাট পুরুষের মন হইতে যেরূপে কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপে তাঁহার নাভ্যাদি অবয়ব হইতে লোক সকল কল্পিত হইয়াছিল। তাঁহার নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, চরণদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌সকল নির্ম্মাণ করা হইল। ১৪। বাং /

হইয়াছে; যাঁহারা বাহুকার্য্য যুদ্ধাদি করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিরাটপুরুষের বাহুদ্বয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, যাঁহারা জঙ্ঘাবৃত্তি দ্বারা ব্যবসাদি কার্য্য করিয়া বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিরাটপুরুষের উরুদ্বয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে: এবং যাঁহারা পাদচারী হইয়া সেবাদি কার্য্যের নিমিত্ত শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বিরাটপুরুষের পাদদ্বয় বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। এইরূপ জাতিভেদ ঋকৃবেদের অন্য স্থানে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং জাতিভেদ হইবার সমকালীন এই মন্ত্রগুলি ঋকৃবেদ মধ্যে যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই পুরুষসূক্ত মন্ত্রপাঠ করিবার সময় ঋকৃবেদের অন্য মন্ত্র অপেক্ষার অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। /

শীলা দেবী।

উত্তর-বঙ্গে, বর্ত্তমান বগুড়ার সন্নিকটে মহাস্থান নামে এক পবিত্র পল্লী দৃষ্ট হয়। এককালে পবিত্র মহাস্থান—কেবলমাত্র হিন্দুর নিকটে নহে—কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান সর্ব্বজাতির নিকটেই পূজনীয় ছিল। প্রকৃতিও মহাস্থানকে সকল সৌন্দর্য্যে সুশোভিত রাখিয়াছিলেন। একদিকে পুণ্যসলিলা করতোয়া নিয়তই মহাস্থানের পাদদেশ বিধৌত করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিল; অপরদিকে খনিত খাতের জল-কল্লোল সততই যেন প্রহরীর কার্য্যে তৎপর ছিল। কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথাই বা বলি কেন, মহাস্থানের আরও এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ছিল। সে সৌন্দর্য্য, স্বর্গীয়; সে সৌন্দর্য্যের নাম, স্বাধীনতা। পৌরাণিক কাল হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষ পর্য্যন্তও মহাস্থান সেই স্বাধীনতার বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। বহু আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের পরও, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষভাগে পরশুরাম নামক জনৈক ক্ষত্রিয় নৃপতি মহাস্থানে, স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া, স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু সে সুখের দিন আর কতকাল থাকিবে?

ইতিপূর্ব্বে রাজা পরশুরামের রাজধানীতে

এক মুসলমান ফকির আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। রাজা বুঝিতে পারেন নাই যে, সে ফকীর মুসলমানদিগের গুপ্তচর; তিনি ভ্রান্তিবশে তাই ফকিরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে বিষধর সর্প প্রতিপালনের ন্যায়, সেই আশ্রয়-প্রাপ্ত ফকিরের ষড়যন্ত্রে একদিন অকস্মাৎ যবনগণ মহাস্থান আক্রমণ করিল। নগরে হাহাকার উঠিল; রাজা পরশুরাম যবন-চক্রান্তে বন্দী হইয়া অসহায়ে নিহত হইলেন। প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্য সহসা মেঘাবৃত হইল।

আর হইল কি? আর যাহা হইল, তাহা আর বলিবার নহে। রাজপুরী অরক্ষিত অবস্থায় ছিল; সুতরাং উন্মত্ত যবনগণ অনায়াসে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। অসহায়া পুরনারীগণ শোকবার্ত্তায় এতক্ষণ হাহাকারে রোদন করিতেছিলেন; এখন আবার তায় দেখিলেন, কালান্তক যবনগণ সম্মুখে অগ্রসর! সুতরাং তাঁহাদের দেহে আর প্রাণ রহিল না। সে ভয়ে কেহ বা শাণিত ছুরিকাঘাতে, কেহ বা যবন-স্পর্শের আশঙ্কায় অট্টালিকা হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনাথ শিশু সন্তানগণ হাহাকারে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়, একি দুর্দ্দৈব! রাজা পরশুরামের কন্যা শীলাদেবী আর কোনরূপ উপায়ান্তর না পাওয়ায়, বা ইচ্ছা করিয়াই যবন হস্তে বন্দিনী হইলেন।

শীলাদেবী পরম লাবণ্যময়ী। বিশেষ, যৌবন-সীমায় পদার্পণ করায় এখন তাঁহার লাবণ্যজ্যোতি পূর্ণ-বিকশিত। তাঁহাকে এখন বন্দিনী অবস্থায় পাইয়া যবন-সেনাপতির* আর সকল আকাঙ্ক্ষা দূরে গেল। অতঃপর তিনি উচ্ছৃঙ্খল যবনগণকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। মনে মনে বাসনা রহিল, যে কোন রূপেই হউক, শীলাদেবীকে স্বীয় সহচারিণীরূপে প্রাপ্ত হইবেন। যাইহোক, সেনাপতির আদেশক্রমে শীলাদেবী বন্দিনী অবস্থায় করতোয়া-তীরস্থ এক অট্টালিকায় নীত হইলেন এবং তাঁহার জন্য এক সতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দিষ্ট রহিল। কএকজন দাসদাসীও তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

এইরূপে রক্ষিত হইলে, কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি-প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত দাসী আসিয়া শীলাদেবীর নিকট উপস্থিত হইল। প্রথমে নানারূপ কথাবার্ত্তার পর ক্রমে সে তাঁহাকে সেনাপতির মনোভাব জানাইল। শীলাদেবী সকলই শুনিলেন; কিন্তু কি আর উত্তর দিবেন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একবার মনে মনে ভাবিলেন,—"হা বিধাতঃ! তোমার মনে এতই ছিল!" যাইহোক, পরক্ষণেই কিন্তু হাসিতে হাসিতে দাসীকে বলিলেন,—"আজ আমার সৌভাগ্যের কথা।—সেনাপতি আমায় এত অনুগ্রহ করিবেন। আচ্ছা, আজ রাত্রেই আপনি তাঁহাকে আসিতে বলিবেন।" দেবীর উত্তর শুনিয়া অতঃপর দাসীও হৃষ্টমনে সেনাপতির নিকট সংবাদ দিল। বলা বাহুল্য, সংবাদ পাইয়া সেনাপতি দাসীকে সমুচিত পুরস্কৃত করিলেন।

ক্রমে রাত্রি। দেখিতে দেখিতে ১০টা বাজিল। সেনাপতি শীলাদেবীর কক্ষ-সমক্ষে আগমন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই শীলাদেবীও প্রস্তুত ছিলেন; সুতরাং অভ্যর্থনা করিতেও বিলম্ব হইল না। সেনাপতি আনন্দে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলেন; এমন সময় একি বিভ্রাট! সেনাপতি দেখিলেন, এখন শীলাদেবী আর সে লাবণ্যময়ী রমণী নহেন; করালমূর্ত্তি অস্ত্রধারিণী চামুণ্ডারূপে দণ্ডায়মানা। সে মূর্ত্তি দেখিয়াই সেনাপতি চমকিয়া উঠিলেন, —উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কে

---

* এই যবন সেনাপতির নাম, সুলতান হাজরাৎ তুলিয়া।

আছ কোথায়!—রক্ষা কর—প্রাণ যায়।" কিন্তু রমণীর কর্ণে সে কথা আর স্থান পাইল না; এক ছুরিকাঘাতে সদন্তে তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া রমণী বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ! এই-ই পাপের পরিণাম! পবিত্র হিন্দু ললনার সতীত্ব নষ্টের আশা করিলে, শেষে এই ফলই পাইতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই আমি আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু তোদের পাপ কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল না দিলে জগতে অধর্ম্মেরই জয় ঘোষণা হইবে, কেবল এই আশঙ্কাতেই শেষে তোদের আশ্রয়ে আসিয়াছি। আর, তোদের দেখাইতেছি যে, প্রতিহিংসা কিরূপে লইতে হয়।"—এই বলিয়াই শীলাদেবী কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। আর, "উঃ—বড় যন্ত্রণা—প্রাণ যায়" ক্ষণকাল এইরূপ আক্ষেপের পরই সেনাপতি প্রাণত্যাগ করিলেন।

তারপর! তারপর যা হইল, তা কি আর বলিতে হইবে? সেনাপতির আর্ত্তনাদে ও সেই শোক-কোলাহলে পুরী প্রতিধ্বনিত হইল; অস্ত্রসস্ত্র সহ প্রহরীগণ আসিয়া ত্বরায় তথায় ধাবমান হইল। সুতরাং অবিলম্বে শীলাদেবীও কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন; তাড়াতাড়ি শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে পুণ্যময়ী করতোয়র পবিত্র জলে* ঝাঁপ দিলেন। আর, তদবধি মহাস্থান মহা শ্মশানে পরিণত হইল।

রাধারাণী। ✓

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জমীদার-গৃহ।

রামেশ্বরপুরের মধ্যস্থলেই মোহনলাল জমীদারের বাটী। সদর রাস্তার উপরেই বাড়ীর প্রথম প্রবেশ-দ্বার। সেখানে প্রতিনিয়তই দুই দশ দ্বারবান বসিয়া আছে,—তন্মধ্যে কেহ বা গাঁজা টিপিতেছে, কেহ বা তামাকু ফুঁকিতেছে, কেহ বা গুণগুণ গান গাহিতেছে এবং কেহ কেহ বা আবার রাজা-উজীর-মারা গালগপ্প করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে; তবে তাহারা যে দ্বাররক্ষা কার্য্যের জন্য ব্রতী, সে দ্বার দিয়া হাতি চলিয়া যাইলেও তাহাদের সে দিকে পলক পড়িতেছে কি না, সন্দেহ। প্রথম প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিলেই একটী সুপরিসর দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকার দুই দিকে দুইটি প্রশস্ত ঘাট। ঘাটের দুইধারে কএকটী বকুল বৃক্ষের সারিগাছা,—ফুল ফুটিয়া তাহাতে দিক আমোদিত করিতেছে। দীর্ঘিকার চারি পার্শ্বে এবং বাটীর বহিঃপ্রাচীরের চতুষ্কোনে অনেকগুলি বৃদ্ধ ঝাউ বৃক্ষ যেন অনন্ত আকাশকে চুম্বন লইবার জন্যই উর্দ্ধমুখ রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন দীর্ঘিকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পারের উপরস্থিত কদলী বৃক্ষের মাঝে মাঝে আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষের চারা বর্দ্ধিত হইতেছে।

দীর্ঘিকার পশ্চিম পারে আন্দাজ আড়াই হস্ত পরিমিত প্রশস্ত একটী পথ। সেই পথ দিয়াই জমীদার-বাটীর বৈঠক-মহলে প্রবেশ করা যায়। পথের দু'ধারেই পুষ্পোদ্যান। তথায় বেলা, মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি সর্ব্বদাই আপন গৌরবে উর্দ্ধমুখ; অথবা পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রতিযোগীতায় পরীক্ষা দিতে বসিয়াছে; তবে তাহাদের কাহারই যে পরীক্ষক ভ্রমর, আর কাহারই বা পরীক্ষক মধুকর, তাহা ঠিক শপথ করিয়া বলিতে পারি না।

এই পুষ্পোদ্যানের সম্মুখেই সুরম্য অট্টালিকাশ্রেণি। অট্টালিকা ইষ্টক-নির্ম্মিত; ত্রিতল; সুধা-ধবলিত। পুষ্পোদ্যানের দিকে সম্মুখ করিয়া দ্বিতল হইতে অট্টালিকার একটী বারান্দা বাহির হইয়াছে। বারান্দাটীও দেখিতে মনোহর। এই স্থান দিয়াই বাটীর

* যে ঘাটে শীলাদেবী প্রাণবিসর্জ্জন করেন, অদ্যাবধি তাহা শীলাদেবীর ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। আর, শীলাদেবীর স্মরণার্থ মহাস্থানকেও অনেক হিন্দু কবিগণ শীলাদ্বীপ নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মধ্যে প্রবেশের দ্বার। এ দ্বারটীও বিশেষ সুরক্ষিত; এখানেও চারি পাঁচ জন দ্বার-রক্ষক বসিয়া আছে। তবে প্রথম দ্বার অপেক্ষা এস্থানের রক্ষকগণ কিছু সুসজ্জিত দেখা গেল। তাহাদের পৃষ্ঠে ঢাল; হস্তে বল্লভ বা তরবারী এবং তাহাদের পরিচ্ছদও তদুপযোগী। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে দক্ষিণ-দ্বারী পূজার দালান; অপর তিন দিক চকমিলান বারান্দার দ্বারা সুশোভিত। সেই সকল বারান্দার প্রতিপক্ষে আবার ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেকগুলি গৃহ—তাহার কোনটীতে দাওয়ানজীর আড্ডা, কোনটীতে বা আমলা মহাশয়েরা বসিয়া কতক সময় সরকারী কাজ করেন, আর কতক সময় কোন্ প্রজার কিরূপে সর্ব্বনাশ করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিবেন, তাহারই ফন্দী আঁটেন।

তবে আজ কিন্তু সকল দরজাই বন্ধ। বাটীর প্রথম প্রবেশ-দ্বারের দ্বারবানগণও দ্বার-রক্ষায় তৎপর। পুষ্পোদ্যানের সম্মুখস্থ দ্বিতীয় দ্বারও ভিতর দিক হইতে আঁটা—তাহার সম্মুখে সেই সকল দ্বারবানগণই পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে। আমলা-সরকারগণের সকল ঘরেও চাবিবন্ধ—তথায় 'কাকস্য পরিবেদনা।' কেবল বাহিরের কথাই বা বলি কেন, এক কথায় বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া অন্দর-প্রবেশের দ্বার পর্য্যন্ত সকলই বন্ধ; কোন স্থান দিয়া বাটীর মধ্যে বিড়াল-কুকুর প্রবেশেরও সুবিধা নাই।

এমন সময় গৈরিক বসন-পরিহিত, দীর্ঘ জটাজুটধারী একটী সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষ আসিয়া বাটীর প্রথম প্রবেশ-দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। অন্য কেহ হইলে দ্বারিগণ কখনই তাহাকে প্রবেশ করিতে দিত না। কিন্তু সম্ভবতঃ জমীদার মহাশয়ের কোনরূপ পূর্ব্বাদেশের বিষয় স্মরণ করিয়া, তাহারা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল। মহাপুরুষের সঙ্গে একটী সুন্দর বালক আসিয়াছিল; সেও অতঃপর তাঁহার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিল। এইরূপে তাঁহারা দুইজনে দ্বিতীয় প্রবেশ দ্বারে পৌঁছিলেও, সেখানেও কেহ আর দিরুক্তি করিতে পারিল না। অধিক কি, তাঁহাকে দেখিয়া অনুচরগণ সসম্ভ্রমে অন্দরেও সংবাদ দিল এবং কোন স্থানেই প্রবেশ করিবার তাঁহাদের আর বাধা রহিল না।

* * *

অন্দরের একটী নিভৃত কক্ষ। বাড়ীর ভিতর এরূপ নিভৃত স্থান আর নাই। এমন কি, কোন অপরিচিত লোক সহসা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, এই একটী ঘর বাটীর ভিতর যে আছে, কোন ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারে না। অদ্য এ ঘরের চারিদিকের জানালা প্রভৃতিও বন্ধ; কেবলমাত্র একটী ছিদ্র দিয়া যা' কিছু আলোক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

জমীদার মহাশয় একাকী ঐ গৃহমধ্যে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। কল্য রাত্রে ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু এখন বেলা অপরাহ্নপ্রায়; তথাপি তিনি একবারও বাহির হন নাই। আহারাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার স্ত্রী একবার লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও যেমন, তেমনই তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত তিনি এক বিন্দু জলও গ্রহণ করেন নাই। কেবলই কি এক দুশ্চিন্তায় তাঁহার মন মগ্ন রহিয়াছে। এমন সময় জমীদার মহাশয়ের নিকট সেই মহাপুরুষের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপিত হইল। তখন তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দুয়ার খুলিয়াদিলেন; তাঁহার এত ভাবনা—এত চিন্তা যেন কোথায় লুকাইয়া গেল। দুয়ার খুলিয়াই তিনি সেই মহাপুরুষের চরণে ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"আসুন গুরুদেব; রক্ষা করুন। বিষম সঙ্কট!—প্রাণ যায়।"

মহাপুরুষ।—"কেন, কি হইয়াছে বাছা! চিন্তা কি?"

উত্তরে জমীদার মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কি জানি গুরুদেব! কোন্ পাপে এরূপ হইল! কিছুই জানি না, কাল বৈকালে হঠাৎ শুনিলাম, ভগবানপুরের মাঠে আমার জমীদারী দখল লইয়া এক বিষম দাঙ্গা——"

আর কথা বলা হইল না! এই পর্য্যন্ত বলা হইতে না হইতেই সদর অন্দর সকলই প্রতি-ধ্বনিত করিয়া হঠাৎ এক বিষম ক্রন্দন-কোলা-হল উপস্থিত হইল। কাহারও মুখে 'প্রাণ যায়'; কেহ বলিতেছে,—"পালান—পালান!" কিন্তু আর বড় পলাইতেও হইল না। তাড়াতাড়ি অস্ত্র-শস্ত্র-বল্লভাদিতে সজ্জিত শত শত পাইক-পাহারা কাতারে কাতারে আসিয়া গৃহ বেষ্টন করিল। জমীদার মহাশয় আর কথাটী পর্য্যন্ত কহিতে অবসর পাইলেন না। পাইক ও সর্দ্দারগণ একেবারেই তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যাবার সময় কাতরকণ্ঠে কেবল তিনি একবার মাত্র বলিতে যাইতেছিলেন,—"গুরুদেব জন্মের মত চলিলাম! চরণে আশ্রয় দিবেন।"

কিন্তু সে কথাও আর বলা শেষ হইল না। তবে গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"বাছা! ভয় নাই! জয় হইবে।" কিন্তু সে কথা—সে আশীর্ব্বাদ তখন আর কাহার কর্ণে স্থান পাইবে?—তখন স্ত্রীপুরুষ সকলেই হাহা-কারে অশ্রুজলে পুরী ভাসাইতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর কুটীরে।

চারিদিকে বনস্থলী। মধ্যদেশ দিয়া কল-কল তরঙ্গে গাঙ্গিনী মা ছুটিতেছেন; কি জন্য ছুটিতেছেন, কখন কি অভিপ্রায়, কে বলিতে পারে! তীরে উঠিতে পার্শ্বদেশে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর। গহ্বরে মিট মিট করিয়া এখন একটি আলোক জ্বলিতেছে। ভিতরে একটী সন্ন্যাসী-বেশী পুরুষ নদীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সান্ধ্য আরাধনায় মগ্ন। এমন সময়, কত কি কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে, দুইটী সাম্যমূর্ত্তি পুরুষ সেই সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া প্রণিপাত করিলেন।

সন্ন্যাসীর আরাধনা ভঙ্গ হইল। তিনি মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"শিষ্য! আসিয়াছ!—তোমার সঙ্গের উনি কে?"

যে দুইটী পুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহাদের একজনের পরিধান গৈরিক বাস; মস্তকে দীর্ঘ জটাবিলম্বিত। সুতরাং তিনি যে সন্ন্যাসীর শিষ্য, তাহা সহজেই অনুমিত হইল। কিন্তু শিষ্য উত্তর করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সঙ্গী সেই অপরিচিত পুরুষটী বিনয়নম্রবচনে উত্তর করি-লেন,—"দেব! আমি পথহারা উদাসী। রোগের যাতনায়, সংসারের পীড়নে বহু বর্ষযাবৎ বড়ই কাতর আছি। শেষে, যাতনা অসহ্য হওয়ার পূজ্যপাদ গুরুদেবের আদেশ ক্রমে, তাঁহারই চরণ ভরসা করিয়া অষ্টাহ কাল অজ্ঞাত-বাসে জীবন অতিবাহিত করিব, স্থির করিয়াছি। গত কল্য সন্ধ্যার সময় আমি সকলের অজ্ঞাতে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এই এক রাত্রি এক দিন অবিশ্রান্ত ঘুরিতে ঘুরিতে অদ্য পথহারা হইয়া এই বনদেশে পতিত হই; কিন্তু আপনার এই শিষ্য আজ আমায় জীবন দান করিলেন!"

সন্ন্যাসী।—"বাছা, ভালই হইয়াছে। এস, তুমি এই কয়দিন আমাদের আশ্রমেই বাস কর।" এই বলিয়াই সন্ন্যাসী পরক্ষণেই আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আচ্ছা বাছা! তোমার নাম কি, নিবাস কোথায়, আমাদিগের নিকট সে পরিচয় দিতে কি কিছু নিষেধ আছে?"

"না,—না—আপনারা দেবতা। আপনা-দিগের নিকট তাহা না বলিলে আর বলিব কাহাকে? মহাশয়, আমার নাম শ্রীসুরেশ-

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নিবাস, ভগবানপুরে।" এই বলিয়াই আগন্তুক নীরব হইলেন। "ভগবানপুরে!—সুরেশচন্দ্র!" অতঃপর এই কথা বলিয়াই সন্ন্যাসীও চুপ করিলেন।

তার পর, সশিষ্য গুরুদেব সেই অভ্যাগত পুরুষটীকে সঙ্গে করিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশের পর তাঁহাদিগের মধ্যে আরও নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সে সকল পরিচয় এখন আর বলিবার আবশ্যক নাই; সময়ে তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব সকলই বাহির হইয়া পড়িবে। যাইহোক, অবশেষে সন্ন্যাসীর দিনান্তের আহরিত খাদ্য-দ্রব্যাদি, যাহাতে তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যেরও কুলান হইত না, অতঃপর তিনি তাহাই সেই আগন্তুক পুরুষটীকে খাইতে দিলেন।

"না—আমায় কেন?—কাল আমি খাইব। আপনারা দিনান্ত উপবাসী আছেন, আমি তবু প্রাতে কতক কিছু খাইয়াছি। এ আহার আপনারাই খান।" অতঃপর এই বলিয়া সেই আগন্তুক সন্ন্যাসীকে বাধা দিতে গেলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী কোন ক্রমেই তাহা শুনিলেন না। অগত্যা সন্ন্যাসী ও শিষ্যের অনুরোধে তাঁহা-কেই সেই সকল খাইতে হইল। তাঁহারা দুইজনে উপবাসী থাকিলেও আগন্তুককে তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

রাণাসঙ্গ*।

এদিকে যখন রাণা রায়মল্ শুনিলেন যে, পৃথ্বির নৃশংস অত্যাচারে তাঁহার প্রিয়পুত্র সঙ্গ পথের ভিখারী হইয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে ও বিষাদে অধীর হইয়া পৃথ্বিরাজকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"তুমি আমায় দুঃসহ মন-স্তাপ দিয়াছ। তোমার ন্যায়নৃশংস ব্যক্তি মিবার-রাজ্যে বাস করিবার উপযুক্ত নহে। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হও। আমি তোমার নির্ব্বাসন আদেশ করিতেছি। দেখিব, কেমন তোমার কুটিলতা তোমায় ভরণ পোষণ করিতে পারে!"

এইরূপে পিতা কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া পৃথ্বী আর উত্তর করিতে পারিলেন না। পিতার ক্রোধ বাক্য শুনিয়া পাঁচটী মাত্র অশ্বারোহী অনুচরের সহিত পৃথ্বিরাজ মিবার পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু নির্ব্বাসন অবস্থায় তাঁহার বাহুবলে তিনি খ্যাতিলাভেও কৃতকার্য্য হইলেন। পার্ব্বতীয় দস্যুদল দমন করিয়া তিনি মাড়োয়ারে সুশাসন স্থাপন করেন এবং তাঁহার অসামান্য শৌর্য্য ও বিক্রমের বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হয়।

কিছু দিন পরে কুমার জয়মাল্ হত হন, সুতরাং মিবারের সিংহাসন একেবারে উত্তরা-ধিকারী শূন্য হইল। সঙ্গ গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং পৃথ্বী নির্ব্বাসিত হইয়া ছিলেন। রাণা কোনও উপায়েই সঙ্গের অনু-সন্ধান পান নাই; সুতরাং তাঁহাকে অন্ততঃ উত্তরাধিকারিত্বের জন্যও নির্ব্বাসিত তনয় পৃথ্বি-রাজকেই পুনর্ব্বার আহ্বান করিতে হইল।

পৃথ্বী এই সময়ে আরও কত অত্যাচার, কত অবিচারের কার্য্য করেন, তাহা শুনিলেও পাপ স্পর্শে। কিন্তু সে সকল বলিবার সময় এখন নহে; তবে কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকের তৃপ্তির জন্য তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার ও পাপ প্রবৃত্তির নিদর্শন-স্বরূপ একটীমাত্র কার্য্যের বিষয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

পৃথ্বির পিতৃব্য সূর্য্যমল্ এক সময়ে বিদ্রোহী হন এবং সারংদিয়ো নামক একজন ক্ষত্রিয় তাঁহার সহায়স্বরূপ দণ্ডায়মান হওয়ায় পৃথ্বী কোন রূপেই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হন না। শেষে পৃথ্বী নাচার হইয়া পিতৃব্যের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সময় এক দিন সারংদিয়োর সহিত বন্ধুভাবে তিনি দেবী-মন্দিরে অর্চ্চনা করিতে যান। কিন্তু কি ভয়ানক বিশ্বাস ঘাতকতা! এইরূপে সারংদি-য়োর সঙ্গী হইয়া যখন অর্চ্চনা-শেষান্তে সারংদিয়ো ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীকে প্রণাম করি-বেন, অমনিই পৃথ্বী তাঁহার গ্রীবাদেশে তরবারী

* অনুসন্ধান, ২য় খণ্ড ২য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অংশের পর।

আঘাত করিলেন। পৃথ্বির পাপ বৃত্তিতে দেবী-মন্দিরেই বীরবর প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। সুতরাং সূর্য্যমল্ সহচরের হত্যা-কাণ্ড শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া সে স্থান হইতে পলায়ণ করিলেন। পৃথ্বিও আর তাঁহার অনুসরণ না করিয়া চিতোরে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে তাঁহার পিতৃসিংহাসন বিপদ হইতে মুক্ত হইল। তাঁহার পথের সকল কণ্টক একে একে দূর হইল। এক্ষণে বৃদ্ধ রাণার মৃত্যু হইলেই তিনি মিবারের অধীশ্বর হইবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু তাঁহার আশালতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াও মুকুলিত হইতে পারিল না; বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহাকে অকালে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইল। রাজ্যলাভের জন্য তিনি যথা সাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রম ফলবতী না হইয়া দেবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। পরে সেই ধার্ম্মিকবর সঙ্গই নিঃশঙ্কচিত্তে পিতৃগৃহে আসিলেন; তাঁহাকে পাইয়া নগরের সকলের মনেই যে ভাবের উদয় হইল, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে; সুতরাং বর্ণনার আবশ্যক নাই। ক্রমে কিছুদিন পরে রাণা রায়মলের মৃত্যু হইল। সঙ্গই আসিয়া মিবারের অধিশ্বর হইলেন।

বিধাতার অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে? যে সিংহাসন লাভের জন্য পৃথ্বী অশেষ গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়া আপনার চরিত্র কলঙ্কিত করিলেন, যাহার জন্য তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বনে বনে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিলেন, তাহা তাঁহার ভাগ্যে হইল না। তিনি বাহুবলে সঙ্গকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দৈববল সঙ্গের সহায় হওয়ায় তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল করিল। যাইহোক, সঙ্গ রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া আপনার উপকারকগণকে ভুলিলেন না। তাঁহার দুঃখের দিনের আশ্রয়দাতা, অসহায় অবস্থার সহায় করিমচাঁদকে তিনি বিশেষ পারিতোষিক প্রদান করিলেন। আর, ন্যায় বিচারে ও সদ্ব্যবহারে শীঘ্রই প্রজারঞ্জক হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধে তিনি প্রায়ই জয়ী হইতেন। অধিক কি, যদ্যপি রাজপুতগণের মধ্যে ঐক্য থাকিত ও তাঁহার সহকারী নৃপতিগণ তাঁহার ন্যায় স্থির-প্রতিজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে বিজয় লক্ষ্মী কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন না। ফতেপুর-শিক্রির যুদ্ধে বাবরের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও নৈরশ্য তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পরাজয়ের পর তিনি মেওয়াটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বাবরকে পরাভব না করিয়া চিতোরে প্রত্যাগম করিবেন না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তিনি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার আর অবকাশ পাইলেন না: এক বৎসর মধ্যেই কৃতান্ত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া মিবারের সকল গৌরব ধ্বংশ করিল।

মুষ্টিযোগ

অনুসন্ধানে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ টোটকাটুটকী ও মুষ্টিযোগের বিষয় বাহির হয় দেখিয়া অনুসন্ধানের জনৈক গ্রাহক এই তিনটী মুষ্টিযোগের বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

১। কুকুরের বিষ নিবারণের আর একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।—ঘৃতকুমারির পাতার রস ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া যেখানে কামড়াইয়াছে, সেই স্থানে বন্ধন করিয়া দিলে তিন দিবসে বিষ নষ্ট হয়। ঔষধ দিবার অগ্রে ক্ষতস্থানের উপরে একটা বন্ধন দেওয়া আবশ্যক।

২। কুম্ভীর ভয় নিবারণ।—গাত্রে হরিদ্রা মাখিয়া জলে অবতরণ করিলে কুম্ভীর ভয়ে

পলায়ন করে। কুম্ভীর নিবারণের ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

৩। মশা, ইন্দুর ও উকুন প্রভৃতির দৌরাত্ম্য নিবারণ।—মুথা, শ্বেত সর্ষপ, গুড়, ভেলা, চুণ, শুকশিম্বী ফল, আকন্দ ফল এবং ধুপ এই কএকটী বস্তু একত্রিত করিয়া ঘরে দগ্ধ করিলে উকুন, মসা, ইন্দুর ও অন্যান্য বিষ-কীট বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সাধারণের পক্ষে ইহা একটী উত্তম উপায়।

মতামত।

পুস্তক সম্বন্ধে।

গান।—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। ইতিপূর্ব্বে 'পকেট গান' ও 'পকেট কবিতা' পুস্তকের বিজ্ঞাপন বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল; এখানি রাজকৃষ্ণ বাবুর সেই সাধের 'পকেট গান। রাজকৃষ্ণ বাবু এপর্য্যন্ত যে সমস্ত গান রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাছাই বাছাই গানগুলি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে আছে;—সুতরাং ইহা যে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপ্রদ ও রুচিকর, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে? তবে কথা এই, এই পুস্তকখানি প্রায় বর্ষাধিক পূর্ব্বে প্রকাশ হইবার বিজ্ঞাপন বাহির হয়; কিন্তু এতদিনে পাঠক ইহা প্রাপ্ত হইলেন। তাই যা'কিছু তাঁহাদের অসুখের কারণ আছে। তদ্ভিন্ন আর সকল অংশেই ইহা উপাদেয়। অনুসন্ধানেও গানের একটীমাত্র নমুনা দেওয়া গেল।

সঙ্গীত কল্পতরু।—শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানির জিনিসগুলি অবশ্যই ভাল; কিন্তু বিজ্ঞাপনের চটক যত, তত যে নয় তাহা বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। বিশেষ, সংগ্রহকার এই পুস্তক প্রচারে অনেকগুলি ভাল জিনিসকে মাটী করিয়াছেন, তাহা আরও দুঃখের কথা। মুরারীমোহন বাবু কলিকাতার একজন বিখ্যাত বাদক: প্রকাশক তাঁহার কোন ছাত্রের খাতা হইতে কতকগুলি সুরতাল নকল করিয়া লইয়া যে নিজের পুস্তকস্থ করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা তত দোষ দিই না, কিন্তু তাহা আবার বিকৃতরূপে গৃহীত হইয়া 'আগল খাস্ত' করা হইয়াছে বলিয়া আমারা বড়ই ক্ষুব্ধ। ইহাতে মুরারী বাবু দুঃখিত, তাঁহার ছাত্র বিড়ম্বিত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পুস্তক-ক্রেতা পাঠক ও প্রতারিত। সাহিত্য-বাজারে এইরূপ প্রতারণা—একের জিনিষ অন্যে লইয়া বিকৃত করিয়া আবার বাহাদুরী লইতে যাওয়া, আজকাল বড়ই বৃদ্ধি দেখিতেছি। এ বড় ক্ষোভের বিষয়। সময়ান্তরে আমরা এ সকল যতদূর পারি, সাধারণকে ধরিয়া দিতে চেষ্টা পাইব। ফলতঃ এরূপ অত্যাচারে অনেক গ্রন্থকারেরও সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। তাঁহারা সকলেও এবিষয় আমাদিগকে ধরাইয়া দেন এবং এসম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হয়, এই আমাদের ইচ্ছা।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেসন্ বা বড় ঘরের বড় কথা!

ব্রহ্মদেশবাসী সমিতির জনৈক মেম্বর আন্তরিক দুঃখের সহিত এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এই ঃ—

"আজ প্রায় ৯। ১০ বৎসর হইল বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেসন (Bengal Banking Corporation Ld.) স্থাপিত হয়। অনরেবল বাবু আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ইহার ডাইরেক্টর (Director) এবং প্রধান উদ্যোগী। বাঙ্গালী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি (Joint-stock company) করিয়া ব্যবসার উন্নতি করিতে জানে না, ইহা বড় অখ্যাতির কথা। কিন্তু যখন উক্ত মহাত্মারা ইহাতে হাত দিলেন তখন

ভাবিলাম, বুঝি বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক ঘুচিল। নিজে অনেকগুলি অংশ খরিদ করিলাম এবং বন্ধুদিগের অনুরোধ করিয়া অনেকগুলি খরিদ করাইলাম। ফলতঃ দেশের এই প্রথম সং উদ্যমটী উৎসাহ অভাবে নষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় আরও চেষ্টা করিলাম। ব্যাঙ্কের কার্য্য বেশ চলিতে লাগিল; যতবার অংশীদারদিগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা হয়, তাহাতে কেবল আমি কেন, অনেকেই বসুজা মহাশয়কে প্রতিনিধি ঠিক করেন। ক্রমে আমি ৭।৮ শত টাকা (Current এবং Fixed deposit এ) জমা রাখিলাম। কিছু দিন সকল বেশ চলিতে লাগিল; কিন্তু "ভাগ্যং ফলত সর্ব্বত্রং"। এমন সকল লোকের হাতে পড়িয়াও ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ হইল, Liquidators ঠিক হইল। তাঁহারা প্রথমেই গচ্ছিত টাকার শতকরা ১০ দশ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আর গচ্ছিত টাকা আদায় হইবে এবং অংশেরও কতক দেওয়া হইবে এরূপ আশা দিলেন। আমার ভাগ তাঁহারা আমাকে পাঠাইলেন না; কিন্তু আমমোক্তার দিলে দেওয়া হইবে বলিয়া পাঠাইলেন। আমি সকল কাগজপত্র কলিকাতা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বাবু দীননাথ চট্টোপাধ্যায়কে পাঠাইলাম এবং তাঁহার নাম আমমোক্তার নামা রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইলাম। ৭০৲ বা ৮০৲ টাকা পাইবার জন্য ইহাতে আমার কএক টাকা ব্যয়ও হইল। সাত আট শত গচ্ছিত টাকার মধ্যে ঐ কএকটী টাকা পাওয়া যায় এবং (Liquidators) পত্রের উত্তর দেন ১।২ মাস, পরে, পূজার পূর্ব্বে বা পূজার পরে দেনাপাওনা সব পরিস্কার হইবে। তাঁহাদের ঠিকানা ওল্ড পোষ্টআপিস ষ্ট্রীটে ছিল। পরে একদিন আমার পত্র ডেড লেটার আপিস (Dead Letter Office) হইতে ফিরিয়া আইসে; আমি উদ্বিগ্ন হই এবং শেষে আনন্দমোহন বাবুকে পত্র লিখি। তিনি উত্তর দেন এখনও সকল কার্য্য শেষ হয় নাই; কিছু সুবিধা বোধ হইলে সংবাদ দিব এবং তাঁহাকেও যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে। অনেক দিন পরে আর একখানি পত্র লিখি, কিন্তু তাহার আর উত্তরও পাই নাই। এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, কিছুই সুবিধা হয় নাই, নচেৎ তিনি পত্র লিখিতেন। যাহা কিছু আদায় হইয়াছিল বা মজুত ছিল, তাহা বোধ হয় (Liquidator দিগের) বেতন প্রভৃতিতে খরচ হইয়াছে। অথচ তাঁহারা যে কি করিলেন, তাহা তো অংশীদারেরা কিছুই জানিল না। আনন্দমোহন বাবুর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমি এক হাজারের উপর টাকা ওখানে দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই নাই। এখন আপনারা তাঁহার দ্বারা সকল সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। যখনই বলিবেন তখন রসিদাদি সকল কাগজ আপনার নিকট পৌঁছিয়া দিব।"

এই একখানি নহে; এইরূপ অভিযোগ সহ আমরা আরও অনেকগুলি পত্র নানাস্থান হইতে পাইয়াছি। সকলেরই এই ক্ষোভ যে, কোম্পানি ফেল হইল হইল; কিন্তু ফেলের পূর্ব্বে বা পরে অংশীদারগণকে সে সংবাদমাত্রও দেওয়া হইল না কেন?—বিশেষ, আনন্দমোহন বাবু প্রভৃতি উচ্চ পদবীস্থ লোকগণ যখন উহার কার্য্যকর্ত্তা ছিলেন। যাইহোক, আপাততঃ আমরা কেবল এই পত্রখানি মাত্র ছাপাইয়া মাননীয় আনন্দমোহন বাবু বা ঐ কার্য্যের অপর কোন কর্ম্মকর্ত্তার নিকট হইতে ইহার সদুত্তর প্রার্থনা করি। আশা করি, তাঁহারা এ সম্বন্ধে সাধারণকে তুষ্ট করিতে পারিবেন।

———

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বাগবাজার, আদরিণী-আপিস সম্বন্ধে আমরা যত অভিযোগ পাই, এত অভিযোগ অতি অল্প লোকের নামেই আসিয়া থাকে। আর, সে সকল অভিযোগও অতি গুরুতর গুরুতর। তন্মধ্যে কেহ বা বাবু রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাসের নিকট, কেহ বা বাবু তারকনাথ বিশ্বাসের নিকট এবং কেহ বা উহঁাদের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট নানারূপে প্রতারিত হইয়াছেন, জানা যায়। কেহ বা ওয়াচ ঘড়ির জন্য, কেহ বা টাইমপিস্ ঘড়ির জন্য, কেহ বা আদরিণী-উপন্যাস লহরীর জন্য, কেহ বা অন্যান্য নানা পুস্তকাদির জন্য, উহঁাদের নিকট টাকা পাঠাইয়া তাহা প্রাপ্ত হন নাই বা অংশমাত্র প্রাপ্ত হন, সংক্ষেপতঃ এই সকলই সেই অভিযোগের সারাংশ। ইহঁারা পূর্ব্বে ইহঁাদিগের পুস্তকাদির গ্রাহক হইলে ওয়াচ ঘড়ি বা টাইমপিস উপহার দিবেন, বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন; কিন্তু উপহার দূরের কথা, পত্রাদি লিখিলে, এখন আর গ্রাহকগণ উত্তর পর্য্যন্ত পান না। এইরূপ এক আদখানি নহে—ইহঁাদের বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যেই দুই একখানি করিয়া এ পর্য্যন্ত রাশি রাশি অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে একবার এবিষয় সমিতির রিপোর্টে প্রকাশ হইলে, ইহঁারা ঐ সকল অভিযোগের মীমাংসা করিয়া গ্রাহকগণকে তুষ্ট করিতে চাহেন; কিন্তু তারপর এখন আর সে চেষ্টা কই? উপরন্তু সে সকলের মীমাংসা না করিয়া, এখনও আবার নানা ঢঙের নানাবিধ বিজ্ঞাপন দিয়া লোক মজাইতে চেষ্টা পাইতেছেন। ইহঁাদের পূর্ব্বের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টামত এপর্য্যন্ত আমরা নীরব ছিলাম; কিন্তু আর সেরূপ থাকিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয় ও লোকেও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। সেইহেতু এখন একথা সাধারণে প্রকাশ করা গেল। তবে রাজেন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে এখনও আমরা বন্ধুভাবে বলিতেছি যে, তাঁহারা এখনও একবার আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই সকল অভিযোগের মীমাংসা করিলে, আমরা সুখী হইব; সে সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রশংসাই করিব। তদ্ভিন্ন, বলা বাহুল্য, লোকে আর ক'দিন ভুলিয়া থাকিবে?

গরাণহাটার সরকার কোম্পানী এখন পর্য্যন্তও আপনাদের চরিত্র শোধন করিতে পারিলেন না, এই ক্ষোভ। ইহঁাদের পূর্ব্বেকার কর্ম্মকাণ্ড অনেকেরই অজানিত নাই; কিন্তু ইতিমধ্যে "সংসার-সর্ব্বরী" নামক এক পুস্তকের বিজ্ঞাপন দিয়াও ইহঁারা সেই পূর্ব্ব প্রকৃতির পরিচয় দিতেছেন, জানিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। সে বিজ্ঞাপনে ঐ পুস্তকের গ্রাহকগণকে একটী করিয়া তাঁহাদের নামীয় রবার-ষ্ট্যাম্প উপহার দিবার লোভানি দেখাইছিলেন; কিন্তু এখন অনেকেই সে উপহার পাইতেছেন না, এইরূপ নানা অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন, পুস্তকের রূপ-গুণেও যে অনেকে তুষ্ট নহেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। যাইহোক, সরকার-কোম্পানী-সম্বন্ধে পূর্ব্বাপরই আমরা সাধারণকে সতর্ক করিয়া আসিতেছি। তথাপি, কেহ তাহা না জানিতে পারিয়া অথবা লোভের মোহিনী কুহকে পড়িয়া ঠকিতেছেন, এই ক্ষোভ। তবে সরকার-কোম্পানীর এখনও মতি ফিরে, এও আমাদের প্রার্থনা।

পূর্ব্বে যেমত অনুমান করিয়াছিলাম, আন্দুলবেড়িয়ার মতিলাল ঘোষের নামে 'হিন্দু'-পত্রিকার মূল্য পাঠাইয়া লোকে সেইমতই প্রতারিত হইয়াছেন, এখন জানা যাইতেছে। অতঃপরও পাঠকগণ আন্দুলবেড়িয়ার নাম স্মরণ রাখুন, এই প্রার্থনা।

ধর্ম্মসুহৃৎ নামে এক নূতন সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে। তাহার প্রায় অধিকাংশ বিজ্ঞাপনেই এবং আকার-ইঙ্গিতে প্রতারণার গন্ধ অনুভূত হয়। তাহাতে সেই হরিদাসের পুস্তক, সেই গৌরদাসের বিজ্ঞাপন, বেলেঘাটার সেই অমৃতলাল দত্ত সকলই বিরাজ করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া সহযোগী সময়ের মত আমাদের কএকজন লোকেরও, ইহার তলে যে হরিদাস মান্না বা সেইরূপ দরের কেহ লুপ্ত আছেন,

সন্দেহ করিতেছেন। যাইহোক, সত্যমিথ্যা সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া

অনেকেই তাহার পয়সা দেন না, প্রায় অধিকাংশ সম্পাদকের নিকট হইতেই—বিশেষতঃ গরিব, ঢাকাগেজেট্, ঢাকাপ্রকাশ মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, লক্ষ্ণৌএর হিন্দিপত্র দিনকর-প্রকাশ, প্রতিকার, সুরভি ও পতাকা প্রভৃতি হইতে, আমরা নানা বিজ্ঞাপনদাতার নামে অভিযোগ পাইতেছি। তন্মধ্যে কেহ বা কতক দিয়া, কেহ বা 'বিজ্ঞাপন ছাপাইলেই টাকা পাঠাইতেছি' বলিয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া লইয়াছেন ও টাকা দিবার বেলায় এখন পত্র লিখিলেও উত্তর নাই। যাইহোক, যাঁহারা আমাদের নিকট বিল পাঠাইয়া আপাততঃ উহা আদায়ের ভার দিতেছেন, আমরা একবার প্রথমতঃ তাহার তাগাদা করিয়া দেখি; তারপর যেমত সুবিবেচন হয়, পরে প্রকাশ হইবে। অর্থাৎ যাঁহারা সহজেই সে টাকা দিবেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিব; আর যাঁহারা তাহা দিতে গোলোযোগ করিবেন, তাঁহাদিগের জন্য অগত্যা উপায়ান্তর লইতে হইবে।

প্রতারক গ্রাহকগণ

ব্যবসায়ীমাত্রকেই জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। ভ্যালুপেয়েবেলে পুস্তক-পত্রিকাদির গ্রাহক হইতে চাইয়া তাহা ফেরত তো দিতেছেই; তা ছাড়া, নানারূপেও ঠকাইতেছে। এই সকল প্রতারক গ্রাহকের নাম ও কার্য্যাদি আমরা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতেছি। শীঘ্রই তাহা সাধারণকে জানান যাইবে। ব্যবসায়ীগণ তাহা দেখিলে কতকাংশেও সতর্ক হইতে পারিবেন, আশা করা যায়।

সংবাদ।

—লঙ্কাদ্বীপে সম্প্রতি এক নিয়ম জারি হইয়াছে যে, ৭ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে যদি কোন পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ না পাঠান, তবে তাঁহাদিগের বিশেষরূপ জরিমানা হইবে। এমন কি, ঐ সময় হইতে যতদিন বালককে বিদ্যালয়ে না দেওয়া হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে অন্ততঃ ৫ পাঁচ টাকা করিয়া তাঁহাদের জরিমানা করা হইবে। ইংরাজ-অধিকারে লঙ্কার রাক্ষস ক্রমে 'বিদ্যা-লঙ্কা'র হইতে চলিল দেখিতেছি!

—'পিপল্‌স্ জর্ণালে' প্রকাশ, বেহার অঞ্চলের কোন কুলবধূ পাল্কী করিয়া একদিন পিত্রালয়ে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দুইজন লোক আসিয়া পাল্কীর বেহারাদের বলিল,—"আমাদের একটা গরু ঐ নদীজলে পড়িয়াছে; তুলিতে পারিতেছি না। তোমরা সাহায্য করিলে উদ্ধার হয়।" তদনুযায়ী দুইজন বেহারা তাহাদের সঙ্গে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা আবার আসিয়া অপর দুইজনকে বলিল,—"তোমরাও না যাইলে হয় না।" সুতরাং অনুনয়ে সে দু'জনকেও যাইতে হইল। তখন, স্ত্রীলোকটীর মনে কি জানি কি ভাবিয়া সন্দেহ হওয়ায় তিনি নিকটস্থ কোন গ্রামে পলাইয়া আশ্রয় লইলেন। পরে দস্যুগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, তাহাদের শীকার পলাইয়াছে। তখন তাহারা অগত্যা অনুসন্ধানে বাহির হইল। ক্রমে তাহাদের এক বৌ পলাইয়া আসিয়াছে, এইরূপ পরিচয় দিয়া তাহারা সন্ধান পাইল। এক বেণিয়া তাহাদিগকে কৌশলে ক্ষণকাল বিলম্ব করাইয়া ও তলে তলে পুলিস ডাকিয়া পুলিসের হস্তে অর্পণ করিল। তখন সন্ধানে জানা গেল, তাহারা দস্যু; চারিজন বেহারাকে হত্যা করিয়া স্ত্রীলোকের গহনাদি আত্মসাৎ করিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। তাহাদের দলে আরও লোক আছে। যাইহোক, ধরা পড়িয়া শেষে তাহাদের উচিত শিক্ষাও হইল।

—গত পরস্য কলিকাতার পারঘাটার এক ষ্টীমার ডুবিয়া প্রায় ৩০।৪০ জন লোকের প্রাণনষ্ট হইয়াছে।

—ঢাকায় ছোটলাট সাহেব যাইলে, তাঁহার ষ্টীমার হইতে কতকগুলি টাকাকড়ি চুরী গিয়াছে।

—তিব্বত যুদ্ধের জন্য ইংরাজ-পক্ষ হইতে সম্প্রতি ৭,৮০০ পদাতিক সৈন্য ও ৩।৪ শত গোলন্দাজ রণস্থলে যাইবার হুকুম হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বিস্তর সৈন্য প্রস্তুত রাখাও হইতেছে; আবশ্যক হইলেই প্রেরিত হইবে। অপর দিকে তিব্বতীয়েরাও সদম্ভে অগ্রসর হইতেছে। ফলতঃ ব্যাপার বড়ই গুরুতর দাঁড়াইল।

—উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; বন্যায় ডুবিয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানেও হাহাকার উঠিয়াছে।

—শ্রীরামপুরের আদালতের একজন পেয়াদা সমন জারি করিতে যাইয়া ॥০ আট আনা ঘুষ লয়। তজ্জন্য অভিযোগ হওয়ায় তাহার ছয়মাস কারা-দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। কলিকাতার ছোট আদালত ও পুলিসের পেয়াদারা এরূপ ঘুষ নিয়তই লইয়া থাকে; অধিক কি, কিছু না পাইলে তাহারা কথাই কয় না। এবন, এদিকে একবার গোয়েন্দা পুলিসের দৃষ্টি পড়িলে ভাল হয় না! চুরী-জুয়াচুরী অপেক্ষাও আমরা এ সকলকে কিন্তু ভয়ঙ্কর জ্ঞান করি।

—দৈনিক বলেন, ময়ূরের ডিম্বে লঙ্কামরিচ পূরিয়া সেই ডিম্ব দুই চারি দিন নিম্বপাতার সহিত রাখিয়া, পরে উহা গুঁড়া করিয়া খাওয়াইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। অথবা তামাকের সহিত ময়ূরপুচ্ছ সাজিয়া খাইলেও বিষ নষ্ট হয়। পরীক্ষায় হানি কি?

—কলাগাছ ম্যালেরিয়া-নাশক। সুতরাং বাড়ীর পার্শ্বে কলাবাগান থাকিলে তাহাতে উপকার বই অপকার নাই, সম্প্রতি এক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছেন।

অনুসন্ধান

—:০(০)০:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই আশ্বিন, ১২৯৫ সাল। [৫ম সংখ্যা।

আনন্দময়ীর আগমনে।*

(গান।)

মেঘমল্লার—একতালা।

এ দুঃখের দিনে সুখের লহরী
 হৃদে কেন খেলে অনিবার।
অসাড়-পরাণ কেনরে জাগিয়ে,
 নাচিছে উল্লাসে বারেবার ॥
ভাঙা হৃদি-বীণ নব প্রাণ-তারে
 সপ্তমে মিশিয়ে বাজিছে গম্ভীরে,
ভক্তি-তাল উঠে সবার অন্তরে,
 কি ভাবে বিভোর হ'ল প্রাণাগার ॥
মহা রিপু ছয় জনে দিয়ে বলি,
 আনন্দ-সলিলে ভাসে সবে মিলি,
কি সুখমিলন হের আঁখি খুলি,
 বিশ্ববাসী নরনারী বিধাতার।
বুঝেছ কি ভাই আনন্দ-কারণ—
 দুঃখিনী বঙ্গের সম্পদ-ভূষণ,
ঐ দেখ চেয়ে বিশ্বের জীবন,
 আসিছে মা তারা ভেদিয়ে আঁধার ॥
ভক্ত-বাঞ্ছা সাধ পূরাতে জননী,
 দশ ভূজা বেশে আনন্দ-রূপিণী,
প্রবোধিতে সুতে শিবের শিবাণী,
 আসিছে মা উমা এ বঙ্গ মাঝার।
সম্বৎসর পরে হরষের ভরে,
 উদ্বোধন-গীতি তাই ঘরে ঘরে,
আনন্দের রোল অন্তরে বাহিরে,
 তাই রে আজি এ আনন্দ অপার ॥

---

* ৺ শারদীয় উৎসব উপলক্ষে।

মা, মা, আয় মা!

দগ্ধপ্রাণ—সদাই জ্বলিতেছে, হু—হু—হু। রোগের যাতনা, শোকের সন্তাপ, অভাবের উদ্বেগ সকলেরই পূর্ণ প্রকোপ; সবাই সুযোগ পাইয়া টানাটানি করিতেছে! হায়! হায়! এ অসময়ে কে সে জ্বালা নিবারণ করিবে? মা! মা! তাই ডাকি, আয় মা! এ সব পাপের ফল; সন্তান তোর, তাই ভুগিতেছে বটে; কিন্তু মা গো! আমি তোর কুপুত্র বলিয়া তুইও কি কুমাতা হইবি? না—না—তুই যে মা দয়াময়ি! পীড়নের একশেষ হইয়াছে, কাতরতায় প্রাণ যায়; তাই শেষে মা তোকে ডাকিতেছি, আয় মা!

এতদিন ডাকি নাই—মোহমদে আচ্ছন্ন ছিলেম। বরং তুই এক আদবার সন্তান বলিয়া দেখিতে আসিয়াছিলি; কিন্তু অভাগা সন্তান তোর, তাই তোকে দ্বার হইতেই ফিরাইয়া দিয়াছে; বলিয়াছি, 'মা, তুই আর আসিসনে. ফিরে যা!' কিন্তু মাগো! এখন বুঝিতেছি, জননী বিনা সন্তানের্ মন সন্ন্যাসী জগতে আর কে বুঝিবে? ভাইনে ঈশ্বরের দ্বারা যাহারা প্রাণের সহিত মিলিতেছি যে, তিনি মাগো, সন্তপ্ত প্রাণ ফেলিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট লুকাইল! এখন বুঝিছো, আগামী শুক্লপক্ষের

হইল; চাটুর্য্যে মহাশয় পূর্ব্ব মত দোকানে কাজ চালাইতে লাগিলেন। সেই জুয়াচোর ইতি-মধ্যে একদিনও তাঁহার দোকানের নিকট আসে নাই। পরে একদিন রাত্রে তহবিল মিলানর পর চাটুর্য্যে মহাশয় প্রদীপের দিকে পশ্চাৎ করিয়া টাকার তোড়াগুলি একে একে সিন্দুক জাত করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ প্রদীপটী নিবিয়া গেল। কি কারণে প্রদীপ নিভিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ নফরকে গালি দিতে দিতে হাপর হইতে প্রদীপটী জ্বালিতে গেল। ব্রাহ্মণ প্রদীপ নিভিবার কারণ বুঝে নাই বটে; কিন্তু পাঠক মহাশয় বোধ হয় স্পষ্টই বুঝিয়াছেন। আমাদের জুয়াচোর ভায়ার অব্যর্থ সন্ধানই প্রদীপ নিবিবার কারণ। চোর যেই দেখিল যে, ব্রাহ্মণ প্রদীপ জ্বালিবার জন্য একটু অন্তরালে গিয়াছে অমনি সে নিঃশব্দ পদবি-ক্ষেপে দোকানের ভিতর আসিয়া একটী নগদ দুই হাজার টাকার তোড়া লইয়া একেবারে চম্পট দিল। ব্রহ্মেণের প্রদীপ জ্বালিয়া আনিতে এত অল্প বিলম্ব হইয়াছিল ইহার মধ্যে যে কেহ দোকানে আসিয়া টাকার থলে [illegible] করিতে পারে একথা তাঁহার মনে একেবা[illegible] উদয় হয় নাই। সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে টাকার তোড়াগুলি সিন্দুকে রাখিয়া যথারীতি দোকান বন্ধ করিয়া তিনি গৃহে চলিয়া আসিলেন।

৪

প্রত্যহ প্রাতে দোকানে গিয়া প্রথমে টাকার তোড়া গুনা চাটুর্য্যের অভ্যাস। পর দিন দোকানে আসিয়া টাকার তোড়া গুনিয়া দেখেন একটা কম। "কাল গুনিয়া রাখিয়া গেলাম আজ কম হইল কেন," ভাবিয়া ব্রাহ্মণ একটু অস্থির হইলেন। ভুল হইয়াছে ভাবিয়া তিনি পুনর্ব্বার গুনিলেন। এবারও একটী কম হইল। অন্য কোথাও পড়িয়া আছে কি না দেখিবার জন্য দোকানের চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখি লেন; কোথাও পাইলেন না। তখন ব্রাহ্মণের বড়ই ভয় হইল। তৎক্ষণাৎ দোকানে চাবি দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু সবে মাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইয়াছেন, এমন সময় চাটুর্য্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া উপস্থিত। বাবু ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "কি চাটুর্য্যে মহাশয়! অত হাঁপাইতেছেন কেন? দোকানে যান নাই?" ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ। মহাশয়, দোকানে গিয়াছিলাম। আপনি কি কাল একটা দুই হাজার টাকার [illegible]াড়া লইয়া আসি-য়াছেন!" বাবু হাঁসিয়া [illegible] করিলেন, "আপনি কি বাতু[illegible]ন? আমি আপনাকে না বলিয়া [illegible] দুই হাজার টাকা কেন লইয়া[illegible]ণের এ কথা বিশ্বাস হইল না[illegible] পরিহাস করিতেছেন। বলিল, "অ[illegible]ন আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য না বলিয়া কাল তহবিল হইতে দুই হাজার টাকা আনিয়াছেন। আপনি [illegible]লিয়া আসুন অথবা না বলিয়াই আসুন, টাকা আপনার। ভাল, এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এত ছুটাছুটী করানটা আপনার ভাল হয় নাই। বাবু কিছু বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "চাটুর্য্যে তুমি কি বলিতেছ? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" বাবুর রকম সকম দেখিয়া ব্রাহ্মণের বড় ভাল বোধ হইল না, তখন তিনি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে, টাকার তোড়া চুরি গিয়াছে; এবং "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বাবুর এত দিন চাটুর্য্যের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু লৌহ সিন্দুকের ভিতর হইতে টাকার তোড়া চুরি গিয়াছে শুনিয়া তাঁহার মনে একটু সন্দেহ জন্মিল। তিনি ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই দোকানে উপ-স্থিত হইলেন; দেখেন, দোকানের দ্বারের কুলুপ যেমন তেমি আছে ও লৌহ সিন্দুকের

কলও অবিকৃত অবস্থায় আছে। তখন তাঁহার চাটুর্য্যের উপর ঘোর সন্দেহ জন্মিল। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমার সহিত প্রতারণা পাইয়াছ? সিন্দুকের চাবির ভিতর টাকার তোড়া রহিল, চাবি রহিল তোমার হাতে। এ টাকা তুমি লইলে না ত কি ভূতে লইল? এখন ভাল চাও ত টাকা ফিরাইয়া দাও। নতুবা এই বৃদ্ধাবস্থায় পুলিশে যাইতে হইবে।" ব্রাহ্মণ একেবারে অবাক। বলিল, "সে কি মহাশয়! আমি আজ বিশ বৎসর আপনার সংসারে কর্ম্ম করিতেছি। কখনও এক কপর্দ্দকও ইতস্তত হয় নাই। আর আজ আমি এই দুই সহস্র টাকা চুরি করিলাম?" বাবু বলিলেন, "আমি তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না; তুমি চোর। চল, আমি তোমাদের বাটিতে যাইতেছি। কোথায় টাকা রাখিয়াছ বাহির করিয়া দিবে চল। টাকা না পাইলে নিশ্চয়ই তোমাকে পুলিশে দিব।" বাবু ব্রাহ্মণের বাটিতে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও টাকার সন্ধান পাইলেন না। পরে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিলেন। তথায় অনেক ভয় অনেক প্রলোভন দেখাইয়াও কিছুতেই ব্রাহ্মণকে স্বীকার করাইতে পারিলেন না। পরে অগত্যা সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে লইয়া থানায় উপস্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষ।

মধ্য সময়ের ইতিহাস।

পাণ্ডবদিগের সময় হইতেই দিল্লী রাজধানী-রূপে প্রায় সমগ্র ভারত শাসন করিয়া আসি-তেছে। আধুনিক ইতিবৃত্তবিৎগণ অনুমান করেন যে, খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরু-পাণ্ডাবীয় কুরুক্ষেত্র-সমর সংঘটিত হয়।

২। ইহার পর ব্রাহ্মণগণের অবনতি ও পুনরুন্নতি।—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মাচরণ ও শাস্ত্রা-লোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ক্ষত্রিয়াদি সকলেই তাঁহাদের নিদেশ মত চলিত; এক কথায় আর্য্যসমাজ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা চালিত হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ এত প্রভূত্বের অধিকারী হইয়াও সমদর্শী ছিলেন না, এই জন্য ক্রমে তাঁহাদের প্রভূত্বে আঘাত লাগিতে আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেব সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণগণের অবনতি আরম্ভ হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মও চিরদিন ভারতে থাকিতে পায় নাই, ধর্ম্মবীর শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির চেষ্টায় ক্রমে ইহা ভারতবর্ষ হইতে প্রায় লুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়েই জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম্মের আর পুনর-ভ্যুদয় হইল না; পুরাণ ও তন্ত্রাদির সাহায্যে শাক্ত-শৈবাদি নানাবিধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

বৈদেশিক আক্রমণ।—ভারত প্রথম হই-তেই বৈদেশিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত। আর্য্য-গণের ভারত আক্রমণের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ মুহুর্মুহু পাশ্চাত্য জাতিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। বেকস্ (Bacchus) ও শমীরমা (Semiramis) কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের কথার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। তারপর আমরা সিস্ট্রিসের (Sesostris) আক্রমণ; ডাইওডোরস্ সিকুলস্ (Diodorus Siculus) বলেন,-মিসররাজ সিস্-ট্রিস খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় ১৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে জলপথে ও স্থলপথে গাঙ্গ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন। তৎপরে পারস্যরাজ দরায়ুস (Darius), বুদ্ধশাক্য সিংহের সময়ে, ভারত আক্রমণ করিয়া পঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করেন। তৎপরে গ্রীকদেশের অধীশ্বর সিকন্দর

(Alexander the Great) ভারত আক্রমণ করেন। পঞ্জাবে পুরুরাজের সহিত ইহাঁর যুদ্ধ হয়। তক্ষশীল (Taxiles) নামে পঞ্জাবের আর একজন রাজা বিনাযুদ্ধে ইহাঁর সহিত মিত্রতা করেন। পঞ্জাব জয়ের পর সিকন্দরের সমস্ত ভারত জয় করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ ভারতের যুদ্ধকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত না হওয়ায়, তিনি মগধ পর্য্যন্ত আগমণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। সিকন্দরের মৃত্যুর পর শিলাক্ষ (Seleucus) মগধ আক্রমণ করেন। এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত মগধের অধীশ্বর, ছিলেন; ইনি শিলাক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যার পানিগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করেন।

ইহার পরই আফগানগণ।—খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দির প্রারম্ভ হইতে কিছুদিন ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানে তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল। প্রথম মোহালিব (Mohalib) নামে একজন খৃীঃ ৬৬৪ অব্দে মূলতান পর্য্যন্ত আগমন করেন। তৎপরে খৃীঃ ৭১১ অব্দে খলিফে বালিদের সময় বসোরার শাসনকর্ত্তার ভ্রাতষ্পুত্র মোহম্মদ কাসিম, জলপথে দেবল (Dewal) নামক বন্দরে উপনীত হন, এবং সমস্ত সিন্দুদেশ জয় করেন। কিন্তু চিতোর রাজবংশের স্থাপয়িতা রাবলের যত্নে তাঁহার ভারত-জয়াশা অস্তমিত হয়। খৃীঃ ৭৫০ অব্দে মুসলমানগণ ভারত হইতে একেবারে বিদূরিত হয়। তৎপরে আর বহুদিন মুসলমানগণের উপদ্রব ছিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দিল্লী বহুদিন হইতেই ভারতের রাজধানী ছিল; খৃীঃ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে জয়পাল নামে একজন ক্ষত্রিয় বীর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সমগ্র পঞ্জাব তাঁহার করতলগত ছিল। তিনি সিন্ধুনদের অপর পারে রাজ্য বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিয়া খৃীঃ ৯৮ অব্দে পেশাবরের অপর পারে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তথায় গজনীরাজ সবক্তগীনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়; কিন্তু তিনি পরাস্ত হন। তৎপরে সবক্তগীন ভারত আক্রমণ করেন এবং সিন্ধুতীরস্থ প্রদেশসমুহ লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রাস্থান করেন। খৃীঃ ৯৯৫ অব্দে সবক্তগীনের মৃত্যুর পর মামুদ গজনীর রাজা হন। ইনি উপর্য্যুপরি খৃী ১০০১ অব্দ হইতে ১০২৪ অব্দ পর্য্যন্ত কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতের অনেক অনিষ্ট সাধন করেন। খৃীঃ ১০৩০ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার সময়ে খৃীঃ ১০২২ অব্দ হইতে লাহোর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ গজনীর অধিকার ভুক্ত হয়। খৃীঃ ১০৩৯ অব্দে মামুদের পুত্র মসায়ূদ লাহোরে রাজপাট স্থাপন করেন। এই সময়েও দিল্লীতে হিন্দু সম্রাট; তাঁহার প্রবল প্রতাপে মুসলমানগণ আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। মসায়ূদের পর তৎপুত্র, তৎপরে তৎপুত্র, তৎপরে মামুদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হন। খৃীঃ ১১১৮ অব্দে দ্বিতীয় মসায়ূদের পুত্র রায়রাম রাজা হন। রায়রামের পর তাঁহার পুত্র খসরু, তৎপরে তৎপুত্র খসরু মাণিক লাহোরের রাজা হন।

ইহার পরই ঘোরবংশ। খসরু মালিক মহম্মদ ঘোর কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য হিন্দুরাজাগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁরই সহিত পানীপথক্ষেত্রে, (তিরোরী) সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহম্মদকে পরাজীত হইতে (খৃীঃ ১১৯১ অব্দে) এবং গজনীতে পলায়ন করিতে হয়। প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মহম্মদ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার ভারতে আগমন করেন। এবার পৃথ্বীরাজ ভারতের প্রধান প্রধান রাজগণের সহিত মিলিয়া দৃশদ্বতী তটে মহম্মদ ঘোরিকে বাধা দেন। হিন্দুরাজাগণের

সৈন্য দেখিয়া সাহাবুদ্দীন প্রচার করিলেন, গজনী হইতে যতদিন দ্বিতীয় আদেশ না আসে ততদিন যুদ্ধ স্থগিত থাকুক। এই কথায় হিন্দুগণকে অপ্রস্তুত রাখিয়া সাহাবুদ্দীন রজনীযোগে অতর্কিত ভাবে বিপুল হিন্দুবাহিনী আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ প্রভৃতি খ্যাতনামা বীরপুরুষগণ নিহত হন। সাহাবুদ্দীন দিল্লী অধিকার করিলে, সংযুক্তা চিতায় জীবন বিসর্জন করেন। সাহাবুদ্দীন মহম্মদের পর কুতবুদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হন। ইনিই প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট। দিল্লীর কোতব মিনর ইহাঁর অক্ষয়কীর্ত্তি। কুতব, সাহবুদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন; এজন্য ইহার বংশীয় রাজগণ দাসরাজ নামে খ্যাত।

প্রাচীন ভারতের অধিবাসীর প্রকৃতি।

খৃষ্টাব্দের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর সেকেন্দার সাহ বেদ-কীর্ত্তিত পবিত্র পঞ্চনদে পদার্পণ করিয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহাবীর পুরু গরীয়সী জন্মভূমির বিদেশী বিজেতার গতিরোধে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী না হইলেও তিনি বিজেতার নিকটে অবমানিত, নিপীড়িত বা নিগৃহীত হন নাই। তাঁহার অসাধারণ সাহস, অসাধারণ বীরত্ব, অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, ইহার উপর আয়াদর-প্রিয়তার মহিমা দর্শনে প্রীত হইয়া বিজয়ী সেকেন্দর তাঁহাকে স্বপদে পুনস্থাপিত করেন; এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব বন্ধন করিয়া ভারতের অন্যান্য স্থান জয়-মানসে ক্রমে বিপাশা-তটে উপনীত হইলেন। এই সময়ে একজন সাহসী পুরুষ সেকেন্দরের শিবিরে উপনীত হইলেন। সাহসের সহিত ইনি কার্য্যতৎপরতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও রণপারদর্শিতা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন। সেকেন্দরকে সম্প্রীত করিয়া তাঁহার সাহায্যে অথবা নিজের বাহুবলে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা ইহাঁর উদ্দেশ্য ছিল। পুরুষ-প্রবর আপনার অপূর্ব্ব পুরুষত্বের মহিমায় উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন। যে সাধনায় সিদ্ধ হইতে তিনি সেকেন্দরের শিবিরে সমাগত হইয়াছিলেন, নানা বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়াছিলেন, ক্রমে সে সাধনা সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইল। সাহসী বীরপুরুষ গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে রাজধানী স্থাপন করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে সেকেন্দরকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু এই বীরপুরুষের প্রধান্য ও ক্ষমতা বিচলিত হইল না। পুরুষ-সিংহ অটলভাবে আপনার রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ক্রমে পঞ্চনদ হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল। এই পুরুষ-সিংহের নাম চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত যখন আপনার বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন একজন গ্রীক দূত তাঁহার সভায় উপনীত হন। দূতের নাম মেগাস্থিনিস্। মেগাস্থিনিস্ সেই সময়ের অবস্থা যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার বর্নিত বিষয়ের একটিমাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশীয় লোক সত্যবাদী, সরলহৃদয়, আতিথেয় ও সদাচারসম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে প্রায় চুরি হয় না। লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকে। ইহারা কদাচিত মোকদ্দমা করিতে অগ্রসর হয়। কোন গুরুতর বিষয় সম্পাদনকালে দলিলপত্র লিখিবার প্রয়োজন হয় না। ইহারা প্রায় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রবঞ্চনা বা জুয়াচুরি

নাই। কেহ কাহাকেও ঠকাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করে না। অর্থোপার্জ্জন মানসে কেহ প্রবঞ্চনা-জাল বিস্তার করিয়া সাধারণকে মোহিত ও দিশেহারা করে না।” চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারি লক্ষ লোক অবস্থিতি করিত; কিন্তু তথায় প্রতিদিন দেড়শত টাকার অধিক চুরি যাইত না। মেগাস্থিনিসের বিবরণে সে সময়ে ভারতবাসীদিগের চরিত্রের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবাসী সে সময়ে চরিত্রের গৌরবে এরূপ উন্নত ছিল। গ্রীসীয় দূত আহ্লাদ সহকারে ভারতবাসীর প্রকৃতির এইরূপ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টাব্দের কিঞ্চিদধিক ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে সাধুতার এইরূপ প্রশান্ত-জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তখন এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা-স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। উচ্চ শিক্ষার অভিমান এত পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। বীর বেন্‌থম, ম্যাট্‌সিনী, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতির নাম সভা সমিতিতে জলদ গম্ভীরস্বরে উদ্ঘোষিত হয় নাই। আত্মশাসন, জাতীয় মহা-সমিতি প্রভৃতির এত ছড়াছড়ি দেখা যায় নাই। তখন ইংলণ্ড অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। জার্ম্মনি গভীর অরণ্যানিতে পরিবৃত থাকিয়া অসভ্যদিগের আবাস-ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছিল। আর ইদানীন্তন সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর লীলাভূমি আমেরিকা আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনার অতীত বিষয় ছিল। তখন ভারতবর্ষে আপনাদের শাস্ত্র-পাঠে আপনারাই আমোদিত হইত, আপনা-দের সভ্যতা লইয়া আপনারাই পরিতৃপ্ত থাকিত। এবং আপনাদের আচার ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া আপনারাই সুখে ও শান্তিতে সময় অতিপাত করিত। এখন পরিবর্ত্তনশীল কালের সহিত সে সুখময় অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। লোক শিক্ষার সহিত, লোক প্রতারণারও বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং বৈদেশিক সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত বৈদেশিক পদ্ধতি অনুসারে চাতুরী, ছলনাও বদ্ধমূল হইতেছে। খ্রীষ্টের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশের সামাজিক চিত্রের সহিত খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রে এইরূপ প্রভেদ। যদি সে সময় পুনর্ব্বার উপস্থিত হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে ‘অনুসন্ধান’ লইয়া সমাজে উপস্থিত হইতে হইত না। এবং সাধারণের হিতসাধনের উদ্দেশে লাঞ্ছনা ও কষ্টের একশেষ ভোগ করিতে হইত না।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের শ্রাদ্ধ।

“সঙ্গীত-কল্পতরুর” বাদ্য-কাণ্ডে মৃদঙ্গ ও তবলার ভ্রমপূর্ণ বোলসমূহ প্রকাশ-সম্বন্ধে যে মতামত* প্রচার হইয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিবাদ এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পত্রেই প্রকাশ হয় নাই;—কেবল দুই একখানি পত্রিকার সম্পাদকীয় ও প্রেরিত স্তম্ভে মন্তব্য বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া কতকগুলি অসার ও অনর্থক তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। আমা-দিগকে ইহার প্রত্যুত্তর দিতে হইলেই কবির লড়াইয়ের ন্যায় কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের সে অভি-প্রায় নয়। সঙ্গীত-ক্ষেত্রে ভ্রমপূর্ণ বোলসমূহ

* গত সংখ্যক অনুসন্ধানে “সঙ্গীত-কল্পতরুর” মতামতে, প্রকাশক অপরের বোল তাঁহাকে না জানাইয়া বিশেষতঃ বোলগুলিকে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করিয়া সাধারণকে প্রতারিত করিতে বসিয়াছেন, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। সে কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও কিন্তু প্রকাশকের দলের কতকগুলি লোক তাহা চাপা দিয়া লোকের চোখে ধূল দিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তজ্জন্য বোলগুলি কিরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহাই সাধারণের চক্ষে ধরিয়া দিবার জন্য এই প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইল। আরও, আমরা এখনও সম্পূর্ণ সাহসের সহিত বলিতেছি যে, মুরারী বাবুর অন্যতম ছাত্র বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপা-ধ্যায় মহাশয়ের খাতা হইতে তালগুলি তাঁহার অমতে কৌশল করিয়া নকল করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে সতীশ বাবুও আমাদিগকে এক পত্র দিয়াছেন। সে পত্র বোল-চুরীর বিশিষ্ট প্রমাণ। যাহাহোক, প্রকাশকগণ এখনও তাঁহাদিগের ভ্রম বুঝেন, এই ভরসা।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সঙ্গীত-শিক্ষার্থী-দিগের সর্ব্বনাশের উপক্রম করিতেছে. তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া সাধারণের গোচরার্থে ‘সঙ্গীত-কল্পতরুর’ কথা তুলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার কোন সদুত্তর না দিয়া কতকগুলি কৎসাপূর্ণ বাক্যে সংবাদপত্র কলুষিত করা হইতেছে। তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি; তবে কিরূপ ভ্রমপূর্ণ হইয়া বোলগুলি প্রকাশিত হইয়াছে: তাহা জাজ্জ্বল্যরূপে সাধারণের চক্ষে প্রত্যক্ষ না করাইলে কেহই আমাদিগের মন্তব্যের প্রকৃত মর্ম্মানুধাবন করিতে পারিবেন না এবং অনভিজ্ঞ প্রতিবাদকারীগণেরও চক্ষু ফুটিবে না। এই বিবেচনায় ‘সঙ্গীত-কল্পতরু’ হইতে তাল, লয়, মাত্রা ও ছন্দের কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আসলের ভাণ করিয়া কিরূপে মেকি চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

১। গ্রন্থকার চৌতালের ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন,—“একবার ১টী তাল দিয়া ১টী ফাঁক দিতে হয়; তৎপরে আবার ৩টী তাল দিয়া ১টী ফাঁক।” কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি চৌতাল না কোন একটা উদ্ভট তাল? চৌতালের এরূপ মাত্রা-বিন্যাস কোন্ সঙ্গীত-শাস্ত্রে আছে? সামান্য ঢুলিরাও জানে যে, চৌতালের সম হইতে উঠিয়া একটী ফাঁক, আর ১টী তালের পর ১টী ফাঁক; এবং তৎপরে দুইটী তাল। প্রথম দুইটী গুরু, পরে দুইটী লঘু মাত্রা এই তালে ব্যবহৃত হয়।

২। ধামালের ঠেকায় লিখিয়াছেন:— “কধেটে ধেটে ধা গদিন্ দিন্‌তা ধতা” ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করি, এই শেষোক্ত “ধতা” শব্দটী কি গ্রন্থকর্ত্তার নিজের সঙ্গীত-শাস্ত্রাভিজ্ঞতার ফল? এই কথাটী যোগ করাতে যে ঠেকার মাত্রা বৃদ্ধি ও লয় ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা কি জ্ঞান নাই!

৩। চৌতালের ৮ ও ১০ নম্বরের বোল দুইটীর সৌসাদৃশ্য দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এই দুইটী, ২খানি আদি বোলের হস্তপদ ভগ্ন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। একটী বোলের অর্দ্ধেক ৮ নম্বরের প্রথমে ও অপরার্দ্ধ ১০ নম্বরের শেষ ভাগে, এবং আর একটী বোলের অর্দ্ধেক ১০ নম্বরের প্রথমে ও অপরার্দ্ধ ৮ নম্বরের শেষ ভাগে দেওয়া হই-য়াছে। এই দুই খানি আদি বোলের ১টি “রেলা” ও অপরটী “আড়ি” গ্রন্থকর্ত্তা এই দুইটী বিভিন্ন ছন্দ একত্র করিয়া লয় ও ছন্দের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। এবং তালে মিলাইতে না পারিয়া আঘাত স্থানে ফাঁক ও ফাঁকের স্থানে আঘাত দিয়া বোল দুই খানির অপরূপ মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। ৮ নং খানি ১১ মাত্রায় ও ১০ নং খানি ২১ মাত্রায় সম রাখা হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য, বোলেরও মাত্রা চুরি?

৪। চৌতালের ৩৭নং বোল খানি ৪ খানি আদি বোল একত্র করিয়া ১ খানি করিয়াছেন, এবং প্রতি বোলের সমের ধা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বোল খানি ২৮ মাত্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাহা কি কখন হইতে পারে? চৌতা-লের ঠেকা যদি ৬ মাত্রা হয়, তবে হয় ৪×৬= ২৪, নতুবা ৫×৬=৩০ মাত্রায় শেষ হইতে পারে। এই রকমের ভুল আরও অনেক বোলে আছে। আড়া চৌতালের ঠেকার ও বোলের এবং অন্যান্য তালের বোলসমূহে কোন মাত্রা-চিহ্ন নাই। ইহাতে শিক্ষার্থীর কথা দূরে থাকুক, গ্রন্থকার বা প্রকাশক ইহার মধ্যে কাহারও এমন ক্ষমতা আছে যে, এই সমস্ত বোল তাল দিয়া পাঠ করিতে পারেন? কখনই না।

৫। একতালার ঠেকার মধ্যে “ঘেড়ে,” আর ঐ তালের ২৭নং বোলের প্রথমে “কুমাড়ী” এই দুইটী শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ইহার অর্থ কি? এরূপ স্থলে এ দুইটী শব্দের কিছুই

সুসঙ্গত অর্থ হইতে পারে না। আশা করি, প্রকাশক অনুগ্রহ করিয়া উক্ত দুইটী শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া সাধারণের উপকার করিবেন।

৬। ত্রিতালীর ৩৮ নং বোল খানিতে অর্দ্ধেক মাত্রা দেওয়া হইয়াছে, আর অপরার্দ্ধ মাত্রা দিতে পারেন নাই। তাহার কারণ বোল খানি সতীশ বাবুর খাতাতেই অসম্পূর্ণ ছিল। বোধ হয়, এই জন্য হাল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে বোধ হয়, সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে, কিরূপ গুরুতর ভ্রমাত্মক বোল সকল প্রকাশিত হইয়া শিক্ষার্থীর মাথা খাইতে বসিয়াছে। কেবল যে উপরোক্ত কয়টী ভুল আছে, তাহা নয়। যদ্যপি পুস্তক খানির সমস্ত ভ্রম প্রদর্শন করা যায় তবে একখানি সংবাদ পত্রে স্থান সংকুলান হয় না।

উপসংহারে আমাদিগের প্রবন্ধের প্রতিবাদকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি বলিতে চান? এইরূপ ভ্রম পরিপূর্ণ তাল, লয় ও ছন্দভ্রষ্ট তালসমূহ প্রকাশ হওয়াতে কি শিক্ষার্থীর অপকারের সম্ভাবনা নাই? ইহাতে কি মৃদঙ্গ বিদ্যার পুনরুন্নতি সাধনে বিঘ্ন ঘটিবে না? ইহা কি কেবল অর্থ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য সাধারণকে প্রতারিত করা নয়? এরূপ পুস্তকের সাহায্যে কি কেহ কখন বাদ্য বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন? কখনই না। এই জন্যই আমরা যাহাতে 'সঙ্গীত-কল্পতরুর' অসার অপদার্থ বীজ রোপিত হইয়া সঙ্গীত-ক্ষেত্রে ভীষণ আগাছা উৎপন্ন করিতে না পারে, তাহার প্রতিবিধানার্থ সংবাদ পত্রে বাদানুবাদ করিতেছি। কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্মানুধারণ না করিয়া কতকগুলি অদূরদর্শী নীচাশয় ব্যক্তি আমাদিগের প্রস্তাবের মীমাংসা ও সদুত্তর না দিয়া আধুনিক বিশ্বনিন্দুকের ন্যায় জঘন্য কুৎসিত বাক্য দ্বারা সংবাদপত্র দূষিত করিতেছেন। আশা করি, তাঁহারা যদ্যপি পুস্তকের ভ্রম স্বীকার না করেন, তবে বৃথা বাক্ বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই: ইতরের ন্যায় ইতর ভাষা ব্যবহারে আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি নাই।—শ্রীনিত্যকিঙ্কর গুপ্ত।

বৈদিক মন্ত্র।

অথ পঞ্চদশী, ১৫শ মন্ত্র।

সপ্তাস্যাসন পরিধয় স্ত্রিঃসপ্তসমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥১৫॥

অস্য সাঙ্কল্পিকস্য যজ্ঞস্য গায়ত্র্যাদীনি সপ্ত ছন্দাংসি পরিধয় আসন্। ঐষ্টিকস্যাহবনীয়স্য এয়ঃ পরিধয় ঔত্তর বেদিকাস্ত্রয় আদিত্যশ্চ সপ্তমঃ পরিধিপ্রতিনিধিরূপঃ। অতএব ম্নাতে, "নপুরস্তাৎপরিদধাদাদিত্যো হ্যেবোদ্যন্ পুরস্তাৎ রক্ষাংস্যপহন্তি ইতি।" তত এতে আদিত্যসহিতাঃ সপ্তপরিধয়োঽত্র সপ্তছন্দোরূপাঃ। তথা সমিধঃ ত্রিঃসপ্ত ত্রিগুণিত সপ্তসংখ্যাকা একবিংশতিঃ কৃতাঃ। দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তব স্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশ ইতি শ্রুতাঃ পদার্থাঃ একবিংশতি দারু যুক্তেধ্মত্বেন ভাবিতাঃ। যদ্যঃ পুরুষো বৈরাজোঽস্তি তং পুরুষং দেবাঃ প্রজাপতিপ্রাণেন্দ্রিয়রূপাঃ যজ্ঞং তন্বানাঃ মানসং যজ্ঞং কুর্ব্বাণাঃ পশুমবধ্নন্ বিরাট্পুরুষমেব পশুত্বেন ভাবিতবন্তঃ। এত দেবাভিপ্রেত্য পূর্ব্বত্র "যৎপুরুষেণ হবিষা" ইত্যুক্তম্॥১৫॥ সায়ন্

যাজ্ঞিক দেবতারা মানসিক যজ্ঞ সম্পাদনকালে সেই বিরাট্ পুরুষকে পশুরূপে কল্পনা করিয়া যখন বন্ধন করিলেন, তখন গায়ত্রী, উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ, বৃহতী পংক্তি, জগতী এই ৭টি ছন্দঃ ৭টি বেদীরূপে কল্পিত হইল। এবং ১২শ মাস, ও ৫ ঋতু,* ৩ লোক (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল) ও সূর্য্য, এই একবিংশ পদার্থ, যজ্ঞীয় সমিধ্ রূপে (একবিংশতি কাষ্ঠিকা) কল্পিত হইল। ১৫। বাং

* মহা মহোপাধ্যায় সায়নাচার্য্য, হেমন্ত ও শিশির এই উভয়কে এক করিয়া পঞ্চ ঋতু ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার প্রমাণও "বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে" দেখা যায়, "দ্বাদশমাসাঃ পঞ্চর্ত্তবো হেমন্ত শিশিরয়োঃ সমাসেন" ইতি।

অথ ষোড়শী, ১৬শ মন্ত্র।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি
প্রথমান্যাসন্। তেহ নাকং মহিমানঃ
সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥১৬॥

পূর্ব্বং প্রপঞ্চেনোক্তমর্থং সংক্ষিপ্যাত্র দর্শয়তি। দেবাঃ প্রজাপতিপ্রাণরূপা যজ্ঞেন যথোক্তেন মানসেন সংকল্পেন যজ্ঞং যথোক্তযজ্ঞস্বরূপং প্রজাপতিং অযজন্ত পূজিতবন্তঃ। তস্মাৎ পূজনাৎ তানি প্রসিদ্ধানি ধর্ম্মাণি জগদ্রূপ বিকারাণাং ধারকাণি প্রথমানি মুখ্যানি আসন। এতাবতা সৃষ্টিপ্রতিপাদক সূক্ত ভাগার্থঃ সংগৃহীতঃ। অথোপাসন তৎ ফলানুবাদক ভাগার্থঃ সংগৃহ্যতে। যত্র যস্মিন্ বিরাট্ প্রাপ্তিরূপে নাকে পূর্ব্বে সাধ্যাঃ পুরাতনাঃ বিরাড়ুপাস্তি সাধকাঃ দেবাঃ সন্তি তিষ্ঠন্তি তং নাকং বিরাট্ প্রাপ্তিরূপং স্বর্গং তে মহিমানঃ তদুপাসকাঃ মহাত্মানঃ সচন্ত সমবয়ন্তি প্রাপ্নুবন্তি॥১৬॥ সায়ন্

প্রজাপতি বিরাট পুরুষের প্রাণভূত দেবগণ, যথোক্ত মানসিক যজ্ঞ দ্বারা যথোক্ত যজ্ঞস্বরূপ বিরাট পুরুষকে পূজা করিয়াছিলেন। সেই পূজার নিমিত্ত, সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ জগদ্রূপ বিকারের ধারণকারী, পদার্থ সকল জন্মিয়াছিল। যে সকল পুরাতন বিরাটপুরুষোপাসক দেবগণ বিরাট্প্রাপ্তিরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হইতেছেন, এই মন্ত্র দ্বারা এই সূক্তঘটিত সৃষ্টি প্রতিবাদক অংশের উপসংহার করা হইল, এবং উপাসনা ও তৎফলও উপসংহৃত হইল। ১৬।* বাং

শ্যামাসুন্দরী।

যেমন একদিকে পদ্মাবতী, তেমন অন্যদিকে শ্যামাসুন্দরীও কপালকুণ্ডলার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিতেছেন। পদ্মাবতী সংসারের পঙ্কিল কীট, কপালকুণ্ডলা অরণ্যের পবিত্র প্রসূন। পদ্মাবতী শুদ্ধ অদৃষ্টবাদ বুঝাইতেই কপালকুণ্ডলার সহচারিণী (duplicate) নহে, পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলার পরোপচিকীর্ষা, সরলতা ও সর্ব্বোপরি পবিত্রতাও প্রদর্শন করিতেছে। কপালকুণ্ডলা নিজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াও অপরিচিত নবকুমারের প্রাণ রক্ষা করিল, পদ্মাবতী স্বীয় প্রণয়ভাজন, উপকারী বান্ধব সেলিমকে রাজ্যচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল,—নিজের সুখের জন্য অমন কপালকুণ্ডলাকেও স্বামীত্যাগ করাইতে প্রস্তুত হইল! যেপ পদ্মাবতী, ঠিক সেইরূপ না হউক, শ্যামাসুন্দরীও কপালকুণ্ডলার সহচারিণী (duplicate)। পাঠক একবার সেই শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথোন স্মরণ করুন—একদিকে কুলীনপত্নী স্বামী-বিরহিনী শ্যামাসুন্দরী, স্বামীসোহাগের জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছে, অন্য দিকে তাহারই কাছে বসিয়া কপালকুণ্ডলা অমন দেবদুর্লভ স্বামী নবকুমারের অমন আনুরক্তি অবাধে অগ্রাহ্য করিতেছে। এক দিকে শ্যামাসুন্দরী সংসারের সমস্ত সুখগুলি নিজে মুগ্ধচিত্তে দেখিয়া কপালকুণ্ডলাকে দেখাইতেছে ও দেখিয়া মুগ্ধ হইতে বলিতেছে, অন্য দিকে কপালকুণ্ডলা সংসারের কিছুতেই সুখ না দেখিয়া সেই বনে বেড়াইবার সাধ প্রকাশ করিতেছে। কি সুন্দর যুগল চরিত্র! কপালকুণ্ডলাকে শ্যামাসুন্দরীর কাছে আনিয়া কবিবর তাহাকে যেন সমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন—দিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহাতেও কপালকুণ্ডলার বাল্যশিক্ষা পরিবর্ত্তিতা হইল না। শ্যামাসুন্দরী ও পদ্মাবতী সংসারের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুই ভাগের দুইটি ছবি। সংসার ছাড়া কপালকুণ্ডলার সহিত ইহারা উভয়েই তুলনীয়।

আবার পদ্মাবতীর যেমন একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে, শ্যামাসুন্দরীরও সেইরূপ একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে। অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইতে কবি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও, ইহাদের চরিত্রে সে ভাগ ছাড়া আরও

*এই পুরুষ সূক্ত মন্ত্র বিষ্ণুর অভিষেক ও হোমাদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কিছু আছে। পদ্মাবতীর কথা বিস্তৃত ; শ্যামাসুন্দরীর কথা সংক্ষিপ্ত, তাহাই এই স্থলে বলিব।

শ্যামাসুন্দরীর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি অর্থাৎ চিত্রের রেখাপাতগুলি বড়ই সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী। যেমন সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিভিন্ন 'বাদী' (জান) থাকে, সেই ভাগটা জানা থাকিলেই, বাকী ভাগটা অনায়াসে সাধিত হইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 'জান' থাকে. চরিত্রের সেই ভাগটা জানিতে পারিলেই, অন্য ভাগটা সহজেই জানা যায়। শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রের এই অন্ত ভাগটি (জান) কবি খুলিয়া দেখাইয়াছেন—তাই শ্যামাসুন্দরীর চিত্রে রেখাপাত মাত্র হইয়া থাকিলেও, চিত্রটি সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কথাটি ক্রমে খুলিয়া বলিতেছি।

কপালকুণ্ডলার 'অবরোধে' নামক অধ্যায়ে শ্যামাসুন্দরীর সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ।

"শ্যামাসুন্দরী মৃন্ময়ীর নিকটে একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

'বলে, পদ্মরাণী, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার,বনের লতা,ছড়িয়ে পাতা,গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নাম্‌লে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছিছি,শরম টুটে,কুমুদ ফুটে,চাদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখ্‌তে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি, একি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পর পরশে সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ।
তুই কিলো একা তপস্বিনী থাকিবি।'

মৃন্ময়ী উত্তর করিল, 'কেন, কি তপস্যা করিতেছি ?'' ইহার পর আর এক দিনমাত্র শ্যামাসুন্দরীকে আমরা দেখিয়াছি। সেদিন শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা নিম্নলিখিত কথোপকথন করিতেছেন।

"কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'ঠাকুরজামাই আর কতদিন এখানে থাকিবেন ?' শ্যামা কহিলেন, 'কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি-ঝাঁটা খাইলাম, আর আজ বাহির হইব কি প্রকারে ?' ইত্যাদি—সমগ্র উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

এই অধ্যায় দুইটি, বিশেষতঃ প্রথমটি পড়িয়া আমরা যেন দেখিতে পাইতেছি, শ্যামাসুন্দরী মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাদিগের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। মুখখানি মধুর আনন্দে ভরা—হৃদয়খানি সংযত প্রেমলালসায় পরিপূর্ণ। শ্যামাসুন্দরী যুবতী—সংসার যেন এখন তাঁহার নিকট সুখের সামগ্রীগুলিকে সুবর্ণবর্ণে বিভাসিত করিয়া একখানি চিত্রপটে আঁকিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে। সেই সামগ্রীগুলি শ্যামাসুন্দরীর বড়ই প্রীতিকর—তাহা পাইবার জন্য শ্যামাসুন্দরী বড়ই লালায়িত। কিন্তু সে সামগ্রীগুলি কিছু দূরে—শ্যামাসুন্দরীর পক্ষে তাহা সহজপ্রাপ্য নহে, তাই শ্যামাসুন্দরী হর্ষবিষাদে মিশ্রিত মনোভাব লইয়া তদ্দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুখ—জিনিসগুলি দেখিয়া, তাহার মনোহারীত্ব কল্পনা করিয়া ; দুঃখ—তাহার অপ্রাপ্যতা বা কষ্টপ্রাপ্যতা নিবন্ধন। সম্মুখে কপালকুণ্ডলা বসিয়া রহিয়াছেন—শ্যামাসুন্দরী সেই চিত্রপটখানির সৌন্দর্য্য তাহার নিকটে ব্যাখা করিতেছেন। কপালকুণ্ডলা কিছুই বুঝিতেছে না—শ্যামাসুন্দরী তাহাকে বুঝাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন—চিত্রপটের রঙগুলি সহস্রগুণে সুন্দর করিয়া কপালকুণ্ডলাকে দেখাইতেছেন ও সে বুঝিতেছে না বলিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইতেছেন। আমার অতি প্রিয় দুর্লভ দ্রব্যকে যে ব্যক্তি সহজে

পাইতে পারে, সে যদি তাহা পাইবার চেষ্টা না করে, তবে যেমন আমার মনে ক্ষোভ হয়, শ্যামাসুন্দরীর তাহাই হইতেছিল। যাহা তাঁহার চক্ষে এত প্রীতিকর, কপালকুণ্ডলা তাহা সহজেই পাইতে পারে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাহা চাহিতেছে না। হায়! শ্যামাসুন্দরী যদি ঐরূপ হইত, তবে না জানি তিনি কত সুখীই হইতে পারিতেন, এইরূপ একটা কথা তাঁহার মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে ক্রীড়া করিতেছে।

পাঠক, স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়া পরমিলনদর্শনেচ্ছু বিরহিণী শ্যামাসুন্দরীর মূর্ত্তিটি সুন্দর নয় কি! শ্যামা কুলীন-পত্নী—স্বামী সোহাগে প্রায়ই বঞ্চিত। অথচ স্বামীসোহাগ যে কি পদার্থ তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। বিরহের সুশীতল ছায়ায়, কল্পনার বারিসেকে সে ভাবটি ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইয়া লতার ন্যায় এখন তাহা সমগ্র শ্যামাসুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। শ্যামাসুন্দরী এখন সেই লতাভারে অবনতা। সম্মুখে কপালকুণ্ডলাকে সেই স্বামীসোহাগের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিতেছেন। সংসারের সুখগুলি তাহাকে বলিয়া দিতেছেন—সংসার চিনিলেই কপালকুণ্ডলা স্বামী চিনিবে। যাহাতে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সহিত মিলিতা হয়, শ্যামাসুন্দরীর এখন কেবল সেই চেষ্টা। বিরহিণীগণ অপরের মিলন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত একরূপ মৃদু মধুর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। কপালকুণ্ডলা গম্ভীরা প্রকৃতি—স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার কোন চেষ্টা নাই। দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিত—শ্যামাসুন্দরী ভাবিতেছেন—'তাও কি হয় ? স্ত্রী কি স্বামীর মন তুষ্ট করিতে যত্নবতী না হইয়া থাকিতে পারে ? কপালকুণ্ডলাও তবে যত্ন করে। বুঝি তাহা গোপনে করে।' তাই শ্যামাসুন্দরী উক্ত শ্লোক পড়িতে পড়িতে তাহাই ভাবিতেছিলেন, ও কপালকুণ্ডলাকে তাহাই ইঙ্গিতে বলিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলাকে যখন কিছুতেই আপন মতে আনিতে পারিলেন না—আপনার মত প্রেমোন্মাদিনী করিতে পারিলেন না, তখন শ্যামাসুন্দরী তাঁহার কল্পনার স্বপ্নে দৃষ্ট সংসারের চিত্রপটখানি, তাহার সম্মুখে ধরিলেন। বলিলেন, 'বাধাঁব ফুলের রাশ,' ইত্যাদি। শ্যামাসুন্দরীর নিকটে ইহাই স্বর্গসুখ—স্তরে স্তরে কাব্যময় বর্ণনা উপরে উঠিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী, বলিলেন 'সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি না লাগে।" কথাটি শ্যামাসুন্দরীর আকাঙ্ক্ষার কথা—তাঁহার সুখের চরমোৎকর্ষের কথা। কি সুন্দর—কি স্বাভাবিক! ইহাই রমণীর কথা! শ্যামাসুন্দরী কথাটি বলিয়া জয়াশা করিয়া না জানি কি সুন্দর ভাবেই কপালকুণ্ডলার দিকে চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আনন্দের সহিত শ্যামাসুন্দরীর একটু দুঃখের ভাবও মিশ্রিত ছিল। উভয়ের মিশ্রণে যেরূপ হর্ষ ভাবটি সঞ্জাত হয়, গ্রন্থকার তাহা প্রথমে আমাদিগকে দেখাইলেন—শেষে যখন মৃন্ময়ী বলিল—(ফুল ফুটিলে) 'লোকের দেখে সুখ ; ফুলের কি ?' কবি আমাদিগকে সেই হর্ষবিষাদ মিশ্রণে যে দুঃখ ভাবটি সঞ্জাত হয়, তাহাও দেখাইলেন। পূর্ব্বে দুঃখমিশ্রিত সুখ দেখিয়াছি—এখন সুখমিশ্রিত দুঃখ দেখিলাম। কুলীনপত্নী হিন্দুরমণী শ্যামা কুটিয়া নিজে সুখী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু পাঠকবর্গকে সুখী করিয়াছেন। মৃন্ময়ীর কথাটিই ঠিক হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা শ্যামাসুন্দরীকে যেরূপ দেখিলাম শেষ অধ্যায়ে ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইলাম না। প্রথম অধ্যায়ে শ্যামাসুন্দরী, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মিলন ও সুখ দেখিবার জন্য লালায়িত—শেষ অধ্যায়ে

শ্যামাসুন্দরী নিজের সুখের জন্য উৎকণ্ঠিত। স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব। সেই স্বামী-প্রাপ্তির জন্য সে সব করিতে পারে। শ্যামা-সুন্দরীর অমন নির্ম্মল হৃদয়েও স্বামীর কথায় একটু মলিনতা পড়িল। সেই মলিনতাও বড়ই স্বাভাবিক ও বড়ই শ্যামাসুন্দরীর মত। অদ্য শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের অসন্তোষ-ভাজন করিয়াও স্বামীবশীকরণের ঔষধ সংগ্রহে কপালকুণ্ডলাকে বনমধ্যে প্রেরণ করিতে মনে মনে প্রস্তুত। প্রকাশ্যে নিষেধ করিতেছেন—কিন্তু মনের অভিলাষ অন্যরূপ। অমন স্বামীসোহাগ-লালসা-পূর্ণ শ্যামাসুন্দরীর হৃদয় ত এইরূপই হইবে!

তবেই আমরা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি, শ্যামাসুন্দরী-সঙ্গীতের প্রাণ বিরহিণীর মিলন-পিপাসার অপরিতৃপ্তি-জনিত দীর্ঘশ্বাস, অন্য দম্পতি-মিলন-দর্শন-লালসা— যুবতী হৃদয়ে স্বাভাবিক আনন্দে আনুরক্তি ও রসপ্রবণতা— সংসারীর অনাস্বাদিত সংসার-সুখের আকাঙ্ক্ষা ও তৎপ্রতি কল্পনার মোহময় মধুর দৃষ্টি! যে সঙ্গীতের এইরূপ প্রাণ তাহা মধুর নয় কি?

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

নিরাশ-প্রণয়—(সামাজিক উপন্যাস) "মহাপ্রস্থান ও মোহিনী প্রতিমা বা সরলা" রচয়িতা প্রণীত। পুস্তকের ভাষাটী বেশ প্রাঞ্জল, গল্পটীও বেশ কৌতূহলপ্রদ। তবে উপন্যাসের প্রাণ—চরিত্র-গঠনে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে অকৃতকার্য্য হইয়া সকল চিত্রগুলি কল্পনা তুলিকায় সুপরিস্ফুট করিতে সমর্থ হন নাই। যাইহোক, ইঁহার অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দিই। আর বরাবর এরূপ উদ্যম থাকিলে, কালে ইনি একজন সুলেখক মধ্যে পরিগণিত হইবেন।

সাময়িক পত্রিকা-সম্বন্ধে।

চিকিৎসা-দর্শন—মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহার প্রথম বৎসর বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে; সম্প্রতি দ্বিতীয় বর্ষের কএক সংখ্যাও আমরা পাইয়াছি। এ বর্ষের গ্রাহক-গণ, কিছু অধিক মূল্য দিলে, চিকিৎসা-প্রণালী, 'ঔষধ-সারসংগ্রহ' ও 'ইডিওম্যাটিক্ রেমেডিস্' নামক তাঁহার প্রণীত তিন খানি পুস্তক উপহার পাইবেন। আমরাও ইহার এক সেট উপহার পাইয়াছি। পুস্তক কয়েকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই বেশ পরিষ্কার, জিনিসগুলিও প্রয়োজনীয় বটে। বিশেষ কথা বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—ইঁহাদের সম্বন্ধে নূতন কিছু আর বলিবার নাই। 'নন্দবিদায়' ও 'প্রভাস-মিলন' উত্তরোত্তর বেশ দক্ষতার সহিত অভিনয় হইতেছে।

আর্য্য-নাট্য-সমাজ।—এ সম্প্রদারের-রও 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি নাটকগুলি দিন দিন অভিনয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে। 'ভ্রান্তি-বিলাস' দেখিবার জিনিস বটে।

ষ্টার থিয়েটারে 'সরলা'।— শুভক্ষণে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নাটকালোচনায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এতদিনে আমাদের আশা ফলবতী হইবার সূত্রপাত হইল। ষ্টার কোম্পানীও সময় বুঝিয়া—লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটক-চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হই-লেন। কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না; সুপ্রসিদ্ধ "স্বর্ণলতা" উপ-ন্যাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত "সরলা"-চরিত্র নাটকাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়া-ছেন। ধর্ম্মের ঢেউ, হরিবোলের ধূম এখন

কিছু মন্দীভূত হইলে মধ্যে সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ ডি, দর্শনে আত্মহারা হই ২৫২৬ বৎসর এই জন্যও মন তন্ময়ত্বভাবে টাকা উপার্জ্জন দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ, ঔষধের বিক্রয় বীভৎস প্রভৃতি রসের আবির্ভাব হইল গুপ্ত" সেই ত অভিনয়, সেই ত নাট্যচিত্র। উপাস্থ্য 'সরলা' নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা সে আশার সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিয়াছি। ইহার কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে সুখ্যাতি করিব? সেই হিংস্র-বিষপূর্ণা কাল ভূজঙ্গিণী প্রমদার,— না সেই কোমল হৃদয়া, কুটীল সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা পতিপ্রাণা সাধ্বী দেবী-রূপা সরলার? আবার অন্যদিকে হাস্যরসের সপ্ত-সমুদ্র সেই নীলকমল, না সেই অক্ষয় গ্রন্থের অক্ষয় সৃজিতা আদর্শ-নারী শ্যামা দাসীর? এক দিকে ভ্রাতৃ-বৎসল বিধুভূষণ, ও অন্যদিকে দানবী স্ত্রীর মন্ত্রে মুগ্ধ কাপুরুষ শশীভূষণ! ফলতঃ ভালর কোলে মন্দ ও মন্দের কোলে ভাল না থাকিলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয় না। ঘটনা স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়েকে উদ্বেলিত করিতে না পারিলে নাটক হয় না; আর তাহা অভিনয় করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থে তাহা প্রচুর পরি-মাণে পরিলক্ষিত হয়। *আমরা এই অভিনয় দেখিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। আবার সময়ে সময়ে হাসিতে হাসিতেও পেটের নাড়ী ছিড়িয়া গিয়াছে। সেই 'ডিডি—ডিডি ঐ চল্লে' গদাধরের উক্তি এখনও আমাদের কর্ণে যেন লাগিয়া রহিয়াছে। আর— সেই সরলার মর্ম্মভেদী শেষ দৃশ্য; সেই দৃশ্য অনেক দিন স্মৃতি-পটে রিরাজ করিবে। শিশু গোপালের "মা আমার খিদে পাইনি, তুই কাঁদিস্‌নে" সেই মর্ম্মস্পর্শী উক্তি বড়ই স্বাভাবিক। ফলতঃ অভিনয়ে আমরা নিন্দার বড় কিছুই দেখিতে পাই নাই; যদি বা কিছু হইয়া থাকে, তাহা সে অপার গুণরাশির মধ্যে

ইহাদের কি অভিভাবক নাই!

প্রতারক গ্রাহকের জ্বালায় অনেকেই জ্বালা-তন, কিন্তু তার মধ্যে কেহ কেহ বড়ই নূতনতর ফন্দিবাজ। বিল্যাফের গ্রাম, সাঁকরাইল পোঃ, টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে রজনীকিশোর অধি-কারী নামক একব্যক্তি অনুসন্ধানের গ্রাহক হন এবং দু এক সংখ্যা পাঠাইলেই টাকা দিতে 'স... অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে কাগজ জীবনে নিয়ম না থাকিলেও, তাঁহার অনুনয়ে ... কএক সংখ্যা যাবৎ কাগজ অনুসন্ধ... শেষে মূল্য পাঠাইতে বিলম্ব প্রতার... নিয়ম মত ভ্যালু-ডাকে এন, সি, চাটু... পাঠাইয়া তাঁহাকে এক এই নাম দিয়া ১৯৮ নং ... ফেরত দিয়া কাতা ঠিকানা হইতে আজকাল ... র অনুসন্ধান প্রাইজিং ষ্টেসনারী বক্স" শীর্ষক এক ... জাঁকাল বিজ্ঞাপন গরিব, চট্টল-গেজেট ঢাকা-গেজেট প্রভৃতিতে বাহির হইতেছে। সঞ্জী-বনীতেও বিজ্ঞাপনটী "এক টাকায় ঘড়ি, চেইন, আংটী" ইত্যাদি শীর্ষক দিয়া লিখিত আছে। বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত বোলচাল এই যে, ১ টাকা দিলে বিনা প্যাকিং খরচে একটী বাক্স পাওয়া যাইবে; সে বাক্সে আবার লিখিবার সরঞ্জাম যাহা কিছু আবশ্যক অর্থাৎ চিঠির কাগজ, খাম, পেন্সিল, কালী, ম্যাজিক দোয়াত নিপ, ব্লটিংপ্যাড ইত্যাদি ইত্যাদি হইতে ইস্তক আলপিনটী পর্য্যন্ত সবই আছে। তাছাড়া, ঘড়ি, চেইন, অঙ্গুরী, ঝিনুকের বোতাম ইত্যাদি ইত্যাদিরও একটী না একটী ঐ বাক্সে থাকিবে। সুতরাং এক টাকায় ব্যাপারখানা কি, পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। কিন্তু শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয় যে, এমন ঘনঘটা-পূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া বাক্স কিনিয়া কিরূপে

---

* সমিতির সুযোগ্য মেম্বর শ্রীযুক্তবাবু বিপিনবিহারী বসু মহাশয় 'সরলা' সম্বন্ধে এই মন্তব্য দিয়াছেন। আর 'সরলা' চরিত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, আমরাও অবিকল তাহাই প্রকাশ করিলাম।

শ্যামাসুন্দরী নিজের সুখের জন্য উৎকণ্ঠিত। স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব। সেই স্বামী-প্রাপ্তির জন্য সে সব করিতে পারে। শ্যামা-সুন্দরীর অমন নির্ম্মল হৃদয়েও স্বামীর কথায় একটু মলিনতা পড়িল। সেই মলিনতাও বড়ই স্বাভাবিক ও বড়ই শ্যামাসুন্দরীর মত। অদ্য শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের অসন্তোষ-ভাজন করিয়াও স্বামীবশীকরণের ঔষধ সংগ্রহে কপালকুণ্ডলাকে বনমধ্যে প্রেরণ করিতে মনে মনে প্রস্তুত। প্রকাশ্যে যেরূপ করিতেছেন—কিন্তু মনের অভি আমাদিগকেও অমন স্বামীসোহাগ-লালসা-। ফলতঃ 'সর্-হৃদয় ত এইরূপই হইবে! কলকে 'সরপ্রাইজ'

তবেই আমরা নি

শ্যামাসুন্দরী-মৃতলাল চট্টোপাধ্যায়

পিপাসারদ্বার, এই নামের এক পোষ্ট কার্ডসহ একটী করিয়া ভ্যালুপেয়েবল প্যাকেট আজ-কাল অযাচিতভাবে মফঃস্বলের ভদ্রলোকগণের নিকট প্রেরিত হইতেছে। প্রেরিত পোষ্ট কার্ডের মর্ম্ম এই যে,—"আপনি সাহিত্যের উৎসাহদাতা। আপনার নামে কএকখানি সু র গ্রন্থ ভ্যালুপেয়েবল ডাকে পাঠাই; গ্রহণ করিয়া ভাষার উন্নতি করিবেন,ইত্যাদি।" বলা বাহুল্য, এই মর্ম্মের এক পত্রসহ একটি প্যাকেট সমিতির মফঃস্বলস্থ কোন মেম্বরের নিকটও প্রেরিত হয়। মেম্বর মহাশয় ব্যাপার কি বুঝি-বার জন্যই হউক অথবা লোভে পড়িয়াই হউক, সে প্যাকেট মূল্য দিয়া লয়েন। কিন্তু পরে তাহা খুলিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে 'কলিরভূষণ্ডী', 'হতভম্ব' প্রভৃতি ছাইভস্ম বর্ত্তমান। তিনি তো অবাক! যাইহোক, সাধারণে এখনও এইরূপ অজাচিত দ্রব্যের প্রতি সতর্ক থাকেন, এই ভরসা। উপসংহারে আমাদের সন্দেহ হয় যে, হয়ত বা এই অমৃতলালই সেই 'রত্ন-ঝাড়ির'* অমৃতলাল!

* প্রথম বর্ষের ১২ সংখ্যক অনুসন্ধানে ইহার বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

সাময়িক পত্রিকা-

চিকিৎসা-দর্শন—ম্যাজিসিয়ান। রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় তলিপাড়া, শ্যামপুকুর, প্রথম বৎসর বেশ 'জেকের' এক বড়ই জাঁকাল হইয়াছে; জাহির হয়। "গরু হারাইলে সংখ্যাগুলায়" সে বিজ্ঞাপনের এইরূপই চটক গল্প। বিজ্ঞাপন 'গরীব প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনটী দেখিয়াই আমাদের কিন্তু সন্দেহ হইয়াছিল। এখন আবার স্পষ্টই সন্ধানে জানা যাইতেছে যে, তাহার সকলই জুয়াচুরী। বিজ্ঞাপন-দাতা বিজ্ঞাপন ছাপাই-য়াও পয়সা দেন নাই; সম্পাদকগণকেও ফাকি দিয়াছেন; গ্রাহকগণকে তো দূরের কথা! এখন ভারপ্রাপ্ত হইয়া টাকার তাগাদা করিতে যাইলে আমাদের কর্ম্মচারীগণ সে ঠিকানায় ও নামের কোন চিহ্নই পান না। কোন জুয়া-চোর এইরূপে সকলকে প্রতারিত করিয়াছে, জানিতে পারেন। যাইহোক, ঠকিবার পূর্ব্বে একবার এ বিষয় সমিতিতে জানিলে ভাল হইত।

প্যাটেণ্ট ঔষধে জুয়াচুরী।

আজকাল আমাদের দেশে প্যাটেণ্ট ঔষ-ধের ছড়াছড়ি। যে কেহ একটি উৎকট পীড়ার ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তাহার সদৃশ গুণবিশিষ্ট ঔষধ যে কেহ আবিষ্কার করিবেন, তাঁহাকে এককালীন দশহাজার টাকা পুরস্কার দিতেছেন, কেহ তাঁহার ঔষধে রোগ আরোগ্য না হইলে সেই ঔষধের দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দিতেছেন, এইরূপ নানা প্রকার লম্বা-চওড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই প্যাটেণ্ট ঔষধের আবিষ্কর্ত্তাদিগের মধ্যে অশিক্ষিত মূর্খ লোকের সংখ্যাই অধি-কাংশ। এমন কি, যাহারা কোনরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তক কখন চক্ষে দেখে নাই, তাহা-রাই অধিকাংশ স্থলে প্যাটেণ্ট ঔষধের আবি-ষ্কর্ত্তা। এই সকল ঔষধ-বিক্রেতা অন্যের নকল করিতেও বিশেষ পটু। এই এক ম্যালে-

রিয়া জ্বরের ঔষধের মধ্যে সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ ডি, গুপ্ত কোম্পানি বিগত ২৫।২৬ বৎসর এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ঔষধের বিক্রয় দেখিয়া অনেক মহাপ্রভু আবার "বি, গুপ্ত" "সি, গুপ্ত" প্রভৃতি নানা ছাঁদের গুপ্ত সাজিয়া গুপ্ত ভাবে সাধারণকে ধাঁধা লাগাইতেছেন। দ্বিতীয় প্রিয়নাথ বাবুর "সুধাসিন্ধু।" "সুধা-সিন্ধুও" অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ডি-গুপ্ত তো দূরের কথা, আমাদের কোন বন্ধু গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই সুধাসিন্ধুরও প্রায় একশত প্রকার নকল ঔষধ হইয়াছে। সুতরাং সাধা-রণে দেখুন, ঔষধের বাজারে কি ভয়ানক প্রতারণা চলিতেছে। আমরা ক্রমশঃ তাহার বিস্তারিত বিবরণও সাধারণকে জানাইব।

রাজবংশের এ যে দুর্ণামের কথা!

ভূকৈলাশ রাজবাটীর কুমার শ্রীযুক্ত সত্য-বাদী ঘোষাল মহাশয় ইতিপূর্ব্বে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ও সংহিতাদি প্রকাশ করিবার বিজ্ঞা-পন দেন। ডাকমাশুল হিসাবে কিছু লই-য়াই পুস্তক বিতরিত হইবার কথা। তদনু-যায়ী, বিশেষ কুমার বাহাদুরের নাম দেখিয়া অনেকেই তাহার গ্রাহক হন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ পুস্তকের অংশবিশেষ মাত্র পাইয়া এবং কেহ বা না পাইয়া সমিতিতে নানা অভি-যোগ-পত্র লিখিতেছেন। যাইহোক, রাজ-বংশের এরূপ দুর্ণামে আমরা বড়ই সন্তপ্ত আছি। আশা করি, কুমার বাহাদুর আর শৈথিল্য না করিয়া সত্বর কোন সুবন্দোবস্ত করিবেন। ফলতঃ পাঠকগণও এ সম্বন্ধে কুমার বাহাদুরকে সন্দেহ না করেন, এই ইচ্ছা। সম্ভবতঃ অন্য কোন কার্য্যে পড়িয়াই তাঁহাকে এরূপ অপযশের ভাগী হইতে হইতেছে। যাইহোক, তিনি এ বিষয়ে আমাদিগকে সদুত্তর দিলে আমরা সুখী হইব।

ইহাদের কি অভিভাবক নাই!

প্রতারক গ্রাহকের জ্বালায় অনেকেই জ্বালা-তন, কিন্তু তার মধ্যে কেহ কেহ বড়ই নূতনতর ফন্দিবাজ। বিল্যাফের গ্রাম, সাঁকরাইল পোঃ, টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে রজনীকিশোর অধি-কারী নামক একব্যক্তি অনুসন্ধানের গ্রাহক হন এবং দু এক সংখ্যা পাঠাইলেই টাকা দিতে চান। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে কাগজ দেওয়ার নিয়ম না থাকিলেও, তাঁহার অনুনয়ে আমরা তাঁহাকে কএক সংখ্যা যাবৎ কাগজ দিই। কিন্তু শেষে মূল্য পাঠাইতে বিলম্ব দেখিয়া আমাদের নিয়ম মত ভ্যালু-ডাকে কয়েক সংখ্যা কাগজ পাঠাইয়া তাঁহাকে এক পত্র দিই। তাহাতে সে প্যাকেট ফেরত দিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি আপনার অনুসন্ধান আনিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলামএবং আপ-নিও পত্রিকা পাঠাইয়াছিলেন। পত্রিকা লইতে (অর্থাৎ মূল্য দিতে) পারিলাম না। কারণ, আমার অভিভাবকের অবস্থা এইক্ষণ অতিশয় খারাপ হইয়াছে।" পাঠক, দেখুন, কেমন উত্তর! যাইহোক, আমরা সন্ধানে জানিলাম; এই ব্যক্তি ঐরূপ করিয়া আরও অনেক দামী পত্রিকারও গ্রাহক হইয়াছেন ও তাঁহারা ধারে তাঁহাকে পত্রিকা দিতেছেন। এখন সকলেরই এই দশা হইবে, এই সম্ভব।

এইরূপ গোপীনাথপুর গ্রাম, ভগবানপুর পোঃ হইতে আশুতোষ সিংহ নামক এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়া গ্রাহক হন; কিন্তু ভ্যালু-ডাকে তাঁহার নামে কাগজ যাইলে তিনি তাহা ফেরত দিয়া প্যাকেটের উপর লিখিয়াছেন, কাগজ পাঠাইতে কোন পত্র আমাদিগকে লেখেন নাই। অথচ প্যাকেটে লিখিত নাম-পসহি প্রভৃতি পত্রের লিখিত সহি প্রভৃতির সহিত একই বোধ হইতেছে। শেষ কথা; এই উভয় ব্যক্তিই বালক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের অভিভাবকগণ, যদি কেহ থাকেন

তবে, এখনও ইহাঁদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এই বাসনা। কারণ, ক্রমে ইহাঁরাই রাজা-উজীর মারিতে পারেন !!

সংবাদ।

—অতঃপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা দেওয়া-নেওয়ার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রমজীবিগণের বিশেষ সুবিধা হইল।

—সম্প্রতি কানপুরে এক আশ্চর্য্য সহমরণ সংঘটিত হইয়াছে। পতির মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয়স্বজন সে শবদেহ চিতানলে অর্পণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। ইত্যবসরে তাঁহার অভাগিনী পত্নী, সকলের অজ্ঞাতসারে, সেই শ্মশানে উপস্থিত হন এবং বিশেষ আনন্দের সহিত সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করেন। তার পর, সকলে সন্ধান করিতে গিয়া দেখেন, সতী পতিক্রোড়ে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত।

—চোরের এ বড় অদ্ভুদ শাস্তি! মানিকতলার এক ভাড়াটিয়া গাড়ির ঘোড়া সর্ব্বদাই তত্রত্য খালধারে চরিয়া বেড়াইত। ঘোড়ার মালিক ঘোড়াকে কোর ও দানা খাওয়াইত না, ঘোড়া এইরূপে প্রায় ঘাস খাইয়াই জীবন কাটাইত। এই উপলক্ষে ঘোড়াটিকে কএকবার থানায় ধরিয়া লইয়া যায় এবং মালিক দণ্ড দিয়া খালাস করিয়া আনে। থানায় ঘোড়াকে দানা দিবার ব্যবস্থা; সুতরাং ঘোড়া ক্রমে দানার আস্বাদে বড়ই মোহিত হইয়া আসে; এবং এমন কি, দানার লোভে পরে সেইচ্ছা করিয়াই থানায় যাইতে আরম্ভ করে। একদিন রাত্রে খালধারে চরিবার সময় একজন চোর ঘোড়াটি চুরি করিয়া পলাইবার চেষ্টা পাইল; আস্তে আস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া নিজের গন্তব্য পথে চালাইতে গেল। এমন সময়, ঘোড়া কিন্তু সম্ভবতঃ সেই দানারই লোভে, সজোরে থানার দিকে ছুটিল; থানায় গিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইল। তখন থানার সকলে চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" কাজেই আমতা আমতা করিয়া চোর উত্তর করিল,—"আজ্ঞে! এ ঘোড়াআমার।" কিন্তু মধ্যে মধ্যেই যাতায়াত থাকায় পুলিসের লোক ঘোড়াকে চিনিত। সুতরাং চোর ধরা পড়িল!

—শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের বালিকা পুত্রবধূকে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, প্রমাণে এইরূপই দাঁড়াইতেছে এবং তাহার স্বামীই ঐ হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হইয়াছে!

—ষ্টুয়ার্ট নামক কলিকাতার এক সাহেবের মেম একদিন অনেক রাত্রিতে বাড়ী আসেন। স্বামী কিন্তু এদিকে তলে তলে সন্ধান পান যে, মেম সাহেব এক স্থলে নৃত্য করিতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে কোন যুবার সহিত মিশিয়াছিলেন। কাজেই রাগ অসহ্য হওয়ায় সাহেব মেমকে এক বেত মারেন। তাহাতেই এক ফৌজদারি কেস,—স্বামী ব্যাচারী শেষে ৫৲ টাকা দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন।

—'পিয়াস সোপ' নামক সাবান-বিক্রেতা যিনি, বৎসরে তিনি ১০ লক্ষ টাকা কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে ব্যয় করেন। বিজ্ঞাপনের জোরে আজকাল তাঁহার লাভও প্রায় বৎসরে ৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

—ভাটপাড়ার কালীকুমার ভট্টাচার্য্য নামক একব্যক্তি সচ্চিদানন্দ স্বামী নাম ধারণ করিয়া কলিকাতার এক অনাথাশ্রম ও গঙ্গার একটি ঘাট করিবার ছুতা করিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক আসাম অঞ্চলে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। কাকিনিয়াতে যাইয়াও এব্যক্তি নাকি এইরূপে অনেককে প্রতারিত করিয়াছে।

—বঙ্গদেশ বর্ষায় ডুবুডুবু; কিন্তু মাদ্রাজ ও হাইদ্রাবাদ অঞ্চল অনাবৃষ্টিহেতু একেবারে উৎসন্নপ্রায়।

—'পঞ্চায়েৎ' কাগজখানি সবে নূতন বাহির হইতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই সহযোগী শিলচর সংবাদ দিতেছেন,—"পঞ্চায়েৎ বাঁচে কি না সন্দেহ।" এ সংবাদে আমরা কিন্তু বড়ই দুঃখিত হইলাম; ছাইভস্ম মাখিয়া যেরূপেই হউক, ঈশ্বর করুণ যেন 'পঞ্চায়েৎ' প্রাণে প্রাণে বাঁচে।

—মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর কোনরূপ দৈব দুর্ঘটনায় তাহা উত্তোলন করিলে দেখা গেল, মৃত তখন আবার জীবিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে এইরূপ এক অদ্ভুদ ঘটনা ঘটিয়াছে, সংবাদ পাওয়া যায়।

—আফগানদিগের সহিত তুরস্কের বিবাদ এবং এদিকে তীর্ব্বতের সহিতে ইংরাজের বিবাদ ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে।

—মালবারের একজন ডেপুটী কলেক্টর ঘুষ লওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ডেলিচেরির সবজজও ঐরূপে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

—পূজা-উপলক্ষে আগামী ৩০ আশ্বিনের সংখ্যা 'অনুসন্ধান' বন্ধ থাকিবে।

অনুসন্ধান

:০(০)০:

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই কার্ত্তিক, ১২৯৫ সাল। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

এবার আমার পূজা হইল যেমন!

পূজায় সবাই নবভাবে।
নবরাগে অনুরাগে সকলি সুন্দর।
কিবা সেই শরদের শশী,
নীল মেঘে ঢাকে মৃদু হাসি;
পরিয়া অনন্ত গলে তারকার মালা,
অনন্ত গগন কিবা করে দিক্ আলা!
সেরূপ দেখিয়া আহা মরি,
বিজলী লুকায় উকি মারি;
বরুণ পালায় লাজে ত্যজিয়া অম্বর।

প্রকৃতি দরের কথা; মানুষ দুর্জ্জন—
আহা! তারাও দু'দিন তরে,
শোকতাপ ঢাকিয়া অন্তরে,
সদানন্দে করিয়াছে সার্থক জীবন;
দেখায়েছে, দানধ্যান, তপসংকীর্ত্তন।
কিন্তু সব বিচিত্র আমার,
তাই ইচ্ছা, বলি একবার,
এবার আমার পূজা হইল যেমন।

পূজায় আমার হায়! সকলি নূতন।
সপ্তমী অষ্টমী মোর নাই,
নবমীও দেখিতে না পাই,
বিজয়া দশমী শুধু আমার পূজায়।
বিজয়ার বিসর্জ্জনে চির ভাসি হায়!
ভাসিতেছি আজো সে তুফানে,
কোথা কূল, কিনারা কে জানে!
মা গেছে ভাসিয়া; আমি একেলা এখন।

আমার পূজার ঘটা বড়ই এবার।
সপ্তমী অষ্টমী দিনত্রয়,
ভগবতী গৃহেতে উদয়;
তবে কিন্তু বিচিত্র পূজার রূপ তাঁর;
আইলেন জ্বরা-রূপে গৃহেতে আমার;
তাই তাঁর পূজা-আয়োজন,
করিলাম আমিও তেমন,
বাজাইনু পূজাবাদ্য, করি হাহাকার।

উপবাস আহার দিলেম আমি তাঁয়;
মরুভূমে করিয়া শয়ন,
আপনি জ্বলেছি অনুক্ষণ,
তথাপি দিলেম স্থান তাঁয় হৃদাসনে,
বুকে-পিঠে সদাই রাখিনু সযতনে;
কিন্তু আর কিছু পারি নাই,
বন্ধু মোর বাদী হৈল তাই;
সাথী সেই, তার কথা, অবহেলা যায়!

অনুগামী অনুরাগী সদা সে আমার।
আহা, সে আমার সহচর,
মোরে ছাড়ি হয় না অন্তর:
কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, কি গৃহ, কি বন,
আমার সে সহচর—সাথী অনুক্ষণ;
কি যে মায়া বলা নাহি যায়,
শুভক্ষণে পেয়েছি তাহায়।
অহো মিত্র!—দরিদ্রতা! কি স্নেহ তোমার!
ছিলে তুমি, তেঁই পূজা হইল এবার।

'মরা মানুষ বেঁচে ওঠে।'

মেছুয়া-বাজারের রাস্তার ধারে, একটী বাড়ীর দুয়ারে বসিয়া, কএক জন ষণ্ডাকৃতি লোক "ভোঁ পো—ভোঁ পো" করিয়া বাজনা বাজাইতেছে; আর তাহাদের মধ্যের একজন সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার নানা সুরবেসুর করিয়া চেঁচাইতেছে,—"এক পয়সার ভেল্কী!—বড় মজাদার! মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠিবে। চক্ষের উপর জীবন্ত মানুষকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইবে ও সকলের সম্মুখেই তাহার খণ্ড অংশ সকল এক করিয়া পুনরায় বাঁচান যাইবে। এরূপ অদ্ভূত কাণ্ড কখনও হয় নাই। একটী মাত্র পয়সা দিয়া সকলে একবার দেখুন, কি আশ্চর্য্য ভেল্কি!"

লোকটীর তো এই কথা। তদ্ভিন্ন ঠিক এইরূপেরই বচন-প্রমাণ সহ কাপড়ে রঞ্জিত এক খানি কাটা মানুষের ছবিও সেই দ্বারদেশে লম্বিত ছিল। কলিকাতার রাস্তায় অনেক সময় এইরূপ বাজনা-বাদ্য করিয়া অনেকে নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জীবজন্তু প্রদর্শন করিয়া থাকে ও তাহাতে তাহাদের বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জনও হইয়া থাকে। এইরূপ করিয়া উহারাও বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, হটাৎ একদিন উহাদের সকল বুজরুকী বাহির হইয়া পড়িল; এবং সকলে জানিলেন যে, এরূপ 'দিনে ডাকাতি বোধ হয় আর নাই!'

দুষ্টেরা কিরূপে সকলকে প্রতারিত করিতেছে, সে সম্বন্ধে কোন ভুক্তভোগীর কথা এইঃ—"রাস্তার ধারের ঐরূপ বাজনা-বাদ্য ও আড়ম্বর দেখিয়া একটী পয়সা দিয়া আমিও ভেল্কী দেখিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর ভিতরে প্রবেশের একটী অন্ধকার-প্রায় সঙ্কীর্ণ গলি; এক-একটী মানুষের অধিক সে গলি দিয়া প্রবেশ করা যায় না। 'মরা মানুষ বেঁচে ওঠে' দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমিও সুতরাং কোনরূপে সেই পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। যা'বার সময়ই মনে কিন্তু নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। যাইহোক, কাটা কুচি কুচি মানুষ বাঁচিয়া উঠিবে দেখিব, শুধু এই যে এক মনের উল্লাস ইহাতেই আমার সকল চিন্তা কিন্তু দূর হইল। আমি বড়ই আশ্বাসে ভেল্কী দেখিতে গেলেম।

"বাড়ীর ভিতর গিয়া প্রথমেই দেখিলাম, জন কএক সেই পূর্ব্বরূপ প্রকৃতিরই লোক সেখানে বসিয়া আছে। আমি যাইবামাত্র তাহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিল,—'মহাশয়, আপনি কি জাতি! হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান!' আমাকে ওরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার তাহাদের না থাকিলেও আমি কিন্তু বলিলাম,—'আমি হিন্দু—ব্রাহ্মণ।' তখন তাহাদের একজন আমাকে সঙ্গে করিয়া একটী গৃহে লইয়া গেল। দেখিলাম, সেই গৃহে একখানি পিতলের সিংহাসনের উপর একটী শালগ্রাম শিলা বর্ত্তমান ও তাহার সম্মুখে একটী পঞ্চপাত্রপূর্ণ গঙ্গাজল। গৃহে প্রবেশ করিলে আমার সঙ্গের লোকটী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'মহাশয়, কিছু মনে করিবেন না। আমাদের এই-ই জীবিকা। আপনার একপয়সার অধিক তো আর যায় নাই! যাইহোক, আপনি এই শালগ্রামের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করুন যে, এ কথা বাহিরের কাহাকেও আর বলিবেন না।'

"আমি তো অবাক! বলিলাম, সে কি কথা! মরা মানুষ বাচান দেখিতে আসিয়াছি, —পয়সা দিয়া। তার উপর আবার এই অত্যাচার! এ কি কথা! তাহাতে তাহারা সকলে তখন রোষকসায়িত লোচনে উত্তর করিল,—'কি দিব্য করিবি না! যদি দিব্য না করিস, তবে তোকে এখনি উচিত শিক্ষা দিব।' আমি একে ক্ষীণজীবি, তাহাতে আবার

উহাদের বাড়ীর ভিতর,—উহারা ষণ্ডা ষণ্ডা কয় জন! সুতরাং আমি আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না। আমাকে দিব্য করিতে হইল। তবে প্রাণদায়ে দিব্য করিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে উহাদিগকে ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য সঙ্কল্প করিলাম।

"এইরূপে 'মরা মানুষ বেচে ওঠা' দেখিতে গিয়া যে শুধু আমি আক্কেল পাইলাম, এরূপ নহে। ফিরিবার সময় দেখিলাম, একজন বাঙ্গাল মুসলমান অপর একটী ঘরে কোরাণ ছুঁইয়া দিব্য করিবার জন্য বিড়ম্বিত হইতেছে। সুতরাং তাহাতেই প্রথমতঃ আমার জাতি জিজ্ঞাসার কারণ কি স্পষ্টই বুঝা গেল; এবং ইহাও বোধ হয় কাহাকেও আর বলিতে হইবে না যে, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, বোধ হয়, সকল জাতিকেই এইরূপে বিড়ম্বিত করিবার জন্য দুষ্টেরা সেইরূপ সকল উপকরণাদিও প্রস্তুত রাখিয়াছে। ফলতঃ কয় দিনে আরও কত লোক যে ঐরূপে প্রতারিত হইয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। যাইহোক, এ পর্য্যন্ত কেহই সে কথা আর প্রকাশ করে নাই।

"পরে আমা হইতেই কিন্তু অভাগাদের সর্ব্বনাশ হইল। প্রথমবার বাহির হইয়া গিয়াই তলে তলে আমার বন্ধুবান্ধবগণকে এই কথা বলিলাম এবং ক্রমে তাঁহারা সকলেই ইহার সদুপায় স্থির করিলেন। এমন কি, তাহাতে শেষে দুষ্টেরা এরূপ শিক্ষা পাইল যে, আমাদের পায়ে ধরিতে লাগিল, ক্ষমা চাহিল, এবং বারবার প্রতিজ্ঞা করিল, —আর কখনও ও-কাজ করিবে না।"

এই তো কাণ্ড। অনেক সময় অনেক মফঃস্বলবাসী কলিকাতায় আসিয়া এইরূপে বিড়ম্বিত হন। দুষ্টেরা কখনও পাঁচ পেয়ে গরু দেখাইতে গিয়া গরুর পৃষ্ঠে একটা ময়দার পা করিয়া দেখায়, কখনও বা কাটা মুণ্ড কথা কয় দেখাইতে গিয়া ঘা'কতক দিয়াই বিদায় দেয়।

জুয়াচুরীর চূড়ান্ত।*

৫

থানায় ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কাহার উপর সন্দেহ হয়?" বাবু ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। সাহেবও যথারীতি বাবুর এজাহার লিখিয়া লইতে লাগিলেন। এমন সময় একটা শীর্ণকায় মুসলমান তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" লোকটা যেন পাগলের মত। সে একটু হাসিয়া সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বলিল, —"হুজুর, আমি চোর। আমিই এই দুই হাজার টাকার তোড়া চুরি করিয়াছি। এ ব্রাহ্মণ নির্দ্দোষী; ইহাকে ছাড়িয়া দেন।" ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব প্রথমে উহাকে পাগল বলিয়া তাড়াইয়া দিতে আজ্ঞা দেন; কিন্তু সে বড় জেদাজেদী করায় তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। এখন পাঠক, চিনিতে পারেন কি, এই লোকটা কে? এই সেই আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত জুয়াচোর; এই নিজ অদ্ভূত কৌশল-বলে দুই হাজার টাকার তোড়া চুরি করে।

ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চাবি রহিল ব্রাহ্মণের নিকট, তুই কেমন করিয়া চুরি করিলি?" তখন সে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিল। শুনিয়া সাহেব বড়ই বিস্মিত হইলেন। কিন্তু লোকটার কথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি তাহাকে পাগল বলিয়া পুনরায় তাড়াইয়া দিবার আদেশ দিলেন। তখন সেই জুয়াচোর যোড়-হস্তে ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবকে বলিল,—"হুজুর, আপনি ধর্ম্মাবতার, একজনের অপরাধের জন্য অপরকে কেন দণ্ড দিবেন! আপনার বিশ্বাস না হয়, আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই দোকানে চলুন, আপনার সমক্ষেই আমার

* দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যার প্রকাশিত অংশের শেষ।

কৌশলের পরিচয় দিব। ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব এই ব্যাপার শুনিয়া বড়ই কৌতুহলী হইয়াছিলেন। সুতরাং জুয়াচোরের কথায় ভুলিয়া ব্রাহ্মণ, বাবু ও সেই মুসলমানকে সঙ্গে লইয়া তিনি সেই দোকানে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রায় রাত্রি ৮টা।

ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ টাকার তোড়া সিন্দুকের বাহিরে রাখিয়া আলোর দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব ও বাবু উভয়েই লণ্ঠনস্থ প্রদীপের দিকে নজর করিয়া রহিলেন। জুয়াচোর দোকানের বাহিরে এতক্ষণ সাহেবের আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেব ইঙ্গিত করিবামাত্র সে এখন একটী ক্ষুদ্র ঢিল ছুড়িল; ঢিলও পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ আসিয়া আলোর উপর পড়িল—ঘর একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। সকলেই একেবারে অবাক! কিরূপে যে প্রদীপ নিভিল, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বমত হাপর হইতে আবার প্রদীপ জ্বালিয়া আনিলেন। প্রদীপ জ্বলিবামাত্র টাকার তোড়ার দিকে সকলের নজর পড়িল; তখন সকলে দেখিলেন, সত্য সত্যই আর একটী তোড়া কম!

ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া সেই লোকটার অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথায় আর তাহার উদ্দেশ পাইবেন? সে চকিতের মধ্যে টাকার তোড়াটী লইয়া কোথায় উধাও হইল, কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সাহেব হত-বুদ্ধি হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং চোরকে ধরিবার জন্য বাছা বাছা ডিটেক্টিভ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু সেও সেই পর্য্যন্তই; কেহই তাহার আর কোন সম্বাদ দিতে পারিল না। সেই চার হাজার টাকা লইয়া সে যে কোথায় গেল, অদ্যাপিও কেহ তাহা বলিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যের বিশ্বজনীন প্রেম।

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সমানে সমানেই প্রেম জন্মে। একে অন্যের সম-প্রকৃতি, সম-স্বভাব বা সম-অবস্থার হইলেই উভয়ে প্রেম-সুত্রে বদ্ধ হইতে পারে। আর, সে কথা জগতের দৃশ্যে বড় অপ্রকৃত বলিয়াও বোধ হয় না। তাহা নহিলে এত দেশ থাকিতে, দেশে এত বড় বড় মস্তকবান্ লোক থাকিতে, তুমি আর আমি এই দুই অভাগাতেই বা এত মনের মিল হইল কেন? তুমিই কি চেষ্টা পাও নাই, আমিই কি যত্নের ত্রুটী করিয়াছিলাম যে, এক জন বড় লোকের বন্ধু হই। কিন্তু ভাই বল দেখি, তাহা হইল কৈ! কি সংসা-রের বিচিত্র কাণ্ড!—কোথা হইতে এই তোমাতে আর আমাতেই প্রাণের এত বাঁধা-বাঁধি হইল।

প্রেমের আকর্ষণ স্বভাবতঃই এইরূপ বটে। কদাচিৎ ইহার ব্যত্যয় দেখা যায়। কিন্তু সেরূপ যেখানে দেখিয়াছি, সেই খানেই সে ভাব এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ। যে দিন দেখিয়াছি, জগৎপূজ্য দেবারাধ্য সেই নবঘনশ্যাম রামরূপ, পতিত আচারভ্রষ্ট অস্পৃশ্য চণ্ডালে ক্রোড়ে লইলেন, সেই দিনের সে ভাব কতই মধুর লাগিয়াছে! যে দিন দেখিয়াছি, প্রেমের অনন্ত-মূর্ত্তি যোগীধ্যেয় ধন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে গোপ-বালকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেছেন, যাঁহার পদরেণুর জন্য দেবগণ লালায়িত তিনি গোপকুলসম্ভূত নন্দের বাধা বহিতেছেন, সে দিনের দৃশ্যও কি ভাবব্যঞ্জক! আর যে দিন দেখিয়াছি, সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর দেব-দেব মহাদেব জীবের পরিত্যক্ত ভস্ম ভূষণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, হিংস্র সর্ব্বজন ঘৃণিত কালকূট মস্তকে ধরিয়াছেন, সে দিনও অন্তরে কি স্বর্গীয় ভাবের ছায়া পড়িয়াছে! সে ভাব, সে কথা বলিবার নহে—তাহা অচিন্ত্য—অব্যক্ত! আর, জগতের সকল মহাজনই—কি বৌদ্ধদেব কি খ্রীষ্ট, কি মহম্মদ সকলেই এই অপূর্ব্ব ভাবের পোষণকর্ত্তা।

তোমার আমার ক্ষুদ্র প্রাণ; তাই আমরা ভ্রমেও কখনও এ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাম না। মনে কখনও ভাবিতে যাইলেও লোকসমাজে বিড়ম্বিত হইবার ভয় পাই। কিন্তু বড় অধিক দিনের কথাও নয়; এই সেদিন—যেদিন যবন ভারতের একচ্ছত্রী রাজা, সেদিনও—একটী ব্রাহ্মণ-তনয় জগতকে প্রেমের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইয়াছেন। আজিও তাঁর সে প্রেমের কথা কবির কাব্যে শুনিতে পাই, লোকের ঘরে ঘরে সকলেই সে প্রেমকাহিনী কীর্ত্তন করে। আর, সে বিশ্বজনীন প্রেম জগতে অতি অল্প লোকেই দেখাইতে পারিয়াছে, জানা যায়।

পুরাতন হইলেও, সে কল্পনা, আমার মনেতে কিন্তু চির নূতন। মুসলমান হিন্দুর অস্পৃশ্য, মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিলেও আজি পর্য্যন্ত অনেক হিন্দু আপনাকে অপবিত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেদিন নবদ্বীপে সেই মুসল-মানের একজনকেও, ব্রাহ্মণ-তনয় হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব ক্রোড়ে লইয়াছিলেন; অধিক বলিব কি, শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় সে যবন আজ জগতে হরিদাস ঠাকুর নামে পূজিত হইতেছে। পতিত-উদ্ধারের এ অপেক্ষা আর জীবন্ত মোহ-কর দৃশ্য কি হইতে পারে? কিন্তু আজ আমরা মুসলমানকে ‘যবন অস্পৃশ্য’ এই হেতুবাদে ঘৃণা করিয়া থাকি; আর, তাহারাও আমাদি-গকে ‘কাফের’-বোধে অবমাননা করে। সুত-রাং ক্রমেই উভয়ের মধ্যে এক বিদ্বেষানল জ্বলিতেছে। শ্রীচৈতন্য দুদিন পূর্ব্বে যে পবিত্র বন্ধুত্বভাবের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, কি ক্ষোভের বিষয় যে, এই কয় দিন যাইতে না যাইতে আজি আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের কাহারই মনে সে কথা স্মরণ রহিল না!

জগাই-মাধাইএর দৃশ্যও শ্রীচৈতন্যের বিশ্বজনীন প্রেমের এক অপূর্ব্ব উপমা। জগাই-মাধাই পাপের পূর্ণ মূর্ত্তি, দুরন্তের চূড়ান্ত অব-তার, মদ্যপায়ী উন্মত্তের অগ্রণী। তাহাদের অত্যাচারে নবদ্বীপবাসীকে সদাই শশঙ্কিত থাকিতে হইত। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের প্রতিই উহাদের আক্রোশ অধিক ছিল। বৈষ্ণবগণকে ধরিয়া দুরন্তেরা তাহাদের মস্ত-কের শিখা কাটিয়া দিত, গায়ের নামাবলী কাড়িয়া লইত, তাহাদের কপালের তিলকে মদ ঢালিয়া বিকৃত করিত। এক কথায় জগাই-মাধাইএর দৌরাত্ম্যে নবদ্বীপের স্ত্রী পুরুষ সক-লেই সর্ব্বদা শশঙ্কিত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিও দুষ্টদের বড়ই আক্রোশ ছিল; একবার ধরিতে পাইলে দুষ্টেরা তাঁহার প্রতিও অত্য-ধিক নির্য্যাতন করিবে, স্থির করিয়াছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন নিত্যানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যও জগাই-মাধাইএর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহা-রাও তাঁহাদের চিরপোষিত আশার সফলতা করিতে অগ্রসর হইল। অধিক কি, তাহারা উহাঁদের দুই জনকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিতে চেষ্টিত হইল। তাহাতে উহাঁরা অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন; সদুপদেশ দানে তাহাদের মতি ফিরাইতে যাইলেন। কিন্তু দুষ্টেরা কিছুতেই তাহা শুনিল না। দুষ্টেরা একটী ভগ্ন কলসীর কাণা ছুড়িয়া নিত্যা-নন্দের প্রতি নিক্ষেপ করিল; আর, সে আঘাতে তাঁহার শরীর হইতে রক্তধারা পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু পাপীর উদ্ধার কামনায় মত্ত নিতাই-চৈতন্য তাহা গ্রাহ্যই করিলেন না; তাহাদিগকে তখনও উপদেশ দিতে লাগিলেন,—

“আয় রে আয় জগাই মাধাই আয়।
মেরেছ তার ভয় কি আছে আয়॥
হরি-সংকীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
ওরে মায় খেয়েছি, না হয় আবার খাব,
তবু হরিনাম দিব আয়॥
ওরে মেরেছ কলসীর কাণা (মাধাই রে! মাধাই রে!)
ওরে তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়।

ওরে আমরা ঢুভাই গৌর নিতাই,
ওরে দু ভায়ে তরাব দু'ভাই আর।
তোদের স্নান করাব গঙ্গাজলে,
হরিনামের মালা দিব গলে আর।
ওরে আয়রে মা াই কাছে আর,
হরিনামের বাতাস লাগুক গায়।" *

মার খাইয়াও নিতাই চৈতন্যের এই অমায়িক ভাব দেখিয়া, জগাই-মাধাইএর মোহ ঘচিল। তাহা া কাঁদিতে কাঁদিতে নিতাই-চৈতন্যের চরনযুগল ধরিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রভো! এ অভাগাদের উপায় কি।" আর তখনই "হরি বল, হরি বল" বলিতে বলিতেই নিতাই-চৈতন্যও জগাই-মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন। আহা! কি উদার প্রেম! উন্মত্তের মত্ততা দেখিয়া আমরা ঘৃণা করি: কিন্তু তাহাদের নিকট মার খাইয়াও তাহাদের প্রতি শ্রীচৈতন্য কি অমায়িক ভাব দেখাইলেন। ভ্রান্ত জীব অমরা; আমরা আপনার উন্মত্ত ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতিও এ ভাব দেখাইতে পারি না। কিন্তু অপূর্ব্ব প্রেমাস্পদ এই দৃশ্যে জগতকে সেই এক অপূর্ব্ব শিক্ষা দিলেন। আহা! এ দৃশ্য কি ভুলিবার জিনিস! এ বিশ্বজনীন প্রেম জগৎপট হইতে কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে?

তা' না হইতে পারে: কিন্তু, আমাদের মন হইতে সেই সঙ্গে সঙ্গেই তো উহা বিস্মৃতিজলে ঢাকিয়া গিয়াছে! আহা ভ্রান্ত জীব আমরা; তত্ত্বময়! এসব তত্ত্ব কতদিনে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব?

রাধারাণী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজদ্বারে।

আজ কয় দিন ধরিয়া বিচার চলিতেছে। নগরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে যে, মোহন লাল জমীদারই খুন করিয়াছেন। অধিক কি, বিচারক রাজ চক্রবর্ত্তী মহোদয়েরও অনেকটা সেই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে। তবে অত বড় একটা জমীদারের প্রতি কি করিয়া তিনি এরূপ গুরুতর অপরাধের কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করিবেন, আজ কয় দিন হইতে কেবল তাহাই ভাবিতেছেন। যাইহোক, বিচারের আজ একটা না একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। আর, এদিকেও সপ্তাহকাল বিচার চলিতেছে। সুতরাং আজ আর একবার প্রধান প্রধান কএকটী সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়াই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন, রাজারও এই ইচ্ছা।

রাজাদেশে ভগবানপুরের কুড়রাম সর্দ্দার চৌকিদার অতঃপর সাক্ষী দিতে দাড়াইল। সে বলিতে লাগিল,—"মহারাজ! আমি কিন্তু স্বচক্ষেই দেখেছি, স্মরণ হচ্চে। ঐ মোহন লাল বাবুই শেষে এক বর্ষার খোঁচায় আমাদের সুরেশ বাবুকে মেরে ফেল্লেন। সুরেশ বাবু ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন। আহা! এক বর্ষাতেই বাবু আমাদের একেবারে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। আর, তারপর মহারাজ, সুরেশ বাবুকে নিয়ে এই মোহন বাবুরই পরসাদে দরোয়ান একেবারে চম্পট দিল। আমি এত ছুটে গেলাম, তবু কিছুতেই বেটাকে ধর্‌তে পাল্লেম না, মহারাজ, ধর্ত্তে পাল্লেম না। আর, মহারাজ! কাল ঐ তালপুকুরের জলে যে পচা মরাটা সন্ধান হয়েছে, আমার স্পষ্টই বোধ হচ্চে, আহা, এ সেই মেজ বাবু। আহা! মেজ বাবুকে এমন করে মাল্লে!" এই বলিতে বলিতে চৌকিদার যেন কাঁদিয়াই ফেলিল।

সর্দ্দারের এজাহার শুনিয়া কোন রাজ-কর্ম্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা সর্দ্দার, তুমি এ ঘটনার তিনদিন পূর্ব্বেতে তোমার বেহাই-বাড়ী গিয়েছিলে নয়! তবে তুমি এসব দেখ্‌লে কি করে!"

সর্দ্দার।—"সে কি মহারাজ! এই বড় বাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন দেখি, আমি ঠিক ঐ সময়েই আমার বেহাই-বাড়ী থেকে আসছিলাম কি না! ঐ মাঠ দিয়েই তো আমার বেহাই-বাড়ীর রাস্তা।"

যাইহোক, এ আপত্তি কিন্তু খাটিল না। চারিদিক হইতেই প্রতিপক্ষের লোকজন বলিয়া উঠিল,—"কুড়রাম সেদিন হাজির ছিল,—হাজির ছিল।"

তারপর দ্বিতীয় সাক্ষী, ফাঁড়িদার। সে উঠিয়াই করযোড়ে বলিতে লাগিল,—"মহারাজ, ভগবানপুরের মাঠ হইতে কএক রশি তফাতেই আমার ফাঁড়ী। সুতরাং আমি এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। মোহনলাল বাবুরই দোষ সম্পূর্ণ। উনিই তো আগে বর্ষাদার, লাঠিয়াল সঙ্গে ক'রে জমীর সীমানায় পিল্লা গাঁথিতে গেলেন। আমাদের মেজ বাবু তাহাতে কত অনুনয়-বিনয় করলেন; বল্লেন, 'আজকার দিনটা শনিবারের বারবেলা। আজকার দিনটা থাক না! আজ আমি যদি আপনাকে ঐখানে পিল্লা গাঁথিতে দিয়ে যাই, তা'হলে দাদা আমায় অপমান করবেন। তা'র চেয়ে কাল যেমন করেই হোক, আমি দাদার মতটা করে আস্‌বো; তারপর, কাল আপনাকে ঐখানেই পিল্লে গাঁথ্‌তে দিব। আর, আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, ওটুকু জমীর জন্যে কোন গোল যাহাতে না হয়, আমি তাহা করিব। তবে কথা এই—দাদার মতটা করেই সব কায করি।' কিন্তু মহারাজ, বলবো কি, মোহনলাল কিছুতেই সে কথা শুন্‌লেন না। শেষে মেজ বাবুকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উঠলেন। সুতরাং শুনি নাই, রাগে মেজ বাবুও নাকি উহাকে কি বলেছিলেন। আর সেই জন্যে মহারাজ, দুঃখের কথা বলবো কি, মোহন বাবু স্বহস্তেই মেজ বাবুকে এক বর্ষা মাল্লেন। আর তাতে, বল্‌তেও কান্না আসে, আহা! মেজ বাবুর সেই নধর শরীর একেবারে ভূমিশায়ী হইল!" এইরূপ আরও নানা কথা বলিয়া ক্রমে ফাঁড়িদার চুপ করিল।

তারপর একে একে আরও বিস্তর লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হইল; কিন্তু সকলেরই ঐ একই কথা। সকলেই যেন প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। তদ্ভিন্ন, রাজ-কবিরাজগণও বৈজ্ঞানিক যুক্তিক্রমে স্পষ্টতঃ পরীক্ষা করিলেন যে, তালপুকুরের জলে যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক সুরেশ বাবুর দেহ। সুতরাং কোন দিকে আর কোন আপত্তি রহিল না। সকলই মোহন বাবুর অন্তরায়ভুত হইল।

তখন আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া রাজা মোহনলালের প্রতি আদেশ করিলেন,—"মোহনলাল! সকলই শুনিলাম। এখন তোমার যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা বলিতে পার।"

মোহনলাল এতক্ষণ গম্ভীরভাবে সকলই শুনিতেছিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রমে রক্তিম বরণ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। যাইহোক, রাজাদেশে যোড়করে এখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! দেখিতেছি, প্রমাণে আমি সম্পূর্ণ দোষী হইতেছি। শত কণ্ঠ তারস্বরে বলিতেছে, আমিই স্বহস্তে সোদরসম সুরেশচন্দ্রকে হত্যা করিয়াছি। তজ্জন্য মহারাজ, অপরাধী হই—রাজদণ্ডে প্রাণ যায়, ক্ষতি নাই। কিন্তু অন্তিমে এই আমার বড়ই ক্ষোভ রহিল যে, সামান্য অর্থের লোভে রাজ্যের এত লোকে মিথ্যা কহিতে পারিল। শুধু মিথ্যা কহিলেও ততদূর ব্যথিত হইতাম না; কিন্তু মিথ্যা কহিয়া এইরূপে একজনের প্রাণদণ্ডের কারণ হইতে পারে, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর। মহারাজ! বলিব কি, প্রাণ-রক্ষার জন্য আমি আজ মিথ্যা কহিব, আপনারা ভাবিতে পারেন। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার এ প্রাণে আর আকাঙ্ক্ষা নাই। কারণ, আমার বিশ্বাস, কোন গুরুপাপ অবশ্যই না করিলে আমার এরূপ হইত না। তবে মহারাজ, আমার শেষ বাক্য এই যে, আমার মৃত্যুর পর আপনি আবার ঐ সকল ব্যক্তির মুখেই এ ঘটনার গূঢ়

* কীর্ত্তনের সুর। ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, পূর্ব্ববিভাগ, ৮১ পৃষ্ঠা হইতে।

রহস্য জানিতে পাইবেন। যাইহোক, আপনি যখন আদেশ করিতেছেন, তখন—আপনি ভ্রমেও ভাবিবেন না প্রাণরক্ষার জন্য; কারণ, আমার প্রাণে আর মায়া করিতেছি না—আমার যাহা বলিবার বলি, শুনুন। যেদিনের ঘটনার কথা, সেই দিন আমি ঠিক ঐ সময়ে আমার জমীদারীর হিসাব দেখিতেছিলাম। এমন সময়, হটাৎ একজন পাইক আসিয়া সংবাদ দিল,—'বাবু, সাবধান ভগবানপুরের মাঠে খুন হওয়ায় আপনাকে ধরিতে আসিয়াছে'। আমি ঘটনার এইমাত্র জানি। অধিক কি, সেদিন ভগবানপুরে আমার কোন লোকও যায় নাই। সুতরাং জানি না, কিরূপে এ ব্যাপার ঘটিল। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন না, আর তাহা করিতেও আমি বলি না। তবে শেষে মহারাজ! যদি জানিতে পারেন যে,—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মোহনলাল চুপ করিলেন। তারপর আর একবার বলিলেন,—"এখন মহারাজ! বিলম্ব করিবেন না; যেরূপ দণ্ড পাই, আদেশ করুন।"

রাজা সকলই শুনিলেন। কিন্তু আর উপায় নাই। আসামীর স্বপক্ষের কোনরূপ প্রমাণই দেখা গেল না। তখন রাজ-সভার পরামর্শক্রমে তিনি মোহনলালের প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন; বলিলেন,—"মোহনলাল! তোমার জীবনে আমারও মায়া আছে। কিন্তু কি করিব, উপায় দেখিতেছি না। বিশ্বাস করিব না প্রতিজ্ঞা করিলেও তোমার প্রতিপক্ষের প্রমাণ তোমাকেই সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করিতেছে। সুতরাং রাজ-নিয়ম পালন-হেতু, নিয়মের বাধ্য হইয়া তোমার প্রতি আমাকে এই কঠোর আদেশ প্রদান করিতে হইতেছে। সুরেশচন্দ্রের হত্যা অপরাধে রাজদণ্ডে তোমার প্রাণ——"

এই পর্য্যন্ত রাজার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে হইতেই রাজদ্বারে এক বিষম কোলাহল উত্থিত হইল। "সুরেশ বাবু! সুরেশ বাবু! রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজারও আর কোন বলা হইল না। একটী বালকের হাত ধরিয়া মোহনলালের সেই সন্ন্যাসী গুরুজীর সহিত প্রত্যক্ষরূপে শ্রীমান সুরেশচন্দ্রই স্বয়ং আসিয়া রাজার পার্শ্বে তখন করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। সভাসদ্ রাজভৃত্য সকলে ব্যাপার দেখিয়া চকিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। কেহই আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম হইল না; প্রতিপক্ষগণ থর থর কাঁদিতে লাগিল। চারিদিকে "জয় ধর্ম্মের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়" রবে বিঘোষিত হইল। সন্ন্যাসী গুরুজীও তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"জয় ধর্ম্মের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়।" তখন রাজ-সভা এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল।

তখন সুরেশচন্দ্র একে একে সকল বলিতে লাগিলেন। ভগবানপুরের মাঠের দাঙ্গার বিষয় তিনি কিছুই জানেন না; শারীরিক পীড়ায় ও মানসিক কষ্টে গুরুর আদেশে তিনি অষ্টাহ অজ্ঞাতবাসে ছিলেন; এবং অষ্টাহ অতিবাহিত হওয়ায় আজ তিনি বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সন্ন্যাসী গুরুজীর নিকট শুনিলেন যে, তাঁহার হত্যাপরাধে মোহনলাল রাজদ্বারে। সুতরাং তিনি সেই সংবাদে রাজদরবারে আসিয়াছেন। যাইহোক, সে কথা শুনিয়া এবং সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়া রাজারও মুখে আর বাক্য সরিল না। কুটিল মানুষে যে এতদূর করিতে পারে, তাহা ভাবিয়াই তিনি স্তম্ভিত হইলেন। আর বলা বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ সসম্মানে মোহনলাল মুক্তি পাইলেন। এবং অপর দিকে দুষ্টদের উপযুক্ত শাস্তির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনাথের উপায়।

রাজদণ্ড হইতে মুক্তি পাইয়া আসিয়াই মোহনলাল সেই সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী গুরুজীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। গুরুজীও সস্নেহে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময় সুরেশচন্দ্রের সহিতও তাঁহাদের নানা কথাবার্ত্তা হইল ও পরস্পরই সে কথাবার্ত্তায় যেন পরম আপ্যায়িত হইলেন।

ক্রমে যা'বার সময় [illegible] কথাবার্ত্তা হইতে হইতে মোহনলাল সন্ন্যাসীকে সেই বালকটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"বৎস! এটিকে তোমার নিকটই দিতে আসিয়াছিলাম। তুমি একে অপুত্রক, তাহাতে এই অনাথ বালকটীও বিশেষ লক্ষণসম্পন্ন। সুতরাং বড় আশা করিয়াই ইহাকে লইয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু কি ইহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে, ইহাকে সঙ্গে আনিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে স্থির দেখিতে পাই নাই। যাইহোক, আজ তোমার সংসারে যে আনন্দের দিন, তাহাতে এই বালককে আজই তোমার করে অর্পণ করিব, স্থির করিয়াছি। বালক সদ্বংশজাত; আর আমি বলিতেছি, এ বালক হইতে তোমার সম্মান সম্যক রক্ষিত হইবে।"

গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অতঃপর মোহনলাল বলিলেন,—"গুরুদেব! আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করিব। এ বালককে আমি নিজ পুত্রের ন্যায়ই পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। ইহাতে কোন ত্রুটী হইবে না। আচ্ছা গুরুদেব! এ বালকটী কে? আপনি ইহাকে কোথায় পাইলেন?"

সন্ন্যাসী।—"বৎস! সে কথা আর বলিব কি? সে কথা স্মরণ করিতেও প্রাণ ফাটিয়া যায়। এ বালক চির-অনাথা; চির-পিতৃমাতৃহীন। নবদ্বীপে ইহাদের পূর্ব্ববাস ছিল। কিন্তু যেদিন রাত্রে যবনগণ নবদ্বীপ আক্রমণ করে, সেই দিন ইহার পিতামাতা ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া নৌকায় করিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। কিন্তু দুরন্ত যবনগণ সে নৌকা ডুবাইয়া দেয়। সে নৌকাডুবিতে ইহার পিতামাতা প্রাণ হারাইয়াছে; অভাগা শিশু এ—এ ভাসিতে ভাসিতে আমার আশ্রয়-সমীপে আসিয়া অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হয়। তারপর বৎস! আমিই ইহাকে বাঁচাইয়াছি; আমিই আজ এই বালকের ভার তোমার হস্তে প্রদান করিতেছি।"

"নবদ্বীপ!—নৌকাডুবি!"—এই বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াই অতঃপর মোহনলাল চুপ করিলেন। এবং সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে বালককে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত-প্রণালী।

আজকাল রবারের ষ্ট্যাম্পই সর্ব্বত্রে ব্যবহৃত হয়। কি সওদাগরী আপিসে, কি গভর্ণমেণ্টের আপিসে, কি স্কুল-কলেজে আজকাল সকলেই রবার-ষ্ট্যাম্পের সমাদর করিয়া থাকেন। কারণ, অন্যান্য মোহর অপেক্ষা রবারের শীলমোহরেই ছাপও বেশ পরিষ্কার উঠে। অধিকন্তু, আজকাল রবারের ষ্ট্যাম্প-প্রস্তুতের ব্যবসাটীও বেশ লাভজনক দেখা যায়; যে কেহ এ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। আর, চাকরীর জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উমেদারী করিয়া বেড়ানর অপেক্ষা স্বাধীনভাবে ইহাতে যে অনেকের জীবিকা-নির্ব্বাহও হইতে পারে, এও আমাদের মনের বিশ্বাস।

ব্যবসায় এরূপ লাভজনক বটে, কিন্তু রবার-ষ্ট্যাম্পের প্রস্তুত-প্রণালী সেরূপ কঠিন নহে।

আমরা রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতের যে কয় প্রকার উপায় অবগত আছি, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উপায় দু'টাই কিছু সহজ বলিয়া বোধ হয়। রবারের-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ সেইমত ছাঁচ প্রস্তুতের দরকার। সে ছাঁচ প্রস্তুতের উপায় এই ঃ—যে নাম বা কথার প্রয়োজন, সেইমত টাইপ বা অক্ষরগুলি একত্র কর। তার পর, হয় সূতা দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তাহা বাঁধ বা রজনের পুটিন (১) দ্বারা সংযোজিত কর। পরে 'প্লাষ্টার অব্ প্যারিস' (২) আনিয়া একটু জলে গুলিয়া কাদার মত করিয়া তাহাতে ঐ অক্ষরগুলি আস্তে আস্তে বসাইয়া দেও। তদপরে ছাঁচ হওয়ার মত বসিলে ক্রমে তাহা তুলিয়া লও। ইহাতেই ছাঁচ প্রস্তুত হইবে। কিন্তু বিশেষ সাবধানে ছাঁচ প্রস্তুত করিতে হয়। (৩)

ইহার পরে রবার দ্রব বা 'লিকুইড কৌচুক' (৪) নামক পদার্থ প্রথমতঃ ঐ ছাঁচে এক স্তর ঢালিয়া দেও। পরে আমসত্ব প্রস্তুতের ন্যায় শুষ্ক হইলে আর একস্তর এইরূপে ৪।৫ কি ৭।৮ স্তর দিলেই ক্রমে উহা জমিয়া বেশ পুরু হইবে। তখন সেই ছাঁচখানি সহ জলে ডুবাইয়া রাখিলেই উহা ছাঁচ হইতে আলগা হইয়া আসিবে। এবং তখন সাবধানে রবারের একত্রিত অক্ষরগুলি খুলিয়া লইলেই ষ্ট্যাম্প হইল। (৫) তৎপরে সেই রবারের অক্ষরগুলি যেরূপ ইচ্ছা হ্যাণ্ডেলে, শিরিশ বা গঁদ দিয়া আঁটিয়া লইলেই রবারের ষ্ট্যাম্প কার্য্যোপযোগী হইল। তখন তাহাতে কালী দিয়া ছাপিলেই সুন্দর ছাপা উঠিবে।

ইহা ভিন্ন উক্তরূপ মোহর-প্রস্তুতের আর এক উপায় এই ঃ—প্রথমতঃ পূর্ব্বরূপ উপায়ে 'প্লাষ্টার অব প্যারিসের' ছাঁচ তৈয়ার কর। তারপর স্পিরিট ল্যাম্প বা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালিয়া আগুন কর। পরে এক খণ্ড পাতলা লোহার পাতের উপর সেই ছাঁচখানি রাখিয়া ছাঁচের মধ্যে পরিমাণ-উপযোগী ইণ্ডিয়া রবারের টুক্‌রা দিয়া সেই আগুনে তাহা তাতাইবার বন্দোবস্ত কর। এইরূপে তাত দিয়া রবার গলাইবার সময় পূর্ব্বরূপ আর এক খানি পাতলা লোহার পাত সেই ছাঁচের উপর চাপা দেও। অতঃপর তাত পাইয়া রবার গলিবার পূর্ব্ব হইতে সেই উপরের ও নিচের লৌহ পাত পরস্পর যাহাতে আঁটা থাকে এরূপ উপায় কর; অর্থাৎ হয় উপরের লৌহপাতে এমন চাপ দেও যে, রবার গলিলে কোনরূপে আর ছাঁচের বাহির হইবে না; অথবা স্ক্রু দিয়া ঐ দুইখানি লৌহ-পাতকে আঁটিয়া রাখিলেও কার্য্যসিদ্ধ হইবে। এইরূপে রবার গলিয়া ছাঁচের ভিতর গিয়া আবশ্যকানুযায়ী অবস্থায় পরিণত হইল। এখন জল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া সেই লৌহ-পাতদ্বয় তথা হইতে খুলিয়া লও ও পরে ছাঁচ হইতে অক্ষরগুলি খুলিয়া পূর্ব্বরূপে হ্যাণ্ডেলে লাগাও। এইরূপেও রবারের মোহর প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমটীর অপেক্ষা এ উপায়টী একটু শক্তও বটে। তবে যে উপায়েই হউক, ছাঁচ ও অক্ষর তুলিতে প্রথম প্রথম হাত সেট হইতে দুই এক বার নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যত্ন করিলে পরে বেশ সুন্দর ছাঁচই উঠিতে থাকিবে।

রবার-ষ্ট্যাম্পের কালী ও প্যাড প্রস্তুতের উপায় বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

---

(১) ৬ ভাগ রজন, ২ ভাগ মোম ও কিছু ইঁট গুঁড়া, হাতা বা সরা করিয়া গরম করিলেই এই পুটিন প্রস্তুত হয়।

(২) 'প্লাষ্টার অব প্যারিস' সিমেণ্টের ন্যায় এক প্রকার মাটি। উহার ।।০ আনা করিয়া সের বিক্রয় হয়। ইহা চিনাবাজারে পাওয়া যায়।

(৩) দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা অনুসন্ধানের 'কাচের মোহর প্রস্তুত-প্রণালী' শীর্ষক প্রস্তাবেও এইরূপ ছাঁচ প্রস্তুতের সংক্ষিপ্ত উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) বেঞ্জোল নামক পদার্থে রবার দ্রব হয় বা লিকুইড অব্ কৌচুক নামে রবার দ্রবও ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। তাহার অর্দ্ধ ছটাকের বিলাতী দাম দুই আনা।

(৫) এই প্রথম উপায়টীর মর্ম্ম রায়ানু হইতে গৃহীত।

যমালয়ের ফেরতা মানুষ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র দাসের কাহিনী।

রামচন্দ্র দাস সেই পুলিস-কর্ম্মচারিকে বলিতে লাগিলেন,—"আমার বাসস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামে। সেই স্থানে আমি পুত্রকলত্র সহিত মহাসুখে বাস করিয়া আমার জীবনের প্রায় ৬০ বৎসর উত্তীর্ণ করিয়াছি। কিন্তু শেষে এই বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। আমার উপর জগদীশ্বরের মহা কোপ পড়িয়াছে; তিন মাসের মধ্যে আমার যে যেখানে ছিল, সকলেই কালের মহা-কবোলে পতিত হইয়াছেন। কেবল আমি ও আমার স্ত্রী যে কি মহাপাতকের ফলে জীবিত আছি, তাহা বলিতে পারি না। এই কারণে আমাদিগের যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট অংশ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অতিবাহিত করিবার মানসে, পাঁচ বৎসর হইল, আমরা দুইজনে বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি। প্রথমেই পূর্ব্ব-অঞ্চলের কয়েকটী তীর্থস্থান দর্শন করিয়া ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হই; এবং কালীঘাটে তিন দিবস অতিবাহিত করিয়া মহামায়ার দর্শনান্তর পশ্চিম যাত্রা করিবার মানসে হাবড়ার রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া একখানি গাড়িতে আরোহণ করি। সেই গাড়িতে কেবল আমি ও আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ প্রথমে উঠেন নাই। কিন্তু গাড়ি ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই একজন পশ্চিম দেশীয় মধ্যমবয়স্ক ষণ্ডাকৃতি মুসলমান পুরুষ, প্রায় দুই হস্ত পরিমাণ লম্বা একটী টিনের বাক্স সঙ্গে করিয়া, আমরা যে গাড়িতে ছিলাম, তাহাতে উঠিল; ও বাক্সটী বেঞ্চের নীচে রাখিতে না রাখিতে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ি আসিয়া বালি ষ্টেসনে থামিল। গাড়ি থামিবামাত্র সেই পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তি গাড়ি হইতে নামিল, ও উহাকে আর পুনরায় কিন্তু উঠিতে দেখিলাম না। পুনরায় গাড়ি চলিল।

"ক্রমে গাড়ি বর্দ্ধমান অতিক্রম করিল। তখন ঐ বেঞ্চের নীচে যে টিনের বাক্স ছিল, তাহার ভিতর হইতে এক প্রকার শব্দ বাহির হইতে লাগিল। তাহাতে উহার প্রতি আমাদিগের লক্ষ্য পড়িল। আমরা দেখিলাম, বাক্স ক্রমে নড়িতে লাগিল; ও উহার ভিতর হইতে যে এক প্রকার শব্দ হইতেছিল, তাহা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ইহাতে আমাদিগের অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হওয়ায় বাক্সটী বেঞ্চের নীচে হইতে বাহির করিয়া জোরপূর্ব্বক উহার ডালা খুলিয়া ফেলিলাম। তাহাতে যাহা দেখিলাম, মহাশয়, তাহা স্বপ্নের অগোচর। দেখিলাম, উহার ভিতর একটী ১১ বৎসর বয়স্ক বালক জড়সড় হইয়া শুইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে ও উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কিছুতে উঠিতে পারিতেছে না; ও তাহার জ্ঞানেরও অল্প ব্যতিক্রম হইয়াছে। তখন আমি তাড়াতাড়ি উহাকে বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিয়া বেঞ্চের উপর শোয়াইলাম, ও আমার স্ত্রী উহাকে বাতাস দিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে উহার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল; ও উঠিয়া বসিল এবং কথা কহিতে লাগিল। তখন আমরাও উহার নিকট সকল জানিতে পারিলাম। সেই অবধিই ঐ বালক আমাদিগের সঙ্গেই রহিয়াছে এবং আমাদিগের সহিত নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতেছে। উহারই কথা মতন আমি কলিকাতায় ৪।৫ খানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার এক খানিরও উত্তর পাই নাই। আর, সেই পত্রের একখানির শেষ অংশই আপনি অদ্য আমাকে দেখাইয়াছেন।"

এই বলিয়া তিনি রামধনিয়াকে ডাকিলেন; রামধনিয়া আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। তখন পুলিস-কর্ম্মচারী সাহাবাদ জেলায় যাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তাহাকে আনাইলেন। এবং রামচন্দ্র দাস তাহাকে রেলওয়ের সেই টিনের বাক্সবাহী মুসলমান বলিয়া চিনিলেন; রামধনিয়াও দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রামধনিয়ার আত্মকাহিনী।

রামধনিয়া বলিল,—"মহাশয়, আমার বর্ত্তমান বাসস্থান কলিকাতায়। সেইস্থানে আমার একমাত্র বৃদ্ধ মাতা ভিন্ন আর কেহই নাই। আমি প্রায়ই স্কুলে যাইবার কালীন, কোন দিন বা স্কুল হইতে আসিবার কালীন, ইহাকে রাস্তায় দেখিতে পাইতাম। এবং ও আমাকে দেখিলেই অতিশয় যত্ন করিত; মিষ্ট কথা বলিত; কলম পেনসিল কিনিয়া দিত; ও নানা প্রকার নূতন নূতন খেলনা আনিয়া আমাকে দিত। আমি ভাবিতাম, এ আমার কোন আত্মীয় হইবে। এক দিবস আমি স্কুলে যাইতেছি, সেই সময়ে আমি উহাকে স্কুলের সম্মুখেই দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই আমি উহার নিকটে যাইলাম। সে দিবস ও আমাকে বলিল,—'গড়ের মাঠে ঘোড়ার নাচ হইতেছে, দেখিতে যাইবে!' আমি আহ্লাদের সহিত উহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম ও উহার সহিত ঘোড়ার নাচ দেখিবার প্রত্যাশায় প্রস্থান করিলাম। কতক দূর গমন করিলেই এই ব্যক্তি একখানি গাড়ি লইল, আমরা উভয়েই সেই গাড়িতে উঠিলাম। অনেক ক্ষণ পরে গাড়ি আসিয়া এক স্থানে থামিল। ও তখন উহার ভাড়া মিটাইয়া দিয়া আমাকে লইয়া এক খানি খোলার বাটীতে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—"এখন ঘোড়ার নাচের বিলম্ব আছে। এখন কিছুক্ষণ এইস্থানে অপেক্ষা করি; পরে সময় মত গমন করিয়া ঘোড়ার নাচ দেখিয়া তোমাকে বাটীতে রাখিয়া আসিব। আমি সম্মত হইলাম, ও সেই বাটীতেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

"ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখন আরও ২।৩ জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদিগের সহিত একটী বালককেও দেখিতে পাইলাম। সকলে কতক্ষণ কি পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহার পর আমাকে ঘোড়ার নাচ দেখাইতে আর লইয়া গেল না। আমি জিজ্ঞাসা করায় বলিল—'অদ্য নাচ হইবে না। এখন রাত্রি হইয়াছে; তুমি এখানে থাক; কল্য নাচ দেখাইয়া তোমাকে বাটীতে রাখিয়া আসিব।' অগত্যা আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। রাত্রি সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু নিদ্রা আসিল না; মনে যেন কেমন এক প্রকার দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। উহারা সকলে একত্রিত হইয়া পুনরায় কি পরামর্শ করিতে লাগিল। পরে দেখিতে দেখিতে এক ব্যক্তি একটী টিনের বাক্স আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন ওই ব্যক্তি বলিল,—'চল, ঘোড়ার নাচ দেখিতে যাই।' আমি সম্মত হইলাম।

"কাপড় লইয়া বহির্গত হইতেছি, এমন সময় ও বলিল,—'ঘোড়ার নাচ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হইবে; একট জল খাইয়া লও।' এই বলিয়া চারিটী সন্দেশ আমাকে আনিয়া দিল। আমি উহা ভোজন করিলাম ও একটু জলপান করিলাম। সেই সময়ে আমার মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল; আমি বসিয়া পড়িলাম। পরে যে আর কি হইল, তাহা বলিতে পারি না। তবে যখন আমার হুস হইল, তখন দেখিলাম, আমি রেলওয়ে গাড়ির ভিতর বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া আছি। আমার ধর্ম্ম-মাতা বাতাস করিতেছেন এবং

ধর্ম্ম-পিতা নিকটে বসিয়া আছেন। আমি সমস্ত অবস্থা উহাঁদিগের নিকট বলিলাম। উহাঁরা সেই দিবস হইতে আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেছেন ও সঙ্গে লইয়া আমাকে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছেন। আমার পিতা কলিকাতায় সেই সময়ে ৪।৫ খানি পত্র লিখিয়া ছিলেন; কিন্তু তাহার এক খানিরও কোন উত্তর পাই নাই। বোধ হয়, আমার বৃদ্ধ মাতা জীবিত নাই; নতুবা এত দিবস তিনি অবশ্যই আমার সন্ধান লইতেন।"—এই বলিয়া বালক রোদন করিতে লাগিল। তখন পুলিস-কর্ম্মচারী তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার মাতা জীবিত আছে, ও তাহার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

যমালয়ের ফেরতা মানুষের জবানবন্দি।

কাছেম আলি বা যমালয়ের ফেরতা মানুষ পরিশেষে যেরূপ জবানবন্দি দেয়, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই,—

"আমার নাম কাছেম আলি নহে বা রামধনিয়াও নহে। আমার নাম আমির খাঁ। আমার পিতার নাম সমসের খাঁ; বাসস্থান, কানপুরের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে। আমার বয়স যখন ১১বৎসর, সেই সময়ে আমার পিতা আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান; এবং সহরের ভিতর একস্থানে একখানি খোলার ঘরে আমরা বাস করিতে থাকি। সে বাটীতে আর কেহ থাকিত না। আমরা দুইজন, আমাদিগের আর একজন আত্মীয় ও আমার চাচা উমরাও খাঁ—যাঁহার বাসস্থান সাহাব্বাদ জেলার অন্তর্গত কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে। উহাঁরা যে কি ব্যবসা করিতেন, তাহা আমি এপর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তবে আমাকে যে প্রকার শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, আমি সেইরূপই চলিতাম। এক দিবস দেখিলাম, আমার চাচা উমরাও খাঁ একটী বালককে আমাদিগের বাসায় আনিলেন ও একটি টিনের বক্সে তাহাকে বন্ধ করিয়া কোথায় লইয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহাদিগের উপদেশ মত আমি রামধনিয়া নাম অবলম্বন করিয়া হিন্দু পরিচয় দিয়া একটী বৃদ্ধার পুত্র সাজিয়া ঐ বৃদ্ধার বাটীতে থাকিতে লাগিলাম। সেই সময়ে ঐ বৃদ্ধার নামে ডাকে ৪।৫খানি পত্র আসিয়াছিল, কিন্তু আমার চাচার পরামর্শ মত ঐ পত্রগুলি বৃদ্ধাকে না দিয়া চাচাকেই আনিয়া দিয়াছিলাম। পরে এক দিবস আমার পিতা অতিথি-রূপে সেই বাটীতে উপস্থিত হইলেন; সেই রাত্রেই ঐ বৃদ্ধার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়া আমরা পলায়ণ করিলাম। ইহার কিছু দিবস পরেই আমি পিতার পরামর্শ মত কাছেম আলি নামে পরিচয় দিয়া ভবানীপুরে উপস্থিত হইলাম ও বৃদ্ধ গোলাম হোসেনের নিকট তাহার 'যমালয়ের ফেরতা পুত্র' বলিয়া পরিচয় দিয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলাম। তিনি আমার বিবাহ দিলেন; পুত্রও হইল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু টাকা লইয়া 'ফকির গুরুকে' দেখিতে যাইবার ভানে বাটীতে যাইতাম। কিন্তু পরিশেষে আমার পিতার পরামর্শে তাঁহারও যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়া ও নসিরুদ্দিনের গহনা প্রভৃতি লইয়া পলায়ন করিয়াছিলাম। কিন্ত এবার আর পরিত্রাণ পাইলাম না—ধরা পড়িয়াছি। যাইহোক, আপনার নিকট এখন সমস্ত প্রকৃত কথা বলিলাম। ইহাতে আপনার যাহা ভাল হয়, তাহাই করুন।"—এই বলিয়া সে নীরব হইল।

পরে পুলিস-কর্ম্মচারী সকলকে আনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং মকর্দ্দমায় যাহা হইল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। তবে এই মকর্দ্দমার আসামিগণের মধ্যে একজন সেই "যমালয়ের ফেরতা মানুষ" জাল কাসেম আলি; সাক্ষী-

গণের মধ্যে একজন "যমালয়ের ফেরতা মানুষ" সেই প্রকৃত রামধনিয়া, এবং তদারককারীও যে "যমের ফেরতা" পুলিস ইহাই আশ্চর্য্য কাণ্ড। যাইহোক, এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিবার নিমিত্ত আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

সমাপ্ত।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

নববাসর।—(গীতিনাট্য)।—শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস-যজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া বিরচিত। রাধানাথ বাবু এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি গীতিনাট্য লিখিয়াছেন এবং তাহার লেখারও অনেকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। উপস্থিত গীতিনাট্যখানিতেও তাঁহার সে প্রশংসা সম্যক রক্ষিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। বিশেষ, ইহার দুই একটী গীত তো আমাদের বেশ মিষ্ট লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে ব্রজের অবস্থা গ্রন্থকার এইরূপ দেখাইয়াছেন;—

"দেশকার—আড়াঠেকা।

থাকিতে শশাংশু ওই কমুদিনী মলিল।
সুখ-সরোবর কেন বিষাদেতে ডুবিল।
কাঁদিল জোছনা বালা, ছড়ায়ে জোছনা-ডালা,
আঁধার বিজন বনে বিষাদেতে পশিল;
আঁধারের পুরী ধরা নিমেষেতে হইল।
থাকিতে বসন্ত ওই, ঝরিল মুকুল সই,
নীরবে বিহগকুল তানমান ভুলিল;
সুখের সময়ে আজি দুঃখ উপজিল।"

আর সেই বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধিকার মর্ম্মগীতি,—

"লগ্নী—যৎ।

নিপট কঠিন হিয়া কাঁহা বনোয়ারি।
তু বিনে কানু, রোয়ত ধেনু,
বাজাওয়ে বেণু, আওরে মোহনমুরারি।
নয়ন অনুখন, বরখে বাদর,
আকুল গোপবালা হিয় জরজর,
শ্যামক-দরশন-আশে!
কথি বঁধু অবহুঁ, কৈ সে অব তুঁহু,
নাহি ভেল দেখা বঙ্কিম হাসে!
* * *
আওরে মধু, পরাণ বঁধু,
মুছাওব ঘুচাওব লোচনবারি।"

এই গীতটীরও অংশবিশেষ বেশ মিষ্ট। পুস্তকের অনেক স্থল এইরূপ বটে; কিন্তু ছন্দোবন্ধে—বিশেষ সেই একঘেয়ে থিয়েটারি সুরে, সকলের কথাবার্ত্তা কহাইতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক স্থল বড়ই কটমট করিয়া ফেলিয়াছেন। যথা,—

"জানত সকলি তুমি—হ্লাদিনী শকতি।"
"সেই পুত্র মহারাজ ন্যায় চক্রবর্ত্তী—"
"দ্যুলোকে দেবতা যাই মর্ত্তে ঋষিলোকে
নিমন্ত্রিয়া সবে আসি।"

ইত্যাদি। ফলতঃ এইরূপ কথাবার্ত্তার জ্বালায় অনেক সময় করুণ-রসেও হাস্যরস আসিয়া উপস্থিত হয়। আরও, শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সেই আদর্শ-নারী সত্যভামার মুখে—

"চল হেরি গিয়ে কেমন সেই রাই কলঙ্কিনী।"

প্রভৃতি বিদ্বেষব্যঞ্জক উক্তিও আমাদের বড় ভাল লাগিল না। যাইহোক, এইরূপ সকল দোষ সত্ত্বেও রাধানাথ বাবুর এ গ্রন্থখানি মোটের উপর বেশ ভালই হইয়াছে। তবে এক শেষ কথা এই যে, চারি ফর্ম্মা ডিমাই বারপেজী পুস্তকের দামটা ॥০ আট আনা বড়ই অধিক; তিন আনা বা হদ্দ চারি আনা হইলেও কম হইত না।

অবসর-বিকাশ।—এখানি একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থ; স্ত্রীলোকের রচিত বলিয়া পরিচিত। গৃহস্থের মেয়ে সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া, অবসরে বসিয়া নেহাত গালগল্পে সময় না কাটাইয়া, যে এ পর্য্যন্তও চিন্তায় সময় কাটাইয়াছেন, ইহাই প্রশংসার কথা। আশা-করি, কালে আমরা ইহাঁর হস্ত হইতে ইহা অপেক্ষাও ভাল ভাল লেখা পড়িতে পাইব।

গোপাল নগর। হরিভক্তি-সংরক্ষিণী সভার কার্য্যবিবরণ।—সভা হিন্দুধর্ম্মালোচনের পরিচয় দিয়া অবশ্যই আমাদের নিকট ধন্যবাদ পাইবার পাত্র।

দুঃখকাহিনী।—"গানও গল্প" সম্পাদক শ্রীমতিলাল বসু প্রণীত। এই গ্রন্থকার বঙ্গের সুপরিচিত নাটককার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয়ের পুত্র এবং আপনার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পরামর্শক্রমে ইনি ইতিপূর্ব্বে "গান ও গল্প" নামক একখানি পত্রিকার সম্পদকতা করিতেছিলেন। 'দুঃখকাহিনীও' সেই পত্রিকা হইতে এখন পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। যাইহোক, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির ক্ষুদ্র ঘটনাটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী বটে। বিশেষ, মতি বাবু বড় মন্দ কায়দা করিয়াও ইহা লিখেন নাই।

সুতরাং অনেকে ইহাতে তৃপ্ত হইবেন, বলিতে পারা যায়।

সাগর-বালা।—ইহাও মতি বাবুর একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। তবে এখানির স্ত্রী-চরিত্রটী আমাদের কিন্তু কেমন কেমন লাগিতেছে। হিন্দুর স্ত্রী—হিন্দুর ঘর হইতে, দুষ্কর্ম্মান্বিত স্বামী দ্বীপান্তরে গিয়াছে বলিয়া যে আপনাকে আদালতের আসামী-স্বরূপ দাঁড় করাইয়া সেই দ্বীপান্তরে যাইতে পারে, এ দৃষ্টান্ত আমরা তো ভাল বলিতে পারি না। তদ্ভিন্ন লিখন প্রণালী ভাল বটে।

এ বৎসরে
কেনারাম বাবুর দুর্গাপূজা।

কেনারাম বাবু গ্রামের মধ্যে আজকাল একজন বড়ই বড় লোক। লোকটা খর্ব্বাকৃতি বটেন, কিন্তু তাঁহার আইরেনচেষ্টে অনেক টাকা আছে; সুতরাং সকলকেই কেনারাম বাবুকে বড় লোক বলিতে হয়। বিশেষ, প্রতি শনিবারে বাবুর দুই তিন শত টাকা ব্যয় হয়। কোন যুবতী স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থ আসিলে কখনই রিক্ত হস্তে ফিরত না। ইহা ব্যতীত বাবু পিতৃপুরুষের নাম বজায় রাখিবার জন্যও সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। দোল, দুর্গোৎসব, ক্রিয়া, কর্ম্ম কিছুই তাঁহার ফাঁক্ যাইত না। ব্যয়ের বন্দোবস্ত সাবেকের অপেক্ষা বরং অধিকই হইত। তবে স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে যে বিষয় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, কেনারাম সে সকল বিষয়ে ব্যয় না করিয়া অন্য বিষয়ে ব্যয় করিতেন। তবে খাতায় কিন্তু সকলই দুর্গোৎসবের ব্যয় বলিয়া লেখা হইত।

এবার সপ্তমী পূজার দিন কেনারাম বাবুর বাড়ীতে আর আনন্দ ধরে না। পূজার দালানে তত ধুমধাম নাই বটে, সেখানে পুরোহিতে পূজা করিতেছেন, ২।৩ জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আর বাড়ীর গোমস্তা ও সরকার পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছে সত্য, কিন্তু পূজার যত জাঁক সেই উপরের বৈঠকখানায়। সেখানে কেনারাম বাবুর ইয়ার আর মোশায়েবে ঘর পরিপূর্ণ। স্যাম্পেনের ফোয়ারা ছুটিয়াছে, হাসির লহরী খেলিতেছে; ইয়ারদের বোল উড়িতেছে। কেনারাম বাবু বলিতেছেন—"আজ আমার কি সুখের দিন।" ইয়ারেরা বলিতেছে—"মা জগদম্বা, তুমি রোজ রোজ এস মা! অন্য কাহার বাড়ী এস আর না এস, আমাদের কেনারাম বাবুর বাড়ী রোজ রোজ এস মা।"

ক্রমে আমোদ অনেক দূর গড়াইতে আরম্ভ হইল। অনেকেই নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন। তখন বেলা পাঁচটার সময় সকলে ধরাধরি করিয়া বাবুকে দেবী-প্রণাম করাইতে আনিল। কেনারাম বাবুর তখন চৈতন্য হইল। কেনারাম বাবু বড় সাবধানী; সুতরাং সকলকে সরাইয়া দিয়া নিজেই সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে পুরোহিতকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া হড় হড় করিয়া পুরোহিতের গায়েই বমি করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং পুরোহিত—"রাম! রাম!" করিতে করিতে খিড়কী দরজা দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিলেন।

কেনারাম বাবু তখন এই দোষটুকু শোধরাইয়া লইবার জন্য দেবীকে তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ফেলিলেন। আর, সে প্রণাম করিতে পা লাগিয়া পূর্ণ-ঘট গড়াইয়া গেল; মা জগদম্বার পা ভাঙ্গিয়া গেল, অসুরের হাত ও সিংহের ল্যাজও ছিঁড়িয়া লইলেন। তখন সকলে ব্যস্ত হইয়া বাবুকে ধরিয়া তুলিল। বাবু এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন,—"বড় সামলে গেচি বাবা!" পরক্ষণেই আবার বলিলেন,—"যাইহোক, বাবা! আর কাজ নেই এ পূজোয়। এখন মানে মানে মাকে আজিই বিদেয় দাও। সপ্তমী অষ্টমীতে কাজ নেই—আমার বিজয়াই আজ থেকে।" এই বলিয়া আপনার রং-বেদার বন্ধুগণকে ডাকিলেন ও তখনই প্রতিমার বিজয়ার আদেশ দিলেন। তাহারাও 'তথাস্তু'! বাড়ীর মেয়ে ছেলে কাহারও আপত্তি শুনিল না। তৎক্ষণাৎ বাবুর আজ্ঞায় সকলে কাঁধে করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে চলিল। আর, বাবুও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাল-বেতালে নাচিতে নাচিতে বিজয়া দেখিতে চলিলেন।*

—সংবাদদাতা স্বয়ং শ্রীকেনারামেরই একজন সহচর।

* টিপ্পনি।—তবে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াই কি রাস্তার ধুলাতেই প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়েছিল, সে সংবাদ আজিও পৌঁছায় নাই, ইতি।

টোট্কা-টুট্কী।

আমাশয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ—(১) পলাণ্ডু কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া লবণ ও হলুদ মাখাইয়া নালিতা ভিজান জলে সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়। (২) বাবুই তুলসীর বীচি জলে ফেলিয়া রাখিলে বীচিগুলি স্থূল ও শুভ্রবর্ণ হইবে, তখন কিঞ্চিৎ ভাল চিনি মিশাইয়া জলসহ খাইতে হয়। যে পরিমাণ জলে বীচি ভিজিতে পারে, সেই পরিমাণ জলেই ভিজাইতে হয়।

রক্তবন্ধের ঔষধ।—তার্পিণ, কর্পুর ও চিনি মিশাইয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া তদুপরি পাণি-সেফালিকার পাতা বাটিয়া বসাইয়া দিয়া তদুপরি নীলবড়ি, পাথরিয়া কয়লা ও কাল-কাসিন্দা পাতা একত্র পেষণ করিয়া লাগাইতে হয় এবং বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সস্তায় সোনা কেনার পরিণাম।

সস্তায় সোনার জিনিস কিনিতে গিয়া অনেকেই আজকাল বিড়ম্বিত হইতেছেন, জানিতে পারিতেছি। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ হইতে ঐরূপ সোনার জিনিস কিনিয়া আমাদের কোন মেম্বর যে শিক্ষা পাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার পত্র এই ;—"মহাশয়, কিছু দিন হইল, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, পা[illegible]ডাঙ্গা, কলিকাতা ঠিকানা* হইতে ইলেক্‌ট্রো কেমিকেল সোনার অঙ্গুরী ও সনিটার ও শ্লিপ বোতামের জাঁকাল রকমের বিজ্ঞাপন দেখিয়া উহাদের কএক সেট ভ্যালুপেয়েবেলে আনাইয়াছিলাম। বিজ্ঞাপন-দাতা লিখিয়াছিলেন,—ইহা গিণ্টি বা অন্য কোনরূপ অস্থায়ী নয় ; কখনও ইহার রং খারাপ হয় না। ব্যবহার করিলে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়। ইহা দেখিতে গিনি সোনার ন্যায়।' আমরা দেশবিদেশে, বনে জঙ্গলে ফিরি। মনে করিয়াছিলাম, যদি অল্পদামে সোনার পরিষ্কার বোতাম পাওয়া যায়, তাহাহইলে ক্ষতি কি! কিন্তু মহাশয় দুঃখের কথা বলিব কি, অল্প দিনের মধ্যেই বোতামের রং অতি অপকৃষ্ট পিতলের মত হইয়াছে এবং কাপড়ে তাহার কলঙ্কের দাগ পড়িতেছে। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, রত্ন ভ্রমে কাচ ক্রয় করিও না ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, কাচ ক্রয় করিলে এত ঠকিতাম না। কারণ, কাচ অপরিষ্কার হয় না এবং কাপড়ও নষ্ট করে না। অনেক প্রতারক লোভপরবশ হইয়া মফঃস্বলের নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে ঠকাইতেছে বলিয়া বিজ্ঞাপনদাতা আবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইহাঁরাই উচ্চ শ্রেণীর।" একখানি নহে ; এইরূপ বিজ্ঞাপন যাঁহারা দেন, প্রায় তাঁহাদের নামেই দুই একখানি অভিযোগ পাওয়া যায়। যাইহোক, ইহাতে বিজ্ঞাপন-দাতাদেরও আমরা তত দোষ দিই না ; কারণ, সোনা জিনিসেরও যাঁহারা সস্তা খোঁজেন, সে সকল গ্রাহকের এরূপ লাভই উচিত।

বাগবাজার, আদরিণী-আপিস

হইতে আজকাল আবার মফঃস্বলের অনেক ভদ্র লোকের নিকট একখানি কার্ডসহ একটী করিয়া প্যাকেট প্রেরিত হইতেছে। তাহার মর্ম্ম এই,—"আদরিণী উৎকৃষ্ট পত্র। রীতিমত প্রকাশ হয়। মূল্যও অল্প। আপনি সাহিত্যের সেবক ; সুতরাং তাহার এপর্য্যন্ত প্রকাশিত সংখ্যাগুলি ভ্যালুপেয়েবেলে আপনার নামে পাঠান গেল। মূল্য দিয়া উহা লইয়া বাধিত করিবেন। পরে বক্রি সংখ্যা নিয়মিত প্রেরিত হইবে।" কিন্তু এই পত্রমত "অনেক মফঃস্বলের ভদ্রলোক এবং পরীক্ষার্থ অনুসন্ধান-সমিতির কোন কোন মেম্বরও সেই পত্র ও প্যাকেট গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সেই পর্য্যন্তই বিজ্ঞাপনদাতার সহিত সম্পর্ক। পরে আর কাগজ পাওয়া দূরে থাক, রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিলেও উত্তর তাঁহারা পান না। যাইহোক, আদরিণী-আফিসের দিন দিন এরূপ অকার্য্যে আমরা বড়ই দুঃখিত আছি। তাঁহারা এখনও সৎপথে চলুন, এই অনুরোধ।

এসব আবার কি ?

সেরপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ও অনু-সন্ধান-সমিতির মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় 'প্রেম-রহস্য' প্রভৃতি কতক-গুলি পুস্তকের বিজ্ঞাপন আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া লিখিয়াছেন,—"প্রেমরহস্য প্রভৃতির বিজ্ঞাপনদাতা বটতলা চিৎপুর রোডের নবকুমার দত্তের নিকট হইতে আমার একজন আত্মীয় ঐ জাঁকাল বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঐ গ্রন্থ চাহিয়া পাঠান। উত্তরে ভি, পি, ডাকে 'স্বর্ণবাই' প্রভৃতি কতকগুলি ছাইভস্ম পাঠাইয়াছেন। বিজ্ঞাপনের লিখিত গ্রন্থের উহাতে নামগন্ধও নাই। আমি ঐ বিজ্ঞাপনটিও তাঁহারই নিকট পাইয়াছি। এসব অত্যাচারের কি প্রতিকার নাই ?'

গ্রাহকের দৌরাত্ম্য।

১। বাবু দেবেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস, নবগ্রাম নান্নার পোঃ, ঢাকা।—'অনুসন্ধান পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের মূল্যের জন্য ইহাঁর নিকট ভ্যালু-ডাকে কএক সংখ্যা কাগজ চাহিলে ইনি তাহা ফেরত দেন এবং পরে ফেরত দেওয়ার কারণ জানিতে রিপ্লাই-কার্ডে পত্র লিখিলে উত্তর দিয়াছেন,—"আমি আপনাদিগকে অতিশয় খারাপ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। শ্রাবণ মাসের হইতে পত্রিকা সবই ফিরাইয়া দিতেছি, তবুও আপনি টাকা চান ইত্যাদি।" কিন্তু পাঠক শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, এ পর্য্যন্ত উহাঁর এক সংখ্যা কাগজও ফেরত পাই নাই। অধিকন্তু, ভাদ্রমাস তক ইহাঁর জ্যেষ্ঠ অপর কোন পত্রিকার জন্য টাকা পাঠাইয়া তাহা পাইতে ছন না জানাইয়া আমাদিগকে এক পত্র দেন ; এবং তখন সে কাগজের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই আমাদিগের টাকা দিবেন, বলেন। কিন্তু এখন আমরা চেষ্টা করিয়া সে টাকারও কিনারা করিয়া দিলাম ; অথচ একেবারেই ইনি চতুরতা করিয়া আমাদের টাকা লোপাট করিতে চাহেন ? পাঠক দেখুন, কিরূপ কলির উপকার-স্বীকার !!

২। বাবু বিপিনবিহারী সিংহ, সাহাসপুর। মাইনর স্কুল, নলগোরা পোঃ, বরিশাল। ইহাঁরও নামে টাকার জন্য ভ্যালুভে কাগজ যাইলে, তাহা ফেরত দিয়া ইনি লিখিয়াছেন যে, 'যে কয় সংখ্যা কাগজ দিয়াছেন, তাহারও মূল্যের দাবী করিতে পারেন না। কারণ আমরা চালাক, আমরা আর কোন বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঠকিব না। যাহারা নিতান্তই বোকা, তারাত ঠকিবেই।" দেখুন পাঠক! টাকা না দিবার কেমন অদ্ভূদ ওজর। এইরূপ আমাদের আরও দুই চারিজন শিষ্ট গ্রাহক টাকা না দিবার কারণ দেখাইয়া থাকেন। সে সকলও বড়ই রহস্যপ্রদ। পাঠকগণকে সময়ান্তরে তাহাও জানাইবার বাসনা রহিল। উপসংহারে বলা বাহুল্য, এই সকল গ্রাহক যে, কেবল আমাদিগের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। বিশ্বাস হয়, ইহাঁরা আরও অনেককে মজাইয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের নিয়ম কিছু কঠিনহেতু আমরা আগে বুঝিতে পারিলাম।

সংবাদ।

—সম্প্রতি পিকিং সহরের নিকটস্থ স্থানসমূহে হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর রূপের বন্যা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ৫।২০ খানি গ্রাম একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে এবং অন্যূন দশ ১০,০০০ সহস্র লোক সে বন্যাজলে ভাসিয়া গিয়াছে।

* এবারও বিজ্ঞাপনদাতাদের নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের বুজরকী প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু আরও বিজ্ঞাপনের বোলচালের বাড়াবাড়ি করিলে বারান্তরে বাধ্য হইয়া আমরা অবশ্যই নামও প্রকাশ করিব।

—এলাহাবাদের একটি মাল-গুদামে কতকগুলি দিয়াস্‌লাই-বাক্সের গাঁইট ছিল। কএক দিন রাত্রিতে তথায় ইন্দুর বাহির হইয়া সে গুলিকে নাড়াচাড়া করে। তাহাতে, কি দুর্দ্দৈবের কথা, বাক্সগুলির পরস্পর ঘর্ষনে একদিন আগুণ বাহির হয়, এবং সে আগুণে ক্রমে বিষম অনর্থ ঘটিয়াছিল। প্রায় ২০ জন মহাজনের গুদাম তাহাতে পুড়িয়া গিয়াছে এবং প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ভষ্মসাৎ হইয়াছে।

—রুশরাজ্যে স্ত্রীও সম্পত্তির মধ্যে গন্য; লোকে কথায় কথায় স্ত্রী-বিক্রয় করিয়া দায় উদ্ধার হয়, সংবাদ পাওয়া যায়। একজন রুশীয় কৃষক পাশাখেলায় তাহার স্ত্রীকে বাজি রাখিয়াছিল; এবং শেষে হার হওয়ায় স্ত্রীকেই প্রদান করিতে বাধ্য হয়। আর একজন কৃষক সম্প্রতি দেনার দায়ে আপনার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে। ঐ ব্যক্তির নিকট একজন মহাজন অনেক দিন হইতে প্রায় ৩০ টি টাকা পাইতেন; কিন্তু সে কিছুতেই তাহা দিতে না পারায় শেষে তাহার স্ত্রীটি লইয়া মহাজন তাহাকে ঋণদায়ে অব্যাহতি দিয়াছেন। এ এক বিটকেল আচার বটে!

—বিড়ালেরও প্রভুভক্তির বড় অল্প পরিচয় পাওয়া যায় না। একজন ফরাসী যুবক ক্রিমীয় যুদ্ধে গমন করিলে, তাঁহার বিড়ালটীও, বহু বাধা দেওয়া সত্বে, তাঁহার সঙ্গে যায়; অধিক কি, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেও নিরস্ত হয় না। যুদ্ধে যাইয়া বিপক্ষের এক অস্ত্রাঘাতে যুবকের দেহ হইতে অনর্গল রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয় এবং যুবক তাহাতে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হন। কিন্তু তখন তাঁহার সেই বিড়ালটী তাঁহার নিকটে যায় এবং ক্ষত স্থানে মুখ দিয়া লেহন করিতে থাকে। ইহার ক্ষণপরেই তথায় ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হন এবং দেখিয়া তিনি বলেন,—"এই বিড়ালই ইঁহার জীবন বাঁচাইল; বিড়াল ক্ষত স্থানে এইরূপে লেহন না করিলে ইনি কখনই বাঁচিতেন না।" বলা বাহুল্য, এইরূপে বিড়াল হইতে জীবন পাইয়া যুবকও আর কখনও সে বিড়ালটিকে ভুলিতে পারেন নাই।

—ব্যাঘ্র হইতে প্রাণ রক্ষার এরূপ আশ্চর্য্য সংবাদ আর কখনও শুনা যায় নাই। একদিন রাত্রিযোগে চীন রাজ্যের কোন একটী গ্রামে, উটি নামক দেবতার মন্দির মধ্যে একজন উপাসক নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রাভঙ্গে ভোর রাত্রে তিনি দেখেন, মন্দিরের দ্বারে একটী ব্যাঘ্র বসিয়া রহিয়াছে। ব্যাঘ্রের লেজটী দুয়ারের ফাঁক দিয়া মন্দিরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে তিনি সম্ভবতঃ তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার আশায়, ব্যাঘ্রের লেজটী কাটিয়া লন। ইহাতে ব্যাঘ্র কুপিত হয় এবং দ্বার ভাঙ্গিয়া উহাঁকে গ্রাস করিবার জন্য চেষ্টা পায়। তাহাতে উপাসকও দুয়ার চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু পরে ব্যাঘ্রের জোরেই দুয়ার ভাঙ্গিয়া পড়িল ও তিনি তাহাতে চাপা পড়িলেন। তখন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, দেবতাই তাহার লেজ কাটিয়া লইয়াছে সম্ভবতঃ এই বোধে, ব্যাঘ্র সেই দেবতাকে মুখে করিয়া পলায়ণ করিল। উপাসক তখন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন!

—ভারতের ভাবী বড়লাট আগামী ১লা বা ২রা ডিসেম্বর ভারতে পদার্পণ করিবেন।

—স্বামী মূর্খ ও কুৎসিৎ বলিয়া সেদিন শিক্ষিতা রুক্মাবাই স্বামী ত্যাগ করিলেন; কিন্তু সম্প্রতি আর একজন পার্শীযুবক 'স্ত্রীলেখা পড়া জানে না' বলিয়া স্ত্রীর সহিত ফারখতের এক দরখাস্ত করিয়াছেন। যুবকও কীর্ত্তিবান বটেন!

—জীবিকার জন্য ভারতবর্ষে প্রায় ৩, ১৭, ৯৪, ৭৩৫ জন স্ত্রীলোক পরিশ্রম করিয়া থাকে। তন্মধ্যে এক কৃষি কার্য্যেই প্রায় ১, ৮৮, ৬৩, ৭২৬ জন, মজুর ৫২, ৪৪, ২০১, চাকরাণী ৬, ৫১, ৯৬৬, কুমার ২৪৯, ৮৩৯, সূতা কাটে ২৮, ৭৭, ৮৭৬, সেলাই করে ৭, ৩৩, ০৮৩ এবং বক্রী অন্যান্য কাজে নিযুক্ত আছে।

—গত বৎসরে পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ কোটি চিঠি বিলি হইয়াছে।

—মালট নামক একজন মহিলা ১৭০২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে এক দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করেন। তাহার পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কোথাও দৈনিক পত্র প্রকাশ হয় নাই। স্ত্রীলোকের এ এক কীর্ত্তির কথা বটে!

—'সখা' কুকুরের বুদ্ধির এক পরিচয় দিয়াছেন। একটী কুকুরের গায়ে পোকা হইলে সে বড়ই অস্থির হয়। শেষে একদিন খানিক তুলা মুখে করিয়া জোয়ারের প্রারম্ভে সে গঙ্গায় গিয়া বসিয়া থাকে। তাহাতে জোয়ারের জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাহার গায়ের নিম্নস্থল যেমন ডুবিতে থাকে, তাহার গায়ের পোকা সকলও অমনি উপরের দিকে উঠিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে তাহার মুখ পর্য্যন্ত জল উঠিলে পোকাসকল সেই মুখস্থিত তুলায় আসিয়া একত্রিত হয়। তখন কুকুর অমনি ফু দিয়া তুলা উড়াইয়া দিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পোকার দল ভাসিয়া গেল। পরে সে উঠিয়া ডেঙ্গায় আসিয়া সচ্ছন্দ পাইল।

অনুসন্ধান।

—:০(০)০:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩০এ কার্ত্তিক, ১২৯৫ সাল। [৭ম সংখ্যা।

কালী-কীর্ত্তন।

(নগর-সংকীর্ত্তনের সুরে)

মহড়া (তেওট)।

ওমা কাত্যায়ণি, কাল-বারিণি, ভব-নিস্তারিণি, শব-বিহারিণি, দেব-অরি-বিঘাতিনি,
চণ্ডমুণ্ড-দনুজ-দলনি!

(খরজ।)

সমরে রূপ ভয়ঙ্করা, মসিবর্ণা অসি-করা, নৃমুণ্ডমালিনি তারা, অর্দ্ধ শশিশেখরা!
রণ-উন্মাদে, কটীতটে করশ্রেণী-ধরা, তাহে বিগলিত খর রুধিরধারা!
নৃত্যশীলা দিগম্বরা, পদভরে কম্পিতা ধরা!

(লোফা)

আহবে আসবে ঘোরে রক্তনয়ন অনিবার!
তায় লোল রসনা, বিকট দশনা, করাল-বদনা রে!
অট্টহাসি কি ভয়াল, পিছে ফিরে ফেরপাল, সঙ্গে যোগিনী রণরঙ্গিনী ছাড়িছে হুহুঙ্কার!

(ধামাল)

হেরে মূর্ত্তি কালানল, নির্ব্বল দনু-দল, ক্রমে নির্ম্মূল সকল দানব প্রবল, শূন্য রণস্থল!
আর কারে মা মার্ব্বি, ঐ চেয়ে দেখ্ তোর পদতল,—শুম্ভ নাই আর—এখন স্বয়ম্ভু পড়ে কেবল!

(ছোট দশকুশি)

দয়া কর্ দয়াময়ি, ওরূপ সম্বর বিশ্বজয়ী! দেখ্‌না মা, কে প'ড়ে চরণে?
ওমা দেখ্‌না দেখ্‌না—তখন ছিলেন হর একা পায়, শ্রীহরিও এসে মিলেছেন তায়,
হরি-হরের মিলন হ'লো হায়! হরি-হর হ'লেন একাঙ্গ হায়!

(মেল্‌তা)

ব্রহ্মপদ যে পদতলে, হরি-হর মিলে যে স্থলে থাকেন কুশলে, সে পদ পাই অন্তকালে,
এই ভিক্ষা দে দাসে জননি!

রাজসই জুয়াচুরী।

বেলা অপরাহ্ণ; ৫টা বাজে বাজে! শ্রীহরি বাবু আপিসের কাজকর্ম্ম সারিয়া আসিয়া লালদিঘির ধারে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি খুঁজিতেছেন। ইচ্ছা, আজই একবার বড়বাজার ও যোড়াসাঁকো প্রভৃতি ঘুরিয়া ছেলে-মেয়ের পূজার কাপড়-চোপড়গুলি কিনিয়া লইয়া যান। কিন্তু অনেকক্ষণ হইতে গাড়ি আর ভাড়ায় বনিতেছে না; সকল গাড়োয়ানই বেশ দাঁও মাফিক ভাড়া হাঁকিয়া বসিতেছে। সুতরাং শ্রীহরি বাবু ক্রমে বিরক্ত হইয়াই পড়িতেছেন। এমন সময় একটী হিন্দুস্থানী বাবু সেইখানেই একখানি গাড়ি ঘণ্টাহিসাবে ভাড়া করিলেন এবং শ্রীহরি বাবুর গন্তব্য পথেই যাইবেন, গাড়োয়ানের নিকট সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন।

গাড়িতে চড়িয়াই হিন্দুস্থানী সেই বাবুটীর যেন শ্রীহরি বাবুর প্রতি নজর পড়িল। তিনি আপনা-আপনিই শ্রীহরি বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আসুন মহাশয়, আর কষ্ট পাইতে হইবে না। আমিই গাড়ি ভাড়া করিলাম: আপনি অমনই আমার গাড়িতে যাইবেন। আপনি যে অঞ্চলে যাইতে চাহিতেছেন, আমিও সেই দিকেই যাইব।" কাজেই সুবিধা বুঝিয়া শ্রীহরি বাবুও সেই গাড়িতে চড়িলেন। তবে তাঁহার মনে মনে থাকিল যে, তিনিও না হয় তাড়ার অংশবিশেষ ঐ গাড়োয়ানকে দিবেন! যাইহোক, গাড়ি চলিতে চলিতে ক্রমে শ্রীহরি বাবুর সহিত সেই হিন্দুস্থানী বাবুটীর পরিচয় হইল। শ্রীহরি বাবু জানিলেন যে, ঐ হিন্দুস্থানী বাবুটী রাজপুতনার কোন রাজ-পরিবারের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী; এবং এমন কি, রাজ-সংসারের অধিকাংশ কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভারই তাঁহার হাতে। আর হিন্দুস্থানী বাবুটীও জানিলেন যে, শ্রীহরি বাবুও পূর্ব্ব-বঙ্গের একজন জমীদারের সন্তান; তবে বর্ত্তমান অবস্থা তাদৃশ ভাল না থাকা[য়] কলিকাতায় একটী কর্ম্ম করিতেছেন। ত[বে] কলিকাতায়ও তাঁহার অনেকের নিকট মানসম্ভ্র[ম] আছে।

এই সকল পরিচয় পাইয়া এবং বর্ত্তমা[ন] চাকুরিতে শ্রীহরি বাবু তেমন তুষ্ট নন জানি[য়া] ও তদপেক্ষা কোন উচ্চ কর্ম্ম পাইলে তা[হা] গ্রহণ করিতে বিশেষ ব্যগ্র বুঝিয়া, অতঃপ[র] সেই হিন্দুস্থানী বাবুটী বলিতে লাগিলেন,—"তা' একটা কাজ আমার হাতেই এখন আছে বটে। কিন্তু এর মধ্যেই তা'র অনেক দরখা[স্ত] এসেছে। এক 'এক্সচেঞ্জ গেজেটে' তার বিজ্ঞা[প]ন বার হ'তে না হ'তেই ১০ জন কর্ম্মপ্রার্থী পাইয়াছি। তবে এখনও কোন স্থির হ[য়] নাই। এই দেখুন সে বিজ্ঞাপন।" এই বলিয়া অতঃপর তিনি শ্রীহরি বাবুকে এক-খানি গেজেট দেখাইলেন।

শ্রীহরি বাবু বিজ্ঞাপনটী পড়িলেন। এব[ং] পড়িয়াই ঐ সম্বন্ধে আরও অধিক কিছু জানিতে তাঁহার বড়ই কৌতূহল হইল। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা মহাশয়! আমি তে[া] আজকাল বড়ই হীন অবস্থায় পড়িয়াছি। আপনি চেষ্টা করিয়া উহাতে আমাকেই প্রতিপালন করুন না কেন? আপনি জামিন চান, আমি তাও দিতে রাজি আছি। আর আমার যে সব কর্ম্মক্ষমতার সার্টিফিকে[ট] আছে, তাও আপনাকে দেখাইতে পারি।" এই বলিয়া শ্রীহরি বাবু যেন কিঞ্চিৎ বাধ্যভা[ব] প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তখন, পূর্ব্বাপেক্ষাও কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া হিন্দুস্থানী বাবুটী বলিলেন,—"তা'হলে কাল একবার প্রাতঃকালে আমাদের ৫৪নং গদীতে আপনাকে সার্টিফিকেট প্রভৃতি লইয়া যাইতে হয়। তখন আমি রাজা বাহাদুরের সঙ্গে একবার এ বিষয়ের কথাবার্ত্তা কহিতে পারি।" এই আশ্বাসে শ্রীহরি বাবু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। এবং তাড়াতাড়ি আপনার পকেট-বুকে উহাঁদের ঠিকানা লিখিয়া সেইমত যাইবেন, বলিলেন। অতঃপর ক্রমে নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটে গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শ্রীহরি বাবু পরম আপ্যায়িত হইয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন।

* * *

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীহরি বাবু হাতমুখ ধুইয়াই একখানি গাড়ী ডাকিলেন। আজ আর গাড়োয়ানের সহিত তেমন দরদস্তরও করিলেন না। সে যাহা বলিল, তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া গাড়ীতে উঠিলেন; ও গাড়ি ক্রমে আসিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। বন্দোবস্তমত ক্রমে তখন তাঁহার সহিত গতকল্যকার সেই হিন্দুস্থানী বাবুটীরও সাক্ষাৎ হইল; এবং ক্রমে তিনিই শ্রীহরি বাবুকে সঙ্গে করিয়া উপরের সুসজ্জিত রাজ-বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

রাজ-বৈঠকের আর পরিচয় দিব কি? সেখানে সেই রাজোচিত সাজসজ্জা—সেই দৃষ্টিচমককারী মণিমুক্তা পুত্তলির শোভা! ফলতঃ শ্রীহরি বাবু পূর্ব্বে কখনও সেরূপ জাঁকজমক দেখেন নাই এবং কখনও যে তাহা দেখিবেন এমত ভাবেনও নাই। যাইহোক, ক্রমে অনেক ক্ষণের পর, রাজার সহিত কথা কহিবার একটু সুযোগ পাইয়া সেই পূর্ব্বপরিচিত হিন্দুস্থানী বাবুটী অতি নম্রভাবে রাজাকে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! রাজসংসারের যে কর্ম্মটী খালি আছে, সেইজন্য এই বাবুটিকে আমি মনোনীত করিতেছি। ইনি এতদঞ্চলের একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার সন্তান এবং আমারও বিশেষ পরিচিত। আমি বহুদিবস যাবৎ ইহাঁর কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আসিতেছি।" তখন অনেকক্ষণ পরে রাজা হিন্দিতে উত্তর দিলেন,—"তা' তোমরা যাহা বুঝ, তাহা করিতে পার। ও সামান্য বিষয়ের জন্য আমার সহিত পরামর্শের আবশ্যক কি?"

কাজেই সকল স্থির হইয়া গেল। বেতন পুরাপুরি তিন শত টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। পূর্ব্বের কর্ম্মকাজ ত্যাগ করিয়া আসিয়া ক্রমে শ্রীহরি বাবুও পরম আনন্দে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তবে এখানে যে কাজ করিতে হইবে বলিয়া তিনি নিযুক্ত হইলেন, কার্য্যকালে তাহা না করাইয়া অন্য সকল রকমওয়ারী কাজই অতঃপর সেই হিন্দুস্থানী বাবু তাঁহার দ্বারা নির্ব্বাহ করাইতে লাগিলেন। সুতরাং কর্ম্মসূত্রে থাকিয়াও শ্রীহরি বাবু রাজ-সংসারের ভিতরের রহস্য কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না।

* * *

দেখিতে দেখিতে এক দিন দুই দিন করিয়া করিয়া ক্রমে পনের দিন কাটিয়া গেল। এই কয়দিনে শ্রীহরি বাবু রাজ-সংসার হইতে উপার্জ্জনের কিন্তু এক নূতন ফন্দী দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখেই এই এক সামান্য তাসখেলার উপলক্ষ করিয়া, রাজার নিকট হইতে প্রতিদিনই অনেক লোকে প্রায় দশ বিশ হাজার টাকা লাভ করিয়া যায়। আর সে খেলা তেমন শক্তও নয়; অধিক কি, ক'দিন দেখিয়া তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তিনিও যদি রাজার সহিত একবার খেলিতে বসেন, তবে তিনিও সেরূপ দাঁও মারিতে পারেন। তবে মনিব রাজার সহিত খেলিবেন, একথা বলেনই বা কি করিয়া; আর, একেবারে দশ বিশ হাজার টাকা সঙ্গে লইয়া না আসিলেও রাজা কাহারও সহিত খেলিবেন না বুঝিয়া, তিনি এত দিন চুপ করিয়াই আছেন। কিন্তু আর পারিলেন না! এক দিন বিশেষ সন্তর্পণে তিনি সেই হিন্দুস্থানী বাবুটীকে বলিলেন,—"মহাশয়, আজ

ক'দিন থেকে আমার মনে একটা বড়ই উদ্বেগ হইয়াছে। কি উপায়, আপনার নিকট তাই পরামর্শ পাইতে চাই। অর্থাৎ আমি প্রত্যহই দেখি যে, রাজা মহাশয়ের নিকট হইতে এই এক সামান্য তাসখেলা উপলক্ষ করিয়া অনেকেই রোজ রোজ ১০।২০ হাজার টাকা মেরে নিয়ে যায়।"

এই কথা বলিতে বলিতেই হিন্দুস্থানী বাবুটি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"তা মহাশয়,—যাবে না! না গেলে এই আজকালকার বাজারে এই সামান্য বেতনে কাঁচাকচি নিয়ে মানসম্ভ্রম কি বাঁচান যেত! বিশেষ রাজার অগাধ টাকা থাকিতে, তাঁহার কর্ম্মচারী আমরা কি না খেতে পেয়ে মরিব? সেইজন্য মহাশয়, রাজার প্রকৃতি বুঝিয়া আমিই এ খেলার বন্দোবস্ত করাই। যাহারা জিতিয়া লইয়া যায়, সকলেরই আমার সহিত ভাগ আছে। আর, ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহেই, মহাশয়, একরূপে সংসারাদি চালাইয়া থাকি।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীহরি বাবু তো আরও আশ্বস্ত হইলেন। তখন একটু সাহস করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, আমারও বড় ঐ খেলা খেলিতে ইচ্ছা করে। তা' রাজা মনিব, কি করেই বা হয়; আর, বিশেষ দশ বিশ হাজার টাকাই বা পাই কোথায়! এক জমীজারাৎ বাঁধা দিয়ে হইতে পারে বটে; কিন্তু প্রথম সন্দেহ যে, রাজা আমার মত ক্ষুদ্র চাকরের সঙ্গে খেলিবেন কি?"

হিন্দুস্থানী বাবুটী।—"তা' আমি সবই ঠিক করে দিতে পারি। যদি আপনার ইচ্ছেই হয়,—অধিক কি, জমীদারী বন্ধক দিয়ে যদি টাকা কড়ি ধারও চান, তা একটু বেশী সুদ দিলে, আমি আজই যোগাড় করে দিতে পারি।"

শ্রীহরি বাবু।—"আপনি আমার প্রতিপালক! তা' দয়া করে আমার জমীদারী বন্ধক দিয়ে আপাততঃ দশ পনের হাজার টাকার যোগাড় যদি করাইয়া দিতে পারেন, তবে বড়ই অনুগৃহীত হই। এবং তারপর রাজার সহিত একবার কথাবার্ত্তাটা হলেও হয়।"

অতঃপর তাহাই হইল। সেই হিন্দুস্থানী বাবুটীরই দালালীতে একজন মাড়োয়ারীর নিকট হইতে বেশ পাকাপোক্তমত রেজিষ্টারী করিয়া শ্রীহরি বাবুর জমীদারীটুকু বন্ধক দেওয়া হইল। এবং বলা বাহুল্য, সে কার্য্যেও হিন্দুস্থানী বাবুটী উভয় পক্ষ হইতেই বেশ দু'পয়সা দালালী পাইলেন।

*　　*　　*

পরে একদিন খেলা আরম্ভ হইল। চারিদিকে রাজ-পারিষদগণ এবং মধ্যস্থলে রাজা ও শ্রীহরি বাবু বসিয়া খেলিতে লাগিলেন। খেলিতে বসিয়া প্রথম প্রথম দুই এক দান শ্রীহরি বাবুরই বেশ জিত হইতে লাগিল এবং তিনি বেশ দুই পাঁচ শত টাকা পাইতে লাগিলেন।

কিন্তু ক্ষণেক পরেই গোল বাধিল। সেবার একবারেই বিশ হাজার টাকার দান। উভয়েই সমস্ত টাকা মধ্যস্থলে আমানত করিয়াছেন। পাঞ্জা বাহির হইলেই রাজার জিত হইবে, আর অন্য কিছু বাহির হইলেই শ্রীহরি বাবুর জিত হইবে, কেবল খেলার এইটুকু বাকী। এমন সময় কাগজ টিপিতে টিপিতে রাজার হাত দিয়া তাস হইতে একখানি ইস্কাবনের চৌকা বাহির হইল। শ্রীহরি বাবু হাতে স্বর্গ পাইলেন; বুঝিলেন, তিনি একেবারেই বড় মানুষ! কিন্তু অমনি চারিদিক হইতে রাজপারিষদগণ বলিয়া উঠিল,—"জয় মহারাজের জয়! জয় মহারাজের জয়।—বাহবা পঞ্জুরী!" এই বলিয়া চারিদিকে গোল উঠিল। সেই ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উভয়ের আমানত টাকা একজন রাজকর্ম্মচারী উঠাইয়া লইল। "চৌকা পড়িয়াছে, চৌকা

পড়িয়াছে" বলিয়া দুই এক কথা কহিতে যাইলেও শ্রীহরি বাবুকে সেই মজলিসে কেহ কিন্তু আর কলিকা দিল না।

ক্রমে রাজা উঠিয়াই 'বাগান-ভোজে যাইতে হইবে' বলিয়া গাড়িতে চড়িলেন। হিন্দুস্থানী বাবুটীও ক্ষণেক শ্রীহরি বাবুকে স্তোক দিয়া বুঝাইতে গেলেন; কিন্তু মন কি আর বুঝে! তখন কাজেই তাঁহাকেও রাজার পথ দেখিতে হইল। অতঃপর কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীহরি বাবু একবার পুলিসের দিকে যাইবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু তাই বা কি করিয়া যান! যে কাজে তিনি ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকেও যে সাজা পাইতে হয়! যাইহোক, তথাপি তিনি একবার 'টাকা কাড়িয়া লইয়াছে' এই এজাহার দিয়া পুলিশ ডাকিতে আসিলেন।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! সাজিয়া-গুজিয়া পুলিস লইয়া যাইতে না যাইতে রাজা-রাজপারিষদ সকলেই অদৃশ্য! কেহই কাহারও আর খোঁজ খবর পাইলেন না।

হালালী ও হারামী।

হালালীর সংখ্যা জগতে অতি অল্প, হারামীর সংখ্যাই অধিক। প্রায় পনের আনা লোক হারামী করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করে, বাকী আর এক আনা আন্দাজ মাত্র হালালীর উপর নির্ভর করিয়া মানব-জগতের আদর্শ-স্থানীয় হন। সহজ কথায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা পালন করিয়া, ধর্ম্ম ও নীতির মুখপানে চাহিয়া যে কার্য্য সমাধা হয়, তাহার নাম হালালী; আর হারামী অর্থে—যাহা কিছু আসুরিক তমো-ভাবাপন্ন, যাহা কিছু হীন ও নীচ কার্য্যের পরিচায়ক, যাহা দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া অতি কুৎসিত ও পৈশাচিক ঘটনার অবতারণা হইয়া থাকে। এক কথায়—হালালী অর্থে ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব; আর, হারামী অর্থে পেজোমি বা ইতরোমি। সংসারের লোক বুঝে না, তাই হারামী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও অতি অশান্তিভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে; কিন্তু তাহারা যদি হালালীর অলৌকিক পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত, তাহার অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে জানিত, তাহাহইলে আজ এই বিশাল মানব-সংসারে ভীষণ হলাহল-স্রোত উঠিত না। হালালী ও হারামীর পরিণাম যে কি, তাহা নিম্নলিখিত কোন সাধু-প্রমুখাৎ শ্রুত এই গল্পটী আলোচনা করিলে অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

প্রবাদ আছে যে, দিল্লীর অধীশ্বর সম্রাট আকবর সাহা 'হালালী' অবলম্বী ছিলেন। অর্থাৎ যদিও তিনি সম্রাট ছিলেন, মণি-কাঞ্চন, ধন-দৌলৎ যদিও তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না, তথাপি তিনি শারীরিক পরিশ্রমে ও স্ব-উপার্জ্জিত অর্থে আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সভাসদ্‌বর্গ, এমন কি আপন মন্ত্রী পর্য্যন্তও, এ কথা কেহ জানিত না। সমস্ত রাজকার্য্য ও রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া রাত্রিকালে যখন বিশ্রাম পাইতেন, সেই সময়ে তিনি নির্জ্জনে বসিয়া সূচিকার্য্যের সাহায্যে টুপি প্রস্তুত করিতেন, এবং কোন এক অতি বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা তাহা বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইতেন; ইহা তাঁহার দৈনিক কার্য্য ছিল। সামান্য টুপি বিক্রয়ের যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ, তিনি 'হালালী' বলিয়া জানিতেন; আর অতুল ঐশ্বর্য্য, মনোরম রাজপ্রাসাদ, অসামান্য কীর্ত্তি কলাপ, তাঁহার নিকট 'হারামী' বলিয়া বোধ হইত।

অর্থী ও ভিক্ষুকদিগকে অর্থ দান তাঁহার এক বিশেষ কার্য্য ছিল। তাঁহার দান দুই প্রকারে বিতরিত হইত। প্রতিদিন সমাগত অতিথি ও ফকিরদিগের অভীপ্সিত অর্থ দিবার

সময় তিনি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"তুমি কিরূপ দানের অভিলাষী?" অর্থাৎ হালালী ও হারামী, এই উভয় প্রকার অর্থের প্রকৃত মহত্ত্ব বা হীনত্ব প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিতেন। যাহারা 'হারামী' দান গ্রহণ করিত, তাহারা যে 'হালালী' অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক অর্থ পাইত, তাহা বলা বেশীর ভাগ। সুতরাং হালালী দান গ্রহণ করিতে কেহ বড় একটা অভিলাষী হইত না। 'হারামী'-অধিকারভুক্ত দশ টাকা পরিত্যাগ করিয়া, 'হালালী'-উপার্জ্জিত দু' গণ্ডা পয়সার কে প্রত্যাশী হইবে? বলা বাহুল্য যে, প্রথম শ্রেণী 'হারামী'-অর্থীরই পূর্ণাধিক্য পৃথিবীতে বিদ্যমান। দিনের পর দিন যায়, ঘটনাক্রমে এক দিন এক ফকির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। বাদসাহ আকবরও পূর্ব্ব-প্রথানুসারে তাহাকে হালালী ও হারামী দানের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম অবগত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি চাও? যদি হারামী অভিলাষী হইয়া থাক, তবে তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা পূর্ণ করিব। আর যদি হালালী চাও, তবে রে বাপু, আমার এই যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করি, সানন্দে গ্রহণ কর।" ফকিরও কি একটু চিন্তা করিয়া কহিল,—"জাঁহাপনা, আমি হালালীই চাই, হারামীতে আমার প্রয়োজন নাই।" দিল্লীশ্বরও হৃষ্টচিত্তে একটি ক্ষুদ্র থোলে হইতে চারি আনা পয়সা তাহাকে দান করিলেন। ফকির প্রস্থান করিল।

কিছু কৌতূহল-ভাবে ফকির কিছুদূর গিয়া হালালী ও হারামী এ দু'য়ের রহস্য ভেদ করিতে মনস্থ করিল। তাহার মনে কেমন এক প্রকার বিশ্বাস জন্মিল যে, হালালীর অবশ্যই কোন এক বিশেষ গুণ আছে; সুতরাং তাহার পরীক্ষার জন্য ফকিরের কিছু আগ্রহ বাড়িল। হালালীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সে এক মনে যাইতেছে, এমন সময় পথিমধ্যে এক বৃক্ষমূলে-স্থিত কতকগুলি কাবুলী (কাবুল দেশীয় অধিবাসী) তাহাকে দেখিয়া কহিল,—"আরে ভাই, তুমি বেদানা কিনিবে? আমরা দেশে যাইতেছি; এই সের-দুইমাত্র মাল আছে। যদি লও, তবে খুব কম দরে দিতে পারি।" ফকির কহিল,—"আমার কাছে ত বেশী পয়সা নেই, এই চারি আনা আছে মাত্র।" একজন কাবুলী বলিল,—"আচ্ছা তাই দাও, চারি আনাতেই দিতেছি।" অতঃপর নিজ সঙ্গীদিগকে কহিল,—"দেশে ফিরিয়া যাইতেছি, কতকগুলো ভার আর সঙ্গে লই কেন? আর আর বোঝাই ত কম নয়!" সঙ্গীগণও তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া থোলেগুলি ঝাড়িয়া দুই সেরেরও অধিক বেদানা ফকিরকে চারি আনাতেই দিয়া প্রস্থান করিল। ফকির মনে মনে একটু হাসিয়া ভাবিল,—"মন্দ কি! হালালীর প্রথম পরীক্ষাতেই এক লাভ দেখা গেল। দেখি, আরও কি দাঁড়ায়!"

বাদসাহের নিয়ম ছিল যে, ফকির সন্ন্যাসী-দিগের নিকট হইতে মালের মাশুল কেহ লইতে পারিবে না। ফকির নদীতীরে আসিয়া দূরগমনশীল এক জাহাজে উঠিল; নির্দ্দিষ্ট দিনের যথাসময়ে জাহাজও ভিন্ন রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইল। সেই দেশের রাজপুত্র কঠিন পীড়াগ্রস্থ হন; অনেক বৈদ্য-হাকিম দেখিল, কেহ কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে এক অতি বিচক্ষণ চিকিৎসক একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; সে ঔষধ সেবন করিলে রাজকুমারের পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, এরূপও বলিলেন। কিন্তু সেই ঔষধের এক প্রবল উপকরণ বেদনা কোন স্থানেই মিলিল না। রাজ-পুরুষেরা ঘোষণা-পত্রে প্রচার করিলেন,—"যে দুই এক দিনের মধ্যে একসের আন্দাজ বেদানা আনিয়া দিতে পারিবে, রাজ-সরকার হইতে তাহাকে পর্য্যাপ্ত

পরিমাণে পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" অল্প ক্ষণের মধ্যেই দেশ-মধ্যে এ কথা রাষ্ট্র হইল; সকলেই বেদানা-লাভের জন্য চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই দিনই পূর্ব্বোক্ত জাহাজ ঐ রাজ্যের নদী-উপকূলে নঙ্গর করিল। অমনি শত শত লোক, যাত্রীদের মধ্যে কাহারও নিকট বেদানা পাইবার আশায় সেইস্থানে উপস্থিত হইল। জাহাজের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আমাদের পরিচিত ফকির যাত্রিটীর নিকট বেদানা ছিল, সে বেচারী বড়ই ফাঁপরে পড়িল। প্রায় শতেক লোক সমবেত হইয়া তাহার নিকট বেদানা প্রার্থনা করিল, এবং প্রত্যেকেই উপযুক্ত মূল্যের অনেক বেশী মূল্য দিতে স্বীকৃত হইল। ফকির বেগতিক দেখিয়া, কাহাকেও ঐ বেদানা প্রদান করিল না; তখন রাজ-পুরুষেরা তাহাকে জোর-জবরদস্তী করিয়া রাজগোচরে লইয়া চলিল। ফকির রাজসমীপে উপনীত হইয়া করযোড়ে বিনয়নম্রবচনে কহিল,—"ধর্ম্মাবতার! আমার এ বেদানার জন্য আমি কিছু মূল্য বা পুরস্কার চাহি না। রাজ-কুমারের ঔষধার্থে যখন ইহা ব্যবহৃত হইবে, তখন ইহাপেক্ষা আর আমার সৌভাগ্য কি?" বুদ্ধিমান রাজা তখন আর বাকবিতণ্ডা করা বিধেয় নয় বুঝিয়া, বেদানাগুলি তাহার নিকট হইতে লইলেন এবং ফকিরকে রাজবাটীতে কিছুদিনের জন্য অবস্থিতি করিতে বলিলেন। অতঃপর চিকিৎসকের পরামর্শমতে বেদনার রস মিশ্রণ করাইয়া সেই ঔষধ পুত্রকে সেবন করাইলেন; ও অতি অল্পকালমধ্যেই রাজ-কুমারও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেন।

এক দিন রাজা সেই ফকিরকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, তুমি কোনরূপ পুরস্কার লইতে ইচ্ছা করিতেছ না কেন? তোমা হইতেই এক প্রকার আমার পুত্র জীবন পাইয়াছে বলিলে হয়। অতএব প্রত্যুপ-কারস্বরূপ আমি তোমার অভীপ্সিত কোন দ্রব্য প্রদান করিতে পারিলে সুখী হইব।" ফকির তখন বিনীতভাবে একটু হাসিয়া কহিল,—"রাজন্ এ আর কিছু নয়; এ আমার 'হালালীর' পরীক্ষামাত্র।" তখন সেই ফকির 'হালালী' ও 'হারামীর' বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন।

সুবিবেচক নৃপতি ফকিরের মুখে তাহার 'হালালী'র বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাগ্রহে হৃষ্টচিত্তে কহিলেন,—"বটে, হালালীর এত গুণ! তবে কেন বৃথা হারামী করিয়া এ রাজ্য পালন করিতেছি? ভাই, আমিও আজ তোমার ন্যায় 'হালালী' অবলম্বন করিব।" অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল রাজবিভব পরিত্যাগ করিয়া সেই ভগবৎ-প্রেমিক নৃপতি-কুল-ভূষণ মহাত্মা সন্ন্যাসীবেশে গভীর রজনীযোগে অতঃপর সেই সাধু ফকিরের সহিত প্রস্থান করিলেন। কত দেশ, কত জনপদ, কত অরণ্য, কত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া কিছুদিন পরে আর এক নূতন রাজ্যে উপনীত হইলেন। এক্ষণে তিনি 'হালালী' ধর্ম্মের উপাসক। এখন তিনি অতি কায়ক্লেশে—প্রতিপদে ধর্ম্মের প্রতি ঊর্দ্ধ লক্ষ্য রাখিয়া, অতি সাবধানে ও শারীরিক পরিশ্রমে যৎসামান্য স্ব-উপার্জ্জিত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; এবং কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই বিরলে ভগবানের ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিতেন। অবশেষে সেই ফকির বন্ধুর পরামর্শানুসারে তাঁহারা উভয়ে ধনুরির কর্ম্ম শিখিলেন এবং তাহা হইতেই ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

একদিন সেই দেশের রাজবাটীতে তাঁহারা লেপ প্রস্তুত করিবার জন্য আহুত হইলেন। যথাসময়ে রাজবাটীতে উপনীত হইলে, হঠাৎ তাঁহারা রাজার দৃষ্টিপথে পতিত হন। চলিত কথায় বলে,—'জহরি না হ'লে জহর চেনে

কে ?' একথাটি বড়ই সত্য ও অতি সুন্দর। রাজা ধনুরিদ্বয়কে দেখিবামাত্র একজনকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে ধনুরিদ্বয় অন্দর-মহলে আসীন হইলেন ; ও তথায় লেপ প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করাইয়া দিলেন।

রাজা মহিষীকে ডাকিয়া অন্তরাল হইতে ধনুরি-বেশী রাজাকে দেখাইয়া কহিলেন, —"আচ্ছা, বল দেখি ইনি কে ? ইহাঁর ভাব-ভঙ্গী ও আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া আমার অত্যন্ত প্রতীতি হইতেছে যে, ইনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী ভূপতি বদনমণ্ডল, ললাট, চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত অবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সকল স্থানেই রাজচিহ্ন দেদীপ্যমান।" মহিষীও তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

পরীক্ষার্থে একান্ত কৌতূহলী হইয়া সেই রাজা এক খণ্ড বহুমূল্য হীরক বস্ত্রাবৃত করিয়া ধনুরিদিগের নিকট তাঁহাদের অজ্ঞাতে ফেলিয়া রাখিলেন। ধনুরিগণও যথারীতি লেপ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কার্য্য সম্পন্ন হইলে, ঐ বস্ত্রাবৃত হীরকের প্রতি প্রথমে ফকিরের দৃষ্টি পড়িল। ফকির উহা গ্রহণ করিয়া বন্ধুকে দেখাইয়া কহিলেন,—"এটা কি বল দেখি,—এক খানা শ্বেত পাথরের টুক্‌রা নয় ?" ধনুরিবেশী রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ পাথরই বটে ! এ হীরাখানির মূল্য ন্যূনকল্পে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা হইবে।" অতঃপর তাঁহারা নৃপতি-সমীপে সেই হীরক খণ্ড লইয়া গিয়া কহিলেন,—"রাজন্, এ বহুমূল্য হীরকখণ্ড অসাবধানে কিরূপে লেপের খোলের সহিত আসিয়াছে, গ্রহণ করুন।" তখন সেই রাজা ধনুরিবেশী রাজার হস্ত ধরিয়া কহিলেন,—"এখন আর যাবে কোথা ? এখন বল দেখি, এ ধনুরি সাজবার দরকার কি ?"

রাজার অনেক পীড়াপীড়িতে তিনি সেই ফকির বন্ধু দ্বিতীয় ধনুরিকে দেখাইয়া হালালী ও হারামীর বিষয় শুনিতে কহিলেন। ফকিরও আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন। "বটে ! হালালীর এত গুণ !'—এই ভাবিয়া তখন সেই ধর্ম্মশীল নৃপতিও হালালীর মহত্ত্ব অনুভব করতঃ সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন ; এবং এতদিন যে 'হারামী'র উপর নির্ভর করিয়া রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন, তজ্জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহারা তিনজন, হৃদয়ে বল পাইলেন। তাই দেশ-দেশান্তরে যাইয়া কয়েক জন রাজা-রাজরাকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদেরও আবার হালালীর অলৌকিক পরিণাম কত প্রকার ঘটিল ; মানব-জগতে কত মহা মহা উপকার সাধন হইতে লাগিল ; তাহার বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

গল্পটীর মধ্যে বড়ই গভীর সত্য ও প্রচুর শিক্ষার বীজ নিহিত আছে। প্রকৃত হালালী অবলম্বন করিলে, মানব-জগতের যে কত উপকার হয়, তাহা এই গল্পটীতেই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ইহার মূল সেই চারি আনা পয়সা ; কিন্তু কার্য্যফল কত মহৎ ! তাই বলিতেছিলাম ভাই, লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে—সত্য ও ন্যায়ের পানে তাকাইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে, ধর্ম্ম-জগতের অতি শীর্ষ স্থানে উপনীত হওয়া যায়। বেশী দেখিয়া লোভ করা মহাপাপ। ধার্ম্মিকের নিকট একটী মাত্র পয়সা দান গ্রহণ করিও, তাহাতে প্রচুর কাজ দেখিবে ; তথাপি পরপীড়নকারী পাষণ্ডের নিকট দশ টাকাও গ্রহণ করিও না। তাহাতে চক্ষের সাধ মিটিবে মাত্র, ভাল কার্য্য তাহাতে না হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু হায়, হারামীর এখন একাধিপত্য, হালালীর মহত্ত্ব কয়জনে গ্রহণ করিবে ?

উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

বঙ্গদেশে যেমন রাঢ়ি, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি উৎকল প্রদেশে উক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। উৎকলে এই জাতির আদিম নিবাস বলিয়া উক্ত ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। পুরীর উত্তরে ১৬ খানি গ্রাম আছে, সেই গ্রামগুলির সাধারণ নাম 'শাসন'। শাসন শব্দের অর্থ,—রাজদত্ত ভূমি। উড়িষ্যার প্রাতঃস্মরণীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উক্ত দেবতার সেবার জন্য, এই ব্রাহ্মণদিগের আদি পুরুষদিগকে গোদাবরী নদীর তীর হইতে আনয়ন করেন ও তাঁহাদের ১৬জন ব্রাহ্মণকে ১৬ খানি গ্রাম নিষ্কর-সূত্রে দান করেন। এই ১৬ খানি গ্রাম ৩২ করবাড়ে বিভক্ত ; কর শব্দে রাজ-প্রাপ্য, বাড় শব্দে বিভাগ। প্রত্যেক বাড়ের ব্রাহ্মণদিগকে এক এক দিন ৺জগন্নাথ দেবকে এক একটী ভোগ প্রদান করিতে হয়। রাজার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা ও নিয়মিতরূপে এক একটী ভোগ প্রদান করিবার উপরেই শাসনের অধিকার স্বত্ব নির্ভর করিতেছে। এই শা নই উৎকল ব্রাহ্মণদিগের আদিম বাসস্থান। যে সকল উৎকল ব্রাহ্মণ অদ্যাপি শাসনের সীমার মধ্যে বসতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ আছে ; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের ব্যবহার বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, উৎকল ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষগণ স্বয়ংই এ প্রদেশে আগমন করেন। যাজপুরের নিকটবর্ত্তী বিরজাক্ষেত্র নামক স্থানে প্রথম ইহাঁদের বসতি ছিল। বিরজা দেবীর নামানুসারে উক্ত স্থানের নামকরণ হইয়াছিল। এই বিরজাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং আগমন করিবার পরে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উহাঁদের শাসন দান করেন। বিরজাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং আগমন করেন, কিম্বা সোম রাজা যত্নপূর্ব্বক আনিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই ব্রাহ্মণদিগের উৎসবে আগমন সম্বন্ধে একটী সুন্দর জনশ্রুতি এ দেশে প্রচারিত আছে। গোদাবরী নদীতীরে ভগবান শশাঙ্কশেখরের একটী মন্দির ছিল। গোদাবরী প্রদেশীয় একজন রাজা এই দেব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই বিগ্রহের সেবার নিযুক্ত থাকেন। এক সময়ে গোদাবরী প্রদেশে রক্ত-বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এই ঘটনায় রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া দেবতার নিকটে হত্যা দেন। পরে দেবতার নিকট হইতে এইরূপ প্রত্যাদেশ হইল, কতকগুলি সেবাকারী ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনিষ্ঠা হ্রাস হওয়ায় এইরূপ দুর্লক্ষণ ঘটিয়াছে। এই কারণ বশতঃ রাজা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদিগকে নির্ব্বাসনের অনুমতি করেন এবং এই নির্ব্বাসিত বিপ্রগণই উৎকলে আসিয়া বাস করেন।

এই জাতির মধ্যে নিম্নোক্ত উপাধিবিশিষ্ট লোকেরাই সমাজে বিশেষ সম্মানিত। যথা,—কর, ধর, রথ, দান, মিশ্র। আর, কর—ভরদ্বাজ-গোত্র ; ধর—গৌতমগোত্র; রথ—ক্ষত্রিগোত্র ; দাস—কাশ্যপগোত্র এবং মিশ্র—কৌশিকী অথবা ঘৃতকৌশিকী গোত্র।

উৎকল-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কোন সময়ে কি কার্য্য উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলায় আগমন করেন, এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

মেদিনীপুর জেলার বাহিরিমুঠা পরগণার দেউলবাড় নামক স্থানে বিভীষণ মহাপাত্র নামক একজন রাজা ছিলেন ; তিনি এক সময়ে একটি বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু

এ প্রদেশীয় আদিমনিবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদবিদ্ জ্ঞানাপন্ন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত না হওয়াতে রাজা উৎকল প্রদেশ হইতে কয়েকজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। উক্ত মন্দিরে লিখিত আছে,—১৫০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৯২ বঙ্গাব্দে উৎকল প্রদেশ হইতে আনীত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা এই মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইল। আমাদিগের মতে এই মন্দির প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেও যে উৎকল ব্রাহ্মণগণ এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, যে সকল উৎকল ব্রাহ্মণ এ প্রদেশে বর্ত্তমানকালে বসতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন বংশীয়গণ বর্ত্তমানকালে ১৪।১৫ পুরুষ এই স্থানে বসতি করিতেছেন, এরূপও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জেলার বেলিয়াবেড়্যা পরগণার প্রহরাজ বংশীয়গণ, বনপাটনার সংপতি বাবুদিগের যে বংশাবলী দেখিয়াছি, উহাতে ১৫ পুরুষ এই জেলায় জমিদারি করিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও যে এই ব্রাহ্মণগণ এ দেশে আসিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জেলায় বর্ত্তমান কালে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প। ৫।৬ শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ইহা অপেক্ষাও অতি অল্পই ছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

এ প্রদেশের পূর্ব্বতন রাজা ও জমিদার-বর্গের যে পুরাতন কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের অনুমান হয়, বহু পূর্ব্বকালে যে সময়ে এই সকল প্রদেশে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিতান্তই অভাব ছিল, তৎকালে উৎকল ব্রাহ্মণ-দিগকে যাগযজ্ঞোপলক্ষে এদেশে আনয়ন করা হইয়াছিল। ফলতঃ বর্ত্তমানকালে যে সকল উৎকল ব্রাহ্মণ এদেশে বসতি করিতেছে, উহাঁদিগের সহিত শাসনস্থিত ব্রাহ্মণ-দিগরে বিবাহাদি আদানপ্রদান হয় না। পরস্পর-সম্বন্ধ অনেক সময় পরে হইয়া[illegible] বোধ হয়।

শাসনের মধ্যবর্ত্তী উৎকল ব্রাহ্মণদিগে[illegible] কোন কোন পরিবার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রথা[illegible] অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত আছে দেখিতে পা[illegible] যায়। সূতিকা-গৃহে যে অগ্নি প্রজ্বলিত [illegible] সেই অগ্নি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিব[illegible] বিধি আছে। উপনয়ন ও বিবাহাদি কা[illegible] সেই অনলে হোমক্রিয়াদি সম্পাদন হ[illegible] সেই অনলে চিতানল প্রস্তুত করিয়া, দে[illegible] ভস্মীভূত সহকারে যাত-অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগকে 'সাগ্নি[illegible] ব্রাহ্মণ বলে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সু[illegible] ণ্ডিত ও সমাজে অতুল সম্মানিত। শা[illegible] সমস্ত কার্য্য সম্পাদন পক্ষে ইহারা বি[illegible] যত্নশীল। জগন্নাথ দেবের সেবা করা ইহাদে[illegible] প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাদের মধ্যে অনেকে[illegible] বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, শাক্ত বা শৈব অত্যন্ন দেখিত[illegible] পাওয়া যায়। মিতাক্ষরা মতে ইহাদে[illegible] বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হ[illegible] মিতাক্ষরার সর্ব্বপ্রধান টীকাকার পণ্ডিত ম[illegible] কর বাজপেয়ির ব্যবস্থা মতে ইহাদের অ[illegible] কারাদি নিরূপিত হয়।

এই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী কু[illegible] থাকা শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন উহাদিগে[illegible] মধ্যে মাতুল কন্যাকে বিবাহ করিবার প্র[illegible] প্রচলিত আছে। কিন্তু এ প্রদেশীয় ব্রাহ্মণগ[illegible] উহা অস্বীকার করিয়া থাকেন।

সমস্ত উড়িষ্যার মধ্যে এই ব্রাহ্মণদিগে[illegible] অতুল সম্মান ও অখণ্ড আধিপত্য ছিল। রাজ[illegible] মন্ত্রী, রাজ-পুরোহিত, জগন্নাথ দেবের পুরো[illegible] হিত ইত্যাদি প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি এ[illegible] সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগের একচেটিয়া ছিল[illegible] রাজাই বলুন, রাজ প্রতিনিধিই বলুন, ইহ[illegible] দিগের ব্যবস্থা অণুমাত্র অতিক্রম করিবা[illegible] সাধ্য কাহারও ছিল না। এই জেলার ম[illegible]

বনপাটনার সংপত্তি, বেলিয়াবেড়্যার প্রহ-রাজ এবং বাসুদেবপুরের রাজারা উৎকল ব্রাহ্মণ।

প্রত্যেক বংশই প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদার। বহুদিবস এ প্রদেশে আধিপত্য করিতেছেন। ইহাঁদিগের পূর্ব্বতন কীর্ত্তিকলাপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও অনুরাগ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালেও ২।৫ জন সুপ-ণ্ডিত লোক এই জেলার মধ্যে আছেন। এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগের দিনের বেলায় বিবাহ হয়। ইহারা অপর কোন ব্রাহ্মণের অন্ন খায় না: এমন কি, এক পংক্তিতেও আহার করেন না।

উৎকলের মধ্যে যেমন উৎকল ব্রাহ্মণ, করণ ও সৃষ্টিকরণ এই তিন সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, মেদিনীপুর জেলার মধ্যে তেমনি মধ্য-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ও মধ্য-শ্রেণীর কায়স্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিহিংসা।

অনেক দিনের কথা। প্রায় কুড়ি বৎসর হইবে, সুরেন্দ্রনাথ দাস নামে এক বাঙ্গালী যুবা, আসামে একটী বড় চা-বাগানে কায করিতে আসিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বেশ ইংরাজী জানিতেন; সাহেবেরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। কাযের লোক হইলেই সাহেবেরা ভালবাসে। সুরেন্দ্র ইংরাজীতে বেশ কথাবার্ত্তা কহিতেন, ভাল করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে পারিতেন, তাঁহার লেখাও বড় ভাল ছিল, কাযেই সাহে-বেরা তাঁহাকে ভালবাসিবে বৈ কি! কিন্তু তা' হইলে কি হয়! এই ভালবাসার দায়ে পড়িয়া তাঁহার বাড়ী যাওয়া বন্ধ হইল—সাহে-বেরা কিছুতেই তাঁহাকে ছুটী দিতে চাহে না। এদিগে বাড়ীতে পত্নী ভাবিয়া আকুল, পাঁচ বছরের বড় ছেলেটী "বাবা! বাবা!" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল, আড়াই বছরের ছোট ছেলেটী দাদার কান্নার সঙ্গে সুর দিয়া আকুল।

সুরেন্দ্র এই দুই বছর হবে, কোলের ছেলের অন্নপ্রাশন না দিয়াই আসামে আসি-য়াছেন। এই দুই বছরের মধ্যে একবারও বাটী যান নাই। শেষে সাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি দিনকতকের জন্য দেশে যাইয়া পুত্রকলত্র সঙ্গে লইয়া আবার কর্ম্মস্থলে আসি-লেন। তাঁহার বাসের জন্য একটী ক্ষুদ্র বাংলা নিরূপিত হইল—তাঁহার পতিপ্রাণা প্রণয়িনী সুরবালার আর সুখের সীমা রহিল না। এখানে বলিয়া রাখি, সুরবালা রূপগুণে যথার্থই সুরবালা—তাহার রূপের তুলনা ছিল না। কিন্তু সেই রূপই তাহার কাল হইল!

উক্ত চা-বাগিচার তুল্যাংশে অংশধারী সত্ত্বাধিকারী তিন জন সাহেব। ইহাদের নাম,—George Harbaugh, James Fawcet ও John Ellery.—তিন জনই ঘোর অত্যা-চারী, কদাচারী ও লম্পট।

বলা বাহুল্য যে, সুরবালার অপরূপ রূপ-লাবণ্যের কথা পাপিষ্ঠগণের কর্ণে উঠিতে বিলম্ব হইল না; বলা বাহুল্য যে, সুরবালার নিকট পাপাত্মাগণের লোক গোপনে আসিতে বিলম্ব করিল না; বলা বাহুল্য যে, সুরবালা সেই গুপ্তচরকে সম্মার্জ্জনী-প্রহারে বিদূরিত করিয়া স্বামীকে ঐ কদর্য্য কথা বলিতেও বিলম্ব করিল না!

সুরেন্দ্র শুনিয়া একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন; তিনি তখনই সে স্থান জন্মের মত ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন; ও রাত্রে থাকি-বার জন্য অন্য স্থান ঠিক করিতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। কার্য সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আসিয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎকম্প উপ-স্থিত হইল; তিনি বাগান হইতে বাহিরে

যাওয়ার পরই তিন জন দুরাত্মাই বলপূর্ব্বক সুরবালার সম্মুখে আসিয়া এই বলিয়া শাসাইয়া গিয়াছে, যে, যদি সুরবালা রাত্রে তাহাদের প্রমোদ-গৃহে যায় ভাল২,নচেৎ তাহারা সুরেন্দ্র ও বালকদ্বয়কে হত্যা করিয়া, সুরবালাকে বলপূর্ব্বক তাহাদের বাংলায় লইয়া যাইবে।

স্ত্রী-পুরুষে অনেকক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হইল, যে, যখন গোপনে পলায়ন অসম্ভব, তখন পুলিসের আশ্রয় লওয়াই বিধেয়। কিন্তু সুরেন্দ্র মনে মনে জানেন, সে আশা বৃথা—দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ সাহেবদিগের নাম শুনিলে পুলিস কিছুতেই অগ্রসর হইবে না। তথাপি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সুরেন্দ্র গ্রামান্তরে ফাড়ীতে সংবাদ দিতে চলিলেন; যাইবার সময় পত্নীকে বলিলেন,—"আমি ছুটিয়া যাইব, ছুটিয়া আসিব। যদি ইতিমধ্যে পাষণ্ডেরা আইসে কিম্বা কিছু বলিয়া পাঠায়, তবে তাহাদিগকে কোনরূপে ভুলাইয়া রাখিও। আর সেই বিপত্তির মধুসূদনকে এক মনে এক প্রাণে ডাকিতে থাক!'

বৃথা আশা! বৃথা চেষ্টা! পুলিসের দারোগা সুরেন্দ্রের আবেদন শুনিবামাত্র হুকুম দিল,—"এ বেটা ভারি বদ্‌মায়েস। বেটা সাহেব লোকের নামে নালিস কর্ত্তে আসে। বেটাকে হাজতে রাখ।" তখনকার কালে দারোগাই রাজা—তাহার কথার উপর কথা কহে কে? সুরেন্দ্র কত কাকুতিমিনতি করিলেন, কত পায় ধরিলেন, কত পুরস্কারের আশা দিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল। দারোগা যে সাহেবদের বেতনভোগী, তাহা বোধ হয় সুরেন্দ্র জানিতেন না।

এদিকে যথাকালে পাপ-অবতার সাবেত্রয় সুরবালার কুটীরে আসিয়া দেখা দিল। সুরেন্দ্র যে দাসী নিযুক্ত করিয়াছিল, সে, সাহেবদেরই গুপ্তচর। তাহার মুখে সাহেবেরা সকলই শুনিল; শুনিয়া বুঝিল যে, এই সময়ই সময়, ইহার পর সুরেন্দ্র আসিয়া পড়িবে। সুতরাং সুরবালার কোন কথাই তাহারা গ্রাহ্য করিল না—তাহার কাতরোক্তি, করুণা, ক্রন্দন, অনুযোগ, ভৎসনা, ভয়-প্রদর্শন সকলই হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বিশেষ তখন তাহারা ঘোর মত্তাবস্থায় পশুবৎ হইয়া পড়িয়াছে!

একজন টলিতে টলিতে সুরবালাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। সুরবালা শয্যার অপর পার্শ্বে যাইয়া আশ্রয় লইল! তখন আর একজন যেমন অপর দিক হইতে ধরিতে যাইবে, অমনি শয্যাপার্শ্বে যে বৃহদাকারের কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, তাহা বিছানার উপর পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল; কতক তৈল জ্বলন্তাবস্থায় মাটীতে পড়িল, অধিকাংশ বিছানার উপর পড়িয়া হু হু করিয়া জ্বলিতে লাগিল! নিমেষের মধ্যে বিছানার চাদর প্রভৃতি জ্বলিয়া উঠিল!

সুরবালা আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া পলকের মধ্যে শিশু দু'টিকে বিছানা হইতে বুকে জাপ্‌টাইয়া তুলিয়া কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা পাইল: কিন্তু সফল হইল না। দুইজন পিশাচ দুইদিক হইতে তাহার দুইটী ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল; আর, একজন তাহাকে সবলে ধরিয়া রহিল!

তখন, সেই দাহ্যমান নিরুপায় শিশুর কোমল কণ্ঠের সহিত একহৃদয়-বিদারক চীৎকার ছাড়িয়া সুরবালা প্রাণপণে আপনাকে নরপশুর করকবল হইতে মুক্ত করিয়া লইল এবং সেই জ্বলন্ত বিছানার চাদরখানিকে টানিয়া লইয়া অর্দ্ধদগ্ধ সংজ্ঞাহীন শিশুদ্বয়কে ভূমিতে স্থাপন করিল। পরক্ষণেই সেই তৈলাক্ত জ্বলন্ত চাদর সেই নরাধম-দ্বয়ের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, অপর পামর—যে তাহাকে ধরিয়াছিল, তাহাকে—সেই জ্বলন্ত বিছানাতে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। পিশাচত্রয় যাতনায় চীৎকার করিতে লাগিল ও পরস্পরে ঠেলাঠেলি করিয়া গৃহ হইতে পলায়ন-চেষ্টায় মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিল। এই গোলমালের সময় চকিতের ন্যায় সুরবালা তাহার পুত্রদু'টীকে লইয়া ছুটিয়া ঘরের বাহির হইল ও দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। দুরাত্মাগণ জানিল না যে সুরবালা পলাইল। তাহাদের কাহারও হাত, কাহারও মুখ, কাহারও চুল পুড়িয়া গেল। তাহারাও যাতনায় অস্থির হইয়া ত্বরিতপদে বাহিরে আসিয়া গৃহের দ্বার রোধ করিয়া দিল; ভাবিল,—"যেমন আমাদের পোড়াইয়াছে, তেমনই জব্দ!"

দেখিতে দেখিতে হুতাশন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সেখানে একটী দুইটী করিয়া লোক জমা হইতে লাগিল। তখন সাহেবেরা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশিয়া গেল—তাহারা ভাবিল যে, কেহ তাহাদিগকে দেখে নাই। কিন্তু প্রথমে দুই একজন যাহারা আসিয়াছিল তাহারা দূর হইতে তাহাদিগকে চিনিয়াছিল।

ক্রমে বিস্তর কুলি জমা হইল। সুরেন্দ্র বাবুর ঘর পুড়িতেছে; তাঁহার স্ত্রী-পুত্র, হয়ত তিনি নিজেও পুড়িতেছেন এই ভাবিয়া অনেকে অগ্নি নিবারণ করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—দেখিতে দেখিতে সকলই ভস্মীভূত হইয়া গেল। সকলেরই ধারণা যে, সুরেন্দ্র বাবু যদিও না পুড়িয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রকলত্র ঐ ঘরে পুড়িয়া মরিল। কাহারও জানিতে বাকি রহিল না, যে সাহেবদের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াই সুরেন্দ্র বাবুর এই সর্ব্বনাশ হইল।

জনরবের নানা মুখে নানা ভাবে ঘর পোড়ার কথাটা ক্রমে দারোগার কাণে গেল। সে তখন আর সুরেন্দ্রকে আটক রাখা শ্রেয়স্কর বুঝিল না—প্রভাতেই সুরেন্দ্রকে খালাস দিল। পরে সুরেন্দ্র আসিয়া স্বচক্ষে সকলই দেখিলেন, দেখিলেন, কেবলই ভস্ম—স্তূপাকার ভস্ম—ভস্মস্তূপ। স্বকর্ণে সকলই শুনিলেন—সকলই বুঝিলেন। দুই একজন কুলি আসিয়া চুপি চুপি যাহা বলিল, তাহাতে তিনি বুঝিলেন ও স্থির বিশ্বাস করিলেন, যে,তাঁহার দুধের বাছাদু'টিকে পামরগণ আছড়াইয়া মারিয়াছে: আর তাঁহার সুরবালার দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বেই পিশাচগণের পৈশাচিক অত্যাচারানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

পত্নীগতপ্রাণ ভর্ত্তা ও সন্তানবৎসল পিতার প্রাণে এই বিষম আঘাত, দারুণ শেলের মত বাজিল। এক অহোরাত্র সুরেন্দ্র সেই ভস্ম-স্তূপের পার্শ্বে অবস্থান করিলেন। কখন আনত আননে ধীরে ধীরে তাহার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিতেছেন; কখন বা স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া শূন্যদৃষ্টিতে তাহার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছেন। যেন ভূতকালের ঘটনাবলী স্মৃতিপটে টানিয়া আনিয়া এক একটী করিয়া সাজাইতেছেন কিম্বা ভবিষ্যতের আঁধারাবৃত অভ্যন্তরে কি যেন পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি প্রথমে তাঁহার গভীর শোকের আভাস কাহাকেও জানিতে দেন নাই। এই শোনিত-শোষক দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহার সম্পূর্ণ মানসিক বিকার ঘটিয়া গিয়াছিল—যেন এই ভীষণ ব্যাপার ও ঘোর বিপদ তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস অথবা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না।

সমস্ত দিবারাত্রি এইভাবে কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে সুরেন্দ্র চা-বাগান হইতে বাহির হইয়া একটী দোকানে যাইয়া কিছু আহার করিলেন। সুরেন্দ্র আহার্য্যের মূল্য দিতে চাহিলে দোকানী তাহা লইল না। বরং তাঁহার শোকে সাহানুভূতি দেখাইয়া তাঁহাকে তাহার দোকানে আর ২।৩ দিন থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিল। সুরেন্দ্র কিছুতেই

সম্মত হইলেন না; বলিলেন,—"আমি এখনই এই স্থান ত্যাগ করিব।"

দোকানী বলিল,—"আপনার শরীরের গতিক যেরূপ তাহাতে তো বড় বেশী দূর যাইতে পারিবেন না।"

সুরেন্দ্র বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার দেহের ভিতরে 'যাহা' আছে তাহাই আমাকে অনেক দূর লইয়া যাইবে!"

(ক্রমশঃ)

সাঁওতাল পরগণা।

সাঁওতালদিগের খাদ্য।

সাঁওতালেরা গো, মেষ, মহিষ, শূকর, কুক্কুট প্রভৃতি গৃহ-পালিত জন্তু, এমন কি ইন্দুর, সর্প ও কাক পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে পুরুষেরা একত্র হইয়া বন-ভোজন করিতে যায়। তখন তাহারা একটী গৃহ-পালিত শূকরকে ছাড়িয়া দিয়া, শর দ্বারা শিকার করার ন্যায় বিদ্ধ করিয়া শূকরটীকে বধ করে। অনন্তর অগ্নিতে অল্প পুড়াইয়া লইয়া লবণ-সংযোগে অরণ্যে বসিয়া মহা আমোদে সেই শূকর মাংস ভোজন করিয়া থাকে। সাঁওতালগণ, পাঁচুই ও মৌয়া মদের অত্যন্ত প্রিয়। ধান্যেশ্বরীও পান করিয়া থাকে। ঐ শেষোক্ত মদ দুমকার খোলাভাটীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সাঁওতালেরা যে পাঁচুই পান করে, তাহা তাহারা অতি সহজ উপায়ে প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রথমে আতপ তণ্ডুলের গুঁড়ি করিয়া তাহার সঙ্গে 'রাণু-রাণ্' (রাণু—ঔষধ) গাছের শিকড় নিষ্পেষিত করিয়া উক্ত গুঁড়ির সহিত মিশ্রিত করে ও অল্প জল দিয়া মাখিয়া ছোট ছোট গুলি প্রস্তুত করিয়া রাখে। অনন্তর প্রয়োজনমতে অন্নের মাড় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কতকগুলি উক্ত 'রাণু-রাণ' মিশ্রিত গুলি (যাহাকে সাঁওতালগণ 'বাখর" কহে) নিক্ষেপ করে। এই অবস্থায় ভাতের মাড় ৫।৭ দিন রাখিলেই সুরা-গুণ প্রাপ্ত হয়। তখন সেই পচা মাড় জল-মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মত্ততা উৎপন্ন করে। উক্ত 'রাণু-রাণ্' এক প্রকার ক্ষুদ্র বন্য গাছ: পাতাগুলি ভুঁই কামড়ির পাতার ন্যায় চাকা চাকা, এবং শিকড়-গুলি ঠিক মূলার ন্যায়; একত্রে ৮।১০টী শিকড় মূলার ন্যায় থোবা হইয়া ঝুলিতে থাকে। শিকড় ধরিয়া গাছটী ৫।৬ অঙ্গুলীর বড় নহে। শিকড়ের ঠিক উপর হইতেই পাতা উঠিয়া থাকে। এই গাছের শিকড় মূলার ন্যায় মোটা নাই হউক, কিন্তু গাছটীর তুলনায় শিকড় গুলিকে অসঙ্গত মোটা বলিয়া বোধ হয়। বোধ হয় ইহার কোন বৈজ্ঞানিক নাম রক্স-বরার "ফ্লোরা-ইণ্ডিকার" মধ্যে থাকিতে পারে; পাঠকগণ কৌতূহল নিবারণের জন্য উক্ত গ্রন্থে ঐ গাছের নাম অনুসন্ধান করিতে পারেন। ঐ গাছ সাঁওতাল পরগণার অরণ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। উক্ত 'রাণু-রাণ্' ব্যতীত সাঁওতালেরা চিরতা-জাতীয় এক প্রকার লতাও ঐ পাঁচুই মদে দিয়া থাকে।

সাঁওতালদিগের বিবাহ।

সাঁওতালগণের কন্যার বিবাহ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমে হইয়া থাকে; কিন্তু কখনও কখনও বাল্যবিবাহের কথাও শুনা গিয়া থাকে। বিবাহের পণ অবস্থাভেদে ২॥০, ৩, ৭, বা ১৬, টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বর যদি ৩, কিম্বা ২॥০ টাকা পণ দিয়া বিবাহ করে, তাহাহইলে সেই বর, কন্যার পিতার নিকট হইতে আর বিবাহের দানসামগ্রী কিছুই প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ৭, টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিলে কন্যার পিতা হইতে দুইটা বলদ, একটী গাভী, ও থালঘটি এবং বস্ত্রাদি পাইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে ইংরাজদের ন্যায় ইহাদের কোর্টসিপ হয় না। প্রথমে ঘটক কিম্বা ঘটকী বিবাহের কথা কন্যার পিতার সহিত স্থির করে। কথা স্থির হইলে, বর হাঁসুলির আকারের পিতলের গহনা ও কাপড় কন্যাকে পাঠাইয়া দেয়। অনন্তর যে গ্রামে কন্যার বাস থাকে সেই গ্রামের 'জগ্মাঝী' একটী দিন স্থির করিয়া দেয় এবং দিনটী কত দিনের পর হইবে নির্দ্ধারণের জন্য একটী রজ্জুতে দিনের সংখ্যায় গাঁইট বাঁধিয়া দেয়। ঘটক সেই দড়ি আনিয়া বরকে দিলে বরও সেই গাঁইট গণিয়া বিবাহ কত দিনের পর হইবে স্থির করে। যে কএকটী গাঁইট থাকিবে সেই কএক দিন অতীত হইলে বর আপন লোকজন সঙ্গে করিয়া লইয়া বিবাহ করিতে যায়। বিবাহ করিতে গিয়া কিন্তু একেবারে কন্যার গ্রামে প্রবেশ করিতে পায় না। প্রথমে গিয়া গ্রামের পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়; অনন্তর কন্যার পক্ষের পরামাণিক যাইয়া বরের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ও বরের গাত্রে জল ছিটাইয়া বরকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া গ্রামের ভিতর আনয়ন করে, এবং কন্যার বাটী লইয়া যায়। বিবাহ করিতে গিয়া একেবারে কন্যার গৃহে প্রবেশ নিষেধ এই ব্যবহারটী এখনও আসাম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আসামে কন্যার গৃহ হইতে কিয়দ্দূরে আরও দুইখানি ঘর করিয়া দেয়। প্রথম ঘরে বরকে আসিয়া অপেক্ষা করিতে হয়; সেইখান হইতে কন্যার লোকে গিয়া বরকে দ্বিতীয় ঘরে আনয়ন করে এবং তথা হইতে কন্যার বাটীর স্ত্রীলোকগণ গিয়া বরকে সভায় আনয়ন করে। সাঁওতাল-বরও কন্যার গৃহে পূর্ব্বোক্তরূপে আসিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করে। বিবাহ হইবার সময় বরকে তাহার [illegible]পতি কিম্বা পিতৃস্বসাপতি স্কন্ধে উত্তোলন [illegible]া ধরে। যদি ভগ্নিপতি কিম্বা পিসা না [illegible], তবে বরের অন্য কোন গুরুতর সম্বন্ধীয় [illegible]কের স্কন্ধে বরকে চাপিতে হয়। বর এইরূপ ভাবে অবস্থিতি হইলে কন্যাকে একটী ঝোড়ায় বসাইয়া আনিয়া বরের সম্মুখে উত্তোলন করিয়া ধরে। বর ও কন্যার মধ্যে প্রথমে একখানা কাপড় টাঙ্গাইয়া দেয়: তাহার পর বরকে ও কন্যাকে তুলিয়া ধরিয়া শূন্যে শূন্যে তাহাদের শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। শুভদৃষ্টি হইয়া গেলে বর খানিক সিন্দূর লইয়া কন্যার কপালে দেয় এবং কন্যাও বরের গাত্রে জল ছিটাইয়া দেয়। এইরূপে সাঁওতাল-বিবাহ সম্পন্ন হইলে যখন বরকে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করায়, তখন গৃহদ্বারের সম্মুখে কন্যার মাতা আসিয়া অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক 'উখল' দিয়া অঙ্গার কুটিতে থাকে।

এই শেষোক্ত ব্যবহারটী হিন্দুর ব্রাহ্মণের মধ্যে কুশণ্ডিকার সদৃশ। আমার বোধ হয় বঙ্গদেশে যখন সাঁওতালগণ বাস করিত তখন তাহাদিগের হইতে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান-প্রচলিত বিবাহকালীন স্ত্রী-আচারের প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে। সাঁওতালগণ কন্যাকে ঝোড়ায় করিয়া উত্তোলন করে: আমরা পীঠোপরি বসাইয়া কন্যাকে উত্তোলন করি। আমাদিগের বিবাহে বরকে স্কন্ধে করিয়া তুলার প্রথা বোধ হয় উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই প্রথা যে থাকিবার কতক সম্ভব ছিল তাহা "বর বড় না কনে বড়" এই আমোদ-জনক কথাতে প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে বাঙ্গালীরাও বোধ হয় বরকে তুলিয়া ধরিতেন এবং এই শিক্ষা তাঁহারা সাঁওতালগণের নিকট হইতেই করিয়াছিলেন; এবং বরকন্যা উভয়কেই তুলিয়া ধরিয়া "বর বড় না কনে বড়" বলিয়া বিবাহের সময় আমোদ করিতেন। ক্রমে আমাদিগের ভিতর হইতে বরকে তুলিয়া ধরার প্রথা উঠিয়া গিয়া, শুদ্ধ কন্যাকে উত্তোলন করার আমোদই স্ত্রী-আচারের সময় প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে। যদি স্ত্রী-আচারের

সময় কন্যাকে পীঠোপরি বসাইয়া উত্তোলন করার প্রথা, আর্য্যজাতির মধ্যে থাকিত, তাহা-হইলে কোন না কোন তৎসদৃশ ব্যবহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আর্য্যগণের মধ্যেও অদ্যাপি দৃষ্ট হইত। দুই জাতি একত্রে বহুদিন বাস করিলে একের আচার-ব্যবহার, অন্যের আচার-ব্যবহারের মধ্যে অনেকাংশে প্রবেশ করে; সুতরাং যখন পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সাঁওতাল-গণ বাঙ্গালার আদিমনিবাসী ছিল ও পরে আর্য্যেরা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছেন, তখন উভয় জাতির সান্নিধ্যাবস্থানে যে পরস্পরের ব্যবহার পরস্পরের দেখিয়া শুনিয়া নূতনভাবে গঠিত না হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। এখনও যে সকল বাঙ্গালী অথবা ভাগলপুর অঞ্চলের হিন্দুস্থানীগণ সাঁওতাল পরগণায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাঁও-তালদের গাছতলায় 'বঙ্গা'-পূজা দেখিয়া ও মাটীর ঢিপি বাঁধিয়া কালিকা পূজা করিতে দেখিয়া, শেষোক্ত প্রকারে কালিকা পূজা করিয়া থাকেন। ঐ কালিকার প্রতিমা নাই। শুদ্ধ দুই তিনটী মাটীর ঢিপিতে সিঁদুর মাখা-ইয়া পূজা হয়।

এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হইলে বর-কন্যাকে গৃহে প্রবেশ করায়। বিবাহের রাত্রে বর-কন্যা এক ঘরে শয়ন করে না। সাঁওতালদিগের বিবাহ দিনের বেলায় হইয়া থাকে; তিথি নক্ষত্রের ব্যবস্থা নাই; এবং রবিবার ব্যতীত অন্য সকল বারেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহোৎ-সবে সাঁওতালিনীগণ গীত গাইয়া থাকে। বিবাহের পর বর নবোঢ়া বালিকাকে নিজালয়ে লইয়া যায়; এবং যদি পথে কোন নদী পড়ে তবে ভাসুরকে কোলে করিয়া ভাদ্রবধুকে নদী পার করিতে হয়। বর-কন্যা গৃহে আসিলে, বরের অগ্রজ জল ছিটাইয়া ভ্রাতৃ-বধুর গাত্রে দেয় এবং সেই অবধি ভাসুর আর সেই ভ্রাতৃ-বধুর গাত্র কিম্বা কোন দ্রব্যও স্পর্শ করে না। ইহাতে দেখা যায় যে, সাঁওতাল-গণ জলকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে ও জল ছিটাইয়া দিলেই সমস্ত শুদ্ধ হইল মনে করিয়া থাকে। বৈদিক সময়ের আর্য্যগণের জলকে পবিত্র জ্ঞান করা, ও সাঁওতালগণের ব্যবহার প্রায়ই একরূপ দেখা যাইতেছে।

সাঁওতালগণ এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে না। তাঁহাদের মধ্যে বিধ[বা] বিবাহ আছে। বিধবা কন্যার বিবা[হে] সময় ২॥০ টাকা মাত্র পণ দিতে হয়; কি[ন্তু] বর যদি মৃতপত্নীক হয় ও কন্যা য[দি] অনূঢ়পূর্ব্বা হয়, তবে বরকে ১৬৲ টাকা প[ণ] দিয়া বিবাহ করিতে হয়। সাঁওতালদিগে[র] মধ্যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে পতি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে; এবং যে ব্যক্তি [ঐ] স্ত্রীর উপপতি হয়, তাহাকে, যত টাকা প[ণ] দিয়া প্রথমে বিবাহ করিতে হইয়াছিল, সে[ই] পণের দ্বিগুণ টাকা দণ্ডস্বরূপ পতিকে দিতে হয়; ও ব্যভিচারিণীর পিতা থাকিলে পিতাকে পূর্ব্ব স্বামীর পণের টাকা ফেরৎ দিতে হয়। যদি ব্যভিচারিণীর উপপতি অর্থ দণ্ড না দে[য়] তবে গ্রামের 'মাঝি' অর্থাৎ মণ্ডল তাহাকে এক ঘরে করিয়া রাখে, এবং তাহার অগ্নি[,] জল পর্য্যন্তও নিবারণ হয়। পূর্ব্ব স্বামী হইতে পৃথক হইলে স্ত্রী যদি ইচ্ছা করে, তবে তাহা[র] উপপতিকেও বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী ত্যাগ করিবার সময় গ্রামস্থ সকল লোককে একত্র করিয়া পুরুষ একটী 'সাকাম' অর্থাৎ বৃক্ষপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করে। এইরূপে পত্র ছিন্ন হইলেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইল। পত্র ছিঁড়িয়া বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার প্রথা আসামে অদ্যা-পিও প্রচলিত আছে। আসামে স্ত্রী ব্যভি-চারিণী হইলে একটী তাম্বুল (পাণ) লইয়া স্ত্রী-পুরুষে নদীর জলে নামিয়া, তাম্বুলের দুই দিক পরস্পরে ধরে; পরে উভয়ে ডুব দিয়া পত্রটী টানিয়া ছিন্ন করে। ঐ তাম্বুল পত্রের ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহ-সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। সাঁওতালগণ যে আসাম দিক হইতে বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ করে, তাহার নিদর্শন আরও এই পাতা ছেঁড়ায় পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশে আর্য্যগণের মধ্যে এ প্রথাটী একে-বারেই নাই। বিবাহের সময় আমাদিগের পাণ, সুপারি দিয়া বিবাহ-গাঁইট বন্ধন হয় বটে, কিন্তু সে গাঁইট চিরকালের জন্য বাঁধা রহিল। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলেও সে পাপ আর কেহ ছিন্ন করিতে পারে না—আমাদের ... সম্বন্ধ চিরকালের জন্য অটুট। ম... তাহা বলবৎ থাকে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

কে. স্মিথ এণ্ড কোম্পানী

এই নাম দিয়া ২৬নং মজাপুরষ্ট্রীট, পটল-ডাঙ্গা হইতে "নবাবিষ্কৃত কেমিক্যাল স্বর্ণের নানাপ্রকার অলঙ্কার" শীর্ষক এক বড়ই জাঁকাল বিজ্ঞাপন আজকাল প্রায় অনেক সংবাদপত্রেই বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে এই কোম্পানীর নামীয় বিজ্ঞাপনটী মজাকার্স লেন ঠিকানা হইতে বাহির হইত; ও সে বিষয়ের সন্ধান অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইলে, বিজ্ঞাপন-দাতাগণ ঠিকানা বদল করিয়া লইয়াছেন। যাইহোক, বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ কিন্তু ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে চলিল, দেখিতেছি। ঐ সম্বন্ধীয় নানা অভিযোগের মধ্যে সম্প্রতি অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য মেম্বর এবং সের-পুরের সম্ভ্রান্ত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়া-ছেন, আপাততঃ নিম্নে তাহাই মাত্র প্রকাশিত হইতেছে। সে পত্র এইঃ—"* * * 'সুরভি' হইতে ঐ বিজ্ঞাপনের একখণ্ড পাঠাই। আমার কিন্তু বেশ মনে পড়ে, পটলডাঙ্গা কোয়াটারে কোন সাহেব কোম্পানী নাই। বাবু শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী এখানকার একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার। তিনি উহাদের হাতে খুব ঠকিয়াছেন। কেমিক্যাল স্বর্ণ নাম দিয়া কতকগুলি পিতলের জিনিস দিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহারা ১৬৲।১৭৲ টাকা লইয়াছে। যদি অভিপ্রায় করেন, তবে তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়াও পাঠাইতে পারি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবিষয়ও অনুসন্ধানে আন্দোলন করিয়া বাধিত করিবেন।" দৃষ্টান্তস্থলে আজ কে, স্মিথ এণ্ড কোম্পানীর নামই প্রকাশ করিলাম; কিন্তু ঐরূপ বিজ্ঞাপন যিনিই দিতেছেন, তিনিই যেন একটু সাবধানতার সহিত কার্য্য করেন, এই অনুরোধ।

কুমার দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ,

১২৬নং গোয়াবাগানষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে আজকাল মফঃস্বলের অনেক ভদ্রলোকের নিকট অযাচিতভাবে ভ্যালুপেয়েবেল ডাকে এক একটী প্যাকেট ও তৎসঙ্গে সেই প্যাকেট গ্রহণের এক একখানি অনুনয়-পত্র প্রেরিত হইতেছে। এইরূপ অভিযোগপত্র আমরা মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত হই-তেছি। তদনুযায়ী সমিতির কোন লোককে সন্ধানার্থ উক্ত ঠিকানায় প্যাকেট-প্রেরকের নিকট পাঠাইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় না। আজকাল এই এক নূতন প্রথায় অনেকে লোক ঠকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, জানিতে পাই। সুতরাং কুমারের সম্বন্ধেও সাধারণের সন্দেহ হইবার কথা। আর সাধারণতঃই অযাচিত-ভাবে প্রেরিত এরূপ ভ্যালুপেয়েবেল প্যাকেট গ্রহণে সকলে সতর্ক থাকুন, এও আমাদের অনুরোধ।

'অনুসন্ধানের' অনুকরণে

'সন্ধান' এই নাম দিয়া ও 'সন্ধানসমিতির-পত্র' বলিয়া দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট ঠিকানা হইতে আশুতোষ দাসের নামে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইতে থাকে। বিজ্ঞাপন বাহির হইবার সময়ই আমরা এবিষয় 'অনুসন্ধানে' আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আবার সে সম্বন্ধে আরও নূতন কথা শুনা যাইতেছে। বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া যে কেবলমাত্র গ্রাহকদিগকে ঠকাইয়া-ছেন, এরূপ নহে; বিজ্ঞাপন দিয়া অনেক সংবাদপত্র সম্পাদককেও ফাঁকি দিয়াছেন, জানা যাইতেছে। অধিক কি, গরিব-পত্রের বিল লইয়া তাগাদায় যাইলে বিজ্ঞাপনদাতার সহিতই তাগাদাকারীর সাক্ষাৎ হইল না। সুতরাং ব্যাপার কি, সাধারণে বুঝিয়া লউন।

সংবাদ। ✓

—ইতিপূর্ব্বে মান্যবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ এই দুইজনই কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আর একজন নূতন জজ নিযুক্ত হইলেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

— মদ্রাজ অঞ্চলে ও উপকূল-সমূহে আজ কএক দিন হইল, এক ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। অনেক গৃহাদি তাহাতে ভগ্ন তো হইয়াছেই; তা'ছাড়া বহুল প্রাণী-হত্যারও সংবাদ পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রযোগের এও এক নমুনা বটে!

—উলুবেড়িয়া স্কুলের একজন গুণধর শিক্ষক তাঁহার স্ত্রীর পরামর্শে আপন জননীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। অভাগিনী এখন নাকি সন্তানের নামে আদালতে নালিশ করিয়া তবে বিষয়ে অধিকার পাইয়াছেন। কলির পুত্র আর কাহাকে বলে!

—গোয়ালিওর রাজ্যে সম্প্রতি এক বড়ই ভয়ঙ্কর রকমের ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তত্রত্য টানবার জেলায় এক জমীদারের বাড়ী লুণ্ঠন করিবার জন্য প্রায় এক সহস্র ডাকাইত সশস্ত্র হইয়া একত্র সমবেত হয়। এ ডাকাতিতে তাহারা প্রায় ৩০ হাজার টাকা লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। এরূপ বড় দলবদ্ধ ডাকাইতের সংবাদ আর অতি অল্পই শুনা যায়।

—বিলাতের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে আজকাল এত ডাক্তারের ছড়াছড়ি যে, গোণা দুই পয়সা ভিজিট দিলেই চিকিৎসার্থ ডাক্তার পাওয়া যায়।

—লর্ড ডফরিণের নিকট একখানি শিখদিগের অতি ক্ষুদ্র ধর্ম্মপুস্তক আছে। পুস্তকখানি এত ক্ষুদ্র যে, শুনিলে অবাক হইতে হয়; অর্থাৎ পুস্তকখানি একখানি ডাকটিকিটেরও অর্দ্ধেক।

—অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তিব্বতের যুদ্ধে বৃটিশেরই জয় হইয়াছে। শীঘ্রই সিকিম-রাজ ইংরাজের সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, জানা যাইতেছে। সেনাপতি গ্রেহাম প্রভৃতি সমুচিত পুরস্কার পাইবেন।

—কৃষ্ণপর্ব্বতের যুদ্ধের সংবাদ এখনও কিন্তু সেই পূর্ব্বরূপই পাওয়া যাইতেছে। ইংরাজ সেনাপতির হত্যার পরও অনেক ইংরাজকে সে যুদ্ধে শায়িত হইতে হইতেছে। তাহাদের পক্ষেরও সমূহ অনিষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিতেছে না।

—আমেরিকার উত্তর কারোলিনা দেশে সম্প্রতি একজাতীয় মৃত্তিকাভোজী মনুষ্য পাওয়া গিয়াছে। ফ্রাঙ্ক জিবেল নামক একজন ডাক্তার ঐ প্রদেশে মৃগয়ায় গমন করিয়া ঐ জাতীয় মনুষ্য দেখিয়া প্রথমে চমকিত হন। ডাক্তার মহাশয় প্রথমে দেখেন যে, একটী নদীগর্ভ হইতে কাদা লইয়া একজন মানুষে আহার করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি উহার বিশেষ বিবরণ জানিতে চেষ্টা পান ও জানিতে পারেন যে, উহারা এইরূপেই জীবন বাঁচাইয়া থাকে। ঐ জাতীয় একটী বালককে একদিন রুটী ও মাংস প্রভৃতি খাদ্য খাইতে দিতে গেলে সে কিছুতেই তাহা খাইতে চায় না; কেবল কাদার প্রতিই ঝোঁক করে। যাই হোক, কাদার প্রতি লোকের এমন শ্রদ্ধা দেখিয়া কোন কোন ডাক্তার পরে সেই দেশীয় মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং তাহাতে ঐ কাদার সহিত কিছু পরিমাণে সেঁকো বিষ মিশ্রিত আছে বলিয়া জানিতে পারেন। আর, আফিংএর নেশার ন্যায় সেই সেঁকোর আস্বাদেই লোকে অধিকতর প্রিয় বুঝা যায়। সৃষ্টির অদ্ভুত মহিমা আর কি!

—লবনের দর যেন আরও চড়িবে বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্প্রতি বিলাতের এক জয়েণ্ট ষ্টক কোং লবনের ব্যবসায় প্রায় একচেটিয়া করিয়া তুলিতেছেন শুনিতে পাই।

—সিকিম সমরে প্রায় দুই কোটী টাকা ব্যয় পড়িয়াছে, সংবাদ পাওয়া যায়।

—বঙ্গের অনেক স্থলে এখন আবার অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন শস্যহানির সূচনা দেখা যাইতেছে। আর দুই এক দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। চাউলের দর প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতেছে।

—সম্প্রতি আর এক খানি ষ্টীমার ডুবিয়া অনেকগুলি লোকের প্রাণ নষ্ট হইল। গত ২১এ কার্ত্তিক কলিকাতা হইতে আপিসের ছুটীর পর যত কর্ম্মচারী বোঝাই লইয়া 'মঙ্গলা' নামক একখানি ষ্টিমার মেটিয়াবুরুজ, রাজগঞ্জ ও সাঁকরেইল প্রভৃতি স্থানে যাইতেছিল। ষ্টিমার খানি মেটিয়াবুরুজের নিকট পৌঁছিতেই 'ক্রাইব' নামক আর এক খানি ষ্টিমারের সহিত ধাক্কা লাগে এবং তাহাতেই একেবারে তলাইয়া যায়। বহুসংখ্যক শ্রমজীবিও এই ষ্টিমারে ছিল। জনকএক পরে বাচিয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে ডুবিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

অনুসন্ধান

—:০(০)০:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৫ সাল। [৮ম সংখ্যা।

ভক্তি-সঙ্গীত।

ইমণ—চৌতাল।

(তাঁরে) মন গাও রে।

গায় চরাচর স্থাবর জঙ্গম
প্রকৃতি-সুন্দরী গ্রহ আদি ব্যোম
দেব দানব যোগী ঋষিজন
অনন্ত-মেদিনী যাঁরে স্তুতি করে।
অনন্ত বিমান কাঁপায়ে সঘনে
তোল হৃদি-তাল প্রীতি-মধ্যমানে
খোল অন্তর্দ্বার সরলতা সনে
বিশ্ববাসী জীবে বাঁধ প্রেম-ডোরে।
ভকতি বিশ্বাস ক্ষমা যোগ-মায়া
শান্তি দান্তি আদি পবিত্রতা ছায়া
বিবেক বৈরাগ্য সর্ব্ব জীবে দয়া
এ নীতি চরণে নম নতশিরে; —
কাম ক্রোধ আদি ষড়রিপুগণে
দেহ বলিদান বিবেক-কৃপাণে
সদানন্দে রহ আত্মা-সম্মিলনে
ইহ-পরলোক সমান যাবে রে॥

চোর-গ্রন্থকার।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ণানন্দ ভক্ত এখন একজন বাঙ্গালা উপন্যাস-লেখক। উপন্যাস লিখিয়া লোক ঠকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কতরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া যে কত লোককে ঠকাইয়াছেন, তাহার শেষ নাই। তবে যতই কেন উপার্জ্জন করুন না, এক দিনের নিমিত্তও কিন্তু ইহাঁর সাংসারিক কষ্টের অনাটন নাই। জুয়াচোর যদি বড় মানুষ হইবে, তাহার যদি কষ্টের লাঘব হইবে, তবে জগৎ হইত এত দিবস 'সৎ' এই শব্দটী লোপ হইত। অদ্য পূর্ণানন্দ বঙ্গীয় উপন্যাস-ক্ষেত্রে প্রথম উপস্থিত। ভাবিয়া ভাবিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, চুরি করিয়া নকল করিয়া, তিনি

---

* এ ঘটনাটিরও নামধাম পরিবর্ত্তিত করা গেল। এইরূপ আরও অনেক প্রস্তাবে প্রকৃত নামধামাদি প্রকাশ করিতে পারি না। কারণ, আইনানুসারে আদালতে দণ্ড প্রাপ্ত আসামীর বিষয়েও—সে যে অপরাধ মাত্রটির জন্য দণ্ডিত সেইটিমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে; তদ্ভিন্ন সে দশ বিশ হাজার রকমের জুয়াচুরী করিলেও তাহা বলিবার যো নাই,—ইংরাজ রাজ্যে 'চোরকে চোর বলা দায়!' কাজেই অনেক স্থলে চোর মহাশয়দের মানহানির ডামেজ দিবার ভয়ে ঘটনাটিমাত্র বজায় রাখিয়া আমাদিগকেও কথা কহিতে হয়।

"চিরন্মদা" নাম্নী একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস বাহির করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কিছুরই অভাব রহিল না; বন, উপবন, নদী, সরোবর পদ্ম, কোকিল, দেবমন্দির, উদ্যান, রমণী, যুবক, যুদ্ধ, বিগ্রহ প্রভৃতি সকলেরই অভাব পূরিত হইল। তবে মাত্র অভাবের মধ্যে কেবল পাঠক নাই; ইহার সুমধুর রস কোন পাঠক বুঝিল না; কেহ পড়িল না। কিন্তু তাহা বলিয়া যে কেহ কখনও পড়িবে না, তাহা নহে। সেক্সপিয়রের পুস্তকের রস প্রথমে কেহ বুঝে নাই বলিয়া কি আর তাহার আদর হয় নাই? মাইকেলকে প্রথমে সকলে উপহাস করিয়াছিল বলিয়া কি তিনি তাঁহার সমস্ত পুস্তক পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন? কিন্তু আমাদের গ্রন্থকর্ত্তার সে ধৈর্য্য কৈ! এখন তাঁহার ভরসার মধ্যে এই পুস্তক; ইহা বিক্রয় না হইলে তাঁহার দিন-পাতের আর কোন উপায় নাই। কাজেই তাঁহাকে বিক্রয়ের উপায় দেখিতে হইল। তিনি এক খানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রে ইহার একটী বিজ্ঞাপন বাহির করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই:—

"চিরন্মদা।—একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত। প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে প্রসংশিত। স্ত্রী-পাঠ্য সুলভ-পুস্তক, প্রত্যেক রমণীর অবশ্য পাঠ্য ও যত্নের ধন। এরূপ পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য কেবল মাত্র ১৲; ডাক মাশুল ৵১০ আনা। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শ্রীপূর্ণানন্দ ভক্ত।

২৭ নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

এই বিজ্ঞাপন ক্রমে এক বার, দুই বার, তিন বার বাহির হইল। কিন্তু ইহার এক খণ্ডও কেহ ক্রয় করিলেন না। গ্রন্থকার ইহাও বেশ জানিতেন যে, পুস্তক বিক্রয় করিয়া লাভ করা দূরে থাকুক, বিজ্ঞাপনের খরচও উঠিবে না। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র বলিয়াই এই বিজ্ঞাপন মাসাবধি প্রকাশিত হইল।

আজ পূর্ণানন্দের হাতে একটীমাত্র পয়সাও নাই। কিন্তু তাঁহার মিষ্ট মুখের গুণে একস্থান হইতে ১০৲ টাকা ধার করিয়া তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত বন্ধুকে উহা প্রদান করিলেন; ও বলিয়া দিলেন,—"আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছি, সেইরূপ কার্য্য করিবে; দেখিও যেন কোনরূপ গোলযোগ না হয়।" বিশ্বস্ত বন্ধুও অতঃপর ঐ টাকা সহিত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্বস্ত বন্ধু কলেজ ষ্ট্রীটের একজন পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন; ও দোকানদারকে বলিলেন,—"আমি ঢাকার একজন পুস্তক-বিক্রেতা। সেই স্থান হইতে কতকগুলি পুস্তক খরিদ করিতে আসিয়াছি। যদি আপনার দোকানে এই সকল পুস্তক থাকে, তবে আমাকে দেন; আমি উহা নগদ টাকায় খরিদ করিব।" এই বলিয়া তাঁহার হস্তস্থিত একখানি ফর্দ্দ দোকানদারের হস্তে প্রদান করিলেন। দোকানদারও ঐ ফর্দ্দ পড়িয়া দেখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—

প্রথম ভাগ, বিদ্যাসাগর কৃত	১০০ খণ্ড
দ্বিতীয় ভাগ, ঐ	৩০ খণ্ড
দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,,	৫ খণ্ড
চিরন্মদা, পূর্ণানন্দ ভক্ত প্রণীত	১০০ খণ্ড
মাধবীকঙ্কন, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত	৪ খণ্ড
গোচারণের মাঠ, অক্ষয়কুমার সরকার ,,	৫ খণ্ড
ঘোড়ার ডিম, রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত	২ খণ্ড
নলিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত	৩ খণ্ড
ভারত-উদ্ধার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,	৩ খণ্ড

দোকানদার এই ফর্দ্দ পড়িয়া বলিলেন,—"মহাশয় সমস্ত পুস্তকই আছে, কেবল 'চিরন্মদা' নাই। উহার নামও আমরা এপর্য্যন্ত শুনি নাই।"

আগন্তুক।—"সে কি মহাশয়! পূর্ণানন্দ

বাবুর 'চিরন্মদার' নাম শুনেন নাই! আমাদের ঢাকা-অঞ্চলে ঐ পুস্তকের যে কতদূর কাটতি তাহা বলিতে পারি না। বঙ্কিম বাবুর পুস্তকও আজকাল আমাদের দেশে ওরূপ বিক্রয় হয় না! আর আমার ফর্দ্দেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। আপনি যদি সকল পুস্তক না দিতে পারেন, তবে আমার ফর্দ্দ ফেরত দিউন। আমি ২৭নং চিৎপুর রোডে পূর্ণানন্দ বাবুর বাটী হইতে তাঁহার পুস্তক খরিদ করিয়া আনিব।"

দোকানদার মনে মনে ভাবিলেন,—"যখন পূর্ণানন্দ বাবুর ঠিকানা জানিতে পারিলাম, তখন আর কেন ফর্দ্দ উহাঁকে ফেরত দিব! পূর্ণানন্দ বাবুর নিকট হইতে এক শত টাকার পুস্তক আনিলে যে তাহাতে কিছু লাভ করিতে পারিব, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।" এই ভাবিয়াই প্রকাশ্যে বলিলেন,—"মহাশয়, ফর্দ্দ আর ফেরত দিতে হইবে না। আমি আপনার ফর্দ্দ অনুযায়ী সমস্ত পুস্তক ঠিক করিয়া রাখিব; আপনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত লইয়া যাইবেন। তবে আপাততঃ কিছু বায়না দিয়া যাউন।"

বিশ্বস্ত বন্ধু তাহাতেই সম্মত হইয়া আপনার আনীত সেই ১০৲টী টাকা বায়না দিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেলেন,—"আমাকে অদ্য রাত্রের গাড়িতেই ঢাকা গমন করিতে হইবে। যেন আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া পুস্তকগুলি নিশ্চয়ই পাই।"

তিনি প্রস্থান করিলে পর দোকানদার ২৭নং চিৎপুর রোডে গমন করিলেন ও খুঁজিয়া পূর্ণানন্দ বাবুর বাটীও পাইলেন। বাটীর দরজায় একটী বাবুর সহিত দেখা হইল; তিনিই সেই জুয়াচোর পূর্ণানন্দ বাবু। কিন্তু দোকানদার তাঁহাকেই পূর্ণানন্দ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"এই পূর্ণানন্দ বাবুর বাটী। কিন্তু বাবু মুঙ্গেরে থাকেন। তিনি সেই স্থানের একজন প্রসিদ্ধ উকিল। আমিই তাঁহার বাটীতে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মকার্য্য ও পুস্তকাদি বিক্রয় করিয়া থাকি। মহাশয়ের যে কোন প্রয়োজন থাকুক, আমাকে বলিলে আমার দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হইতে পারিবেন।"

দোকানদার বলিলেন,—"আমি তাঁহারই প্রণীত 'চিরন্মদা' পুস্তক এক শত খণ্ড লইতে আসিয়াছি। কি প্রকার কমিশনে ও কত দিবস পরে টাকা লইবেন, তাহা প্রথম জানিতে ইচ্ছা করি।"

বাবু বলিলেন,—"চিরন্মদা পুস্তক আর অধিক নাই। বোধ হয় ২৩ শত পুস্তকের অধিক হইবে না। কিন্তু ইহার যেরূপ কাটতি হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় ২৩ দিবসের মধ্যেই সমস্ত পুস্তক শেষ হইয়া যাইবে। আমি বাবুকে পুনর্মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত লিখিয়াছি; কিন্তু তাহার উত্তর এপর্য্যন্ত পাই নাই। আপনি ১০০শত পুস্তক লইতে আসিয়াছেন; আর বিশেষ আপনি দোকানদার; এই নিমিত্ত আপনাকে শতকরা দশ টাকা কমিশন দিতে পারি। কিন্তু সমস্ত মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে। দেনা-পাওনায় আমরা কোন পুস্তক বিক্রয় করি না। সুতরাং সমস্ত মূল্য অগ্রিম লইব।"

পরে অনেক কসামাজা করিয়া দোকানদার উহার কমিশন ১৫৲ টাকা স্থিরীকৃত করিয়া নগদ টাকা দিয়া একশত পুস্তক খরিদ করিয়া আপন দোকানে আসিলেন; ও আর আর পুস্তকও সংগ্রহ করিয়া সমস্ত বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া দিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। কিন্তু যে বাবুটী অর্ডার দিয়া যান, তিনি আর পুস্তক লইতে আসিলেন না। ক্রমে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল, তথাপি তাঁহার দেখা নাই। তখন দোকানদার ভাবিলেন, বোধ হয় অপর কোন কার্য্যের নিমিত্ত তিনি ব্যস্ত আছেন; কল্য সকালে আসিবেন। এই ভাবিয়া সে দিবস দোকান বন্ধ করিলেন।

পরদিবসও তাঁহার প্রতীক্ষায় প্রত্যুষে দোকান খুলিলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না। ক্রমে সে দিবস, তাহার পর দিবস ও দেখিতে দেখিতে আরও দুই তিন দিবস অতীত হইয়া গেল। ক্রেতার আর কোন সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া সেই সকল পুস্তক ক্রমে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

সমস্ত পুস্তক বিক্রয় হইয়া গেল, কিন্তু কেবল 'চিরম্মদা' একখানাও বিক্রয় হইল না। তখন একদিবস তিনি পুনরায় ২৭নং চিৎপুর রোডে পূর্ণানন্দের বাটীতে গেলেন। সেই বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন, ও পুস্তকগুলি যাহাতে ফেরত লন, তাহার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ কে শুনে? তিনি তাঁহার কথা শুনিলেন না; সুতরাং দোকানদার খিন্ন মনে ৭৫৲ টাকা লোকসান দিয়া আপন দোকানে ফিরিয়া আসিলেন।

পূর্ণানন্দ বাবু এই উপায় অবলম্বনে যে কেবলমাত্র ঐ দোকানদারের নিকট হইতে ৭৫৲ টাকা ঠকাইয়া লইলেন, তাহা নহে। এইরূপ নিরীহ অনেকগুলি দোকানদারেরও যথোচিত ক্ষতি করিলেন।

অদ্ভুদ জুয়াচোর।

বিপিন বাবু কলিকাতার মধ্যে একজন ধনাঢ্য ও সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোক। বড়বাজারের মধ্যে তাঁহার অনেকগুলি ভাড়াটিয়া বাটী আছে। একদিন তিনি তাঁহার আমলাবর্গের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বিষয়-কার্য্য দেখিতেছেন, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, দুইজন ভদ্র-বেশধারী ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে দ্বারে দণ্ডায়মান। বাবু তাঁহাদিগকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন; ও পরে আদেশমত দ্বারবান তাঁহাদিগকে বাবুর নিকটে হাজির করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ব্যক্তিদ্বয় বাবুকে সম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন। বিপিন বাবু তাঁহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের মধ্যের একজন বলিলেন,—"মহাশয়, আমরা বিজনগ্রামের রাণীর কার্য্যাধ্যক্ষ। কোন কার্য্যোপলক্ষে রাণী কলিকাতায় আসিবেন। বড়বাজারের অমুক নম্বরের আপনার যে একটী বাটী খালি পড়িয়া রহিয়াছে, যদি অনুগ্রহ করিয়া উক্ত বাটী সজ্জিত করিয়া পাঁচ মাসের জন্য আমাদিগকে ভাড়া দেন, তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হই।" তাহাতে বাবু বলিলেন যে, এক সপ্তাহকাল সময় দিলে তিনি আহ্লাদ-সহকারে তাহা করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু তাহা করিলে অন্ততঃ ৩৫০৲ টাকা ভাড়া লইবেন। কিছু কথাবার্ত্তার পর ৩০০৲ টাকায় ধার্য্য হইল।

যথাসময়ে বাটী সজ্জিত হইল। তিন দিনের মধ্যে রাণীও আসিয়া পৌঁছিলেন। অনেক লোকজনেরও সমাগম হইল। চারিদিকে বড়ই রবরবা!

ইতিমধ্যে এক দিন এক সুসজ্জিত পাল্কি করিয়া সেই ব্যক্তিদ্বয় রাণীর সমভিব্যাহারে এক সুবর্ণকারের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দোকানদারের নিকট হইতে মহামূল্য অলঙ্কারাদি ক্রয় করিবার জন্য রাণী আসিয়াছেন, জানাইল। দোকানদারও শশব্যস্তে সমস্ত অলঙ্কার দেখাইতে লাগিল। ক্রমে যে সমস্ত অলঙ্কার রাণী পছন্দ করিলেন, তাহা পাল্কির মধ্যে রাখা হইল; ও অন্যান্য সমস্ত প্রত্যর্পণ করা হইল। এইরূপে প্রায় বিশ ত্রিশ হাজার টাকার অলঙ্কার মনোনীত করা হইল। এই সময় উক্ত দুইজনের মধ্যে একজন দোকানদারকে বলিল যে, রাণীর অনেক পুরাতন জহরৎ আছে, এবং রাণীর ইচ্ছা যে

সেই সমস্ত বিক্রয় করেন। দোকানদার তাহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল যে, তিনি সেই সমস্ত ক্রয় করিতে প্রস্তুত। পরে যে সমস্ত অলঙ্কার রাণী মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা সকলের অলক্ষিত ভাবে লইয়া উক্ত বাবু পুরাতন অলঙ্কার আনিবার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। এইরূপে প্রায় ১০ মিনিট অতীত হইলে উক্ত দুইজনের মধ্যে অপর ব্যক্তিও দোকানদারকে জানাইল যে, রাণী তৃষ্ণায় কাতর; এবং তদনুযায়ী সেও নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে সরবত আনিবার জন্য রৌপ্যনির্ম্মিত এক পাত্র পাল্কি হইতে বাহির করিয়া এক ভৃত্যের সহিত প্রস্থান করিল।

এদিকে রাণী একাকিনী পাল্কির মধ্যেই রহিলেন; এবং দুইজন দ্বারবান ও ছয়জন বেহারা দোকানদারের দ্বারে বসিয়া রহিল। ক্রমে চারি ঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি উক্ত দুইজনের মধ্যে একজনও আসিল না। ইহা দেখিয়া দোকানদারের মনে সন্দেহ হইল এবং দোকানের দুইজন সরকারকে তাহাদের উদ্দেশে প্রেরণ করিল। পরে তাহারাও প্রত্যাগত হইল; কিন্তু বাবুদের দেখা নাই। তখন দোকানদার পুলিষে সংবাদ দিল ও যথাসময়ে থানা হইতে একজন ইন্‌সপেক্টর, দুইজন কনেষ্টবলের সহিত, আসিলেন। তখন পাল্কি-মধ্যস্থিত রাণীকে অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে সে বলিল, তাহার নিকট কিছুই নাই। প্রথম ব্যক্তি তাহা লইয়া গিয়াছে। আরও ক্রমে দুই এক প্রশ্ন করাতে পরে সে বলিল,—"আমি বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করি। এক দিবস গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী আসিবার উদ্যম করিতেছি, এমন সময়ে ঐ দুইজন ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া আমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া আমার বাটী যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল; এবং আমার সমভিব্যহারে আমার বাটী আসিল। দুই দিবস আমার বাটীতে রহিল ও আমাকে প্রায় ৫০৲।৬০৲ টাকা দিল। আরও একদিন আমাকে বলিল যে, তাহাদের সুন্দর এক বাটী আছে; ও তথায় আমাকে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইল। এবং আমাকে জানাইল যে, আমাকে রাণীর ন্যায় তথায় থাকিতে হইবে। তাহাতে আমি সম্মত হওয়াতে আমাকে তাহাদের বাসস্থানে লইয়া আসে; এবং বাস্তবিক আমাকে রাণীর ন্যায় রাখে। আজ এই পাল্কি করিয়া আমাকে অলঙ্কার ক্রয় করিয়া দিবার জন্য এই স্থানে আনিয়াছে।'

ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্সপেক্টর বুঝিলেন যে, ইহা জুয়াচোরের খেলা। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ রাণী, বেহারা ও দ্বারবানগণকে পুলিষে পাঠাইয়া দিলেন। এবং পরে তাহাদের সেই বাটীতে গিয়া দেখেন যে, তাহার মধ্যেও জনমানব নাই। কেবল এখানে-ওখানে বিশৃঙ্খলভাবে কতিপয় সামগ্রী পড়িয়া রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বিপিন বাবুকেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত সাজ-সরঞ্জম অপহৃত হইয়াছে। ক্রমে আর আর দুই এক জন লোক আসিয়াও সেখানে জমায়েৎ হইল; এবং তাহাদের অনেককেও ঐ প্রকারে জুয়াচোরদ্বয় নানা উপায়ে ঠকাইয়াছে, জানিয়া স্তম্ভিত হইল। যাহাহোক, বলা বাহুল্য, বহু আয়াসে পরে উক্ত দুইজনও পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হয় ও রাজদ্বারে যথোপযুক্ত শাস্তি পায়।

হাতিয়া-গড়।

মেদিনীপুর সহরের উপর দিয়া, কংসাবতী নদী পার হইয়া, যে রাস্তা সরল রেখার ন্যায় দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে, উক্ত রাস্তা পুরীর জগন্নাথ দেবের সিংহদ্বারের নিকটে শেষ হইয়াছে। ঐই রাস্তায় গমন করিলে, প্রায় ৩৬।৩৭ মাইল

পরে দাঁতনের বাজার। দাঁতন অতীব প্রাচীন স্থান; এখানে 'বিদ্যাধর' নামে একটী সুবৃহৎ দিঘী আছে। পুরী গমনের যে পুরাতন রাস্তার চিহ্ন অদ্যাপী স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত রাস্তার ধারে ৫৬ ক্রোশ অন্তরে 'বিদ্যাধর নামে এক একটি সুবিস্তৃত সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই জেলার কেশিয়াড়ি নামক পরগণার অন্তর্গত 'বিদ্যাধর' নামে একটী গ্রাম, এবং তথায় উক্ত নামে একটী বৃহৎ জলাশয় অবলোকন করিয়াছি। এ প্রদেশে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত আছে,—বিদ্যাধর নামক একজন রাজ-মন্ত্রী ছিলেন; তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া, স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই সকল সরোবর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই বিদ্যাধর মন্ত্রীর বাটী কোন স্থানে ছিল, তিনি কোথাকার রাজমন্ত্রী ছিলেন, এবিষয়ে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। রাজস্থানের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়, অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহের বিদ্যাধর নামে একজন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারও প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই।

দাঁতনের পার্শ্বে সুবর্ণরেখা নদী। সুবর্ণরেখা অতিক্রম করিলেই, অপর পার্শ্বে ফতেয়াবাদ পরগণা। এই ফতেয়াবাদ পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু এইক্ষণ বালেশ্বর জেলার সীমানাভুক্ত হইয়াছে। ফতেয়াবাদের অনেক স্থলে অদ্যাপি নিবিড় শাল জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ও ময়ূর মৃগ যথেষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বনপ্রদেশে "হাতিয়া-গড়" নামক একটী স্থান আছে। ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে, এই স্থানে বন্যজন্তুর ন্যায় কতকগুলি অসভ্য সাঁওতালের বসতি ছিল। ইহাদিগের গৃহাদি কিছুই ছিল না। এই সম্প্রদায়স্থ লোকের তীর পরিচালনের যথেষ্ট শক্তি ও দক্ষতা আছে। ইহারা আরণ্যপ্রদেশে শিকার করিয়া, সেই মাংস অর্দ্ধদগ্ধ পূর্ব্বক, এবং বনস্থলিতে যে অযত্নসম্ভূত 'জনার', 'ভূট্টা' প্রভৃতি শস্য জন্মে, উহাও দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিত। ইহারা কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, বনমানুষের ন্যায় বনস্থলিতে অবস্থিতি করিত।

সুপ্রসিদ্ধ জলেশ্বর গ্রাম এই স্থান হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূর। এই জলেশ্বরে মিসনারি সাহেবদিগের একটী প্রধান আড্ডা অনেক দিন হইতে আছে। তৎকালে রেঃ ফিলিপ্ নামে একজন ধার্ম্মিক মিষ্টভাষী মিসনারি এখানে অবস্থিতি করিতেন। এক দিবস ভ্রমণোপলক্ষে সাহেব এই অসভ্যদিগের আবাসে উপস্থিত হইলেন। ইহারা পূর্ব্বে কখন সাহেব দেখে নাই। মিসনরি সাহেব সাঁওতালি কথা কিছু কিছু জানিতেন। ইনি এখানে আসিয়া এই অসভ্য লোকদিগের অবস্থা অবগত হইলেন। মানুষের এইরূপ পশুবৎ নিকৃষ্ট অবস্থা দেখিয়া, সাহেবের মনে বড়ই দয়ার সঞ্চার হইল। ইনি উহাদিগের অবস্থোন্নয়ন জন্য ব্যাকুল হইলেন। ক্রমশঃ কয়েক দিন উহাদিগের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা আরম্ভ করিলেন। মানুষের মঙ্গল চিন্তা করিলেই স্বভাবতঃ তাহারা বাধ্য হয়। ক্রমশঃ মিসনারি সাহেবের প্রযত্নে সে বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে এই হাতিয়া-গড়ে কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ হইল। সাহেব ক্রমশঃ ইহাদের মঙ্গলানুষ্ঠানে যত্নপর হইয়া, পশুবৎ বন্যদিগকে গৃহবাসী করিলেন। কৃষিপ্রণালী শিক্ষা দিয়া সেই বন-প্রদেশে যে সকল অদৃশ্য ভূমি ছিল, তাহা চাসের উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই জাতি শ্রমসাধ্য কার্য্যে যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিয়া, সাহেবের উপদেশ মতে ধান্য ও নানা প্রকার রবিশস্যের চাস আরম্ভ করিল। ইহাদিগের গাত্রে অপরিমিত বল; ইহারা ভীমের ন্যায় পরিশ্রম সহিষ্ণু। ক্রমশঃ সাহেবের যত্নে ইহাদিগের আহার সংস্থান হইল। তখন তিনি সেই দলশুদ্ধ সাঁওতালদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

সাঁওতাল রমণীদিগকে বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা করিতে চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। পুরুষেরা ক্রমশঃ নানা প্রকার চাস-কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিল। স্ত্রীলোকদিগকে গৃহকার্য্য ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্য শিক্ষা দিয়া সেই বনপ্রদেশে একটী আনন্দ-নগরী সংস্থাপনের সূত্রপাত করিলেন। কিছুদিন পরে সাহেব এই হাতিয়া-গড়ে আপনাদিগের অবস্থানোপযোগী কয়েকখানি 'বাঙ্গালা' প্রস্তুত করিলেন। সেই বাঙ্গালার চতুস্পার্শে নানাপ্রকার ফলফুলের গাছে সুশোভিত করিলেন। সাঁওতালগণ সাহেব ও মেমদিগকে স্বর্গীয় দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। ক্রমশঃ অসভ্য বন্য সাঁওতালদিগকে ভাগ্যলক্ষ্মী আশ্রয় করিলেন। ইহারা এইক্ষণ বড় বড় ঘর প্রস্তুত করিয়া তথায় বসতি করিতেছে। ঘর দ্বার উঠান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন; সাহেবের পরামর্শ মতে এই সকল গৃহ প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে ছোট ছোট রুজু জানালা আছে, গৃহ মধ্যে অনায়াসে বায়ু গমনাগমন করিতে পারে। ইহাদিগের পরিবারবর্গ এইক্ষণে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বস্ত্র-অলঙ্কারে সুশোভিতা হইয়াছে। বরং উহাদিগের পরিচ্ছদ আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত। উহারা একটী ঢিলে 'আঙ্গরাখা' (অঙ্গাবরণ) ব্যবহার করে এবং একখানি ১২ হাত মোটা সাটী হিন্দুস্থানী ধরণে দোফের দিয়া পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য এবং সন্তানপালন প্রণালী উত্তমরূপে শিক্ষা করিতেছে; তদ্ভিন্ন অনেকেই উলের কার্য্য, সূচের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে। ইহারা নিজের অথবা পুত্রকন্যাদিগের ব্যবহার্য্য কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে। জড়বুদ্ধি হিংস্র শ্বাপদের স্বভাবতুল্য সাঁওতালের মনোবৃত্তি সাহেবদিগের যত্নে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে। সাঁওতালদিগের পুত্র-কন্যাদিগের শিক্ষার জন্য পাঠশালা সংস্থাপন হইয়াছে। মিসনারিগণ সাঁওতালি ভাষায় অনেক পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপুস্তক হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়া উহাদিগের জন্য ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হইতেছে। এইক্ষণ এই জাতির মনে ক্রমশঃ ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্রিক্ত হইয়া উঠিতেছে। ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে এই জাতির বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। এই জাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুন্দর যে সকল ছেলেমেয়ে আছে, বিশেষতঃ যাহারা কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত অপরাপর উচ্চশ্রেণীর হিন্দু—যাহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত বিবাহাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া ভবিষ্যতে এই জাতির মধ্যে যাহাতে সুন্দর ও বুদ্ধিমান সন্তান-সন্ততি জন্মে, সাহেব তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সাহেবের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হইয়াছে।

এই সাঁওতাল-সম্প্রদায় পশুবধাদি নিকৃষ্ট কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, এইক্ষণ গো-মহিষাদি পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই বন্যদিগকে কৃষিবাণিজ্য শিক্ষা দিয়া সাহেবেরা এইক্ষণে মানুষের দলে আনয়ণ করিয়াছেন। এই দলস্থ লোকেরা মিসনারি সাহেব ও মেমদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। কাহার ঘরে একটী ভাল বস্তু হইলে কিম্বা কোন নূতন দ্রব্য হইলে সাহেবকে অগ্রে প্রদান করে।

দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিতে মিসনারি

সাহেবেরা যেমন জানেন, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও জানি না। আমরা জানি, আড়ম্বর ও গলাবাজী করিতে। একটা সামান্য কার্য্যের সূত্র পাইলে সভাসমিতি ও গগণভেদী বক্তৃতা করিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু কৈ আমাদিগের যত্নে কয়জন লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে? কয়জন লোকের দুঃখ ঘুচিয়াছে? কয়জন লোক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে? এই যে দেশব্যাপী আন্দোলন, ইহারই বা ফল কি হইতেছে? দেশের লোক যে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, রোগের যন্ত্রণায়, জমীদার মহাশয়দের উৎপীড়নে দেশ-মধ্যে যে হাহাকার-ধ্বনি উঠিতেছে, তজ্জন্য কি উপায় হইতেছে? যাহা হইবার নহে, যাহা কখন স্বপ্নেও মনে করি নাই, সেই সুখের জন্য তোমরা লালাইত! আকাশে ফাঁদ পাতিয়া গগণ-চাঁদ ধরিতে সকলেই ব্যস্ত! কিন্তু চক্ষের সম্মুখে যে শতশত লোক হাহাকার করিতেছে, তাহার কি উপায় করিতেছ? কলের জল দেশে আনিয়া দুঃখ ঘুচাইবে?—সে শক্তি কোথায়? যে শক্তি আছে, যাহা যত্ন করিলে হইতে পারে, তজ্জন্য কেন যত্ন কর না? ২০৫টা কূপ খনন করিয়া দিলে আমাদিগের পিপাসা কিছু প্রশমিত হয়; কিন্তু কই সেজন্য কেহই তো চেষ্টা করে না! তুমি যদি সমস্ত জীবন যত্ন করিয়া দুটী লোকের অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে পার, তোমার যত্নে যদি একটী লোকেরও ধর্ম্মে মতি হয়, সেও যে ভাল! পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিবে?—পৃথিবীতে নন্দন-কানন প্রতিষ্ঠিত করিবে?—এ দুরাশা কেন? যাহা কখন হয় নাই, হইবে না, এমন দুরাশার কুহকে ভুলিয়া জ্ঞানশূন্য হইলে কি কোন কার্য্য হয়? তাই বলি, যাহা সম্ভবপর, অগ্রে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

প্রতিহিংসা।

ইহার পর ৬মাস অতীত হইয়াছে। রাত্রি ৮।০ ঘটিকা; জোৎস্নালোকে চারিদিক্ হাসিতেছে। ধুবড়ী নগর-প্রান্তে রাজপথ দিয়া একটী অশ্বারোহী দ্রুতবেগে যাইতেছে। এই অশ্বারোহী George Harbaugh. কি একটা কার্য্যোপলক্ষে আজ ধুবড়ীতে আসিয়া কার্য্য সমাধান্তে সাহেব গন্তব্য স্থানে ফিরিতেছে।

সহসা আর একজন অশ্বারোহী পথিপার্শ্ব হইতে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া সাহেবের অশ্বের গতিরোধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "Good evening, Sir!"

নির্জ্জন স্থানে এইরূপ প্রতিরুদ্ধ হইয়া সাহেব কিছু ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"I See you're a natve! But who're you? and what d'ye want?"

"Do not be alarmed, sir! But permit me to ask you one or two questions! In the first place, is your name George Harbaugh?"

এতক্ষণে সাহেবের সাহস দেখা দিল। একে দেশী লোক, তায় স্থিরভাবে কথা কহিতেছে। সুতরাং সাহেবের বিলক্ষণ সাহস হইল। তখন ঘৃণার সহিত সাহেব উত্তর করিল,—"Well, what of it, whether it is or is n't?"

"If it is, I owe you something, which I wish to pay, and if it is not, perhaps you can put me in the way to find the person I seek?

"What do you owe me for, and how much?"

"I am right, then, in supposing I address George Harbaugh himself?"

"Yes, that's my name. What's yours, and where'd we ever met before?"

"If I am not mistaken, you with two associates, were at the tea garden of———, on the night of the eighth of May last?"

"Ha! what's this?" সাহেবের মুখ হইতে ঐ কয়টী কথা বাহির হইতে না হইতে অপর অশ্বারোহী চকিতের ন্যায় সাহেবের হস্তে একখানি কোষ-সম্বদ্ধ অসি অর্পণ করিয়াই, নিজ হস্তস্থ নিষ্কোষ তরবারি দ্বারা সাহেবকে আক্রমনোন্মুখ হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিল,—"Now draw, and depend yourself!"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এই অদ্ভুদ নৈশ দ্বন্দ-যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটী সজীব প্রাণী নির্জ্জীব হইয়া চিরদিনের মত ধরা-শয্যা গ্রহণ করিল! এই প্রাণী, সেই সাহেব, George Harbaugh.

*　　*　　*

ইহার পরে আরও ছয় মাস অতীত হইয়াছে। রাত্রি ৮।০ ঘটিকা; কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্র মনের সাধে হাসিতে হাসিতে কোমল কিরণ ছড়াইতেছে, আর চারিদিক হাসাইতেছে। নওগাঁর একটী নিভৃত পল্লীর একখানি সুদৃশ্য বাংলার সম্মুখে একটী সুবৃহৎ মনোহর উদ্যান। সেই উদ্যানের নির্জ্জন প্রান্তে James Fawcet মনের সুখে, হাসিতে হাসিতে পাদচারণ করিতেছে। নওগাঁর একটী বিবির সহিত সাহেবের আর ছয় দিন পরে বিবাহ; তাই এত সুখ, এত হাসি। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ কে একজন আসিয়া তাহার হাতে একগাছি বাঁসের লাঠি গুঁজিয়া দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—তাহারও হাতে লাঠি। সাহেবের মুখের হাসি মুখেই মরিয়া গেল, সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—

"What's the meaning of this? Do you intend to murder me?"

"I suppose you do not recollect ever having seen me, before this?"

"No, of course not! where had I ever seen you before?"

তখন আগন্তুক তাহার ছদ্ম কেশ ও শ্মশ্রু উৎপাটন করিয়া স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"Do you know me now?"

"Well, it does seem as if I had seen you before; but I can't tell where."

"Do you remember the women and children you helped to murder on this day last year?"

"Ha! you're Surendra!"

"Surendra, at your service.—The same in name as when you knew me, but not the same in nature. Then I would not have harmed you; but now I would execute the vengence of a wronged husband and father."

প্রাণভয়ে ভীত দুর্ব্বৃত্ত তখন মনে মনে ভাবিল যে, সুরেন্দ্র যখন লাঠি হাতে করিয়া আসিয়াছে, তখন সে নিশ্চিত ভালরূপেই লাঠিখেলা শিখিয়াছে। এরূপ লাঠিবাজের সহিত প্রাণের জন্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নিশ্চিত মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই না। এই ভাবিয়া ভীরু পামর কাতর স্বরে সুরেন্দ্রকে কহিল,—"Mercy!"

সুরেন্দ্র সম্পূর্ণ দয়ার্দ্র সহকারে উত্তর দিলেন, "Did you show any?"

"You will not murder me?"

"If you can't defend yourself, you must die; I have sworn it! I have followed you to rid the earth of a monster. Harbaugh fell by my hand; I shall not spare you; and then to hunt down John Ellery! Now defend yourself, you know fencing well! But be sure your minutes are numbered!"

পাঁচ মিনিটকাল যষ্ঠি-যুদ্ধের পরিণাম—সাহেব ভীষণ আর্ত্তনাদ ছাড়িয়া ধরাশায়ী হইল। তাহার মস্তক দ্বিধা হইয়া মুহূর্ত্তেকের মধ্যেই সে জন্মের মত নীরব হইল।

*　　*　　*　　*

এই ঘটনার পর আরও ছয় মাস অতীত হইয়াছে। গৌহাটীর অনতিদূরে একখানি সুন্দর চা-ক্ষেত্রে রাত্রি ৮॥০টার সময় John Ellery ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে; জ্যোৎস্নাময়ী রজনী কৌমুদী-কিরণ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া প্রকৃতি সুন্দরী মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া হাসিতেছে; সাহেবও তাহার চা-ক্ষেত্রের আশাতীত উন্নতি দেখিয়া বড়ই সুখের হাসি হাসিতেছে। সহসা পার্শ্বে কিসের শব্দ হইল। সাহেব চমকিত হইয়া দেখে যে, একটী লোক তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সাহেব বাচ্ছা—ভয় পাইলে ভীরু অপবাদ হইবে, তাই সাহসে ভর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"Who're you? and what d'ye want?"

ঐ দুটী প্রশ্নের উত্তরে সাহেবের আরও নিকটে আসিয়া, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে দুইটী পিস্তল বাহির করিয়া, তাহার একটী সাহেবের হস্তে দিয়াই, সে ১০।১৫ হাত দূরে যাইয়া নীরবে দাঁড়াইল। ব্যাপার দেখিয়া সাহেবের প্রাণ উড়িয়া গেল; অন্তিম সাহসে ভর দিয়া সাহেব জিজ্ঞাসিল,—"What d'ye mean by this? Do you intend to murder me?"

জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল, "Listen to me for a few moments, and you will know and understand all. There were once three miscreants, named George Harbaugh, James Fawcet and John Ellery. A little more than a year ago, they murdered an innocent woman and children, in the village of———while the husband and father, Surendra Nath Das, was away. When he returned and learned all the horrid particulars, he swore a solemn oath that he would never rest in peace till he should have hunted, them all down, and put an end to their guilty lives. George Harbaugh fell by my hand in a duel at Dhubri, James Fawcet followed his example in the garden of Nowgong and now it is John Ellery who will do the same after having been shot through and through!"

পাপ-অবতার পাষণ্ড, সাক্ষাৎ ভয়ের অবতার স্বরূপ হইয়া ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিল,—"But I am John Ellery!"

"No need to tell me that, who have hunted you to your death! I am Surendra!"

"Good Heaven! I'm then done for!"

"Yes, beyond hope! In a minute you will be a corpse, if you can't hit me first! Now, fire!"

"Murder! Help!"

"None of that! All murderer you are, you must fire first, for now, I am the agressor!"

সুরেন্দ্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই, সাহেব সুরেন্দ্রের প্রতি ঠিক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল; সুরেন্দ্রের দক্ষিণ হস্তের গুলির উপর সাহেবের গুলি যাইয়া দারুণ আঘাত করিল। সুরেন্দ্র যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন; তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অকর্ম্মন্য হইয়া পড়িল। তিনি অন্তিম বলে বলীয়ান হইয়া বাম হস্তে পিস্তলটী লইয়া পলায়নপর সাহেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিলেন। ধন্য শিক্ষা! ধন্য ধর্ম্মের জয়! ধন্য অধর্ম্মের পতন! গুলি যাইয়া সাহেবের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে লাগিয়াছিল—সাহেব বিষম আর্ত্তনাদ ছাড়িয়া ভূতলে পতিত হইল; নিমেষের মধ্যেই তাহার প্রাণবায়ু বাহ্য-বায়ুর সহিত বিলীন হইল।

* * *

ইহার পর আরও দেড় বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রভাত কাল—বেলা ৮॥০ টা। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত দাসপুর গ্রামের নিকটে এক বিস্তৃত প্রান্তর; সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়া এক প্রশস্ত পথ গ্রামের মধ্যে গিয়াছে। সেই পথ দিয়া একজন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে গ্রামা-

ভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সন্ন্যাসীর বয়ঃক্রম আন্দাজ ত্রিশ বৎসর—শরীর বিলক্ষণ সবল, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ও শ্রম সহ বলিয়া বোধ হয়। ললাটে গভীর চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে; নয়নে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ও বদনে মালিন্য-কালিমা পড়িয়াছে। তাঁহার পরিধানে একখানি গৈরিক বস্ত্র, অঙ্গে আর একখানি সামান্য গৈরিক বস্ত্র-খণ্ডমাত্র। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে গ্রামাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, একটী দীর্ঘশ্বাস প্রক্ষেপ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায়, আমি বড়ই হতভাগ্য বহুদিন পরে স্বদেশে, স্ববাসে ফিরিয়া আসিলে লোকের কতই আনন্দ—স্বজনগণেরও কতই আনন্দ! কিন্তু আমার কি?—আমার কেবলই নিরানন্দ, নিরাশা, আর অনুতাপ, আতঙ্ক। এই যে এত তীর্থাদি পর্য্যটন, এত কঠোর ব্রত ধারণ ও উদ্‌যাপন করিলাম, শরীরকে নানা রূপে এত কষ্ট দিলাম; কিন্তু কৈ—সুরবালার চিন্তা—আমার বাছাদের কথা, একবারও ভুলিতে পারিয়াছি কি? হায়, কেন যে তিনটী জীবন আমার প্রবল প্রতিহিংসানলে আহুতি দিলাম, কেন বৃথা প্রাণিহত্যা করিয়া অক্ষয় পাপ সঞ্চয় করিলাম? এখন যতদিন আমার সেই বুকের ধনদিগের সহিত ভিন্ন জগতে যাইয়া মিশিতে না পারিতেছি, ততদিন আর আমার শান্তি নাই! যাই—দেখি, এখন বাড়ীঘরের কিরূপ অবস্থা; জমা-জমি যাহা কিছু আমার আছে, আর বাড়ীখানার একটা বিলি ব্যবস্থা করিয়া, এবার জন্মের মত জন্মভূমি ত্যাগ করিব।"

সুরেন্দ্রনাথ বরাবর নিজ ভবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। বাটীর অবস্থা ভাল দেখিয়া তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। বহির্ব্বাটীর গৃহগুলি ও প্রাঙ্গনভূমি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বাড়ীখানি নিতান্ত পরিত্যক্ত নহে—নিশ্চিত কেহ বাস করিতেছে। যেই হউক, অবশ্যই কোন আত্মীয়ই হইবে ভাবিয়া, সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রাঙ্গনে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, আশা ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, ঠিক তাঁহার সুরবালার মত কে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক—যদিও শীর্ণা, জীর্ণা—অঙ্গনে বসিয়া তাঁহারই পুত্রদ্বয়ের মত দু'টী ছেলেকে আহার করাইতেছে! মৃতকে জীবিত দেখিলে কে সহসা তাহার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করে?

কিন্তু সাধ্বী সুরবালা তাহার বড় সাধনের ধন স্বামীকে, বড় বড় কেশ, শ্মশ্রু, গুম্ফ সত্ত্বেও—দেখিয়াই চিনিতে পারিল,—সে চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীও তিন বৎসর পরে এত তীর্থ-দর্শন ও এত পুণ্য-ক্রিয়া-সাধনের ফল পাইলেন।

হৃদয়ের ভিত্তি কোথায়!

ভাই, বল দেখি তোমার হৃদয়ের ভিত্তি কোথায়? এই বিশ্বজনীন ব্রহ্মাণ্ডে হৃদয়ের ভিত্তি কাহাকে বল? যে ভিত্তির উপর অবস্থিতি করিয়া এই পাপময় সংসার-ক্ষেত্রে তুষ্ট মনে অবস্থিতি করিতেছ, যে ভিত্তির উপর অবস্থিতি করিয়া পিতা, মাতা, ভাই, স্ত্রী ও আত্মীয়গণকে আপন মনে করিতেছ, যে ভিত্তির উপর অবস্থিতি করিয়া তুচ্ছ-জ্ঞানে সেই অখণ্ড প্রেম ভুলিয়া ক্ষণিক সংসার-প্রেমে মন মাতাইয়াছে, হৃদয়ের সেই মূল ভিত্তি কোথায়? তুমি অমনি উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিবে, কেন বিশ্বাস! কিসে বিশ্বাস? তুমি বলিবে, কেন এই পঞ্চভূতাত্মা দেহে যাহা কিছু সার।

সার কোন্‌টুকু? যে টুকুর ধ্বংশ আমরা দেখিতে পাই না। এই দেহ, ইহা তো পঞ্চ-

ভূতে মিলিবে! থাকিবে কি?—মন ও প্রাণ। এইবার আমি জিজ্ঞাসা করি, ভাই তোমার হৃদয়ের ভিত্তি কোথায়? তুমি বলিবে, মনে। মন আবার প্রেমের আধার, পিতামাতার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশেই বদ্ধ হইয়া থাক, ভাইকে আত্মসম জ্ঞান করিতেই থাক, স্ত্রীর জন্য প্রাণ দিতেই প্রস্তুত থাক, আর বন্ধুগণকে প্রাণাপেক্ষাই ভাল বাসিতে থাক, সকলেরই কারণ প্রেম। এই প্রেমাধার মনের উপরই আমার হৃদয়ের ভিত্তি। আচ্ছা, এই প্রেমই যদি তোমার হৃদয়ের ভিত্তি হয়, তবে দেখা যাউক, তোমার প্রেমের দৌড় কত দূর। পিতা-পুত্রে প্রেম? এ প্রেম তো অতি সামান্য। বাণিজ্য-কাণ্ডে দেখ, পিতা-পুত্রে বিসম্বাদ চলিতেছে: পিতা পুত্রকে কারাগারে বদ্ধ করিতেও পারে, ধনের জন্য পুত্র পিতাকে হত্যা করিতেও পারে। রাজ্য-কাণ্ডে দেখ, পিতা পুত্রকে কারাবদ্ধ করেন, কখন বা প্রাণে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। পুত্রও সিংহাসন প্রত্যাশায় পিতাকে হত্যা করিতে পারে। মাতা-পুত্রে প্রেম? গৃহকাণ্ডে দেখ, স্বার্থের জন্য মাতা পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিতেছে; কুসন্তান তো মাতাকে এক মুষ্টি অন্ন দিতেও কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। দাম্পত্য-প্রেম? এ প্রেম আরও অসার। সামান্য ভোগবিলাসের কারণ তোমার পত্নী তোমাকে ত্যাগ করিতে পারে; তুমিও সামান্য মাদক সেবন করিয়া তোমার সধবা পত্নীর একাদশী ঘটাইতে পার। সুতরাং দাম্পত্য-প্রেমও নাই। বন্ধুগণের প্রেম? ইহাও অতি অকিঞ্চিৎকর। যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইলে, তুমি তোমার বন্ধুর বিপক্ষে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যও দিতেও পার।

এই অসার প্রেমই তোমার হৃদয়ের ভিত্তি! ভাই, তুমি যদি প্রেমের উপর তোমার হৃদয়ের ভিত্তি গাঁথিয়া থাক, তবে তুমি ভ্রমে পতিত হইয়াছ। অতি অসার অপদার্থের উপর হৃদয়ের ভিত্তি গাঁথিয়াছ; দেখিও সামান্য বাতাস লাগিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর যদি ভাঙ্গা ছাদের তলায় থাকার ন্যায় ভয়ে ভয়ে না থাকিতে চাও, তবে তোমার হৃদয়ের এ ভিত্তি ছিঁড়িয়া ফেল,—ফেলিয়া নূতন করিয়া গাঁথ; আর তাহার নিম্নদেশে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত কর,—"মহাপ্রাণ।" এই প্রাণে প্রাণ মিশাইতে শেখ; এই প্রাণে বিশ্বাস কর; এই প্রাণের সহিত তোমার যেটুকু প্রেম আছে ঢালিয়া দাও। হৃদয়ে শান্ত পাইবে। সংসারে সুখ বাড়িবে। আশায় নৈরাশ হইবে না। সংসারে থাকিয়া স্বর্গসুখ পাইবে।

আত্মরক্ষা।

'আত্মরক্ষা' শব্দের বহু-অর্থে তাৎপর্য্য। কোথাও ধর্ম্মরক্ষা, কোথাও প্রাণরক্ষা, কোথাও মর্য্যাদারক্ষা ইত্যাদি। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে। রক্ষা করাও পুরুষোচিত কার্য্য। উহাই মানবের মানবত্ব। অজ্ঞতায়, স্বার্থে বা প্রলোভনে যে আত্মরক্ষার্থ পরপদে বলি প্রদান করে, সে সর্ব্বতোভাবে পুরুষকারবিহীন; সুতরাং পশুকল্প। যে জাতির আত্মরক্ষায় প্রয়াস নাই, সে ব্যক্তির উন্নতি নাই, দেহে জীবনী-শক্তি নাই, নয়নে দর্শন নাই, বাহুতে বল নাই, মুখে বাক্‌শক্তি নাই, সে নিস্পন্দ, নির্জীব চিত্র-পুতলিপ্রায়। আত্মরক্ষার পূর্ব্বে আত্মবোধ থাকা চাই। যাহার আত্মবোধ নাই, তাহার আত্মরক্ষা জন্য প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং সে পেচকের ন্যায় হয় তরু-কোটরে অবস্থান করে অথবা পরহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া পদে পদে তাহাদের অনুসরণ করে; এবং আচার-ব্যবহার স্বপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলেও বিজাতীয় অনুকরণে তাহার স্বতঃ-প্রবৃত্তি জন্মে। বিজাতীয় শিক্ষায় বর্ত্তমান সময়ে এদেশীয় আর্য্য-বালকবৃন্দের অধিকাংশ আত্মবোধে বঞ্চিত; সুতরাং আত্মরক্ষায় উচ্ছৃঙ্খল। মানব-সন্তান ব্যাঘ্রের নিকট রক্ষিত ও পালিত হইলে ব্যাঘ্রের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং সেই রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার শিক্ষা করে: সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পশুপদবী প্রাপ্ত হয়। এইরূপ একদেশীয় বালক দেশান্তরীয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, তদ্দেশীয় রীতি-নীতি অভ্যস্ত হইয়া বিকৃত করিয়া তুলে; কার্য্যকালে দেশের ব্যবহারে অন্ধ হইয়া সে অশেষ অনর্থ উৎপাদন করে। কারণ, মূলে সে আত্মবোধের কোনও উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। আত্মবোধ-বিহীনতায় আত্মহারা হইয়া স্বমর্য্যাদা লঙ্ঘন করে। এই জন্য অনেক সময় প্রাচীন ও নবীনে বিরোধ ঘটে।

যে ভারত ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র, জ্ঞানের আদি-পত্তন, সভ্যতার প্রথম নিবাস, সে ভারত আজ ক্ষার-ভূমির ন্যায় সুফলবান তরু উৎপাদন করিতেছে না। ধর্ম্মরক্ষার জন্য যে দেশের অঙ্গনাগণ একদা প্রজ্জ্বলিত হুতাশন-মুখে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছে, সে দেশের অঙ্গনা আজ স্বামী-পরিত্যাগার্থিনী হইয়া রাজ-দ্বারে দণ্ডায়মান; আর ভারত-সন্তানই তাহার সহকারী। ইহার একমাত্র কারণ কি বিজাতীয় শিক্ষা নহে? এইযে নবীন শিক্ষিতাভিমানী যুবক বিজাতীয় বেশে সদর্প-পাদবিক্ষেপ করিতেছে, ধর্ম্ম উহার নিকট তিরস্কৃত। সেইজন্য অধুনা নব্য-শিক্ষিতদলে ধর্ম্মের আলাপ অতি অল্পই শুনা যায়; যাহা কদাচিৎ শুনা যায়, প্রায়ই তাহা বালকের প্রলাপ, অসার, অযৌক্তিক ও অসংবদ্ধ। অতএব ইহা বলিতে কোন আপত্তি নাই যে, বর্ত্তমান যুবকগণের অনেকে স্বধর্ম্ম-রক্ষায় একান্ত শিথিল ও উদাসীন। শিক্ষার যাহা মুখ্য প্রয়োজন, তাহাতে ঔদাস্য প্রকাশের একমাত্র কারণ, তদ্বিষয়ে শিক্ষার অভাব।

প্রাণ সদাচারে পরিপূরিত হইয়া শান্তভাবে বিরাজ করে। সদাচারে সম্পূর্ণ কদাচার হইলে প্রাণও তর্জ্জিত হইয়া বহুক্লেশে প্রয়াণ করে। সদাচার-কদাচার শিক্ষা ভিন্ন বুঝিতে পারা যায় না। শিক্ষাকালে তদুপদেশের অপ্রতুল হইলে কার্য্যকালে আশুতোষকর লোভজনক দ্রব্যে মন আকৃষ্ট হইয়া হিতাহিত জ্ঞানে দৃক্‌শূন্য করিয়া ফেলে। অসময়ে অশন-বসন প্রভৃতির দুর্ব্যবহারে শরীর ও মন ক্লিষ্ট ও রগ্ন হইয়া অকালে বহু যাতনা প্রদান করে। কেহ অনুচিকীর্ষায় স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ঐ সকল আচরণে নিরত থাকে; কেহ বা বাধ্য হইয়া তদাচারে বিচরণশীল। ফল উভয়তঃই প্রায় তুল্য। ঐ উভয়ের মধ্যে একে কর্ম্মকাল মাত্র তদ্রূপে অতিবাহিত করে; আর অন্যে স্বভাববশতঃ অনুরাগ-ভরে ঐরূপ পরাচারে আরক্ত। ফল কথা, এবম্বিধ বিসদৃশ আচারে প্রাণরক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে না। অশেষবিধ রোগ দেশমধ্যে সংক্রামিত হইতে লাগিল। বলক্ষয়, আয়ুক্ষয়, সঙ্গে সঙ্গে অর্থনাশ, সুতরাং মনস্তাপ প্রজ্বলিত হইয়া নিরন্তর দগ্ধ করে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল অন্তরায় অপসারণ করিতে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধি হইয়া আবহমান-কাল-প্রচালিত দেশীয় সুগুণমণ্ডিত ব্যবহারাবলীকে নিদানস্থানীয় করিয়া ব্যবস্থকতা উপস্থাপিত করে। ইহার একমাত্র কারণ আজন্ম বিজাতীয় শিক্ষা ও সনাতন শাস্ত্রানভিজ্ঞতা, আর বিশ্বাস-বৃত্তির বিলয়। অর্দ্ধশত বৎসরের সহিত উপমিত হইলে এখন দৌর্ব্বল্য ও অল্পায়ুতা প্রভৃতি সমধিক পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, প্রাণরক্ষা কার্য্যেও অধুনা ভারত-সন্তান অশক্ত।

সৃষ্টির আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত এখানে মানবগণ আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল। যখন আশ্রমাচার অক্ষুন্ন ছিল, তখন ভারতের যশঃশশধর পরিপূর্ণভাবে

করিয়া আপনাদিগের জলাভাব নিবারণ করিত। ক্রমে যত আর্য্যগণ আস্তে আস্তে উত্তর ও নিম্ন-বঙ্গে প্রবেশ করিয়া ক্রমে সাঁওতালগণকে বাঙ্গালা হইতে নিঃসারিত করিতে লাগিলেন, ততই তাহারা বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা ও ছোট নাগপুরের অরণ্যে ও পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে শিখিয়া ক্রমে চির-প্রবাহশালী দামোদরের জলে আপনাদিগের জলাভাব দূর করিতে লাগিল; এবং পূর্ব্বে যেমন তাহারা গঙ্গাকে ভক্তি-চক্ষে দেখিত সেইরূপ দামোদর-কেও পবিত্র জ্ঞান করিতে লাগিল। মনুষ্যের আদিম বা অসভ্য অবস্থায়, নৈসর্গিক কোন অদ্ভুত ব্যাপারে ঈশ্বরত্ব প্রদান করা স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং দামোদরের জলপ্লাবন, উহার সময়ে সময়ে অকস্মাৎ জল-বৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনায় লোকের চিত্তে ভয়েরও সঞ্চার হইতে পারে, এবং সেই অনিষ্ট নিবারণের জন্য দামোদরের পূজা করাও কিছু সাঁওতালগণের পক্ষে প্রথমে আশ্চর্য্য ছিল না। আমার বোধ হয়, যদি তৎকালে সাঁওতালগণ দামোদর ব্যতীত অপর কোন চিরপ্রবাহিনী নদী তাহাদিগের পথিমধ্যে পাইত,তাহা হইলে একা দামোদরকে কখনই পবিত্র বলিয়া স্থির করিত না।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

ডিটেক্‌টিভ-পুলিস।—(দ্বিতীয় কাণ্ড)। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তক খানির আমরা যদি সুখ্যাতি করি, তাহা হইলে আমাদেরই আত্মশ্লাঘা করা হয়; কারণ, প্রিয়নাথ বাবু আমাদের 'অনুসন্ধানেরই' এক জন প্রধান লেখক। তবে যদিও পুস্তক খানির সুখ্যাতি না করি, কিন্তু এরূপ পুস্তক এদেশে যে নূতন, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। আরও ইহাও বলিতে হইবে যে, এরূপ পুস্তক যদি আজ আমেরিকা কিম্বা ইউরোপের কোন সভ্য-প্রদেশ হইতে বাহির হইত, তবে প্রিয়নাথ বাবুকে ইহার প্রচারের জন্য আর সংবাদ-পত্রের সমালোচনার মুখাপেক্ষী হইতে হইত না—এ পুস্তকের নামমাত্র জানিতে পারিলেই লোকে ইহা পড়িয়া চমকিত হইত। ফলতঃ ইহাতে জুয়াচুরীর যেরূপ অদ্ভুদ অদ্ভুদ কাণ্ড বর্ণিত আছে, তাহা পড়িলে স্বতঃই বিস্মিত হইতে হয়। অথচ সে সকল ঘটনা তাঁহার কার্য্যকালে তিনি নিত্য নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাহাহউক, এরূপ-সকল পুস্তক-প্রকাশে সাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া প্রিয়নাথ বাবু অবশ্যই ধন্যবাদ পাইবার পাত্র।

সংসারকোষ।—বাবু রাণেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এ পুস্তকখানির বিজ্ঞাপনও ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্র জমকাইয়াছিল। অর্থাৎ চারণ, মারণ, বশীকরণ যা কিছু ঘরসংসার করিতে দরকার, সকলই ইহাতে আছে, এইরূপ বিজ্ঞাপনের বোল। পুস্তকখানির অর্দ্ধেক আবার লাল কালীতে ছাপা। তজ্জন্য প্রকাশক বলেন, মন্ত্রাদি অস্পৃশ্য যবন-স্পর্শে কলুষিত হইবার আশঙ্কায় তিনি কায়েস্থ দ্বারা কালী প্রস্তুত করাইয়া ব্রাহ্মণ প্রেসম্যান দ্বারা উহা ছাপাইয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশক যদি বলিতেন যে, স্বর্গ হইতে দেবগণ আসিয়া কাগজ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং শ্মশ্রুধারী আচার্য্যগণ পুস্তক বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং বিক্রয় কার্য্যও খড়দহের মা-গোঁসাইজী করিয়া থাকেন। যাই-হোক, এ ভণ্ডামী কেন? বিশেষ, যখন পুস্তকের যেমন ছাপা, তেমনই কাগজ, তেমনই বিশুদ্ধ শ্লোক!!

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

তাই হইল!

আমরা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কার্য্যকালেও তাহাই ঘটিল। ৯৮নং গরাণহাটার—কখন বা টালার বাবু রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ যে 'জগৎবাসী' কাগজ বাহির করিতেছিলেন, তাহাও আর বাহির হইতেছে না। রাজেন্দ্রলাল বাবু ইতিপূর্ব্বে নানা উপায়ে যে লোক ঠকাইয়াছিলেন, সে কথা এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এখন আবার তাঁহার 'জগৎবাসীর' জন্য টাকা দিয়াও অনেকে সম্পূর্ণ প্রতারিত হইলেন, এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। যাইহোক, এ সংবাদে পাঠকগণের সহিত আমরাও বড়ই দুঃখিত হইলাম।

বসু এণ্ড কোম্পানী

নাম দিয়া, ৭২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানা হইতে নানারূপের অঙ্গুরী ও ঘড়ি প্রভৃতির বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ইহাঁরাও সস্তায় সোনার গহনা দিবার মত লোভ দেখান। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি গহনা সেরূপ না দেখায়, পরে ফেরত দিয়াছেন, এরূপ জানা যায়। এবং জিনিস নিয়মমত ফেরত দিয়াও এখন আর টাকা ফেরত পাইতেছেন না, এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, বসু মহাশয় এখনও কাজ-কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করুন, এই বাসনা।

ভূকৈলাশ, রাজবাটীর

সম্বন্ধে আমরা নানা অভিযোগ পাই; কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহারা তাহার কোন মীমাংসা করিতেছেন না। সুতরাং সে সম্বন্ধে এবারও একখানি মাত্র পত্র নিম্নে ছাপান যাইতেছে। আশা করি, কুমার বাহাদুর অতঃপরও আপনাদের কার্য্যের শৃঙ্খলায় মনোযোগ করিবেন। সে পত্রখানি এইঃ— ম্যানেজার্স আপিস, ত্রিহুত-ষ্টেট-রেলওয়ে, মজঃফরপুর হইতে বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"মহাশয়, মোকাম কলিকাতা খিদিরপুর ভূকৈলাশ রাজ-বাটী হইতে এইরূপ এক বিজ্ঞাপন বাহির হয় যে, তাঁহারা ডাকমাসুলের স্বরূপ লইয়া ৩৲ টাকাতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও ১১৸০ এগার টাকা বার আনাতে সংহিতাগুলি বিতরণ করিবেন। কিন্তু রামায়ণের দরুণ ৩৲ টাকা একবারে দিতে হইবে; আর সংহিতার দরুণ প্রথমে চারি টাকা দিয়া, বক্রী টাকা ক্রমে ক্রমে দিলে হইবে। ইহাতে আমি ৩৲ টাকা ও ৪৲ টাকা মোট ৭৲ মনিঅর্ডারে পাঠাই। তাহাতে তাঁহারা ১৭খণ্ড মাত্র রামায়ণ ও তিন খণ্ড মাত্র মনুসংহিতা পাঠাইয়া বলিলেন যে, রামায়ণ ৩৪খণ্ড ছাপা হইতেছে, হইলে পর শীঘ্র পাঠাইব। আর সংহিতা ছাপাও শুরু হইয়াছে; তৈয়ার হইলেই পাঠাইব। কিন্তু সে সেইপর্য্যন্তই শেষ! তাহার পর মহাশয় প্রায় এক বৎসরকাল যে কত বিনয়সহকারে পত্র লিখিয়াছি, তাহা এ পত্রে লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। কিন্তু মহাশয় এপর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না।"

অন্যায় কথা।

রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে বাবু শরৎকুমার সরকার লিখিয়াছেন,—"মহাশয়, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেন হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার কবিরত্ন এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, শরৎশশী-প্রেস হইতে Kabichandra's Hints on Provashika নামক একখানি গ্রন্থ অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রকাশিত করিবেন। আমি উক্ত বিজ্ঞাপনানুসারে ঐ পুস্তকের মূল্য মায় ডাকমাশুল ৸৵০ আনা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়াছি; তাহার পর প্রায় দুই তিন মাস অতীত হইল, গ্রন্থকর্ত্তা বা প্রকাশকের আর কোন সাড়াশব্দ নাই। টেষ্ট-এক্‌জামিন অতি নিকট বলিয়া রিপ্লাই কার্ডেও পত্র দিয়াছি। কিন্তু উত্তর নাই।" এসকল পরীক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক সম্বন্ধে প্রকাশক মহাশয়ের এরূপ ব্যবহারে আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম।

গ্রাহকগণের দৌরাত্ম্য।

১। বাবু শ্রীধরচন্দ্র সিংহ, গ্রাম গোপীনাথপুর, ভগবানপুর পোঃ।—উক্ত গ্রামের আশুতোষ সিংহ নামক এক ব্যক্তি 'অনুসন্ধানের' গ্রাহক হইতে চাহিয়া যেরূপ অপূর্ব্ব প্রতারণার ফাঁদ পাতেন, সে পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐ গ্রাম হইতে সম্প্রতি শ্রীধর সিংহ নামে আর এক বালকের অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে আমাদের এখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ঐ গ্রাম হইতে প্রকৃত ঠকাইবার উদ্দেশেই কএকজন প্রবঞ্চক পত্রিকাদির গ্রাহক হয় বা অপরকে হওয়ায়; এবং শেষে সে সকলের

নামের এক তাগাদা আসিলে তখন অপর নামে কাগজ পাঠাইতে বলে। বিশেষ, এই কথার প্রমাণও নিম্ন-প্রকাশিত একখানি পত্রে (যাহা ঐ আশুতোষ বা শ্রীধর সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই স্বয়ং লিখিয়াছেন) পাঠকগণ বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। সে পত্র এইঃ—

"সবিনয় নিবেদনমেতৎ,—মহাশয়, অতিশয় দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, দশমবর্ষ বয়স্ক আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ আশুতোষ একটী দুষ্ট-বালকের প্রলোভন-জনিত পরামর্শে 'অনুসন্ধানের' গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করে। ইতিপূর্ব্বে আমিও ইহার বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ কিছুই অবগত নই। কল্য আপনার রিপ্লাই-কার্ডখানি হঠাৎ আমার হাতে পড়ায় আশ্চর্য্য হইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর উপরোক্ত ঘটনাটী সবিশেষ অবগত হইলাম। আপনার যে 'অনুসন্ধান' শ্রীমান্ আশুতোষের নামে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা প্রলোভনকারীর হস্তগত হওয়ায় সম্প্রতি পাঠাইতে পারিলাম না। পরে অন্বেষণ করিয়া প্রেরণের ইচ্ছা রহিল। আশা করি, বালক বলিয়া অবশ্যই ক্ষমা করিবেন, ইতি।—শ্রীজীবানন্দ সিংহ।"

জীবানন্দ বাবুর পত্রমত বালককে ক্ষমা করিতে পারি বটে; কিন্তু ইহাতে যে গ্রামের—বিশেষতঃ তাঁহাদের প্রসিদ্ধ সিংহ-পরিবারেরই যে দুর্ণাম হইতেছে, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারিতেছন না? যাইহোক, আমরা আর কিছু বলিতে চাহি না। তবে অতঃপরও এইরূপ সকল বালকের চরিত্রের প্রতি তাহাদের অভিভাবকগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে, এই বাসনা। কারণ, তাহা না হইলে সমাতির অভাবে কালে ঐ সকল বালকই আবার এক এক 'কেষ্ট-বেষ্ট' হইতে পারে।

সংবাদ। ✓

—মানিলার কারাগারে একজন আসামী প্রায় ১০৪ বৎসর কাল ক্রমাগত বন্দী আছে। এরূপ দীর্ঘজীবনই তো সচরাচর ঘটে না; সুতরাং এতদিন জেলভোগ, এ বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর হয় নাই।

—গত ১৮৮১অব্দের মার্চ্চ মাসে যে লোক গণনা হয়, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ইংরাজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ভাগ প্রায় কুড়ি লক্ষ তের হাজার ৪শত ১৯ জন বেশী।

—ছিপে মাছ ধরা, একথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি? কিন্তু সম্প্রতি রাণাঘাটের সন্নিকট আড়ংঘাটার অনতিদূরে শালো নামক গ্রামে বাস্তবিকই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। শুনা যায়, তত্রত্য মালোগণ চূর্ণী নদীতে 'জোয়ান' (বৃহৎ ছিপ—এ ছিপের সূতা এত মোটা যে, ছোট ছোট গরু ইহাতে অনায়াসে বাঁধা যায় এবং ইহার বর্ষিও সেইরূপ) পাতিয়াছিল। জোয়ানের নিয়ম যে, তাহার বর্ষিতে একটী জীবন্ত মৎস্য বদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বদা নড়িতে থাকে; এবং তখন কোন বৃহৎ মৎস্য আসিয়া সেই মৎস্যকে গিলিলেই ধৃত হয়। গত ৫ই কার্ত্তিক রাত্রে একটা ব্যাঘ্র সেই নদীতীরে আসিয়া সম্ভবতঃ ঐ মৎস্য গিলিতে গিয়া, ছিপে আবদ্ধ হইয়া যায়। পরদিন সকালে মালোগণ কিন্তু মৎস্য ধরিতে গিয়া দেখে যে, মাছের পরিবর্ত্তে ছিপে বাঘ পড়িয়াছে।

—কলিকাতার বাজরে সম্প্রতি কতকগুলি জালনোট চলিতেছে। এই নোটে ১৮৮৪সালের ১৯এ মার্চ্চ তারিখ দেওয়া আছে। সুতরাং সকলে সাবধান।

—একি দুঃসংবাদ শুনি! প্রজাবন্ধুর সম্পাদকের নামে হুগলি ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার পাদ্রী এক মানহানির মকর্দ্দমা উপস্থিত করায় সম্পাদকের তিন মাস কারাদণ্ড ও চারি শত টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

—শুনা যায়, আমেরিকায় একটা সাবানের খনি বাহির হইয়াছে। তাহা জমাইলেই সাবান হয়।

—চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় দেশের ভাবগতিকও বড় ভাল বোধ হইতেছে না। ইংরাজ সম্প্রতি তাহাদিগকে দমন জন্য সৈন্য পাঠাইয়াছেন। এখন কিসে কি হইবে, এই ভাবনা।

—সহযোগী সোমপ্রকাশের নামে বাঁকুড়ার হেড কনেষ্টবল সম্প্রতি এক মানহানির মকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। শুনিতেছি ফরিয়াদী কালেক্টারির সেরেস্তাদারের ভাগিনা; তাই বারের কোন উকিলই সম্পাদকের পক্ষ লইতেছেন না। এ সংবাদ সত্য হইলে বড়ই লজ্জার কথা! ফলতঃ সম্পাদকের এরূপ দুর্দ্দৈবে আমরা বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম!

—আমেরিকার কানসাস প্রদেশে দুইটী কৃষক-সন্তান একত্রে ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় একটী ঈগল পক্ষী আসিয়া তাহাদের একটীকে মুখে করিয়া উড়িয়া গিয়াছে। পরে ঈগলের বাসাতেই বালকের মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছে!

—এবারও ষ্টীমার-ডুবির পালা পড়িয়াছে। 'বৈতর্ণা' নামক একখানি ষ্টীমার প্রায় ৯০০শত যাত্রী লইয়া কচ্ছ প্রদেশ হইতে বোম্বাই সহরে আসিতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সে ষ্টীমার যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহার আর সন্ধান হইতেছে না। কি দুর্দ্দৈবের কথা!

—ইংরাজের সহিত কৃষ্ণপর্ব্বতে যে যুদ্ধ হইতেছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহাতে ইংরাজ-পক্ষের বহুল অনিষ্টের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ইংরাজ-সেনাপতি সংবাদ দিয়াছেন যে, তত্রত্য পার্ব্বত্যগণ অতঃপর বশ্যতা স্বীকার করিতেছে; সুতরাং আর আশঙ্কা নাই। সংবাদ সত্য হইলেই ভাল।

অনুসন্ধান।

—:০:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩০এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৫ সাল। [৯ম সংখ্যা।

যাতনার হাসি।

(১)

যাবে যাও—ছেড়ে যাও
কেন হেসে ব্যথা পাও!
কেন দারুণ মরম-কথা
মরমে লুকাও!
তুমি যাও চ'লে ধীরে ধীরে
চাও শুধু ফিরে ফিরে;
আজি তোমার নয়ন-নীরে
আমায় কাঁদাও;
কেন হেসে ব্যথা পাও!

(২)

যাবে যাও—ছেড়ে যাও
কেন ভুলাইতে চাও!
কেন বাঁশী যা' বাজিতে চাহে
তাহে না বাজাও!
তুমি প্রাণের যাতনা দিয়ে
হাসিটুকু নিরমিয়ে
কেন অধরেতে বসাইয়ে
বেদনা বাড়াও!
কেন ভুলাইতে চাও!

জুয়াচোরের শিবপূজা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোবর্দ্ধন মিশ্র একজন পুরাতন জুয়াচোর। পুলিশের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখন ইনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এখন ইহাঁর গৌরবর্ণ দেহ ভস্মে আচ্ছাদিত; মস্তকে কৃত্রিম জটা-বিলম্বিত; গণ্ডদেশে, নাভিদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু শোভা পাইতেছে। পরিধানে গৈরিক বসন; হস্তে কমণ্ডলু ও চিমটা; গলে রুদ্রাক্ষের মালা। এখন ভাগীরথী-তীরে শার্দ্দল চর্ম্মের উপর বসিয়া একমনে ইনি পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন। ইহাঁর পার্শ্ব, সম্মুখ ও পশ্চাৎ চারিদিকেই লোকে লোকারণ্য। সকলেই একাগ্র মনে ইহাঁর দিকে এক-দৃষ্টে তাকাইয়া আছে; সকলেরই ইচ্ছা, ইহাঁকে কিছু না কিছু প্রশ্ন করিয়া আপন-আপন মনকে সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে কই? যাঁহার অদৃষ্ট নিতান্ত প্রসন্ন হইল, ইনি তাঁহারই দিকে একবার চক্ষুরুন্মিলন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—'কি চাই?" প্রশ্নকর্ত্তা অমনি কৃতার্থ হইলেন ও আপনার মনের বাসনা ইহাঁকে জানাইলেন;

এবং পরে ইহাঁর উত্তর পাইয়া, বেদবাক্য-সদৃশ বিশ্বাস করিয়া আপন আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গোবর্দ্ধন মিশ্র এইরূপে ভাগীরথী-তীরে প্রায় দুই মাস কাটাইলেন। সকলেই জানিল যে, ইনি একজন পরম ধার্ম্মিক যোগীপুরুষ. বা ঈশ্বরের জানিত একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী। আরও তখন সকলের এরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, বেদবাক্য যদিও মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু ইহাঁর বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে। তখন গোবর্দ্ধনেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পথ ক্রমে পরিস্কৃত হইয়া আসিল। ইহাঁর উপর তখন সহরের অনেকেরই, বিশেষ ধনী মাড়ওয়ারিগণের দৃষ্টি পড়িল। সকলেই আসিয়া ইহাঁর চরণে উপঢৌকন সহ আপন আপন মস্তক অবনত করিতে লাগিলেন। কেহ বা ইহাঁকে আপন-আপন বাটীতে লইয়া গিয়া ইহাঁর দ্বারা স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি দৈবকার্য্য সকল সমাপন করাইয়া লইতে আরম্ভ করিলেন।

গোবর্দ্ধন চন্দ্র এইরূপে আপনার পশার এক দফা জমজমা করিয়া লইয়াছেন। এমন সময় এক দিবস একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী বিশেষ মনোযোগের সহিত ইহাঁকে দেখিতে লাগিলেন। তখন ইনি ভাগীরথীর তীরে বসিয়া জপনিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু ইহাতে ইহাঁর মন যেন কিছু অস্থির বোধ হইতে লাগিল। ইনিও পুলিশ কর্ম্মচারিকে বার বার দেখিতে লাগিলেন। আর পুলিশকর্ম্মচারীও ইহাঁকে দেখিয়া দেখিয়া পরে সে দিবসের মত চলিয়া গেলেন। কিন্তু পর দিবস অন্য আর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি আবার উপস্থিত হইলেন। সে দিবস আর সন্ন্যাসীকে কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তিনি রাত্রিযোগে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কি বলাবলি করিয়া, সন্ন্যাসীর বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর পুনরায় দেখিতে পাওয়া গেল না বা আর কোন সন্ধানও পাইলেন না।

ইহার প্রায় একমাস পরে ঐ পুলিশ-কর্ম্মচারী কোন কার্য্যোপলক্ষে একটি পল্লীগ্রামের নিকটবর্ত্তী ময়দানের ভিতর গমন করিতেছেন; তখন রাত্রি প্রায় ৮টা। ইনি অদ্য সমস্ত দিন পদব্রজে পল্লীগ্রামের রাস্তা দিয়া চলিয়া আসায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন নিকটে কোন স্থান পাইলে সেই স্থানে রাত্রিযাপন করিয়া প্রত্যূষে আপন গন্তব্য পথে চলিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। ক্রমে যত রাত্রি হইতেছে, তিনিও তত দ্রুতগতি চলিতেছেন। সঙ্গে অন্য কেহই নাই, কেবল সেই স্থানের একজন চৌকিদার তাঁহার অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী লোক ব্যাগ হাতে দৌড়িতেছে। এমন সময় একটী বৃক্ষের নীচে কতকগুলি লোককে দেখিতে পাইয়া চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"এখানে কি হইতেছে?—এত লোক জড় হইয়াই বা কি করিতেছে?" চৌকিদার কহিল,—"ঐ যে বৃক্ষটী দেখিতেছেন, উহা বিল্বগাছ। প্রায় একমাস হইল, কোথা হইতে এক জন সন্ন্যাসী আসিয়া ঐ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি মনুষ্য নহেন; বোধ হয়, কোন দেবতা সন্ন্যাসী-রূপ ধরিয়া বিশেষ কোন কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। ইনি আহার করেন না; কেবল রাত্রি দিন ধ্যানেই মগ্ন থাকেন, এবং যাহাকে যাহা বলিয়া দেন, তাহার তাহাই হয়। প্রায় ১৫ দিবস হইল, ইনি প্রকাশ করেন যে, এই স্থানে ভগবান ভূতভাবনের পীটস্থান; তিনি এত দিবস মৃত্তিকার ভিতর সকলের অজানিত ভাবে ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি সকলকে দর্শন দিতে মনস্থ করিয়াছেন। আরও, সন্ন্যাসী মহাশয়কে বলিয়া দিয়াছেন

যে, তিনি চতুর্থীর দিবস এই বৃক্ষের নীচে পৃথিবীর ভিতর হইতে উঠিয়া সকলকে দর্শন দিবেন। এই কথা ক্রমে এক দুই করিয়া প্রায় শতাধিক গ্রামের লোকে জানিতে পারিয়াছেন, ও ক্রমে সকলে উহা দেখিবার নিমিত্ত একে একে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানকার প্রধান প্রধান শিক্ষিত ভদ্রলোক-গণ এবং জমিদার মহাশয়েরাও এই কথা শুনিয়া প্রথমে অবিশ্বাস করেন; এবং ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত তাঁহারা সকলে আসিয়া প্রায় সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে রাত্রিদিন নিজে পাহারা দিতেছেন। কিন্তু ভগবানের কথা কখন মিথ্যা হইবার নহে। প্রায় সহস্র লোকের সম্মুখে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া দেবাদিদেব ভগবান মহাদেব, অদ্য ৪ দিবস হইল, উত্থিত হইয়াছেন। আর, সেই দিবস হইতে এই স্থান জনাকীর্ণ। যাঁহার যেরূপ সংস্থান, তিনি সেইরূপ পূজা দিতেছেন।"

হিন্দু-পুলিশ-কর্ম্মচারী এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। চৌকিদারের কথা প্রথমে অবিশ্বাস করিলেন, কিন্তু স্থান অতিশয় জানাকীর্ণ দেখিয়া তাঁহারও মন ক্রমে সেই দিকে ধাবিত হইল। তখন তিনি আগ্রহের সহিত ভগবানের মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত সেই দিকে গমন করিলেন।

অনেক কষ্টে তিনি ভিড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, প্রস্তর সদৃশ দৃঢ় মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রস্তরময় ভগবানের মূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছে। উহার চতুঃপার্শ্বের মৃত্তিকা ফাটিয়া গিয়াছে। এবং তাহার সম্মুখে মহাপুরুষ সন্ন্যাসী ঠাকুর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন আছেন! তাঁহার দুইপার্শ্বে দুইটী প্রজ্জ্বলিত দীপ দপ দপ করিয়া জলিতেছে। কর্ম্মচারী ঐ মহাপুরুষকে অনিমিষ লোচনে দেখিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। পুলিশ-কর্ম্মচারীর, নয়নের উপর তাঁহার নয়নযুগল পতিত হইল। তাহাতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মুখ যেন ম্লান হইয়া গেল। তখন কর্ম্মচারী আর কিছুই না বলিয়া যেন অতি ভক্তিভাবে তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেন,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রনাম হই।" এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম কমণ্ডলু প্রভৃতি ফেলিয়া এক লম্ফে উত্থিত হইয়া বলিলেন,—"পামর! সহর পরিত্যাগ করিয়া এই জঙ্গলের ভিতর আশ্রয় লইলাম, ইহাতেও তুই ত আমার পশ্চাৎ ছাড়িলি নে।" এই বলিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী ঠাকুর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন; কর্ম্মচারীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী দৌড়িতে দৌড়িতে একটী বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মচারী যদিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন সত্য, কিন্তু তিনি রাত্রিকালে সেই অপরিচিত নিবিড় বনের ভিতর আর তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া আসিলেন। পরে চৌকিদারের নিকট জানিতে পারিলেন যে, উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে পুলিসের একটী থানা আছে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। এবং তাহাদিগের সাহায্যে গ্রামস্থ অনেক লোক জন, চৌকিদার ও মশাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সেই রাত্রেই বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ বনের ভিতর একটী বটবৃক্ষের উপর বসিয়া আছেন। সুতরাং সন্ন্যাসী ঠাকুর গ্রেপ্তার হইয়া অতঃপর থানায় নীত হইলেন।

অদ্য সন্ন্যাসী ঠাকুর কয়েদীর অবস্থায় থানার ভিতর বসিয়া আছেন। দুই হস্ত দৃঢ় লৌহ-হাতকড়ির দ্বারা একত্র সম্বদ্ধ; সম্মুখে একজন

বসিয়া পাহারা দিতেছে। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যদেব এখনও পূর্ব্ব গগনে উদয় হন নাই। এমন সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর ঐ পাহার-ওয়ালাকে বলিলেন,—"যিনি কল্য আমাকে আনিয়াছেন, একবার তাঁহাকে আমার নিকট ডাকিয়া দেও; তাঁহাকে আমি কিছু বলিতে প্রার্থনা করি।" এই কথা শুনিয়া পাহারওয়ালা কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে কিছু বলিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাসী। কর্ম্মচারীও এই সংবাদ পাইবামাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়, আমি যে চরিত্রের লোক এবং যে যে কর্ম্ম করিয়া সহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি, তাহার যদিও সমস্ত আপনি অবগত নহেন, তথাপি তাহার যে কতক কতক আপনি জানেন, তাহার আর কোন ভুল নাই। দেখুন, আপনি ভদ্রলোক; আমাকে জেলে দিলে আপনার যে বিশেষ কোন উপকার হইবে তাহা নহে। আর, আপনি চাকরী করিতে আসিয়াছেন; কেবল আপনাদিগের সামান্য বেতনের উপর নির্ভর করিলেই যে আপনার চলে তাহাও নহে। আপনি এক কাজ করুন; আমাকে ছাড়িয়া দিউন। আমাকে এখনি যদি ছাড়িয়া দেন তাহাহইলে সহরের যে কেহ তাহা জানিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনাও নাই। বিশেষ, আমিও যে আপনার কতক উপকার করিতে পারিব, তাহারও কোন ভুল নাই।"

কর্ম্মচারী।—"তুমি সন্ন্যাসী। তোমার নিকট দেখিতেছি, একটীমাত্র পয়সাও নাই। তুমি এখন আমার কি উপকার করিতে পার?"

সন্ন্যাসী।—"আমার নিকট পয়সা থাকুক আর নাই থাকুক, আপনি বলুন যে, আমাকে ছাড়িয়া দিবেন! তখন দেখিতে পাইবেন যে, আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারি কি না?"

কর্ম্মচারী।—"বল, তুমি এখন আমাকে কত টাকা দিতে পারিবে?"

সন্ন্যাসী।—"আপনি আমকে এখনই ছাড়িয়া দিউন; আমি আপনাকে সহস্র মুদ্রা দিতেছি।"

কর্ম্মচারী।—"সহস্র মুদ্রার কার্য্য নহে। যদি আমাকে এখনই পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিতে পার, তাহাহইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

সন্ন্যাসী।—"আচ্ছা, আমি আপনাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রাই দিব। কিন্তু আপনি হিন্দু; আপনি আপনার দেবতার দিব্য করিয়া বলুন যে, আপনি আমাকে ছাড়িয়া দিবেন।"

কর্ম্মচারী।—(একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া) "আচ্ছা, আমি পরমেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, আমাকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিবামাত্র আমি ছাড়িয়া দিব।"

সন্ন্যাসী।—"পাঁচ সহস্র মুদ্রা ব্যতিরেকে যদি তুমি আমার নিকট আর কোন দ্রব্যাদি দেখ, তাহা হইলে আর কিছু বলিবে না? ঐ পাঁচ সহস্র টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট হইবে, ও আমাকে ছাড়িয়া দিবে, বল?"

কর্ম্মচারী।—"পাঁচ সহস্র টাকা কিছু সামান্য টাকা নহে। আমি তাহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক প্রার্থনা করিব না ও তোমাকে ছাড়িয়া দিব।"

সন্ন্যাসী।—"তোমার পৈতা ছুঁইয়া দিব্য করিয়া বল যে, পাঁচ সহস্র টাকা ভিন্ন আর কিছু আমার নিকট লইবে না ও আমাকে ছাড়িয়া দিবে!"

কর্ম্মচারী।—(মৌন ও দুঃখিত ভাবে একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া) "হাঁ, আমি তাহাই করিতেছি ও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি পাঁচ সহস্র মুদ্রার অধিক আর কিছু প্রার্থনা করিব না এবং তাহা পাইলেই তোমায় ছাড়িয়া দিব।"

সন্ন্যাসী।—"তবে আমাকে আধ ঘণ্টার জন্য

ছাড়িয়া দিউন। আমি পাঁচ সহস্র মুদ্রার সহিত এখনই আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

কর্ম্মচারী।—"তাহা আমি পারিব না। তোমাকে একাকী আমি যাইতে দিতে পারিব না। যদি কোন স্থানে যাইতে চাও, আমাকে সঙ্গে করিয়া চল। নতুবা কয়েদ থাক।"

সন্ন্যাসী।—"যদি একান্তই আমাকে একাকী যাইতে না দেন, তবে আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনার সমক্ষেই আমি মুদ্রা বাহির করিয়া আপনাকে দিতেছি।"

কর্ম্মচারী।—"আমি একাকী যাইতে পারি না বা আমি সমস্ত টাকা একাকী লইতেও পারি না। কারণ, এই স্থানের পুলিশ কর্ম্মচারী যিনি আমার সহিত ছিলেন তিনিও আমার সহিত যাইবেন, এবং ঐ টাকার অংশ তাঁহাকেও দিতে হইবে। নতুবা তিনি সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিবেন।"

সন্ন্যাসী ইহাতে সম্মত হইয়া দুই জন পুলিশ কর্ম্মচারীকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। ক্রমে যাইয়া যে স্থানে তিনি একমনে শিব পূজায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণ হস্তে শিব-মস্তক ধরিয়া জোরে উঠাইয়া ফেলিলে এক হস্ত পরিমিত শিব-মূর্ত্তি সেই স্থানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। পরে তিনি যে স্থান হইতে শিবমূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছিল, সেই স্থানের মৃত্তিকা খোদিত করিতে বলিলেন। অল্প পরিমিত মৃত্তিকা খোদিত হইতে না হইতে এক খানি কাষ্ঠ-ফলক দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি উহা উঠাইতে বলিলেন। কাষ্ঠ-ফলক উত্থিত হইলে তাহার নীচে রাশীকৃত ভিজা ছোলা (কতক বা কল হইয়াছে) দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকলেই অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তখন তিনি ঐ সকল ছোলা উঠাইতে বলিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ছোলা উপরে তোলা হইল। তখন উহার নীচে একটী তাম্র কলসি দৃষ্টিগোচর হইল। তাম্র কলসি উপরে উঠাইলে দেখা গেল, উহার মুখ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। তখন সন্ন্যাসী ঠাকুর উহার মুখ খুলিয়া ফেলিলেন ও তাহার ভিতর হইতে পাঁচ বাণ্ডিল নোট বাহির করিয়া কর্ম্মচারীর হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এই লউন পাঁচ সহস্র মুদ্রা। আমার ধর্ম্ম আমি করিলাম, এখন আপনার ধর্ম্ম আপনি প্রতিপালন করুন। আমাকে ছাড়িয়া দিউন।" তখন কর্ম্মচারী কোনরূপ উত্তর না করিয়া সেই কলসির ভিতর দৃষ্টিপাত করিলেন, ও দেখিলেন, উহা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত গহনায় পরিপূর্ণ।

ইহা দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন,—"আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিব। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও আমার কথা মিথ্যা হইবে না। তবে এখন আপনাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; তাহার উত্তর আমাকে দিলেই আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব। এই যে পাঁচ সহস্র টাকা আমাকে দিলেন, ইহা কি সেই হাটখোলার পাঁচ সহস্র টাকা!"

সন্ন্যাসী।—"হাঁ, সেই পাঁচ সহস্র টাকা ভিন্ন আর টাকা কোথায় পাইব?"

কর্ম্মচারী।—"এই গহনাগুলি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?"

সন্ন্যাসী।—"কালিকাতার কতক এবং মেদিনিপুরের কতক।" এই বলিয়াই তিনি কর্ম্মচারীর কানে কানে কি বলিলেন। ফলতঃ তিনি যে কি বলিলেন, এখন কেবল কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। পাঠকগণ ক্রমে জানিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারী।—"সমস্তই ত শুনিলাম। কিন্তু এই শিব মূর্ত্তির নিচে কাষ্ঠ ও ছোলা রাখার প্রয়োজন কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।"

সন্ন্যাসী।—"ইহার কারণ আর কিছুই

নহে। কেবল মানবগণের প্রবৃত্তি লওয়ান মাত্র। নতুবা লোকে আমাকে বিশ্বাস করিবে কেন? আমি যখন এখানে আসিয়া প্রথমে উপস্থিত হইলাম, তখন কেহই আমার কথা বিশ্বাস করে না দেখিয়া আমি এই ষড়যন্ত্র করিলাম। তাহার ফলে ক্রমে সকলেই আমাকে বিশ্বাস করিয়াছিল। প্রথমে আমি এই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া সকলের অজ্ঞাতে একটী গর্ত্ত প্রস্তুত করি, ও ছোলার দ্বারা ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তাহার উপর এই কাষ্ঠফলক রাখি। পরে উহার উপর এই শিবমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিই; এবং প্রায় ১০ হস্ত দূরে এরূপভাবে একটী পথ রাখিয়া দেই যে, সেই স্থানে জল দিলে উহা ক্রমে সেই ছোলার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। পরে যখন সেই স্থানের মৃত্তিকা সমান হইয়া অন্য জমির মতন হয় ও উহার উপর তৃণাদি জন্মায়, সেই সময় আমি প্রচার করি যে, এই স্থানে মহাদেব মূর্ত্তি উত্থিত হইবে। তখন আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই স্থানে ক্রমে লোকে লোকারণ্য হইতে আরম্ভ হয় এবং আমিও সেই সময়ে ঐ স্থানে জল দিতে আরম্ভ করি। ঐ জল ক্রমে যাইয়া ছোলায় পড়িতে আরম্ভ করে, ও ক্রমে ছোলা ফুলিতে আরম্ভ হইয়া শিবমূর্ত্তি সহিত সেই তক্তা-ফলককে ক্রমে উপরে ঠেলিতে থাকে। সুতরাং ঐ স্থানের মাটি ফাটিয়া শিবমূর্ত্তি উত্থিত হয়। আর, তখন সকলেই আমার ভবিষ্যৎ কথাতে বিশ্বাস করিয়া ক্রমে আমাকে যথেষ্ট ভক্তি দেখাইতে আরম্ভ করে এবং আমিও শিবপূজায় নিযুক্ত হই। এমন সময় তুমি আসিয়া আমার সকল নষ্ট করিয়া দিলে। আমার এ উপায়ের সকল আশা শেষ হইল।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী ক্ষণকালের জন্য নীরব হইলেন।

সাঁওতাল পরগণা।

সাঁওতালদিগের ভাষা।

সাঁওতাল-ভাষা একটী অনার্য্য ভাষা; সংস্কৃতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। তবে কোন কোন কথা সংস্কৃত শব্দের ন্যায় যদিও বোধ হয়, তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সাঁওতালদিগের ও আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন কালে এক ভাষাই ছিল। এমনও হইতে পারে যে, সাঁওতালগণ ভারতবর্ষে বসতি করার পর আর্যগণের নিকট হইতে কোন কোন কথা শিক্ষা করিয়াছে। কোন জাতির আদিম অবস্থায় ভাষা কি ছিল, জানিতে গেলে, লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও অপরাপর গার্হস্থ বস্তুর নামের শব্দ দেখিলে অনেক জানিতে পারা যায়। এবং এইরূপে দুইটা জাতির ভাষা এক কিম্বা পৃথক বুঝা গিয়া থাকে। যে জাতি যত উন্নত হয়, তাহাদের ভাষাও সেই মত উন্নতি লাভ করে; ভিন্ন ভিন্ন জাতির কথাও তাহাদের ভাষায় প্রবেশ করিতে দেখা যায়। জগৎ যত উন্নতি-পদে উঠিতেছে, যত এক জাতির ভাষা অপর জাতির ভাষায় প্রবেশ করিতেছে, ততই জাতি ও ভাষা নির্ণয়ের সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে। লোকের আদিম অবস্থায় সংযুক্ত বর্ণ-যুক্ত শব্দ অতি বিরল। অসংযুক্ত শব্দ উচ্চারণ যত সহজ, সংযুক্ত তেমন নহে। বালকে "মা,বা,লা, মা-মা," ইত্যাদি শব্দ প্রথমে উচ্চারণ করিতে শিখে। পরে যত বয়োবৃদ্ধি হয়, তত সংযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করিতে শিখে। জাতির ভাষা সম্বন্ধেও এই সাদৃশ্য প্রয়োগ করা যায়। জাতি সর্ব্বাগ্রে আপনাপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির নামকরণ করে, এবং সেই সকল শব্দ প্রায়ই একাক্ষরে না হয় দ্ব্যক্ষরে হইয়া থাকে। ভাষা সৃষ্টি হইবার ও সভ্যতার আলোক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, মনুষ্য যখন স্বভাবাবস্থায় থাকে, তখন তাহারা যেরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত

করে, সেই শব্দগুলিই তাহাদের ভাষার 'প্রসূতি স্বরূপ।' সাঁওতালেরা প্রথমে যে অবস্থায় ছিল, সহস্র বর্ষ অতীত হইল তাহাদের ভাষায় যে অনেক নূতন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নামগুলি প্রায় সমস্তই এখনও একাক্ষরে অথবা দ্ব্যক্ষরে আছে দৃষ্ট হয়; যথা,

সাঁওতালী তি = হাত
কোড়াম্ = বক্ষ
লায়্ = উদর
জংগা = পদ (সংস্কৃত জঙ্ঘা।)
কাটুপ্ ঃ = অঙ্গুলি
মোচা = মুখ
গোচো = গোঁফদাড়ি
বহ্ = মস্তক
আ = ধনু
সা = তীর
উপ ঃ = চুল ইত্যাদি।

সাঁওতালদিগের ভাষার আদিম অবস্থার আরও এই চিহ্ন আছে যে, কতকগুলি বর্ণ শব্দের শেষে আসাতে সম্পূর্ণ উচ্চারিত না হইয়া কেবলমাত্র অর্দ্ধোচ্চারিত হইয়া থাকে; যথা, কাটুপ্ ঃ এখানে প-বর্ণের উচ্চারণ একেবারেই শ্রুতিগোচর হয় না, কেবল আস্তে আস্তে কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া ওষ্ঠে আসিয়াই বিলীন হইয়া যায়। ঐরূপ ত, ট, প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ আছে, তাহাদের উচ্চারণও অর্দ্ধ মাত্রায় হয়। এই সকল অর্দ্ধোচ্চারিত বর্ণ উচ্চারণ করা নব-শিক্ষাকারীগণের পক্ষে সহজ নহে। আসাম-প্রদেশে, স-এর উচ্চারণও ঐরূপ অর্দ্ধোচ্চারিত হয়। সাঁওতালগণের কোন লিখিত বর্ণ বা অঙ্ক-বিন্যাস এতাবৎ কাল ছিল না; প্রায় ১২।১৪ বৎসর হইল, খৃষ্টান মিসনারীগণ গিয়া সাঁওতালী ভাষার লিখিত বর্ণের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সাঁওতালী পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতেছেন। বর্ণগুলি সমস্তই রোমান্ বর্ণাকারে করা হইয়াছে। কিন্তু ত, থ, দ, ড়, ও অর্দ্ধোচ্চোরিত শব্দ প্রভৃতি যাহা রোমান বর্ণে লিখা যায় না, তাহা লিখার জন্য ঐ রোমান্ বর্ণের কাহারও উপর রেফ্ চিহ্ন, কাহারও তলে ফুটকি বা নোক্তা দিয়া একপ্রকার জঙ্গলা বর্ণের উৎপাদন করিয়াছেন। এবং মিসনরীগণও আপন-আপন ইচ্ছামত সাঁওতালী শব্দ বানান করিয়া লিখিতেছেন। ভাষার ঐ শেষোক্ত দুর্দ্দশা অদ্যাপিও আসামে চলিতেছে। সাঁওতালী ভাষার বর্ণবিন্যাস, বাঙ্গালা অক্ষর, কায়েথি নাগরী, দেবনাগরী, উড়িয়া প্রভৃতি বর্ণে পরিবৃত থাকা স্বত্বেও রোমান্ অক্ষরে হওয়া আমরা কখন যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না। ভবিষ্যৎ কালে সাঁওতালগণ ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিলে, বাঙ্গালা ও হিন্দিভাষীদিগের সহিত যে তাহারা সদ্ভাবে থাকিবে, তাহাও বিষম সন্দেহ স্থল। দুই জাতির মধ্যে সমব্যথার অভাব হওয়ার মূল কারণ, ধর্ম্ম ও ভাষার পার্থক্য। কালের কুটীল গতিতে সাঁওতাল-ধর্ম্ম নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিবে, তাহাদের ভাষাও স্বভাবতঃ বাঙ্গালী, উড়িয়া ও হিন্দুস্থানিগণের হইতে পৃথক, এমন স্থলে তাহাদের অক্ষর ভারত-ছাড়া হইলে কেনই বা তাহারা পরে আপনাদিগকে অন্যান্য হইতে পৃথক মনে না করিবে? যদি এই সময় হইতে সাঁওতালগণের লিখিত বর্ণকে বাঙ্গালা অথবা কায়েথি বর্ণের যতদূর পারা যায় অনুরূপ করিয়া রাখা যায়, তবে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী, সাঁওতাল ও হিন্দীভাষীগণের পরস্পরের মধ্যে অনেকাংশে বন্ধুত্ব সংস্থাপনের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা হয়। সাঁওতাল পরগণার চতুঃপার্শ্বস্থ ভিন্ন ভিন্ন লিখিত বর্ণের কোনটী অবলম্বন করিয়া সাঁওতাল ভাষার অক্ষর গঠিত করা উচিত। যদিও এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক উঠি- পারে, কিন্তু সে সমস্ত তর্ক কোনরূ বিশেষ

বলবান তর্ক নহে। ভবিষ্যতের গুরুতর সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সাঁওতাল-বর্ণাক্ষরের গঠন করা উচিত। আজিকালি বেহার হইতে আসাম পর্য্যন্ত এবং সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলের পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা সমাদৃত হইয়া থাকে। কারণ, এই ভাষাতে অনেকবিধ গ্রন্থ দিন দিন প্রকাশিত হইয়া বিদ্যার দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে; এবং সেই জন্য বাঙ্গালা ভাষাও দিন দিন পরিষ্কার, প্রাঞ্জল, ও উন্নত হইতেছে। এমন অবস্থায় বাঙ্গলা অক্ষর দিয়াই সাঁওতাল অক্ষর অধিকাংশ গঠন করাই আমরা উচিত বোধ করি। বিশেষতঃ যেমন পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গলা ভাষার ভিত্তিতে অনেক সাঁওতালী কথা আছে এবং তাহাদের কোন কোন কথার যেমন সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ আছে, এই উভয় কারণে সাঁওতালগণের অক্ষর বাঙ্গালার সঙ্গে মিলাইলে যত তাহাদিগের উন্নতির পক্ষে উপকারে লাগিবে, এমন বোধ হয় অন্য কোন ভাষার অক্ষরের সহিত সমান রাখিলে উপকারে লাগিবে না। বাঙ্গালা ভাষা হইতে যত তাহারা উন্নতি আশা করিবে, হিন্দী কিম্বা উড়িয়া ভাষা হইতে তাহারা কখনই ততদূর উন্নতি করিতে পরিবে না ইহা নিশ্চয় কথা। যদি বাঙ্গালা অক্ষরে সাওতালী সকল শব্দের উচ্চারণ করা না যায়, তবে আসামে যেরূপ ৰ, ৱ, ইত্যাদি চিহ্ন দিয়া বাঙ্গালা অক্ষর ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ কোন কোন চিহ্ন যোগ দিয়া অথবা অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়াও, সাঁওতালী বর্ণমালা করা যাইতে পারে। এইরূপ কথা বলিবার আমাদিগের উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে সাঁওতালগণ ভবিষ্যতে হিন্দুগণের সহিত একমিল হইয়া থাকে ও যাহাতে জাতীয় বিদ্বেষ অথবা অবজ্ঞা উভয়ের মধ্যে না জন্মে, তাহারই জন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান লওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে সাঁওতালগণ, হিন্দু ও মুসলমানগণকে 'অবজ্ঞাসূচক দিকো' বলিয়া অভিহিত করে। 'দিকো' অর্থ কতকাংশে উৎপীড়ক বুঝায়। বাঙ্গালা "ডাকু" শব্দের সহিতও ঐ কথার সাদৃশ্য টানিয়া লওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানগণকে "দিকো" আখ্যা দিবার কারণ বোধ হয় এই হইতে পারে যে, প্রথমে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ও পরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ইহারা বাঙ্গালা হইতে নিরাকৃত, বিধ্বস্ত ও অনেক প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছিল। সেই আক্রোশ ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। যদিও এখনকার সাঁওতালগণ হিন্দুগণের প্রতি বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু "দিকো" কথাটী তাহারা ভুলিতে পারে নাই। ইংরাজদিগকে তাহারা "দিকো" কহে না। এরূপে জাতীয় ঘৃণা-স্বত্বে যদি সাঁওতালগণকে এখন হইতে ভাষা শিক্ষায় ও ধর্ম্মে পৃথক থাকিতে শিখান যায়, তবে সাঁওতালগণ হাজার সভ্য হইলেও ক্রমে কতকাংশে তাহাদের হৃদয়ে সদ্ভাব বিলুপ্ত হইয়া "দিকোর" ভাবই বদ্ধমূল হইবে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অবিবেচকগণের মধ্যে ভাষার পার্থক্য-জ্ঞান, জাতীয় বিদ্বেষের এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রমাণ আসামের ও বেহারের কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল লোক আপনাদিগের পূর্ব্বাবস্থা না দেখিয়া, কেবল বর্ত্তমানের সংসর্গ-গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া ও মূঢ় লোকের পরামর্শে ভিজিয়া, আপনাদিগের জাতীয়ত্ব বিনাশ করিতে বসিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে?

চিতানল।

অমাবশ্যার ঘন অন্ধকার-রাশি অপসারিত করিয়া, শ্মশানের ভৈরব-মূর্ত্তিকে আরও ভীষণতর করিয়া, একটি চিতা জ্বলিতেছে। চিতানল কোমল কমনীয় মূর্ত্তি, স্নেহসরলতাপূর্ণ হাসিমুখ কোন শিশু সন্তানকে দগ্ধ করিতেছে, অগ্নিজিহ্বাসকল সমীর-সন্তাড়িত হইয়া কখন বা সেই অপূর্ব্ব সোণার ছবিখানিকে গলা জড়াইয়া ধরিতেছে, কখন বা চাঁদমুখের আধ-হাসির উপর গড়াইয়া পড়িয়া অধরপ্রান্তে মিশিয়া যাইতেছে, কখন বা সুবিন্যস্ত কেশগুচ্ছ সকলের ভিতর দিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া মস্তক পরিবেষ্টন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু দেখিতে দেখিতে বহ্নি-সংস্পর্শে প্রফুল্লরাজীবৎ মুখখানির হাসির ভাব কোথায় লুকাইয়া পড়িল, সোণার বরণে কালি পড়িল, যাহা দেখিয়া মহাশ্মশানের ভীষণতা ভুলিয়াছিলাম, তাহা যেন কোথায় গেল; সেই মোহ, সেই ভ্রান্তি ঘুচিয়া গেল। তখন বুঝিলাম, আমি মেদমজ্জা-মাংসাস্থির দহনজনিত দুর্গন্ধ পাইতেছি ও চট্‌পটা শব্দ শুনিতেছি; চিতাশন সমুত্থিত অগ্নিজিহ্বা দ্বারায় চতুর্দ্দিক নীলিমাময় অস্ফুটালোকে আলোকিত। আবার দেখিলাম, ঐ কিঞ্চিৎ দূরে আলুলায়িত কেশা বিবর্ণা উন্মাদিনী পুত্রহীনা মাতা আর্ত্তনাদে আকাশমণ্ডলকে যেন বিদীর্ণ করিতেছেন; দেখিলাম, বালকের পিতা অস্ফুট অব্যক্ত রোদনে নেত্রনীরে ভূমিতল অভিসিঞ্চিত করিছেন; অপরদিকে শিবাগণ বিকটরবে, সকলের মনে ভীতি উৎপাদন করিয়া চিতাসজ্জাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কোথায় গেল সেই খল খল হাসি, সেই ঠোঁটফুলান অভিমানের রাঙা মুখখানি, সেই গোল গোল সদাচঞ্চল ছোট ছোট হস্ত দুখানি, সেই দুষ্টামীপূর্ণ চতুরতা মাখান ঘুরান ঘুরান ছলছলে চোখ দুটি, সেই কোমল কষিতকাঞ্চনবৎ অপূর্ব্ব রূপরাশি?—এই যে এখনি দেখিলাম, কোথায় গেল? কে বলিবে, কোথায় গেল?

তখন সংসারের দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেই একদিনের মধুর সুখময় সংসার এখন বিষময় ভীষণ বিভীষিকাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। যাহার স্মিতমুখ দেখিয়া, যাহার অস্ফুট আধ আধ কথায়, যাহার সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণে, একদিন হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিত, এখন তাহাই স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া উত্তপ্ত লৌহশলাকারূপে হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল। স্বীয় জীবন ভারাক্রান্ত ও আত্মীয়-স্বজনের প্রবোধ-বাক্য হলাহলপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। শোকে মোহে অধীর হইলাম, উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ফিরিতে লাগিলাম। কোথায় যাইলে মন প্রাণ শান্ত হইবে, তাহাই খুঁজিতে লাগিলাম। কোন্ দুর্গম স্থানে যাইলে তাহাকে দেখিতে পাইব—একবার মাত্র দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিব, একবার মাত্র বুকে লইয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব, তাহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়! এজগতে ত কুত্রাপি তাহা পাইলাম না।

ক্রমে পলায়ন করিয়া যেমন সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, কি জানি কোন্ মহামায়ার মহাশক্তিপ্রভাবে আমি একটু একটু করিয়া মনে বল পাইতে লাগিলাম। ক্রমে সেই উৎক্ষিপ্ত মনকে স্ববশে আনিতে প্রবৃত্তি হইল। গতাসু শিশুর কথাবার্ত্তা, চিন্তা ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুই বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহা পারিলাম না! একটু রন্ধ্র পাইলেই, দেখি, উঁকি মারিতেছে। একটু নিশ্চিন্ত হইলেই, দেখি, বাঁধ ভাঙ্গিয়া সেই ভীষণ চিন্তাতরঙ্গ মনোরাজ্যকে উৎপ্লাবিত করিতেছে।

তখন অধীতঃ শাস্ত্র-বিদ্যার স্মরণ লইলাম। ভাবিলাম, এ জগৎ কি? আমিই বা কে? আমার সহিত এ জগতের কি এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, যাহা আমি অবগত নহি? কে আমায় যন্ত্র-নির্ম্মিত ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় নাচাইতেছে, হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে! কে এই জগৎ সংসারকে একবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে; আবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে? এ বিষম প্রহেলিকা ভেদ করিয়া কে আমায় যথার্থ তত্ত্ব বলিয়া দিবে?

তত্ত্বজিজ্ঞাসাসু হইয়া তখন আর্য্যশাস্ত্রের শরণ লইলাম। উপনিষদ দেখিলাম, নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেবমে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্চোকস্য পারং তারয়ত্বিতি।" উপদেশকালীন সনৎকুমার একস্থানে বলিতেছেন,—"স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বাস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ পিতৃহা বৈত্বমসি মাতৃহা বৈত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈত্বমসি স্বসৃহা বৈত্বমস্যাচার্য্যহা বৈত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈত্বমসি। অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতিসন্দহেৎ নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাসীতি ন মাতৃহাসীতি ন ভ্রাতৃহাসিতি ন স্বসৃহাসীতি নাচার্য্যহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসিতি।" এইরূপে বহু দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের দ্বারা বেদান্ত প্রতিপাদন করিলেন যে, এই জগৎ মায়ামাত্র, বাস্তবিক কোন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। ইহা নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মার বিবর্ত্তন মাত্র। সেই আত্মাছাড়া ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, অথবা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেবল নামমাত্র,—"বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেবসত্যেম্।" তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রে
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্যান্নাম রূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

এই পাঞ্চভৌতিক দেহেরই বিনাশ অথবা অবস্থান্তর সম্ভব। কিন্তু দেহীর কখনও বিনাশ বা অবস্থান্তর নাই,—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা নভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

এই দেহী কাহারও পিতা বা পুত্র, ভ্রাতা বা বন্ধু, মাতা বা স্ত্রী, বা ভর্ত্তা নহেন। বাস্তবিক-পক্ষে ও-কথাগুলি কেবল বাগাড়ম্বর, সাংসারিক নামমাত্র। তবে কাহার জন্যই বা মিথ্যা রোদন, শোকতাপ করিয়া ঘোর মোহজালে আবদ্ধ হই? কেনই বা রোদন করি, বুঝিয়াও বুঝি না! কেই বা রোদন করায়? মানবহৃদয়ে শোকতাপজনিত ক্ষতির প্রথমাবস্থায়—রক্তস্রাবকালীন মনুষ্য যখন তাহার জ্বালায় অস্থির হয়, পাগল হইয়া উঠে—তখন তাহার গতিরোধ করে এমন কিছুই নাই; তখন বন্ধুবর্গের প্রবোধ-বাক্য যেন "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে" বলিয়া বোধ হয়। পরে কালের সম্মোহিনী গতির দ্বারা তাহা যখন কতকটা শুষ্ক হইয়া আসে, তখনই আমরা শাস্ত্র ও বিচার প্রক্ষেপ দ্বারা ক্ষতস্থানকে শীঘ্র শুখাইতে পারি

মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম; স্বপ্নে দেখি, আবার সেই শিশু মূর্ত্তি। যেন আমার দিকে খল খল করিয়া হাসিয়া বলিতেছে:—

"তুলসী যব্ তুমি জগ্ মে আএয়ো জগ হসে তুম্ রোয়।
অযস্ন কর্মি কর্ চলো তুম্ হসো জগ্ রোয়॥"

সহসা আবার সে মূর্ত্তি অপসৃত হইল। তখন দেখিলাম, নবনীরদনিন্দিতকান্তি, মণিমণ্ডিত বঙ্কিম-চূড়া, সুদর্শন-চক্রধারী এক দিব্যমূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্মিতমুখে বলিতেছেন,—

"দেবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।
নমাং দুষ্কৃতি নো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"

সসম্ভ্রমে যেমন প্রণাম করিতে যাইলাম, অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন,—

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈপ্রসন্না ভুবিমুক্তিহেতুঃ॥"

বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তখন দেখিলাম, এই আপাতঃ রমণীয় সংসার-ক্ষেত্র, সৃষ্টিকর্ত্তার সুন্দর শিল্পকার্য্য এই জগৎ, একটী সুবৃহৎ চিতাকুণ্ড মাত্র। অর্জ্জুন একদিন এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছিলেন,—

"লেলিহ্যসে গ্রাসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।"

কে ঐ স্তরে স্তরে মনপ্রাণ মাতান ভুবন ভুলান রমণীয় কমণীয় এত ঐশ্বর্য্যরাশি আমার চতুর্দ্দিকে সৃষ্টি করিয়া রাখিল! আবার দেখিতে দেখিতে কেই বা এক-একটী করিয়া তাহার সমস্তগুলিকে কি জানি কোথায়, আমার দৃষ্টিপথের অগম্য দেশে লইয়া গেল! সহসা কে যেন বলিতেছে, শুনিতে পাইলাম—

অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং
নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে চ তদত্তিভূয়ঃ॥"

ওলাউঠা।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভেদবমি রোগে হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা ভাল, ইহা সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রায় প্রতিঘরেই এক একটি "কলেরা-ক্যাম্ফার" (হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রুবিণী সাহেবের প্রস্তুত প্রণালী অনুযায়ী) আছে। কিন্তু বাস্তবিক ইহার প্রয়োগ প্রণালী অনেকে জানেন না। সেই জন্য অনেক সময়ে উপকার না হইয়া অপকার হইয়া থাকে। এই ভয়ানক পীড়ার নামেই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়—গৃহস্থ অস্থির হইয়া পড়েন; সুতরাং সে সময়ে ইতিকর্ত্তব্যতা বোধ থাকে না। কখন বা এই পীড়াকে প্রথমতঃ বুঝিতে না পারিয়া উপেক্ষা বশতঃ প্রবল অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। আমরা এই বিষয়ে বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের অভিমত সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণের উপকারার্থ সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রবন্ধটী প্রকটিত করিলাম।

প্রথম কথা।—এই পীড়াটি যখন প্রবলাকার ধারণ করে, তখন তাহাকে সকলে ওলাউঠা আখ্যা দেন। পাতলা বাহ্যে হইতে থাকিলে "বদহজম" হইয়াছে বলিয়া উপেক্ষা করা হয়। কেবল তাহা করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, "গরম" হইয়াছে বলিয়া স্নান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা যতগুলি রোগী চিকিৎসার্থ আহুত হই, প্রায় অর্দ্ধেক রোগী স্নান করিয়াছে এইরূপ পরিচয় পাই। ইহাতেই প্রায় এই সকল রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। পেটের অসুখ হইলে স্নান নিষেধ, একথা আমাদের অনেকেই জানেন না।

দ্বিতীয় কথা।—"প্রস্রাব হইতেছে," উহা ভেদবমি রোগ নহে। সুতরাং প্রস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ চেষ্টা বা ঔষধাদি প্রয়োগ করা হয় না। পীড়ার সম্পূর্ণ বিকারাবস্থায় প্রস্রাব উৎপন্ন হয় না, তখন গৃহস্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং চিকিৎসা ও চিকিৎসকের জন্য বিলম্ব হইয়া পড়ে, কাজে-কাজেই সুফল ফলে না। যতক্ষণ মূত্রস্থলীতে প্রস্রাব থাকে ততক্ষণ হইয়া থাকে, পরে আর প্রস্রাব হয় না। আমরা এরূপ পরিচয় পাইয়াছি যে, প্রথম ১১বার পর্য্যন্ত প্রস্রাব হইয়াছে, পরে ক্রমেই পীড়া ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে।

তৃতীয় কথা।—"কেবল ভেদ হইতেছে, বমি হয় নাই" উহা ওলাউঠা নহে, ভয় নাই। তা'র পরেই রোগীর যখন অবসন্নাবস্থা উপস্থিত তখন গৃহস্থ বা আত্মীয়-স্বজনের চৈতন্য হয়। আমরা জানি যে, ভেদবমন প্রধান ওলাউঠা অপেক্ষা, কেবল ভেদ-প্রধান

ওলাউঠার সংঘাতিকতা অধিক। তবে কোথা হইতে যে এই সংস্কার প্রচলিত, বলিতে পারি না। আবার বান্ত-পদার্থ (বমিত) যদি খাদ্য দ্রব্য সংযুক্ত হয়, তবে উহা কিছু নহে, এ ধারণাও অনেকের আছে। প্রথম বমনে ভাত বা পাকস্থলিস্থ দ্রব্য উঠিবে না তো কি উঠিবে? এই সকল কুসংস্কার জন্য অনেক সময়ে পীড়া দুরারোগ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।

এই প্রবন্ধ দ্বারা চিকিৎসক-মণ্ডলীকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে না, ইহা যেন পাঠকবর্গের স্মরণ থাকে। সংক্ষেপতঃ গৃহস্থ গণকে সতর্ক করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্পূরের আরক।—ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; রোগের প্রথমাবস্থার প্রয়োগ করিতে হয়, ইহা ডাক্তারি পুস্তকে লেখা আছে। কিন্তু পীড়ার পূর্ব্বরূপ কয়জন বুঝিতে পারেন? যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী বেশ সজোর থাকে, শরীর হিম, শীত করা, অস্থিরতা, উদ্বেগ, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, ভেদ, বমন ও খালধরা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ ইহা ব্যবহার করা যায়। নাড়ী দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ হইলে আর এই ঔষধে উপকার হয় না।

যদি চোয়াল ধরিয়া যায়, তবে ক্যাম্ফার শুঁকাইতে হয়। ডাক্তার সাল্জার বলেন, কর্পূরের আরক অপেক্ষা চূর্ণেতে বেশ কাজ করে। আরক ৫।৬ বার সেবন করাইলে সেই সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধড্রাম মদ্য সেবন করান হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় উহার ব্যবহার উপকারক কি না উহা বড়ই সন্দেহজনক। বিশেষতঃ কর্পূরের আরক সেবনের জন্য গলা জ্বালা করে না। কর্পূর চূর্ণ জলে গলিয়া যায়, ভাসে না, ইহাও আর একটি সুবিধা। কিন্তু চূর্ণ বেশ সুচূর্ণ হওয়া আবশ্যক, যেহেতু সুরাতে কর্পূরের পরমাণু বিশেষ বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হয়।

ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে আর এক কথা।—যদি বমন অধিক হইতে থাকে, তবে উহাতে বড়ই অসুবিধা হয়। এজন্য একটু চিনির জলে (Sugar-water) উহা দিলে জমিয়া যায় না, অথচ বেশ উপকার হয়, বমি হয় না। চিনি খুব পরিষ্কার হওয়া চাই। পল্লীগ্রামে গুড়ে বাতাসায় কর্পূরের আরক দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহাতে উপকার না হইয়া অপকার হইবার কথা। কর্পূরের আরকে একেবারে ৫। ৬ মাত্রার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। যখন সেবন করাইতে হইবে, তখনই প্রস্তুত করা ভাল; যে হেতু কর্পূর বড়ই উদ্বায়ু (Volatile)। দুগ্ধ-শর্করাতে প্রস্তুত করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেও বিশেষ সুবিধা হয়।

এই রোগ হইলে গৃহস্থ ও চিকিৎসকের সাবধানতা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কথা সময়ান্তরে লিখিত হইবে।

মানুষ ভাবে কেন?

সংসারে মনুষ্যমাত্রেই কোন না কোন কার্য্য লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত। যেরূপ কার্য্যই হউক না কেন, করিবার পূর্ব্বে, সকলেই একবার সেই কার্য্য সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখে;—কি উপায়ে কার্য্য করিবে, কোন্ উপায়ে কার্য্য করিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ফলের তারতম্য কিরূপ হইবে, কার্য্য-সাধন পক্ষে বাধা-বিপত্তি নিবারণের উপায় কি, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে সকলেই ভাবিয়া থাকে। আমিও ভাবি, কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি ভাব কেন?" অনেকবার লোকের এ প্রশ্নে কি উত্তর দিব ভাবিয়াছি; কিন্তু কোন উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই, আমার ভাবনার শেষ হয় নাই। জানি না, ভাবনার শেষ আছে কি না?

কেন ভাবি, জানি না। কিন্তু প্রত্যহই অধিকাংশ সময় ভাবনায় কাটিয়া যায়। ভাবিব না

বলিয়া স্থির করিলেও, ভাবনা যে কোথা হইতে আসিয়া জুটে তাহা বলিতে পারিনা। অথবা তাহাতে কোন বাধাও দিতে পারিনা। কোন একটা ভাবনা উপস্থিত হইলেই একে একে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাবনা আসিয়া জুটে;—একে একে যশ, মান, ধন, অর্থ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বিপদ, সম্পদ, ঈশ্বর-তত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি কত বিষয়েরই ভাবনা যে জুটে, তাহা বলিতে পারি না। শূন্য-মনা কেহ হইতে পারে কি না, সন্দেহ! যে অবস্থাকে শূন্যমন বলিয়া থাকে, তাহা হয়ত একটা গভীর চিন্তার অবস্থা অথবা কোন একটা সামান্য চিন্তায় মন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

যাহাহউক, ভাবিতে আরম্ভ করিলে অনেক বিষয়েই ভাবিয়া থাকি বটে, কিন্তু কখন কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ। সম্পূর্ণ মীমাংসা বোধ হয় করি নাই; কিন্তু অনেক বিষয়েরই একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহা হয় নাই। যত কার্য্য করিয়াছি, তাহার একটাও এপর্য্যন্ত সিদ্ধান্তের সহিত মিলে নাই। সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় বরাবরই ভাবিয়াছি যে, ইহাই যথার্থ সিদ্ধান্ত; একার্য্যের এতদ্ভিন্ন অপর ফল অসম্ভব বা এ কার্য্যের এইই উপায়। কিন্তু পরিশেষে নিরাশ হইতে হইয়াছে, কি হইল ভাবিয়া আবার ভাবনা-সাগরে ঝাঁপ দিতে হইয়াছে। এইরূপ এক ভাবনা হইতে অন্য ভাবনায় পড়িয়া যে কতবার হাবুডুবু খাইয়াছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! অবশেষে ভাবিয়াছি যে, যতই ভাবি না কেন, ভাবিয়া কখন কুলাইতে পারিব না; আর বোধ হয় যে, এক ভাবনা ভিন্ন জগতে আমার অন্য কাজ নাই। ভাবিতে জন্মিয়াছি, বুঝি ভাবিয়াই জীবন কাটিবে!

যখন দেখিলাম যে, কোন মতেই সিদ্ধান্তের সহিত কার্য্যের ফল মিলাইতে পারি না, তখন ভাবিলাম যে, হয়ত ভাবিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমার নাই। আর, যদি তাহাই না থাকে, তবে আমি মিছামিছি এত ভাবি কেন? যাহা হইবার তাহা আপনিই হইতেছে, আপনিই হইয়া যাউক; আমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল ভাবনায় কোন কার্য্য হয় না, সে ভাবনায় ফল কি? হইতে পারে, এই সকল ভাবনা হইতে মানুষের মন ভাবিতে শিখে এবং ক্রমশঃ ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের বিচার-শক্তির স্ফূর্ত্তি ও দৃষ্টিশক্তি সর্ব্বদেশ-দর্শিনী হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ কাহারও ভাগ্যে কখন ঘটিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। বিচার-শক্তির স্ফূর্ত্তি ও সর্ব্বদেশদর্শিনী দৃষ্টিশক্তির আবশ্যক, কার্য্যফল ও কার্য্যে ফলোপধারকতা স্থির করিবার জন্য। কিন্তু এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত কার্য্য হইয়াছে ও বর্ত্তমানে প্রত্যেক মানবে যে যে কার্য্য করিতেছে, তৎসমুদয় আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কাহারও ইচ্ছানুরূপ কার্য্য কখন সাধিত হয় নাই। অতএব যদি কোথাও পূর্ণ-বিচারশক্তি ও সর্ব্বদেশ-দর্শিনী দৃষ্টি শক্তি না দেখা যায়, তবে এসকল ভাবনার কার্য্য-কারিতা-কি? নেপোলিয়ন, মিল, কোম্‌ত, কপিল, গৌতম, নিউটন, ভাস্করাচার্য্য, সেক্ষপীর, কালিদাস, প্রভৃতি লোকে সাধারণের অপেক্ষা অনেকটা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন বটে; কিন্তু কাহারও আশার অর্দ্ধেক ফল ফলিয়াছে কিনা সন্দেহ! আর যদি মানবের মধ্যে পূর্ণ বিচার-শক্তির এবং সর্ব্বদেশ-দর্শিনী দৃষ্টিশক্তির চিরকালই অভাব থাকিবে এরূপ হয়, তবে লোকে এত ভাবে কি জন্য? আমিই বা ভাবি কেন? আরও একটা কথা,—যে ভাবনায় কোন ফল হয় না, সে ভাবনাই বা আসে কোথা হইতে? যাহাতে বস্তুতঃ কোন উপকার নাই সেরূপ বিষয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমার ঘাড়ে চাপাইল কে? অপর কেহ

চাপাইয়া দিয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কারণ একা আমি নহি, মানুষমাত্রেই ত এইরূপ ভাবনার জ্বালায় অস্থির! অবশেষে ঠিক্ করিলাম, যে, হয়ত আমি নিজেই অতর্কিত ভাবে এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, যদি তাহাই হয়,—আমার ক্ষমতাতেই মনোমধ্যে এত ভাবনার জন্ম হয়, তবে আমারই শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কণামাত্র আমি দূর করিতে পারি না কেন? আবার ভাবিলাম, হয়ত আমার সংগ্রহের ক্ষমতা আছে, পরিত্যাগের ক্ষমতা নাই। যদি ইহাই হয়, তবে এমন এক সময় ছিল যে, যখন আমি ভাবনাশূন্য ছিলাম। কিন্তু সে কবে? জীবনের অতীত দিনগুলি খুঁজিলাম, কিন্তু কখন যে সে সুখময় সময়টি ছিল, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম যে, যখন জ্ঞান হয় নাই, আত্মবোধ ছিল না, তুমি আমি ভিন্ন ভাবিতাম না, তখনই সে সুখের অবস্থা ছিল। লোকেও বলে, বালকের ভাবনা নাই, আপনার মনে খাইয়া খেলিয়া-বেড়ায়; কিন্তু তাহাহইলে, এত ভাবনা আসিয়া জুটে কোথা হইতে? "না ভাবো বিদ্যতে সতঃ না সতো বিদ্যতে ভাবঃ।" যেখানে চিন্তার বীজ নাই, সেখানে এত চিন্তা জন্মে কোথা হইতে? বালকের মনও চিন্তাশূন্য হইতে পারে না। কারণ, তাহাদের রোদনই তাহাদের চিন্তার সাক্ষী। হইতে পারে, এখনকার মত যশমানও ধনাদির চিন্তা বাল্যকালে থাকে না; কিন্তু খেলাধূলা (যথার্থ-পক্ষে কার্য্যানুষ্ঠান) ও ক্ষুন্নিদ্রাক্লেশাদি-জনিত ভাবনাও যে থাকে না ইহা কোন কথাই নহে; কারণ, তাহাহইলে বালকে কাঁদিত না। যদি স্বীয় অভাবের আত্যন্তিক উপলব্ধির নামই ভাবনা হয়, তবে বালকের ক্রন্দন ভাবনা জন্য নহে কেন? যে কোন বিষয়েরই ভাবনা হউক না কেন, তাহা কোন না কোন প্রকার অভাব হইতে উৎপন্ন।

তাহার পর, সকলেই ভাবে যে তাহার নিজের অভাব অপরের অভাবের অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তাহার ভাবনাও অপরের অপেক্ষা অধিক। আমিও সেইরূপ ভাবিয়া থাকি। সুতরাং আমার ভাবনারও শেষ নাই। যাহাহউক, এরূপ মিছামিছি ভাবি কেন? এ ভাবনা আসে কেন? বুঝিতে পারি না, এ রহস্যের মীমাংসা কোথায়?

শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও পারিবারিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত মানুষের অভাবের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এখন যদি ভাবনার কারণ খুঁজিতে হয়, তাহাহইলে দেখিতে পওয়া যাইতেছে যে, যদ্দারা মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাতেই ভাবনার জন্ম হয় বলিতে হইবে। কারণ, অভাব হইতেই ভাবনার উৎপত্তি।

ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে মানুষের সকল প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই মানবের মনে ভাবনার জন্ম হয়। যদি তর্ক পক্ষে ইহা স্বীকার না করা যায় তবে অনুসন্ধানে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, কার্য্য লইয়াই সংসার; আর সকল লোকেই কার্য্য করিবে, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। তাহার পর ঈশ্বরের নিয়ম-বশে যে কার্য্যই কর না কেন তাহার একটা ফল পাওয়া যায়। এই কার্য্যফলানুসারে মানুষের অবস্থার তারতম্য হইয়া থাকে। অবস্থার পরিবর্ত্তনানুযায়ী তাহার অভাবেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয় ও যে পরিমাণে অবস্থার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে ভাবনার গুরুত্ব বা লঘুত্ব জন্মে। অভাবের প্রতিকারার্থ সকলকেই ভাবিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন মানুষই, এমন কি কোন জীবই ভাবনা হইতে নিস্তার পায় না, আশা এবং অভাব জীবের নিত্য সঙ্গী। সুতরাং ভাবনাও নিত্য সহচরী।

কার্য্য করাই যখন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন

স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের কার্য্যের মূলেও ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রীড়া করিয়া থাকে। কারণ, যদি তাহা না হয় তবে মানুষ সকল সময়ে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে না কেন? তাহার পর ইহাও বুঝা যায় যে, মানুষ যতদিন বাঁচিবে ততদিন কেবল কার্য্যই করিবে, আর কার্য্যের ফলে তাহাদের সকল প্রকার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভাবের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে এবং সেই অভাবে পড়িয়া সারা জীবন ভাবনার স্রোতে ভাসিতে থাকিবে। কিন্তু আমরণ কালের মধ্যে মানুষ কার্য্য-মুক্তও হইবে না; আর এরূপ ভাবনার হাতও এড়াইতে পারিবে না।

ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমরা ভাবিয়া তাহার একটা পূর্ণ-মীমাংসা করিতে পারি না। Addison বলেন, "If we are careful to inspect something, we must of course neglect others. This imperfection which we observe in ourselves is an imperfection that cleares in some degree to creatures, that is, beings of finite and limited nature." সুতরাং আশা এবং অভাব জীবনের নিত্যসঙ্গী ও চিন্তা চির-সহচরী। ঈশ্বরের ইচ্ছায় চিন্তা মানবের মনে তাহার অজ্ঞাতে প্রবেশ করে ও তাহার শতচেষ্টাতেও তাহাকে ত্যাগ করে না। এখন বুঝিতে পারা গেল যে, ঈশ্বর আমাদিগকে যেরূপ ভাবাইতেছেন, সেইরূপ ভাবিতেছি। মানুষ ভাবে কেন?—উত্তর খুঁজিয়া পাইয়াছি,—ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

কাননবালা বা পবিত্র শ্মশান।—শ্রীযুক্ত বেচুলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানি সমালোচনার্থ পাঠাইয়া প্রকাশক মহাশয় আমাদিগকে এই পত্র লিখিয়াছেন যে,—"আপনার 'অনুসন্ধানে' একটু ভাল করিয়া সমালোচনা করিবেন। বালি-অপেরা-কোম্পানী কর্ত্তৃক ইহার থিয়েটার হইয়া গিয়াছে। যাহাতে কলিকাতার নাট্য-মন্দিরে অভিনয় হয়, তাহার জন্য বিশেষ করিয়া সমালোচনা করিবেন। আপনার অনুসন্ধানে সমালোচনা হইয়া যাইলে বিজ্ঞাপন পাঠাইব। আরও এক কথা তাহাহইলে, অনুসন্ধান অন্য স্থলে যে দরে ছাপাইতেছেন, আমাদের এখানে হইলে প্রতি ফর্ম্মায় ৷৷০ আট আনা করিয়া কম করাইয়া দিব।" এই তো ব্যাপার! এখন, এই পুস্তকখানি পাইয়া অবধি আমরা বড়ই শঙ্কটে পড়িয়াছি; কেবলই ভাবিতেছি যে, এই দুর্ব্বৎসরের বাজারে এত লাভ এখন ছাড়িব কি ক'রে! এক অনুসন্ধানে বিজ্ঞাপন দেওয়ার লাভ, তা' ছাড়া আর চিরকাল প্রতি ফর্ম্মা ৷৷০ আনা হিসাবে বার্ষিক অন্ততঃ প্রায় পঞ্চাশ টাকা খরচ-বাঁচান লাভ, এও কি সহজ লাভ! কাজেই পাঠক মহাশয়গণ মাপ করিবেন, আমরা এত লোভ ছাড়িয়া পুস্তকের ভাল সমালোচনা না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না। এক এক করিয়া পুস্তকের গুণাগুণসমূহ বলিতে হইল। প্রথমতঃ পুস্তকের প্রকাশক মহাশয় অতি বাহাদুর লোক; অর্থাৎ প্রথমে ইনি শ্রীযুক্ত বাবু বেচুলাল বেণিয়া বি, এ, ভূত-সম্পাদক প্রভৃতি উপাধিগ্রস্ত ছিলেন; তবে ভাগ্যদোষে এখন হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত বেচুলাল গুপ্ত প্রিণ্টার, আর্য্যাবর্ত্ত-প্রেস মাত্র। পুস্তকখানিও ডিমাই বারপেজী ১০০ পৃষ্ঠার কম নহে; দাম কিন্তু অল্প করিয়া বার গণ্ডা পয়সা মাত্র। সুতরাং বড়ই বেহদ্দ সুলভ! তার পর লেখার কথা; তা' পুস্তকে গদ্য আছে, পদ্য আছে, গল্প আছে, ব্লাঙ্কভার্স আছে, কোটেসান আছে, সেমিকোলান আছে, কমা আছে, ভূমিকা আছে, এক কথায় যা' দরকার সবই আছে। তবে কেবল

মাত্র 'ভ্রম-সংশোধনটী' দিতে পারেন নাই বলিয়া গ্রন্থকারও দুঃখিত আছেন। তা' আমরা বলি, সেজন্য দুঃখের বিষয় কিছুই নাই; কারণ, বিজ্ঞাপন দিবার সময় প্রকাশক 'ভ্রমকেও' একটী বেশীর ভাগ বিষয়ের মধ্যে গণ্য করাইতে পারিবেন। আর, আজকাল বিজ্ঞাপনের লিখিত পুস্তকের সূচিপত্রেও প্রায় ঐরূপ সকল কথাই থাকে। শেষ কথা, এই পুস্তকখানির ছন্দোবন্ধ দেখিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর 'পশুপতি-সম্বাদ' মনে পড়িল। কারণ, এতেও সেই,—

"দীনবেশে
হীনভাবে
চায় দরশন তব
দেখা দেহ প্রাণ যায়।
বনমাঝে
বিচলিত চিত।"

ইত্যাদিরূপ পৃষ্ঠাপুরাণ ছন্দ বড় বড় অক্ষরে পুস্তকের অঙ্গ বর্দ্ধন করিতেছে। এখন, পাঠক বলুন, অধিক সুখ্যাতি আর কি করিব?

জ্যোতিপ্রকাশ।—দীনজন সমিতি হইতে প্রকাশিত। ধর্ম্মালোচনার কথঞ্চিৎ সহায়তা করিবার উদ্দেশে এই পুস্তকখানি রচিত। সুতরাং অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে এ পুস্তক-প্রকাশকের উদ্দেশ্য ভাল। তবে লিখন-প্রণালীর গভীরতা নাই, এই ক্ষোভ।

আশালতা।—(গীতিকাব্য)। শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মিত্র প্রণীত। রাধানাথ বাবুর লিখন-প্রণালীর বিষয় ইতিপূর্ব্বে একবার আলোচিত হইয়াছে। এখানিও তাঁহার সেই শ্রেণীর লেখা; সুতরাং সাধারণের নিকট যে একই চক্ষে লক্ষিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষ, এ পুস্তকখানিতে সেই একঘেয়ে থিয়েটারী ছন্দের ছড়াছড়ি দেখিলাম না, এই আরও আনন্দের বিষয়। অধিকন্তু রাধানাথ বাবুর এ পুস্তকেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কএকটী গান আমাদিগকে বেশ তুষ্ট করিল।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—বঙ্গরঙ্গ-ভূমিতে আজকাল "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" নামক একখানি করুণ রসাত্মক নাটক অভিনীত হইতেছে; নাটকখানি উক্ত থিয়েটারে-অভিনীত সুবিখ্যাত 'প্রভাস-মিলন'-রচয়িতার প্রণীত বলিয়া পরিচয় পাইয়াছি। এ নবনাটকের অভিনয়ও বেশ সুন্দর হইতেছে। পরীক্ষিতের করুণ ধর্ম্ম-ভাবে পাষাণও বিগলিত হয়; আর, মহামুনি শমীকের শোক-প্রবাহও বড়ই উচ্ছ্বাসময়। দৃশ্যপটের মধ্যে তক্ষক-দংশনে সজীব বৃক্ষের মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হওন ও ধন্বন্তরীর কৃপায় পুনরায় পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হওন, অবশ্যই উল্লেখ-যোগ্য। তদ্ভিন্ন, অভিনয়-সম্প্রদায় অপরাপর কএকটি পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটের জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন দেখিয়াও সুখী হইলাম।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ১৬১নং অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা।—এই ঠিকানা দিয়া আজকাল এই মর্ম্মের এক এক ছাপান কার্ড মফঃস্বলের সকল ভদ্রলোকদিগের নিকট প্রেরিত হইতেছে,—

'মহাশয়, আমি অনেক প্রকার ইন্দ্রজাল পুস্তক দেখিয়া শুনিয়া 'আদি-ইন্দ্রজাল মহাবিদ্যা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলাম। এই পুস্তকে ৪টি বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে; ১ম অদৃশ্য, ২য় বশ করা, ৩য় গুটিকা-চালন, ৪র্থ বীচ হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বৃক্ষাদি উৎপাদনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। উপরোক্ত ৪টি বিষয় ৩টি মাত্র ফল আর একটি মাটির গুলী। ১মটি বলাডুমুর, এই বলাডুমুরটী মুখের ভিতর দিবামাত্র আর কেহই দেখিতে পাইবে না, কিন্তু আপনি সকলকে দেখিতে পাইবেন। ২য়টী আরগট নামক একটী ফল, এই ফলটী যে কোন ব্যক্তিকে খাওয়াইবামাত্র সে বশ হইয়া যাইবে। ৩য়টী একটী মাত্র মাটির গুলী। এই গুলী যে কোন জিনিষে ছোয়াইবা মাত্র ২য়টী

হইবে; কিন্তু যেটি নূতন হইবে সেইটি এক দিবসের জন্য স্থায়ী হইবে। ৪র্থটি কদরী ফল, এই ফলের রস যে কোন বীচে মাখাইয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুর, বৃক্ষ, পুষ্প, ফল ফলিবে। এই পুস্তকের মূল্য নাই; কেবল পরীক্ষার ৪টী দ্রব্যে মূল্য ১৲ মাশুলখরচ ৵০ আনা, একুনে ১৵০ আনা লইয়া বিতরণ করিতেছি। আপনি আমাদের গ্রাহক ছিলেন; সেইজন্য আপনাকে এক সেট বই ও ৪টি উপরোক্ত দ্রব্য তীর্থাশ্রমী যোগীপ্রবর কর্ত্তৃক মন্ত্রে তন্ত্রে প্রস্তুত করিয়া অনরেজেষ্টারী প্যাকেটে পাঠাইলাম, বুঝিয়া লইবেন। ইতি কুমার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। নং ১৬১ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা।

পুঃ, এই প্রেরিত প্যাকেটটি পোষ্ট আপিষে কোন মতে খুলিবেন না। বাটীতে নিঃসন্দেহে খুলিবেন, বাধা নাই।"

কিন্তু এই বচনে মুগ্ধ হইয়া যাঁহারা প্যাকেট লইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রতারিত হইয়াছেন, জানিতে পাই। অর্থাৎ কিছুতেই ফল ফলিতেছে না। এ সম্বন্ধে পাঠক দেখুন, একখানি পত্র পত্র এই, ধুবড়ী বিলাসীপাড়া হইতে বাবু আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—'কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ নামক জনৈক প্রতারকের প্রতারণায় বিশেষরূপ প্রতারিত হইয়া অদ্য আপনার স্থানে উপস্থিত। প্রবঞ্চকের পত্রের লিখিত 'আদি ইন্দ্রজাল-মহাবিদ্যার' পরিবর্ত্তে 'ইন্দ্রজাল-কল্পতরু' নামক যে পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহার তাহার মূল্য এক আনা হবে কি না সন্দেহ-স্থল; কারণ উহাতে কএকটি প্রলাপ বাক্য ব্যতীত আর কিছুই নাই।'

এইরূপ সকল [illegible] অভিযোগ। বশেষ, পত্রোক্ত জিনিষেরও [illegible] নাম তে কখনও শুনি নাই। যাহাহোক, এই 'ইন্দ্রজাল কল্পতরুর' বিজ্ঞাপন দিয়া পূর্ব্বে ফকির সরকার ও গিরীন্দ্রলাল দাসঘোষ অনেককে ঠকাইয়াছিলেন। এখন এ উপেন্দ্রকৃষ্ণ আবার কে? ইনি সম্ভবতঃ ঐ দলেরই একজন হইবেন। যাহাহোক, পাঠকগণ অতঃপরও ঐরূপ অযাচিতভাবে প্রেরিত প্যাকেট সম্বন্ধে সাবধান হউন, এই বাসনা।

"শান্তি" এই নাম দিয়া

আজকাল একখানি কাগজ বাহির হইতেছে। সে কাগজের গ্রাহক হওয়া সম্বন্ধে নানা লোভানির কথা আছে। কিন্তু সেই সকল লোভানিতে পড়িয়া পাঠকগন যে সকল প্রকারে প্রতারিত হইতেছেন, তাহার একটী এই;—"মহাশয়, ঘোষনা-পত্র দৃষ্টে আমরা 'শান্তির' গ্রাহক হইয়াছিলাম। আড়ম্বরের বিজ্ঞাপনের মধ্যে লেখা ছিল, ১০ই আশ্বিনের মধ্যে 'সৌভাগ্য-উপহার' বিতরণ শেষ হইবে। কিন্তু আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ গত হইয়া পোষ মাস আসিল, তথাপি এ পর্য্যন্ত সৌভাগ্য-উপহার পাইলাম না।" শান্তির গ্রাহকগণের ভাগ্যে যে এরূপ সকল দুর্দ্দশা ঘটিবে, এ কথা শান্তির বিজ্ঞাপন বিতরিত হইবা মাত্রই আমরা বুঝিয়াছিলাম। কারণ, সাধারণে শান্তির কার্য্যাধ্যক্ষ ও সম্পাদক বাবু দীনবন্ধু সেন বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও ইহার মূলে বটতলার শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচন্দ্র বসাক প্রভৃতিকে দেখিয়াই আমরা সন্দিগ্ধ হইয়াছিলাম। আর, সে ভাবের আভাসও ইতিপূর্ব্বে আমরা অনুসন্ধানে দিয়াছি। যাহাহোক, এখনও ইহাঁরা কথা বজায় রাখিয়া কাজ করেন, এই বাসনা। নতুবা প্রথমেই কথার ব্যত্যয় ঘটিলে 'শান্তিকে' আর কদিন টিকাইতে পারিবেন?

সংবাদ।

—ঘুষ লওয়া অপরাধে কালিকটের কলেক্টরের প্রতি সম্প্রতি দুই বৎসরের জন্য কারা-দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে এবং তাঁহাকে ৩০০০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

—ব্রেজিলের সম্রাটের তিনটী পুত্র একত্র হইয়া "ইম্পিরিয়াল মেল" নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতেছেন। সে পত্রের লেখক, প্রিণ্টার এবং কম্পোজিটারের সকল কাজই তাঁহারা তিনজনে সম্পাদিত করিয়া থাকেন। সম্রাট-পুত্রদের স্বহস্তে এরূপ সকল কাজই নির্ব্বাহ করা, অবশ্যই লোকের শিক্ষার কথা।

—রুষ-রাজ্যে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ সমাধিস্থ হইতেছিল। গোরের মধ্যে মৃতদেহ রাখিয়া ক্রমে সকলে মৃত্তিকা চাপা দিতেছে, এমন সময় একখণ্ড বৃহৎ মৃত্তিকা পতিত হওয়ায় স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল, "আমায় কবরে পুতিও না। আমি মরি নাই।" কিন্তু তখন সকলে স্ত্রীলোকটীকে দানো পাইয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি আরও মাটি ঢাকা দিতে লাগিল এবং তদপর আর কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ইহার ক্ষণপরেই ঐ গোরস্থানে একজন ডাক্তার আসিয়া মৃত দেহ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন; এবং তখন পরীক্ষায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, মৃত্তিকা-চাপা পড়াতেই ঐরূপে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

—উত্তর সিন্ধুপ্রদেশে সম্প্রতি অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছে। থিলাত প্রদেশে তাহাদের বাসস্থান ছিল; দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ-হেতু তাহারা দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এইরূপ জানা যাইতেছে।

—এক লণ্ডন সহরে অনূ্যন ১৪ হাজার লোক বহি লিখিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ যোগাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু সমগ্র ভারতেও এত লোক সাহিত্য-ব্যবসায়ে প্রতিপালিত হন কি না, সন্দেহ; আমাদের নিকট এও এক প্রহেলিকা!

—পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের পুত্রের প্রতি, বালিকা-স্ত্রীর হত্যা-অপরাধে, ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

—কুলীর অত্যাচার ক্রমে বড়ই ভীষণ হইতে চলিল। প্রসবের পর একজন কুলিনী কয়দিন চা-বাগানে কাজ করিতে যাইতে পারে নাই। তজ্জন্য মিসাইজান চা-বাগানের সাহেব তাহাকে এরূপ বেত্রাঘাত করিয়াছে যে, তাহাতেই অভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে। অন্যান্য কুলিরা সাহেবকে তাহাতে বাধা দিতে যাওয়ায় সাহেব পরে দলবল লইয়া তাহাদিগকেও বেত্র-দণ্ড ও মারপিট করিতে থাকে। এই অত্যাচারে, অধিক কি আরও ৪।৫ জন কুলীকে প্রাণত্যাগ করিতে হয় এবং অনেকে বিশেষ আহত হয়। আরও, বলিতে প্রাণ বিদীর্ণ হয় যে, এই সময় পাপিষ্ঠ আর একটী কুলী রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। যাহাহউক, বিচারে সাহেব এখন দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু দণ্ড প্রথম দাবিতে তিনমাস সপরিশ্রম কারাদণ্ড ও আড়াই শত টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয় দাবিতে দশ দিন কারাদণ্ড ও এক শত টাকা জরিমানা মাত্র হইয়াছে। ইংরাজ-রাজ্যে ইংরেজ-অপরাধীর প্রতি এইরূপই সুবিচার বটে!

—গত ২৭এ অগ্রহায়ণ আমাদের নূতন লাট লর্ড ল্যান্স ডাউন ভারতের গবর্নর জেনারেল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

—বিলাতের প্রসিদ্ধ ডাক্তার মেকেঞ্জি সাহেব "ফ্রেড্রিক" নামক একখানি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। শুনা যায়, সেই পুস্তক-প্রকাশের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাহার এক লক্ষ কাপী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে কিন্তু একথা স্বপ্নবৎ!

—ড্রেসডেনে সম্প্রতি এক নূতন ধরণের যাদুঘর খোলা হইয়াছে। সে যাদুঘরে কেবল বড় বড় লোকের পরিত্যক্ত "জুতা" রক্ষিত হইবে।

—মালবার প্রদেশের একটী বালক হটাৎ জীবন্ত টিকটিকি গিলিয়া ফেলে। টিকটিকি উদরে গিয়া লাফাইতে থাকে। সুতরাং তাহাতে বালক বড়ই কষ্ট পায়। এমন সময় একজন ডাক্তার বুদ্ধি করিয়া ধুকালের জন্য বালকের পদদ্বয় ঊর্দ্ধে ও মস্তক নিম্নে ন করাতেই পরে মুখ দিয়া সেই জীবন্ত টিকটিকি বাহির হইয়া পড়িল।

—মার্ণিং পোষ্ট বলেন,-একজন যাদুকর সস্ত্রীক একটী বানর ও ছাগল লইয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। এমন সময় পথিমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া যাদুকর ও তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে ও তাহাদের সম্পত্তি লইয়া পলায়ন করিতে থাকে। ইতিমধ্যে তাহাদের বানরটী হস্ত ছাড়াইয়া গাছে উঠে; এবং পরে দস্যুদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহাদের বাসবাটীর সন্ধান লয়। সন্ধান লইয়া বানরটী পরে পুলিসের একজন কর্ম্মচারীকে ইঙ্গিত-ইসারায় প্রথমতঃ তাহার মৃত প্রভুর নিকট ও পরে সেই দস্যুদের নিকট লইয়া যায়। এবং তথায় পুলিশ পোঁছিলে বানর অমনি লাফাইয়া গিয়া দস্যুদল-পতির পিঠে পড়িয়া গলা কামড়াইয়া ধরে ও তাহাতেই পুলিশের আর কিছু বুঝিতে বাকী থাকে না। যাহাহউক, বানরের এইরূপ বুদ্ধির গুণে অতঃপর হত্যাকারীগণ ধরা পড়িয়াছে।

—ইউরোপ হইতে জমাট দুধ এখানে আসিয়া থাকে। কিন্তু এখন আবার দুধের গুঁড়া আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই গুঁড়া তপ্ত জলে ফেলিলেই উত্তম দুধ প্রস্তুত হয়।

ইয়ং ম্যান এণ্ড কোং।

এজেন্সি বিভাগ।

মফস্বলের ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ীগণের সুবিধার নিমিত্ত আমরা এই এজেন্সী-বিভাগ স্থাপিত করিয়াছি। আমরা ভারতবর্ষের সকল স্থানে কলিকাতার সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য অল্প কমিশনে প্রেরণ করিয়া থাকি। অর্ডার সাপ্লাই বিভাগ।—দেশী ও বিলাতী সর্ব্বপ্রকার রেশমী, পসমী ও সুতার কাপড় ও পোষাক; সর্ব্বপ্রকার স্কুলপাঠ্য পুস্তক, উপন্যাস, ইত্যাদি কলিকাতায় প্রাপ্তব্য সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য আমরা অর্ডার পাওয়া-মাত্র পাঠাইয়া থাকি।

কমিশনের হার।—১৲ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত শতকরা ৬।০; ১০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত ৪৲; ৫০০ হইতে ১০০০ ও তদূর্দ্ধে ১।০।

অর্ডারের সহিত অর্দ্ধমূল্য পাঠাইতে হইবে। আমাদের নিয়মাবলী পত্রলিখিলে পাঠান যায়।

ইয়ংম্যান এণ্ড কোং। ৩১।১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

OPINIONS OF THE PRESS.

"Th treatise is written with care and good taste can be confidently recommended to Hindu ladies." The indian Nation.—1st June, 1885.

"A work of the nature, is a real necessity of the day, the author deserves praise for al that he has done."

—Thendian rMror, 6th June, 1885.

NOTICE.

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত

দ্বাদশ-নারী।—এখানি একখানি বৃহদাকারের বিশুদ্ধ স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক। মূল্য উপহার দিবার উপযোগী স্বর্ণনামাঙ্কিত সুন্দর কাপড়ের বাঁধাই ৬০ বার আনা। কাগজের মলাট, ॥৵০ দশ আনা।

নির্ব্বাণ-জীবন।—এখানি সুবিখ্যাত ইংরাজী কবি গ্রে রচিত 'এলিজির' ভাবমূলক বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ। মূল্য ৵০ দুই আনা।

ভারতে দুর্গোৎসব।—দুর্গোৎসব উপলক্ষে লোকের মনোভাব ও কার্য্যভাব কিরূপ হয়, এখানিতে সরল কবিতায় তাহাই বর্ণিত আছে। মূল্য ৴০ এক আনা।

আদর্শ-চরিত।—কৃষ্ণমোহন। এখানি স্বর্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত। মূল্য।০ চারি আনা।

এই সকল পুস্তক আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

OPINIONS OF THE PRESS.

"The author of the present biographical treatise deserves our warmest thanks for having rendered into Bengali the eventful characters of some of the exemplary females of India. We request the educational authorities to introduce this entertaining, as well as instructive biographical reader as a text-book for the girls of this province."—The News of the day. 26th August, 1885.

মৈত্র এণ্ড কোম্পানী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়।

৪৫,৪৬,৪৭,৪৮ ও ৪৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র এম. বি, প্রণীত।

(১) শিশু-চিকিৎসা ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ৵০।

(২) জ্বর-চিকিৎসা ॥০ আনা, ডাকমাশুল ৴০।

অম্ল ও অম্লশূল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

লবণের অম্লবিনাশী শক্তি কেহই অস্বীকৃত হইবেন না। কএকটী লবণপাকে এই ঔষধ প্রস্তুত। উক্ত পীড়ায় যে, রোগী অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন, আহার করিলেই বমন ও পেটবেদনা হয়, শত শত এরূপ রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য (১ মাসের) ঔষধে ড: মা: সহ ২।০ টাকা।

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা, বড়বাজার, মেদিনীপুর।

অর্শরোগের মাদুলী।

স্বর্ণের ২।৴০, রৌপ্য ১।৴০, খরচা সমেৎ। ইহাতে জুয়াচোরের বিজ্ঞাপন নাই। নিয়ম ও ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সঙ্গে দিব।

রক্ত প্রদরের ঔষধ।

খরচাসমেৎ ২॥০। ঋতুকালে ব্যতীত যে স্ত্রী-লোকের কষ্টের সহিত অতিশয় রক্তস্রাব হয় তাহার সকল অবস্থাতেই ব্যবহার্য্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মোং কেচুয়াডাঙ্গা, পোঃ শিকারপুর। (নদীয়া)

চিকিৎসা-দর্শন

এলোপ্যাথি মতে ইহাই একমাত্র চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

৮॥০ টাকায় ২ বৎসর চিকিৎসা দর্শন, মায় মাসুল ৬॥০ টাকা মূল্যের প্রাকটিস্ অব্ মেডিসিন ১ খান, মায় মাসুল ১।৴০ মূল্যের মেটিরিয়া মেডিকা এক খানা, মায় মাসুল ৫৴০ মূল্যের ইডিওম্যাটীক্ ফেজেস ১খানি অর্থাৎ ৮॥০ টাকায় ১৩।৶০ মূল্যের পুস্তক ও পত্রিকা দিব।

শ্রীরজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়,
গোল্লাবেলিয়া স্থবর্ণপুর পোঃ, নদিয়া।

ডাঃ ভট্ট এণ্ড কোম্পানি।

১১৬নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবজ্বরহর। রেমিটেণ্ট ভিন্ন নবজ্বর ও দাদা-জ্বর অতি শীঘ্র আরাম হয়। ইহাতে কুইনাইন বা কোন বিষাক্ত দ্রব্য নাই। মূল্য ১৬ বটিকা ।০ আনা। ডাকমাশুল ।০ আনা।

জ্বরপঞ্চানন। সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মূল্য বার বারের ঔষধ ॥০, ডাক মাশুল ।০ আনা। ভি, পি, তে দু'আনা বেশী।

প্রশংসা পত্র।

"মহাশয়গণ! আপনাদের 'নবজ্বরহর' যথার্থই নামকে সার্থক করিয়াছে। আমার কয়েকটি সন্তানকে দিয়া পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য ফল-লাভ করিয়াছি।"

শ্রীহরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মুন্সেফ, আলিপুর।

কুষ্ঠাদি রোগের অমোঘ ঔষধ।

মহেশ্বরী তৈল।

এই একমাত্র অধৌতিক তৈলের মোহিনী শক্তি-প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ধবল, বিসদোষ, দুষ্টব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ, নালী ঘা, গরমী, বাঘী, কুণী, ছুলী, ভগন্দর, বিখাজ, অগ্নিদগ্ধ, অঙ্গুলহাড়া, ও পারাজনিত যাবতীয় রোগ অল্পকালমধ্যে আরোগ্য হয়। ফোড়া, বাঘী, বগলী, গণ্ড-মালা, পৃষ্ঠাঘাত প্রভৃতি রোগের আবির্ভাব হইবামাত্র এই তৈল ব্যবহার করিলে তাহাও ৪ ৫ দিন মধ্যে আরোগ্য হইয়া অদৃশ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২০ মাত্র।

শূলারী চূর্ণ ও শূলনাশিনী গুটিকা।

ইহাতে সাধ্য ও অসাধ্য অষ্টবিধ শূল নষ্ট হয়। এমন কি যাঁহাদের পেটে অন্ন থাকে না, বমি হইয়া যায়, তাঁহারাও এই ঔষধ সেবনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বহুকালের শূল বেদনা, পার্শ্বশূল, কোটিশূল আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

চিকিৎসক শ্রীমধুসূদন চতুর্ধুরীণ বি, এ,
বসোয়া—রামপুরহাটা।

রহস্যমুকুর।

আশ্চর্য্য গুপ্তকথা।

সুবিখ্যাত হরিদাসের গুপ্তকথার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক কর্ত্তৃক বিরচিত।

মূল্য মায় ডাকমাশুল দুই টাকা পাঁচ আনা। স্থলে দুই টাকা।

আর একটী বিশেষ সুবিধা

শিক্ষিত স্ত্রীলোক, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র, এবং সম্পূর্ণ মূল্য প্রদানে অসমর্থ পাঠকগণের পক্ষে অর্দ্ধ মূল্য (এক টাকা) ও ডাকমাশুল দুই আনা! বিশেষ বিবরণ এই পত্রিকার ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় দেখিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন,
প্রিণ্টার, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়।
কালকাতা,—নিমতলা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫।

...দশ বৎসরে বিশেষ পরিচিত হইয়াছে।

সকোর্টিনা রেস

পুরুষত্ব-হানির মহৌষধ।

আমেরিকা হইতে আনীত ও নতন আবিষ্কৃত

মূল্য ৫্ প্যাকিং ।০ আনা।

এই ঔষধে সকল প্রকার ধ্বজভঙ্গ, শুক্র-ক্ষয়, শুক্রপাত জনিত মাথাধরা, দৌর্ব্বল্য আরোগ্য হয়, ইহা ধারণাশক্তি বৃদ্ধির একটী অমোঘ ঔষধ। ...কুলের বিশ্বাস মেহ, স্বপ্নদোষ, সপুঁজ ধাতু-নির্গমন, খড়ির গোলার মত সাদা প্রস্রাব কিছুতেই আরোগ্য হয় না। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, সপ্তাহ এই ঔষধ ব্যবহার করিলে শুক্রের তরলতা দূর হইয়া, গাঢ় হওয়ায় ধারণাশক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। আমরা এই ঔষধ আনাইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সকলেই ফললাভ করিয়াছেন এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মেহ আরোগ্য হয়। ১৫ দিনের মধ্যে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব। ইহাতে পারা বা অন্য কোন হানিকারক পদার্থ নাই। ২০ দিনের ঔষধ প্রতি শিশির মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র, প্যাকিং ।০ চারি আনা।

সাবধান! ভয়ানক অনুকরণ, সাবধান—এই ঔষধের অসীম উপকারিতা ও বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া কতিপয় প্যাটেণ্টওয়ালা এই ঔষধের নকল আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রেতাগণ! সাবধান! আদত আমেরিকা হইতে আনীত প্রসিদ্ধ "পুরুষত্ব হানির মহৌষধ" কেবল ৩৯ নম্বর ক্যানিং ষ্ট্রীট মুর্গীহাটা কলিকাতা। ভারতবর্ষের এক মাত্র এজেণ্ট এ, সি, ঘোষ কোংর নিকট পাওয়া যায়। রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক।

BUNDI & Co.,
Suppliers & Commission Agents,
19 Jhamapukur Lane,

Goods of all Descriptions sent to all parts of India on receipt of Cash Remittances or by Value-Payable Parcels.

RATES.

Half-anna per Rupee
Over 100 Rupees. $2\frac{1}{2}$ per cent.
„ 500 „ 2

CALCUTTA,
The 1st April 1888.

J. N. MITRA,
C. C. DUTTA,
Managers.

পাইকপাড়া নর্শরি।

১৮৬৯ সালে স্থাপিত।

বীজ! গাছ!! বীজ!!!

এইসময়ে বপনোপযোগী আমিরিকান ও বিলাতি কপী প্রভৃতি নানা প্রকার সজ্জী ও মনোহর মরসমি ফুলের তাজা বীজ, বিবিধ প্রকার দেশী বীজ এবং নানা প্রকার অকৃত্রিম ফল, ফুল ইত্যাদির কলম ও গাছ বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

আবেদনকারীগণ স্বস্ব নাম ও ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ৵১০ আদ আনার টিকিট পাঠাইলে গাছ ও বীজের ক্যাটেলগ পাঠান যাইবে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্শরি, কলিকাতা।
জুলাই ১৮৮৮

পেটের পীড়ায় আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

এত দিন বহু পরীক্ষার পর

এস, ডি, ভট্টাচার্য্যের

অব্যর্থ পাচক বটিকা

কি অজীর্ণতা, কি মন্দাগ্নি, কি অম্লরোগ, কি অতিসার, কি আমাশায়, কি ভেদবমি, কি স্ত্রীলোকের সুতিকা-রোগ, এমন কি অনেক স্থলে ওলাউঠাতেও বিশেষ উপকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

দামও অতি কম; অতি গরিব লোকেও অনায়াসে ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। অর্থাৎ ।০ চারি আনা মাত্র দিলে ১২টী বটীকা সহ একটী বাক্স পাওয়া যায়। আর এরূপ এক ডজন বাক্স একত্রে লইলে ২।০সিকা মাত্র! তবে মফস্বলে এক হইতে ১২টী পর্য্যন্ত বাক্সের ডাক মাসুল ।০ চারি আনা স্বতন্ত্র লাগিবে এবং তজ্জন্য প্যাকিং খরচা ৵০ অতিরিক্ত লাগে।

আরও এক কথা, এই 'পাচক বটিকা' যখন ব্যায়রাম হইবে, তখনই কিনিতে হইবে, এমন নহে! ঘরকন্না করিতে হইলে সকল সময়ই ইহার একটি না একটি বাক্স কিনিয়া রাখা উচিত; কারণ তাহাতে হঠাৎ আবশ্যক পড়িলেই ব্যবহৃত হইবে।

উক্ত 'পাচক বটীকা' ২৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বনার্জ্জি এণ্ড কোম্পানির প্রসিদ্ধ ঔষধালয়ে এবং আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এস, ডি, ভট্টাচার্য্য, সাঁত্রাগাছি, হাবড়া।

এন, সি, ঢোল এণ্ড কোম্পানির

রেজিষ্টারি করা। রেজিষ্টারি করা।

ভয়ানক অনুকরণ কাণ্ড।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

সর্ব্ব সাধারণে জ্ঞাত আছেন, সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ঔষধ বিক্রেতা এন, সি, ঢোল এণ্ড কোম্পানির আবিষ্কারের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনোপযোগী নারিকেল তৈল অন্য কাহারও আবিস্কৃত ছিল না। এজন্য উক্ত কোম্পানী সুপ্রসিদ্ধ গোলাপী নারিকেল তৈলের আদিম স্রষ্টিকর্ত্তা ইহা সকল ভদ্রলোক মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া-থাকেন। এক্ষণে ইহার অপরিসীম বিক্রয় দেখিয়া, কতিপয় মহাপুরুষ অর্থাৎ কর্ম্মকার হইয়া কুম্ভকারের বৃত্তি অবলম্বনের ন্যায় নারিকেল তৈলে লাল রং করতঃ, আতর ও লেবুর তৈল প্রভৃতি উগ্র গন্ধ অপকারক দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া প্রায় শতাধিক প্রকার নারিকেল তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং আমাদিগের কৃত সুবাসিত গোলাপী নারিকেল তৈলের নাম নকল করিয়া ও নানা প্রকার চিত্তহর নাম দিয়া ও অসম্ভব গুণ কীর্ত্তন করিয়া, কম মূল্যে স্বার্থ পরায়ণ অর্থ পিশাচ ব্যবসায়ীগণের সহযোগে মফঃস্বলস্থ অনভিজ্ঞ বোকা লোকদিগকে বিক্রয় করিতেছে। এজন্য সাধারণের সতর্কতার নিমিত্ত আমাদিগের কৃত উপরোক্ত তৈলের শিব মন্দিব স্থিত শিবলিঙ্গ রেজিষ্টারী করা ট্রেডমার্ক সমস্ত শিশি ও বোতলের উপরিভাগে ও পৃষ্ঠদেশে অঙ্কিত আছে। তাহা ব্যতীত সমস্ত নকল জানিবেন।

এন, সি, ঢোল কোম্পানির কৃত সুবাসিত গোলাপী নারিকেল তৈলের গুণ।

কেশ পরিবর্দ্ধন অর্থাৎ চুল বৃদ্ধি করিয়া। চুলের গোড়া শক্ত করে উর্দ্ধক নাশক, শ্লেষ্মা ও গরম জন্য কিম্বা অপর কারণ বশতঃ শিরঃ পীড়া ও মাথা ঘোরা ইত্যাদি আরোগ্য হয়, এবং অকালে চুল পাকা নিবারণ করে, চুলের ময়লা ও মরামাস নিবারক ও জ্যোতিঃকারক এবং কেশ-দদ্রু বিনাশক। দেহে পুষ্টিকর, চর্ম্মরোগ নিবারক ও বিনাশক, অর্থাৎ চুলকনা পাঁচড়া ক্ষত, কোঁচদার ইত্যাদি হয় না ও আরোগ্য করে। বর্ণ সংস্কারক ও বায়ু... বিনাশক এবং গাত্রদাহ ও হাত পা ... নিবারণ করে।

কয়েকটী সর্ব্বজানিত বড় বড় লোকে... প্রশংসা পত্র শিশি ও বোতলের গাত্রে সং... আছে। মূল্য ৮ আউন্স শিশি (প্রায় ... পোয়া) ৸০ বার আনা। কোয়ার্ট বো... (প্রায় তিন পোয়া) ২৲ দুই টাকা। প্যা... ১ শিশি।০ চারি আনা ১ বোতলের ।৵০ আন...

যাঁহারা ম্যালেরিয়া জ্বরাদিতে ও ... রোগে এবং দন্তরোগে কষ্ট পাইয়া, নানা... ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করেন না... তাঁহারা এক একবার আমাদিগের কৃত নি... লিখিত ঐ কয়েক প্রকার ঔষধ ব্যব... করিয়া দেখুন; ইহাতে নিশ্চয়ই ফল লাভ করি... বার সম্ভাবনা। কারণ, অনেকানেক ভদ্র লো... ও চিকিৎসক মহাশয়গণ ইহার গুণ পরী... করিয়া, ফললাভ করিয়াছেন; এজন্য গুণে... বিষয় বেশী লেখা বাহুল্য এবং ব্যবস্থা... প্রতি ঔষধের সহিত সংলগ্ন আছে।

অত্যাশ্চর্য্য বটিকা।

ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সংক্রামক জ্বর, প্লীহা... যকৃত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পুরাতন ও পা... জ্বরাদির মহৌষধ। প্রতি কৌটার মূল্য ... দেড় টাকা। অধিক লইলে কম হইবেক।

দদ্রু রোগের অমোঘ মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দাদ নিবারণ হয়...
মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা।

দন্তরোগের মহৌষধ।

ইহা সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগের আশু ফল... প্রদায়ক ও নীরোগ কারক।
মূল্য প্রতি কৌটা ৵০ আনা।

আমরা বহু দিবসাবধি বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রসি... ইংরাজী ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকট লইয়ে... ঔষধ আনয়ন করিয়া থাকি। এনিমিত্ত... পাইকারী ঔষধ বিক্রেতাগণকে জ্ঞাত করা... যাইতেছে যে, যাঁহারা সুলভ মূল্যে ভাল ঔষধ... ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার... ব্যবহার করিলে জানিতে পারিবেন এবং... নিশ্চয় জানিবেন যে, এন, সি, ঢোল এণ্ড... কোম্পানির ন্যায় ভাল ঔষধ সুলভ মূল্যে... কেহ বিক্রয় করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

ঠিকানা—এন, সি, ঢোল এণ্ড কোঃ ইউনি-ভারসেল মেডিকেল হল, ২৮৩-৮৪ অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

—:•(০)•:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড] ১৫ই পৌষ, ১২৯৫ সাল। [১০ম সংখ্যা।

প্রেম-ফুটা।

একহারে গাঁথা তারাচয়,—
একহারে গাঁথা রবিশশী।
মরি কি এ অপূর্ব্ব মিলন—
নীলাকাশে প্রেম রাশি রাশি!

সেই প্রেম, অনন্ত ভাণ্ডার,
ভবে আসে কিরণ আকারে।
কভু সৌম্যময় রূপ ধরে—
পুনঃ কভু অনল উগারে।

মৃদুশ্বাসে অনিলের ভরে,
প্রেম আসে জগতের মাঝ।
দিয়ে যায় নবীন জীবন—
পরাইয়া দেয় নানা সাজ।

বসন্ত হিল্লোলে বহে প্রেম—
হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে।
ফুটিয়া না ফুটে তবু হায়!
গুমুরিয়া যায় কোথা মরে!

ভাঙ্গিতে না পারি প্রেম-কথা,
হয়ে যাই পাগলের প্রায়।
ক্ষুদ্র প্রেমে মত্ত থাকি সদা,
বিপথে পরাণ মন ধায়।

প্রেম আঁকা বিটপীর কায়,
পত্রে-পত্রে শিরায় শিরায়।
প্রেম লেখা গোলাপ কমলে,
সরোবরে প্রেম-আলো ভায়।

হেরি হোথা প্রেম-নিঝরিণী—
থাকি থাকি ফুটিয়া ফুটিয়া।
অনন্ত তরঙ্গ সাথে করি—
কোন্ পথে চ'লেছে ছুটিয়া।

জগতের যেইদিকে চাই,
প্রেম-পতি চারিধারে ফুটে।
ধরিতে না পারি প্রেম তবু—
তার পানে প্রাণ যায় ছুটে।

অনন্ত অচিন্ত্য একি প্রেম—
ফুটে না যে হৃদয় আগারে।
তারি পানে ধেয়ে ধেয়ে হায়—
কোন্ পথে যাই আমি চ'লে!

পাপীর আত্ম-কথা। ✓

(সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূচনা।

ডিটেক্‌টিভ্-পুলিশ-কর্ম্মচারী কারাগারে আবদ্ধ ত্রৈলক্ষকে সম্বোধন করিয়া বহিলেন,—দেখ, ত্রৈলক্ষ্য! তুমি আজ রাজদণ্ডে যেরূপ ভয়ানকরূপে দণ্ডিত, সেরূপ দণ্ড এদেশীয় আর কোন হিন্দু-রমণী যে কখন পাইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। বিশেষ, তোমার

এই দণ্ডের মূলীভূত কারণই আমি। ইহা জানিয়া তোমার জীবনের এই শেষভাগে আমি তোমার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি। ইহাতে তুমি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিবে; কারণ, আমি নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী বা লোভ-পরতন্ত্র হইয়া এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবলমাত্র আমার জঘন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি এইরূপ জঘন্য কর্ম্মের মূলীভূত কারণ হইয়াছি। কিন্তু ত্রৈলক্ষ! এখন তোমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী; বোধ হয়, এক সপ্তাহের ভিতরই তোমার প্রাণ-বায়ু শেষ হইবে। এখন, বোধ হয়, তুমি আর কোনপ্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া তোমার আত্মাকে আরও কলুষিত করিবে না। আমি অদ্য তোমার নিকট একটি শেষ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। বোধ হয়, এখন আর তাহা পূরণ করিতে তুমি কুণ্ঠিত হইবে না; বরং অনেকের উৎকণ্ঠা পরিতৃপ্ত করিবে। সে প্রার্থনা আর কিছুই নহে; কেবল তোমার জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনাগুলি জানিবার ইচ্ছা-মাত্র। আমি জানি, তোমার জীবনের অনেক অংশ ভয়ানক বিভীষিকাময় কার্য্যে পরিপূর্ণ; তাহার কতক কতক আমিও জ্ঞাত আছি। কিন্তু সমস্ত জানি না বলিয়াই অদ্য তোমার নিকট উপস্থিত। এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত কর; ও স্ত্রীলোক-মাত্রকেই জানাইয়া দেও যে, পাপ-পথে পদার্পণ করিলে তাহার ভবিষ্যৎ ফল কি হইতে পারে!"

ত্রৈলক্ষ কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া বলিতে লাগিল,—"মহাশয়, আমি যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যেরূপ রাশী রাশী পাপ উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত দণ্ড আমার হয় নাই। ইংরাজ-রাজত্বে আমার, সদৃশ পাপীর উপযুক্ত দণ্ডের বিধান নাই, জানিলাম। আমি যত লোকের প্রাণহত্যা করিয়াছি, এবং যত যত মহাপাপের প্রশ্রয় দিয়াছি, তাহার কি উচিৎ দণ্ড আমার এই সামান্য পাপ প্রাণকে হত্যা করা! আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকিত, ও সেই সকল প্রাণকে লক্ষ লক্ষ প্রকার যাতনা দিয়া যদি হত্যা করা হইত, তাহাহইলে বোধ হয় আমার সমস্ত পাপরাশীর এক আনার কতক পরিমাণ দণ্ড হইত। আপনি আমার জীবনের বিবরণ শুনিতে চাহিতেছেন; আমার যতদূর মনে আছে, তাহা বলিতে পারি। কিন্তু আমার মহাপাপের কাহিনী শুনিলেও যে পাপ হয়, বোধ হয় তাহারও প্রায়শ্চিত্ত নাই। মৃত্যুকালে আমার আর লজ্জা-শরম কি? আমি যতদূর পারি, বলিতেছি; যিনি শুনিতে ইচ্ছা করেন, শুনুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্য-পরিচয়।

"আমার নাম, শ্রীমতী ত্রৈলক্ষতারিণী দেবী। বর্দ্ধমান-জেলাস্থিত একটী ক্ষু পল্লীতে ব্রাহ্মণ-বংশে আমার জন্ম হয়। আমি আমার বাসস্থান ও পিতার নাম প্রকা করিয়া সেই বংশের আর মুখোজ্জল করি না। তবে যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার অনুগ্রহ করিয়া উহা মনে মনেই রাখিবেন আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ 'স্বভাব-কুলীন ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র দুহি বলিয়াই পিতামাতা সাধ করিয়া আমার না ত্রৈলক্ষতারিণী রাখিয়াছিলেন। বাল্যকা আমি অতিশয় সুরূপা ছিলাম; গ্রামের ভিত কোন সুন্দরী কন্যার কথা হইলেই আমার না আগে হইত। কিন্তু শেষে সেই রূপই আম কাল হইয়াছিল। আজকাল মেয়েরা যে লেখাপড়ায় পণ্ডিত হয়, আমার অদৃষ্টে তা ঘটে নাই। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমাদের দেশের মেয়েরা লেখাপ নামও শুনে নাই। ক্রমে ক্রমে দেখি

দেখিতে আমার বয়ক্রম বার বৎসর হইল; পিতা-মাতা আমার বিবাহের কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমাদের সমান ঘরে বর পাওয়া দায় হইয়া উঠিল; পিতা গোঁড়া কুলীন ছিলেন, সুতরাং তিনি অন্য ঘরেও আমার বিবাহ দিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে আমি তের বৎসরে পড়িলাম। তখন পিতা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গাল দেশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একজন কুলীনকে আনিয়া তাঁহারই সহিত আমার পরিণয়-কার্য্য সমাপন করিয়া দিলেন। স্বামীর মুখ দেখিয়া হৃদয় জ্বলিয়া গেল; পরিণয়ের সুখ মিটিয়া গেল! কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলাম না, হৃদয়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া কেবল কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। একে আমার বৃদ্ধ স্বামী, তাহাতে তাঁহার আবার আরও ১০।১২টী বিবাহ আছে; ইহা দেখিয়া পিতা যে কিরূপে বিবাহ দিলেন, তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। বিবাহ-ব্যবসায়-জীবী স্বামীও আমার, তাঁহার ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া ২।৩ দিবস পরে প্রস্থান করিলেন; দুই তিন বৎসর আর তাঁহার কোন সন্ধান পাইলাম না। চারি বৎসর পরে একদিন শুনিলাম যে, আমার স্বামী আসিয়াছেন। তক্ষাৎ হইতে তাঁহাকে দেখিলাম. কিন্তু চিনিতে পারিলাম না। রাত্রিকালে পাছে তাঁহার সহিত দেখা হয়, এই ভয়ে লুকাইয়া আমাদিগের বাটীর নিকটস্থ তারা বৈষ্ণবীর বাটীতে গিয়া শুইয়া রহিলাম। স্বামীও কি জানি কি ভাবিয়া পরদিন প্রত্যূষেই তাঁহার পাথেয়-গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া আমাদিগের বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। পিতা-মাতা আমাকে কত গালি দিলেন; বলিতে কি, দুই এক ঘা প্রহার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। তারা-দিদিও আমাকে স্থান দিয়াছিল বলিয়া তাহারও অপমানের কিছু বাকি রহিল না। আমি তখন মনে করিলাম যে, আত্মহত্যা করিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইব। কিন্তু তারা দিদির পরামর্শে তাহা করিতে পারিলাম না। সেইদিন হইতে তারা দিদির সহিত আমার প্রণয় জন্মিতে লাগিল; সে আমাকে ভাল বাসিতে লাগিল—আমিও তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার পর এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বাঙ্গাল দেশ হইতে সংবাদ আসিল যে, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। আমি বিধবা হইলাম।

"বিধবা হইলাম সত্য, কিন্তু বিধবার ধর্ম্ম কিছুই প্রতিপালন করিলাম না। তারা দিদি আমার পিতামাতাকে কি বুঝাইল, জানি না। পিতামাতা আমাকে অলঙ্কার বা পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন না। আমিও ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছুই করিলাম না। আমি বিধবা হইলাম বটে, কিন্তু বৈধব্য যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। আমার সধবা ও বিধবা সমানই বোধ হইতে লাগিল; মনে যেরূপ সুখ বা কষ্ট ছিল, তাহাই রহিল। প্রভেদের মধ্যে কেবল মৎস্য-মাংস খাওয়া নিষেধ হইল; ও এক সন্ধ্যা ব্যতীত আহার করিতে পাইতাম না। ইহাও এক বৎসরের অধিক নহে।

"পূর্ব্ব-অপেক্ষা তারা দিদি আমাকে এখন যেন অধিক ভাল বাসিতে লাগিল। অতিশয় যত্ন করিতে লাগিল; এমন কি, আমাকে এক দণ্ড না দেখিলে সে অস্থির হইল! আমারও ভালবাসা ক্রমে তাহার উপর পড়িল; মনের দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা সকলই তাহার নিকট বলিলেই মন সন্তুষ্ট থাকিত। তাহার কথা শুনিতে, তাহার নিকট উপদেশ ও পরামর্শ লইতে, মন যেন সতত্তই ব্যগ্র থাকিত। আমি তাহার কথায় যে কেন এত বাধ্য হইলাম, তাহা তখন আমি নিজেই বুঝিতে পারিতাম না। তারা দিদি যে কে, তাহা

সংক্ষেপে আপনাদিগকে একটু বলা বোধ হয় আবশ্যক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তারা দিদির পরিচয়।

"তারা দিদি এক জন বৈষ্ণবী। কিন্তু বৈষ্ণবের কন্যা কি না, জানি না। এখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরের কম নহে। তাহার বর্ণ শ্যাম; নাক, চোক মুখ প্রভৃতির গঠন মন্দ নহে; যৌবনে বোধ হয় সে দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। এখন তাহার গলায় তুলসীর মালা, হাতে হরিণামের ঝুলি, এবং নাকে রসকলি, আপনারা সকল সময়েই দেখিতে পাইবেন; মুখে হরিনাম সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। তাহার একখানি সামান্য খড়ের ঘর, আমাদের বাটীর সংলগ্ন। যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা ভাবিবেন, ও-ঘরও আমাদিগের বাটীর সামিল। আমি বাল্যকাল হইতেই তারা দিদিকে একই প্রকার দেখিয়া আসিতেছি; কখনও ইতর-বিশেষ বুঝিতে পারিলাম না। তবে আজকাল প্রভেদের মধ্যে এই দেখিতেছি যে, পূর্ব্বে তারা দিদি ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিত; কিন্তু আজকাল আরভিক্ষায় গমন করে না। তথাপি এদানি কিন্তু তা'র কোন বিষয়ের অনাটন দেখি নাই; বরং পূর্ব্ব হইতে কষ্টের যেন অনেক লাঘবই হইয়াছে, বোধ হইত।

"আমি তারা দিদির স্বামীকে কখন দেখি নাই; শুনিয়াছি, তাহার একটী 'বৈষ্ণব' ছিল। কিন্তু আমার জন্মিবার পূর্ব্বে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কেন গিয়াছে তাহাও কেহ বলিতে পারে না, বা তারা-দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে তাহার কিছু পরিস্কার উত্তর দেয় না। তারা দিদি যদিও আমাদের বাটীর নিকটে থাকে, তথাপি গ্রামের ভিতর যেখানে কোন প্রকার গোলযোগ হয়, মেয়েয়-মেয়েয় যেখানে ঝগড়া উপস্থিত হয়, যেখানে বিবাহ প্রভৃতি কোন শুভকর্ম্মের সূচনা হয়, সেই খানেই তাহাকে অগ্রে দেখা যায়। এমন কোন বিবাহই হয় নাই, যেখানে তারা-দিদি সমস্ত রাত্রি বাসর ঘরে না কাটাইয়াছে। এক কথায় তারা দিদি সকল স্থানেই এবং সকল কর্ম্মেই থাকে। তারা দিদিকে সকলেই বিশ্বাস করে, সকলের বাটীর ভিতরেই যখন ইচ্ছা যাইতে বারণ নাই। তারা দিদির অন্য কোন প্রকার দোষ কেহ কখন দেখে নাই বা শুনে নাই। তবে বৈষ্ণবের ঘরে যে দোষটী প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, সেই দোষ তারা দিদির পূর্ব্বে ছিল বলিয়া সকলেই সন্দেহ করে।"

"আমি তারা দিদিকে এতদূর ভাল বাসিতাম, এতদূর বিশ্বাস করিতাম, বলিয়াই আমার এই মহাপাপের উৎপত্তি,—সর্ব্বনাশের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং আমার জীবনের পরিণামও এই হইতেছে।"

"ক্রমে যত দিন গত হইতে লাগিল, তারা-দিদির সহিত আমার প্রণয়ও ততই বাড়িতে লাগিল। এমন কি, অবসর পাইলেই আমি আর কোন স্থানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিতাম না; তাহারই নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। সেও আমাকে ততোধিক যত্ন করিত। আর, সে যত্নের অর্থও তখন আমি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতাম না। ইহাতে আমার পিতা মাতা যেন একটু রাগ রাগ করিতেন; সকল সময়েই তারা দিদির বাটীতে যাওয়া তাঁহারা ভাল বাসিতেন না, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু পাছে আমি অসন্তুষ্ট হই এই ভয়ে তাঁহারা স্পষ্টও কিছু বলিতেন না। সুতরাং আমার যাওয়ারও নিবৃত্তি ছিল না। কিন্তু তখন আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, পিতা-মাতা কেন এরূপ করেন।

"এই সময় কিন্তু তারা দিদির সহিত আমার কোন গল্প হইলে, কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন হইলে তিনি আমাকে বুঝাইতেন যে,পুরুষ ভিন্ন

স্ত্রীলোকের কোন সুখই নাই, কোন উপায়ই নাই। আর সেই নিমিত্তই নাকি বৈষ্ণব কন্যাগণ আপনার স্বামী পরলোক গত হইলেও, অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে; নহিলে ইহকালের ত কথাই নাই; পরকালেও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না।' কিন্তু তখন আমার যেরূপ বয়ঃক্রম, যেরূপ সংসার সুখে নিরাশা! তাহার উপর নিত্য নিত্য এইরূপ ভাবের কথা শুনিতে শুনিতে আমারও মন যেন একটু কেমন কেমন হইল। আরও এই সময়ে আমাদিগের সংসারেরও নিতান্ত টানাটানি; সুতরাং আমার নিজের কোন দ্রব্যাদির যদি আবশ্যক হয়, তবে সংসার হইতে তাহার একটামাত্র পয়সা পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। তারা দিদি ইহা জানিত। সুতরাং সে এই সময়ে আরও একটী নূতন উপায় বাহির করিল। আমাকে আবশ্যক-মত গামছাখানা, কাপড়খানা, টাকাটা, সিকেটা তো দিতেই লাগিল; তদ্ভিন্ন আমার পিতা-মাতাকেও এই সময়ে বিশেষরূপ সাহায্য করিতে লাগিল। তাঁহারা সহসা সে সাহায্য লইতে সম্মত না হওয়ায়, তাঁহাদিগকে এইরূপে বুঝাইল যে, 'আমি এতদিবস ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু সংস্থান করিয়াছি, তাহা আমার নিকটেই আছে। কিন্তু আমি আর কতদিন বাঁচিব! আর, আমার মৃত্যুর পরই বা আমার যাহা কিছু আছে, তাহা কে লইবে! আপনারা ব্রাহ্মণ; বিশেষ এখন আপনারা কষ্টে পড়িয়াছেন, সুতরাং আমার কর্তব্য কর্ম্ম ব্রাহ্মণের সাহায্য করা। আপনাদিগের যত দিবস এইরূপ অবস্থা থাকে, তত দিবস আপনাদিগের যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আমার নিকট হইতে লউন। আপনাদিগের সময় ভাল হইলে আমাকে সমস্ত হিসাব করিয়া দিবেন।' আমার বৃদ্ধ পিতামাতাও তাহাই বুঝিলেন। এখন তারা দিদিই আমাদিগের সংসারের সমস্ত খরচ দিতে লাগিল। আর এই সময় হইতে প্রায় রাত্রিদিনই আমি তারা দিদির বাটীতে থাকিতে লাগিলাম। এখন আর আমার পিতামাতাও কোনপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রথম সোপান।

একদিন দুইদিন করিয়া দেখিতে দেখিতে এইরূপে আরও দুই মাস গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তারা দিদির বাটীতে বসিয়া আছি, তাহার সহিত নানাপ্রকার হাসি-ঠাট্টা করিতেছি, এমন সময় সেই মায়াবিনী তাহার মায়া প্রকাশ করিয়া আমাকে অভিভূত করিল। তখন আমার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না; ভাল-মন্দ বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। তাহার প্রস্তাবিত প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বেও, তাহার খাতিরে কতক সম্মত হইলাম। কারণ, মনে ভয়, পাছে তারা দিদি অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় দিবসে আমার মনের গতিক আরও পরিবর্ত্তিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাত দিবসের মধ্যেই তাহারই উত্তেজনায় আমি আমার মনকে কলুষিত করিলাম; হৃদয়কে অপবিত্র করিলাম; ক্ষণিক সুখে প্রবৃত্ত হইয়া নিত্য-সুখে জলাঞ্জলি দিলাম। হায়! সেই-ই আমার মহাপাতকের প্রথম সোপানে উত্থিত হইবার দিন!—এখন তাহা মনে করিলে হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়, পরিতাপ আসিয়া মনকে যন্ত্রণা দেয়! সেই সময়ে যদি আমি আমার হৃদয়ের গতি রোধ করিতে পারিতাম, সর্ব্বনাশী তারা দিদির প্রলোভনে না ভুলিতাম, তাহা-হইলে কি আজ আমার এই দশা হইত! হতভাগিনী আমি, তাই আমি তখন বুঝিয়াও বুঝি নাই, সর্ব্বনাশী আমাদিগের নিমিত্ত কেন এত টাকা খরচ করিতেছে? আর, কোথা হইতেই বা সেই টাকা পাইতেছে!

"যাইহোক, তখন আমি আমার জীবনের এক অধ্যায় শেষ করিয়া অন্য অধ্যায়ে প্রবেশ

করিলাম। হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ ও ভাবনা দূর করিয়া মহাসুখে নিবিষ্ট হইলাম। যাহাকে এখন আমি মহা-দুঃখ বলিয়া জানিতে পারিতেছি, তখন তাহাকেই মহা-সুখ জ্ঞান করিলাম। যাহাকে এখন আমি বিষজ্ঞান করিতেছি, তখন তাহাকেই অমৃত বলিয়া সুখে পান করিলাম। যে সর্ব্বনাশী রাক্ষসীর কথায় আমার ইহকাল পরকাল গিয়াছে, যে মহাপাপের কথা কর্ণে প্রবেশ করিলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন বলিয়া এখন জানিতেছি, সেই হতভাগিনীর কথাকেই আমি বেদবাক্য জ্ঞান করিতাম বলিয়াই আমার এখন এই দশা! ইহার পরে আর যে কি হইবে, তাহা ভাবিতেও পারি না।

"জীবনের অন্য অংশে প্রবেশ করিবামাত্রই আমার মনের গতি পৃথক হইয়া গেল। তারা দিদিকে যেরূপ ভাল বাসিতাম, তখন 'আর এক জনকে' তাহা অপেক্ষা আরও ভাল বাসিতে লাগিলাম। তারা দিদিকে না দেখিলে পূর্ব্বে মনে মনে কষ্ট হইত, কিন্তু তখন আমার সেই 'আর এক জনকে' না দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ভয়, পাছে কেহ দেখিতে পায়; পাছে কেহ টের পায়! পাছে কেহ আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ করে! কিন্তু তারা দিদির এমনই কৌশল, এমনই নূতন উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা, যে, প্রায় এক বৎসর কাল আমি সেই 'আর এক জনের' সহিত রাত্রিদিন আমোদ-আহ্লাদ করিয়া মহাসুখে কাটাইলাম; তথাপি কেহ তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিল না। এমন কি, আমার পিতামাতা পর্য্যন্তও স্বপ্নান্তরে তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট যে, এক বৎসরের পরই আমার সেই প্রাণের দিদির মৃত্যু হইল; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও অদৃষ্ট ভাঙ্গিল। তারা দিদির যাহা কিছু ছিল, সে মৃত্যুকালে তাহা আমার পিতাকেই দিয়া গেল।

"তারা দিদির মৃত্যুর ৮।১০ দিবস পর হইতেই আমার সকল গুপ্ত-কথা প্রকাশ হইতে লাগিল। এক কান দুই কান করিয়া আমার পাপের কথা ক্রমে সকলের কানে কানে ফিরিতে লাগিল। ক্রমে উহা আমার পিতা-মাতার কানে পর্য্যন্ত আসিয়াও পঁহুছিল। কেবল শোনাও নহে; একদিন আমার মাতা আমার পিতাকে ডাকাইয়া আমাদের সেই অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ দেখাইলেন। স্বচক্ষে দেখিয়া পিতাও মর্ম্মাহত হইলেন। এবং আমাকে হত্যা করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই একবার মনে মনে ভাবিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্ত্রী-হত্যা মহাপাপ ভাবিয়া, কি করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এইরূপে ২১ দিবস অতীত হইতে না হইতেই আমিও এই সংবাদ পাইলাম, এবং পিতামাতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া উভয়েরই প্রাণ যাইবে, বিবেচনা করিলাম। তখন মনে বড় ভয় হইল; প্রাণে মায়া জন্মিল; সুখের চরম সীমা দেখিতে ইচ্ছা করিল। তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া সকল কথা 'তাঁহাকে' বলিলাম। তখন 'তিনিও' তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীর জ্বালায় জ্বালাতন; প্রতিবেশীদিগের কঠোর অত্যাচারে প্রপীড়িত। সুতরাং তিনিও আর কোন উপায় দেখিলেন না। অগত্যা উভয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলাম লইয়া, পিতা-মাতা ও গ্রামের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, এক দিবস রাত্রে উভয়েই গ্রাম হইতে বহির্গত হইলাম। সমস্ত রাত্রি চলিয়া প্রাতঃকালে একটী ষ্টেসন যাইয়া উপনীত হইলাম।

"হায়, আমি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম না বলিয়াই অমূল্য সতীত্ব-রত্ন হারাইয়াছিলাম, ও পরিশেষে সামান্য প্রাণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অকিঞ্চিৎকর সুখে মন মজাইয়া স্বদেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার দেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই, যদি আমি আমার

পাপের উপযুক্ত সাজা পাইতাম, যদি পিতা মাতা বা গ্রামের অন্য কাহারও হস্তে আমার প্রাণ বিসর্জ্জন হইত, তাহা হইলেও আজ আমি মহা-সুখে আমার আত্মাকে সুখী করিতে পারিতাম; কখন না কখন সেই পাপ হইতে পরমেশ্বর আমার আত্মাকে মুক্ত করিতেন। কিন্তু এখন আর আমার সে আশা কই? আমার সেই ভয়ানক ভয়ানক রাশী রাশী পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোন জগতেই যে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষোলকলা সম্পূর্ণ।

সেইদিন দিবা ১০টার সময় আমরা রেল-যোগে হাবড়া-ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম; ও সেই স্থান হইতে একখানি গাড়ি করিয়া ক্রমে কলিকাতায় উপনীত হইলাম। যে স্থানে আসিয়া আমাদিগের গাড়ি থামিল, সেই সময় উহার নাম আমি জানিতাম না। কিন্তু পরে জানিয়াছিলাম যে, উহাকে সোনাগাছি কহে। আমরা গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হইয়া একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত দ্বিতল বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। উহার ভিতর যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই বা ভাবি নাই। দেখিলাম, ঐ বাটীর উপর ও নীচে ছোট ছোট ১৭।১৮ খানি ঘর। ঘর-একখানি ব্যতীত তাহার সকলগুলিতেই লোক আছে। তবে আমাদিগের দেশে যেরূপ নিয়মে সকলে বাস করে, ইহা তাহা অপেক্ষা সতন্ত্র। বাটীর ভিতর একটীমাত্রও পুরুষ মানুষ দেখিতে পাইলাম না প্রত্যেক ঘরই একটী-একটী স্ত্রীলোক দ্বারা অধিকৃত। কিন্তু সকলেই স্বাধীন; কেহ কাহারও কথা শুনে না, কাহাকেও মান্য করে না এবং কেহই একান্নবর্ত্তী নহে। আমি এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে তত অসন্তুষ্ট হইলাম না; বরং কতক আহ্লাদিতই হইলাম। কারণ, আমি আমার তারা দিদির মৃত্যুর পর হইতেই সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভাল বাসিতাম; নির্জ্জনে কেবল 'তাঁহার' সহিত আমোদ-আহ্লাদ করা ব্যতত পৃথিবীতে আমার যে আর কোন সুখ আছে, তাহা ভাবিতাম না। সেই খালি ঘর খানিতেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; 'তিনি' আমাকে সেই ঘরে রাখিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির নিমিত্ত বাজারে গমন করিলেন। একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার নিকট বসিয়া নানাপ্রকার গল্প করিতে ও শুনিতে লাগিল। পরে জানিতে পারিলাম, তাহারই সেই বাটী। ক্রমে অন্য ঘর হইতে একটী একটী করিয়া প্রায় সকলেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি উহাদিগের চাল চলন, বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া বিবেচনা করিলাম যে, ইহারাই সকপ্রকার দুঃখ ও কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখে এই স্থানে বাস করিতেছে। ইহারা সকলেই আমার নিকট আমার পূর্ব্বের জীবন-কাহিনী শুনিয়া কতই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং আমি এখন যাহাতে তাহাদের মতন শীঘ্র স্বাধীন ও সুখী হইতে পারি, তাহার কত প্রকার যুক্তি-পূর্ণ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিল।

"দেখিতে দেখিতে দিবা ৪টা বাজিয়া গেল। সেই সময় 'তিনি' বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলেন; এবং যে সকল দ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া আনিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক কথায় আমার ঐ নূতন ঘর তিনি অন্যান্য সকলের ঘরের মতন দ্রব্যাদিতে সজ্জিত করিয়া দিলেন। পালঙ্ক, বিছানা, বালিস, আলমারি, বাক্স, তৈজস-পত্র প্রভৃতি কোন দ্রব্যের অভাব রহিল না। আমি বাটীতে যেরূপ দরিদ্রের মতন থাকিতাম, যেরূপ কষ্টে দিন কাটাইতাম, তাহার তুলনায় যেন আমি রাজ-রাণীর অবস্থায় পরিণত হইলাম। মনে আর সুখ ধরে না; হৃদয় যেন আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেল। তবে সময় সময় আমার পিতা-মাতার দুঃখের অবস্থার সহিত আমার অবস্থার তুলনায়

মনে কষ্ট হইত। কিন্তু তাহাও অতি অল্প দিবসের নিমিত্তই।

উৎকলের আংশিক বিবরণ।

কবিবর জগন্নাথ দাস।

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ বিভাগে দাঁতন থানা, এই স্থানই বঙ্গের সীমান্ত-প্রদেশ। এই দাঁতনের নিম্নেই রজত-রেখার ন্যায় সুবর্ণ-রেখা নদী প্রবাহিত। এখানেই বঙ্গ-ভাষার অধিকার শেষ হইয়াছে। নদী উত্তীর্ণ হইলেই বালেশ্বর জেলা, উড়িষ্যার সীমা। এই স্থান হইতেই উৎকল ভাষার অধিকারের সূত্রপাত হইয়াছে। তালপত্রে লৌহ-লেখনী (খুন্তী) দ্বারা লিখিবার প্রথা প্রদেশে প্রচলিত।

যেদিন আকাশ নির্ম্মল, নিখুঁত ও পরিষ্কার থাকে, সেদিন প্রাতঃ-সন্ধ্যায় সুবর্ণরেখা নদী-তীরে দণ্ডায়মান হইলে, মেঘমালার ন্যায় নীলগিরি নয়নগোচর হইয়া থাকে। সুবর্ণ-রেখার তীরস্থ প্রদেশ বড়ই রমণীয়। নদী-স্রোত রৌপ্য-সূত্রবৎ চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে অপার বালুকারাশী ধূ ধূ করিতেছে; স্থানে স্থানে নদীর চর ভূমিতে নানাপ্রকার পুষ্পপত্র পরিশোভিত বৃক্ষশ্রেণী ও শ্যামল শস্যক্ষেত্র পরিশোভিত। সম্মুখে অসীম শাল-জঙ্গল, নানা প্রকার আরণ্য কুসুম-শোভিত। এই অরণ্য প্রদেশ বড়ই মনোহর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নির্ভয়ে বিচরণ করিবার কোন উপায় নাই।

আমি বঙ্গোৎকলের সীমান্ত-প্রদেশ বহুদূর ভ্রমণ করিয়াছি। গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া, অধিবাসীগণের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সমস্তই অবগত হইয়াছি। চৈতন্য মহাপ্রভুকে এ-প্রদেশের লোকে বড়ই ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। প্রায় গ্রামে গ্রামে মহাপ্রভুর মৃন্ময় অথবা কাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত আছে। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, এ প্রতিমূর্ত্তিও তদনুরূপ। প্রত্যেক মহোৎসবে এই মূর্ত্তি আনয়ন করা হইয়া থাকে। চৈতন্য মহাপ্রভু বহুকাল উৎকলে অবস্থিত করিয়াছিলেন। এই সময় হরিপ্রেমে সমস্ত উৎকলবাসীগণ প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 'নামে রুচি, জীবে দয়া' এই মহামন্ত্রে এক সময় সমস্ত উৎকল মুগ্ধ হইয়াছিল। উৎকলে অনেক সাধুভক্ত বৈষ্ণব কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশে যেমন কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামদাসের অবিনশ্বর কীর্ত্তি আছে, উৎকলের এই সীমান্তবর্ত্তী-স্থানে জগন্নাথ দাস নামক সেইরূপ একজন ভক্ত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎকল ভাষায় ইহাঁর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এদেশে প্রচারিত আছে। কিন্তু এই গ্রন্থ অদ্যাপী অমুদ্রিতাবস্থায় আছে; তালপত্রে লৌহ-লেখনী দ্বারা লিখিত, এই ভাগবদ্গ্রন্থ প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে আছে। এ প্রদেশের লোকে এই গ্রন্থ পরম সমাদরে পূজা করিয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই পৃথক পৃথক ভাগবত্-ঘর আছে। আমাদিগের দেশে ঠাকুর-ঘর যেমন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, এ-প্রদেশে ভাগবত ঘর ও তদ্রূপ। কবিবর জগন্নাথ দাসের বিরচিত ভাগবত-গ্রন্থ কোন অংশে কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীদাসের মহাভারত অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। উহার অনেক স্থানেই স্বভাবোক্তি অলঙ্কারপূর্ণ সরল ও প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থ অধিকাংশই পয়ারছন্দে বিরচিত। তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটী ত্রিপদী ও ভঙ্গ-ত্রিপদী ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিবরের বাসস্থান জাজপুরের নিকটবর্ত্তী; কিন্তু ইনি সংসারত্যাগী উদাসীন ছিলেন। ইহাঁর রচনা দেখিলে প্রকৃত ভক্ত বলিয়া অনুমান হয়। ইনি যে সকল ভক্তি-রসাত্মক পদাবলী রচনা করিয়াছেন, প্রকৃত ভক্ত বা প্রকৃত আর হৃদয় ভিন্ন উক্তরূপ উচ্ছ্বাস কদাচ সম্ভবে না। উৎকলে অনুসন্ধান করিলে অনেক সাধক-শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবির বিরচিত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল গ্রন্থও অদ্যাপী অমুদ্রিতাবস্থায় রহিয়াছে।

বাঙ্গালী যেমন বিলাসপরায়ণ বাবু, উড়িয়ারা অদ্যাপী কিন্তু সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। আমরা যেমন বিলাতি বস্ত্র, বিলাতি অস্ত্র, বিলাতি পরিচ্ছদ, বিলাতি গৃহসজ্জার জাকপাকী, উড়িয়ারা অদ্যাপীও সেরূপ হয় নাই। আমাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহের চতুপার্শ্বে দৃষ্টিপাত কর, একটী দেশীয় দ্রব্য দেখিতে পাইবে না। অন্য কথা দূরে থাকুক, আজকাল হাঁড়ি-কলসি, সরা-মালসার পরিবর্ত্তে অনেক সভ্য লোকের গৃহ চিনামাটীর বাসন প্রাপ্ত হইয়াছে। উৎকলবাসীরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার অধিকাংশই স্বদেশজাত। কটকে অতি উৎকৃষ্ট রূপার গহনা প্রস্তুত হইতেছে। বিশেষতঃ রূপার তারের কার্য্য কটকে যেমন হয়, ভারতের কোন স্থানে আর তদ্রূপ গহনা প্রস্তুত হয় না। আমরা বিলাতি দ্রব্যের আশু চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া থাকি, 'হ্যামিল্টনের' দোকানের কৃত্রিম স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্রব্যের কতই না আদর করিয়া থাকি? কিন্তু সে যে ইংরাজী সোণা!—তাহার মূল্য কি? কিন্তু কটকের রূপার গহনা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বিলাতি গহনাকে শত-সহস্র ধিক্কার প্রদান করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উপযুক্ত উৎসাহাভাবে এই সকল শিল্প বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, সেদিকে আমাদিগের দৃষ্টি কোথায়? কটকের জুতা দেখিতে তত সুন্দর না হউক কিন্তু পায়ে দিতে বড়ই আরাম বোধ হয়। আমরা যদি বিলাতি জুতার পরিবর্ত্তে এই দিনামা(?) ব্যবহার করি [illegible] দেশের লোকের কিছু উপকার হওয়া সম্ভব। দেশের প্রতি মমতা ও জাতীয় সহানুভূতি আমাদিগের বড়ই অল্প। কোনগতিকে দিন কাটিয়া গেলেই আমরা সন্তুষ্ট. ভবিষ্যদ্দর্শন আমাদিগের কোথায়? কিসে স্বদেশের উন্নতি হইবে, কিসে দেশের লোকে একমুঠা অন্নের সংস্থান হইবে, সেবিষয়ে আমাদিগের যত্ন কোথায়? যদি দেশীয় শিল্পের প্রতি একটীমাত্র আমাদিগের মমতা থাকিত, তাহাহইলে কি তাঁতির অন্ন মারা যায়?

দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? যাঁহারা আমাদিগের একমাত্র আশাভরসার স্থল, যাঁহাদিগের মুখপানে সমস্ত ভারত সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে, সেই বাবুদিগের দুর্ব্বুদ্ধি দেখিলে হাসিপায়। যাহা হবে না, যে আশা স্বপ্নেও মনে স্থান পায় না, তাঁহার জন্য সকলে উন্মত্ত। দেশীয় মাদুর, সতরঞ্চি, গালিচাই আমাদিগের উত্তম বিছানা; কিন্তু কি দুর্ভাগ্য যে, বিলাতি চিয়ার না হলে এক দণ্ডও বসিতে পারেন না!

স্বাধিন-বৃত্তি।

পাশ্চাত্য-শিক্ষার গুণে আমরা অনেক জিনিস বড়ই বিকৃতভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের পাশ্চাত্য-শিক্ষার রীতিমত উপায় নাই বলিয়াই ইহার সুফল আমরা বড় কিছুই ভোগ করিতে পাই না। শিক্ষার প্রধান উপায় দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তানুকরণে শিক্ষা করিতে হইলে সতত একাগ্র থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টক্রমে পাশ্চাত্য-শিক্ষকগণ আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া রীতিমত শিক্ষা দিতে নারাজ। সেইজন্যই আমরা পাশ্চাত্য-শিক্ষার গোটাকতক ভাবা ভাষা ধরণ-করণ, কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গি শিখিয়াছি মাত্র; কিন্তু হৃদয়ে পাশ্চাত্য-শিক্ষা আজও প্রবেশ করে নাই। এইটুকু লিখিতে লিখিতে একটী গল্প মনে আসিল। একজন কলিকাতার [illegible]

স্থলের জনৈক ধনাঢ্য জমীদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তথায় গিয়া দেখেন, জমীদার বাবুর সমস্তই সাহেবি কায়দা; বৈঠকখানায় চেয়ার, টেবিল, মেজ, আলমারি; অভ্যর্থনায় নমস্কার-প্রণাম স্থলে হাতাহাতি আরম্ভ হইয়াছে। পোষাক সর্ব্বদাই বিলাতী ধরণে করা হয়। আমাদের কলিকাতাস্থ ভদ্রলোকটী, বোধ হয় একটু বিরক্ত হইয়াই হইবে, গৃহস্বামীর সাহেবিয়ানার উল্লেখ করায়, জমীদার মহাশয় অপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিলেন,—"মহাশয়, আমি সাহেবদের নিকট সমস্তই শিক্ষা করিয়াছি; একটীমাত্র বিষয় কেবল শিক্ষা করিতে পারি নাই, সেটী তাঁহাদের লেখ-পড়া।"

আমরাও বলি, আমরা সাহেবেদের আর সকলই অনুকরণে শিক্ষা করিতে পারিয়াছি; কেবল শিক্ষা করিতে পারি নাই, তাঁহাদের হৃদয়ের দৃঢ়তা! এই বিষয়টী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা নিম্নে বিস্তার করা যাইতেছে।

স্বাধিনতা সাহেবদের জীবনের মূলমন্ত্র। গদ্যে পদ্যে, নবেল নাটকে, পথে ঘাটে, আহার ব্যবহারে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে সাহেবেরা বড়ই স্বাতন্ত্র-প্রিয়, আমরা শুনিয়াও থাকি, দেখিয়াও থাকি, পড়িয়াও থাকি। তাঁহাদের দেখা-দেখি আমরাও আজকাল বড় বিষম স্বাধিনতাপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমরা এখানে আমাদের ন্যায় ইংরাজিতে অর্দ্ধশিক্ষিত দলের কথাই বলিতেছি। আমরাও আজকাল বুক বাজাইয়া স্বাধিনতার ধূয়া ধরিয়া মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। তবে অনেক দিকে অনেক বিভ্রাট। যে দিকে স্বাধিনতা দেখাইলে গোলযোগ নাই সেই দিক দিয়াই নিজের শিক্ষার মহিমা প্রকাশ করা ভাল। সুতরাং বৃত্তি নির্ব্বাচনে আমরা এই স্বাধিনতা-প্রিয়তার বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকি। চাকরি করা হইবে না, কারণ তাহা যত বড়ই হউক না চাকরিত বটে, সেরূপ পরাধিনতা বড়ই লজ্জাকর, স্বাধিন বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। বণিক-বৃত্তি অর্থসাপেক্ষ, সেটাতেও মহাবিভ্রাট! অর্থ কোথায়? আমরা প্রায় সকলেই ধনকুবের বলিলেই হয়, কাজে কাজেই শিক্ষার জোরে, সভ্যতার শাসনে অপর বৃত্তি অপেক্ষা চিকিৎসা, ওকালতি প্রভৃতি উচ্চতম বৃত্তি নির্ব্বাচন করিয়া আপনা-আপনি ধন্য হই। কখনই ভাবি না, বাস্তবিকই কি চাকরি নীচ এবং চিকিৎসা বা ওকালতি উচ্চ বৃত্তি! এই নীচোচ্চতা কার্য্যে হয় না, মানুষের নিজের মনের উপর নির্ভর করে। সেইটী আজ আমরা এই প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। চাকরি নীচ কেন?—চাকরিতে মনিবের মন যোগাইতে হয়। কথাটা যদি সত্য হয় তাহা হইলেও বলিতে পারি, সেটা কেবল যিনি কর্ত্তব্যে নারাজ তাঁহারই পক্ষে। যিনি নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম রীতিমত করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মনিবের মন যোগাইতে হয় না, কাজ যোগাইলেই হইল! তুমি দশটার স্থলে প্রত্যহই এগারটার সময় কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইবে, আর অর্দ্ধেক দিন গল্প গুজবে কাটাইবে; আর বলিবে মনিবের মন যোগাইতে পারি না বলিয়া আমার কার্য্যে উন্নতি নাই। সেটা তোমার বড় লজ্জার কথা। যিনি নিজ কর্ত্তব্য-জ্ঞানে সুচারু ভাবে কর্ম্ম করেন, তাঁহাকে মনিবের মন যোগাইতে হয় না, বরং তাঁহার সহিত তাঁহার মনিবের বিশেষ প্রীতি হইবারই কথা। আর, যিনি পরাধিন হইয়াও স্বাধিন। তিনি চাকরি করেন বটে কিন্তু মনিবের অধিন নহেন, কর্ম্মের অধিন; আর এসংসারে কর্ম্মের অধিন নয় কে? সাহেবেরা এই ভাবে চাকরিও করেন, স্বাধিনতাও রক্ষা করেন।

তাহার পর যে কথা বলিতেছিলাম, সেই চিকিৎসা এবং ওকালতির কথা! চিকিৎসা অতি উত্তম কার্য্য। কিন্তু ভাল জিনিসের ব্যবসাটা বড় খারাপ। সে যাহাহউক, এ স্থলে

আমরা ব্যবসার ভালমন্দের কথা রাখিয়া চিকিৎসা স্বাধীন বৃত্তি কি না, আলোকন করিয়া দেখি। উপর হইতে দেখিতে চিকিৎসকগণ বড় স্বাধিন, কাহারও বশ্যতা স্বীকার করেন না। বরং যাঁহার নিকট হইতে প্রতিপালনের চেষ্টা তিনিও বাধ্য হইয়া থাকেন। আর, এই মোহে পড়িয়াই বোধ হয় অনেকের ধারণা চিকিৎসায় পরাধিনতার লেশমাত্র নাই। কিন্তু সেই বর্ষার রাত্রিতে, যখন এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, ওদিকে ভীমনাদে মেঘ ডাকিতেছে; অন্ধকারে ধরা আচ্ছন্ন, জলে কর্দ্দমে পথ আকীর্ণ; তখন তুমি দুই টাকার স্থলে আট টাকার লোভে রোগী-প্রেরিত ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলে! তবু কি তুমি বলিতে চাও তুমি স্বাধিন! আবার এই পৌষের দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁচা ঘুমে উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে দ্বিগুণ অর্থ-লোভে শয্যা ত্যাগ করিয়া চলিলে; আর তুমি বলিবে, তুমি স্বাধিন!—আর রমেশ বাবু এত বড় হাকিম হইয়াও পরাধিন? তুমি হয়ত মনে মনে ভাবিতেছ, লেখক বড় অলস। তাহার উপর হয়ত আরও মনে করিকরিতেছ লেখকের হৃদয়ে পরের ক্লেশে সহানুভূতি নাই। কিন্তু আমার বক্তব্য এই, তুমি যদি বাস্তবিক অর্থ-লোভে না পড়িয়া পরের দুঃখ নিবারণের জন্য এরূপ করিয়া থাক, তবে তুমি সমাজের নিকট পূজনীয়। আর ভাই, যদি তাহা না হইয়া কেবল পয়সার লোভে এইরূপ করিয়া থাক, তাহাহইলে তোমাকে কি বলিব, তুমি স্বাধিন, না তুমি পয়সার অধিন। যে মানুষের অধিন, তাহাকে আমরা জড়পিণ্ডের অধিন অপেক্ষা মান্য করি, ভক্তি করি; কিন্তু তুমি চিকিৎসক হইয়া ঘৃণার পাত্র—পরাধিনের পরাধিন। তুমি স্বাধিনতার কথা মুখে আনিও না।

চিকিৎসা-ব্যবসায়-স্বাধিনতার যেরূপ বিড়ম্বনা, ওকালতি প্রভৃতি যে সকল বৃত্তিকে লোকে সাধারণতঃ স্বাধিন বৃত্তি বলে, সর্ব্বত্রই এইরূপ। সর্ব্বত্রই স্বাধিনতার দেবী মূর্ত্তির ছায়ায় পরাধিনতার রাক্ষসী-মূর্ত্তি অবস্থান করে। সাবধান! দেবতা-ভ্রমে রাক্ষসীর কুহকে পড়িয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার ধাঁদায় মজিয়া আমরা মারা না যাই!

খোস-গল্প।

মলয়াবতী।

পুরাকালে পশু, পক্ষী নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত জীবদিগের কথা কহিবার শক্তি ছিল, নরনারী যেরূপ ভাষায় পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে, ইতর জন্তুদিগেরও সেইরূপ ক্ষমতা থাকায় মনুষ্য জাতি হইতে তাহাদের কিছুমাত্র ভেদাভেদ ছিল না, এইরূপ কিম্বদন্তি আছে।

কোন পল্লীগ্রামে পুরাকালে একটী সুন্দরী বালিকা বাস করিত, তাহার তুল্য মনোরম মূর্ত্তি কদাচ নয়নগোচর হয় নাই; বালিকা পিতা মাতার স্নেহের সামগ্রী ছিল। কুমারীর অলৌকিক রূপলাবণ্য বশতঃ গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে সুন্দরী মলয়াবতী বলিয়া সম্ভাষণ করিত।

অভাগিনী মলয়াবতী ভূমিষ্ঠ হইবার দুই এক মাস পরেই, তাহার পিতা পরলোক গমন করেন, তিনি তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না; জাতিতে ব্রাহ্মণ—দুই এক স্থানে যাজকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করিতেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে অন্য কেহ অভিভাবক না থাকায়, মাতা ও কন্যার দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। গৃহস্বামীর জীবদ্দশায় পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তাঁহারই স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে, পরিবারভুক্ত অন্য কাহাকেও সে জন্য চিন্তিত থাকিতে হয় না; তিনি যে কোন উপায়ে হউক স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহ-স্বামীর অবর্ত্তমানে সংসার মরুভূমির ন্যায়, প্রতিক্ষণেই

ভাবি অভাব স্মরণ করিয়া হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতে থাকে; মলয়াবতীর জননীর অদৃষ্টে এক্ষণে সেই দশা সংঘটিত হইল। ব্রাহ্মণ-বণিতা পৈতা বিক্রয় করিয়া যৎসামান্য অর্থোপার্জ্জন দ্বারায় দুহিতা ও আপনার গ্রাসাচ্ছাদন ব্যয়তার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

দুঃখিনী জননীর সর্ব্বস্বধন, প্রিয়তম কন্যা, মলয়াবতী যে কোন উপায়ে কন্যাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই মাতা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। এক বৎসর পূজার সময় পল্লীস্থ কোন গৃহস্থের কন্যার রক্তিমবর্ণের একখানি বস্ত্র দেখিয়া, মলয়াবতী সেইরূপ একখানি কাপড়ের জন্য মাতার নিকট আবদার করিয়াছিল; ব্রাহ্মণী দুঃখে কষ্টে ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করেন, কিছুই সঙ্গতি নাই; তথাপি কন্যার আবেদন নিষ্ফল হইল না; তিনি যথাযথ মূল্যে একখানি লাল রঙ্গের কাপড় ক্রয় করিয়া দিলেন, বালিকা সেই বস্ত্রখানি পরিধান করিলে অতীব সুন্দরী দেখাইত।

এই ভাবে কিছু দিন গত হইলে মলয়াবতীর জননী এক দিন কয়েকখানি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ও একটী বাটীতে কিছু গুড় দিয়া বালিকাকে বলিলেন,—মলয়া! এই কয়েকখানি পিষ্টক ও এই গুড়বাটী-টি লইয়া তোমার দিদিমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এস; লোকমুখে শুনিয়াছি তিনি পীড়িতা আছেন, তোমার হাতে খাবার পাইয়া না জানি তিনি কতই আহ্লাদিতা হইবেন।" মলয়াবতীর দিদিমাতার বাটী, তাহাদের বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অন্য এক ক্ষুদ্র গ্রামে। অল্প বয়স্কা বালিকা মাতার আদেশানুসারে পিষ্টক কয়েকখানি ও গুড়ের বাটাটি একটী চুবড়ী করিয়া লইয়া জননী প্রদত্ত লোহিত বর্ণের বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দিদিমাতাঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিবার উদ্দেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল।

সরলা বালিকা এক বন-পথ দিয়া যাইতেছিল, পথিমধ্যে অকস্মাৎ এক বৃহৎ ব্যাঘ্রের নয়ন-পথে পতিত হইল; শার্দ্দুলেরও সেই সুন্দরী কুমারীটিকে উদরসাৎ করিবার একান্ত অভিলাষ জন্মিল; কিন্তু সন্নিকটস্থ বনভাগে কতিপয় কাঠুরিয়া কাষ্য করিতেছে, দেখিতে পাইয়া, তাহার সেই অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইল না। যাহা হউক, ধূর্ত্ত তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া সাহসে ভর করিয়া মলয়াবতীকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইতেছ?"

সরলা বালিকা হিংস্রের সহিত আলাপ পরিচয় যে কত ভয়ানক বিপদজনক তাহার কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া উত্তর করিল "আমার দিদিমার সহিত দেখা করিতে যাইতেছি; তাঁহার কারণ পিষ্টক ও গুড় আনিয়াছি, 'এই কথা বলিয়া বালিকা অগ্রসর হইল, কিন্তু ব্যাঘ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কি অনেক দূরে বাস করেন?"

মলয়াবতী। না, ওই যে দূরে একটী বট গাছ দেখা যাইতেছে, উহার পাশ দিয়া যে পথ আছে, ঐ পথের শেষেই আমার দিদিমার বাড়ী"

ব্যাঘ্র।—"ভাল, আমিও তোমার দিদিমার নিকটে যাইব এবং তাঁহাকে দেখিয়া আসিব। তুমি এই পথ দিয়া যাও, আমি অন্য পথে অগ্রসর হইলাম; দেখি, আমাদের মধ্যে কে অগ্রে পৌঁছিতে পারে!"

ব্যাঘ্র সাধ্যমত, যে পথ দিয়া শীঘ্র যাওয়া যাইতে পারে, সেই পথেই ধাবমান হইল; এদিকে ক্ষুদ্র বালিকা শার্দ্দুলের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া সুদীর্ঘ-পথ দিয়া যাইতে লাগিল; মলয়াবতী পথে যাইতে যাইতে কোথাও ফুল কুড়াইয়া, কোথাও বা প্রজাপতি ধরিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়া, হয়ত পথপার্শ্বস্থ পুষ্প-বৃক্ষ হইতে কুসুম চয়ন করিয়া তোড়া বাঁধিতে বাঁধিতে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাইয়া যাইতে লাগিল।

হিংস্র প্রকৃতি ব্যাঘ্র সত্বর সেই বৃদ্ধার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, বহির্দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। বৃদ্ধা জাসা করিল কে ও!"

ব্যাঘ্র বালিকার মত কোমল স্বরে উত্তর করিল, আমি তোমার নেয়ী মলয়াবতী। মা তোমার জন্য কয়েক খানি পিষ্টক ও এক বাটী গুড় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; আমি সেই সমস্ত খাদ্য সামগ্রী লইয়া আসিয়াছি।"

বৃদ্ধা তৎকালে রোগের যন্ত্রনায় শয্যাগত হইয়া পড়িয়া ছিলেন; অধিকন্তু তিন দিবস অনাহারে কাল যাপন করায় এরূপ জীর্ণা শীর্ণা ও ক্ষমতাহীনা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এক কালে তাঁহার উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছিল; পুনঃ পুনঃ দ্বারোদ্ঘাটনের অনুরোধ অবশেষে তিনি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিলেন, হুড়কাটী ধরিয়া টানিলেই দরজা খুলিয়া যাইবে।" ব্যাঘ্র বৃদ্ধার কথানুসারে অর্গল ধরিবামাত্র দ্বারোদ্ঘাটিত হইল; ব্যাঘ্র বাক্যব্যয় না করিয়া লম্ফন পূর্ব্বক কঙ্কালাবশিষ্ট সেই বৃদ্ধাকে আক্রমণ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই উদরসাৎ করিল। তৎপরে দ্বারদেশের অর্গল বদ্ধ করিয়া মলয়াবতীর আগমন-প্রতীক্ষায় সেই বৃদ্ধার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। ইতিমধ্যে মলয়াবতী দ্বারদেশে উপনীতা হইয়া দরজা খুলিয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলে, চতুর ব্যাঘ্র গৃহ হইতে প্রশ্ন করিল "কেও!" স্বরের তারতম্যে বালিকার মনে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ভয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু হয়ত দিদিমার কম্পদিয়া জ্বর আসিয়াছে, তাই তিনি স্পষ্টভাবে কথা কহিতে পারিতেছেন না অনুমান করিয়া উত্তর করিল, "আমি মলয়াবতী।" ব্যাঘ্র অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল যে, অর্গলটী ঠেলিলেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তদনুসারে মলয়াবতী দরজা খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ব্যাঘ্র ইতিপূর্ব্বেই বিছানার চাদরে সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত করিয়া শুইয়াছিল এবং সেই সুকোমলমতি মলয়াবতীকে দেখিতে পাইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ স্বরে বলিল, "দিদি! তুমি অনেক কষ্ট করিয়া চলিয়া আসিয়াছ; এস, তক্তাপোষের উপর খাদ্যসামগ্রী রাখিয়া গায়ের কাপড়-চোপড় খুলিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া বিশ্রাম কর।"

মলয়াবতী তদনুসারে পরিচ্ছদাদি উন্মোচনান্তর শয্যায় শয়ন করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু তাহার স্নেহময়ী দিদিমাতাঠাকুরাণীর বিভিন্ন ভাব দর্শনে এককালে বিস্মিত হইয়া বলিল, "দিদিমা! তোমার এমত বৃহৎ হাত কবে হইল?"

ব্যাঘ্র।—"তোমাকে দৃঢ়ালিঙ্গন করিবার জন্য হইয়াছে।"

মলয়াবতী।—"দিদিমা! তোমার কি লম্বা লম্বা কর্ণ!"

ব্যাঘ্র।—"তোমার কথা ভালরূপে শুনিতে পাইব না বলিয়া কান দুইটী দীর্ঘ করিয়াছি।"

মলয়া। "দিদিমা, তোমার কি বড় বড় চোখ!"

ব্যাঘ্র।—"মলয়া! ইহাও তোমাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য!"

মলয়া।—"দিদিমা তোমার কি প্রকাণ্ড দাঁত!"

ব্যাঘ্র। "জানিস না! এ সকল তোকে উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিবার উদ্দেশ্যে।"

এই কথা বলিয়াই দুরাত্মা ব্যাঘ্র অবলা কুমারীর প্রতি সতেজে আক্রমণ করিল ও দুই চারি গ্রাসেই তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

শ্রীরাধানাথ মিত্র।

ওলাউঠা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মাত্রা।—ইহার ব্যবহারের নিয়ম প্রয় ব্যবস্থাপনে লিখিত আছে, ১—৫ ফোঁটা চিনি সহযোগে। বাস্তবিকপক্ষে, কাহার পক্ষে কম, কাহারও পক্ষে বেশী প্রয়োজন হয়। আফিং-ব্যবহারকারীদিগের জন্য বেশী দরকার হয়; আবার যাহাদের স্বাভাবিক শীঘ্র শীঘ্র বমন হয়, তাহাদের জন্য অল্প মাত্রায় প্রয়োজন হয়। গৃহস্থ, ২। ৩ মাত্রা দিয়া যদি উপকার না হয়, অমনি আর প্রয়োগ করেন না, বা ২। ৩ বার দিয়া যদি কিছু উপকার হয় অর্থাৎ ২। ৩ ঘণ্টা বাহ্যে না হয় এবং রোগীর অল্প নিদ্রা আইসে ও তারপর, যদি আবার দুই একবার বাহ্যে হয় অমনি সে ঔষধ বন্ধ করিয়া অন্য ঔষধ দেন। বাস্তবিক পক্ষে কর্পূরের আরকের উপকার শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। তবে আমরা একথা বলিয়া রাখি যে, ২।৩ মাত্রা দিয়া উপযুক্ত চিকিৎসককে যেন আহ্বান করেন। অনেক সময়ে অধিক মাত্রায় কর্পূরের আরক সেবন করান হয় এবং রোগীর ভয়ানক গাত্রদাহ ও উহার পাকস্থলির মধ্যে ভয়ানক জ্বালা করিতে থাকে। তখন রোগীর অবস্থা হইলে ভাল "বার্লি" এবং রোগ প্রবল থাকিলে 'ফস্ফরাস্' ১২ নামক ঔষধের দুই এক মাত্রা সেবন করাইলে আশু উপকার হয়।

মন্তব্য।—ফল কথা, যখন চারিদিকে ওলাউঠা হইতে থাকে, তখন কাহারও পাতলা বাহ্যে, গা শীত শীত করা, মাথা ঘোরা, নাড়ীতে বেগ বেগ হওয়া বা সজোর নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে, কর্পূরের আরক দেওয়াতে উপকার ছাড়া অপকার হয় না। বিলম্ব হইলে আর যেন কর্পূরের আরক না দেওয়া হয়। সে সময়ে চিকিৎসকের হস্তে সে ভার ন্যস্ত করা উচিত

পিপাসা।—এই রোগে ভয়ানক পিপাসা থাকে। তবে একথা যেন কেহ মনে করেন না যে, পিপাসা না থাকিলে এই পীড়া হয় না। এই পিপাসা নিবারণার্থ বরফ দেওয়ার ব্যবস্থা সহরে খুব প্রচলিত আছে। কেহ বরফের টুকুরা জিহ্বায় রাখিতে বলেন, কেহ বরফ জলে দিয়া সেই বরফ জল পান করিতে দেন। কিন্তু আমাদের মতে ইহা অপেক্ষা একটি গেলাসে জল রাখিয়া উহার চারিদিকে বরফ রাখিয়া ঠাণ্ডা জল পান করিতে দেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। যেহেতু ঐরূপ প্রণালীতে বরফের ময়লাগুলি (Impurities) ভেদবমি রোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করান হয় না। পল্লীগ্রামে আবার এই ভীষণ তৃষ্ণার সময়ে জল পান করিতে দেওয়া হয় না; বমনের ভয়ে সহরেও অনেক চিকিৎসক অধিক জল পান করিতে দেন না। কিন্তু উহাতে অধিক অপকার হইয়া থাকে। শেষাবস্থায় প্রস্রাব হইতে বড়ই বিলম্ব হয়।

সকলেই জানিয়াছেন যে, এই রোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ভাল। কিন্তু উত্তম চিকিৎসক নির্ব্বাচন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চিকিৎসককে এই রোগের নিকট উপস্থিত রাখিতে হয়। এই রোগে সর্ব্বক্ষণ লক্ষণের পরিবর্ত্তন হয়, এজন্য সর্ব্বদাই ঔষধ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। দুই ক্রোশ দূর হইতে চিকিৎসক আসিয়া এক অবস্থা দেখিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন, তিনি যাইতে না যাইতে রোগের অন্য লক্ষণ প্রকাশ পাইল, গৃহস্থ না জানিয়া সেই ঔষধই সেবন করাইতে লাগিলেন। এইরূপ হওয়াতে অধিক অপকার হয়। হয় চিকিৎসক, না হয় সুদক্ষ পরিচর্য্যাকারী—এই রোগে সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়।

(ক্রমশঃ)

দূরবন্ধুর্গতোহহম্। *

কালিদাসের যক্ষ, রামগিরির আশ্রমে প্রিয়া-বিরহে কাতর হইয়া, গতিশীল মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'দূরবন্ধুর্গতোহহম্'। তুমি আমি কতবার এই সৌধসঙ্কুল মহানগরিতে দাঁড়াইয়া বলিয়া থাকি, "দূরবন্ধুর্গতোহহম্"। আবার গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ-বিরহে কাতরা হইয়া দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হয়ত কতবার বলিয়াছেন, "দূরবন্ধুর্গতোহহম্"। মানুষের হৃদয়ে যেন এইরূপ একটা ভাব সর্ব্বদাই জাগরুক রহিয়াছে। যেন কোথাও বন্ধু আছে, যেন অনেক দূরে কে আমায় আনিয়াছে, যেন এই সমস্ত মনুষ্য, এই সমস্ত প্রাণী, কেহ আমার নয়, কেহ আমায় বন্ধু বলে না, যেন কখন সেথায় ফিরিতে পারিব না, তাই মনের আক্ষেপে বলিয়া উঠি, "দূরবন্ধুর্গতোহহম্"। সেখানে গিয়া সে বন্ধুকে বুঝি দেখিতে পাইব না, মনের সাধে তাহায় কখন সাজাইতে পাইব না। এখানে যাহাদের সহিত প্রমোদ-মদিরা পানে উন্মত্ত হই, যাহাদের নিগ্রহে সেই দূরবন্ধুর কথা বিস্মৃত হই, যাহাদিগকে বন্ধু ভাবিয়া অকপটে প্রাণ খুলিয়া কথা কই, যেন তাহাদের সহিত বাক্যালাপকালে এক-একবার অন্তর ভেদ করিয়া কথা উঠে, "দূরবন্ধুর্গতোহহম্"। তখন কি এক দৃশ্য মানসচক্ষে যেন ভাসিয়া উঠে, আমি সেই পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিতে পারি না; কার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া উঠি।

একদিন নিকটে ছিলাম, একদিন তাঁহার মুরলি-ধ্বনি শুনিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া প্রাণের সখা বলিয়া ডাকিয়াছি। বাল্যকালে, অনন্ত জলধিতীরে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনন্তাকীর্ণ, অনন্ত-বিক্ষিপ্ত অনন্ত-পরিব্যাপ্ত মধুর সংগীত কতবার হৃদয়ে শব্দিত হইতে শুনিয়াছি। এখন যেন কে আমায় লোভ দেখাইয়া, কে আমায় প্রতারণা করিয়া, কে আমায় প্রমোদ-মদিরা পান করাইয়া, মায়া-মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া, কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে! আমি সে মনমুগ্ধকারী বংশিধ্বনি আর শুনিতে পাই না, সে গীত আর কর্ণে প্রবেশ করে না, সে অনন্তাকীর্ণ অনন্তপরিব্যাপ্ত ধ্বনি আর যেন হৃদয়ে পুনঃ প্রতিধ্বনিত হয় না। আর যেন সেই মুরলিধ্বনির মধুর নিনাদে হৃদয় মন অন্তরাত্মা আমূল কম্পিত হইয়া উঠে না, আর যেন কি আসিয়া হৃদয়কে পরিবেষ্টন করিয়া আছে; যেন কাহারও কোন কৃত্রিম গৃহে আমি আবদ্ধ, যেন কৃত্রিম রূপ রসগন্ধ স্পর্শলব্ধ ভিন্ন অন্য কিছু আমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না।

কিন্তু যে ধ্বনি হৃদয়ে হৃদয়ে মাখা, যাহার বাক্য প্রাণে প্রাণে জড়িত, যাহার স্নেহ যাহার ভালবাসা অভাব্য অবর্ণনীয়, যাহার অনুভূতি সুখের উপরেও কি যেন একটু সম্ভোগ করাইয়া দেয়, এত কৃত্রিমতার মধ্যে থাকিয়াও, সেই শব্দ যেন অন্তর ভেদ করিয়া, যেন সেই অনোরনীয়ান্ প্রদেশ হইতে স্থূলকর্ণে শব্দিত হয়। তখন বলিয়া উঠি, "দূরবন্ধুর্গতোহহম্"। কোথায় সেই বন্ধু, কোথায় সেই অনন্ত প্রেম, কোথায় সেই আনন্দ! এখানকার সমস্তই যেন আমার চক্ষে বিস্ব হইতেছে, আমার কর্ণে বিকটধ্বনি করিতেছে, আমার হৃদয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছে। হায়! কোথায় সেই বন্ধু, কে আমায় এত বন্ধন করিয়া তাহার কাছে যাইতে দিতেছে না! হায়! কেন আজি 'দূরবন্ধুর্গতোহহম্' হইলাম। এখানে যাহাদের সঙ্গে আমি আলাপ করিতেছি, তাহারা ত আমার পরিচিত নহে, ইহাদের ত আমি কখন দেখি নাই। ইহারা আমায় কেন এরূপ করিতেছে? ইহাতে ইহাদের কি স্বার্থ আছে? ইহাদের কৃত্রিম প্রণয়ে যে আমি ব্যথিত, ইহাদের কপট

* "দূরবন্ধুর্গতোহহং" অহং শব্দের বিশেষ করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। মেঘ দূতে এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বৈয়াকরণ মহাশয়গণ ক্ষমা করিবেন।

সৌজন্যে যে আমি ভীত! এখানে আমার সে বন্ধু ত নাই? তেমন হাসি কাহারও মুখে ত দেখিতে পাই না, তেমন সারল্য পূর্ণ দৃষ্টি ত কাহারও নাই, তেমন সুমিষ্ট বাক্য ত কাহারও পাই না, তেমন আদর করিয়া ত কেহ ডাকিতে জানে না, তেমন করিয়া ত কেহ কাছে বসেনা, তেমন রূপ ত কাহারও নাই: ইহাদের আকার ইঙ্গিতে আমার ভয় হইয়াছে ইহাদের হাবভাবে আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে। ইহাদের কি যেন কু-অভিসন্ধি আছে, ইহারা যেন আমার কিছু করিবার জন্য এমন করিয়া রাখিয়াছে; ইহাদের যেন কি এক ঘোর স্বার্থ আছে। এখানে আমার সে বন্ধু নাই, আমি এখানে থাকিব না। হায়! আজি 'দূরবন্ধুর্গতোঽহম্।'

হায়, ইহাদের কি কুহক! দূরশ্রুত সরল পক্ষীর সারল্য সংগীতে যখন আমার মন চঞ্চল হয়, নূতন মেঘের ধ্বনি শুনিয়া যখন আমি নিস্তব্ধ হই, শ্যাম সন্ধ্যা সময়ে, সুনীল আকাশ পটে অগণ্য তারারাজির উদয় দেখিয়া যখন আমি গম্ভীর হই, মেঘমালার সহিত তড়িত লতার ক্রীড়া দেখিয়া যখন আমি ব্যাকুল হই, তখন ইহারা আমার সে ভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করে। ইহারা কি কপটী! তখন ইহারা যেন ভীত হইয়া, নানারূপ গানবাদ্য রহস্য করিয়া আমায় ভুলাইতে চায়। আমি কতবার এইরূপে ভুলিয়া, সেই বন্ধুকে ভুলিয়া যাই। কিন্তু আমার সেই বন্ধুর প্রণয়? হায়, আর কি তাহা পাইব? সে আমায় চিন্তা করে, সে আমার কথা ভাবিয়া থাকে। আমিও মনে মনে অনুভব করি, সে আমায় ডাকিতেছে। হায়, সে কত ভাল! আমি তাহার সব ভুলিয়া যখন এই অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকি তখন সময়ে সময়ে হঠাৎ যেন সেই দূরবন্ধুর দৃশ্য বিদ্যুতের মত দেখা দিতে দিতে আমার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যায়। সে যখন আমায় ডাকে, কোটি কোটি যোজন অন্তরে থাকিয়াও আমি মনে মনে তাহার সুমিষ্ট, সোহাগপূর্ণ বাদ্য যেন সুস্পষ্ট শুনিতে পাই। হায় এখানকার লোকে আমায় কি অকৃতজ্ঞ করিয়াছে। আমি এখানে থাকিব না। আজি 'দূরবন্ধুর্গত'; আমি তাহার কাছে যাইব।

কিন্তু সে যে অতি দূর দেশ। আ একাকী কিরূপেই যাইব? আর সঙ্গে কেহ যাইবে না? এখানে অনেকে আমার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, অনেকে আমায় বলিয়া থাকে, তাহারা আমায় বড় ভাল বাসে! কিন্তু কৈ কেহ ত যাইতে চায় না! আমি একাকী যাত্রা করিব।

কত নদী, কত পর্ব্বত, কত দেশ, কত উপ দেশ পশ্চাৎ করিয়া আসিলাম, কিন্তু কোথা সে? সে যে আমায় ডাকিয়াছিল, সে আমায় স্মরণ করিয়াছিল! আমি অকৃতজ্ঞ আমি প্রতারিত—আমি এখানে নরকপ্রা স্থানে থাকি। কিন্তু তথাপি তাহার জন্য প্রা অস্থির হইত, মন চঞ্চল হইত। সে যে তখন আমায় ডাকিয়াছিল! তবে সে কোথায়? তাহার দ্বারে এত প্রহরী কেন? দ্বারী ত দ্বার ছাড়ে না! কেন সে আমায় দেখিতে দেয় না? তাহার নাম করিলাম, তাহার পরিচয় দিলাম, তথাপি ত দেখিতে দেয় না। আমার পরিচয় দিলাম—ইহারা যে আমায় চেনে না!—তাহার নাম করিলেও যে আমায় ইহারা তাড়াইয়া দেয়! সে যে আমায় কত ভালবাসে, ইহারা কি তাহা জানে না? এত মিনতি করিতেছি, এত কাতরোক্তি করিতেছি, হায়! ইহারা কর্ণপাতও করে না। হায়, এখানে কেন আসিলাম। হায়, এখানেও বন্ধু দূরগত।

বেদব্যাস।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

উপহার দেয় কি করিয়া?

আজকাল লোকে কথায় কথায় উপহার, কথায় কথায় সস্তায় জিনিস দিতে চাহে কিন্তু ভ্রান্ত গ্রাহকগণ এপর্য্যন্ত তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এই দুঃখ। সাদা কথায় বুঝিলেই বুঝা যায় যে, ব্যবসায় করিতে বসিয়াছে যে ব্যবসায় করিয়া আপন জীবিকা-নির্ব্বাহ ও দুষ্কর্ম্ম সকল সিদ্ধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে আবার জিনিস বিক্রয়ের সময় উপহার দেয় কি করিয়া? কিন্তু আজকাল বিজ্ঞাপন মাত্রেরই বোল হইয়াছে ঐরূপ। পাঠকও একথা একবার ভবেন না যে, বিজ্ঞাপনদাতা উপহার দেয়, কোথা হইতে?

অগ্রেই বিক্রেয় জিনিস খেলো না করিয়া বা তাহার দাম দ্বিগুণ-ত্রিগুণ না ধরিয়া, উপহার যে তাহারা কোনরূপেই দিতে পারিবে না, একথা স্থির-নিশ্চিত। ব্যবসায় করিতে বসিয়া, ঘরের পয়সা অপরকে সদাব্রত দান কি কেহ করিয়া থাকে? উপহার বা বিজ্ঞাপন দেখিয়া সস্তায় জিনিস কেনা সম্বন্ধে প্রধানতঃ ক্রেতা-মাত্রেরই এইটুকু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আজকাল যত যিনি উপহার বা সস্তায় কিছু দিতে চাহেন না কেন, শতকরা দুই-একটী ব্যতীত, প্রায় সকলেরই গূঢ় অভিসন্ধি এক। সুতরাং গ্রাহকগণ সস্তায় বা উপহার-সহ জিনিস কিনিবার সময়ই যেন স্মরণ করিয়া টাকাকড়ি পাঠান। আর প্রথমে এরূপ বিবেচনা করিলেই পরে আর অনুতাপ করিতে হইবে না, ইহাই যেন সকলের স্মরণ থাকে।

উপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত,

১০৮।১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা— এই নাম ও ঠিকানা দিয়া আজকাল আবার এক নূতন বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বিজয়ীর সেই সর্বজানিত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত নানারূপ নাম ও ঠিকানার কারচুপী করিয়া ঐ ঠিকানা হইতে বিজ্ঞাপন দিয়া লোক ঠকাইয়াছেন। কিন্তু এখন আবার সন্ধানে জানা যায়, এও সেই পূর্ণচন্দ্রের লীলা। নিজের নাম লোকে চিনিয়াছে এইজন্যই সম্ভবতঃ, তিনি আবার এই নূতন লোকের নামে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। যাহৌক, পূর্ণচন্দ্রের কথা আর আমরা বলিতে চাহিনা বলিতেও প্রবৃত্তি নাই। মধ্যে 'অপূর্ব্ব পঞ্চায়ৎ' নামক যে পত্রিকা বাহির হইয়াছিল, শুনা যায়, এই শ্রীমান পূর্ণচন্দ্রই শেষে পঞ্চায়তেরও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিয়া আসিয়াছেন। আর মরণকালে সেইজন্যই সম্ভবতঃ, পঞ্চায়ৎও আবোল তাবোল বকিয়াছিল। ফলতঃ পূর্ণচন্দ্রের এখনও মতি ফিরে নাই আমাদের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

ধর্ম্মের নামে প্রেমের পুস্তক।

গড়ক ডাকঘর, সিকিম হইতে বাবু চন্দ্রভূষণ লাহড়া সব্-ওভারসিয়ার লেখেন,—'মহাশয়, বাল্মীকি পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রী নবকুমার দত্ত মহাশয় 'বঙ্গবাসী-পত্রিকায় অনেক রামায়ণ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন তাহা দেখিয়া তাঁহাকে উক্ত রামায়ণ এবং উহার উপহার সহ ভেলুপেএবল ডাকে পাঠাইতে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, বলিতে লজ্জা হইতেছে যে, উক্ত দত্তজা মহাশয় রামায়ণও উপহার না পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে তিনখানি 'প্রেমলহরী, 'প্রেমরহস্য ইত্যাদি অর্থাৎ প্রেমের পুস্তক ১।।৵ মহ। ভি, পি, ডাকে পাঠাইয়াছেন। মহাশয়! যে রামায়ণ পড়িতে চাহে তাহার পক্ষে প্রেমের বহি কেমন বোধ হয়? এপ্রকার শঠতার কারণ কি? এবং না চাহিতেই বা অমন সব পুস্তক কেন পাঠান হয়? রামায়ণ ইত্যাদি ভাবিয়াই আমি পেকেট খুলিয়াছিলাম। আমার প্রার্থনা যে, এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে অপর কোন গ্রাহক এপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েন তাহা করেন। উক্ত দত্তজা মহাশয়ের ঠিকানা ১০৭ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

উপহার-চোরের এই ই পরিণাম।

লেটেকুজান চা-বাগান, রাঙ্গাজান পোষ্ট, আসাম হইতে বাবু সোমেশ্বর দত্ত বলেন,—"মহাশয়, অদ্য চারি মাস গত হইল, জগৎবাসীর গ্রাহক হইবার জন্য পত্র লিখি। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু আর, এল, ঘোষ মহাশয় একখানি পোষ্টকার্ড সমেত কতকগুলিন মাথামুণ্ড পুস্তক উপহার ভেঃ পেঃ পারসেলে পাঠাইয়া দেন; আমি ২৲ টাকা দিয়া পুস্তক গ্রহণ করি। তৎপর আজ পর্য্যন্ত কিন্তু জগৎবাসী পাইলাম না. পত্র লিখিলেও উত্তর পাই নাই। এক্ষণে মহা-

শয়ের শরণাপন্ন হইলাম। আপনি জুয়াচুরির প্রতিবিধান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তজ্জন্য মহাশয়ের নিকট যোড়হস্তে নিবেদন করিলাম। আমি গরিব লোক; ২৲ টাকা ক্ষতি হইলে বড় মনকষ্ট পাইব। এক্ষণে সানুনয়ে নিবেদন, যাহাতে কিছু বিধান হয় এমত করিয়া দিলে কৃতজ্ঞতা-পাশে চিরকাল বদ্ধ থাকিব। আগে জানিলে কখনই গ্রাহক হইতে যাইতাম না। আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, করিবেন। নিবেদন, ইতি ৮ অগ্রহায়ণ।"

সংবাদ।

—আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতার গঙ্গার পুলের মাশুল উঠিয়া যাইবে, এইরূপ ঘোষণাজারি হইয়াছে। লোক-জনের তো কথাই নাই; গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতিরও মাশুল লাগিবে না।

—গ্লাডষ্টোন সাহেবের লাইব্রেরীতে অন্যূন ১৫ হাজার পুস্তক আছে এবং তাহার সকলগুলিই নাকি তাঁহার সুপরিচিত।

—ব্রিটিস-দ্বীপে প্রত্যহ ৫ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চায়ের খরচ হয়।

—সম্প্রতি উজ্জয়িনী হইতে ১৩ মাইল দূরে গবর্ণমেণ্টের ডাক গাড়ি লুঠ হইয়াছে। মেইল এবং আরোহীদিগের সমস্ত জিনিস-পত্রও দস্যুরা লইয়া পলাইয়াছে।

—প্রজাবন্ধুর সম্পাদক মহাশয়ের জেল হইয়াছে বলিয়া যে গুজব উঠে, তাহা মিথ্যা। সম্পাদক মহাশয় বলেন, এখনও কেহ কিছুই করিতে পারে নাই। এ সংবাদে আমরা বড়ই সুখী হইলাম।

—ঢাকার একজন পুস্তক-বিক্রেতা, পুস্তকের গাঁটের সঙ্গে লুকাইয়া আফিং চালান আনিয়া বিক্রয় করিত। তজ্জন্য তাহার দণ্ড হয়। কিন্তু এখন সে আপিলে নিষ্কৃতি পাইয়াছে।

—গত ২৩ পৌষ রাত্রি ১১টা ৫মিনিটের সময় কলিকাতায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

—উলুবেড়িয়ার একটী যুবক তাহার বৃদ্ধ পিতাকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়া তাহার দশ দিন কারাদণ্ড হইয়াছে।

—সম্প্রতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে, স্ত্রীলোকটী নাকি ওজনে ১০ মন ২৫ সের।

—বর্দ্ধমান ও বীরভূম বিভাগ হইতে যে সকল বালককে কলিকাতায় এণ্টেন্স পরীক্ষা দিতে আসিতে হইত, এবার হইতে বর্দ্ধমানেই তাহাদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

—নিউ-জিলণ্ড দ্বীপে মেওরি নামক এক অসভ্য জাতি আছে। তাহাদের একজনের এক সময় জুতা পায়ে দিবার সখ হয়। কিন্তু জুতা কিনিয়া আনিলে তাহা একটু ছোট হয়। সুতরাং সে তখন পায়ের অঙ্গুলি কাটিয়া পা একটু ছোট করিয়া লইয়া, জুতা পরার সখ মিটাইল।

—ফিলিপাইন দ্বীপের কোন এক জাতির বিবাহ-প্রণালী বড়ই বিচিত্র। সহজে নুইয়া পড়ে এমন দুইটী গাছে, পাত্র ও পাত্রী আরোহণ করে। পরে বংশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আসিয়া গাছের মাথা নোয়াইয়া পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দেয় এবং এইরূপ করিলেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এ বড় অদ্ভুদ প্রথা বটে;

—কলির কুম্ভকর্ণ ভিন্ন ইহাকে আর কি বলিব? একজন ফরাসী সম্প্রতি ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। গত বৎসর তিনি একাদিক্রমে ২৩ দিন নিদ্রা গিয়াছিলেন। এবার ইংলণ্ডে আসিয়াও প্রায় ৫।৭ দিন নিদ্রিত আছেন। এখন, এ নিদ্রা কবে ভাঙ্গিবে, তাহার স্থির নাই।

—এবৎসরকার এম এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ৬৯ জন ব্যক্তি এবার এম এ পাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩২ জন ইংরাজী-সাহিত্যে, ১৬ জন মনোবিজ্ঞানে, ১২ জন সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ৯ জন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—একটী ভৃত্যের সহিত জনৈক মাড়োয়ারী কলিকাতায় আসিতেছিলেন। ট্রেণ মোকামা ষ্টেসনে পৌছিলে তাঁহার ভৃত্য নগদ টাকা ও নোটে তাঁহার প্রায় ১২০০ হাজার টাকা লইয়া পলায়ণ করিয়াছে।

—ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে ভারতীয় ইংরাজ-সৈন্যদিগকে অতঃপর রুষ-ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহার কারণ কি, এখনও প্রকাশ নাই।

—দার্জ্জিলিং জেলায় আলুর চাসের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ৫০০ টাকা ব্যয় করিতেছেন।

—একটী তিব্বতী বালককে প্রশ্ন কর, তোমার পিতার নাম কি? সে অমনি পাঁচ ছয় জন লোকের নাম করিবে! পাঠক হাসিবেন না, ইহাই প্রকৃত কথা। কারণ, গরিব তিব্বতীয়েরা এক একটী ভার্য্যার ভরণপোষণ করিতে না পারায়, দুই-চারি জনে মিলিয়া ঐরূপ ভাগে বিবাহ করে। রহস্য মন্দ নয়!

—ফৌজদারী দণ্ড-বিধির মধ্যে কলিকাতার হাইকোর্ট সম্প্রতি এই একটী নূতন বিধি সৃষ্টি করিতে চাহেন। অর্থাৎ কোন আসামীর খালাসের জন্য প্রার্থনা হইলে ও সে খালাস পাইবার যোগ্য হইলে, একেবারে জেলাধ্যক্ষের উপর তাহার খালাসের ভার অর্পিত হইবে। ইহাতে কোন আসামী খালাস পাইবার আদেশ পাইলেও, পর পর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে খালাস পাইতে তাহাকে যে বিলম্ব ভুগিতে হইত, তাহা আর হইবে না।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ২৯এ পৌষ ১২৯৫ সাল। [১১শ সংখ্যা।

তরঙ্গ।

তরঙ্গিনী-কোলে ওই স্রোতগুলি ভাসি যায়।*
অনন্তের সখা তাই, অনন্তের পানে ধায়!
চঞ্চল প্রয়াণে স্রোত চ'লেছে রে ধীরে ধীরে।
কভু-উঠে, কভু নামে, মধুর মধুর দোলে।
পাইয়া সাঁজের আলো. গোধূলি রক্তিম-ছটা;
হাসিতে হাসিতে চলে, বিকাশি রূপের ঘটা;
তরঙ্গ যৌবন ল'য়ে—মাতিয়া গরব-ভরে।
কুলু কুলু বহি যায়. মধুর মধুর স্বরে।
সে মধুর বংশীরব, পশিয়া প্রাণের মাঝ.
সঞ্জিবনী শক্তি-সুধা—ঢালিল প্রাণেতে আজ!
উঠিল তরঙ্গ প্রাণে, প্রেমভরা টল টল।
হৃদয় আগার ক'রে কুলু কুলু ঝলমল।
নবীন এ ক্ষুদ্র প্রেম, অনন্ত প্রেমের সনে,
মিশিবে কি দুলে দুলে, মাতিবে কি বিভু-গানে?
প্রবল বাত্যায় পাছে, আধ পথে মিশি যায়।
আঁধা রেতে পথ ভুলে—পাছে অন্য পথে ধায়!
প্রেমের অঙ্কুর ছোট; কলি প্রায় নাহি ফুটে!
বিঘ্ন-বাধা, ঝটিকায়—পাছে ও'র প্রাণ টুটে!
ক্ষুদ্র ও'র দেহখানি, ক'রে দেয় চুরমার!
তা হ'লে এ শূন্য প্রাণে, প'ড়ে রবে হাহাকার!
তরঙ্গ প্রাণের আশা! হেরিয়া তোমারে আজ,
আশা মনে, প্রেম যেন, ফুটিবে হৃদয় মাঝ।

---

*স্ব . রু উচ্চারণে ইহা পাঠ করিতে হইবে।

পাপীর আত্মকথা।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে ক্রমে।

"সন্ধ্যা হইতে হইতেই ঐ বাড়ীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। বাড়ীর সকলেই মনোহারিণী বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া, মুখে পাউডার মাখিয়া যেন স্বর্গীয় পরীর রূপ ধারণ করিল; ও কেহ উপরের বহির্ভাগের বারাণ্ডায়, কেহ বা নিচের দরজায় যাইয়া উপবেশন করিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল স্ত্রীলোকের পুরী ছিল, কিন্তু এখন হইতে পুরুষের আগমনও আরম্ভ হইল। কেহ পরিচিতের ন্যায়, কেহ অপরিচিতের ন্যায়, কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে, কেহ একাকী, কেহ বা বন্ধুবান্ধব সমভিব্যবহারে সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ, এবং বাটী হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। কোন ঘরে গান-বাদ্য, কোন ঘরে নৃত্য-গীত, কোন ঘরে হাসি-ঠাট্টা এবং কোন ঘরে বা মদ্যপানাদি চলিতে লাগিল। সকলেই যেন আমোদে বিভোর, আহ্লাদে গদগদ ও পরম সুখে সুখী বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ

সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রথম রাত্রে আমার কিন্তু উহা ভাল লাগিল না, আমি আমার ঘরের বাহির হইলাম না, সমস্ত রাত্রি দিনের পরিশ্রমহেতু আমরা উভয়েই শয়ন করিয়া রহিলাম। কিন্তু ভালরূপ নিদ্রা হইল না; নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল। কখনও আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার নিমিত্ত মন কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, তাঁহাদের যত্ন ও ভালবাসার কথা মনে হইতে লাগিল, চক্ষু দিয়া জল আসিল। আবার পরক্ষণেই সে জল শুখাইয়া গেল; আমার উপর তাঁহাদিগের কঠোর ব্যবহার মনে আসিল; আমাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের উপর আমার রাগ হইতে লাগিল। কখনও ভাবিতে লাগিলাম, 'ইনি' তো এখন আমাকে আনিলেন, আমাকে যথেষ্ট দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া দিলেন; কিন্তু আমার উপর এ ভাব কি 'ইহাঁর' চিরকাল থাকিবে? যদি 'ইনি' আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে এই অপরিচিত স্থানে আমার কি উপায় হইবে? আমি তখন কাহার আশ্রয় লইব, কোথায় যাইব! পরমেশ্বর না করুন, যদি আমি কোন প্রকার রোগগ্রস্ত হই, তাহাহইলেই বা আমার দশা কি-হইবে? পিতা-মাতা আমাকে তো আর গ্রহণ করিতে পারিবেন না! হিন্দু-সমাজ ইহাতে তো কখনই সম্মতিপ্রদান করিবে না! আর, আমি প্রাণের মমতা করিয়াই বা যাইব কি প্রকারে? যদি তাঁহারাও লোক-অপবাদ সহ্য করিয়া, সমাজের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, আমার জীবনের উপর হস্তক্ষেপ না করেন; কিন্তু তথাপি আমি আর সে স্থানে ফিরিয়া যাইব কোন্ মুখে? প্রতিবেশীর গঞ্জনা, পাড়ার মেয়েদের কানা-ঘুষা, শত্রুপক্ষের আমোদ, এবং ছেলেদের ঠাট্টা, আমি কখনই তো সহ্য করিতে পারিব না! স্নানের ঘাট, বসিবার বৈঠক, পূজার মন্দির, চলিবার পথ, বিবাহের বাসর, সভার মজলিস প্রভৃতি সকল স্থানেই আমার চরিত্রের কথা তো কানে কানে ফিরিবে! কেহ কেহ বা আমা শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিবে, দেখাইয়া দেখাই হাসিবে! তাহা তো আমি কিছুতেই সহ্য করি পারিব না? ইহাতে আমার অদৃষ্টে এ যাহাই হউক না কেন, এই স্থানেই থাকি আর, এবাটীর অন্যান্য সকলেই তো সুখে কা কাটাইতেছে, তবে আমিই বা পারিব না কেন এইরূপ নানা চিন্তায় সে রাত্রি অতিবাহি করিলাম।

"দ্বিতীয় দিবসে কিন্তু আর তত চিন্তা থাকি না, তৃতীয় দিবস আরও কমিল। এইরূপে ১০।১ দিবসের মধ্যে আমি সমস্তই ভুলিয়া গেলাম তবে হঠাৎ কখন কখন পিতা-মাতার চিন্তা আমার মনে উদয় হইত বটে, কিন্তু সেও জলবিম্বের মত তখনই আবার অগাধ জলে মিশিয়া যাইত।

"এইরূপে দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইয়া গেল। বাটীর সমস্ত লোকের সহিত আমার ভালবাসা জন্মিল; তাহাদের মত 'আদব-কায়দা, ভাব-ভঙ্গি, চাল-চলন প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষা করিলাম; ধূমপান করিতে শিখিলাম। এবং ক্রমে সুরাদেবীর আরাধনা করিতেও পরাঙ্মুখ হইলাম না। অধিক কি, ক্রমে দেবী আমার মস্তকে পদার্পণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও আমার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিয়া চিরদিনই আমার পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

"'তাঁহার' সহিত ক্রমে 'তাঁহার' অন্যান্য দুই একটী বন্ধুও আমার ঘরে আসিয়া বসিতে লাগিলেন। আমি ভদ্রলোকদিগকে যত্ন করিতে কোন ক্রমেই ত্রুটি করিতাম না; সুতরাং আমার ঘরে যিনি এক বার আসিতেন, তিনি আমার উপর কখনও অসন্তুষ্ট হইতেন না। প্রথম প্রথম কিছু দিবস কেহই 'তাঁহার' অবর্ত্তমানে আমার ঘরে আসিতেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা আসিতেন, দুই চারি টাকা মদ্যপানাদিতে খরচ না করিয়া কেহই যাইতেন না। পরে ক্রমে সময়-অসময়ে, রাত্রিদিনে, 'তাঁহার' সহিত একত্রে, একে বা যখন ইচ্ছা তখনই, আমার ঘরে আসিতে তাঁহাদিগের আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। এই সময়ে তাঁহারা 'তাঁহাকে' লুকাইয়া আমাকে কিছু কিছু দিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না; আর আমিও তাহা লইতে কোনপ্রকার আপত্তি করিতাম না।

"এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, যাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই হইল। আমার যদিও এখন অনেকে সহায় হইয়াছিলেন, তথাপি আমার প্রধান সহায় এবং যাঁহাকে আমি আন্তরিক একটু ভালও বাসিতাম, 'তিনি' আমাকে পরিত্যাগ করিলেন,—বিসূচিকা রোগে হঠাৎ 'তাঁহার' মৃত্যু হইল। ইহাতে আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইল বটে; কিন্তু সে কষ্টও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পাইল না; অবিরত সুরাপান করিয়াই, সেই কষ্টকে আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত করিলাম।

"হায়! তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম না যে, আমি দিন দিন কেবল পাপেরই প্রশ্রয় দিতেছি; পাপের কুহকিনী মায়ায় ভুলিয়া তাহাকেই সুখ জ্ঞান করিতেছি; ও নিত্য নিত্য সেই পাপের অতলস্পর্শ সমুদ্রের ভিতর ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছি! আমি যদিও বিধবা, কিন্তু পূর্ব্বে স্বামী-সহবাস আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই; যদিও আমি ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাকে কেহ 'দ্বিচারিণী' বলিতে পারিত না; যদিও আমি অন্য পুরুষের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতাম, যদিও তাহাদিগের সহিত একত্রে সুরাপান প্রভৃতি করিতে কোনরূপ দ্বিধা করিতাম না, কিন্তু 'সেই একজন' ব্যতীত অন্য কাহাকেও এ পর্য্যন্ত অন্য ভাবে আমার হৃদয়ে স্থান দিই নাই। কিন্তু, এখন আমার পাপের পরিণাম—সেই ভয়ানক দণ্ড—স্মরণ করিয়া হৃদয় আতঙ্গে অভিভূত হইয়াছে; ও পাপ মুখে এখন বলিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে যে, 'তাঁহার' মৃত্যুর পর আর আমার কিছুই বাকি রহিল না; ক্রমে ক্রমে আমি দ্বিচারিণী, ত্রিচারিণী, বহুচারিণী হইয়া পড়িলাম।

"উঃ! আমি বুঝিতে না পারিয়া কি ভয়ানক কার্য্যই করিয়াছিলাম? হে জগদীশ্বর! এই বিধবা হিন্দু-রমণীর সেই পাপের ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে কি পরিত্রাণ নাই? হে জগৎপিতা! আমি জানি যে, আপনার নিকট সকলেরই ক্ষমা আছে; সকল পাপীকেই আপনি পাপানুযায়ী ক্ষমা প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু জগদীশ! আমি নিজেই বুঝিতেছি যে, আমার এ পাপের ক্ষমা নাই। আর, আমিই যদি ক্ষমা প্রার্থী হইব, তবে এ 'জগতে প্রকৃত মহাপাপীর দণ্ড আর কে সহ্য করিবে? সর্ব্বনিয়ন্তা! আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত দণ্ড না দিবেন, ভয়ানক নরক-যন্ত্রনায় যদি আমাকে অস্থির ও জ্বালাতন না করিবেন, তবে আর কাহার জন্য সেই সকল স্থানের সৃষ্টি! আমা-অপেক্ষা পাপী আর কে হইতে পারে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখের ঢেউ।

"কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে, তাঁহার মৃত্যুর পর আমার কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমার সুখেরই বৃদ্ধি হইতে লাগিল; সম্পদ-লক্ষ্মী আসিয়া আমাকে যেন আশ্রয় করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই সোনাগাছি অঞ্চলে জনরব উঠিয়াছিল যে, একটী সুরূপা নূতন স্ত্রীলোক আসিয়াছে। সুতরাং সেই সময় হইতে অনেক বাবুই, আমার নিকট আসিতে, আমার সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টা

করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এত দিবস কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এখন তাঁহাদেরও আশা-পথ প্রশস্ত হইল; আমারও কপাল সুপ্রসন্ন হইল। রাত্রি দিন আমার ঘরে আমোদ-আহ্লাদ চলিতে লাগিল। সুরার ঢেউ বহিতে লাগিল। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন, 'আমি তাঁহারই'; প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন, 'আমি যদিও কলিকাতার বেশ্যামণ্ডলীর রীত্যানুসারে সকলের সহিত প্রকাশ্যে আমোদ-আহ্লাদ করি, কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না।' ফলতঃ আগন্তুক সকলেই আমার মুখের মিষ্ট কথায় ভুলিতেন; আমার অন্তরের কথা কেহই বুঝিতেন না। এইরূপে তাঁহারা আমার আশা নিবৃত্তি ও লালসা চরিতার্থ করিয়া, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন; এবং আমাকে যথেষ্টরূপ অর্থের সাহায্য করিতেও কেহ কুণ্ঠিত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে আমার যথেষ্ট সঙ্গতি হইল; সোনায় গা ঢাকিয়া গেল; নাকে কানে, বড় বড় মুক্তা ঝুলিতে লাগিল; আঙ্গুলে, সাদা, লাল, সবুজ প্রভৃতি বর্ণের বড় বড় পাথর ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। অধিক কি, কলিকাতার ভিতর নিজের একটী বড় গোছের বাটীও হইল। আর, তাহাতে মৃজাই-আঁটা লাল-পাগড়ি-বাঁধা দরয়ানও বসিল; এবং বাটীর ভিতর ৪।৫ জন দাস-দাসীও ঘুরিতে লাগিল। ফলতঃ এখন আমার সম্পদ দেখে কে? আমার বাটীর ভিতর সহজে আসেই বা কে, এবং আমার অলঙ্কারের সম্মুখে দাঁড়াই বা কে? আমি আর কাহাকেও খোসামদ করি না; কড়া কথা ভিন্ন আর কাহাকেও মিষ্ট কথা বলি না; এবং সহজে কাহাকেও আমার বিছানায় বসিতেও দিই না। কিন্তু তথাপিও আমার পসারের কিছুমাত্র ক্ষতি না হইয়া, ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

"এইরূপে প্রায় ১০।১৫ বৎসর কাটিয়া গেল। সেই সময় কালী বাবু নামীয় একটী বাবুর সহিত আমার বড়ই প্রণয় জন্মিল। কালী বাবু বড় লোক নহেন, গরিবের ছেলে; সামান্য দালালী করিয়া আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। এক দিবস তিনি একটী বাবুর সহিত আমার বাটীতে আসিয়াছিলেন; আমিও সেই দিবস তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম। কিন্তু তাঁহাকে যে কি ক্ষণে দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। সেই দেখাই আমার সর্ব্বনাশ হইল; কালী বাবুর ছায়া আমার হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইল; সে ছায়া আর কখনও ভুলিতে পারিলাম না। উহা ক্রমেই আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ-লাভ করিল। তখন কালী বাবুকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের বাহির করিতে পরিতাম না, তিনি অল্প সময়ের নিমিত্তও কোন স্থানে যাইলে আমার হৃদয় যেন ব্যাকুল হইত, মন অস্থির হইত; যতক্ষণ তিনি প্রত্যাগমন না করিতেন, ততক্ষণ কোন ক্রমেই সুস্থ হইতে পারিতাম না। ক্রমে তাঁহাকে তাঁহার দালালি-কর্ম্মে যাওয়াও ও বন্ধ করিয়া দিলাম; তাঁহার সমস্ত খরচ আমি নিজে বহন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহাও নহে, তাঁহার পরিবারের খরচের নিমিত্তও আমি প্রত্যেক মাসে তাঁহার দেশে কিছু কিছু পাঠাইতে লাগিলাম। কালী বাবুও অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি দিন আমারই নিকট থাকিতে লাগিলেন; আমারই হৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

"ক্রমে তিনিই সর্ব্বস্বময় হইলেন; হিসাব কিতাব, টাকা-পয়সা, চাবি-ছোড়ান, প্রভৃতি সকলই তাঁহার হস্তে পড়িল; দেনা-পাওনা খরচ-পত্র সকলও তাঁহারই ইচ্ছামত হইতে লাগিল। তবে কখন কখন কোন বিষয় আমাকে নামমাত্র জিজ্ঞাসা করিতেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতেও কোনপ্রকার প্রতিরোধ করিতাম না। তিনি যাহা বলিতেন, আমি তাই শুনিতাম; তাহাই করিতাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভাটার টানে নূতন পন্থা।

"এইরূপে আরও ২।৪ বৎসর অতীত হইয়া গেল। এখন আমার পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থের উপর হাত পড়িল। কালী বাবুর সহিত আমার এইরূপ ভালবাসা দেখিয়া আর কেহই আমার বাটীতে আসিতেন না। তবে যদিও কোন অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ কোন দিবস আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনিও কালী বাবুকে দেখিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেন। আর, আমি যে কাহারও সহিত আমোদ-আহ্লাদ করি, তাহও কালী বাবুর আর ভাল লাগিত না। সুতরাং কালী বাবু যাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন, আমিও তাহা করিতে এখন আর কোন প্রকারেই সম্মত হইতে পারিতাম না। বিশেষ, আমার আর এখন সে বয়স নাই, সে চোহারা নাই, সে দিন নাই; সকলই গিয়াছে। এখন আর কেহই আমাকে সেরূপ ভাবে দেখেন না; সেরূপ যত্ন করেন না; আমার নিমিত্ত সেরূপ পাগলের মত অজস্র জল-রূপে আর কেহই অর্থ ব্যয় করেন না। এবং সেই সকল মহাশয়েরা ভুলক্রমেও আমার বাটীর নিকট দিয়াও যান না। এখন আমার বিপদ বলুন, বা সম্পদই বলুন, ভরসার মধ্যে কালী বাবু ভিন্ন আর কেহই নাই।

"বিনা আয়ে বসিয়া বসিয়া খরচ করিলে কুবেরের ভাণ্ডারও ক্ষয় হইয়া যায়, আমি কোন্ ছার! আমার সমস্ত অর্থ যেরূপ জোয়ারের মত আসিয়াছিল, এখন ভাঁটার মত চলিয়া যাইতে লাগিল। আমার ও কালী বাবুর, সেই পূর্ব্বের মত খরচ, সেই পূর্ব্বের মত পরিচ্ছদ, ও সেই পূর্ব্বের মত সুরাপানের কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া এখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার উপর কালী বাবুর দেশের খরচ আছে; এখানকার নাচ-থিয়েটার আছে; গাড়ী-ঘোড়া আছে; বাবুগিরি আছে। তাহাতে সঞ্চিত ধন আর কত দিবস থাকিবে? ক্রমেই তাহার হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল।

"এই সময়ে কালী বাবুর দেশ হইতে এক পত্র আসিল যে, তাঁহার স্ত্রী ভয়ানক পীড়িত, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত; এবং কালী বাবুকে একবার জন্মশোধ দেখিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা। এইরূপ পত্র পাইয়াও কালী বাবু আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। কিন্তু তিনি প্রায় চারি বৎসর দেশে যান নাই। তাঁহার একটী পুত্র সন্তানও হইয়াছে, এখন তাহারও বয়ক্রম প্রায় সাড়ে তিন বৎসর হইবে; কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত পুত্রমুখ দেখেন নাই। আমি কালী বাবুকে অনেক বুঝাইলাম; এবং কিছু খরচের টাকা দিয়া তাঁহাকে সাত দিবসের জন্য দেশে পাঠাইয়া দিলাম। আমিও তাঁহার সহিত ষ্টেসন পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথাকার রেলে উঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তিনি যাইতে না যাইতেই আমার মন অস্থির হইতে লাগিল; তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে চারি দিবস কাটাইলাম; পঞ্চম দিবসে কালী বাবু তাঁহার সেই পুত্রটীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে তখন জানিতে পারিলাম যে, দুই দিবস হইল, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে; এবং তাঁহার আর কেহই না থাকাতে তিনি, যাহা কিছু ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়া, পুত্রটীর সহিত এখানে আসিলেন।

"ঐ পুত্রটীর নাম হরি। হরি দেখিতে তাহার পিতা অপেক্ষাও সুশ্রী এবং তাহার কথাগুলি অতিশয় মিষ্ট ও সুখশ্রাব্য। আমার সন্তানাদি জন্মে নাই; সন্তানের যে কি মোহিনী মায়া, তাহা আমি এত দিবস জানিতাম না; এত দিন পুত্রস্নেহ আমার হৃদয়কে অধিকার করিতে

পারে নাই। কিন্তু পরের পুত্রের নিমিত্ত এখন আমার তাহাতে বাকি রহিল না; হরিকে আমি আমার পুত্রের মত দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলাম; তাহাকে খাওয়াইলে-পরাইলেই আমার মনে সুখবোধ হইতে লাগিল। রাত্রিদিন তাহাকে আমার নিকটেই রাখিতাম, মুহূর্ত্তের নিমিত্ত চোখের অন্তরাল করিতাম না। এইরূপে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল।

"কিছুদিন কাটিল সত্য, কিন্তু আমার সঞ্চিত ধন যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গেল! দাস-দাসীগণকে জবাব দিলাম; দরোয়ানকে বিদায় করিলাম। ইহাতেও কিন্তু আমার বিশেষ সুশার হইল না; ক্রমে ক্রমে দুই-একখানি করিয়া গহনাগুলিও বন্ধক পড়িতে লাগিল। এই সময় কালী বাবু পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বের সেই দালালি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যে পসার একবার ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা পুনরায় আর হয় না। সময়ের স্রোত একবার চলিয়া গেলে পুনরায় আর ফেরে না। এত দিবস পরে কালী বাবু তাঁহার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন সত্য, কিন্তু আর কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন তিনি আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া, জুয়াচুরির নানা উপায় বাহির করিলেন; ও সেই উপায় অবলম্বনেই আমাদিগের সংসার চলিতে লাগিল। এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহার একজন সহকারীর আবশ্যক হইল; তিনি তাহাও পাইলেন। সে আর কেহই নহে, এই দুরাচারিণী, মহাপাপকারিণী ও মায়াবিনী রাক্ষসীই তাঁহার সহায় হইল; ও তাঁহার ইচ্ছামত সকল কার্য্যই করিতে লাগিল।

"কালী বাবু তখন নব্য ইয়ার-ছোকরার দলে মিশিলেন। তাঁহাদিগকে জুটাইয়া আমার বাটীতে আনিতে লাগিলেন। আমার বাটীতে তখন একটী ছোটখাট মদ্যালয় স্থাপিত হইল। যিনি পিতামাতাকে লুকাইয়া পাপের প্রথম দ্বারে উঠিতে ইচ্ছা করিতেন, অধিক রাত্রে যাঁহার মদ্যপানের লালসা বলবতী হইত, তিনিই আমার বাটীতে পদার্পণ করিতে লাগিলেন! কিন্তু এক দিবস যিনি আসিতেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইতাম না। তিনি যত দিন বাঁচিতেন, আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতেন না, ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবকেও আমার চরিত্রের কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেন!

"যিনি আমার বাটীতে মদ্যপান করিতে আসিতেন, তাঁহারই খরচে মদ্য আনীত হইত; ইহাতেও কিছু লাভ করিতাম। যিনি অধিক রাত্রে মদ্যপান করিতে আসিতেন, তাঁহাকে আমার ঘরের সঞ্চিত মদ্যই দিতাম। তাহাতে সিকি মদ ও বার আনা জল থাকিত। তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন; কারণ, অধিক রাত্রে আর কোন স্থানে মদ্য পাওয়া যাইত না। তখন সকলে একত্রে উহা পান করিতাম। কালী বাবুও সেই সঙ্গে পান করিতেন এবং ঘন ঘন চুরট টানিতেন। অন্য সময় কালী বাবু অধিক চুরট খাইতেন না; কিন্তু মদ্যপানের সময় এত অধিক পরিমাণে চুরট খাওয়ার বিশেষ কারণ ছিল, তাহা যাঁহারা কখন ঠেকিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু অন্যে সহজে বুঝিতে পারিবেন না বলিয়াই তাহার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস দেওয়া যাইতেছে।

"চুরটের ছাই অতি অদ্ভুত দ্রব্য। মদ্যের সহিত ঐ ছাই মিশ্রিত হইলে যে কিরূপ ভয়ানক নেশা হয়, তাহা বোধ হয় অনেক মাতালই জানেন! কালী বাবু মদ্যের সহিত ঐ ছাই মিশাইয়া সেই সুরাপান-অভিলাষী ব্যক্তিকে তাঁহার অজ্ঞাতে খাওয়াইতেন। ইহাতে তাঁহার অতিশয় নেশা উপস্থিত হইত, তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। তখন আমরা উভয়ে তাঁহার নিকট যাহা কি

থাকিত সমস্তই অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিতাম। তখন তিনি রাস্তায় যাইয়া বে-এক্তার অবস্থায় দুই এক পদ চলিলেই পড়িয়া যাইতেন; ও পরিশেষে পুলিস কর্ত্তৃক থানায় নীত হইয়া আপনার পাপের পরিণাম ফল দর্শন করিতেন। আর, ভদ্র লোকের ছেলে বুঝিতে না পারিয়া, পিতামাতাকে লুকাইয়া এক কর্ম্ম করিতে গিয়া তাহার যথেষ্ট সাজা পাইলেন, এই অপমানে তিনি অতিশয় লজ্জিত হইতেন; ও তাহাতে আবার বেশ্যা-বাড়ি যাওয়ায় যে তাঁহার সমস্ত দ্রব্য চুরি গিয়াছে, একথা আর কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারিতেন না—মনের যন্ত্রণা মনেই নিবৃত্তি করিতেন।

"তবে যাঁহার হিতাহিত জ্ঞান নাই, মান অপমানের ভয় নাই, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা নাই, তিনি পাপ কথার কিছুমাত্র লুকাইতেন না; প্রকাশ্যে পুলিশের নিকট নালিস করিতেন যে তাঁহার সমস্ত দ্রব্য চুরি গিয়াছে। কিন্তু তিনি যে সময় পুলিস কর্ত্তৃক থানায় আনীত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার কিছুমাত্র হুস ছিল না—বেহুস অবস্থায় প্রকাশ্য রাস্তায় পড়িয়াছিলেন। তখন কে তাঁহার দ্রব্য চুরি করিল, বা তিনিই কোথায় ফেলিয়া দিলেন, ইহার কিছুই স্থির না হওয়ায় সে বিষয়ের আর অধিক বাচ্য হইত না। সুতরাং আমাদের উপর কেহই বিশেষ সন্দেহ করিতেন না। যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাহইলে আমাদিগের বাটীতে তাহার আসার বিষয় একেবারেই অস্বীকার করিতাম; কখন বা স্বীকার করিয়া বলিতাম, যখন তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ মাতাল ছিলেন না এবং তাঁহার দ্রব্যই তাঁহার নিকটে ছিল।

আমি এইরূপে কালী বাবুর পরামর্শে চুরি-অভ্যাস করিয়া পাপের পথে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম; ও সেই চুরিলব্ধ দ্রব্যের দ্বারা আমাদিগের জীবন নির্ব্বাহ করিয়া আরও রাশী রাশী পাপ সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। হায়! তখন আমি বুঝিতে না পারিয়া কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি; তখন আমি যাহাকে সুখ মনে করিতাম, যে অর্থকে সুখকরী অর্থ জ্ঞান করিয়া যে কোন উপায়ে তাহার উপার্জ্জনের পথ দেখিতাম; এখন দেখিতেছি, তাহা সুখ নহে, গভীর দুঃখ-রাশীর প্রশস্ত সোপান। সে অর্থ সুখকরী নহে; ভয়ানক দুঃখের এবং পাপের মুলীভূত সর্ব্বনাশকারী মায়াময় অস্ত্র।

"এইরূপে আমি আমার বাটীতে আগত লোকদিগকে ঠকাইয়া তাহাদিগের নিকটস্থিত দ্রব্যাদি চুরি করিয়া কিছু দিবস অতিবাহিত করিলাম সত্য; কিন্তু পাপের পথ আরও কত দিন প্রশস্ত থাকে? অতি শীঘ্রই আমার সেই পাপময়ী রাস্তা রোধ হইল। তখন সকলেই আমার অবস্থা জানিতে পারিল; ও যে উপায়ে আমি লোকদিগকে প্রতারণা করিতাম, তাহা সকলেই অবগত হইল। তখন, আর কেহ আমার বাটীতে আসে না; আমাদিগের কথায় আর কেহ প্রত্যয় করে না। এবং আমার বাটীতে আসিয়া ঠকিয়াছে, এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত রাস্তা-ঘাটে দেখা হইলে, সে আমার পিতৃপুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া গালি দিতেও ক্ষান্ত হয় না। তাহাতে তখন আমাদিগের চলাচলের অতিশয় কষ্ট হইল; গহনাগুলি এক একখানা করিয়া সমস্তই প্রথমে বন্ধক ও পরে বিক্রয় হইয়া গেল। অধিক কি, তখন ভরসার মধ্যে রহিল, আমার বাড়ীখানা। কিন্তু তাহাও যে রাখিতে পারিব এরূপ আশা হৃদয় হইতে দিন দিন অন্তর্হৃত হইতে লাগিল।

"বিশেষ, তখন আর আমার সে বয়স নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে রূপ-লাবণ্যও নাই; আমাকে দেখিবার নিমিত্ত তখন আর কেহই ব্যগ্র নাই। বারান্দায় একবার বাহির হইলে

যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত রাস্তায় লোক ধরিত না, সে এখন রাস্তার রাস্তায় বেড়াইলেও কেহ তাহাকে একবারের নিমিত্ত চাহিয়াও দেখে না। তখন যাহার সুমধুর গীতধ্বনি উন্মত্ত বাদ্যযন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া বহুদূর হইতে যে ব্যক্তির কর্ণকুহরে একবার প্রবেশ করিত, তিনিই স্পন্দহীন চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় সেই স্থানেই দণ্ডায়মান থাকিতেন—সমস্ত সুখ দুঃখ, কার্য্য-কলাপ প্রভৃতি ভুলিয়া দুই দণ্ড কাল অন্ততঃ একাগ্রমনে তাহা শুনিতেন; কিন্তু এখন সেই মুখের সেই গীত-ধ্বনি, তাঁহারই নিকট গীত হইলে, তিনিই বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান। এই তো জগতের গতি! পূর্ব্বে যিনি যে নয়নে যাহাকে দেখিতে ভাল বাসিতেন, যাহাকে দেখিলে আনন্দ অনুভব করিতেন, এখন তিনি সেই নয়নে তাহাকে দেখিলে বিরক্ত হন! পূর্ব্বে যাহার কথায় তাঁহার কর্ণে অমৃত-বৃষ্টি হইত, এখন তাহারই কথা তিনি বিষ-তুল্য জ্ঞান করেন! হায়! হায়! অপূর্ব্ব জগতের অদ্ভুদ্ লীলা!

"যদি আমি পূর্ব্বে ভাবিতাম যে, রূপ-যৌবন কিছুই চিরস্থায়ী নহে; ধন-সম্পদ, দাস-দাসী প্রভৃতি কিছুই চিরকাল থাকিবে না; তাহাহইলে আমি কি আমার সেই ক্ষণ-স্থায়ী সুখকে অবিনশ্বর সুখ জ্ঞান করিয়া আত্মাকে এরূপ কলুষিত করিতাম? না, ধর্ম্মের মস্তকে জলাঞ্জলি দিয়া সেই মহাপাতকী তারা দিদির কুহক-মন্ত্রে ভুলিতাম? না, পাপকে ক্রমে ক্রমে এতদূর প্রশ্রয় দিয়া অসহ্য নরক-যন্ত্রণার ফলাকাঙ্ক্ষী হইতাম? হায়! আমি কি মূর্খ!—কি পাপিষ্ঠা!!

"যাইহোক, আমাদিগের যখন এই উপায় বন্ধ হইল, যখন সকলেই আমাদিগের চাতুরি বুঝিতে পারিলেন, তখন কালী বাবু আমার পরামর্শ-মত অন্য আর একটী উপায় বাহির করিলেন। এবং প্রথম প্রথম সেই উপায় অবলম্বনেই আমাদের অবস্থার একটু পরিবর্ত্তন হইল। সমস্ত খরচ পত্র বিনা ক্লেশে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। সে উপায় যে কি, তাহার কতক বোধ হয়, এখন প্রকাশ করা মন্দ নহে।

সংসার-বিরাগী যুবক।

রজনী তামসময়ী। সকলই নিস্তব্ধ। কেবল মাত্র পবনদেব স্বন্ স্বন্ স্বনে কখনও দ্রুত, কখন [illegible] মৃদুমন্দ গমনে গভীর রজনীর ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া ভীত অন্তঃকরণের ভয় দ্বিগুণতর বর্দ্ধি[illegible] করিতেছিলেন। এই সময়—রজনীর এই [illegible] তৃতীয় প্রহরাতীত স্থির সময়ে, একমাত্র ধর্ম্ম[illegible] জগৎকে শাসন করিতেছিল। পক্ষীগণ আপ[illegible] আপন কুলায় থাকিয়া, নিদ্রার ভানে থাকি[illegible] থাকিয়া ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার গ[illegible] গাইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষগণ অন্ধকারের আ[illegible] পাইয়া সময় বুঝিয়া পাপ মানব-চক্ষুর অগো[illegible] চরে ঈশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে[illegible] নিবিড় অরণ্য-প্রদেশে ভয়াবহ শ্বাপদকুল তা[illegible] দিগের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য হৃ[illegible] ভেদী আর্ত্তনাদে ঈশ্বরের কৃপা-কটাক্ষ চা[illegible] তেছে। নদী-সকল জগৎ প্রভুর অনুগ্রহ পা[illegible] লাম না ভাবিয়া, মৃতপতি-যুবতীর গভীর রজ[illegible] যোগে মৃদু মৃদু ক্রন্দনের ন্যায়, মসীময় জল[illegible] দুঃখাবরণে হৃদয় ঢাকিয়া বন হইতে বনা[illegible] কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার অনুসন্ধান ক[illegible] বেড়াইতেছে। স্থানান্তরে কোথাও পার্ব্ব[illegible] গহ্বর মধ্যে, কোথাও বন-ভূষণ [illegible] তাপসবর উপযুক্ত সময় পাইয়া রজনীর [illegible] কারে আপন হৃদয়ের পাপরূপ তমঃ ঢা[illegible] দিয়া শুদ্ধমনে, ধর্ম্মান্তঃকরণে, একাগ্র-চি[illegible] মুদ্রিত-নয়নে, করযোড়ে ঈশ্বর-ধ্যানে নিমগ্ন[illegible]

এমন সময় একটী প্রকোষ্ঠের দ্বার ধীরে [illegible] উদ্ঘাটিত হইল। দ্বার-মধ্য হইতে [illegible]

[illegible]লোক রজনী-তামস দূর করিয়া দিল, [illegible] দ্বারের মধ্য দিয়া অপ্রকাশিত দৃশ্য [illegible] প্রকাশ হইল। গৃহ-মধ্যস্থ দৃশ্য [illegible] চমৎকার। গৃহের মধ্যস্থলে দুইখানি [illegible]; একখানিতে একজন যুবতী নিদ্রিতা; [illegible] একটী নবশিশু, সেও নিদ্রিত। আর [illegible] খানিতে একটী যুবক পদদ্বয় নিম্নে [illegible] দিয়া উপবিষ্ট। যুবকের বয়স [illegible] বর্ষ হইবে; বর্ণ গৌর; বাহুযুগল [illegible], সুঠাম, অনতিদীর্ঘ; নাভীদেশ [illegible]; দেহ মোটের উপর অনতিস্থূল; [illegible] সুন্দর; শরীর মধ্যে অনেকগুলি [illegible]-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। [illegible] রজনীযোগে এতক্ষণ পর্য্যন্ত একবারও [illegible] যান নাই। তাঁহার মনে গভীর চিন্তার [illegible] উঠিতেছে। দুঃখে চক্ষুদ্বয় হইতে [illegible] দরদর বেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। [illegible] থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে; [illegible] কি জানি কি ভাবিয়া, থাকিয়া থাকিয়া [illegible]কিয়া উঠিতেছে। কখনও তাঁহার ইচ্ছা [illegible]ছে, একবার প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে [illegible]য়া ফেলি; কিন্তু তখনই আবার নিদ্রিত [illegible]লোক ও বালকটীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কি [illegible] কি ভাবিয়া সে ক্রন্দন দমন করিতেছেন। [illegible] যুবকের দৃষ্টি দীপ-শিখার প্রতি। থাকিয়া [illegible]কিয়া তিনি ধীরভাবে আপনা-আপনি [illegible]তে লাগিলেন,—"দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত; [illegible] অচিরেই তৈলাভাবে নির্ব্বাপিত হইবে। [illegible]াপিত দীপে তৈল পুনঃ-প্রদান করিলেও [illegible] যামিনী জ্বলিবে না। কারণ, আমি [illegible]র সহিত আলাপনে নিদ্রা পরিত্যাগ [illegible]য়াছি; সারা রাতই জাগরণে কাটিবে। [illegible]ই আমার এখন একমাত্র শান্তি। চিন্তা [illegible] থাকিলে ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকা অসীম [illegible]াধ্য হইত। কিন্তু চিন্তাতেই বা সুখ [illegible]? সংসারের চিন্তা!—কুটিল চিন্তা!—

সংসারের কুটিলতা ইহাতে পরিদৃশ্যমান। ও চিন্তায় আমার হৃদয়ে কিন্তু বড় আঘাত লাগে; প্রাণ যেন শুকাইয়া যায়। হস্তপদ শিথিল হয়; বোধহয়, এ সংসারে জীবিত থাকাই পাপ। পাপীরাই সংসারে জীবিত থাকে। সাহারা কালাহারি অথবা আরব্য মরুর দৃশ্য বরং সুন্দর; নরকের দৃশ্য শুনা যায় বড় ভয়ানক, সেও ভাল; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সংসারের দৃশ্য কুটিল—পাপময়। ইহাতে পিতা পুত্রকে প্রতারণা করিতেছে; পুত্র পিতাকে হত্যা করিতেছে; মাতা প্রিয়তম পুত্রের প্রাণনাশের হেতু হইতেছে; স্বামী স্ত্রীকে বধ করিতেছে; স্ত্রী স্বামীর বক্ষে শাণিত ছুরিকাঘাত করিতেছে। এ দৃশ্য বড়ই ভীষণ; বড়ই হৃদয়ঘাতী, বড়ই পাপময়! পৃথিবীতে সকলই স্বার্থময়; সকলই প্রতারণা! নশ্বর সংসারে এত পাপ! তাই আমার সংসারে বিদ্বেষ; তাই আমি নির্জ্জনে কাল কাটাই।

"প্রকৃতির সহিত আমি কথা কহিতে বড় ভালবাসি। রজনীর এই অন্ধকারময় ভাবটী আমার বড় ভল লাগে। কারণ, ইহাতে ক্রুর সংসারের কুটিলতা নাই; ইহার বহির্দ্দেশ ও অন্তর্ভাগ সকলই সমান। মৃত্তিকার পুত্তলি মানব, মানবকে যত প্রতারিত করিতে পারে, প্রকৃতি তত পারে না। প্রকৃতি ঈশ্বরের ছায়ায় গঠিত; ইহাতে সকলই যেন ধর্ম্মভাব। ধর্ম্ম যেন ইহাতে অন্তর্নিহিত।"

হৃদয়ের এই চাঞ্চল্য দেখিয়া যুবক একবার একাগ্রচিত্তে প্রাণ ভরিয়া জগৎপিতার নাম উচ্চারণ করিলেন; ডাকিলেন,—"পিতা হে, পথভ্রান্ত অধম সন্তান বিপথে যাইয়া পাপ সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ হইতেছে। তাহাকে পথ দেখাও; তাহার বিকল চিত্তে সৎপরামর্শ প্রদান কর; তোমার অপার করুণা সিন্ধুর কণামাত্র করুণা প্রদান করিয়া পাপাসক্ত অধম মানবজীবন চরিতার্থ কর

বল পিতঃ কোন পথে যাইলে তোমার সাক্ষাৎ পাইব? তাহাতে যদি আমাকে ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পিতামাতার স্নেহ অতিক্রম করিতে হয়; সংসারের একমাত্র বিরামস্থল পত্নীর কমনীয় কোমল করপাশ ছেদ করিয়া, নবজাত পুত্রধনের আশ পরিত্যাগ করিতে হয়; অথবা অরণ্য-অরণ্যে, পর্ব্বতের শিখরে শিখরে, তরুমূলে, গহ্বর ভিতরে অনাহারে দিবারাত্রি যাপন করিতে হয়, আমি তাহাঁতেও সম্মত।

ইহার পরই যুবক পুণরায় ভাবিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা, জগতের সকল বস্তুই তো পরিবর্ত্তনশীল! কত সুগন্ধিযুক্ত রক্তাভ গোলাপের মুকুল অকালে কীটদষ্ট হইতেছে! কত নয়নতৃপ্তিকর প্রস্ফুটিত শতদল দল-চ্যুত হইয়া শোভাহীন হইতেছে ও পরিশেষে শুকাইয়া যাইতেছে! কত কমনীয় উজ্জ্বল কান্তি নীলাভ চক্ষু অন্ধ হইতেছে! কত শিরীশ-কোমল রমণী-বদন মৃত্যুকালীন মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছে! কত প্রেমের প্রতিমা পঞ্চভূতে লয় পাইতেছে! তবে আমার এই সামান্য পরিবর্ত্তনে কেন এত চিন্তিত হইতেছি? না—না, চিন্তাই বা কিসের? পিতা ডাকিতেছেন, তাঁহার নিকটে যাইব; তাহাতে আবার চিন্তা কি? এ পথে চিন্তা নাই, ভয় নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই। অথবা মৃত্যুই এ বাঞ্ছিত পথের দ্বারী; মৃত্যু অনুগ্রহ করিলে, এ পথেই চির-আকাঙ্ক্ষিত অক্ষয় জীবন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আর না; বিলম্বে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে। আমি চলিলাম।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই যুবক পালঙ্ক হইতে উঠিয়া দ্বারদেশে গমন করিলেন। কিন্তু তখনও ভাবনা,—"তাই তো রজনীও বিগত প্রায়। তবে যাই,—আর না। কিন্তু নব শিশুটীকে এক দিনও আদর করি নাই। যাইবার সময় একটী চুম্বন লই। না—না [illegible] তা তো হইল না! চুম্বনে যদি শিশু জাগ্র[illegible] হয়, তবে তাহার ক্রন্দনে শিশু-মাতাও জাগি[illegible] উঠিবে। সে জাগিলে, আর তো আমা[illegible] যাওয়া হইবে না! সরলা সে, কাল যে[illegible] আমায় কত বিনয় ক'রে বলে ছিল,—'[illegible] যাও নাথ, অভাগীকে সঙ্গে নিও!' কিন্তু [illegible] জানে না যে, ক্লেশ-ভোগই এ পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ-লাভই ইহা[illegible] পরিতোষিক। এ পরীক্ষায় আমি তাহা[illegible] পরিচর্য্যার প্রত্যাশী নই।

"আমি প্রত্যাশী নই বটে, কিন্তু আ[illegible] চলিয়া গেলে, প্রিয়া আমায়, নিদ্রাভ[illegible] যে কি পর্য্যন্ত অস্থির হইবে, তাহা ভাবিতে[illegible] শরীর রোমাঞ্চিত হয়! কিন্তু গুরুদেবে[illegible] নিকট শুনিয়াছি যে, ধার্ম্মিকা রমণী সংসা[illegible] আপন গুণেই রক্ষিতা হয়। সুতরাং ভয়[illegible] হয়, প্রিয়ে ভয় নাই; ধর্ম্মই তোমাকে র[illegible] করিবেন। কারণ, জগতে তুমিই পতিপরায়[illegible] ও ধার্ম্মিকার অগ্রণী। আর, সেই জগ[illegible] তোমারও নিকট আমরা এই শেষ নিবেদ[illegible] আমার অবর্ত্তমানে ঈশ্বরের নিকট আম[illegible] হইয়া তুমিও প্রার্থনা করিও, যে, তুমি যে[illegible] পতিপ্রেমে মন মজাইতে পারিয়াছ, আমি[illegible] যেন সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমে মন মজাই[illegible] পারি! আর তাহাহইলেই নিশ্চিত আ[illegible] তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব। কিন্তু আর [illegible] চলিলাম—প্রিয়ে বিদায়!"

এই ভাবিতে ভাবিতেই যুবক গৃহ হই[illegible] নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেখিলেন, রজনী প্রায় শে[illegible] পদব্রজে গমন করিলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নগরে[illegible] বাহিরে গমন করিতে পারিবেন না। সুতরা[illegible] অশ্বশালায় গমন করিয়া অশ্ব-রক্ষককে এক[illegible] অশ্ব সজ্জিত করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা[illegible] মাত্র একটী সুন্দর অশ্ব সজ্জিত হইল। অতঃপ[illegible] "আমার সঙ্গে আইস" এই মাত্র বলি[illegible]

[illegible] অশ্বে আরোহণ করিলেন। কিয়দ্দূর [illegible]ইয়া যুবক দেখিলেন, বেশভূষায় অশ্বারোহণে আর অধিক দূর যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। কারণ, তাহাতে অনেকে তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হইবে। সুতরাং তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সমীপবর্ত্তী অশ্ব-রক্ষকের হস্তে বল্গা প্রদান করিলেন। আর বলিলেন, "ভাই, তুই আর আমি কিছুই ভিন্ন নয়। সংসারের চক্ষে আমাদের দুই জনে অনেক [illegible]ভেদ বটে, কিন্তু ঈশ্বরের চক্ষে আমরা উভয়েই সমান। উভয়েরই দেহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, উভয়েরই দেহ পঞ্চভূতে মিলাইবে। উভয়েরই এক জীবন, জীবন কখন ভিন্ন হয় না। জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট; প্রাণীগণ তাঁহার অংশেই উদ্ভূত। সুতরাং আমরা [illegible]লেই পরস্পর ভ্রাতা। আয় ভাই, তবে একবার তোকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণের জ্বালা [illegible]ক জুড়াই। আসিবার কালে পিতার সহিত [illegible] হয় নাই। ভাই, বলিও তাঁকে, পুত্র [illegible]হার ঈশ্বর-অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়াছে। [illegible] তার কাজ নাই; গৃহের সুখ ক্ষণিক; [illegible] চির সুখ পাওয়া যায় না। পিতা [illegible]ন, অভাগা পুত্র আমি, তাঁহার অপ্রিয় [illegible]র্য্য সাধন করিলাম। পিতার নিকট পুত্র [illegible]দাই অপরাধী। তাই বলি ভাই, তাঁহার [illegible] অভাগা পুত্রকে ক্ষমা করিতে বুঝাইয়া [illegible]ও!

"পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পিতার সেবা করা। [illegible]মি তাঁহার হতভাগা সন্তান, তাই তাঁহার [illegible]বা করিতে পারিলাম না। আমার মত [illegible]গ্য আর জগতে কে আছে? পুণ্যের মধ্যে [illegible] গুরুসেবা। আর, জগতের মধ্যে পরম গুরু, [illegible]তা। আমি সেই দেবতুল্য পরম গুরুর সেবা [illegible]তে পারিলাম না। সুতরাং আমার মত পাপী [illegible]র পৃথিবীতে কে আছে? আমার এ অন্তরের [illegible]ভ জনমে মিটিবে না। কালের পরিবর্ত্তনে সকলই ভুলিতে পারিব; কিন্তু এ কথা আমার হৃদয়ে দৃঢ়-অঙ্কিত রহিল। এ কথা কখন আমার জীবন-সহ কঙ্কর দ্বারা মার্জ্জিত করিলেও, হৃদয়-পট হইতে দূরীভূত হইবে না। আর সেই স্নেহময়ী মাতা!—আহা সে কথা ভাবিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়! তাঁহার সেই অকৃত্রিম পুত্রস্নেহ কখনও ভুলিতে পারিব না। তাঁহাকেও বলিও ভাই, তাঁহার হতভাগ্য সন্তান তাঁহার নিকট বিদায় লইয়াছে। তবে তাঁহাকে অশ্রু-ত্যাগ করিতে বারণ করিও। তাঁহার এক এক বিন্দু অশ্রু-পতনে আমার হৃদয়ে এক একটী শেল বিদ্ধ হইবে। যদি ঈশ্বর দিন দেন, যদি তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, তবে বলিও, তাঁহার অভাগা সন্তান আর একবার গৃহে ফিরিবে ও পিতৃমাতৃ পদে মস্তক নমিত করিয়া জীবন চরিতার্থ জ্ঞান করিবে।"

"এই কথা বলিয়া যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একজন গৈরিক বসন পরিধারী ভিক্ষুক তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিতেছে; তৎক্ষণাৎ তিনি ভিক্ষুককে ডাকিলেন। বলিলেন,—ভাই ভিক্ষুক, তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে, তাহা পূরণ করিতে হইবে। তোমার ঐ গৈরিক বসনের পরিবর্ত্তে আমার এই বহুমূল্য বসন তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।" ভিক্ষুক প্রথমে তাঁহার সে কথায় বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু পরে যুবকের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তাহার বিশ্বাস জন্মাইল; সে নিজ গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিল। যুবক তখন আপন পরিধৃত বস্ত্রগুলি একে একে উন্মোচন করিলেন। পরে ভিক্ষুককে বিদায় দিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"দীনবন্ধু! বাঞ্ছা আমার পূর্ণ ক'রো। আজ তোমারই পথের পথিক হইলাম।"

সাঁওতাল পরগণা।

সাঁওতালদিগের জাতিভেদ।

সাঁওতালদিগের মধ্যে পূর্ব্বে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু পাহাড়ী, ঘাটোয়াল ও ভুঁয়েগণের আচার-ব্যবহার দেখিয়া-শুনিয়া এক্ষণে জাতিভেদের প্রতি তাহাদের অনেকাংশে আস্থা হইয়াছে। সাঁওতালগণ, বাঙ্গালীর ও ঘাটোয়াল জাতির স্পৃষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে; এবং ভুঁয়ের অন্নও তাহারা অস্পৃশ্য মনে করে না। কিন্তু খৃষ্টান, মুসলমান ও পাহাড়ী জাতির অন্ন তাহারা কখনও গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহে। আজিকালি এমনও দেখা যায় যে, কোন সাঁওতাল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলে, আর সে তাহার পিতামাতা ভাই-বন্ধুর সহিত একত্রে থাকিতে পায় না। আহার-সম্বন্ধে যেরূপ সাঁওতালগণ জাতিভেদ বিচার করিয়া থাকে, বিবাহ-সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। ভুঁয়ে প্রভৃতি অপর জাতির মধ্যে ইহাদের বিবাহ হয় না!

সাঁওতালদিগের অলঙ্কার।

সাঁওতালিনীগণ চরণে পাঁজোর, হস্তে কঙ্কণ, কণ্ঠে লাক্ষার কৃত্রিম প্রবাল-কাঁঠির মালা, ও গলায় পিতলের হাঁহুলি পরিধান করিয়া থাকে। ইহাদের যাবতীয় অলঙ্কার প্রায় পিত্তল ও কাংস্যে নির্ম্মিত। ঐ সমস্ত অলঙ্কার বীরভূমের কাঁসারীগণ কর্ত্তৃকই অধিকাংশ প্রস্তুত হয়। সাঁওতাল-নারীগণ পুষ্পের অতি প্রিয়। পুষ্প পাইলেই তাহারা আপন-আপন কবরীতে গুঁজিয়া রাখে। উহাদের পরিধেয় বস্ত্র মোটা সূতায় নির্ম্মিত। সাঁওতালিনীগণের মধ্যে অবগুণ্ঠনের প্রথা নাই।

সাঁওতাল-সঙ্গীত।

সাঁওতালগণ গীত-বাদ্যের অত্যন্ত প্রিয়। এমন কি, সাঁওতালিনীদিগকেও গৃহে থাকিবার সময় ওরাস্তায় চলিবার সময় নাকি-সুরে গীত গাহিতে শুনা যায়! পুরুষগণ যখন গান গাহে, তখন তৎসঙ্গে মাদল বাজাইয়া থা[কে।] সাঁওতালিনীগণের নৃত্য অতি আমোদজন[ক।] একেবারে ১০।১২ জন স্ত্রীলোক হাত-ধরা[ধরি] করিয়া সারি দিয়া দাঁড়ায়। অনন্তর মা[দল] বাদ্যের তালে তালে দুই পা অগ্রগামি হইয়া, একটী পা সকলে ভূমি হইতে উত্তো[লন] করে; আবার দুই কদম পৌঁছিয়া আ[সিয়া] পুনরায় একটী পা উত্তোলন করে। এইর[ূপ] সৈন্যের কাওয়াজের ন্যায় একবার সম্মুখে একবার পশ্চাদ্ভাগে ক্রমান্বয়ে গতিবিধি করি[য়া] থাকে। অনন্তর এইরূপ নৃত্য সাঙ্গ হই[লে] সকলে হেঁট হইয়া হাত নিচের দিকে ঝুলাই[য়া] ভিস্তির সংএর ন্যায় নাচিতে ও অঙ্গ[ভঙ্গী] করিতে থাকে। নাচিতে নাচিতে সক[লে] নাসিক (নাকি) সুরে গান করিতে থা[কে।] ইহাদের গীতিরও ক্রম আছে। না[চের] আরম্ভে গোলোয়ারে সুরে গান গায়; প[রে] ঝুমুর সুর ধরে; এবং নৃত্য-ভঙ্গের সময় আ[বার] গোলোয়ারে সুরে গান গাহিয়া থাকে। গোলো[য়ারে] সুরটী শুনিতে আমাদের মধুর বলি[য়া] বোধ হইয়াছিল। সাঁওতালিনীগণ ম[ধ্যে] মধ্যে যে গীত গাহিয়া থাকে, তাহার কো[ন] কোনটীতে স্বভাব-বর্ণন ও কবিত্ব আ[ছে।] আমরা যে একটী গান শুনিয়াছিলাম, তা[হার] অর্থ,—"নদীর ধারে কেমন সুন্দর কুর্নির (অর্থাৎ কলাই) গাছ হয়েছে, যেন কচি ছে[লে] হাসিতেছে।"

উপসংহার।

সাধারণের বিদিতার্থ সাঁওতাল পরগণা[র] স্থানীয় বিবরণ ও সাঁওতালদিগের আচা[র-] ব্যবহার, ধর্ম্ম ও নীতি প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিব[রণ] প্রকাশ করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ[ই] যে, সাঁওতাল পরগণায় বহুদিন অবস্থানে[র] সুবিধা না পাওয়ায় অন্যান্য অনেক বিষ[য়ে] অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হইলাম না। ফল[তঃ] সাঁওতাল পরগণায় আলোচ্য বিষয় অনে[ক] আছে। উহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করুন, প্রত্যেক দৃশ্যের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইলে, প্রকৃতির সেই দিকেই এক একখানি গ্রন্থ উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন। যদি কোন বৈজ্ঞানিক সমস্ত জীবন সাঁওতাল পরগণায় কাটাইয়া উহার যাবতীয় বস্তুর বিষয় শিক্ষা করিতে যান, তাহাহইলেও সেই মহাত্মা সাঁওতাল পরগণার এক-চতুর্থাংশ বিষয়ও শিক্ষা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমরা যে অল্প দিন ছিলাম, সাঁওতাল পরগণার বনে বনে বেড়াইয়া যে কত বস্তু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। সেই সেই বস্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে যে নাই, তাহা নহে; কিন্তু বঙ্গদেশের এত সন্নিধে থাকিয়া সাঁওতাল পরগণার ভাণ্ডার যে উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। পূর্ব্বে এই প্রদেশের খনিজ-দ্রব্যাদির কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি; যাহাতে অর্থব্যয় করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে প্রচুর ধনাগম হইতে পারে। বলা বাহুল্য, সাঁওতাল পরগণায় অনুসন্ধান করিলে স্বর্ণও প্রাপ্ত হওয়া যায়; কারণ, আমরাই বালুকাকণার সহিত স্বর্ণ-রেণু অনেক স্থলে দর্শন করিয়াছি। পরিপক্ব মার্ব্বল প্রস্তর যদিও না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই মার্ব্বল প্রস্তরের ধরণের কোমল প্রস্তরও আমরা ডুমকার নিকটবর্ত্তী অরণ্য-মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; ও তথাকার কোন কোন ভদ্রলোককে প্রদর্শন করাতে তাঁহারাও মার্ব্বল বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, রাজমহলের নিকটে কোন একস্থানে চিনা-মাটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণার দুই একস্থলে ভূগর্ভ হইতে উষ্ণ-প্রস্রবণের ন্যায় জল উঠিয়া থাকে; তাহার অনুসন্ধান করিলেও, সাঁওতাল পরগণার ভিত্তির ভিতর অনেক প্রবেশ করা যাইতে পারে। সংক্ষেপতঃ কহিতে গেলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই পরগণা বিদ্যোৎসাহীগণের বিশাল পুস্তকাগার; বণিকগণের অক্ষয় ধন-ভাণ্ডার; দুর্ব্বলের স্বাস্থ্য-নিবাস; এবং ভাবুক ও ঈশ্বর পরায়ণের নিভৃত চিন্তার স্থল।

সাঁওতালদিগের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে ইহাই একরূপ এই স্থির হইতেছে যে, হিমালয়ের পূর্ব্বভাগ এবং আসামের দিক হইতে তাহারা আসিয়া, আর্য্যগণের বাঙ্গালায় প্রবেশ করিবার বহু পূর্ব্বে, উত্তর-বঙ্গে বসবাস করিত; পরে, আর্য্যগণ উত্তর-বঙ্গে প্রবেশ করার পর তাহারা বাঙ্গালা-ব-দ্বীপের অরণ্যে প্রবেশ করে। এবং তাহাদের উপাস্য দেবতা বঙ্গা হইতেই প্রথমেআর্য্যগণ সাঁওতালদিগের নিবাস-স্থলকে 'বঙ্গাল' বা 'বঙ্গদেশ' কহিতেন। আরও বোধ হয় ইহাও অসঙ্গত নয় যে, হয় তো সাঁওতালদিগের পূর্ব্ব-নাম 'বঙ্গালী' ছিল; এবং উহা আর্য্যগণ কর্ত্তৃকই প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে, তাহাদিগের সাঁওতাল নাম সমতলে' বাস করিয়াই হউক, অথবা 'তেরায়'-স্থলে বাস করিয়াই হউক, (অন্যান্য জাতি, যথা, পাহাড়ী প্রভৃতি কর্ত্তৃক) প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাহউক, ঐ শেষোক্ত সাঁওতাল নাম কিন্তু অতি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বঙ্গদেশ হইতে সেই আদিম বাঙ্গালী অর্থাৎ সাঁওতালগণ, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া, এক্ষণে এই সাঁওতাল পরগণায় ও তৎসন্নিধে বাস করিতেছে; এবং আমাদের মাতৃ বঙ্গদেশে সেই 'বঙ্গাল' সাঁওতালদিগের কোন চিহ্নই আর নাই। কেবল তাহাদের কতকগুলি কথামাত্র স্থানে স্থানে বঙ্গভাষায় ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এক সময় যে ঐ দুর্ভাগারা বাঙ্গালায় বাস করিত, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাহাহউক, সাঁওতাল পরগণা ও সাঁওতালগণের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে বাঙ্গালার-সম্বন্ধেও

আসাম-সম্বন্ধে অনেক কথা সময়ে সময়ে উল্লেখ করিতে হইয়াছে। আশা করি, পাঠক মহোদয়গণ আমার সেই দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

সঙ্গীত সুধাংশু।—৺ নন্দগোপাল ঘোষ প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি কএকটি ধর্ম্ম-সঙ্গীতে পূর্ণ। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি লিখিয়া লোকান্তরে গমন করেন; এবং এক্ষণে তদীয় পৌত্র ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এরূপ লুপ্তপ্রায় প্রাচীন পুস্তক-প্রকাশের বড়ই পক্ষপাতী; কারণ, এইরূপে ঐ সকল গ্রন্থ সংগৃহীত না হইলে, ক্রমে উহা লোপ পাওয়ারই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এ গ্রন্থখানির রচনা-প্রণালীও বেশ। একটী নমুনা :—

"রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।
তুমি কার তরে রেখেছ—মা, কৃপাধন তারা।
এমন কে আছে ভবে, ওগো ভবদারা॥
সাধনের ধন আছে যার, অন্তে চিন্তা কিবা তার,
সে তোমায় দেবে না ভার, তরাতে নিস্তারা॥"

ইত্যাদি। ফলতঃ এইরূপ প্রকারের দুই একটী গানে পরলোকগত গ্রন্থকারকে প্রকৃতই ভক্ত বলিয়া বোধ হয়।

নবগঙ্গা।—শ্রীযুক্ত মতিলাল বসু প্রণীত। এখানি একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। ইতিপূর্ব্বে মতি বাবু "গান ও গল্প" নামক যে পত্রখানি প্রকাশ করিতেন, এখানিও সেই পত্রে প্রকাশিত হইতেছিল। মতি বাবুর এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানির লিখন-প্রণালীও মিষ্ট বটে। পুস্তকের অনেক স্থলেই গ্রন্থকর্ত্তার মনের ভাব বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তবে দুই এক স্থলে বিজাতীয় ভাবেরও যে আভা পড়ে নাই, তাহাও বলিতে পারি-না,—আর আজকালকার ইংরাজী চাল-চলনের সময় সচরাচর তাহাও অপরিহার্য্য; সুতরাং গ্রন্থকারকে আর এজন্য দোষ দিব কি? যাইহোক, মতি বাবু ইহাতে উৎসাহ পান, এই বাসনা।

শিশু প্রবেশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।—শ্রীক্ষেত্র মোহন ব্রহ্ম প্রণীত। বলা বাহল্য যে, এ ব্যাকরণ খানিও বালকদিগের জন্য রচিত হইয়াছে। সচরাচর যেরূপ স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ হইয়া থাকে, ইহাও সেই শ্রেণীর বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং আজকালকার সইসুপারিশের বাজারে ইহা যে কতদূর সমাদৃত হইবে, তাহা বলা যায় না। তবে পুস্তকখানির মূল্য সুলভ-হেতু ও গ্রন্থকারের পরিশ্রমের উৎসাহ জন্যও অন্ততঃ ইহার সুপ্রচার হয়, এই আমাদের বাসনা।

অভিনয় সম্বন্ধে

বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি।—'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ" নামক নব-নাটকের অভিনয় বঙ্গ-রঙ্গ ভূমে, দেখিতেছি, দিন দিনই প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতেছে। দ্বিতীয় দিন অভিনয় দেখিতে গিয়া আমরা পূর্ব্বাপেক্ষাও সন্তুষ্ট হইয়াছি। এদিন অভিনয়ের অনেক স্থলেই বেশ জম-জমা—অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনেকের অংশই বেশ ভাবোদ্দীপক, বলিয়া বোধ হইল। বিশেষ, প্রথম দিন মহিষী-প্রধান শুকদেবের চরিত্রে যে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখিয়াছিলাম, এদিন অভিনেতা-নির্ব্বাচণের কৌশলে, তাহাও অতি মনোরম হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন, পরীক্ষিত ও শমীকের অংশও পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কিছু যেন মর্ম্ম-স্পর্শী বলিয়া বোধ হইল। আর এক কথা, অভিনয়ের কএকটী গীত বেশ মধুর ও শ্রবণ তৃপ্তিকর হওয়াতে ক্ষণে ক্ষণে সাধারণে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এমারেল্ড থিয়েটার।—বিষাদ নাটকের অভিনয়ে উক্ত রঙ্গ-ভূমিও, আজকাল যেন বেশ একটু প্রশংসিত হইতেছেন। ইতিমধ্যে 'বিষাদের" অভিনয় দেখিয়া আমরাও বেশ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বিশেষ, বিষাদ-নাটকের মধ্যে যে একটু নিগূঢ় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আজকালকার অনেক থিয়েটারী-নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষাদে পতিভক্তির কি জীবন্ত ছবি!—সে বিষাদ-দৃশ্য যখনই মনে আসে, তখনই হৃদয় বিষাদে অভিভূত হয়। এক দিকে কুলটার মোহ-মাখা লোল কটাক্ষ; আর অন্যদিকে প্রেমের পুতলি সরলার গভীর পতিলাভ-তৃষা!—এতদুভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে সংসরের যে ভয়ানক কুটীল দৃশ্য, ইহাই বিষাদ-নাটকের প্রাণ। সুতরাং কে আর না ইহাতে গলিয়া যাইবে? তবে নাটকে যে দোষের ভাগও একেবারেই লক্ষিত হয় না, এমন নহে। রাজাকে যেরূপ করিয়া হাসান-নাচান হইয়াছে, মানুষ কেন, পাগলকেও ওরূপ করান যায় কি না সন্দেহ। পাপের পথে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশিত করাইতে হইবে বলিয়াই কি সেরূপ অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয় দেওয়া যায়? আর, এইজন্যই এইরূপ দুই এক স্থল এবং নাটকের প্রথম-প্রথমকার ভাগটী আমাদের তেমন ভাল লাগিল না। তদ্ভিন্ন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যে নীতি অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত অর্থাৎ সদুদ্দেশ্য থাকিলেও অনুষ্ঠানে অসৎ পন্থা অবলম্বিত হইলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয় এই যে নাটকের উদ্দেশ্য; এবং ইহার আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ, অবশ্যই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বলিতে হইবে। এবং সংসারের এ বিষময় দৃশ্য সকলেরই যে দেখা কর্ত্তব্য, তাহাও অবশ্যই বলা যায়।

সকলেরই আবশ্যকীয়।

রবার ষ্ট্যাম্পের কালী প্রস্তুত *।—চারি আনা ওজন লাল কিম্বা বেগুনী রঙ্গের মেজেণ্টার (যেরূপ রঙ্গের কালী আবশ্যক বুঝিয়া) আধ ছটাক পরিমিত গ্লিশিরিণের সহিত ভিজাইয়া এক দিন রাখ। পরে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইলে আবশ্যকীয় তরল কালী প্রস্তুত হইবে। তখন উহা একটী ছিপিযুক্ত শিশিতে রাখিয়া দাও। এইরূপে রবার-ষ্ট্যাম্পের কালী প্রস্তুত হয়।

প্যাড প্রস্তুত।—দুই বা তিন ইঞ্চ পরিমিত দুই টুকরা দৃঢ় মসৃণ কাষ্ঠের উপর, দুই কিম্বা তিন স্তর গর্ণেণ্টি কিম্বা কেলিকো কিম্বা কাশ্মীরা অথবা বনাত, সটান ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেরেক দ্বারা আবদ্ধ কর। ইহাকে গদি অর্থাৎ প্যাড কহে। এই মখমল, বনাত প্রভৃতি পুরু কাপড় হইলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ছাপা উঠিয়া থাকে; এবং উহাই দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্যাডের একখানির উপর এক কিম্বা দুই ফোঁটা পূর্ব্বোক্ত কালী ঢালিয়া অপর প্যাডখানির দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। পরে উহার উপর মোহরটী বসাইয়া কালী লইয়া, পুস্তকাদিতে অল্প জোর দিয়া চাপ দিলেই উত্তম ছাপ উঠিবে।

কাচের উপর খোদাই।—যাহাতে খোদাই করিতে হইবে তাহার উপর মোম লাগাইয়া একটী সূচীর দ্বারা উহায় লিখিবে। পরে সেই দাগে Hydrofluric acid † দিয়া দশ মিনিট পরে ধুইয়া ফেলিলেই কাচের গায়ে লেখা দৃশ্য হইবে।

পিতলের উপর খোদাই।—পিতল পাত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লিখিয়া তাহাতে Iodine দিলেই লেখা হইবে।

সহজ ফ্রেঞ্চ পালিশ প্রস্তুত।—স্পিরিট অব্ ওয়াইন আড়াই পোয়া, পাতগালা ১০ তোলা, এই দুয়ে একত্র করিয়া একটী বোতলের মধ্যে পুরিয়া রৌদ্রের উত্তাপে উত্তমরূপে দ্রব কর। পরে তাহাতে খুনখারাপি ও রুণিমস্তকি (পাঁচ আনা ওজনে) মিশাইয়া লও। ঐ পালিস কেদারা, খাট প্রভৃতিতে লাগাইলে উত্তম পালিশ হইবে।

কাপড়ে লিখিবার কালী।—বৃষ্টি কিম্বা চোয়ান জলে কাষ্টিক অর্দ্ধ ভরি, গঁদের মণ্ড এক কাঁচ্চা এবং লাইকার এমোনিয়া সিকি কাঁচ্চার কিছু কম, একটী পরিষ্কার শিশিতে করিয়া অন্ধকার স্থানে রাখ। অন্ধকার স্থানে রাখিবার সুবিধা না হইলে কাল অথবা নীল কাগজ মোড়া শিশিতে রাখিতে হইবে। এই কালীতে কাপড়ে লিখিতে হইলে, পেন কলম দিয়া লিখিয়া শীঘ্র শীঘ্র আগুণের উপর ধরিবে (সাবধান যেন কাপড় না পুড়ে) ও তাহাতে লেখা কাল হইয়া যাইলে সরাইয়া লইবে। ইহা আর কখন উঠিবে না। ইহা বাজারে বহুমূল্যে বিক্রয় হয়।

কৃত্রিম স্বর্ণ এবং কৃত্রিম রৌপ্য।—আজ-কাল কৃত্রিম স্বর্ণ ও কৃত্রিম রৌপ্যের বড়ই

* অনুসন্ধান, ২য় বর্ষ, ১০২ পৃষ্ঠা দেখ।

† কেহ কেহ Hydroehloric acid দিবার কথা বলেন।

ছড়াছড়ি। প্রতারকগণ তো নিয়তই নানারূপে কৃত্রিম স্বর্ণের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া, অথবা গিল্টির গহনাকে সোনার গহনা বলিয়া অনেকেই ঠকাইতেছে। ঘড়ির চেন, পরিবার অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক জিনিসেই আজকাল কৃত্রিমতা ঢুকিয়াছে। এরূপ সময়ে সেই কৃত্রিম স্বর্ণ ও কৃত্রিম রৌপ্য প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালী সাধারণের জানিয়া রাখা অবশ্যই যে আবশ্যকীয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তজ্জন্যই নিম্নে কৃত্রিম স্বর্ণ ও কৃত্রিম রৌপ্যের প্রস্তুত-প্রণালী লিখিত হইতেছে। কৃত্রিম স্বর্ণ (mosaic gold) প্রস্তুতের উপায় এই ঃ—একটী পাত্রে সমান ভাগে তাম্র ও দস্তা লইয়া আগুণের দ্বারায় গলাও। মাঝে মাঝে তাহার মধ্যে অল্প পরিমাণে ছোট ছোট দস্তার টুকরা দাও এবং নাড়িতে থাক। ধাতু দুইটী গলিতে গলিতে নানা রং ধারণ করিবে। ধাতুদ্রব প্রথমে পিতলের মত পীত, পরে পিঙ্গল, লোহিত, বেগুণে এবং সর্ব্বশেষে স্ববর্ণরূপে শ্বেতবর্ণ হইবে। এই অবস্থায় ধাতু-দ্রবকে ছাঁচে ঢালিয়া শীতল করিয়া লইলেই কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত হইল। এই সোণার রং কোন রূপে খারাপ হয় না ; ময়লা ধরিলে, মাজিলেই পরিষ্কার হইবে।

কৃত্রিম রৌপ্য বা জর্ম্মণ সিলভার প্রস্তুতের উপায় এই ঃ—তাম্র এবং নিকেল নামক এক প্রকার ধাতু লইয়া একটি পাত্রে করিয়া গলাইতে হয়। গলাইবার পূর্ব্বে কতকগুলি দস্তা খণ্ড উত্তপ্ত করিয়া উক্ত ধাতু গলাইবার সময় পাত্রের মধ্যে অল্পে অল্পে প্রদান করিতে হয়। অথবা উক্ত ধাতু তিনটির অতি সূক্ষ্ম ২ চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া মিশ্রিত করিয়া উপরে ও নীচে তাম্র দিয়া পাত্রের মধ্যে রাখিতে হয় ; এবং কয়লার চূর্ণ দিয়া ঐ সমস্ত আগুনের উত্তাপে গলাইতে হয়। পরে যে পর্য্যন্ত ধাতুগুলি উত্তমরূপে গলিয়া একত্র মিশ্রিত না হয়, ততক্ষণ ধাতু দ্রবকে ক্রমাগত নাড়িয়া দিতে হয়। নিকেল গলাইতে খুব বেশী উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

কাচ কাটিবার সহজ উপায়।—জলের ভিতর কাচ ধরিয়া একটু জোর করিয়া বড় কাঁচি দিয়া কাটিলেই অনায়াসে কাচ কাটা যায়। Glass may be cut with a strong pair of scissors, if it is held under water. পাঠক এই সুন্দর উপায়টী অবলম্বন করিয়া কাচ কাটিয়া দেখিবেন, এই কৌশলে কাটে কি না।

— —

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

উপহারের শেষ দশা।

গুহগ্রাম পোঃ, জেলা বর্দ্ধমান হইতে বাবু নীলকণ্ঠ হাজরা হরিসভার সম্পাদক লিখিয়াছেন,—"সবিনয় নিবেদন, মহাশয়, ৩২৩নং কলিকাতা চিৎপুর রোড হইতে 'দত্ত এণ্ড কোংর' বিজ্ঞাপন-মতে তাহার 'স্বপ্নফলকল্পদ্রুম' নামক পুস্তকের গ্রাহক হইয়াছি ও মূল্য দিয়া পুস্তকও লইয়াছি। কিন্তু প্রায় মাসাধিক হইল, সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রভৃতি যে উপহার গ্রন্থ দিবার কথা ছিল, তাহা দিতেছেন না ; মধ্যে পত্র দ্বারা সংবাদও দিয়াছিলাম, তাহাতেও নীরব। মহাশয়, প্রলোভনে পড়িয়া বুঝি এই দশা!"

ব্রহ্মাণ্ডবাজারের প্রতারণা।

উখারা, ভায়া রাণীগঞ্জ, জেলা বর্দ্ধমান হইতে বাবু উত্তমলাল সরকার লিখিয়াছেন,—'সবিনয় নিবেদনমিদং, কলিকাতার ৪নং বৃন্দাবন মল্লিকের প্রথম লেনের শ্রীচণ্ডীচরণ বসু মহাশয়ের নিকট ৺ দুর্গাপূজার পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডবাজার' পত্রিকার একখানা নমুনাস্বরূপ যাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। ৺পূজার (বোধ হয় ১২ই কার্ত্তিক) উক্ত বসু

মহাশয় একেবারে এক ভি, পি, প্যাকেট ও এক পোষ্টকার্ড আমার নিকট পাঠান। এই কার্ডখানিতে বসু মহাশয়ের শীল ছাপা আছে। উহাতে লেখা আছে যে,—"আপনাকে গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া উপহার পুস্তক (মসারি রহস্য, পাগলের কথা, পরমায়ু-প্রহরী) পাঠাইলাম! এবার হইতে আপনি প্রতিবারে ব্রহ্মাণ্ড-বাজার পাইবেন।" আমি লজ্জার খাতিরে প্যাকেটটী লইয়া ১৷৶০ এক টাকা দশ আনা দিয়াছি ; কিন্তু 'ব্রহ্মাণ্ডবাজার' পাওয়া দূরে থাকুক, তজ্জন্য বসু মহাশয়কে ২।৩ বার পত্র লিখিয়াও উত্তর পাই নাই। এক্ষণে মহাশয়ের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, এ বিষয়ের প্রতিকার করিলে চিরবাধিত হইব।"

গ্রাহকগণের দৌরাত্ম্য।

১। বাবু রাজেন্দ্রনাথ হালদার, ৩৯নং শিকদারপাড়া রোড, কালিঘাট।—ইনি 'অনুসন্ধান' পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম হইতে গ্রাহকভুক্ত হন। এবং কিছুদিন কাগজ পাইয়া টাকার জন্য প্রথমবার তাগাদা হইলে লেখেন যে—"আগামী আশ্বিন মাসের ১২ই তারিখে লোক পাঠাইলে মূল্য দিতে পারিব। এইজন্যই মহাশয়কে ক্ষমা করিবার প্রত্যাশায় যথোচিত অনুরোধ করিলাম ; অপরাধ লইবেন না। পত্রিকা বন্ধ করিবেন না।" এই মর্ম্মের পত্র এবং তৎসহ নানারূপ অনুরোধহেতু আমরাও চুপ করিয়াছিলাম। কিন্তু শেষে ঐ সময়ও উত্তীর্ণ হইলে—অর্থাৎ আশ্বিন, কার্ত্তিক, এমন কি অগ্রহায়ণ মাসও কাটিয়া গেলে, হালদার মহাশয়ের নিকট আমরা তাগাদায় লোক পাঠাই। কিন্তু দেখুন পাঠক, সে সময় তিনি কি উত্তর দিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পত্রিকা পাঠাইয়াছেন ; কিন্তু আমি ইহার দাম দিব না। মূল্যের বিল ফেরত দিব। কারণ, আমি বারম্বার লিখিতেছি, তথাপি আপনি কাগজ পাঠাইতেছেন।" সুতরাং দেখুন পাঠক, কি অদ্ভুদ আবদার!

২। বাবু ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, মাওগাছি, পূর্ব্বস্থলী পোঃ, কালনা।—এই নাম ও ঠিকানা দিয়া একব্যক্তি অনুসন্ধানের গ্রাহক হন এবং তাঁহার অনুরোধ-মত কাগজ যাইতে থাকে। কিন্তু পরে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-কথামত টাকা না পাঠানয়, আমরা মূল্যের জন্য তাঁহার নামে ভ্যালুপেয়েবেলে কাগজ পাঠাই। কিন্তু তাহাতে নবদ্বীপ হইতে বাবু ব্রজানন্দ গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি এইরূপ অদ্ভুদ উত্তর দিয়াছেন,—"আপনাদের অনুসন্ধান-সমিতির ১২১১নং গ্রাহক শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য আমার বাটীতে আছেন বলিয়া ঐ কাগজ এখানে পাঠাইতেছেন। কিন্তু ঐ বাবুটী আশ্বিন মাসে কালীঘাট যাওয়া-উল্লেখে এখান হইতে গিয়াছেন ; তা'র পর আর তাঁর দেখাও নাই। তদবধি ঐ কাগজ ডাকপিওন আনিলে আমি ঐ কথা বলা-সত্বেও তাহারা কাগজ বৈঠকখানাতে ফেলিয়া যায়। তদপর সেদিন ঐ কাগজ ভেলুপেয়েবেল-যোগে আসিলে, আমি তাহা ফেরত দিয়াছি ; ও আর আসিলে দিব ইতি। শ্রীব্রজানন্দ গোস্বামী।" দেখুন পাঠক, এও কি অদ্ভুত উত্তর নহে? এক মাওগাছির কাগজ তলে তলে নবদ্বীপে প্রতি-প্রেরিত হওয়ার বন্দোবস্তই তো গ্রাহকের পক্ষে অল্প চাতুরীর কথা নহে ; তাহাতে আবার কেবল টাকার তাগাদার সময়ই কাগজ ফেরত দেওয়া ;—এও কি অল্প রহস্যের কথা? যাইহোক, এযাবৎ কাগজ ঐরূপে পিওনকে ফেরত না দিয়া, শেষে টাকার তাগাদার সময়ই ফেরত দেওয়া ব্রজানন্দ বাবুরও কি উচিত কাজ হইয়াছে? ফলতঃ এইরূপ গ্রাহকগণের জ্বালায় অনেকেই জ্বালাতন, এই ক্ষোভ।

———

সংবাদ।

—কোন নূতন পুস্তক প্রকাশ করিলে, রেজেষ্টারী আপিসে তিনখানি পুস্তক দিতে হইত; গবর্ণমেণ্ট ঐ পুস্তক তিনখানির মূল্য দিতেন। কিন্তু আজকাল আবার নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে, ইহার পর আর প্রকাশক ঐ তিনখানি পুস্তকের মূল্য পাইবেন না; বিনা-মূল্যেই তাঁহাকে পুস্তক দিতে হইবে।

—রুস দেশের একজন মহাজন প্রথম শ্রেণীর রেল-যোগে মস্কাউ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটী স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার আলাপ হয়; এবং উভয়ে পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যাইতে থাকেন। এমন সময়, হঠাৎ তাঁহাদের গাড়ির ভিতর কিসের দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে, ও তাহাতে স্ত্রীলোকটী কি এক শিশি ঔষধ গাড়িতে ছড়াইয়া দেন। ইতিমধ্যে মহাজন একেবারে নিদ্রিত হইয়া পড়েন ও অনেকক্ষণ তাঁহা সে নিদ্রা ভাঙ্গে না। কিন্তু শেষে মহাজনের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত টাকা-কড়ির ও জিনিস-পত্র কে সেই সময় চুরি করিয়া পলাইয়াছে এবং স্ত্রীলোকটীও গাড়িতে তাঁহার মত নিদ্রিত রহিয়াছে।; কিন্তু সন্দেহ হওয়ায়, অতঃপর সেই স্ত্রীলোকটীকেই দোষী সাব্যস্থ ও কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ইহার কিছু দিন পরেই তত্রত্য রেলওয়ের গার্ডের নিকট হইতে সকল মালপত্র বাহির হইয়া পড়িল; এবং সন্ধানে জানা গেল, যে, সে নল দ্বারা 'ইথার" নামক ঔষধ গাড়ির ভিতর ছড়াইয়া ঐরূপে মধ্যে মধ্যে আরোহীদিগকে অভিভূত করিত ও শেষে তাহাদের সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিত। যাই-হোক, ধরা পড়িয়া গার্ডের ঐরূপ আরও নানা কীর্ত্তির কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জুয়াচুরীর কি ভয়ানক ফন্দি!

—সম্প্রতি লণ্ডনে একটী শিবলিঙ্গ নিলামে ৩২৬০৬ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদিগের হস্ত হইতে মুসলমানগণ উহা অপহরণ করেন এবং শেষে ইংরাজ-রাজত্বে উহা শ্বেত-দ্বীপে গিয়া বিক্রীত হইল। উক্ত শিবলিঙ্গটি মনিমণ্ডিত ছিল, তাই এত দামে বিক্রিত হইয়াছে। যাইহোক, হিন্দুর দেবতার এ অপেক্ষা দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে?

—এইবার মৌঙ্গথন্ নামক ব্রহ্মের এক ব্যক্তি ভারতে লাট-দরবারের মেম্বরের পদে বরিত হইয়াছেন।

—দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া দেশে একটী নদীর জল এত অম্ল যে, সে দেশের লোক তাহার নাম রাখিয়াছে, "ভিনিগার নদী।"

—আল্‌জিরিয়া দেশে একটি নদীর জল কালী। সেই কালীতে লেখা চলে। দুটি নদীর সংযোগে এই কালী-নদী হইয়াছে। একটি নদী লৌহময় দেশ বহিয়া আসিতেছে, আর একটি নদী আসিতে আসিতে গ্যালিক এ্যাসিড নামে এক প্রকার অম্লরস-মিশ্রিত জলপূর্ণ একটী প্রাচীন জলাশয় ভেদ করিয়া অম্লরসযুক্ত হইয়া আসি-তেছে। যে স্থানে লৌহময় জলপ্রবাহ অম্লরস-মিশ্রিত জলে সংযুক্ত হইতেছে, ঠিক্ সেই স্থানে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে।

—আমেরিকার ম্যাসাচুসেট অঞ্চলে বালুকাময় সমুদ্রতট রহিয়াছে। যখন জল কমিয়া যায়, অধিক বালুকাময় স্থান বাহির হয়। তুমি যদি যষ্টি দ্বারা সেই বালিরাশীর উপর আঘাত কর, কিম্বা তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাও, তবে তাহার ভিতর হইতে গানের সুর শুনিতে পাইবে। অনেক দূর হইতেও সেই গুন্ গুন্ শব্দ শুনিতে পাইবে। সে শব্দও আবার মধুর। আমেরিকার লোকে সেই বালির নাম রাখিয়াছে, "গাইয়ে বালি।"

—রুষ রাজ্যে শৈল-তৈলের কতকগুলি উৎস আছে। একটী উৎস বড়ই অদ্ভুত। সেই উৎস হইতে শৈলতৈল বাহির হইয়াছে। সেই তৈল এরূপ বেগে প্রবাহিত হয় যে, উৎস-সমীপে চারি মাইল দীর্ঘ ও দেড় মাইল প্রস্থ একটি হ্রদ হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি এই প্রকাণ্ড তৈল হ্রদ আপনি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মনে কর, কি অদ্ভুত দৃশ্যই না হইয়াছে! দেড় ক্রোশ দীর্ঘ তৈল হ্রদ ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার চারি দিকে এরূপ প্রখর উত্তাপ যে, কাহার সাধ্য তাহার নিকটে যায়!

—হুগলি ষ্টেষণের নিকট একটী যুবক রেলের উপর মাথা রাখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। চালক অনেক চেষ্টা করিরাও ট্রেণ থামাইতে পারে নাই।

—কোন ডাক্তার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়াছিলেন। ডাক্তার রসায়ন-শাস্ত্র খুব ভাল জানেন; স্ত্রী স্বামীর সহিত কিছুতেই না পারিয়া কান্দিতে লাগিলেন। স্বামী বলিলেন,—"চক্ষের জল ফেলিয়া কিছুই লাভ নাই। চক্ষের জলের দ্বারা কোন কাজই হয় নাই। আমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, চক্ষের জলে অল্প পরিমাণ ফস্‌ফেট্ অব্ লাইম, একটু ক্লোরাইড অব্ সোডা, আর অকর্ম্মণ্য জল আছে; অতএব, এমন অকেজো জল ফেলিয়া লাভ কি?"

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই মাঘ, ১২৯৫ সাল। [১২শ সংখ্যা।

সাধক-সঙ্গীত।

মুলতান—আড়াঠেকা।

"যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবা-নিশি আশা-পথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবননাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয়-কুটিরদ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি এক বার, এসে কি জুড়াবে হিয়ে।"

পাপীর আত্ম-কথা।

(সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-সম্বন্ধে।

"একদিন সন্ধ্যার পর একটী বাবুকে সঙ্গে করিয়া কালী বাবু আমাদিগের বাটীতে আসি-লেন। তাঁহাকে আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, তিনি কালী বাবুর একজন প্রধান পারিষদ। কালী বাবুর সঙ্গে প্রায়ই তিনি আমাদিগের বাটীতে আসিতেন এবং সুরাপানাদিও করিতেন। তাহার নাম গণেশচন্দ্র। আজ গণেশ বাবু আসিয়া আমার ঘরে উপবেশন করিলেন; কালী বাবু তাঁহার নিকট বসিলেন। আমি এক ছিলুম তামাক সাজিয়া কালী বাবুর হস্তে দিলাম; তিনি উহা টানিতে লাগিলেন। আমিও সেই স্থানে বসিলাম।

"কালী বাবু কহিলেন,—'গণেশ, তুমি কি ইহার যোগাড় করিতে পারিবে? তোমার সহিত তো বরকর্ত্তার আলাপ নাই! বিশেষ, তিনি পাড়াগাঁয়ের লোক; তিনি তোমার কথায় কি প্রকারে বিশ্বাস করিবেন!'

"গণেশ।—'সে ভাবনা আর আপনার ভাবিতে হইবে না। আমি নিজে ইহার সম্বন্ধ করিতেছি না। আমার সহিত যাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তিনি সেই গ্রামের একজন অধিবাসী ও বরকর্ত্তার কুটুম্ব। তিনি বহুকাল অবধি কলি-কাতায় আছেন, অথচ তিনি ইহার ভিতরের অবস্থাও অবগত নহেন; তাঁহার মনে কোন পাপ নাই। কেবল একটী ভদ্র বংশের লোপ হয়, এইজন্য তিনি কায়মনোবাক্যে বরের উপকারের চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির কথাতে যে কেহ অবিশ্বাস করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই।'

"কালী।—'পাড়াগাঁয়ের লোক কি এতই মূর্খ! তাহাদের দেশে কি উহার বিবাহ হয় না!'

"গণেশ।—'পাড়াগাঁয়ে উহার বিবাহ হইলে কি সে আর কলিকাতায় এরূপ যোগাড় দেখিত? সেখানে তাহার বিবাহের সম্ভাবনা নাই; কারণ, বরটী সেই গ্রামের একঘর শুদ্ধ শ্রোত্রীয়ের পুত্র। তাহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা বরাবর চারি মেলের ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া কুলীনের পুত্র আনিয়া সুপাত্রের সহিতই তাঁহাদের কন্যাদির বিবাহ দিয়াছেন। এই নিমিত্ত দেশের ভিতর তাঁহাদের যথেষ্ট নামও আছে। কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষের নাম থাকিলে কি হয়! বরটীর বয়স একে চল্লিশের কম হইবে না; তাহাতে আবার সে মূর্খ—লেখা-পড়ার নাম মাত্রও জানে না; বিষয় আদিও তাদৃশ নাই যেকিছু ব্রহ্মত্তর জমি ও বাগান আছে, তাহ ও অতি সামান্য। দেশের মধ্যে এরূপ বরকে দেখিয়া কে তাহার কন্যাকে জলে ফেলিয়া দিবে? বিশেষ, বিবাহ করিতে হইলে সময় সময় ইহাদের এক হাজার হইতে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পণ দিতে হয়। তাহা ছাড়া, অলঙ্কার আছে ও বিবাহের অন্যান্য খরচ-পত্রাদিও আছে। কিন্তু সে সঙ্গতি ইহাদের কই! সুতরাং কেমন করিয়া দেশের মধ্যে উহার বিবাহ হইবে? ইহার আর কেহই নাই; থাকিবার মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধ মাতা। এখন তাঁহারও ইচ্ছা, সামান্য খরচে পুত্রটীর সমান ঘরে বিবাহ হয়। তাহাহইলে তিনি পৌত্রের মুখ দর্শন করিতে পাইবেনই তো; তদ্ব্যতীত সেই বংশের জলপিণ্ড-দানের পথও একেবারে রুদ্ধ হইবে না। আর, এ বিবাহে তিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধাই হইতেছে। একে কন্যাটী বড় ও সুশ্রী, তাহাতে ঘর উত্তম; এবং খরচ-পত্রও তাদৃশ লাগিবে না।'

"কালী।—'তাঁহাদিগকে কিরূপ ভাবে বুঝান হইয়াছে? আমি যে যে প্রকার বলিয়া দিয়াছিলাম, সেই প্রকার হইয়াছে, কি অন্য কোন প্রকার বলা হইয়াছে?'

"গণেশ।—'তাঁহাদিগকে এইরূপ ভাবে বুঝান হইয়াছে যে,—'মেয়েটী একজন শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা। তাহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হওয়ায়, তাহার একমাত্র বিধবা মাতা তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া মেয়ের মামার বাটীতে বাস করিতেছেন। মেয়ের মামাও একটী সামান্য কর্ম্ম করেন; সুতরাং তাঁহার অবস্থা এরূপ নহে যে, তিনি তাহাদিগের উভয়ের প্রতিপালন ভার গ্রহণ করেন ও ভাল পাত্রে ভাগ্নীটীর বিবাহ দেন। আর, তাঁহাদের বংশের একটু গৌরব থাকা প্রযুক্ত কিছু টাকা পণস্বরূপ লইয়াও উহার বিবাহ দিতেও পারেন না। এখন, কন্যাটী বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বয়ঃক্রম এখন প্রায় ১৪ বৎসর হইবে। বিবাহ না দিয়া এত বড় কন্যা ভদ্র লোকের ঘরে আর কি প্রকারে রাখা যায়!' এইরূপ নানা কারণে তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে. যদি এরূপ একটী পাত্র মিলে যে, তাঁহার সংসারে আর কেহই নাই এবং কন্যাটী ও তাহার মাতাকে তিনি প্রতিপালন করিতে পারেন, তাহাহইলে অতি সামান্য খরচেই তিনি কন্যাটীকে পাইতে পারিবেন। খরচ কিছু অধিক হইবে না; তবে কন্যাকে কেবলমাত্র ৫০০ শত টাকার গহনা দিতে হইবে; কিন্তু সেও কেবল দেওয়া মাত্র' তাহাতে যাঁহার টাকা তাঁহারই ঘরে থাকিবে। আর, কন্যার নিমিত্ত পণ-আদি কিছুই লাগিবে না। তবে কন্যার মাতার প্রাপ্য ৩০০ শত টাকা দেনা আছে, ঐ টাকা কয়েকটী কেবল তাঁহাকে প্রণামী-স্বরূপ দিতে হইবে। আর, এখানকার লোকজন খাওয়ান প্রভৃতি খরচও তাঁহাকেই করিতে হইবে। তবে তাহা অতি সামান্য; এক বা দেড় শত টাকাতেই যথেষ্ট হইবে।' আমাদের এইরূপ প্রস্তাবে বরকর্ত্তা সম্মত হইয়াছেন। দুই তিন হাজার

...। খরচ করিলেও যাহার বিবাহ হয় না, প্রায় হাজার টাকায় সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ...রাও আবার পাঁচ শত টাকার গহনা আপন ...ই থাকিবে! বিশেষ, মেয়েটী ভাল। সুতরাং ...প প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় তাঁহার আর কোন ...তিবন্ধকতাই দেখিতেছি না। তাঁহারা বলিয়া ...য়াছেন যে, তিন দিবস পরে তাঁহারা কন্যা-...কে দেখিতে আসিবেন ও একেবারে 'আশীর্ব্বাদ' ...য়া যাইবেন। এখন, কন্যার কি উপায় ...য়াছ? দেখিও, এত যত্ন ও কষ্ট যেন বিফল ... হয়!"

"কালী।—'কন্যার ভার ত আর আমার ...পর নাই, যে, আমি তাহার উপায় দেখিব? ... ভার ত্রৈলোক্যের উপর আছে।'

"তখন আমি উহাদিগকে বলিলাম, সে ...না আর তোমাদিগের ভাবিতে হইবে না। ...হার সমস্তই ঠিক আছে। এখন, তোমরা ...ত্র শীঘ্র ইহার অন্যান্য যোগাড় দেখ।

...ণেশ।—'কি প্রকার কন্যার ঠিক করিয়াছ, ...কবার জানিতে ইচ্ছা করি।

"তখন আমি উহাদিগকে বলিলাম, আমার ...টীর নিকট ঐ যে কয়েকখানি খোলার ঘর ...দেখিতেছ, উহার একখানিতে একটী পঞ্চাশ ...ৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক বাস করে। তাহার ...াম দিগম্বরী। শুনিতে পাই, দিগম্বরী বাগ-...দের মেয়ে, তাহাকে কে চুরি করিয়া কলিকাতায় আনিয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে। সেই পর্য্যন্তই ...গ কায়স্থ-পরিচয়ে আমাদিগের মতন বেশ্যা...ত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আসি-...তেছে। পরে যখন তাহার বয়স অধিক হইল, ...খন সে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অন্য আর একটী ...নিতান্ত দরিদ্র বেশ্যার নিকট হইতে বিধু নাম্নী একটী দেড় মাসের বালিকা ৩ টাকা মূল্যে ...খরিদ করিয়াছিল; ও তাহারই রোজগারের উপর নির্ভর করিয়া বৃদ্ধাবস্থা অতিবাহিত করি-...বার প্রত্যাশায় এতদিন ঐ বালিকাটীকে আপন কন্যার মত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। বিধু দেখিতে এখন মন্দ হয় নাই; যেমন হউক, একটু লেখাপড়াও শিখিয়াছে, এবং তাহার বয়ঃক্রমও ১৩।১৪ বৎসর হইয়াছে। আমি দিগম্বরীকে সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিয়াছি। এখন তাহারও অবস্থা ভাল নহে। সুতরাং সেও আমার কথায় সম্পূর্ণ আহ্লাদের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে হইবে। তাহার কমে কিছুতেই সে রাজি হয় না।

"কালী।—'তাহাই হইবে! উহাকে অর্দ্ধেকই দিয়া বক্রী আমরা অংশ করিয়া লইব। আমরা যাহা পাই, তাহাই আমাদিগের লাভ।'

"গণেশ।—'বর-কর্ত্তার পক্ষের লোক তিন দিবস পরে কন্যা দেখিতে আসিবেন। এখন কোন ভদ্র-পল্লীতে আমাদের একটী বাটী লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এখানে তাঁহাদিগকে কোন ক্রমেই আনা যায় না; এখানে তাঁহারা আসিলে তাঁহাদিগের মনে নানারূপ সন্দেহ হইতে পারে। বিশেষ, ভবিষ্যতে যদি কোন প্রকার গোলযোগ হয়, তবে আর আমাদিগের ধরা পড়িতে বাকি থাকিবে না।'

"এইরূপ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর গণেশ বাবু সে দিবস গমন করিলেন। পর দিবস কালী বাবু ও গণেশ বাবু উভয়ে মিলিয়া কোন ভদ্র-পল্লীর ভিতর একটী ছোটগোছের একতালা বাটী একমাসের জন্য ভাড়া করিলেন। যাঁহার বাটী তিনি প্রথমে একমাসের জন্য অপরিচিত লোকের নিকট ভাড়া দিতে অসম্মত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই নগদ এক মাসের ভাড়া পাইয়া আর কোন প্রকার দ্বিরুক্তি করিলেন না; তখনই বাটীর চাবি আনিয়া দিলেন। আর, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় হইতেই আমি, কালী বাবু, দিগম্বরী ও বিধু সেই নূতন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম। তবে সেখানে অধিক দ্রব্যাদি কিছুই লইয়া গেলাম না। কেবল

নিতান্ত আবশ্যকীয় কয়েকটী দ্রব্য ও বিছানা পত্রাদি লইয়া গেলাম।

"উহার দুই দিবস পরে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বর পক্ষের ৩।৪ জন লোক মেয়ে দেখিতে আসিল। গণেশ বাবু উহাঁদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন; উহাঁদিগের নিমিত্ত উত্তমরূপ জল খাবারের আয়োজন করিলাম; তাঁহারা পরিতোষের সহিত জল পান করিলেন। ও তাহার পর মেয়ে দেখিতে চাহিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিধুকে উত্তমরূপ শিখাইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন কেবলমাত্র একখানি সুন্দর সাড়ী পরাইয়া বিনা আভরণে কালী বাবু, যে স্থানে উহারা বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে বিধুকে লইয়া গেলেন। ও আপনার ভাগী পরিচয়ে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা মেয়ে দেখিয়া যার পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মেয়েকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয় করিলেন। তাহার উপযুক্ত উত্তর পাইতেও বিলম্ব হইল না। তখন তাঁহারা আর কিছু না বলিয়া একখানি 'মোহর' দিয়া মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ও একটী দিন দেখিয়া সেই মাসের মধ্যেই বিবাহের দিন স্থির করিলেন। কন্যা পক্ষের লোকেরা যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাঁহারা তাহাই দিতে সম্মত হইয়া সে দিবস চলিয়া গেলেন। পর দিবস কালী বাবু সেই আশীর্ব্বাদি সুবর্ণ মুদ্রা বাজারে বিক্রয় করিয়া যথা-নিয়মে সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

"একদিন, দুই দিন করিয়া ক্রমে দিন গত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। বিবাহের কেবল মাত্র চারি দিবস বাকী আছে, তখন গণেশ বাবু বর-পক্ষীয় লোকের নিকট হইতে আবশ্যকীয় খরচ-পত্রের নিমিত্ত একশত টাকা আনি[লেন]; এবং বিবাহের তিন দিবস বাকী থাকিতে বরের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আর তাঁহারাও বুঝিলেন যে সেই দিবস কন্যার গাত্রেও হরিদ্রা দেওয়া হইল। কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই হইল না। ঐ একশত টাকার মধ্য হইতে পঞ্চাশ টাকা আমরা সকলে নিয়ম মত অংশ করিয়া লইলাম; এবং বক্রী পঞ্চাশ টাকার দ্বারা বিবাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি খরিদ ও বরযাত্রী এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদির বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।

"দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। বাটীর ভিতর মহা ধুম ধাম পড়িয়া গেল; যাহার যাহার সহিত আমাদিগের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাঁহারা সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। সোনাগাছি হইতে আমার সমবয়স্কা স্ত্রীলোকগণ, যাহাদের সহিত আমার বিশেষ মিল ছিল, তাহারাও আমাদিগের এই নূতন বাটীতে আগমন করিয়া সকলেই আব[শ্য]ক-অনুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। কেহ ময়দা মাখিতে লাগিল; কেহ লুচি ভাজিতে লাগিল; কেহ বা তাহাদিগের উপর আপন হুকুম চালাইতে লাগিল। কেহ, কেহ বা কন্যাকে লইয়াই বিব্রত হইল; তাহাকে স্নান করাইতে, তাহার চুল বাঁধিতে, এবং তাহাকে কাপড় পরাইতে বিশেষ ব্যস্ত থাকিল। কেহ বা পিঁড়িতে আলপনা দিয়া তাহার শিল্প কার্য্যের পারিপাট্য দেখাইতে লাগিল। এই রূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন নাপিত ও পুরোহিত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই বা তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের পরিচয়ও ছিল না। কিন্তু তাঁহারা সকলকে দেখাইতে লাগিলেন, যেন আমরা তাঁহাদের কতই পরিচিত, এবং অনেকদিনের জানিত। আমা[]দিগের বংশাবলী, কুলশীল প্রভৃতি, যাহা তাঁহাদিগকে জানান হইল, তাঁহারা তাহাই বিশ্বাস করিয়া লইলেন। ও তাহাই বলিয়া পরে বর-যাত্রী ও বর-পক্ষীয় পুরোহিত প্রভৃতির নিকট অম্লান বদনে পরিচয় প্রদান করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না।

"ধন্য মুদ্রা!—তোমার দ্বারা না হয় এমন কার্য্যই নাই! আর ধন্য কলিকাতাবাসী!—তোমরাও পয়সার লোভে না করিতে পার এমন কর্ম্মই দেখি না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই আপন ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন; এবং আমাদিগকে ভাল ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া বেশ্যার বিবাহ দিতেও কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইলেন না।

"এই বাটীর ভিতর এক স্থানে বরের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহাতে উত্তমরূপ বিছানা পড়িল; এবং আমাদিগের নিমন্ত্রিত ও পদলস্থ ব্যক্তিগণ আমাদিগের ষড়যন্ত্রের বিষয় উত্তমরূপ অবগত হইয়া, বরযাত্রীর প্রতীক্ষায় সেই স্থানে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তথায় পরস্পরে ঠাট্টা-তামাসা ও আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল। সেই সময় দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দরজার সম্মুখে উপনীত হইল। তদ্দর্শনে সকলেই উঠিয়া সেই দিকে গমন করিলেন; এবং গাড়ির ভিতরস্থিত ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক নামাইয়া বাটীর ভিতর লইয়া আসিলেন। বরকে সকলেই দেখিবামাত্র চিনিয়া বাহির করিল। বরের পরিধানে পীতাম্বরী ধুতি এবং তাহার কাল অঙ্গও লাল 'দোবজা' দ্বারা আচ্ছাদিত। কপালে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি চন্দনের রেখা, হস্তে দর্পণ এবং মস্তকে টোপর। কেহ বরের হস্ত ধরিয়া, কেহ বরযাত্রীগণকে পথ দেখাইয়া, কেহ বা পুরোহিত মহাশয়কে অগ্রে লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে

নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিলে সকলেই সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

"এদেশে বিবাহের সভা-মাত্রেরই অলঙ্কার,—বালকের কোলাহল, ঝগড়া ও পরস্পরের পরীক্ষা গ্রহণ—। কিন্তু এ সভায় একটীমাত্রও বালককে না দেখিয়া, এবং কন্যাযাত্রীর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, শুনিলাম নাকি একজন বৃদ্ধ বরযাত্রী আস্তে আস্তে তাঁহাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'এবিবাহ আমার কেমন কেমন বোধ হইতেছে। কলিকাতার ভিতর অনেক প্রকার জুয়াচুরি হয়; ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া এ সম্বন্ধ হইয়াছে ত?' আরও তাহাতে তাঁহাদের পুরোহিত মহাশয়ও তাঁহাকে নাকি উত্তর দিয়াছিলেন,—'ইহা আমারও কেমন কেমন বোধ হয় বটে; তবে যিনি এ সম্বন্ধের মূল, তিনি একজন অতি প্রবীণ এবং দক্ষ লোক। সুতরাং ইহাতে আমাদের আর কোন প্রকার সন্দেহ করাই অন্যায়।' যাহা হউক, আমাদের পুরোহিত মহাশয় কিন্তু ইহার কিছু আভাস পাইয়া তখনই শশব্যস্তে বলিলেন,—'বিবাহের লগ্ন হইয়াছে,—আর দেরি করিয়া, নিরর্থক লগভ্রষ্ট করা কোন মতে উচিত নহে। শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই ভাল। আর একটী কথা, আমার প্রথমেই বলা উচিত। কারণ, আপনারা কলিকাতার অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন কিনা, জানি না! এখানকার নিয়ম এই যে, দেনা-পাওনা-সম্বন্ধীয় যদি আপনাদিগের কোনপ্রকার বন্দোবস্ত থাকে, তবে সেটা বিবাহের অগ্রেই মিটাইয়া দেওয়া উচিত। আপনারা শীঘ্র শীঘ্র এদিকের বিষয় মিটাইয়া ফেলুন। আমি দেখিয়া আসি বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে কি না?'

"বরকর্ত্তা এই কথা শুনিয়া যাহা কিছু প্রণামী প্রভৃতির বন্দোবস্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইয়া দিলেন। পরে পুরহিত মহাশয়

বাটীর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিতে পাইলেন যে, সমস্ত দেনা-পাওনা মিটিয়া গিয়াছে, তখন সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের অনুমতি-অনুযায়ী বরকে লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন; এবং পুরোহিত, নাপীত, ও বরযাত্রীগণের মধ্যেও কেহ কেহ বিবাহের স্থানে গমন করিলেন।

"ক্রমে চেলির কাপড় পরাইয়া, পিঁড়ির উপর বসাইয়া, কন্যাকে বিবাহের স্থানে আনা হইল, সকলে কন্যা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; বরের আর আহ্লাদের সীমাই রহিল না। ক্রমে স্ত্রী-আচার সাতপাক, শুভদৃষ্টি, প্রভৃতি বিবাহের সমস্ত অঙ্গই শেষ হইয়া গেল। আহারের বিষয়টীও বাকী থাকিল না; বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত মত জলপান করিলেন। পরে কন্যাযাত্রীগণ একে একে চলিয়া গেলেন; এবং বরযাত্রীগণ সেই স্থানেই সে রাত্রির মত শয়ন করিয়া রহিলেন; বর বাসর-ঘরে রাত্রি কাটাইলেন। এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু পরদিবস প্রাতঃকালে আমি একজনের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বর নাকি তাহার সমবয়স্ক অন্য আর একটী বরযাত্রের কাণে কাণে বলিয়াছিল,—'ভাই! কলিকাতার ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েরা যে এত বেহায়া তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। কাল রাত্রে আমার যে হাল করিয়াছে, তাহা আমিই জানি, আর ভগবানই জানেন।'

"প্রাতঃকালে শয্যাতোলানি, ডেলাছেলানি, বারওয়ারি, স্কুল প্রভৃতি বিবাহের আনুসঙ্গিক 'বাব'-গুলিও একে একে মিটিয়া গেল। তখন কন্যা-বিদায়ের সময় হইল। বিবাহের পরই কন্যা বিদায় করিতে হইলে যে যে প্রকার আয়োজনের আবশ্যক হয়, তাহার সমস্তই যোগাড় হইল। বরকর্ত্তা তাহাদের আনীত অলঙ্কারগুলি নিজে কন্যার অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। পরে গাড়ি আনাইয়া সকলে আনন্দিত মনে ষ্টেসন অভিমুখে গমন করিলেন। কন্যার সহিত তাহার মামা এবং একটী ঝি এখান হইতে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, কন্যার মামা আর কেহই নহেন, তিনি আমাদের সেই কালী বাবু; আর ঝি তাঁহারই আপন মাতা।

দশম পরিচ্ছেদ।

কন্যার প্রত্যাগমন।

"বরযাত্রীগণের গমনের পর দিবস গণেশ বাবু কন্যাটীকে আনিবার নিমিত্ত বরের দেশে গমন করিলেন। আমিও নূতন বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিজ বাটীতে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। ক্রমে ১০ দিবস অতীত হইয়া গেল; কালী বাবু বা কন্যার আর কোন প্রকার সম্বাদ না পাইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় একখানি গাড়ি আসিয়া আমাদিগের দরজায় উপস্থিত হইল। গাড়ির শব্দ পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি বাহিরের বারান্দায় গিয়া দেখি, কালি বাবু, গণেশ বাবু, বিধু এবং দিগম্বরী আসিয়াছেন। সকলেই আমার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন; গাড়োয়ান চলিয়া গেল। গণেশ বাবু সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কন্যার গায়ের অলঙ্কারগুলি তখন সমস্ত খুলিয়া লইলাম ও একজন পোদ্দারকে ডাকাইয়া সমস্তগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। পোদ্দার নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি করিয়া ঐ পাঁচ শত টাকা মূল্যের অলঙ্কারের দাম ৩৫০৲ টাকা মাত্র দিল। আমরা আর কি করিব! তাহাতেই রাজি হইলাম। কারণ, ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ হইলে, ঐ ব্যক্তি কখনই স্বীকার করিবে না যে, আমরা তাহার নিকট অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছি। বিশেষ, ঐ সকল দ্রব্যাদির চিহ্ন-মাত্রও ঘরে রাখা কোন ক্রমেই যুক্তি-

সঙ্গত নহে। তখন ঐ টাকা নিয়ম মত আমরা সকলে মিলিয়া অংশ করিয়া লইলাম।

"সন্ধ্যার সময় আমি কালী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বরের দেশে গমন করিলে, তাহারা তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? এবং বিবাহের পর প্রথমবার কন্যা বরের বাড়ী হইতে একলা আসিবার নিয়ম এদেশে নাই, তবে কেন জামাই এই সঙ্গে আসিল না?

"কালী বাবু কহিলেন,—'আমরা এখান হইতে বরের বাড়ী গমন করিলে সেই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সকলেই আমাদিগের সহিত যেরূপ সৎভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন ও আমাদিগকে লইয়া যেরূপ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইয়াছিলেন, সেরূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। পরে 'পাকস্পর্শ' পর্য্যন্ত হইয়া গেল; কন্যার হাতের অন্ন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলী মাত্রেই আহার করিলেন,—বেশ্যার ভাত খাইতে আর কাহার বাকি থাকিল না। পরে যখন গণেশ বাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন কন্যা পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল. সকলে সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম; জামাই বাবুও আমাদিগের সঙ্গে আসিলেন। এইরূপে যখন সকলে কলিকাতায় আসিয়া রেল-গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হইলাম, তখন গণেশ বাবু জামাই বাবুকে কহিলেন,—'মহাশয় এখান হইতে আমাদিগের বাটী অনেকদূর। সুতরাং এই স্থান হইতে কিছু জলযোগ করিয়া গেলেই ভাল হয়।' আমি গণেশ বাবুর অভিপ্রায় বুঝিলাম ও তাঁহার প্রস্তাবে মত দিলাম। এবং পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া জামাই বাবুর হস্তে প্রদান করিলাম। গণেশ বাবু তাঁহাকে একটী মেঠাইয়ের দোকান দেখাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন—'আপনি এই লোকের সঙ্গে ঐ দোকান হইতে কিছু আহারীয় দ্রব্য খরিদ করিয়া আনুন। ব্যাচারা জামাই বাবু গূঢ় কথা কিছুই না বুঝিয়া সেই দোকান-উদ্দেশে গমন করিলেন। আর, সেই সাবকাশে আমরা একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহাতে উপবেশন করিলাম ও দরজা বন্ধ করিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ করিলাম। সে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। এইরূপে জামাই বাবুকে তাঁহার অজানিত স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আমরা আপন বাড়িতে চলিয়া আসিলাম।'

"কালী বাবুর কথা শুনিয়া আমার মনে একটু কষ্ট হইল। একে একজন গরিব ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিলাম, বিবাহের খরচ-পত্রের নিমিত্ত তাহার যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গেল, তাহাতে আবার তাহার জাতি গেল; গ্রামস্থ লোকেরও প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হইল। তাহার উপর আবার সেই গরীব নিরীহ জামাই বাবুকে এই অপরিচিত কলিকাতায় একলা পরিত্যাগ করা হইল। স্ত্রীকে পাওয়া তো দূরের কথা, এখন তিনি পুনরায় দেশে গমন করিবেন কি প্রকারে? এই সকল ভাবিয়া আমার মনে কষ্ট হইল সত্য, কিন্তু টাকার কথা যখন মনে করিলাম, তখন সে কষ্ট দূর হইল। এখন আমার হৃদয় শক্ত হইয়া গিয়াছে, পাপকর্ম্মকে আর পাপ বলিয়াই মনে হয় না। বরং ক্রমেই আমোদ উপস্থিত হয়।

"উঃ! এই সকল মহাপাপের কথা মনে হইলে এখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে থাকে; পাপের বিভীষিকা মূর্ত্তি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। হে জগদীশ্বর! আমি কবে এই পাপের উপযুক্ত দণ্ড পাইব!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আবার বিয়ে।

"ছয় মাস পর্য্যন্ত জামাই বাবুর আর কোন সন্ধান পাইলাম না। তাহার পর একদিন

হঠাৎ ৪।৫ জন লোক আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কালী বাবুকে দেখিয়াই চিনিলেন। কালী বাবু যেন তাঁহাদিগকে জানেন না, এরূপ ভান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা শুনিলেন না। যাহা হউক, সে দিবস তাঁহারা চলিয়া গেলেন; পরে কিন্তু জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন, এবং আমাদিগের সমস্ত চক্রান্তই টের পাইয়াছেন। কন্যাটীও যে নাচ, গাহনা এবং বেশ্যাবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাও জানিয়াছেন। জানিয়া আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বা আর কোন প্রকার গোলযোগ না করিয়া তাঁহারা দেশে গমন করিলেন; ও সেই স্থানে গিয়া প্রকাশ করিলেন যে বিসূচিকা-রোগে কন্যাটীর মৃত্যু হইয়াছে। গ্রামস্থ লোক আর অধিক কিছু জানিতে পারিল না; তবে যিনি 'কানা-ঘুসা' কিছু কিছু শুনিলেন, তিনিও আর তাহা প্রকাশ করিয়া গ্রামস্থ সমস্ত লোকের ধর্ম্মনাশের কারণ হইলেন না।

"আমরা এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া আরও ৪।৫ ঘর ভদ্র লোকের সর্ব্বনাশ করিলাম। আরও ৪।৫ খানি পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর জাতি মারিলাম। ঐ কন্যার আরও ৪।৫ স্থানে বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক আপন আপন দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিলাম। কন্যাটী ক্রমে বড় হইয়া আসিল। তখন আমাদেরও সে রাস্তা বন্ধ হইল। আমাদের মনের মতন আর সেরূপ বালিকা না পাইয়া তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।

"এই কলিকাতায় প্রায় প্রত্যহই ছোট ছোট বালক-বালিকাগণ খেলিতে খেলিতে রাস্তা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু পরে পুলিসের সাহায্যে অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই পাওয়া যায়। তবে কাহারও অঙ্গে অলঙ্কার থাকিলে সময় সময় সেই অলঙ্কার মাত্র চুরি যা... কিন্তু বালক-বালিকার সন্ধান হইতে বা... থাকে না। এখন প্রায়ই শুনিতাম ... বালক হারাইলে পাওয়া যায়, কিন্তু সক... বালিকা মিলে না। কেন মিলে না ... আর কেহ জানিত না। কেবল আমরা... জানিতাম।

"ঐরূপ কোন বালিকাকে রাস্তায় একা... পাইলে তাহাকে আমরা বাটী লইয়া আসি... তাম; খুব যত্ন করিতাম। ছেলে মানু... সামান্য যত্নেই ক্রমে আপন পিতা-মাতাকে... ভুলিয়া যাইত, আমাদিগকেই পিতৃ-মা... জ্ঞান করিত। কালী বাবু ও গণেশ ... পরে উহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেন। চা... প্রভৃতি কোন বঙ্গদেশে বিবাহের স্থির হইলে... পনের টাকা প্রভৃতি বুঝিয়া লইয়া কন্যা... সহিত আমরা সেই স্থানেই গমন করিতাম... কেহ মাতা, কেহ পিতা প্রভৃতি সাজি... তাহার বিবাহ দিতাম এবং সেই স্থানে কন্যাকে... রাখিয়া চলিয়া আসিতাম। মধ্যে মধ্যে তাহা... খোঁজ-খবর লইতেও ভুলিতাম না। যাহা... আমাদের মায়ায় অভিভূত হইত, যাহা... আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া কন্যাকে আম... দের সহিত পুনরায় পাঠাইত, তাহাদে... একেবারেই সর্ব্বনাশ করিতাম। অলঙ্কা... প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তাহারা সে... কন্যার আর কখন কোন সন্ধান পর্য্যন্ত... পাইত না। আমরা উহার পুনরায় বিবাহ দি... আবার কিছু উপার্জ্জন করিতাম।

"আমাদের এই ব্যবসা কিছু দিবস চলি... চলিতে একেবারে বন্ধ করিতে হইল; সহরে... ভিতর ভয়ানক গোলযোগ হইয়া উঠিল।... ঘরে ঘরে ডিটেকটিভ্ ঘুরিতে লাগিল। আম... আর কোনরূপ কার্য্য করিতে সাহস পাই... না। যাহা কিছু অসদ্ উপায়ে উপার্জ্জন করি... ছলাম, বসিয়া বসিয়া তাহাই খাইতে লাগি...। এইরূপে আরও কিছু দিবস অতি-...হিত হইল।

" কোথায় কালী বাবু?—এখন তুমি ...থায়! এখন তুমি আসিয়া একবার দেখ, তোমা কর্ত্তৃক আমার কি সর্ব্বনাশ হইল। ...রা দিদির পরামর্শে আমি কেবল আমারই ...র্ব্বনাশ করিয়াছিলাম, আমারই দেহকে ...বল পাপরাশীতে আচ্ছন্ন করিয়াছিলাম। ...ন্তু কালী বাবু, তোমার কথায় আমি ...ই না করিলাম? কত লোকের সর্ব্বনাশ ...রিলাম; কত লোকের জাতি মারিলাম; ...ত লোককে পথের ভিখারী করিলাম; কত ...ক-জননীকে জনমের নিমিত্ত শোকসাগরে ...সাইলাম! উঃ, এ সকল কথা এখন মনে ...রিতেও ভয় হয়; আতঙ্গে হৃদয় কাঁপিতে ...কে! আমার মত সর্ব্বনাশী মহাপাতকী ...তে অতি দুর্লভ, ইহাই মঙ্গল!

আত্ম-দৃষ্টান্ত।

...সকলেই বলে,—'ছেলেপিলেদের যা শেখাও ...রা তাই শেখে।" কথাটা বড় মিথ্যা নয়। ...ই দেখিতে পাওয়া যায়, ছেলেপিলেকে বাল্য-...ল থেকে যা শেখান যায়, তারা তাই শেখে; ...ধিক বয়সে সে সকল সংস্কার ভুল বোধ ...লেও, যদিও তাহারা বাহিরে তাহা পরি-...গ করুক, অন্তরে তাঁহাদের যে একটা আঁক-...ক তাহা একেবারে মুছিয়া যায় না।

কিন্তু কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, ...হাদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা ...হারা শেখে না: কিন্তু আর এক রকম হইয়া ...ড়ায়। সে সকল স্থলে ওরূপ হয় কেন?— ...স্থলে,—'ছেলেপিলেকে যা শেখাও' তারা শেখে না কেন?'

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে ...া যায়, সেস্থলেও তাহাদিগকে যাহা শিখান ...য়াছে তাহারা তাহাই শিখিয়াছে।

শিক্ষা দুই প্রকারে হয়, এক শুনিয়া শিক্ষা; আর এক দেখিয়া শিক্ষা। আমি যদি শিশু-দিগকে পরিশ্রমী হইতে বলি, অথচ নিজে আলস্যে কাল যাপন করি; শিশুরা আমার উপদেশ মত পরিশ্রমের কত ফল তাহা বিবেচনা করিবে না। কিন্তু আমি আলস্যে যে আরাম লাভ করিতেছি, তাহাই তাহাদের ভাল বোধ হইবে। সুতরাং তাহারা সেই পথই অবলম্বন করিবে। যদি আমি তাহাদিগকে পড়িতে বলি, অথচ নিজে খেলা-ধুলা করিয়া দিন কাটাই, তাহাহইলে তাহারা কখনই আমার উপদেশ মত কাজ করিতে ইচ্ছা করিবে না। সদুপদেশে যে ফল না ফলে, সদ্দৃষ্টান্তে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ হয়। উপদেশের অভাব না থাকিলেও খালি দৃষ্টান্ত-দোষে অনেক লোক নষ্ট হয়। অনেক সময়ে আবার এরূপ দেখা যায়, দৃষ্টান্তের সু-অংশ ছাড়িয়া কু-অংশেরই অনুকরণ করে। বোধ হয়, কু-অংশই আপাততঃ মনোরম বলিয়া এরূপ করিয়া থাকে।

এস্থলে এই সম্বন্ধে একটা সামাজিক উদাহরণ দিই:—

বিলাতে ক্রিষ্টমস্ প্রভৃতি উপলক্ষে আবৃত মোড়কে করিয়া উপহার দিবার রীতি আছে। ঐ সময়ে অনেক থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ-প্রদর্শক সম্প্রদায়েরা, ঐরূপ উপায়ে দর্শক-দিগকে উপহার দিয়া থাকেন। আমাদের দেশে ইংরাজ-থিয়েটারওয়ালারা ঐরূপ করিবার পর, দেশীয় থিয়েটারওয়ালারা ঐরূপ প্রথা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে প্রলোভনে লোক সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইত। তার পর ক্রমে পুস্তক-উপহার সৃষ্টি। পুস্তক উপহার দিবার সুবিধা এই, পুস্তক যত মূল্যে বিক্রীত হয় তাহার ব্যয় কিছু তত নয়; তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প। কিন্তু আজকাল আবার ঐ তারতম্য-ক্রমে দর এত বৰ্দ্ধিত হইতেছে যে

দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অথবা না হইলেই বা পোষাইবে কিরূপে? মনে করুন, একজন বিজ্ঞাপন দিলেন,—"অমুক গ্রন্থ যাহা একদিন ৬৲ ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় হইত (বিক্রয় হউক না হউক, কভারে ছয় টাকা লেখা আছে সত্য) এক্ষণে কোন বিশেষ কারণে (যদি দু-দশ খানা বিক্রয় হয়) অল্প দিনের জন্য ১৷৹ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিব (হয়ত সে গ্রন্থ দেড় টাকা মূল্যেও মহার্ঘ)। যাঁহারা অমুক মাসের মধ্যে দেড় টাকা দিবেন, তাঁহাদিগকে আরও সতেরখানি পুস্তক উপহার দিব। কাজেই সতের খানা উপহারের বই একপাতা দুপাতার বই নহিলে চলিবে কেন?

যাই হউক, যে মহাত্মা বাঙ্গালায় এই উপহারের প্রথম পথ-প্রদর্শক, তিনি যে বাঙ্গালার কি মহান্ অনর্থ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া বোধ হয় তিনিও সময়ে সময়ে আত্ম-নিন্দা করিবেন। ফলতঃ এটি দৃষ্টান্তের একটি ভয়ানক দৃষ্টান্ত।

ফল কথা, যদি কাহাকেও কিছু শিখাইতে যাও, নিজের দৃষ্টান্তে শিখাও; শীঘ্র সু-ফল পাইবে। শুধু এই দৃষ্টান্তের বলেই এক এক জন সংস্কারক জগতে যুগান্তর উপনীত করিয়াছিলেন। ভারতে চৈতন্যদেব নানক প্রভৃতির জীবন, দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা-দানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

কিন্তু আজ সে সকল কথা কিছুই বলিব না। আজ বিদেশের একজন অপর ধর্ম্মাবলম্বীর কথা বলিব। ধর্ম্ম-জগতেই দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দানের ফল বড় অধিক।

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দিতে একজন ধর্ম্ম-সংস্কারক ইউরোপ-খণ্ডে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নাম ইগ্‌নেসিয়স্ লয়োলা (Ignatius Loyola)। ইনি খ্রীঃ ১৪৯১ অব্দে স্পেন দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত কল্পনাপ্রিয় ছিলেন; যেমন আমরা ডনকুইক্‌সোটের গল্পে, ডন্‌কুইক্‌সোটকে, অসত্যকে সত্য কল্পনা করিয়া কার্য্য করিতে দেখিতে পাই, ইনিও নিজ জীব[illegible] সেইরূপ করিতেন। তাঁহার মনে কল্পনা-[illegible] এরূপ ধারণা হয় যে, এক জন পরমা[illegible] রাজকুমারী আছেন, তিনিই তাঁহার হৃদয়[illegible] উপাস্য দেবতা। ডন্‌কুইক্‌সোটও এই[illegible] করিতেন। লয়োলা, কুইক্‌সোটের মত [illegible] রাজকুমারীর বিষয় চিন্তা করিতে কর[illegible] অনেক সময় অনেক দুঃসাহসের কা[illegible] করিতেন।

যাহাই হউক, এ স্বপ্ন তাঁহাকে বড় [illegible] দিন দেখিতে হয় নাই। এক সময় পাম্‌প্লো[illegible] নামক স্থানে তিনি ভয়ানকরূপে আ[illegible] হন। তাহাতে তাঁহার সমস্ত বল-বি[illegible] নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহাতে চিরজীব[illegible] জন্য বিকলাঙ্গ হইতে হয়। রুগ্নশয্যায়[illegible] তাঁহার মনের গতি ভিন্নদিকে গমন ক[illegible] আরোগ্য হইয়া তিনি ধর্ম্মজীবনে প্র[illegible] করেন; এবং জীবনের অতীতাংশ-কৃত[illegible] সমূহের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন ক[illegible] এমন সময়ে তিনি খ্রীষ্টানের পবিত্র তীর্থ [illegible] প্রদেশের পবিত্র মন্দির দর্শনে গমন করেন[illegible] খ্রীঃ ১৫২৬ অব্দে তথা হইতে প্র[illegible] হইয়া ইনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য আরম্ভ ক[illegible] ইহাঁর মনে যথার্থ ধর্ম্মভাব ছিল। মন[illegible] তফাৎ ছিল না; কাজেই ইহাঁর উপ[illegible] অনেকের মন ভিজিয়া ছিল। ইহাঁকে [illegible] জন্য অনেক কষ্ট সহিতে হইয়া[illegible] রাজাদেশে ইনি অবরুদ্ধ হইয়া কা[illegible] ভোগ করিয়াছিলেন।

কারা-মুক্তির পর, ইনি প্যারিসে গমন ক[illegible] তথায় ইনি ধর্ম্মসংস্কারের নূতন উপায়[illegible] করেন। প্যারিস হইতে তিনি বিনিস[illegible] গমন করেন; তথায় থিয়েটাইন (Theat[illegible] নামক একধর্ম্ম সম্প্রদায়ে মিলিত হন। খ্রী[illegible] দায়ের উদ্দেশ্য, দরিদ্র সমাজে ধর্ম্ম-প্রচার[illegible] লয়োলা বিলক্ষণ জানিতেন, মুখের কথা[illegible]

[illegible]জে না। আমি যদি বলি, ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্যাগী হও; আর সেই উপদেশ দিবার সময় আলবার্ট টেরি, আলবার্ট চেন প্রভৃতি [illegible]ীন পরিচ্ছদে অঙ্গ ভূষিত করি; তবে [illegible]কে আমার কথায় সন্তুষ্ট হইবে কেন? সেই-জন্য লয়োলা সর্ব্বত্যাগী হইবার উপদেশ দিবার আগে নিজে সর্ব্বত্যাগী হইলেন।

থিয়েটাইন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াই সামান্য [illegible]ন্ন বসন ও অতি সামান্য কথঞ্চিৎ জীবন-ধারণোপযোগী আহার বই আর কিছুই তিনি ব্যবহার করিতেন না। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে [illegible]গী ও দুঃখীদিগের শুশ্রূষাদির পর পথে পথে উপদেশ দিয়া বেড়াইতেন; তখনও তাঁহার সেই দীন-বেশ—সেই ফকিরী বেশ। কাজেই তাঁহার উপদেশে অনেক ফল ফলিয়াছিল। খ্রীঃ ১৫২৪ অব্দে তিনি রোমে গমন করেন। তথায় অতি কষ্টে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মসংস্কার-সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পোপ তৃতীয় পৌল এই খ্রীষ্টভক্ত[illegible]রের বাক্য শুনিয়া বুঝিলেন, এ লোকের দ্বারা ধর্ম্মজগতে অনেক কাজ হইতে পারে। [illegible] তিনি ইহাঁর সংস্কার-কার্য্যে সাহায্যতা করিলেন।

[illegible] তখন লয়োলা পোপের বলে বলবান হইয়া সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তবে তাঁহার [illegible]-কার্য্যের ফল দেখিতে তিনি অধিক দিন [illegible]ন নাই; খ্রীঃ ১৫৫৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু [illegible]

[illegible] তাঁহার সম্প্রদায়ের মত কি, এবং তাঁহার [illegible] কিরূপ ফল হইয়াছিল, তাহা আমাদের আলোচ্য নয়। কেবলমাত্র আত্ম-দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষাদান কত সহজ হয়, তাহাই দেখান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রেরিত কাহিনী।

ধর্ম্ম-ধ্বজীগণের ধর্ম্ম-ছালা।

বুধবার, বৈকাল বেলা। আড্ডা-মন্দিরে বসিয়া আমার এক বন্ধুর সহিত বেঙ্গল থিয়েটারে 'ব্রজলীলা' দেখিতে যাইবার পরামর্শ আঁটিতেছি। এমন সময়, আমাদের 'ঠাকুরদাস ভায়া' তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের পরামর্শ শুনিয়া 'ভায়ার' মনে কিছু বড়ই কষ্ট হইল; ভায়া বড়ই দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ছি! ছি! কি অধঃপতন!—কি কুরুচি! এই উৎসবের দিন, তোমরা ধর্ম্ম-মন্দিরে না গিয়া বেশ্যা-পরিপূরিত নাট্যশালায় যাইবে? বিশেষ, নাট্যশালায় আবার ব্রজলীলা—সেই লম্পট কৃষ্ণের লাম্পট্য-কাহিনী শুনিয়া মনকে কলুষিত করিবে! না—না, আমার কথা রাখ; আজ আমার অনুরোধেও অন্ততঃ, একবার ধর্ম্ম-মন্দিরে চল। দেখিবে, সেখানে যাইলে মনে কি আনন্দ হয়! ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব, প্রেম, প্রীতি সেখানে সকলই বর্ত্তমান। সুতরাং আইস, আজ একবার ধর্ম্মের আলোক দেখিয়া আসিবে।"

ভায়া এইরূপ নানা ভাবের নানা গঞ্জনায়, আমাদিগকে ক্রমে লজ্জিত করিয়া তুলিলেন। কাজেই আমরাও আর ধর্ম্ম-মন্দিরে না গিয়া থিয়েটারে যাইতে পারিলাম না; ভায়ার সহিত আমাদিগকেও ধর্ম্ম-স্থানে যাইতে হইল।

সেখানে গিয়া প্রথম দৃশ্য দেখিলাম, বড়ই ভিড়—চারিদিকেই লোকের ঠেসাঠেসি, ঘেঁষ-ঘেঁষি, মেশামিশি। সকলেই আচার্য্য-উপাচার্য্যের পাশাপাশি,—নিকট-নিকট বসিবার জন্য লালায়িত। কাজেই 'রকম আছে' বুঝিয়া, আমরাও অতঃপর আচার্য্যের বেদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সেখানে গিয়া একখানি বেঞ্চে বসিতেছি, এমন সময় একজন সেই ধর্ম্ম-মন্দিরের লিপ্টভুক্ত মেম্বর—

চোকে চসমাধারী মুখে চাঁপদাড়ী প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট যুবক—কিছু তীব্রভাবে আমাদিগকে বলিয়া উঠিলেন,—"মহাশয়গণ, আপনাদের এদিকে নহে—এদিকে নহে। আমরা ধর্ম্মালয়ে নিয়মিত এ্যাটেণ্ড (attend) দিয়া থাকি। সুতরাং অদ্যকার প্রথম বেঞ্চের স্থান আমাদেরই বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আপনারা ওখানে বসিবেন না—বসিবেন না।"

কথার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। যাহাহউক, ফিরিতে হইল। ফিরিয়া সকলের পশ্চাৎ দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আর, তখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপার দেখিতে ও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কতক বুঝিতে লাগিলাম।

প্রথম ব্যাপার, দেখিলাম, আচার্য্যের আশেপাশে চারিদিকেই মহিলাগণের সমাবেশ। তাহার মধ্যে সামান্য রেলিংএর ব্যবধান। তৎসম্মুখ হইতেই পরপর বেঞ্চের উপর কাতারে কাতারে ধর্ম্মধ্বজীগণ বসিয়া আছেন। তদ্ভিন্ন স্থানাভাবে অনেকে আমাদের মত পার্শ্বপশ্চাতেও দাঁড়াইয়া আছেন। আচার্য্য মহাশয় কখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কখনও বা হস্তপদ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে, কখনও বা প্রেমে গলিয়া গিয়া, বক্তৃতা-চ্ছটা দেখাইতেছেন। সময়ে সময়ে বা আচার্য্য-উপাচার্য্য সকলে মিলিয়া "নিরাকার ব্রহ্মের রাঙা চরণে পুষ্পাঞ্জলী" দিতেছেন। শ্রোতৃবৃন্দ অনেকেও কিন্তু প্রেম-ভোরে বিভোর হইয়া ক্রমে ক্রমে চক্ষু মুদিতেছেন। আর আর সকলেও চুপচাপ করিয়া একাগ্রচিত্তে 'সেই একদিকেই' চাহিয়া আছেন। তবে যেখানে দুই চারিজন বন্ধু-বান্ধবে একত্রে বসিয়া আছেন, সেখানেই একটু-আদটু যা'কিছু গা' টেপাটেপী ও চোখ-মুখের কারচুপী দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বর-প্রেমপিপাসু সকলেই গম্ভীর—বিষম গম্ভীর—গরজে গম্ভীর !!

এক আদবার বক্তৃতার পর একটী-আদটী সঙ্গীত হইতে লাগিল। সঙ্গীত সময়ে লোকের আনন্দ আরও উথলিয়া পড়িতে লাগিল। লোকেরই বা বলি কেন, দিব্য করিয়া বলিতে পারি, তাহাতে আমরাও বড়ই আনন্দিত হইতে লাগিলাম। অধিক কি, সে সঙ্গীত শুনিয়া মনে মনে আমরা আমাদের 'ঠাকুরদাস ভায়াকেও' বড়ই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এও এক উঁচুদরের থিয়েটার ; বিনা পয়সায় এ থিয়েটার দেখা ফেলিয়া যদি পয়সা দিয়া বেঙ্গল থিয়েটারে যাইতাম, তবে তাহা জলে পড়িত—নিশ্চয় জলে পড়িত। এমন হাবভাব-রূপরস কি বেশ্যা-প্রতিপালক নাট্যশালায় আছে ? বিশেষ, সেখানকার সবই 'কুরুচি'—সবই 'কুরুচি !'—তথায় স্ত্রী-পুরুষে একত্রে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া লোকের প্রাণ হরণ করে ?—কি ভয়ানক কথা !—কি প্রাণান্তক দৃশ্য !!

প্রথম সঙ্গীতটী ভাঙ্গিবামাত্রই দেখিলাম, অনেকগুলি বাবু উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কি জানি, তাঁহারা কি মনে করিয়া আসিয়াছিলেন ; আর, কি ভাবিয়াই বা চলিয়া গেলেন। যাহাহউক, তাহাতেও স্থান কিন্তু খালি পড়িয়া রহিল না ; ক্রমে যেমন ভিড়, তেমনই নূতনতর ভিড় জমিতে লাগিল। সকলেই পূর্ব্বমত আচার্য্যের দিকে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। এমন সময়, আচার্য্য মহোদয় পুনরায় সভ্যমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।—বড়ই আবশ্যকীয়, তাই সে উপদেশের সারমর্ম্ম আমরাও প্রায় মুখস্থ রাখিয়াছি। তাহা এই,—"ভ্রাতাগণ !—ভগ্নীগণ ! আজ আমাদের কি আনন্দ ! সকল ভ্রাতায়—সকল ভগ্নীতে একত্র সমাগত হইয়া আজ আমরা পবিত্র প্রেম রাজ্যের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। জগৎপাতা কি আমাদের সে বাসনা পরিপূর্ণ

করিবেন না ? ("অবশ্যই অবশ্যই" এইরূপ উত্তর সহ ঘন ঘন করতালি) ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !!! ঈশ্বর অবশ্যই এদিকে তাকাইবেন। আর, তাহার লক্ষণও আমরা কতক কতক স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। এই মনে করুন, এক শতাব্দি পূর্ব্বে,—এক শতাব্দিই বা বলি কেন, দশ বৎসর পূর্ব্বে,—আমাদের অবস্থা কি ছিল ; আর, পরম পিতার কৃপায় এখনই বা তাহা হইতে কতদূর অবস্থার উন্নতি না হইয়াছে ? পূর্ব্বে আমাদের অন্তপুর-মহিলাগণ সকলেই এক অবস্থায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় পরাধীন ভাবে কাল কাটাইতেন। কিন্তু দেখুন, সভ্য মহোদয়গণ, আজই তাঁহাদের অবস্থা কতদূর উন্নত ! এই ধর্ম্ম-মন্দিরে, দশ বৎসর পূর্ব্বে, কই কয়জন মহিলাকে আমরা আমাদের সহকারিণী-স্বরূপ পাইতাম ? কিন্তু আজ সাক্ষাৎ প্রমাণ দেখুন, আমাদের পার্শ্বে-পশ্চাতে কত পুরনারী আমাদের ন্যায় এক যোগে ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন। একি আমাদের অল্প আনন্দের বিষয় ——"

আচার্য্য মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময় মন্দির-প্রাঙ্গনের একপার্শ্ব হইতে একজন বাচাল যুবক দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল,—"আরও আনন্দের বিষয় হইত—আরও আনন্দ পাইতাম, যদি এই ধর্ম্ম-মন্দিরে আজ প্রতি বেঞ্চে একটী করিয়া পুরুষ ও তৎপার্শ্বে একজন করিয়া মহিলাকে বসানর ব্যবস্থা করা হইত।"

অশিষ্ট যুবকের এইরূপ বাক্যবাণে ধর্ম্ম-মন্দিরে ক্রমে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 'কুরুচি' 'কুরুচি'—'মার,' 'মার' বলিয়া সকলে উঠিয়া পড়িলেন। ধর্ম্মসভা ভাঙ্গিয়া গেল। উপাসনার পরিণাম ক্রমে হাতাহাতি, ঘুঁষোঘুঁষি, ও কিলোকিলিতে পরিণত হইল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; সকলেরই মান সম্ভ্রম বাঁচান দায় হইয়া উঠিল। আর, কাজেই সে হিড়িকে পড়িয়া সে দিনের মত আমাদিগকেও গৃহে ফিরিতে হইল। তবে রাস্তায় আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম,—'এ বড় মন্দ নয়। পয়সা দিয়া মেয়ে থিয়েটার দেখার অপেক্ষা বিনা পয়সায় এ থিয়েটারে বিস্তর লাভ ! হায় !—হায় ! হা পোড়া অদৃষ্ট !—আমাদের বুঝিবারই ভ্রম, এরূপ নহিলে ভ্রাতারা বেশ্যা-প্রতিপালক বলিয়া নাট্যশালায় কেন এত বিরোধী !' ইতি

শ্রী—আঁধার হইতে আলোকে যাইতে ইচ্ছুক।

সকলেরই প্রয়োজনীয়।

বালকের কৃমিজনিত রক্তামাশয়ে।—বালকের এই রোগে সিকি ভরি ওজনে দাড়িম্বের শিকড়ের ছাল অর্দ্ধ পোয়া জল সহ সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ ছটাক থাকিতে নামাইয়া, সেই ক্বাথ ৩।৪ বার করিয়া উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিবস সেবন করাইলে আরোগ্য হয়। এই ক্বাথ প্রত্যহ নূতন প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

হিক্কা রোগে।—দুর্দ্দম্য হিক্কা রোগে একটী গোলমরিচ সূচিকায় বিদ্ধ করিয়া প্রদীপে দগ্ধ ও তাহার ধূমের আঘ্রাণ লওয়াইলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

পায়ে পাঁকুই ধরিলে বা হাজা ঘা হইলে।—আইওডোফর্ম্মের মলম এই রোগের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মলম প্রস্তুত করিবার সুবিধা না থাকিলে নারিকেল তৈলের সহিত আইওডোফর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া নেকড়া বা তুলায় করিয়া ব্যবহার করাতেও অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

শুঁও পোকা লাগিলে।—শুঁও পোকার শুঁও লাগিয়া প্রায় অনেককেই কষ্ট পাইতে হয়। ইহার পক্ষে তাজা কলিচূণ যেমন ঔষধ, এমন আর কিছুই নাই। তাজা কলিচূণ তৎক্ষণাৎ পাওয়া না গেলে পানতৈয়ারির পাত্রে যে চুণ

থাকে, তাহা শুঁও-লাগা স্থানে লেপিয়া দিলে আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না। চূণে শুঁওকে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

সর্পদংশন-চিকিৎসা।—একটী বিষধর সর্পে এক জনকে দংশন করে। ডাক্তার এম্, টেরিয়ার বলেন, সর্পে দংশন করিবামাত্র প্রথমতঃ তাহার উপরে একটী বন্ধনী দেওয়া হয়; পরে দষ্টস্থান চিরিয়া দিয়া তৎপরে তথায় টীং আইওডিনের পিচকারী দেওয়া হয়। মধ্যে মধ্যে অস্থায়ী উত্তেজক ঔষধ সেবন এবং মধ্যে মধ্যে ২।১ বার বমনকারক ঔষধ সেবন ও বিরেচক ঔষধ পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করায় ১২ ঘণ্টার মধ্যে রোগী আরোগ্য হইয়াছিল।

জোঁক ধরিলে ছাড়াইবার উপায়।—জোঁক ধরিলে সেই দষ্ট স্থানে বা জোঁকের উপর কয়েক ফোঁটা কর্পূরের জল দিলে জোঁক তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে ও অধিক রক্ত পড়িবে না।

ঔষধ মর্দ্দনে জ্বর আরোগ্য।—তার্পিন্ তৈল ১২৫ অংশ, টীং ওপিয়াই ৫ অংশ, কর্পূর ৩ অংশ, ওলিভ্ অইল্ ৬০ অংশ; একত্র মিশ্রিত করিবে। ৬ ঘণ্টা অন্তর ৬ মিনিট্ পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের উপর উপর, উপর দিক্ হইতে নীচের দিকে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। সবিরাম জ্বর সচরাচর ২।৪ বার এই ঔষধ মর্দ্দনে আরোগ্য হয়।

শিশুর ম্যালেরিয়া জ্বরে কালমেঘের পাতা।—কুইনাইন দিয়াও ম্যালেরিয়া জ্বর একেবারে বন্ধ করা যায় না। একদিন দুইদিন কুইনাইনের জোরে আটক থাকিয়া ক্রমে আপনিই আবার জ্বর বাহির হয়। কিন্তু ঐরূপ জ্বরে বার বার কুইনাইন দিয়াও যেখানে ফল পাওয়া যায় নাই—কালমেঘের কচি পাতা জ্বর বিরাম সময়ে প্রতিবারে ৩টী করিয়া বাটীয়া ৩বার সেবন করিতে দেওয়ায় জ্বর আরোগ্য হইয়াছে। তৎপর ৩ দিবসউপযু্যপরি ঐ নিয়মে কালমেঘের পাতা সেবনে আর শিশুর জ্বর হয় নাই।

জ্বরের সহিত রক্তভেদ ভেদ।—অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা একটী স্ত্রীলোকের ৫ দিনের জ্বরে হঠাৎ প্রতিবারে অনুমান তিন ছটাক নিয়মে রক্তভেদ হইতে থাকে। এইরূপ চারিবার রক্তভেদ হওয়ার পরে প্রতি বার ১০ গ্রেণ হিসাবে পল্ভ ইপিকাকুয়ানা সেবন করিতে দেওয়ায় রক্তভেদ নিবারিত হয়। সর্ব্বসমেত ৩ বারে ৩০ গ্রেণ ইপিকাকুয়ানা সেবন করিতে দেওয়া হয়। জ্বরও এই সঙ্গে যায়। ষষ্ঠ দিবস রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকে।

ম্যালেরিয়া-জনিত জীর্ণ জ্বরের সহিত কাসি রোগে বাকসের মধু।—দেড় বৎসর পর্য্যন্ত পীড়িত একটী জীর্ণ রোগীর জ্বর ও সেই সঙ্গে গত কার্ত্তিক মাসে অত্যন্ত কষ্টকর কাসি হয়। ৩০ ফোটা বাসকের মধু প্রতি বারে, এই নিয়মে দিবস মধ্যে তিন চারি বার সেবন করিতে দেওয়ায় ছয় বা সাত দিন মধ্যে এই দীর্ঘকালের জ্বর এবং দশ বার দিবস মধ্যে কাসি আরোগ্য হয়। সর্ব্বসমেত ১৫ দিবস এই ঔষধ সেবনের পর, লাইকর ফেরি ডায়ালিসাট সেবনে বিশেষ প্রতিকার হইয়াছে।—চিদ।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

রাজপুত-কুসুম।—বাবু আশুতোষ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানিতে দ্বাদশটী সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত-বীরের বীর-কার্য্য কবিতায় বর্ণিত আছে। রাজপুত-বীরের বীরকার্য্য সমুদয়, আর আমাদের রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির পৌরাণিক কাহিনী সকল, যেরূপ ভাবেই যিনি রচনা করুন না কেন, তাহাতেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে, এই স্বাভাবিক নিয়ম। সে অর্থেও

ন্ততঃ এ পুস্তকখানি নিন্দার নহে; তবে বীন লেখকের নবীন-কালোচিত যা'কিছু টী, তাহা অবশ্যই ধর্ত্তব্য নহে। ফল কথা, ধ্যে মধ্যে লেখারও আবেগ আছে।

শরতের চিঠি।—শ্রীরাধারমণ মহাতা র্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, বর্ত্ত-মান বঙ্গীয় সমাজের গুটিকতক গূঢ় চিত্র লোক-সমাজে প্রকাশ করা। উদ্দেশ্য আমরা ভাল বলি। সমাজ-কীট, ধর্ম্ম-কীট, সাহিত্য-কীট প্রভৃতি নানারূপের কীট-পতঙ্গ আজকাল বঙ্গ-সমাজে উদ্ভূত হইতেছে। স্পষ্ট কথায় হউক, শ্লেষ করিয়া হউক, যে কোন রূপে, তাহাদিগকে নির্বীর্য্য ক... ...ই উচিত। সুতরাং এরূপ ধরণের ...র আমরা পক্ষপাতী। আর, তজ্জ... পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত আমরা ...তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এখন বলিতে হইতেছে, ইহাতে আমাদের সে আশা মিটিল না। লিখন-প্রণালীর পরি-পক্কতা ইহাতে কই? নূতন হাতে পাকা রঙ ফলাইবার চেষ্টা গ্রন্থকারের অনেকাংশে বৃথা হইয়াছে।

সাময়িক পত্র-সম্বন্ধে।

পাগলিনী।—বাবু লালমোহন বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা মাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু তা'র পর আর সাক্ষাৎ নাই। এই পত্রের যখন বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তখনই আমরা বিশেষ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, সেই সন্দেহই কার্য্যে বুঝি বা পরিণত হয়! প্রথম সংখ্যার লেখা ও ছাপা যেরূপ ভ্রমপূর্ণ ছিল, তাহা তো কহিবার নহে! আর 'সচিত্র পত্র' আখ্যা দিয়া যে ছবি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও তদ্রূপ! ফল কথা, এরূপ সকল কাগজ যতই দেশে অল্প বাহির হয়, ততই দেশের মঙ্গল!

অভিনয়-সম্বন্ধে।

নিউ ন্যাসন্যাল থিয়েটার।—বীণা-রঙ্গমঞ্চে উক্ত কোম্পানীর দ্বারা আজকাল 'দাদা ও আমি,' 'সরৎ সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হই-তেছে। বিলাত-প্রত্যাগত খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের তত্ত্বাব-ধানে উক্ত থিয়েটারটি পরিচালিত। উপেন্দ্র বাবু একজন শিক্ষিত এবং অভিনয়-কার্য্যে দক্ষ লোক। সুতরাং তাঁহার পরিচর্য্যায় অভিনয় পারিপাট্যের বিশৃঙ্খলা যে অল্পই হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আর মোটের উপর, অভিনয়ও যে সুন্দর হইতেছে, ইহা অবশ্যই বলিতে পারা যায়! তবে কথা এই যে, লোকের বর্ত্তমান রুচি বুঝিয়া বিষয় নির্ব্বাচন না করিলে ও তাহা সেই রূপ সুন্দররূপে অভিনীত না হইলে, রঙ্গমঞ্চে যে লোকাধিক্য হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। আশা করি, এই বিষয়ে উপেন্দ্র বাবু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিবেন।

ষ্টার থিয়েটার।—গত সপ্তাহে, অব-কাশের পর, উক্ত থিয়েটারে 'সরলা' এবং 'বুদ্ধদেব-চরিত' ও 'বেল্লিকবাজার' অভিনীত হইয়া গিয়াছে। 'সরলা' ও 'বুদ্ধদেব' উভয় নাটকেই বেস জমজমা দেখা গেল।

রাধিকার বিরহ।

(কীর্ত্তন)

মনোহরসাহী—লোফা।

আকুল ভেই অব ব্রজনারী
সোই প্রাণ সখা শ্যাম-বিরহে।
শ্যাম ব্রজ ছোড়ী ছোড়ী ব্রজলীলা
অব গেইরে মথুরাপুরী ॥
(ব্রজ আঁধার করুরে)

দশকুশী।

অব সব সখি সঙে মেলি
শ্রীরাধিকা সায়ম্ বেলি
কানু আশে চলল কানন।

(অব কহাঁ প্রাণকানাহি বোলি)
ভরমে ন মনে ভেল
কানু ব্রজ ছোড়ি গেল
আকুল করই প্রাণ-মন ॥
(মনে ভেল নাহি সোহি দুখ-কথা)

খয়রা।

কিয়ে চঞ্চল ভেই ধাওত ঘন
পবন যমুনা তীরে।
করু চঞ্চল তুলহি লহর
শ্যামল সচল নীরে ॥
(রোয়ি রোয়ি শ্যাম বিরহে)
কিয়ে শারদ চন্দ উয়ল গগনে
ভারই চাঁদিমা ধারা।
ব্রজ বধূসব পাগর ভেই
ভাসল লোচন-নীরে ॥
(অব কহাঁ প্রাণ কানাহি বোলি)
ঢুণ্ডত সবে কদম কাননে
কুঞ্জ কুটীর-মাঝে।
পুছত সলিলে পুছত অনিলে
ভাসই লোচন-নীরে ॥
(কাহাঁ জীবন পিয়া কানাহি বোলি)

দশকুশী।

পুছহি—
বোলরে যমুনা বারি
কহাঁ মেরি প্রাণ হরি
কহাঁ যাই দরশন পাই !
(সোহি বধুয়াকুরে)
বোলরে তমাল তাল
পিয়াল শাল হিন্তাল
কহাঁ মেরি প্রাণ-কানাই ॥
(বোল বোল বোলরে)

লোফা।

যব কোই ন বোলত বাণী
রাই ভেইল আকুল প্রাণী ॥
(কানাহি বিরহে)

দশকুশী।

তব সম্বিত পাওই রাই
সখিজন মুখ চাই
বোলতহি মৃদু মন্দু ভায়।
(রোয়ি রোয়ি ঘনে)
(সো প্রাণবল্লভ বিনুরে)

লোফা।

সোহিরে—
কানুক লাগিয়ে ভেল
আকুল পরাণ।
কৈছলে রাখব সহি
জাতি কুলমান ॥
(সম্পূ... দই ভাগল রে)
...া-জনিত জী...
সহিরে
...সর মধু... ন তোরু লাগি
...গী জীর্ণ... বৈঠি আঙ্গিনায়।
গুমুরি গুমরি কাঁদি।
প্রাণ বাহিরায় ॥
(গুরু জন ভয়ে রে)

মেলতা।

কহ কহাঁ মেরি প্রাণ হরি।
সহিরে রাখহ মিনতি মোরি ॥

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণ-প্রবঞ্চনা।

দিনে ডাকাতি।

গত আষাঢ় মাস হইতে "ধর্ম্ম-সুহৃৎ এই নাম দিয়া একখানি সংবাদপত্র বাহির হইতেছে। 'ধর্ম্ম-সুহৃৎ' বাহির হইবার প্রথমেই আমাদের কিন্তু উহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছিল; এবং আমরাও সরলভাবে সে মনের ভাব 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানে * প্রকাশিত হইয়াছিল যে,—"'ধর্ম্মসুহৃৎ নামে এক নূতন সংবাদপত্র বাহির হইতেছে। তাহার প্রায় অধিকাংশ বিজ্ঞাপনেই এবং আকার-ইঙ্গিতে প্রতারণার গন্ধ অনুভূত হয়।" কিন্তু এখন দেখিতেছি, উক্ত পত্রিকার ভূত-পূর্ব্ব সম্পাদক স্বয়ংই অনুতপ্ত হইয়া, সেরূপ সকল কথাই স্বীকার করিতেছেন; অর্থাৎ উক্ত পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু রামচন্দ্র মল্লিক মহাশয় ও-সম্বন্ধে আমাদিগকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইঃ—

'ইহার সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত, ম্যানেজার শ্রীমান ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র। ইহার

১ম রহস্য।—"শ্রীসত্যচরণ ব্রহ্মচারীর সিদ্ধ-কবচের বিজ্ঞাপন।" এই সত্যচরণ ব্রহ্মচারী নামে অপর কোন লোক নাই। ইনি স্বয়ং হৃষীকেশ দত্ত। সত্যচরণ ব্রহ্মচারীর নামে 'সিদ্ধ-কবচের' জন্য যে মনিঅর্ডার আইসে, সমুদয় এই হৃষীকেশ দত্তই সত্যচরণের নাম সহি করিয়া টাকা লয়েন। ফল কথা, সত্যচরণ ব্রহ্মচারী নামটাই জাল, আর 'সিদ্ধ-কবচ' এক পয়সা জোড়া তাঁবার মাদুলি।

২য় রহস্য।—'তন্ত্রকোষের বিজ্ঞাপন' বিজ্ঞাপন-দাতা স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র; ঠিকানা বংশী সাহার বাগান, বেলেঘাটা, কলিকাতা। এই 'তন্ত্র-কোষ' বটতলার বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষের দ্বারায় প্রকাশিত। ম্যানেজার ত্রৈলোক্য বাবু এই তন্ত্রকোষের টাইটেল বদলাইয়া 'বৃহৎ তন্ত্র-কোষ' বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন।

৩য় রহস্য।—'তন্ত্র-কল্পতরু।' বিজ্ঞাপন-দাতা শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, ভট্টাচার্য্য। ঠিকানা, বংশী সাহার বাগান, বেলেঘাটা, 'ধর্ম্ম-সুহৃৎ-কার্য্যালয়', কেয়ার অব্ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র। এই তন্ত্রকল্পতরুও বটতলার ছাপা এবং 'বিদ্যারত্ন' নামটাও জাল।

৪র্থ রহস্য।—সুলভ-মূল্যে 'কমলকুমারী' 'সরাজ-মোহন' ইত্যাদি পুস্তকের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন-দাতা' কে, ঘোষ; ঠিকানা, ২৪নং মুন্সী দিদার বক্সের লেন, তালতলা, কলিকাতা। এটীও হৃষীকেশ দত্তের খেলা। কেবল এই ঠিকানায় একখানি ঘর ভাড়া আছে মাত্র। এইরূপ প্রতি সপ্তাহে ইহাঁরা নূতন নূতন খেলা খেলিতেছেন। সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ইহাঁদিগের নহে। মফস্বলের ঠিকানা-ওয়ালা পোষ্টকার্ড চাহিয়া লইয়া সেই সকল ঠিকানায় প্রতি সপ্তাহে বিজ্ঞাপন পাঠাইবার জন্য, ইহাঁরা এই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন।

৫ম রহস্য।—'ম্যানেজার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।'—ইহাঁকে বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইতিপূর্ব্বে টি, এন, দত্ত নামে যে ব্যক্তি ধোপার ব্যবসায় করিব বলিয়া অনেককে ঠকাইয়া, শেষে কয় বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছে—ইনি তাঁহারি সহকারী ছিলেন। আর ইনিই সেই বিখ্যাত 'হেম-কুমার-গ্রন্থাবলীর' বিজ্ঞাপনদাতা।"

রামচন্দ্র বাবুর পত্র তো এই। তা'ছাড়া, তাঁহার মুখে উহাঁদের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে আরও যাহা শুনিলাম, তাহাও বড়ই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রকমের। অধিক কি, সত্য হইলে, সে সকলের জন্য ক্রমে পুলিসের সহায়তাও আবশ্যক হইবে। যাহা হউক, আমরা এখনও আশা করি, অভিযোক্তাগণ এ গুরু কলঙ্ক-ভার হইতে এখনও উদ্ধার পাইবার চেষ্টা পান।

* দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য।

সংবাদ।

—বিলাতের প্রসিদ্ধ বল্‌ডিয়ান পুস্তকালয়ে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পুস্তক আছে। এত বড় পুস্তকালয় পৃথিবীতে আর নাই; কোন্ বিখ্যাত পুস্তকালয়ই ইহার সমান নহে।

—সম্প্রতি আমেরিকায় 'চুম্বন' শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেমন করিয়া 'চুম্বন'

করিতে হয়, তথায় তাহাই হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সভ্য যাঁহারা, তাঁহাদের সকলই সাজে! এ দেখিয়া, এখন আমাদের সভ্য 'ভ্রাতার দলও' ইহার অনুকরণ না করিলে বাঁচি!

—বিক্রমপুরের বাবু অম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তীর ভাইজি-জামাই কাছাড়ে থাকিতেন। তাঁহার জ্বর বিকার হয়; বাড়ীতে চিঠি আইসে। তাঁহার খুড়া কাছাড় চলিয়া যান। যাইয়া শুনেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। এ গত আষাঢ় মাসের কথা। কিন্তু আজ কএক দিন হইল, কলিকাতা হইতে শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, উক্ত অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর ভাইজি-জামাই বাঁচিয়া আছেন; তাঁহাকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপে পরিচয় পাইয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তিই অম্বিকা বাবুর ভাইজি-জামাই। অম্বিকা বাবু এই চিঠি পাইয়া কলিকাতা ও কাছাড়ে টেলিগ্রাম করেন। কাছাড়ের টেলিগ্রামের উত্তর এইরূপ—'আপনার ভাইজি-জামাইর মৃত্যুর পর আমরা তাঁহাকে যখন দাহ করিতে লইয়া যাই, তখন ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হয়। আমরা শব ফেলিয়া বাসায় ফিরিয়া আসি।' কলিকাতা হইতেও আবার টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, তাঁহাকে অনেকে দেখিয়াছে। অম্বিকা বাবুর বড় ভাই এখন জামাতাকে কলিকাতায় অনুসন্ধান করিতেছেন।—গরীব।

—মগ-দস্যুপতি টেক্‌নাগ্‌ লুর প্রাণদণ্ডের পর তত্রত্য শানজাতিরা তাহার দেহ ও ছিন্ন মস্তক লইয়া একপ্রকার মলমে পরিণত করিয়া, বাজারে অতি উচ্চ দরে বিক্রয় করিতেছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, সেই মলমে যে স্বীয় অঙ্গ চিত্র-বিচিত্র করিবে, সেই টেক্‌নাগ্‌ লুর ন্যায় সাহসী ও বীর্য্যবান্ হইবে।

—আমেরিকার ডানবারীতে একটী ছোট কুকুর আছে। কুকুরটী রেলওয়ে ট্রেণের সহিত দৌড়াইয়া ট্রেণকে পশ্চাতে রাখে। 'নিউ-ইয়র্ক-সন্' পত্র এই কুকুরের সম্বন্ধে বলেন যে, উহার প্রভুর বাটী ষ্টেষণ হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে, ঠিক্ রেলের ধারে অবস্থিত। যখন ট্রেণ যায়, কুকুরটীও সেই সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, এঞ্জিনের অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে থাকে। গাড়ি ষ্টেষণে যাইয়া থামিলে কুকুরটীও তথায় যাইয়া থামে; ও দুই তিন বার এঞ্জিন-চালকের দিকে চাহিয়া চীৎকার করতঃ জয়-ঘোষণা করিয়া চলিয়া আইসে। এঞ্জিন-চালক কুকুরটীকে পরাভব করিবার জন্য এঞ্জিনের গতি বৃদ্ধি করিয়াও দেখিয়াছেন; কিন্তু কুকুরটীকে কোন মতে এঞ্জিনের পশ্চাৎ করিতে পারেন নাই। কুকুরটী বরাবর এঞ্জিনের ঠিক অগ্রে অগ্রে দৌড়াইয়াছে।

—'ডাক্তার' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাম ধরিয়া জনৈক বাঙ্গালী যুবক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবঞ্চনা করিয়া টাকা আদায় করিতেছিল। সে বলিয়া বেড়াইত যে, সে কলিকাতা এলবার্ট এসোসিয়াসনের সেক্রেটারী; উক্ত সভা বিলাতে ভারতবাসীর দুঃখকাহিনী আন্দোলন করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক। এ কার্য্যে টাকা চাই, সুতরাং উক্ত সভা তাহাকে চাঁদা-সংগ্রহার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। যাইহোক কিন্তু সুরেন্দ্র এক্ষণে খান্দা নামক স্থানে পুলীষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

—কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এবার একজন মাংস-পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহাকে অন্যান্য মাংস অপেক্ষা গোমাংসের উপরই অধিক লক্ষ্য রাখিতে হইবে; কারন সাহেবদিগের চীৎকারেই তাঁহার এই নূতন চাকুরী জুটিয়াছে কি না!

—অষ্ট্রিয়ায় এক প্রকার উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যদ্দ্বারা পূর্ব্বেই শীতাতপের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই উদ্ভিদের অবস্থা সবিশেষ যত্নসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বার ঘণ্টা পূর্ব্বে ঝড় বৃষ্টি হইবে কিনা বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

—একটা মূর্খের হিসাব সংবাদপত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে ব্যক্তি হিসাব দিয়াছেন, তিনি মূর্খ নন; ইউরোপে কত পরিমাণে মূর্খ আছে, তাহারই হিসাব। রুষে শতকরা ৮০ জন, স্পেনে ৬৩ জন, ইতালিতে ৪৮ জন, হঙ্গেরিতে ৪৩ জন, অষ্ট্রিয়ায় ৩৯ জন," আয়র্লণ্ডে ২১ জন, ফ্রান্সে ১৫ জন, বেলজিয়মে ১৫ জন, ইংলণ্ডে ১৩ জন, হলন্দে ১০ জন, স্কটলণ্ডে ৭ জন ইত্যাদি। মূর্খ অর্থে এখানে বর্নজ্ঞানশূন্য অশিক্ষিত লোক; অর্থাৎ যাহাদের পেটে কীল মারিলেও বর্নমালার আদ্য অক্ষর "ক"-যুক্ত কোঁক শব্দটীও উচ্চারিত হয় না।

—বিলাতে এক যুবতী পেয়াদাগিরি করিয়া খুব নাম বাহির করিয়াছেন। তিনি নাকি সুন্দরী বলিয়া ওয়ারেণ্ট, শমন প্রভৃতি জারি করিতে তাঁহার কোন কষ্টই হয় না; কেহই তাঁহাকে বাটী প্রবেশ করিতে বাধা দেয় না। যুবতীকে বাটীতে দেখিতে পাইবে বলিয়া লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ধার-কর্জ্জ করে না ত?

অনুসন্ধান।

—:০(০)০:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ২৯এ মাঘ, ১২৯৫ সাল। [১৩শ সংখ্যা।

সাধক-সঙ্গীত।

মূলতান—আড়া।

"মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়॥
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল-সম,
আমি পাপী তৃণ-সম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়॥
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়॥"

পাপীর আত্ম-কথা।

(সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কালী বাবুর পরামর্শ।

"আমাদিগের জুয়াচুরির উপায় তখন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। জুয়াচুরি-উপলব্ধ কপর্দ্দক-মাত্রও আর রহিল না। পুনরায় আবার সংসারের কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি নির্জ্জনে বসিয়া আপন অদৃষ্ট-ফল ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ কালী বাবু বাহির হইতে আসিলেন; আসিয়াই আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার হস্তে এক গোছা নোট দিয়া বলিলেন,—'ইহা রাখ, যখন আমি চাহিব, তখনই দিতে হইবে। এখন, একটু সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে আর আমাদিগের কষ্ট থাকিবে না। কিন্তু বিশেষ সাবধান হইয়া কর্ম্ম করিতে না পারিলে একেবারে সর্ব্বনাশ হইবে।'

"আমি নোটগুলি খুলিয়া দেখিলাম, দশখানা এক এক শত টাকার নোট। তখন কালী বাবুকে বলিলাম,—এই হাজার টাকা হঠাৎ কোথায় পাইলেন! আর কোনরূপ নূতন উপায় বাহির করিয়াছেন কি?

"কালী বাবু আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিলেন,—'নূতন উপায়, তাহার আর কোন ভুল নাই। আর কেবলমাত্র যে হাজার টাকা আনিয়াছি, তাহাও নহে। ইহা কেবল বায়না মাত্র। আরও ৪৫ হাজার

টাকা অনায়াসেই আনিতে পারিব। এবার আমার সহিত আর কোন অংশীদার নাই; যাহা পাইব, তাহা আমাদিগেরই থাকিবে। কিন্তু অন্য আর এক জনের সাহায্য ব্যতিরেকে আমি একাকী যে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। তুমি একটু বিশেষ সাহায্য করিলেই হইতে পারিবে।

"তাহাতে আমি বলিলাম,—আমি সাহায্য করিলে যদি হইতে পারে, তাহাহইলে আর ভাবনা কি? আমি আমার সামর্থ্য-মত সকল কর্ম্মই করিতে প্রস্তুত আছি।

"তখন কালী বাবু বলিলেন,—'প্রায় ১৫ দিবস হইল, পশ্চিম দেশীয় এক জন বড় জমিদার এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে একটী বিবাহ উপস্থিত। সেই উপলক্ষে কিছু ভাল কাপড় এবং কতকগুলি জহরত খরিদ করাই তাঁহার এখানে আসার উদ্দেশ্য। তিনি নিজে বাজারে বাজারে ঘুরিয়া নিতান্ত জ্বালাতন হইয়াছেন; এক গুণ দ্রব্যের চতুর্গুণ মূল্য শুনিয়া তিনি কিছুই খরিদ করিতে পারেন নাই। এই সংবাদ পাইয়া আমি তাঁহার নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করিলাম; এবং আমি নিজে একজন বড় দোকানদার বলিয়া পরিচয় দিলাম; ও তাঁহার কি কি প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন জানিয়া বাজারে আসিলাম। বাজার হইতে এক থান অতি উৎকৃষ্ট কিংখাপ খরিদ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম। কিংখাপ দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল; তিনি উহার দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে আমি বলিলাম,—মহারাজ! ইহার দাম আমি পশ্চাৎ বলিব। প্রথমে আপনি ইহার দাম কি পছন্দ করেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তবে আপনি ইহা মনে করিবেন না যে, যদি আপনি ইহার দাম আমার ন্যায্য দাম অপেক্ষা অধিক পছন্দ করেন, তাহা আমি লইব। আমি ইহার দাম এই কাগজে লিখিয়া এই স্থানে রাখিয়া দিলাম; আমি উহাই লইব। কিন্তু মহাশয়ের নিজের কি পছন্দ হয়, তাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পূর্ব্বে বলিলে বাধিত হইব। এই বলিয়া যে দামে আমার উহা খরিদ ছিল, তাহার অর্দ্ধেক দাম এক খানি কাগজে লিখিয়া সেই স্থানে রাখিয়া দিলাম। জমিদার মহাশয় ঐ কাপড় উত্তমরূপ দেখিয়া-শুনিয়া মাপিয়া-জুপিয়া আমার খরিদ দাম অপেক্ষা প্রায় এক চতুর্থাংশ কম করিয়া বলিলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলাম,—'আমি প্রকৃতই আজ একজন খরিদদার পাইয়াছি। যে ব্যক্তি দ্রব্যের উপযুক্ত দাম না জানেন, তাঁহার সহিত কেনা-বেচা করা যে কত দূর কষ্টকর তাহা যিনি করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আপনি যে দাম বলিয়াছেন, তাহা এই দ্রব্যের প্রকৃত দর। কিন্তু আমার এই দ্রব্য কোন কারণ বশতঃ কিছু কম মূল্যে খরিদ ছিল বলিয়াই আমি আপনাকে আরও কম দরে দিতে পারিতেছি। এই বলিয়া সেই কাগজখানি তাঁহার হস্তে দিলাম। তাহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐ দ্রব্যের দাম আমার লিখিত-মত দিলেন। আরও আমাকে গাড়িভাড়া বলিয়া ২৲ টাকা প্রদান করিয়া অন্য আর একটী দ্রব্যের ফরমাইস করিলেন। পর দিবসও আমি সেই দ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া গেলাম ও সেইরূপ কম মূল্যে তাঁহার নিকট বিক্রয় করিলাম। তাহাতে তিনি আরও সন্তুষ্ট হইয়া প্রায় ৬।৭ হাজার টাকা মূল্যের জহরত আনিতে বলিয়াছেন। আর, এই যে হাজার টাকা দিতেছি, ইহা তাঁহার দেওয়ানের জামিন-মত আমাকে দিয়াছেন। দেওয়ান আমাকে পূর্ব্ব হইতে জানেন; আমার ঠিকানা আদিও তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। অধিক কি, তাঁহার দ্বারাই আমি এই উপার্জ্জনের পথ

পাইয়াছি। এখন যদি আমি এই হাজার টাকা লইয়া আর সে দিকে না যাই, তাহাহইলে দেওয়ান তো মারা পড়িবেনই, তদ্ভিন্ন আমারও সর্ব্বনাশ হইতে বাকি থাকিবে না। কিন্তু আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের লাভও যথেষ্ট হইবে এবং দেওয়ান প্রভৃতি কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না।'

"এই বলিয়া কালী বাবু আমার কানে কানে তাঁহার পরামর্শের সমস্ত কথা বলিলেন। আমি প্রথমে শুনিয়াই একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু কি করিব, ক্রমে তাঁহার সেই প্রস্তাবেই মত দিলাম; তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাণী জী।

"পরদিবস প্রাতে কালী বাবু বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। সমস্ত দিবস আর ফিরিলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৯ টা বাজিয়া গেল। তখন কালী বাবু ফিরিয়া আসিলেন; এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'আমি যাহার নিমিত্ত অদ্য প্রাতে গমন করিয়াছিলাম, তাহার সমস্তই ঠিক করিয়া আসিয়াছি। এই দেখ, তাহার চাবি।' এই বলিয়া পকেট হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। আমি বলিলাম,—চাবি তো দেখিলাম; কিন্তু কিরূপ স্থান হইয়াছে, চলুন, একবার যাইয়া দেখিয়া আসি। কালী বাবু আমাকে সে দিবস লইয়া গেলেন না; বলিলেন,—'কল্য প্রাতে একেবারে সুসজ্জিত হইয়া যাইও। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে; বিশেষ, সেই স্থানও নিকটে নহে—অনেক দূরে।' আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম, এবং ভাল অলঙ্কার ও কাপড়ের যোগাড় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"পরদিবস প্রাতে উঠিয়া শীঘ্র শীঘ্র স্নান-আহার সমাধা করিলাম। অন্য স্থান হইতে অলঙ্কার-বস্ত্র প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য চাহিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা দ্বারা উত্তমরূপ সুসজ্জিত হইলাম। তখন, কালী বাবু এক খানা গাড়ি ডাকিয়া আনিলেন; আমরা উভয়েই তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিলাম। নানা রাস্তা ও গলির ভিতর দিয়া অনেক দূর যাইয়া ছোট গলির ভিতর একটী বড় নূতন বাটীর দরজায় ঐ গাড়ি থামিল। আমরা গাড়ি হইতে নামিলাম। কালী বাবু গাড়ির ভাড়া মিটাইয়া দিলেন; গাড়ি চলিয়া গেল। কালী বাবুর নিকট যে চাবি ছিল, তাহা দ্বারা তিনি ঐ বাটীর দরজা খুলিলেন। আমরা উভয়েই ঐ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

"আমি সেই স্থানে একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন করিলাম। দেখিতে দেখিতে একখানি প্রকাণ্ড জুড়ি আসিয়া দরজায় থামিল। কালী বাবু সহিসকে ঐ গাড়ির পরদা সকল উঠাইয়া দিতে বলিলেন। সহিস তাহাই করিল। উহার ভিতরের কোন ব্যক্তিকে বাহিরের লোক যে কোনরূপে দেখিতে পাইবে, তাহার আর যো রহিল না। তখন আমি গিয়া তাহার ভিতর উপবেশন করিলাম। কালী বাবু দরজায় চাবি বন্ধ করিতে না করিতে, আর এক খানা কম্পাস গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। কালী বাবু তাহাতেই উঠিলেন। উভয় গাড়ি বড়বাজার অভিমুখে গমন করিল।

"ক্রমে গাড়ি গিয়া বড়বাজারের ভিতর এক স্থানে থামিল। আমি গাড়ির ভিতরেই বসিয়া রহিলাম। কালী বাবু তাঁহার গাড়ি হইতে নামিয়া, একটী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ও দেখিতে দেখিতে আর এক জন লোকের সহিত ফিরিয়া আসিয়া আমার গাড়ির নিকটই

দাঁড়াইলেন। আমার গাড়ির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গের ব্যক্তিকে বলিলেন,—'এই গাড়িতে রাণীজী আছেন; আপনি জহরতের বাক্সগুলি এক এক করিয়া তাঁহার হাতে দেন। তাঁহার যাহা যাহা পছন্দ হইবে, তাহার দাম-দস্তর পরে ঠিক করা যাইবে।' ঐ দোকানদার তাহাতেই সম্মত হইল, এবং এক-একটী করিয়া নানা প্রকার জহরতের বাক্স আমার হাতে দিতে লাগিল। আমার যাহা যাহা পছন্দ হইল; আমি সেই সকল দ্রব্য কালী বাবুর হস্তে প্রদান করিতে লাগিলাম। এইরূপে কতকগুলি দ্রব্য লওয়া হইলে, আমি কালী বাবুকে বলিলাম,—আমি এখন বাসায় যাইতেছি, আপনি এই সকল দ্রব্যের উপযুক্ত দর স্থির করিয়া আমার বাসায় উহা লইয়া আসুন, এবং ইহাদিগের এক জনকেও সঙ্গে করিয়া আনুন; সেই স্থানে আমি সমস্ত দাম একেবারে মিটাইয়া দিব। এই সামান্য দ্রব্য সকল দেনায় লওয়ার কোন প্রয়োজন দেখি না। এই বলিয়া আমি সেই নূতন বাটীতে চলিয়া আসিলাম এবং কালী বাবু সেই স্থানেই রহিলেন। পরে আমি আমার গাড়ি বিদায় করিয়া দিয়া উপরে উঠিলাম ও কালী বাবুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

"প্রায় দুই ঘণ্টা পরে কালী বাবু অন্য আর এক ব্যক্তির সহিত সেই কম্পাস গাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ি বিদায় করিয়া দিয়া আমাকে বলিলেন,—'সমস্ত জহরতের দাম প্রায় সাত হাজার টাকা হইয়াছে। এই লোক ঐ জহরতগুলিও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু ইহার মনিব ইহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, অগ্রে টাকা না পাইলে উহা কাহারও হস্তে দিও না। কারণ, কলিকাতা জুয়াচোরে পূর্ণ।'

"আমি এই কথা শুনিয়া জহরত সহিত তাহাকে উপরে আসিতে বলিলাম। সে উপরে আসিল। কালী বাবুও ভিতর দিক হইতে সদর দরজার তালা বন্ধ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। আমি উভয়কেই সেই স্থানে আমার নিকট বসিতে বলিলাম। তাঁহারা উপবেশন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ানক হত্যা।

"আমি তাহাকে আমার নিকটে বসাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে সে কহিল,—'আমার নাম রামজিলাল।' আমি তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম,—রামজিলাল, দেখি, আমি যে সকল জহরত পছন্দ করিয়া দিয়াছিলাম ইহা তাহাই, কি অন্য আর কিছু আনিয়াছ! তাহাতে রামজিলাল উত্তর করিল,—'রাণীজী আপনি যে সকল জহরত পছন্দ করিয়া দিয়াছেন, ইহা তাহাই। কিন্তু আমার মনিবের এরূপ আদেশ আছে যে, দাম অগ্রে না পাইলে ইহা কাহাকেও দিতে পারিব না। এজন্য আমি পূর্ব্বে এই সকল দ্রব্য আপনাকে দিতে পারিতেছি না বলিয়া, আমার অপরাধ লইবেন না; ক্ষমা করিবেন। আমি সামান্য চাকরমাত্র; কিরূপে মনিবের আদেশ অমান্য করিব?'

"কালী বাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এই সকল কথা শুনিয়া আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেন না; রাগভাব প্রকাশ করিয়া রামজিলালকে কহিলেন,—'তুমি জান না কাহার সহিত কিরূপ ভাবে কথা বলিতেছ! ইনি একটু রাগ করিলে তোমার মস্তক লইয়া এই বাটীর বাহিরে যাওয়া কঠিন হইবে?'

'এই কথা শুনিয়া রামজিলাল একটু ভীত হইল। কিন্তু মুখে সাহস দেখাইয়া বলিল,—'কেন আমি কি অন্যায় কথা বলিয়াছি! আমি কি চোর, যে আমার এই বাটী হইতে বাহির হইয়া যাওয়া ভার হইবে? একি অরাজকের

মুলুক যে, যাহার যাহা ইচ্ছা হইবে, তিনি তাহাই করিবেন? সাত হাজার টাকার জহরত বিক্রয় না হইলে আমার মনিব গরিব হইয়া যাইবেন না। আমি জহরত বিক্রয় করিব না; চলিলাম।' এই বলিয়া রামজিলাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তখন কালী বাবু বিশেষ রাগভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—'কি ছোট মুখে এত বড় কথা!' এই বলিয়া সজোরে তাহার বক্ষঃস্থলে জুতা সহিত এক লাথি মারিলেন; হতভাগ্য রামজিলাল চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া সেই স্থানেই পড়িয়া গেল। কালী বাবু তাড়াতাড়ি তাহার বুকের উপর উঠিয়া জোর করিয়া তাহাকে ধরিলেন।

"আমি তখন কি করিলাম? মহাশয় যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই, আমি তাহাই করিলাম। স্ত্রীলোক দ্বারা যে কার্য্য কখনও হইতে পারে বলিয়া মনেও স্থান দেন নাই, আমি তাহাই করিলাম। দস্যু বা ডাকাতে যে কার্য্য করিতেও ঘৃণা বোধ করে, আমি তাহাই করিলাম। রাক্ষস বা পিশাচ যে কার্য্য শুনিলেও কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে, আমি তাহাই করিলাম। উঃ! যে কথা বলিতে এখন আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে, যে কথা বলিতে এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি তাহাই করিলাম। যে মহাপাপের কথা শুনিলেও মহাপাপ জন্মে, আমি তাহা করিতেও পরাঙ্মুখ হইলাম না। বিনা দোষে সেই নিরীহ, নিষ্পাপী, নিঃসহায় ব্যক্তির গলার উপর পা দিয়া দাঁড়াইলাম। যে পর্য্যন্ত তাহার প্রাণবায়ু একেবারে শেষ হইয়া না গেল, সে পর্য্যন্ত পা আর উঠাইলাম না। সামান্য টাকার লোভে কালী বাবুর পরামর্শমত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমাধা করিলাম।'

'যখন এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সমাধা হইয়া গেল, তখন রামজিলালের মৃত দেহের উপর আমি একবার দৃষ্টি করিলাম। তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। চক্ষু দিয়া বিন্দুপাত হইল। টাকার উপর ঘৃণা জন্মিল। পরকালের ভাবনা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে ভাব দূরে পলায়ন করিল। কালী বাবু ঐ মৃত ব্যক্তির নিকট হইতে সমস্ত জহরতগুলি লইলেন। তখন আমরা উভয়ে মিলিয়া উহাকে ধরিয়া নীচে আনিলাম। নীচের একটী ঘরের ভিতর ঐ মৃত দেহ লইয়া গেলাম। সেই স্থানের একখানি প্রস্তর উঠাইয়া তাহার ভিতর একটী গর্ত্ত খনন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই রাখা ছিল। রামজিলালকে ঐ গর্ত্তের ভিতর পুতিয়া ফেলিলাম; তাহার উপর ঐ প্রস্তর পূর্ব্বের মত বসাইয়া দিলাম। চুন সুরকি প্রভৃতি কিছুই সংগ্রহ করিতে হইল না; সেই বাটীর ভিতর একটী ঘরে সমস্তই মজুত ছিল। তাহার দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলাম। ঐ ঘরটী উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম, যাহাতে কেহ কিছু বুঝিতে না পারে। তখন ঘর সাজাইবার যে সকল দ্রব্য যেস্থান হইতে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল, সেই সমস্ত দ্রব্য ভাড়া-সমেত সেই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কালী বাবু বাটীর সদর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যাহার বাটী তাহার নিকট ভাড়া ও চাবি দিতে গমন করিলেন। আমিও একখানি ঠিকাগাড়ি লইয়া আপন বাটীতে গমন করিলাম।

"সেই দিবস বেলা ৫টার সময় কালী বাবু আরও পাঁচ খানি পাঁচ হাজার টাকার নোট আনিয়া আমাকে দিলেন; এবং বলিলেন যে, সেই সকল জহরত ছয় হাজার টাকা মূল্যে সেই ধনী ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়া ঐ সকল টাকা পাইয়াছেন।

"সেই দিন রাত্রিতে আমি ও কালী বাবু একস্থানে শয়ন করিয়াছিলাম; কিন্তু কাহারও

নিদ্রা আসিল না; নানা প্রকার চিন্তা এবং পরামর্শে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

"পরদিবস ১০ টার সময় কালী বাবু ঐ ছয় হাজার টাকার নোট লইয়া বাহির হইয়া গেলেন; এবং সন্ধ্যার সময় নগত টাকা এবং কতকগুলি অল্প দামের নোট সহিত ফিরিয়া আসিলেন। তখন, সমস্তগুলি একত্র করিয়া গণিয়া দেখিলাম, ঐ ছয় হাজার টাকাই হইল। তখন ঐ নোট ও টাকা একটী পিতলের কলসির ভিতর বন্ধ করিয়া আমার বাটীর ভিতর একস্থানে পুতিয়া রাখিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, যদি কোন প্রকার গোলযোগ না হয়, তবে ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া খরচপত্র করিতে থাকিব, ও পুনরায় কতকগুলি অলঙ্কারও খরিদ করিব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ওয়ারেণ্ট।

"দুই তিন দিবস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু কোন প্রকার গোলযোগ শুনিতে পাইলাম না। চতুর্থ দিবসে একজন পুলিস-কর্ম্মচারীর সহিত একটী বাবু আসিয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। কালী বাবু সম্মুখেই বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই বাবুটী চিনিলেন। বলিলেন,—'এই বাবুর সহিতই রামজিলাল জহরত লইয়া আসিয়াছিলেন।' আমি যদিও বাবুটীকে চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া বোধ হইল তিনিই যেন আমাকে গাড়ির ভিতর জহরত দেখাইয়াছিলেন।

"পুলিশ-কর্ম্মচারী কালী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'অদ্য ৪ দিবস হইল, বড়বাজার হইতে রামজিলাল কতকগুলি জহরত লইয়া আপনার সহিত আসিয়াছিলেন কি?,

"এই কথা শুনিয়া আমার অতিশয় ভয় হইল, সমস্ত শরীর যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি সেই স্থান হইতে একটু অন্তরালে গমন করিলাম। কালী বাবুরও মুখ শুখাইয়া গেল। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করি[illegible] বলিলেন,—'হাঁ মহাশয়, একটী লোক বড়বাজ[illegible] হইতে আমার সহিত জহরত লইয়া আসি[illegible]ছিল সত্য। কিন্তু তাহার নাম কি, তাহা আ[illegible] জানি না। তিনি সেই সকল জহরত আমা[illegible] দিয়া তাহার মূল্য সাত হাজার টাকা লই[illegible] সেই দিবসই গমন করিয়াছেন। কেন মহাশ[illegible] কি হইয়াছে, তিনি কি দোকানে যান নাই?'

"কর্ম্মচারী।—'তিনি গেলে তাঁহার নিমি[illegible] গত তিন দিবস হইতে এত কষ্ট করিয়া [illegible] আর তাঁহার অনুসন্ধান করিতাম! আপ[illegible] বলিতেছেন যে তাঁহাকে সাত হাজার টা[illegible] দিয়াছেন। আচ্ছা, নোট, নগত বা [illegible] প্রকারে ঐ টাকা দিয়াছেন, তাহা বলি[illegible] পারেন কি?'

"কালী বাবু।—হাঁ মহাশয়, তাহা বলি[illegible] পারি। দশ টাকা হিসাবের নোট এক হাজ[illegible] টাকার, একশত টাকা হিসাবের নোট দশ খানা[illegible] হাজার টাকা, এবং হাজার টাকা হিসাবের নো[illegible] পাঁচ খানার পাঁচ হাজার টাকা; একুনে এ[illegible] সাত হাজার টাকা দিয়াছি। দশ টাকার নোটে[illegible] নম্বর আমি রাখি নাই। এক শত ও হাজা[illegible] টাকার নোটের নম্বর আমি রাখিয়াছি; তাহ[illegible] এই।' এই বলিয়া তাঁহার বাক্স হইতে এ[illegible] খানি কাগজ বাহির করিলেন; ও তাহা হইতে[illegible] ১৫ খানা নোটের নম্বর বলিয়া দিলেন। [illegible] তাঁহারা উভয়েও তাহা লিখিয়া লইলেন।

"তখন কালী বাবু ঐ বাবুটীকে সম্বো[illegible] করিয়া বলিলেন,—'মহাশয়, আপনার দোকানে[illegible] এরূপ অবিশ্বাসী লোক রাখা কোন ক্রমে[illegible] উচিত নহে! এখন দেখুন দেখি, এই সা[illegible] হাজার মাত্র টাকার লোভ তিনি সম্বর[illegible] করিতে পারিলেন না! ইহা কি কম দুঃখে[illegible] বিষয়!'

এই কথা শুনিয়া পুলিশ-কর্ম্মচারী ও সেই বাবুটী আস্তে আস্তে কি পরামর্শ করিয়া উভয়ে[illegible]

[illegible]র বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার [illegible] কর্ম্মচারী কালী বাবুকে বলিয়া গেলেন,—[illegible] এই মকর্দ্দমায় আপনাদের কোন প্রয়ো-[illegible]হয়; তবে সংবাদ পাঠাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক [illegible]বেন।' কালী বাবু সম্মত হইলেন। তাঁহারা [illegible]য়া গেলেন।

[illegible] তিন দিবস আর কোন কথা শুনিতে [illegible]লাম না। নবম দিবসের দিন এক জন [illegible]ষ্টেবল্ আসিয়া কালী বাবুকে সঙ্গে করিয়া [illegible]য়া গেল। আমিও তাঁহাদের সহিত [illegible] করিলাম। প্রথমে থানায় পরে পুলিশে [illegible]য়া উপস্থিত হইলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের [illegible]ট মকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। আসামী [illegible]তে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। [illegible]লী বাবুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। তিনি [illegible]জিলালকে যে টাকা দিয়াছেন, তাহা [illegible]লেন; যে নোট দিয়াছেন, তাহারও নম্বর [illegible]য়া দিলেন। পরে দেখিলাম, করেন্সি-আফি-[illegible]র একটী বাবুরও সাক্ষ্য লওয়া হইল। তিনি [illegible]পোনের খানি নোটের পরিবর্ত্তে কতক নগদ [illegible] এবং কতক ছোট নোট রামজিলাল [illegible]মীয় এক ব্যক্তিকে দিয়াছেন, বলিলেন; ও [illegible] খাতায় উহা লেখা ছিল, তাহাও হাকিমকে [illegible]ইলেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন আর কোন সাক্ষ্য [illegible]য়া অনাবশ্যক বিবেচনা করিলেন। রামজি[illegible]লাল যে সাত হাজার টাকা লইয়া পলায়ন [illegible]রিয়াছে এবং তাহার ভিতরের ছয় হাজার [illegible]র নম্বরি নোট করেন্সি-আফিসে যে [illegible]লাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতেও আর [illegible]কোনপ্রকার সন্দেহ না করিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]হেব অতঃপর রামজিলালের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-[illegible]তকতা অপরাধে গ্রেপ্তারি-ওয়ারেণ্ট বাহির [illegible]য়ার হুকুম দিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সহিসগিরি।

"ওয়ারেণ্ট একজন ডিটেকটিভ-কর্ম্মচারীর জিম্মা হইল। তিনি রামজিলালের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। প্রথমেই তিনি ফরিয়াদী অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন, কালী বাবু এই মোকদ্দমার ফরিয়াদী। তিনি কালী বাবুকে জানিতেন। কালী বাবুর যে সাত হাজার টাকার জহরত খরিদ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি আমাদিগের বাটীতে আসিয়া কালী বাবুকে দুই একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রামজিলালের অনুসন্ধান করিবার ভান করিয়া বহির্গত হইলেন।

"যে সময় কালী বাবুর সহিত ডিটেকটিভ্ কর্ম্মচারীর কথা হইতেছিল, সেই সময় যদি কেহ বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিতেন তাহা-হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, কর্ম্মচারী কালী বাবুর ও আমার আপাদ-মস্তক বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ করিতেছিলেন। আমরা তখন সে সূক্ষ্ম দর্শনের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিয়াছিলাম না। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম ও জানিয়াছিলাম যে, সে দর্শনের অর্থ কি!

"পরে শুনিয়াছিলাম যে, কর্ম্মচারী আমার বাটী হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমেই বড়-বাজারে গমন করেন; এবং বড়বাজারের সেই দোকানদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রামজি-লালের চরিত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। দোকানদার তাহার চরিত্রের বিষয় যেরূপ ভাবে বর্ণন করেন, তাহাতে কর্ম্মচারীর মনে সন্দেহ আসিয়া আরও বদ্ধমূল হয়। যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিত, যাহার কর্ম্মের উপর মনিব কখনও একবার দৃষ্টিপাতও করিতেন না, সে যে কেবলমাত্র সাত হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিবে ইহা শুনিয়া তাঁহার যেন কেমন কেমন

বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি দোকানদারের নিকট হইতে রাণীজীর বিষয়, জুড়ি ও কম্পাশ গাড়ির বিষয়, এবং জহরত প্রভৃতির বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন। তখন তাঁহার মনে সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; গাড়ির সহিস ও কোচম্যানের কিরূপ ভাবের পোসাক ছিল তাহা অতি সতর্কতার সহিত জানিয়া লইলেন। পরে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমেই করেন্সি-আফিসে যাইয়া উপনীত হইলেন। করেন্সি-আফিসের বড় সাহেবের সহিত এক বার দেখা করিয়া সেই ১৫ খানি নোট একবার দেখিতে চাহিলেন। ক্রমে নোট আনিয়া কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদত্ত হইল। তখন তিনি উহা দেখিয়া যে কতদূর বিস্মিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। দেখিলেন ঐ নোটগুলির পৃষ্ঠে রামজিলালের নাম সহি আছে। সাক্ষর বাঙ্গালা ভাষায়; কিন্তু রামজিলাল বাঙ্গালা লিখিতে জানিত না। ইহাতে কর্ম্মচারির মনের সন্দেহ আরও প্রবল হইল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নোটগুলি ফিরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন। যে স্থান হইতে কালী বাবু গাড়ি আনিয়াছিলেন, তিনি সহিস-কোচম্যানের পোসাকের অবস্থা শুনিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাইহোক, করেন্সি-আফিস হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ তিনি আপন বাসায় আসিলেন। এবং বাসায় আসিয়া আপন পোসাক-আদি পরিবর্ত্তন করিয়া একটী সামান্য সহিসের বেশে সেই আড়গোড়ায় যাইয়া উপনীত হইলেন। পরে সহিস মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের দলে মিশিলেন; আপনাকেও এক জন সহিস বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন; এবং আজকাল চাকরী না থাকায় সহিসের কর্ম্মের উমেদারিতে যে সেই স্থানে আসিয়াছেন, ইহাই তাহাদিগকে বুঝাইলেন। প্রায় নয় দশ দিবস হইল, যখন এক খানা জুড়ি ও এক খানা কম্পাস গাড়ি একত্রে বড়বাজারে গিয়াছিল, অ[illegible] মধ্যে একজন সহিস তাঁহাকে কর্ম্ম [illegible] দিতে চাওয়ায় তিনি অদ্য সেখানে গিয়াছে[illegible] এই ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি প্রথমতঃ সে[illegible] সহিসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভি[illegible] প্রকাশ করিলেন। তাহাতে সহিসগণ [illegible] স্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে স্থির করি[illegible] যে, কোন্ কোন্ সহিস সেই দিবস বড়বাজা[illegible] গিয়াছিল। এইরূপে তিনি সহিসগণের না[illegible] অবগত হইয়া কম্পাস গাড়ির সহিসকে বাছি[illegible] বাহির করিলেন; এবং তাহাকে এইরূ[illegible] বুঝাইলেন যে,—'সে দিবস কম্পাস গাড়িতে [illegible] একটী বাবু বড়বাজারে তোমার গাড়ি[illegible] আসিয়াছিলেন, তিনি যাইবার কালীন আমাকে [illegible] একটী চাকরি দেওয়ার নিমিত্ত তাঁহা[illegible] বাটীতে যাইতে বলিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহা[illegible] ঠিকানা পর্য্যন্ত আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন[illegible] কিন্তু ভাই দুঃখের কথা আর কি বলিব, আম[illegible] সেই ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া আ[illegible] সেখানে যাইতে পারি নাই। এই কয় দিব[illegible] অন্যান্য স্থানে কত উমেদারি করিলাম; কি[illegible] আমার সময় এমন মন্দ যে, কোন স্থানেই [illegible] কিছু যোগাড় করিতে পারিলাম না। এখ[illegible] ভাই, তোমার নিকট অনেক কষ্টে আসিয়া [illegible] উপস্থিত হইয়াছি; হয়, আমাকে অন্য কোন [illegible] স্থানে একটি চাকরির যোগাড় করিয়া দেও[illegible] নতুবা সেই বাবুর বাটী, যাহা তোমার দেখা [illegible] আছে, একটু কষ্ট করিয়া আমাকে দেখাই[illegible] দিয়া আমার বিশেষ উপকার কর।' ছদ্মবেশী কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া সহিস প্রথমে [illegible] যাইতে অস্বীকার করিল। পরিশেষে অনে[illegible] খোসামদের পর স্বীকৃত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র আপ[illegible] কর্ম্ম সমাধা করিয়া লইবার মানসে তাঁহাকে [illegible] নানারূপ 'ফরমাইস আরম্ভ করিল। কখ[illegible] লাগাম আনিতে বলিল, কখনও খড় আনি[illegible] বলিল, এবং একটী ঘড়ার গা মলি[illegible]

[illegible]লেন। ছদ্মবেশী কর্ম্মচারী কি করেন, কোন [illegible]কে তাঁহার কার্য্য উদ্ধার করিতেই [illegible]লেন; সুতরাং তিনি সর্ব্বপ্রকারে সহিসকে [illegible]সাহায্য করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়াও সহিসকে খাওয়াইতে লাগিলেন। ক্রমে যখন সহিসের সমস্ত কর্ম্ম সমাধা [illegible]ল, তখন রাত্রি ১০টা। তখন সহিস তাঁহার [illegible]হিত আড়গোড়া হইতে বহির্গত হইয়া [illegible] বাবুর বাটীর উদ্দেশে চলিল। রাস্তায় [illegible] করিতে করিতে গল্পচ্ছলে ছদ্মবেশী কর্ম্মচারী [illegible] জানিতে পারিলেন যে, সেই বাবুর বাটী [illegible]তে একজন রাণী-জুড়ি গাড়িতে এবং বাবু [illegible]হার কম্পাস গাড়িতে বড়বাজারে গমন [illegible]করিয়াছিলেন। রাণী জী বড়বাজার হইতে [illegible]ই চলিয়া আসেন। বাবু আর এক জন পশ্চিমদেশীয় লোকের সহিত তাঁহার কম্পাস গাড়িতে বাটীতে ফিরিয়া আসেন, ও উভয়েই [illegible] বাটীর ভিতর প্রবেশ করেন।

"ক্রমে সহিস সেই বাড়ির দরজার গিয়া উপস্থিত হইল। ছদ্মবেশী কর্ম্মচারী দেখিলেন, [illegible] একটী প্রকাণ্ড ত্রিতল নূতন বাটী। কিন্তু [illegible] বাটীর দরজা আজ খোলা নাই, বাহির [illegible]তে সদর দরজার তালা বন্ধ; এবং বাটীর অবস্থা দৃষ্টেও বোধ হইল, ইহা একটী খালি বাড়ি।

"তখন কর্ম্মচারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু সহিসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'ভাই, [illegible] আমার জন্য বিশেষ পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার করিলে। কিন্তু আমার আজকাল এমনি [illegible] হইয়াছে যে, বাবুটীও এই বাটী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। যাহা [illegible], তুমি এখন গমন কর, তোমাকে আর অধিক কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু ভাই, যদি তোমাদের আড়গোড়ার ভিতরই আমার একটী সহিসী কর্ম্মের যোগাড় করিতে পার, [illegible]হার চেষ্টা দেখিও; আমি দুই এক দিবস অন্তর সেই স্থানে গিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া উভয়ে পৃথক পৃথক রাস্তা অবলম্বন করিলেন।"

রায়বনিয়ার গড়।

মেদিনীপুর জেলায় দাঁতনের পার্শ্বেই সুবর্ণরেখা নদী। এই নদী অতিক্রম করিলেই বালেশ্বর জেলা। সুবর্ণরেখা পার হইয়া, কিয়দ্দূর গমন করিলেই বৃত্তাকারে গড়ের পরিখা-চিহ্ন নয়নগোচর হয়। এই পরিখা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উহার মধ্যে এইক্ষণ ধান্যাদি শস্য জন্মে। রায়বনিয়ার গড় বালেশ্বর জেলার ফতেয়াবাদ পরগণার অন্তর্গত। উহার এক-পার্শ্বে ময়ূরভঞ্জের রাজার অধিকার, অপর পার্শ্বে মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম পরগণা। এই গড় বিরাট রাজার প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এ-প্রদেশে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। তবে এ দেশের জলেশ্বরের নিকট 'বিরাট-দীঘী' নামে একটী সুবিশাল সরোবর নয়নগোচর হইয়া থাকে। রায়বনিয়া গড়ের অবস্থা দেখিলে ২।৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে এই গড় ব্যবহৃত হইয়াছিল, সম্পূর্ণই বিশ্বাস হয়। ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে এ প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। সুবর্ণরেখা নদী-তীরে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত, মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। এই গড় সুবর্ণরেখার নিকটবর্ত্তী; সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় কালে এই গড় যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, এই স্থানের নিকটবর্ত্তী, মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম পরগণার অন্তর্গত দেউল গ্রাম নামক একটী স্থান আছে। উক্ত গ্রামের কতকটা স্থান প্রস্তরের দেউল (প্রাচীর) দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। উক্ত স্থানের মধ্যে দীর্ঘ-প্রস্থে প্রায় ১২শ হস্ত পরিমিত একখানি

সম-চতুষ্কোন প্রস্তর আছে। উক্ত প্রস্তরে 'দাবা খেলার ঘরের ন্যায় অঙ্কিত আছে। ঐ প্রস্তরের এক পার্শ্বে ৭টা প্রস্তরের ঘোটক-প্রতিমূর্ত্তি; তদুপরি ৪টী করিয়া, প্রস্তর-খোদিত মনুষ্য-মূর্ত্তি সংস্থাপিত। মস্তকের শীরপেচ (পাগড়ি) গুলি পর্য্যন্ত সুন্দর ভাবে খোদিত। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিলেই, মহারাষ্ট্রীয় প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং এই সকল স্থান যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত ছিল, সহজেই অনুমান হয়। এই প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তি গুলি নয়নগোচর করিলে, এদেশে যে প্রস্তর-শিল্পের বিশেষ উন্নতি ছিল, এবিষয় সহজেই বুঝা যায়।

এই বন-প্রদেশে স্থানে স্থানে গৃহোপযোগী ২।১ ফিট পরিমিত সম-চতুষ্কোণ প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এক স্থানে কয়েকটা প্রস্তরের ঢেঁকি পতিত আছে।

যাহাহউক, স্থানীয় অবস্থা দেখিলে এক সময়ে যে এখানে মহা পরাক্রান্ত লোকের বসতি ছিল, এ বিশ্বাস সহজেই জন্মে।

এইক্ষণ অপর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া এই গড়ের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করা যাইতেছে। গড়ের পরিমাণ প্রায় ৬ বর্গ মাইলের অধিক। গড়খাইএর মধ্যে এইক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক জল আছে। এই পরিখার পার্শ্বে প্রায় ১৬ হস্ত পরিমিত পরিশস্ত প্রস্তরের সুদৃঢ় প্রাচীর। এই প্রাচীর এত দৃঢ় যে কামানের গোলা দ্বারাও সহসা ভাঙ্গা যায় না। প্রথম পরিখার উপরিভাগে প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ-দ্বার। এই দ্বার পার হইয়া, গড়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেখা যায়, কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ কূপ। এই সকল কূপের মধ্যে অদ্যাপী জল আছে। কূপের নিম্নে অবতরণ জন্য কলিকাতার মনুমেন্টের সিঁড়ির ন্যায় প্রস্তরের গোল সিঁড়ি (সোপান) আছে। উক্ত সোপান দ্বারা কূপের নিম্নে অনায়াসে যাতায়াত করা যাইতে পারে।

এই বিভাগ নিবিড় শাল-জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু সাঁওতালগণ এই জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এখানে বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই স্থান অতিক্রম করিয়া 'রি পরিখা। এই পরিখার উপরিভাগে প্রস্ মৃন্ময় বাঁধ। এই বাঁধ এত উচ্চ যে, উ উপরিভাগে অধিরোহণ করিলে, ৪ ক্রো অন্তরের দাঁতনের গৃহাদিও সুস্পষ্ট লক্ষিত হ এই বিভাগে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বং বশেষ আছে। কয়েকটা পুরাতন অট্টালি ভগ্ন প্রস্তর রাশীকৃত আছে। বড় দাল ন্যায় একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির অর্দ্ধভ বস্থায় আছে। উক্ত মন্দিরের মধ্যে সুন্দর প্র রের একটী দেবী-মূর্ত্তি দেখা যায়। এ প্রদে লোকের মুখে শুনিলাম, ঐ দেবীর নাম 'জ কালী'। মহাদেবীর হস্তে প্রস্তর-খোদিত নৃ গলায় মুণ্ডমালা। পদতলে শিব-মূর্ত্তি; স মহাকালের করাল মূর্ত্তি। এ প্রদেশীয় লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, এই দে সন্নিকটে পূর্ব্বকালে অনেক নরবলী হই গিয়াছে। এই দেবী-মন্দিরের সন্নিকটে প্র মাইল দীর্ঘ একটা দীঘী; শুনিলাম, উ নাম 'রূপাদীঘী'। উক্ত জলাশয় জঙ্গল আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্গলে বৃহৎ অজাগর সর্প আছে।

এই সকল স্থান অত্যন্ত জঙ্গলাবৃত হই উঠিয়াছে। এই বনের মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্র হিংস্র শ্বাপদ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যা

ফলতঃ এই স্থানের অবস্থা ও গড়ের অ এবং প্রাচীন গৃহমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেখি একসময়ে যে এই সকল স্থানে এ সর্ব্বপ্রধান স্বাধীন শক্তির অধিপত্য ছি এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ জন্মে না।

'জয়কালীর' বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে বড়ই ক্লেশ উপস্থিত হয়। গভীর বনপ্র

মন্দিরে দেবী অবস্থান করিতেছেন। এক-দিন যে দেবীর মাহাত্ম্য-নিকটে শত সহস্র লোক অবনত ছিল, লক্ষ লক্ষ মেষ মহিষ ও ছাগ-রক্তে যাঁহার খর্পর রঞ্জিত হইত, যিনি হয়তো একটা স্বাধীন রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, এইক্ষণ সপ্তাহ অন্তর তাঁহার পূজা হয় না। ফলতঃ এই সকল দেবস্থান ও দেবমূর্ত্তির দুরবস্থা দেখিতে মনে বড়ই ক্লেশের উদ্রেক হয়।

ভাস্করাচার্য্য।

ভাস্করাচার্য্য ভারতে, শুধু ভারতে কেন, সমগ্র জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁর প্রণীত 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থ গণিত-শাস্ত্রের ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ১০৩৬ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যস্থিত বিজ্জলবীড় নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজ্জলবীড়, সহ্যপর্ব্বতের … দেশে অবস্থিত। ইহাঁর পিতা মহেশ্বর … শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। একথা পাশ্চত্য পণ্ডিতগণও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।*

ইনি বিদর্ভে বাস করিতেন। ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম-সময়ে ইনি উক্ত 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গণিত বিষয় লিখিত আছে।

তৎপ্রণীত পাটীগণিত 'লীলাবতী' নামে বিখ্যাত। অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধ আছে যে, ভাস্করাচার্য্য স্বীয় বালবিধবা কন্যা লীলাবতীকে শিক্ষা দিবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পশ্চিম ভারতে প্রসিদ্ধ আছে যে, ঐ গ্রন্থ তিনি স্বীয় পত্নী লীলাবতীর উদ্দেশে রচনা করেন। ফলকথা, গ্রন্থারম্ভে একস্থলে "অয়ে বালে লীলাবতী" ইত্যাদি যে সম্বোধন আছে, তাহা হইতেই এই কিম্বদন্তীর উৎপত্তি হইয়াছে।

৬৫ বৎসর বয়সে বিদর্ভ নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইনি গণিত-শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসীর অনেক দিন মনে থাকিবে। জগতে যেখানে যত পণ্ডিত জন্মিবেন, তাঁহারাও ভাস্করের গ্রন্থ দর্শন করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইবেন।

এইক্ষণে আমাদের দেশে লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থের চর্চ্চা নাই। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য অঙ্ক-শাস্ত্রের সাহায্যে যাহা লিখি, লীলাবতী প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যের গণিত-গ্রন্থ সেই সমস্তই অনায়াসে শিখাইতে সক্ষম।

বঙ্গে ঐ সকল গ্রন্থের চর্চ্চা নাই বটে, কিন্তু, দাক্ষিণাত্যে এবং পশ্চিম-ভারতে বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত গ্রন্থ অধ্যাপিত হইত।

ঐ সকল গ্রন্থ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু যে মহাত্মা ঐ সকল অপূর্ব্ব পদার্থ সূর্য্যালোকে অনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

---

* পণ্ডিতবর স্পটিসউড (Mr. Spottiswoode) বলেন,—"The Penetration shown by Bhaskara in analysis, is in the highest degree remarkable; that the formulæ which he establishes * * * and his method of establishing it, bear more than a mere resemblance—they bear a strong analogy to the corresponding process in modern mathematical astronomy; and that the majority of scientific persons will learn with surprise; the existance of such a method in the writings of so distant a period and so remote a region."

অধ্যাপক উইলসন (Prof Willson) বলেন,—"Bhaskara has no Indian rival of mediæval or modern times. It has been said by some that Bhaskara was fully acquainted with the principle of differential calculus, which was only discovered in Europe during the last century."

আর সহেনা যাতন!

(টৌরি, কাওয়ালি।)

আর সহেনা যাতন,
ধরণী হ'য়েছে পুরাতন!
হেরি উষা-রূপ-রাশি,
মনে পড়ে তা'র হাসি;
বিধু-কোলে সে বিধু-বদন!
হেরিলে কাননে ফুল,
মনে পড়ে সেই ভুল—
সে আকৃতি, সে প্রীতি-নয়ন!
কাঁপে বায়ু ফুল-বাসে,
মনে হয় সে-ই শ্বাসে!
বিহগ-কুজনে সে বচন!
নবীনতা-হারা ধরা,
স্মৃতি পুরাতনে ভরা।
দাও ভেঙে এ ধরা, এমন—
ওরে রে মরণ!

জীবের দায়িত্ব।

জীব কি এবং উহার দায়িত্বই বা কি, এই কথা লইয়া হিন্দুশাস্ত্রকার মহামহোপাধ্যায় মুণিগণের মধ্যে অনেক বিচার হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। আর, সেই সেই মতের অধিকাংশ মতই অদ্যাপি আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং তাহাও আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। এ-সম্বন্ধে অদৃষ্টবাদীগণ অদৃষ্টে, কালবাদীগণ কালে, ও কর্ম্মবাদীগণ কর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া যে যে কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। আমরা সেই কূট তর্কে প্রবেশ না করিয়া অদ্য পাঠক মহাশয়গণকে জীব-সম্বন্ধে ও দায়িত্ব-সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব।

জীব শব্দের অর্থ দুই হইতে পারে; ১ম, যাহাদের জীবন আছে; ২য়, বুদ্ধি, জ্ঞান [illegible] চৈতন্যবিশিষ্ট সৃষ্ট পদার্থ। হিন্দুশাস্ত্রে [illegible] পণ্ডিতগণ শেষোক্ত অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করেন; অর্থাৎ যাহাদের জীবাত্মা [illegible] তাহারাই জীব। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত[illegible] প্রায় প্রথম অর্থে জীব শব্দ ব্যবহার করি[illegible] থাকেন। জীবতত্ত্ব (Biology) বলি[illegible] পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে উদ্ভিদ্ ও প্রা[illegible] উভয় সম্প্রদায়ের তত্ত্বকেই বুঝায়। আ[illegible] প্রাণীতত্ত্বকে তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত করি[illegible] (১) প্রাণীদেহতত্ত্ব, (২) আধ্যাত্মিকতত্ত্ব নি[illegible] করিয়াছেন। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ প্রাণীদে[illegible] অন্তর্ভূত জীবাত্মার তত্ত্বকেই জীবতত্ত্ব বলে[illegible] আমরা সাধারণ কথায় চৈতন্যশীল বস্তুকে[illegible] জীব বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি; এবং [illegible] চৈতন্যাবস্থায় আমরা কোন জীবকে দায়ি[illegible] অদায়ী বলিয়া বুঝি। ইহাতে দেখা যাইতে[illegible] যে, চৈতন্য জীবের একটী ধর্ম্ম। আর [illegible] জীবের একটী ধর্ম্ম চৈতন্য হইল, তখন [illegible] দেহে চৈতন্য আছে, সেই দেহেই যে জীব[illegible] অবস্থিত আছে এমন কতক অংশে সি[illegible] করা যায়।

এখন দেখা যাউক, চৈতন্য কাহাকে ক[illegible] আমরা কহি, চৈতন্য অর্থে প্রধানতঃ তি[illegible] বস্তু বুঝায়। (১) সংজ্ঞা, (২) জ্ঞান, (৩) [illegible] দেহান্তর্গত কার্য্যোৎপন্নকারী শক্তি। [illegible] চৈতন্য শব্দের সহিত সমস্ত আধ্যাত্মিক [illegible] জড়িত। চৈতন্য কোন সময় জাগ্রত ও কো[illegible] সময় সুপ্তাবস্থায়ও থাকিতে পারে। অণ্ড ম[illegible] কিম্বা গর্ভস্থ শিশুর কি চৈতন্য নাই? অব[illegible] চৈতন্য আছে। কিন্তু তাহা সুপ্ত। চৈত[illegible] সকল আনুসঙ্গিক শক্তি তাহাতে বিকা[illegible] নাই থাকুক, তাহার এক ভাবও অন্তর্ভূত হই[illegible] অবশ্য কার্য্য করিতেছে। আমরা প্রাণ[illegible] চৈতন্যর এক বিশেষ ভাব বলিয়া ধরি; [illegible] প্রাণের কার্য্য জীবদেহে প্রথম হইতেই চলিতে দেখা যায়। কিন্তু চৈতন্যের অন্যান্য ভাবের কার্য্য জীবদেহের কোন বিশেষ অবস্থা না পাওয়া পর্য্যন্ত গুপ্ত বা সুপ্ত ভাবে থাকে। উদ্ভিজ্জে প্রাণের কার্য্য অর্থাৎ জন্ম, বৃদ্ধি, পরিপক্বতা, হ্রাস ও শেষে মৃত্যু চলিতেছে। কিন্তু চৈতন্যের অপর ভাব সমুদয়, অণ্ডস্থ অথবা গর্ভস্থ শিশুর দেহান্তর্গত ভাবের ন্যায় সমস্ত উদ্ভিজ্জ-জীবনে সুপ্ত অবস্থায়ই রহিয়া থাকে।

প্রাণী-রাজ্যে অতি নিম্ন-শ্রেণীস্থ প্রোটোজোয়া (Protozoa) কীটের মধ্যে প্রাণ ব্যতীত চৈতন্যের অপর কোন ভাবের অথবা অন্য কোন আধ্যাত্মিক শক্তির আদৌ বিকাশ নাই। অথচ তাহারা প্রাণী পদের বাচ্য, তাহাদের আকার ও গতিবিধি-ক্রিয়াদি উদ্ভিদ্ রাজ্যের নিম্ন-শ্রেণীস্থ প্রোটোফাইটা উদ্ভিদের ঠিক সদৃশ। উদ্ভিদে যেমন চৈতন্যর শুদ্ধ একভাব জাগ্রত এবং অপর ভাব সকল সুপ্ত, সেইরূপ ঐ প্রোটোজোয়া শ্রেণীভুক্ত কোন কোন কীটের প্রাণ ব্যতীত অপর সমস্ত ভাব সুপ্ত। প্রাণী-তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ স্নায়ু-শরীরের (Nervous system) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের অপর ভাবের ও আধ্যাত্মিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি কহিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যেরূপ প্রত্যক্ষ জীবদেহে স্নায়ু-শরীরের ক্রমোন্নতি দেখাইয়াছেন, সেইরূপ তৎসঙ্গে অধ্যাত্মিক ভাবের জাগরণও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা উদ্ভিদে স্নায়ু-শরীরের অভাব দেখিয়া, তাহাতে যে চৈতন্যের অপর ভাব জাগ্রত আছে অথবা হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করি না। কারণ, চৈতন্য থাকিতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু তাহার প্রাণ ব্যতীত অপর ভাব সমুদয় সুপ্ত। তাহাদের প্রাণের কার্য্য অহর্নিশ চলিতেছে; প্রাণ রক্ষার্থে আহার, নিদ্রা, অথবা বিশ্রাম সমস্তই প্রাণীদিগের ন্যায় আছে; কিন্তু জাগ্রত চৈতন্যশীল প্রাণীর প্রাণ-রক্ষার জন্য যেমন অন্যান্য অনেকগুলি অধ্যাত্মিক শক্তি, যথা ভয়, ক্রোধ, স্নেহ, দয়া ইত্যাদির অনেক সময় বিকাশ দেখা যায়, উদ্ভিদ্-দেহে সে বিকাশ কিছুই নাই! ভগবানের এমনই মহিমা যে, যেমন একদিকে বৃক্ষাদির প্রাণ রক্ষার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের উপায় দেন নাই, তেমনি অপর দিকে তাহাদের প্রাণ অতি কঠিন করিয়া তাঁহার জীবরাজ্যের সমভার বা সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। কোন কোন নিকৃষ্ট কীটকে, বিশেষতঃ যাহাদের চৈতন্যের অন্যান্য ভাব সুপ্ত আছে, কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করুন তথাপি বৃক্ষাদির ন্যায় তাহার শীঘ্র প্রাণ বিয়োগ হয় না। জীব-রাজ্যের মধ্যে মেরুদণ্ডহীন কৃমি হইতে ইন্দ্রকীট (কেন্নু), জলৌকা, শম্বুক প্রভৃতি শ্রেণীতে ধাপে ধাপে উঠিয়া, অনন্তর মেরুদণ্ডী প্রাণীরাজ্যের মধ্যে ক্রমে মৎস্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গম ও স্তন্যপায়ীতে প্রবেশ করুন; দেখিবেন, যেমন প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের গঠন-প্রণালী সূক্ষ্ম ও জটিল হইতেছে, চৈতন্য ও আধ্যাত্মিক শক্তি-সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবও ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। শেষে এই পৃথিবীতে দেহবিশিষ্ট সর্ব্বোচ্চ জীব মনুষ্যতে যাইয়া, চৈতন্যের অপর ভাবের ও আধ্যাত্মিক জগতের বিকাশ যতদূর মনুষ্য-দেহের নির্ম্মাণ-প্রণালীতে সম্ভবে, ততদূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের উপরি-উক্ত কথায় এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, দেহের নির্ম্মাণ যদি প্রত্যেক জীবে কোন না কোন সূক্ষ্ম অংশে প্রভেদ হয়, তবে তাহাতে চৈতন্যের ও আধ্যাত্মিক শক্তিগণেরও পরিপক্কতা-বিকাশের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যদিও আমরা তত সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরিতে পারি না, তথাপি শক্তির বিভিন্ন বিকাশেই আমরা সেই ভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া লইতে পারি।

দুইটী মনুষ্য, কি দুইটী জন্তু, কি দুইটী বৃক্ষ, এই পৃথিবীতে কখনও ঠিক এক দেখিতে পাইবেন না। তাহাদের কোন না কোন পার্থক্য আছেই আছে; যদিও স্থূল চক্ষে সেই পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি না। মনুষ্যের মধ্যে দেখুন, সকলের আধ্যাত্মিক শক্তিই কি সমান পরিস্ফুট? অথবা চেষ্টা করিলে সকল আধ্যাত্মিক শক্তিকে কি কেহ সমান পরিস্ফুট করিতে পারেন? আমাদের বোধ হয়, তাহা হইতে পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি একটী মনুষ্য-আকারধারী উন্মাদ (Idiot) যাবজ্জীবন খাইল, পড়িয়া থাকিয়া হাত-পা নাড়িল, লোককে দেখিয়া দন্ত বাহির করিয়া হাসিল, এবং আনন্দের বিকট রব বাহির করিল। আবার একজন চৈতন্য ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে ভাসিলেন; আবার একজন ভাস্করাচার্য্য গ্রহ-নক্ষত্র লইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন; আবার একজন ভীষ্ম রাজতন্ত্রের কূট প্রশ্ন লইয়া মস্তক ফাটাইয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। এই সকল লোকের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ কি এক ভাবের? না ইহাতেই কি বিশ্বাস করিবেন যে, চৈতন্যকে জ্যোতিষ শিখাইলে তিনি ভাস্করাচার্য্য হইতেন; অথবা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে রাজকার্য্য শিক্ষা দিলে শ্রীকৃষ্ণ অথবা ভীষ্মের ন্যায় রাজমন্ত্রবিশারদ করিতে পারা যাইত? ভাস্করাচার্য্যের আনন্দ চৈতন্য কিছুই আস্বাদন করিতে পারিলেন না, কিম্বা চৈতন্যের আমোদ ভাস্কর কিছুই বুঝিলেন না। আমরা কহি, দেহের সূক্ষ্ম গঠনের তারতম্যানুসারেই এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। কি উল্লিখিত উন্মাদের, কি অপর দুই বিধ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সমুদয় শক্তি সমান ভাবে বিকশিত নহে। কাহারও বা লুপ্ত, কাহারও বা অর্দ্ধ লুপ্ত।

কেহ কেহ আমাদের এই মতের সহিত অনৈক্য হইয়া কহিতে পারেন যে, শরীরের তারতম্যানুসারে চৈতন্য ও তদানুসঙ্গিক বুদ্ধির (Intelligence) বিকাশ না হইয়া, বরং চৈতন্য ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে শরীর-গঠনের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমাদের মূল কথার অর্থাৎ উদ্ভিদ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল জীবদেহে চৈতন্য কোন না কোন ভাবে বিদ্যমান আছে এই কথার, বিরুদ্ধে যাইতেছে না। লাটিন কথায় বলে যে,—"অ-সত্ত্বা হইতে না-ই হয়" (Ex nihilo nihil fit)। এ কথা ঈশ্বরের কার্য্য ব্যতীত সকল স্থলেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক-শক্তির অসীম বিকাশ-শক্তি থাকিলেও, মনুষ্য দেহে তাহা সীমা-বিশিষ্ট। সুতরাং এমন স্থলে যাঁহারা চৈতন্য ও বুদ্ধির ন্যূনাধিক্যতা অনুসারে জীবদেহের গঠন-প্রণালী সাব্যস্ত করেন, তাঁহাদের মতও যে অসম্ভব, তাহা বলিতে সাহস করি না।

উদ্ভিদ-দেহে আমরা চৈতন্যের একভাব অর্থাৎ প্রাণের প্রকাশ আছে কহিয়াছি; এবং অপর ভাব সুপ্ত। কেহ কেহ কোন কোন উদ্ভিদে অধ্যাত্মিক 'অনুভব'-শক্তি পর্য্যন্তও আছে বলিয়া অনুভব করেন; কিন্তু আমরা সে কথার স্বপক্ষ নহি। কারণ, যদিও লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ মাত্র সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায়, যদিও অন্যান্য লতাকে অবলম্বের আশ্রয় করিতে—'শনি' অথবা সোঁ (Tendril) বাড়াইতে দেখা যায় (যথা অলাবু লতা), কিম্বা যদিও উদ্ভিদকে সূর্য্য রশ্মির দিকে শাখা বৃদ্ধি করিতে দেখা যায়, যদিও কীটভোজী একবিধ উদ্ভিদ, পত্র গুড়াইয়া, প্রাণী-দেহকে আত্ম-দেহসাৎ করে, তথাপি এই সমস্ত কার্য্যকে কি অধ্যাত্মিক শক্তির (যথা ইচ্ছা, ক্ষুদ্‌বোধ) বিকাশের ফল বলিব? যদি তাহা বলি, তবে যে সমস্ত উদ্গামশীল অঙ্গ (Erectile organs) সুপ্তাবস্থায়ও স্পর্শ করিলে উদ্গামের কার্য্য দেখায় (যেমন স্তনের অগ্রভাগ), যে সমস্ত মাংশপেশী অথবা দেহের স্থল বিশেষের ঢাকনি, ইচ্ছা না থাকিলেও, স্বতঃ আকুঞ্চিত অথবা আবদ্ধ কিম্বা উন্মোচিত হয় (যথা ফুসফুস নলীর মুখের ডালি, চক্ষের পাতা ইত্যাদি), সে সমস্ত কার্য্যকেও কেন আধ্যাত্মিক শক্তির কার্য্য বলি না? বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ঐ সমস্ত কার্য্য শুদ্ধ প্রাণের আনুসঙ্গিক ঘটনামাত্র। উহাতে ইচ্ছা, বা অনুভবাদি শক্তি বিকাশের কোন সম্পর্ক নাই। বরং ঐ সমস্ত কার্য্য আমাদের মতে বাহ্য জগতের সহিত জীবদেহের সম্বন্ধ-বাচক চিহ্ন মাত্র। সূর্য্য-রশ্মির সহিত উদ্ভিদ-জীবনের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধে বৃক্ষ সেই দিকে শাখা প্রসারণ করে; বায়ু ব্যতীত অপর বস্তুর ফুসফুসের কার্য্যের সহিত যে সম্বন্ধ আছে (অর্থাৎ শত্রুতা-সম্বন্ধ) তাহা পূর্ণ করিতে ফুসফুসের দ্বার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়; তাহাতে আর জ্ঞানের বা অনুভবের অপেক্ষা করে না। (ক্রমশঃ)

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস।—বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সুরেন্দ্র বাবু ইতিমধ্যে তিন চারি খানি পুস্তক লিখিয়া ধীরে ধীরে বেশ যশস্বী হইতেছেন। তাঁহার লিখিত বর্ত্তমান পুস্তকখানিও সে সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছে। পুস্তকের অনেক স্থানে বেস মিষ্টত্ব আছে। তবে কথা এই, ইহাও আমাদের রুচি বিরুদ্ধ সেই থিয়েটারী ছন্দে বিরচিত। আর, সেই জন্যই পুস্তকের স্থানে স্থানে যা' কিছু বিরক্তিকর বোধ হইল। আরও এক কথা, পুস্তকের দামটী কিছু কম হইলে ভাল হইত। যাইহোক, গ্রন্থকারের ভাষা ভাবের নমুনার স্বরূপ গ্রন্থের এক স্থল হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এস্থলে দ্বৈতবনের মধ্যে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

"ছায়া সম ফিরি বনে পর্ব্বতে কন্দরে
বহু দেশ দেখেছি নয়নে. হায় নাথ!
স্বভাবের হেন চিত্র কভু হেরি নাই
নয়নে আমার; পরিমল বহিছে পবন,
বিজন প্রান্তরে বিলাইছে হাসি হাসি;
হের ফুলের কলিকাগুলি কিবা দুলিছে সমীরে।
মরি মরি কত শোভা প্রকৃতি অধরে!
ফুটিয়াছে ফুল, পবনে আকুল,
অবনত শীরে দাঁড়ায়ে দু'ধারে
হেসে হেসে দুলে দুলে, হাসির তরঙ্গ তুলে,
হের নাথ! হের ডাকিছে আমারে;
কচি পাতা গুলি, আনন্দ লহরী তুলি,
হাসিতেছে সবে আনন্দ অন্তরে।
দেয় নাথ! দেয় তুলে কুসুম রতন
চিকনিয়া গাঁথি মালা পরিব ভূষণ।
আহা! শোক দূরে যায় হেরিলে মাধুরি।"

সাময়িক পত্রিকা-সম্বন্ধ।

কর্ণধার।—বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কর্ণধারের প্রথম বর্ষ বাহির হইতে বড়ই অনিয়ম হইয়াছিল। কিন্তু এ বর্ষে কোন মহানুভব রাজার সাহায্যে তিনি কর্ণধারের নূতন সংস্করণ বাহির করিতেছেন। তাঁহার বাসনা, এবার সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় উহা প্রকাশিত করিবেন। এবারের প্রথম তিন সংখ্যা বাহির হইয়াছে; তাহাতে বেশ উদ্যম এবং প্রবন্ধাদির উৎকর্ষ দেখা গেল। 'সংসার-আশ্রম' নামে একটী উপন্যাস এবার প্রকাশিত হই-

তেছে। শেষ পর্য্যন্ত না দেখিলে উহা কিরূপ হইবে বলা যায় না। তবে প্রথম নমুনায় বেশ জনজমা আছে বটে। যাইহোক, আমরা কর্ণধারের উন্নতি প্রার্থনা করি।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

ষ্টার থিয়েটার।—উক্ত রঙ্গভূমে 'সরলা' নাটকের অভিনয় যতবারই দেখা যাইতেছে, ততই উহা মর্ম্মস্পর্শী বলিয়া বোধ হইতেছে। অধিক কি, অভিনয় দেখিতে দেখিতে অনেক সময়ই অশ্রু অনিবার্য্য হইয়া আসে। আর, এমন পাষণ্ড যে কেহ আছেন এ আমরা বিশ্বাসই করিতে পারি না যে, যিনি 'সরলা' অভিনয় দেখিয়া না কাঁদিয়াছেন। ফলতঃ এরূপ সামাজিক নাটকের অভিনয়ে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' যে বঙ্গবাসীর মূল সূত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হওয়ার যে সম্ভব, একথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিছি। তবে প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের চক্ষে দেখিলে যে, অভিনয়ের সকল অংশই একেবারে দোষশূন্য, এরূপ বলা যায় না; ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের লইয়া ওরূপ বাঁদর সাজান প্রভৃতি অংশ পরিত্যক্ত হইলেও হানি ছিল না।

এমারেল্ড থিয়েটার।—দিন দিন এমারেল্ড থিয়েটারেরও পুনরুন্নতি দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। আজকাল অধ্যক্ষগণের সরল ব্যবহারও ঐরূপ আনন্দের কতক কারণ বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন নূতন নূতন নাটকের অভিনয়েও ইহাঁরা পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল বেশ বাহাদুরী লইতেছেন। সম্প্রতি গত শনিবার হইতে 'আনন্দকুমার' নামক আরও একখানি নূতন নাটক অভিনীত হইতেছে। অদ্য স্থানাভাব; সে সম্বন্ধের বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

এও কি সদুপায়!

বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র, ৩০ নং শ্রীনাথ রায়ের গলি, কলিকাতা;—এই ঠিকানা দিয়া আজকাল 'রহস্য-মুকুর' এবং 'বৃহৎ তন্ত্রকোষ' প্রভৃতি পুস্তকের বড়ই জাঁকাল জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। সে বিজ্ঞাপনের নানা বোল-চালের মধ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে '১ম ও ২য় পর্ব্ব রহস্য-মুকুর একত্রে মূল্য মায় ডাকমাশুল ২ দুই টাকা।' এবং তাহার সহিত আবার নানা উপহার। কিন্তু পাঠকগণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, ঐ পুস্তক, রহস্য-মুকুর প্রভৃতির প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্তের নিকট হইতে কিনিলে ১ এক টাকায় পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণে দেখুন, বিক্রেয় মূল্যে চাপিয়া উপহার দেওয়ার লোভানীতে মূল্যে অধিক লইয়া উহা বিক্রয় করা কতদূর সঙ্গত! এইরূপ 'তন্ত্রকোষ ও বটতলার পুস্তক। সুতরাং সে সম্বন্ধেই বা অধিক কি বলিব! যাইহোক, বিজ্ঞাপনদাতা এখনও বিজ্ঞাপনের বোল-চাল পরিবর্ত্তন করুন, এই বাসনা।

দিনে ডাকাতিই বটে!

গত সংখ্যক অনুসন্ধানের 'প্রতারণা-প্রবঞ্চনা' স্তম্ভে 'ধর্ম্মসুহৃৎ' পত্রিকার সম্বন্ধে 'দিনে ডাকাতি' শীর্ষক যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন আবার সে সম্বন্ধে তদপেক্ষাও গুরুতর গুরুতর অভিযোগের কথা জানিতে পারিতেছি। প্রথমতঃ বেলেঘাটা, বংশীসাহার বাগান হইতে 'শ্রীসত্যচরণ ব্রহ্মচারী, কেয়ার অব বাবু কৈলাশ চন্দ্র দে, জমিদার' এই নাম দিয়া যে 'সিদ্ধ কবজের' বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে তাহার মূলেই সম্পূর্ণ গলদ। এমন কি, প্রমাণ পেই জানা যাইতেছে যে, হৃষীকেশ দত্ত নামীয় এক ব্যক্তিই ঐ সকল নাম ও ঠিকানা

ভড়ং দেখাইয়া সাধারণকে প্রতারিত করিতেছেন। আরও 'সিদ্ধকবজ' ব্যবহারে কে কেমন ফল পাইয়াছেন, তাহা বুঝি না; তবে আমাদিগের জানিত কএকটী লোক উহাতে আদৌ কোন ফল পান নাই বলিয়া সতত অভিযোগ করেন। ফলকথা, 'ধর্ম্মসুহৃৎ' পত্রিকাখানি দেখিয়া সকলেরই এই অনুমান হয় যে, 'সিদ্ধকবজের' বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য, হৃষীকেশ দত্তই ঐ খেলা খেলিয়াছেন। যাইহোক, 'ধর্ম্মসুহৃৎ' ও হৃষীকেশ দত্ত সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব প্রস্তাব দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে তিনি সংবাদপত্রের নামে লাইবেলের মকর্দ্দমা আনিতে যান। কিন্তু আমাদের মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মার্সডেন সাহেব মহোদয় হৃষীকেশের সে মকর্দ্দমা আদৌ গ্রহণ করেন নাই; অধিকন্তু তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার নামে যদি কেহ অভিযোগ করিত, তবে বিচারে তাঁহারই (হৃষী বাবুরই) জেল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যাইহোক, আমাদের চতুর্থ সংখ্যক* অনুসন্ধানের লিখিত কথাই যে এখন সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে শ্লাঘার কথা।

সুগন্ধিতে কুগন্ধ।

ময়মনসিংহ বেতাগড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার শর্ম্মা মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন,—"৩নং ভোলানাথ কুণ্ডুর লেন, কলিকাতা হইতে 'দাস বসাক এণ্ড কোম্পানী' এই নামের এক জাঁকজমকযুক্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট নামধেয় সুগন্ধি আতর ইত্যাদি আনিবার জন্য পত্র লিখি। যে মূল্য আমি অনুমান করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, ঠিক সেই মূল্যেরই একটী ভ্যালিউপেবল আসিয়া ডাকঘরে উপস্থিত হওয়ায় পার্শেল গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ও হরি! আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম, আর যে সকল সুগন্ধির জন্য লিখিয়াছিলাম, এত তা নয়! ইতিকর্ত্তব্য ভাবিয়া সেই সুগন্ধিওয়ালাকে পত্র পরে লিখি; কিন্তু কয়েক পত্রের জবাব একেবারেই নাই। অধিক পীড়াপীড়ির পর, এবং এই সকল কথা সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইবে বলিয়া ভয় দেখানয়, অগত্যা সুগন্ধি ফেরত দিয়া টাকা ফেরত লইতে লিখিয়াছেন। কিন্তু এত বিশ্বাস তাঁহাকে কে করে! এখন, পাঠক দেখুন কেমন ঘটনা; ভ্যালিউপেবলে যাহা তাহা দিয়া কেমন ঠকান!"

এইরূপ প্যাটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন দিয়া মূল্য ফেরতের লোভানী।

"মীর আতাহার আলী, করটীয়া, টাঙ্গাইল; এই ঠিকানায় একটী প্রমেহের ঔষধ বিক্রয় হয়। রোগ আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে এইরূপ সর্ব্বনেশে প্রলোভন সেই বিজ্ঞাপনে আছে। মূল্য কম দেখিয়া আমি একটী রোগীর জন্য ঔষধ আনাই; এবং রোগ আরাম না হওয়ায় মূল্য ফেরত চাই। কিন্তু—'কয়েক দিন পরে পাঠাইব' এইরূপ ভাবে একখানি পত্র লিখেন। তারপর আজ ত বহুদিন হইয়া গিয়াছে, এবং আতাহার আলির নিকট ক্রমে কয়েক খানি পত্র লিখায় এক খানারও জবাব আসিল না। সুতরাং পাঠকগণ সাবধান, মফঃস্বলেরও এরূপ কত ফন্দি বাহির হইতেছে।"

সংবাদ।

—ডাকবিভাগ সম্প্রতি এক নূতন নিয়ম করিতেছেন যে, আগামী ১লা এপ্রেল হইতে ডাকঘরে ভ্যালুপেবেল করিতে হইলে, প্রেরক যে প্রকৃত আদেশানুযায়ী প্যাকেট পাঠাইতেছেন একথা ডাকঘরকে দেখাইতে হইবে। আরও, এখন অনরেজেষ্টারী প্যাকেটের মনি-অর্ডার ফিটা গৃহীতার নিকট হইতে টাকা না আসিলে দিতে হয় না; কিন্তু উক্ত সময় হইতে সে সম্বন্ধেও এই নিয়ম চলিবে যে, উক্ত টাকা আসার ফিটাও প্যাকেট

* দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য।

পাঠাইবার সময়ই প্রেরককে দিতে হইবে; আর, টাকা না আসিলে সে ফিটা বাজেয়াপ্ত হইবে। এই সংবাদের প্রথম অংশটী পড়িয়া আমরা যেরূপ সুখী হইয়াছিলাম, দ্বিতীয় অংশটীতে আমাদিগকে কিন্তু ততোধিক দুঃখিত হইতে হইল। উহাতে সম্বাদপত্রগণের ব্যবসার মূলে যে সম্পূর্ণরূপে কুঠারাঘাত করা হইল, তাহা বলা বাহুল্য। যাহাহোক, এখনও ডাকবিভাগ বিশেষ বিবেচনা করিয়া ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, এই বাসনা।

—কাপ্তেন হিয়াসে নামক একজন সাহেবের বিরুদ্ধে পাইওনিয়ার পত্রে কি লেখা হইয়াছিল। সাহেব তাহাতে চটিয়া লাল হইয়া একেবারেই পাইওনিয়ার আপিসে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পাদককে উত্তম-মধ্যম ঘা-কতক প্রহার দিয়া চম্পট দেন। তাহাতে সম্পাদক আদালতে নালিস করিয়াছিলেন। এখন বিচারে কাপ্তেনের একমাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

—আমেরিকায় ফটোগ্রাফ করিয়া পুস্তক মুদ্রিত করা হইতেছে। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার' প্রত্যেক খণ্ড ১০, টাকায় বিক্রয় হয়, কিন্তু এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ফটোগ্রাফ করিয়া প্রতিখণ্ড ৫, টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে।

—উচ্চবংশীয় জনৈক ফরাসী যুবকের সহিত একটী যুবতীর বিবাহ হয়। গির্জ্জায় বিবাহাদির পর, কন্যা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণসহ একটী হোটেলে যাইয়া পরিতোষ-রূপে আহারাদি করেন। তৎপরে হোটেল-স্বামী টাকার জন্য বিল পাঠাইয়া দিলেন। বর নিজের পকেট হইতে টাকা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়া দেখেন, পকেটে এক কপর্দ্দকও নাই। ক্রমে একে একে সকল পকেটগুলিই খুঁজিয়া দেখেন, কোনটীতেও নাই। তখন তিনি আপনাপনি বলিতে লাগিলেন,—'ভারি আশ্চর্য্য! আমি ঠিক জানি আমি ফেলিয়া আসি নাই।' তৎপরে নববধুকে এ রহস্য জ্ঞাত করিলেন। নববধূ স্বামীর এইরূপ নির্বুদ্ধিতা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—'আমি জানি, তুমি এইরূপ অসাবধান; তাই আজ প্রাতে আমি নিজে কয়েকখানি ব্যাঙ্ক-নোট লইয়া আসিয়াছি, এই লও'; এই বলিয়া পাত্রী আপনার পকেটে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'বাঃ! কোথা গেল? তবে অন্য পকেটে নিশ্চয়ই আছে।' পরে সকল পকেটই খোঁজা হইল, একটীতেও নাই। এই সকল কথা বরের আর এক জন বন্ধু শুনিতে পাইলেন, তিনি বন্ধুর মান বাঁচাইবার জন্য আপনার পকেট হইতে টাকা বাহির করিতে হাত দিলেন। ও হরি! তিনিও পকেট অন্বেষণ করিয়া টাকা পাইলেন না। অবশেষে সকল পকেটে হাত দিয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হোটেলে প্রবেশের সময় এক জন পকেট-মারা সকলের পকেট মারিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল।

—'হিন্দু' সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, পূর্ব্ববঙ্গে ১২ জন কুলীন আছেন, তাঁহাদের সর্ব্বসমেত ৬৫২টী বিবাহ। তন্মধ্যে এক জনের ৮০ টী ও বাকী ১১ জনের ৫৭২ টী। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য, তাঁহার কেবল মাত্র ৪০টী পত্নী। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুলীন-চূড়ামণির বয়স ৭০ বৎসর ও সর্ব্ব কনিষ্ঠের বয়স ৪০ বৎসর।

—কোন সহযোগী বলেন, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে হুগলী, হাবড়া, ২৪ পরগণা এবং নদীয়া এই চারিটি জেলা হইতে খোলাভাটির প্রথা উঠিয়া যাইবে, এবং অপরাপর জেলায়তেও খোলাভাটির কিরূপ কাজ চলিতেছে, তদ্বিষয়ে তদন্ত করা হইবে। সংবাদ সুখের বটে!

—লাহোর জেলের একজন কয়েদী ঝগড়া করিতে করিতে অপর একজন কয়েদীর নাক কাটিয়া দিয়াছিল। বিচারে আসামীর দুইবৎসর মেয়াদ বাড়িয়া গিয়াছে, আর তাহার দশটাকা জরিমানা হইয়াছে।

—নন্দলাল পাল নামক এক ব্যক্তি ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঝগড়া করিয়া বাটী ছাড়িয়া কুলিগিরি করিতে দ্বীপান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। ৪৭ বৎসর পরে নন্দলাল কলিকাতা আসিয়া যোড়াসাঁকোর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই তাহাকে চিনিতে পারিতেছে না। দুই একজন বৃদ্ধা কেবল তাহাকে আঁচে চিনিতে পারিয়াছে। নন্দলাল এখন পৈতৃক বিষয়ের ভাগ দাওয়া করিতেছে। হাইকোর্টে মকর্দ্দমা হইয়াছিল শুনা যায়, তাহার ভাতৃপুত্রেরা তাহাকে ভরণপোষণ দিতে সম্মত হওয়ায় মকর্দ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। সংবাদটী মরা মানুষ ফিরে আসার ন্যায়!

—এক জন মার্কিণ সাহেব এক হাজার টাকা বাজি রাখিয়া পদব্রজে হডসন নদী পার হইয়াছেন। সাহেব বিনা বিলামায় কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারেন নাই। দুই পাটি বিরাট জুতা পায়ে দিয়া বাজি জিতিয়াছেন। জুতার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট, প্রস্থ এক ফুট। কাষ্ঠ ও পিত্তলে উহা নির্ম্মিত, ভিতরে হাওয়া-পোরা। 'খড়ম পায়ে গঙ্গা পার' সংবাদের ন্যায় ইহা অলীক নহে।

অনুসন্ধান।

—:•(০)•:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৫ সাল। [১৪শ সংখ্যা।

স্বভাব-সঙ্গীত।

আলাইয়া—আড়া।

"তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন;
নিরখি জুড়াই নাথ! যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ,
শোভি'ছে শশী তপন, হৃদয়রঞ্জন;
মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভব-ভয়-ভঞ্জন।
ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ,
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্ব-কারণ;
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন।"

বৈজ্ঞানিক চোর।

রকম বেরকম কত রঙেরই চোর-ছ্যাঁচোড়ের খবর পাওয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চোর, এ একটী সম্পূর্ণ নূতন কথা। সম্প্রতি সুসভ্য মার্কিন প্রদেশ হইতে ঐরূপ চোরের এক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।' সে বৃত্তান্ত দেখুন পাঠক, বড়ই চমকপ্রদ—আমাদের চিন্তারই অতীত।

টেলিফোঁ (Telephone) নামক এক প্রকার বার্ত্তাবহ যন্ত্র আছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, সে যন্ত্রের সাহায্যে এক স্থানে কথা কহিলে দূরবর্ত্তী অন্য স্থানে বসিয়া অবিকল সেই কথা শুনা যায়।

মার্কিন দেশের একজন সাহেব, আপিসে কাজকর্ম্ম করিবার সময়, ঐ বার্ত্তাবহ যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাড়ীর সংবাদ লইতেন। আপিস হইতে তাঁহার আবাস-বাটী প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে ও নগরের প্রান্তদেশে অবস্থিত হওয়ায় এবং বাড়ীতে আর কেহ অভিভাবক না থাকায়, তিনি ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আপিস-সময়ে হঠাৎ কোন কথা বলার আবশ্যক হইলে, তাঁহার মেম তাঁহাকে 'টেলিফোঁর' দ্বারা সংবাদ দিত; এবং তিনিও ঐ উপায়ে তাহার উত্তর-প্রতি-উত্তর করিতেন।

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়—সাহেব মহোদয় যখন আপিসে বসিয়া কাজ-কর্ম্ম সারিতেছেন তখন—তাঁহার বাড়ী হইতে যেন একজন অপরিচিত কণ্ঠের স্বর শুনা যাইতে লাগিল। সাহেব চমকিত হইয়া শুনিতে

লাগিলেন। সে অপরিচিত কণ্ঠ বলিতে লাগিল,—"আমি একজন দস্যু-সর্দ্দার। দল বল-সহ তোমার বাড়ী আক্রমণ করিয়াছি। তোমার পরিবারের হাত-পা-মুখ বাঁধিয়াছি; এবং তোমার একমাত্র পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকেও আটক করিয়াছি। তোমার নিকট হইতে উত্তর পাইতে যদি মুহূর্ত্তেক বিলম্ব হয়, তবে তাহাদের এখনই হত্যা করিব। গৃহে যে সকল সামগ্রী আছে, তাহা সমস্তই লইয়া যাইব; এবং অবশেষে তোমার গৃহে আগুণ লাগাইয়া দিয়া প্রস্থান করিব। এখন, যদি পুত্র-পরিবারের প্রতি তোমার মায়া থাকে, তুমি যদি তাহাদিগকে বাঁচাইতে বাসনা কর, তোমার যদি সমস্ত জিনিসপত্র যেরূপ অবস্থায় ছিল, তাহাই রাখিতে চাও, তবে এখনই এক কাজ কর;—আমি যা বলি, তাই শুন। তাহাহইলে এখনই—মুহূর্ত্ত মধ্যেই আপিস হইতে পাঁচ সহস্র টাকা লইয়া আমাকে দিবে, প্রতিজ্ঞা কর। আর, যদি তাহা দিতে স্বীকৃত হও, তবে স্বীকার কর, এখনই আমার যে দুইজন লোক তোমার নিকট যাইবে, তাহাদের একজনের হস্তে নির্জ্জনে এখনই ঐ পাঁচ সহস্র টাকা অর্পণ করিবে। অর্থাৎ যদি তাহা কর, তবে অপর ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া দিতে ইসারা করিবে, ও তখন আমি দল-বল-সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিব; আর, তাহা হইলে ঐ পাঁচ সহস্র টাকা ব্যতীত তোমার আর কিছুই অনিষ্ট হইবে না। যাইহোক, বুঝিয়া এখনই উত্তর দেও; বিলম্ব করিলে আমি আর কিছুই শুনিব না।"

'টেলিফোঁর' ভিতর হইতে অপরিচিত কণ্ঠের ঐরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া সাহেব তো একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কি যে উত্তর দিবেন, কি যে করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল-মাত্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময়—দুই এক মিনিট পরেই আবার শব্দ আসিল,—"টাকা দিবে কি না, স্পষ্ট বল। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না। এখনই আমার যা কর্ত্তব্য, করিয়া যাইব।"

প্রাণের মমতা!—নিঃসহায় পুত্র-পরিবার! অর্থ কার জন্য!—এইরূপ দুই এক কথা ভাবিয়াই অগত্যা সাহেবকে উত্তর দিতে হইল। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, লোক পাঠান; আমি টাকা দিতেছি।"

পরক্ষণেই আবার উত্তর আসিল,—"কিন্তু সাবধান, প্রেরিত লোকের প্রতি যেন কোনরূপ অত্যাচার করা না হয়! যদি কোনরূপ অত্যাচার করা হয়, আমি তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব; এবং বুঝিলেই জানিও, তোমাদের আর কাহারও নিস্তার নাই। আর, এও জানিও যে, আমার যে লোক যাইতেছে, তাহাদিগকে, তুমিও ইচ্ছা করিলে, কোন ক্রমে পুলিসের হস্তে দিতে পারিবে না। কারণ, আমি আইন বাঁচাইয়া কাজ করিতেছি। সেরূপ চেষ্টা পাইলে অনর্থক তোমারই গৃহ আজ তোমারই পুত্র-পরিবারের রক্তে রঞ্জিত হইবে। আমার ঘুণাক্ষরেও কোন ক্ষতি তুমি করিতে পারিবে না। টাকা আনিতে যাইতেছে, দুই জন লোক। তাহার একজন টাকা লইয়া নিজের গন্তব্য স্থানে সাবধান হইলে, অপর ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দিবে; এবং তখন আমি সকলকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব। তদ্ভিন্ন, তুমি জানিও, কিছুতেই আজ তোমাদের আর রক্ষা নাই।"

সাহেব কি করেন?—আর উপায় নাই। সুতরাং তাঁহাকে আবার বলিতে হইল,—"আচ্ছা, লোক পাঠান; আমি টাকা এখনই দিব; এবং আপনার প্রেরিত লোককে কোন কষ্টই দিব না।"

উত্তর মাত্র দিয়াছেন,—অতদূর হইতে হঠাৎ লোক আসিতে অন্যূন দু'দশ মিনিট বিলম্ব

হইলেও উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে পারিবেন অন্ততঃ এ ভাবিয়াও উত্তর দিয়াছেন,—এমন সময় তখনই দুইজন ভদ্রলোক সাহেবের কামরায় আসিয়া উপস্থিত। সুতরাং সাহেব চমকিত! এ স্বপ্ন দেখিলেন, কি ভৌতিক ব্যাপার, ভাবিয়াই বুদ্ধিহীন। কিন্তু উত্তর আর দিবার নাই; ভাবিবার আর অবসর হইল না। লোক দুই জন যেন পূর্ব্ব হইতেই আপিসে আসিয়া উপস্থিত ছিল। সাহেবের ভাব-ভঙ্গীতেই হোক, বা কি জানি কি উপায়ে, তাহারা যেন সকল কথারই ইসারা পাইল।

যাইহোক, সাহেবকে টাকা দিতে হইল। প্রাণের দায়ে তিনি আর বিলম্ব বা ওজর-আপত্তি করিতে পারিলেন না। সুতরাং পূর্ব্ব কথামত একজন টাকা লইয়া সাবধান হইল; এবং অপর ব্যক্তি একাবর টেলিফোঁর কাছে গমন করিয়া কি জানি কি ইসারা করিয়া চলিয়া গেল। মন্ত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া, কি কোনরূপ ভৌতিক উৎপাতে পড়িয়া যে সাহেবকে এইরূপে টাকা দিতে হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

এইরূপে টাকা হইয়া তাহারা চলিয়া গেলে, সাহেব তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পাপিষ্ঠগণ, তাঁহার অনাথা স্ত্রী-পুত্রের যে কি দুর্দ্দশা করিয়া গেল, একবার গৃহে যাইয়া সেই সংবাদ লইতেই অতঃপর তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ আপিস হইতে বহির্গত হইয়া তিনি গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—বাড়ীতে আসিয়া সকলই সমভাবে অবস্থিত দেখিলেন; ঘর-দুয়ারের কোথাও কোনরূপ বিকৃত ভাব তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। যাইহোক, বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি শশব্যস্তে তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রিয়ে! দস্যুগণ তোমায় কি বড়ই কষ্ট দিয়াছে! কই কই, বাছা আমার কৈ? তাহাকেও কি দুরন্তগণ বাঁধিয়াছিল!"

স্বামীকে এইরূপে শশব্যস্তে ও অসময়ে গৃহে আসিতে দেখিয়া, এবং তাঁহার মুখে এইরূপ সকল কথা শুনিয়া সাহেব-পত্নী তো বড়ই চমকিত হইলেন; বলিলেন,—"সে কি বলিতেছ নাথ! আমি তো ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! দস্যুগণ আবার কে?"

"কেন! কেন!—যাহারা এই আদ ঘণ্টা পূর্ব্বে তোমাদিগকে বাঁধিয়াছিল; এবং আমার টেলিফোঁ দিয়া কথা কহিয়া বলিতেছিল যে, আমার নিকট হইতে তখনই পাঁচ সহস্র টাকা না পাইলে তোমাদের বধ করিবে!"—সাহেব এই পর্য্যন্ত বলিতেছেন, এমন সময় স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"সে কি কথা! এরূপ তো কিছুই হয় নাই! তবে আদ ঘণ্টা পূর্ব্বে একটী ভদ্রবেশ সাহেব আমার নিকট আসিয়াছিলেন বটে! কিন্তু এরূপ ঘটনা তো কিছুই ঘটে নাই? তবে তোমার সহিত আপিস-সম্বন্ধীয় তাঁহার এক বিশেষ কথা আছে বলিয়া এবং সে কথা জানাইতে বিলম্ব হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা হেতুবাদে, তিনি একবারমাত্র মিনিট-পাঁচ সাত-কাল তোমার সহিত কি জানি কি কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিলেন। সাহেবটী বিশেষ করিয়া আমায় অনুরোধ করায় আমি তাঁহাকে টেলিফোঁ দিয়া কথা কহিতে দিয়াছিলাম। এইমাত্র তো ঘটনা! ইহাতে আবার আমাদের বন্ধন করিল কে? বুড়া বয়সে এমন নূতন-তর ঠাট্টা আবার কোথা হইতে শিখিলে নাথ! যাহোক, এত শীঘ্র শীঘ্র তোমার আপিস হইতে আসার কারণ কি?"

তখন সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিলেন। এবং বলা বাহুল্য, তাহাতে উভয়কেই একেবারে হতবুদ্ধি ও জ্ঞানহারা হইতে হইল।

আমি বড়।

এ কথায় অনেকে রাগ করিবেন—অনেকে ঠাট্টা করিবেন—অনেকে বালকের বালকত্ব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। দিন্, ক্ষতি নাই—উপরে একদিন আসন পাতিব এ ভরসা না থাকিলে, আমি এ বিষম প্রবন্ধ লিখিতে বসিতাম না। যখন নিশ্চয়ই আমি বড়, তখন লোকের কথায় আসে যায় কি? দুঃখের কথা,—লোকে মানুষটাকে কথা করিয়া ফেলে; তাহারও যে কথা আছে, এ কথা মনে স্থান দেয় না। দিবে কেন? তাহারা যে ক্ষুদ্র প্রাণ—অবলম্বিত হৃদয়; দেখিবার শক্তি তাহাদের কই? লোকের কথা একটা বলিতে গেলে তাহারা আগে সেই লোকটার খোঁজ নেয়; তাহাকে দোষ দেয়—ঠাট্টা করে—হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—শ্লেষ করে—ঘৃণা করে—সে লোকটাকে 'কথা' করিয়া ফেলে! তাহাকে ডাকিয়া না হয় জিজ্ঞাসা কর—তাহার উত্তর নাও; কিন্তু তা নয়! সে সব শুনিবার আগেই তাহাকে আক্রমণ করিবে—তিরস্কার, শ্লেষ, কঠোর বচন দ্বারা বেচারীর প্রাণান্ত করিবার উদ্যোগ করিবে! এ সব কি! যাহা সংসারে সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে—ব্যাকুবত্ব।

সুতরাং সাধে বলি আমি বড়? যখন দেখি, মানুষগুলা কেবল গড্ডলিকা-প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে—নিজের কিছুই যেন নাই—অন্যের পদানুসরণেই যেন তাহাদের প্রকৃষ্টাজ্ঞাপিত কার্য্য, তখন মনে হয়, কেন এ বেচারীদের একটু করিয়া বেশী স্বাধীন বুদ্ধি হইল না! যখন দেখি, যাহারা কিছু বুঝে না, অথচ বুঝাইতে আসে; কিছু জানে না অথচ বিদ্যাদান করিতে ইচ্ছা করে, আবার একটু ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে অধোমুখে ফিরিয়া যায়, তখন কি মনে হয়? সামান্য তড়াগ-মাত্রে পড়িয়া যাহারা হাবুডুবু খায়, অথচ দাঁড়াইবার শক্তি মাত্র নাই, আর, যখন আমি কনিষ্ঠাঙ্গুলি-তাড়নে তাহাদিগকে তীরে উঠাইয়া দিই, তখন কি মনে হয়? যখন দেখি, লোকে দোষ করিয়া তাহা স্বীকার করিতে পারে না, লোক ভ্রুকুটীতে থরহরি কাঁপে, তখন মনে কি হয়? তখন মনে হয়, মানুষ হইয়া এত হীন প্রাণ লইয়া জন্মিয়াছে কেন? দাড়াইবার ক্ষমতা নাই অথচ মানুষ!—কেন? যখন দেখি, দুর্দ্দশার একটী ফুৎকারে লোকে পড়িয়া যাইতেছে, আর উঠিতে পারিতেছে না; যখন দেখি দুর্ঘটনার স্রোতে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া কেবল তাহারই নিশ্বাসের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করিয়া কেবল সেই দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া আছে, তখন মনে হয়, ইহারা কি মানুষ? যখন দেখি, নিঃসহায় অবলার উপর—নির্ব্বল বালকের উপর লোকে নিজের শক্তি-মহিমা প্রচার করিতেছে, তখন বুঝিতে না পারিয়া ভাবি—"এ সব মানুষ না পশু?" যখন দেখি, আমার লিখিত বিষয়ের অর্দ্ধাঙ্গমাত্র জানিয়াই লোকে বিরুদ্ধ সমালোচন করিতে বসে, তখন কি মনে হয়! যখন দেখি, গীতার মহিমাময়ী গূঢ়ার্থগতি ও সর্ব্বব্যাপী মাহাত্ম্য না বুঝিয়া কেবল 'হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান' বলিয়া চীৎকার করে ও অজস্র রক্তপাত করিবার পরামর্শ পুস্তক বলিয়া জানাইতে থাকে, তখন কি মনে হয়?—মনে হয়, এমন সুদর্শন অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত মানুষগুলা ভারতে না জন্মিলেই চলিত! আবার যখন দেখি, একবারের চীৎকারে 'ধরতত্ত্ব ভাষার ঘণ্ট' ও 'পাঁচালি ব্যবস্থা' শুনিয়াও পুনরায় সেই চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে, তখন মনে হয়, এমন অপদার্থ আত্মাভিমান-ত্যক্ত জীবও আছে!! চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলেও যাহারা দেখে না—কর্ণ মর্দ্দন পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিলেও যাহারা বুঝে না, তাহাদের অপেক্ষা বড় নই ত কি? অবশ্য বড়; অতএব নিঃসন্দেহে ইহা প্রমাণ হইয়া গেল,—আমি বড়।

জীবের দায়িত্ব।

মনুষ্য, ভাষার দোষে ও নিজের কল্পনা-শক্তি অসঙ্গত বৃদ্ধি করিয়া, অনেক সময় ভ্রমে পতিত হয়েন; এবং নিজের জাগ্রত চৈতন্যকে পরিমাণ করিয়া সেই পরিমাণ-দণ্ডকে সুপ্ত চৈতন্যেও বিস্তার করিয়া ফেলেন। মনুষ্য বয়ঃ-প্রাপ্ত হইয়া কোন বস্তু দর্শন করিয়া যদি আপন হাত-পা তুলিয়া আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভব করেন, অমনই সেই হাত-পা নাড়া দেখিয়া ২।৪ দিন বয়স্ক শিশুরও আনন্দ প্রতিপন্ন করিতে থাকেন। কোন কোন কীটের সূর্য্য-রশ্মিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়ানকেও আনন্দময় দর্শন করেন; বসন্তে বৃক্ষোপরি পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়াও বৃক্ষের হাসি স্থির করেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়াই যে "হোয়া হোয়া" করিয়া শব্দ করিয়া উঠে, তাহাকে রোদন কেন বলি? তাহা তো অপর কোন অনুভবের (যথা, ক্ষুধা) কিম্বা এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থায় পতিত হওয়ার জন্য যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার ব্যঞ্জনা-মাত্রও হইতে পারে। অথবা অনাশ্রয়ের কণ্ঠস্বর যেরূপ বল-স্বরূপ, সেই বল-প্রকাশও হইতে পারে। অথবা অধিক বৈজ্ঞানিক মতে কহিতে গেলে, যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুর ফুস্ফুসের কার্য্য আরম্ভ হইল; বক্ষের জাঁতা উঠিতে লাগিল, পড়িতে লাগিল; সেই বলে তাহার স্নায়ু-শরীর কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠের টুঁটির (Larynx) মাংসে ও স্বরীয় ভাবে প্রতিঘাত হইল; তখন কাজেই সেই শিশুর কোমল মুখের ব্যাদান বা বিকার হইল; এবং "হোয়া হোয়া" শব্দ, বহির্গত হইয়া আসিল। শিশু জানিল না যে, সে হাসিল বা কাঁদিল, বা তাহার মাতাকে স্তন দিতে ডাকিল। আমরা এতদ্বারা এরূপ বলিতে ছি না যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, ক্রমে তাহার স্পর্শ-বোধের ভাব জাগ্রত হয় না। কিন্তু আমাদের কথার উদ্দেশ্য এই যে, শিশু যতক্ষণ না নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলে, ততক্ষণ তাহার চৈতন্যের প্রাণ-ভাব ব্যতীত অপর সকল ভাবই বৃক্ষাদির ন্যায় সুপ্ত থাকে। এইজন্য কহিতেছি যে, এক মনুষ্য জন্মে জীবের তিন প্রধান জন্মের ভাব দেখায়; অর্থাৎ যত দিন শিশু গর্ভে থাকে, ততদিন সে উদ্ভিদের ভাবে বর্দ্ধিত হয়; তখন নাড়ী (Umbilical cord) তাহার শিকড়, পোরে। (Placenta) তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু-সমুদ্র কিম্বা শিকড়ের আবরণ, এবং তাহার গর্ভধারিণী পৃথিবী-স্বরূপা। তখন তাহার মুখের কার্য্যের প্রয়োজন নাই; ফুস্ফুসও অকর্ম্মণ্য যন্ত্ররূপ থাকে। অথচ সে দিন দিন জরায়ুর মধ্যে বৃদ্ধি পায়।

সেই অবস্থায় তাহাকে কাটিয়া ফেলুন, তথাপি সে "হোয়া হোয়া" করিবে না; বৃক্ষের মত মুক হইয়া ও জ্বালা-যন্ত্রনার কোন রব না করিয়া বৃক্ষের ন্যায় মরিবে। যদি অস্ত্রাঘাতে তাহার শরীর নড়ে, তবে আমরা তাহাকে অকস্মাৎ প্রাণ-বিয়োগের কার্য্য বলিব। কারণ, কোন ছাগকে ছেদন করিলেও, সে তাহার দেহ খেঁচিতে থাকে; কিন্তু তখন তাহার কাটামুণ্ড লইয়া জোড়া দিলেও সে আর্ত্তনাদ করে না।

তাহার পর দ্বিতীয়, জন্মের ভাব। প্রাণী মণ্ডলীর নিম্ন-শ্রেণীস্থ মেরুদণ্ডবিহীন জীবের ন্যায়, অর্থাৎ বৃক্ষ-লতাদির ভাব হইতে কিছু উন্নত ভাবে. তাহা কতিপয় আধ্যাত্মিক গুণের অপরিস্ফুট আবির্ভাব। তাহা প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানমাত্র অনুভূত হইয়া, তৎপরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ, দ্বেষ ইত্যাদি পাশব গুণের ভিতর দিয়া গমন করিলে যখন চিন্তা ও স্মারকতা শক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে, তখন মনুষ্য প্রকৃতির গুণাবলম্বী হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সেই সকল শক্তি সুপ্ত ভাবেই ছিল বলিতে হইবে। যতদিন আমাদের শক্তিগণ সুপ্ত অথবা অপরিস্ফুট থাকে, ততদিন আমাদের কার্য্যকে অজ্ঞানকৃত

কার্য্য কহি;—এবং চিন্তা ও স্মারকতা শক্তির বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত, অতি শৈশবাবস্থায় আমরা যে কার্য্য করি তাহার কিছুই বলিতে পারি না। মনুষ্যের স্মারকতা শক্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি না হইলে সে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ন্যায় প্রায়ই থাকে। যে সকল মনুষ্য মাতৃগর্ভে বৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে হইতে বিকৃতাঙ্গ হইয়া যায়, তাহারাও ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছুদিন, অন্যান্য ভূগর্ভস্থ শিশু যে ভাবে থাকে সেই ভাবেই থাকে। কিন্তু যখন মনুষ্যের উপযোগী গুণ বিকাশের সময় আইসে, তখন তাহারা আর মনুষ্য হয় না; নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায়ই প্রাণ ও কতিপয় আধ্যাত্মিক গুণের বিকাশ লইয়াই থাকে। প্রত্যেক জীব দেহের ভিন্ন ভিন্ন গঠনের ও তৎসূচিত ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিরও তারতম্য এইরূপেই ঘটিয়া থাকে। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, "কেন এরূপ হয়?" তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, এ 'কেন' কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে ঈশ্বরকে মূলে রাখিয়া 'দায়িত্ব'-সম্বন্ধে লিখিবার সময় পরে দুই এক কথা কহিব।

উপরে মনুষ্য-জীবে যেরূপ মোটামুটি তিন জন্মের ভাব প্রকাশ হয়, দেখাইলাম; আবার মনুষ্য ছাড়িয়া যত নিম্ন প্রাণী-রাজ্যে যাইব, ততই এক এক জন্মের ভাব কমিতে দেখা যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিম্ন-শ্রেণীস্থ প্রাণীর মধ্যে, উদ্ভিদের প্রাণ ও কীটের অল্প মাত্রায় বাহ্য বা ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিকাশিত। তদ্ভিন্ন পক্ষীতে অথবা স্তন্যপায়ীতে যে সকল প্রধানতর আধ্যাত্মিক ভাব প্রত্যক্ষ হয়, সে সমস্তই তাহাতে সুপ্ত। সেইরূপ কীটে ও শেষে উদ্ভিদে, একে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের এই কথাতে ডার্‌উইন সাহেবের মতের পক্ষ সমর্থন করিতেছি, অনেকে মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের কাহারও মতামত সমর্থন করা উদ্দেশ্য নহে। যাহা প্রত্যহ দেখিতেছি তাহাই বলিলাম। তবে পরে জীবের দায়ীত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিব, তাহার অবতারণার জন্য দেখাইতেছি যে, জীব নামে যে একটা কোনরূপ আকারের পদার্থ আমাদের জীবদেহের ভিতর আছে, তাহা নহে। এবং সেই জীবের যে এক-একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ এক-একটা শক্তি, তাহাও নহে। আর, জীব কথা সাধারণ কথা, উহা চৈতন্যশীল সৃষ্ট পদার্থমাত্রকেই বুঝায়; ও সেই চৈতন্যের কোন ভাব সুপ্ত (যথা সংজ্ঞা জ্ঞানাদি) ও কোন ভাব জাগ্রত থাকে (যথা প্রাণাদি)। আর, সেই চৈতন্য-শীল জীবের দেহের এবং আধ্যাত্মিক ভাবের কার্য্য কখন হইতেই বা আরম্ভ হয়, এই সমস্ত দেখাইতেই পূর্ব্বের যাবতীয় কথা গুলির উল্লেখ করা হইল।

উচ্চতরের আধ্যাত্মিক গুণের কার্য্যও নিম্নশ্রেণিস্থ জন্তুর মধ্যে অনেক সময় নিরীক্ষিত হয়। কুকুরের প্রভুভক্তি, কপোতের প্রণয়, বানরীর ও কীটের মধ্যে উর্ণনাভের অপত্য-স্নেহ কাহারও অবিদিত নাই। মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে, স্তন্যপায়ী-বিভাগে, অনেক সময় অনেক মেজাজের জন্তু দেখা যায়। তন্মধ্যে কেহ খিট্‌খিটে, কেহ শান্ত, কেহ কৃতজ্ঞ, কেহ অকৃতজ্ঞ, কেহ সাধু, কেহ অসাধু। মনুষ্যের মধ্যেও তদ্রূপ ভাবের লোকের অভাব নাই। চোর গরু, রাত্রে অপরের ক্ষেতের ধান খাইয়া আসিয়া, প্রভাতের পূর্ব্বে গোয়ালে ঢুকিয়া সাধু হইয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকে, এ কথাও অনেকে শুনিয়াছেন। এইরূপ যদি আমরা প্রত্যেক শ্রেণী, বিভাগ, উপবিভাগ, সম্প্রদায়, পরিবার ও জাতির কার্য্য-কলাপ নিরীক্ষণ করি, তবে তাহাদের ভিতর আধ্যাত্মিক সৎ-অসৎ (যাহাকে মনুষ্য সৎ অসৎ কহেন) গুণের কার্য্য ন্যূনাতিরেক ভাবে দেখিতে যে পাইব, তাহা আমরা সন্দেহ করি না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ একদিন কতিপয়

মনুষ্যোপবেশী সালিক-পরিবার অন্তর্গত পক্ষীর যে কার্য্য দেখিয়াছি, তাহা নিম্নে কহিতেছি;—

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ এ নভেম্বর বৈকালে আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় দুই জোড় 'গুই-সালিক' আমাদের নিকটবর্ত্তী একটী কদম্ব বৃক্ষে বসিয়া থাকিয়া (তাহাদের মধ্যে কি হইল তাহারাই জানে) পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে রাস্তায় পড়িল। মোরগ যেরূপ উড়াউড়ি করিয়া লড়াই করে, ইহারাও সেইরূপে উড়িয়া উড়িয়া ও কখন নখর দিয়া পরস্পরকে ধরিয়া সম্মুখীন করিয়া বসিয়া চীৎকারে মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল। সুখের মধ্যে এই ছিল যে, তাহাদের মধ্যে অন্যায় যুদ্ধ ছিল না। নর পাখী নরের সহিত, মাদি মাদির সহিত রণে ব্যস্ত।

এখানে এক কথা বলা যাউক, নিকৃষ্ট জীবের যত যুদ্ধ দেখিয়াছি, এক জাতীয়ের মধ্যে কখন পুরুষ যাইয়া স্ত্রী-জন্তুকে আক্রমণ করে না; অথবা স্ত্রী-জন্তু (আহারের সময় ব্যতীত) কখনও পুরুষের সহিত চড়াও হইয়া ঝগড়া করে না। তবে যখন স্ত্রী-জন্তু তাহার পুরুষকে অন্য কোন পুরুষ জন্তুকে আক্রমণ করিতে দেখে, তখন সে যাইয়া তাহার স্বামীর সহায়তা করে। এইরূপে চারিটী পাখীর ঘোরতর রণ প্রায় ৪৫ মিনিট ধরিয়া চলিতেছে, এমন সময় এক জোড়া 'ভাত-সালিক' আর এক গাছ হইতে উড়িয়া আসিয়া সেই রণ-স্থলে উপবিষ্ট হইল। একটী কাকও কোথায় ছিল, সালিককে বসিতে দেখিয়া সেও আসিয়া বসিল। কাক প্রবাদিত রূপে ধূর্ত্ত; যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে পাছে নখরাঘাত খাইতে হয়, এই ভয়ে সে অল্প তফাত হইতে তামাসাই দেখিতে লাগিল। কিন্তু ভাত-সালিকের অন্তঃকরণ ভিন্ন ভাবে গঠিত। আমাদের স্পষ্ট বোধ হইল, যেন সেই বিবাদ ভাঙ্গাইয়া দিবার জন্য, পুরুষ ভাত-সালিকটী রণোন্মত্ত পুরুষ গুই-সালিক দ্বয়ের এক পক্ষে যাইয়া ঠোকর মারিল। ঠোকর খাইয়া, যেমন তাহারা থাবা দিয়া ধরিয়া বসিয়াছিল, অমনি পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া আবার আর এক স্থলে গিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে ধরিয়া বসিল। ভাত-সালিকটী আবার তাড়াইয়া গিয়া একটাকে ঠোকর মারিল। এই দুইবার ঠোকর মারার পর পুরুষ-দ্বয়ের বিবাদ ভাঙ্গিল। যখন পুরুষের বিবাদ ভাঙ্গিল, তখন তাহাদের স্ত্রীর বিবাদই বা কতক্ষণ থাকে? স্ত্রী গুই-সালিক দুইটাও পরস্পরকে ছাড়িয়া দিল; ও এক জোড়া গুই-সালিক উড়িয়া গেলে তখন দ্বিতীয় জোড়ার পুরুষটী আপন স্ত্রীর কাছে আসিয়া গাত্র ফুলাইয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া 'চ্যাঁ চ্যাঁ, ক্যাঁ ক্যাঁ' করিয়া কতই না জানি আপনার বীরত্বের কথা স্ত্রীকে জানাইল; এবং শেষে উড়িয়া গিয়া অশ্বত্থ গাছে বসিল। যতক্ষণ পুরুষ ভাত-সালিকটী এই বিবাদ-ভঞ্জন-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ তাহার কৃশাঙ্গী ও অনতিসুন্দরী পক্ষিণী কাকের নিকট দাঁড়াইয়া নিজ স্বামীর কার্য্য দেখিতেছিল। এখন, পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করুন, ভাত-সালিকটী মনুষ্যের ন্যায় কি না কার্য্য করিল! এবং তাহার ইচ্ছা, জ্ঞান, সহানুভূতি ও ঔদার্য্য ইত্যাদি গুণের কোন্ ভাবটী না প্রকাশ পাইল? ইহাকে কি "পক্ষীর জ্ঞান" বলিব?—না, আর কিছু বলিব?

যদি সালিকের ঐ সকল কার্য্যকে "পক্ষীর জ্ঞান" কিম্বা "জন্তুর জ্ঞান" বলিয়া উপেক্ষা করি, তবে মনুষ্যের সেই সমস্ত গুণ-গরিমার গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। কারণ, মনুষ্যেও সেই সমস্ত কার্য্য সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ হয়! প্রাণী-সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক শক্তির বিচার করিতে গেলে, কখনও একটী সাধারণ ব্যবস্থা ধরিয়া বিচার করা যায় না। কারণ, প্রত্যেক জীবে ভাবের বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে হয় বলিয়া,

তাহাদের প্রকৃতিও প্রত্যেক হইতে স্বতন্ত্র। তবে মনুষ্য কায চালাইবার জন্য আপন সুবিধা মত মোটামুটি কতকগুলি গুণ মনুষ্যে এবং কতকগুলি নিম্ন-শ্রেণীস্থ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রাণীতে অর্পণ করিয়া থাকেন। মনুষ্য আকার ধারণ করিয়াও অনেক মনুষ্য, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ, শৃগাল, কুক্কুর, বানর, এমনি কি তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবের সদৃশ ব্যবহারে, চিন্তাও আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি অল্প কিম্বা অধিক মাত্রায় ধারণ করে। অর্থাৎ সেই মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জগতের কোন কোন ভাব এরূপ অপরিস্ফুট যে, তজ্জনিত যে সুখ অপর মনুষ্য-দেহে হইতেছে কিম্বা সম্ভবে, তাহাও তাহাদের ভোগে হইতেছে না। আবার অপর পক্ষে দেখিতে গেলে যে মনুষ্যকে আধ্যাত্মিক শক্তির নানা ভাবের বিকাশের জন্য আমরা মানবের উপমান বলিতে পারি, তাঁহারও এরূপ অনেক ভাব-বিকাশের অভাব আছে, যাহা থাকিলে, তিনি হয়ত আরও উচ্চ জীবনের সুখ-ভোগের সমর্থ হইতেন।

আমরা এস্থলে "হয়ত" কথা প্রয়োগ করিলাম। কারণ, ঈশ্বরের অপর জগতে মনুষ্য হইতে অধিক আধ্যাত্মিক ভাব বিকাশিত জীব আছে কি না, জানি না। তবে আধ্যাত্মিক ভাবের ক্রমোন্নতি ও ক্রম-বিকাশে বিশ্বাস, নীচ জীব হইতে ক্রমোন্নতি দেখিয়াই হইয়া থাকে বলিয়া এ কথা কহিলাম। আমাদের এই কথায় যেন পাঠক মহাশয় এরূপ না বুঝেন যে, কোন এক ব্যক্তির জীবাত্মা, বৃক্ষ জন্মের পর কীট, মৎস্য, সরিস্থপ ইত্যাদি জন্ম, মরিয়া মরিয়া, প্রাপ্ত হইয়া শেষে মনুষ্য জন্মে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা সাধারণ কথায় কহিয়াছি যে, আধ্যাত্মিক শক্তি, ক্রমোন্নতিতে অসীম ভাবরূপে বিকাশিত হইতে পারে।

'এই পৃথিবীতে যে যে জীব-দেহ দৃষ্ট হয় সেই সেই দেহে যদিও এরূপ বিকাশ সম্ভব না হয়, তথাপি এমন কোন জীব-দেহ থাকিতে পারে যাহাতে ঐ অধিকতর উন্নত বিকাশ সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত সালিকের দৃষ্টান্তে, সকল সালিকের নাই হউক, ভাত-সালিকের আধ্যাত্মিক ভাব, অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষী হইতে যে কিছু উন্নত, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি। ঔপসিক-দেহচ্ছেদবিদ্‌গণ (Comparative Anatomysts.) পক্ষীর স্নায়ুদেহ সম্বন্ধে কহিয়া থাকেন, যে, পক্ষীর মস্তিষ্ক, সরিস্থপের হইতে বড়। কিন্তু স্তন্যপায়ীগণের মস্তিষ্কে যেমন ভাঁজ কিম্বা কুঞ্চন (Convolution) দৃষ্ট হয়, পক্ষীতে সেরূপ নাই; উহাদের দৃষ্টিশক্তি অতি তীব্র। দণ্ডোপবেশী পক্ষীগণের (যাহার মধ্যে একজাতীয় অন্তর্গত ভাত-সালিক) মস্তিষ্ক, পক্ষীগণের মস্তিষ্ক যতদূর উন্নত হইতে পারে, তদ্রূপ। উহাদের নিম্ন টুঁটি (Inferior Larynx) দ্বিভক্ত ও তাহার গঠন-প্রণালী অতি উন্নত; এই নিমিত্ত তাহাদের সুমধুর গান করিবারও শক্তি আছে। যখন সালিকের আভ্যন্তরিক গঠন এত উৎকৃষ্ট হইল, তখন যে সেই দেহে আধ্যাত্মিক ভাব অধিক প্রকাশিত থাকিবে তাহার আর আশ্চর্য্য নাই।

পক্ষী ছাড়িয়া স্তন্যপায়ী চতুর্হস্ত বানরের মধ্যে একটী স্নেহ ভাবের বিকাশের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের পরিচিত একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক, আসামের অন্তঃগত বড়পেটায় থাকিবার সময় একটা বানরী পুষিয়াছিলেন। তাঁহার বাসা বাটীতে একটী বিড়ালীর তিনটী শিশু হইয়াছিল। বানরী বিড়াল শিশু দেখিয়া, অত্যন্ত বাৎসল্য প্রবল হওয়াতেই হউক, কি অপর কোন ভাব মনে উদয় হওয়াতেই হউক, বিড়ালীর নিকট হইতে দুইটী শিশু চক্ষু না ফুটিতেই কাড়িয়া লয়; এবং দুই হাতে দুইটীকে ধরিয়া আপন বক্ষের কাছে চাপিয়া রাখে। যখন গৃহস্বামী তামাসা দেখিবার জন্য ঐ ছানা কাড়িয়া লইতে যাইতেন, তখন বানরী বুকের মধ্যে দুইটী বিড়াল ছানা ধরিয়া সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোন ক্রমেই ছাড়িবে না, এই ভাবে কাতরোক্তি করিত। কিন্তু যখন আমরা কাছে যাইতাম, তখন সে দন্ত বাহির ও হা করিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত। এইরূপে বানরী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ৫।৭ দিন বিড়াল শিশু দুটীকে রাখিয়াছিল। অকস্মাৎ একটী শিশুর মৃত্যু হইল। কিন্তু তখন অপর দুইটীই তাহার স্তনপান করিত। গৃহস্বামী পাছে বিড়াল শিশু দুইটীই মরিয়া যায় এই ভয়ে মধ্যে মধ্যে আর একটী বিড়াল শিশু আনিয়া বানরীর কাছে দিলে, তবে সে একটীকে ছাড়িয়া দিত; এবং তৃতীয়টীকে পাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে আপন স্তনের নিকট চাপিয়া রাখিত। গৃহস্বামী দেখিয়াছিলেন যে, বিড়াল শিশুকে কএকদিন ধরিয়া স্তনপান করানতে, বানরীর স্তনে দুগ্ধের ন্যায় কষের সঞ্চার হইয়াছিল।

শাস্ত্র-তত্ত্ব। ✓

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্যাধিষ্ঠিতম্॥

'তিনি সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিগণের পরম জ্যোতি-স্বরূপ (প্রকাশ-স্বরূপ), তিনি প্রকৃতির পর, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, তিনিই (বিবর্ত্তন দ্বারা) জ্ঞেয় স্বরূপ, তিনি জড় বস্তুর সহায়ে জ্ঞানের গম্য, তিনিই সকলের হৃদয়ে বিশেষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।"

গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে এই অল্প কথায় এক শ্লোকে এই যে উপদেশটি দিয়াছেন, ইহার মধ্যে অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে। অধ্যাত্ম-রাজ্যের অতি অপূর্ব্ব সত্য ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে অদ্য সে সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শাস্ত্রে স্থূলকল্পে জীবের জ্ঞাতব্য বিষয়ের তিনটি ভাগ করিয়াছেন। ১ম,—ক্ষেত্র, ২য়,—জ্ঞান, ৩য়,—জ্ঞেয়। মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি শক্তির সহিত যে এই স্থূল শরীর—ইহাকেই ক্ষেত্র বলিয়াছেন। আর যিনি এইরূপ প্রত্যেক দেহের অভ্যন্তরে থাকিয়া দেহ ও দেহমধ্যবর্ত্তী সমস্ত-তত্ত্ব সর্ব্বদা অনুভব করিতেছেন, তিনি জ্ঞান বা ক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ ব্যষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ লইয়া সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ যিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞের সমষ্টিরূপে ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত নিখিল ক্ষেত্রেতে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ও দেহান্তরবর্ত্তী তত্ত্বের অনুভব করিতেছেন তাঁহাকেই জ্ঞেয় বা ঈশ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। এই ঈশ্বর হইতে মায়ার বিকাশ, মায়া হইতে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের বিকাশ, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মন-চক্ষুরাদি দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং সুক্ষ্ম পঞ্চভূত (পঞ্চতন্মাত্র), পঞ্চভূত হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের বিকাশ হয়। এই পঞ্চস্থূলভূতেরই বিকার এই স্থূল দেহ। আর পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধ্যাদি হইতে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ চেতনা, ধৃতি প্রভৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। অতএব এখন বুঝা গেল এই সমস্তের সমষ্টি যাহা তাহাই ক্ষেত্র বা স্থূলদেহ।

জ্ঞান-সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন, শুনুন,—

অমানিত্ব মদাম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তি রার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্য মাত্ম বিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মন হঙ্কার এব চ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্॥
আসক্তির নভিষঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়িচানন্য যোগেন ভক্তির ব্যভিচারিণী।

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥

অর্থাৎ—অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, অহিংসা ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা শৌচ, স্থিরতা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার এবং এই সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখাদি দোষ দর্শন করা, পুত্র দারা এবং গৃহাদি বিষয়ে অনাশক্ত, অনভিসঙ্গ, ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্ব্বদা সম-জ্ঞান, জীবাত্মার অভিন্নভাবে সন্দর্শন করিয়া আমাতে (ভগবানে) অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞান চর্চ্চা এবং নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক ও জীবাত্মার পরমাত্মার অভেদজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়কে ভগবান জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন।”

অতএব যাহা ইহার বিপরীত, অজ্ঞান শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে ক্রমশঃ বিকার বা বিপরিণাম হইয়া যে এই স্থূল দেহ হইয়াছে, তাহারই যে প্রত্যখ্যানুভূতি তাহারই নাম জ্ঞান।

আমরা সংক্ষেপে ক্ষেত্র ও জ্ঞান কি, তাহা বুঝাইলাম। এখন জ্ঞেয় কি তাহা বুঝাইলেই উপস্থিত বিষয় সহজ হইয়া পড়িবে। অতএব জ্ঞেয় কি, তাহা এখন দেখা আবশ্যক। কিন্তু জ্ঞেয় বুঝান বড়ই সুকঠিন। যাহা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াতিত, বাক্য-মনের অগোচর অথচ জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহা লিখিয়া বা বলিয়া বুঝান একান্তই সুদূরূহ। সাধারণ উপায়ে বুঝা বা বুঝান একবারেই অসম্ভব।

শাস্ত্র দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্ম রাজ্যের তত্ত্ব অন্যের হৃদয়ঙ্গম করাইতে প্রয়াশ পাইয়াছেন। একটি স্বরূপ লক্ষণ, অপরটি তটস্থ লক্ষণ। একটি বাক্য বুঝাইতে অন্য একটি বাক্য প্রয়োগ করিলে যদি ঐ বাক্য-প্রয়োগ-প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত বাক্যে যাহা বুঝাইয়াছিল; শেষোক্ত বাক্যেও তাহাই বুঝায়, তাহা হইলে উহাকে স্বরূপ-লক্ষণ বিশেষণ বলে। যেমন মনে করুন, “অন্ন” বুঝাইতে যাইয়া যদি আমি “অন্ন” অর্থে “ভাত” বলি, তাহা হইলে অন্ন বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলাম ভাত বলিতে তাহাই বুঝিলাম। অথবা শূন্য পদার্থটি কিরূপ বলিলে যদি আমি বলি, শূন্যটা ফাঁক পদার্থ, ইহাতে ফাঁক কথাটির দ্বারা শূন্যের কোন অর্থই বুঝিলাম না। শূন্যও যাহা ফাঁকও তাহা। কিন্তু শূন্য পদার্থটি কি বুঝাইতে হইলে আমাকে বলিতে হইবে যে, দেখ ঐ গৃহের যেখানে গৃহভিত্তির শেষ হইয়াছে, উহাই ফাঁক বা শূন্য। তখন আমি ঐ ভিত্তির সাহায্যে আপনাকে শূন্য বুঝাইলাম। এইরূপ একের সাহায্যে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়ার নাম “তটস্থ লক্ষণ”-জনিত জ্ঞান। এখন ঈশ্বরকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র উক্ত দুই লক্ষণই অবলম্বন করিয়াছেন। যখন স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা বুঝাইলেন, তখন বলিলেন, তিনি সত্য-স্বরূপ, চিৎ স্বরূপ, তিনি আনন্দ-স্বরূপ ইত্যাদি। ইহাতে ঈশ্বরের বিশেষ কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু যখন বলিলেন, তিমি কর্ত্তা, তিনি বিধাতা, তিনি পালয়িতা, তখন তাঁহার পালয়িতৃত্ব, বিধাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্বাদি গুণের সাহায্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইল; সুতরাং ইহাকে তটস্থ লক্ষণ-জনিত ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলা হইল। তাহাই শাস্ত্র বলিয়াছে, তিনি,—

জেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মৃত মশ্নুতে।
অনাদি মৎ পরং ব্রহ্মন সত্তন্ন সদুচ্যতে ॥
সর্ব্বতঃ পাণি পাদন্তৎ সর্ব্ব তোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্ব ভৃৎ চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃ চ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।

ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদিসর্ব্বস্যধিষ্ঠিতম্ ॥

“এই মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি যত প্রকার প্রাণী আছে, ইহাদের যে হস্ত-পদাদি ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ সচেতন ভাবে কার্য্য করিতেছে, ইহার মূল কারণই তিনি; তিনি এই দেহ ইন্দ্রিয়াদি এবং সমস্ত জগতের মধ্যে অনুস্যূত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। লৌহাদি যেমন তাপ-সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তোমাদের মনাদিও তদ্রূপ তাঁহার সহিত মাখামাখি থাকাতে চেতন হইয়া কার্য্য করিতেছে। এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্ব-পানিপাদ-বিশিষ্ট, সর্ব্ব-নয়ন-বিশিষ্ট, সর্ব্ব-মুখ বিশিষ্ট, সর্ব্ব মস্তক-বিশিষ্ট ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে।

প্রাণীগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির সহিত তাহার তাপ ও লৌহের ন্যায় সম্বন্ধ থাকাতে যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে শক্তি সমস্তই তাহাতে আরোপিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক কিন্তু তিনি সর্ব্ব-ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি নির্লিপ্ত হইয়াও এতৎ সমস্ত ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার কোন প্রকার গুণই নাই, অথচ বায়ু ও আকাশের ন্যায় কেবল সম্বন্ধ মাত্রের দ্বারা তাঁহাকে সুখ দুঃখাদি গুণের ভোক্তা বলিয়া (জীবাদি অবস্থায়) গণ্য করা হয়। তিনি সমস্ত প্রাণী দেহের মধ্যেও বাস করিতেছেন, বাহিরেও অবস্থিত আছেন, আবার যাহার অন্তর বাহিরে তিনি বাস করিতেছেন সেই স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ-রাশিও তাঁহা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নহে। রজ্জু যেরূপ মিথ্যা সর্পাকারে পরিণত হয়, তিনিও সেই রূপ এই মিথ্যাভূত জগৎ-স্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। অথচ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুতরাং অবিজ্ঞেয়। তাই তিনি নিতান্ত সন্নিহিত বস্তু হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এক অভিন্ন, তাঁহার বহুত্ব নাই। তথাপি প্রতি দেহে মন ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধির পার্থক্য থাকাতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীব রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। তিনি এই সমস্ত জগতের পালয়িতা অর্থাৎ তিনি আছেন বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব আছে, এবং তিনি উৎপত্তির কারণ, অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব না থাকিলে জগতের বিকাশ হইতে পারে না। আবার রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান হইলে, যেরূপ সেই রজ্জুতে আরোপিত সর্প ভাবের বিনাশ হইয়া, কেবল রজ্জুই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ তাঁহাতেই সমস্ত জগতের বিলয় হইয়া থাকে। তিনি সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিগণের পরম জ্যোতি স্বরূপ (প্রকাশ স্বরূপ) তিনি প্রকৃতির পর, তিনি জ্ঞান স্বরূপ, তিনিই বিবর্ত্তের দ্বারা, জ্ঞেয় স্বরূপ, তিনি জড় বস্তুর সাহায্যে জ্ঞানের গম্য, তিনিই সকলের হৃদয়ে বিশেষ রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাই জ্ঞেয় পদার্থ।

এইরূপ দেহক্ষেত্রে জ্ঞানবীজ বপন করিয়া অনুরাগ-বারি সিঞ্চন করিলে তবে জ্ঞেয় ফল আস্বাদনে সক্ষম হইবেন। অতএব এই ত্রিতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হউন, তবেই মঙ্গল, নচেৎ মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব লোপ অবশ্যম্ভাবী।

অসাধারণ আত্মত্যাগ।

(১)

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরীর মধ্যে বড়ই সংগ্রাম চলিতে থাকে। আর, সেই সংগ্রামের এক দিন হঙ্গেরীর এক জন প্রধান সেনা-নায়ক অষ্ট্রীয়-সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দী হন; এবং অপর সৈন্যমণ্ডলী তদ্দর্শনে পলায়নপর হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লুক্কায়িত হয়।

সেই বন্দী সেনানায়কের নাম রেজী। রেজী হঙ্গেরী-সাম্রাজ্যের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার

মহনুভাবতার গুণে রাজ্যেশ্বর, সামান্য এক জন রাজ-কর্ম্মচারী হইতে তাঁহাকে সেনা-পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন; এবং রাজ্যের অর্থ-অনর্থ, বলাবল সকলই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত রাখিয়াছিলেন। এক কথায় কোথায় সেনা-নিবাস, কোথায় সৈন্য-মণ্ডলীর গুপ্তাবাস, কোথায় ধনাগার, কিরূপ রাজ্যের আয়-ব্যয় এ সকলই তাঁহার করতলস্থ ছিল। আর, সেই হেতুই চক্রান্ত করিয়া বিপক্ষগণ তাঁহাকে বন্দী করে। তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, রেঞ্জী বন্দী হইলেই রাজ্যের সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে; লুক্কাইত সৈন্যের সন্ধান লইয়া, অসহায় অবস্থায় তাহাদিগকে বন্দী করিব।

সুতরাং হঙ্গেরীয় সৈন্যের মধ্য হইতে বন্দী করিয়া, প্রথমে তাহারা রেঞ্জীকেই আপনাদের শিবিরে লইয়া আসিল। শিবিরে আনিয়া আপনাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রথমে রেঞ্জীকে কত লোভ দেখাইল। কিন্তু রেঞ্জীর অটল হৃদয় কিছুতেই তাহাতে টলিল না। তখন তাহারা তাঁহাকে নানারূপে ভয় দেখাইতে লাগিল; কখনও বা তাঁহার উপর বজ্রমুষ্টি, কখনও বা তাঁহার উপর কঠিন বেত্র-দণ্ড পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপিও রেঞ্জীর হৃদয় টলিল না; রেঞ্জী অটল অচল ভাবে নির্ব্বাক রহিলেন।

এইরূপ পীড়ন-অত্যাচারেও কয় দিন, কয় রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু তথাপিও রেঞ্জীর মুখ হইতে কোন উত্তর মিলিল না। তিনি এত পীড়ন—এত অত্যাচারের পরও, কেবল এই মাত্র উত্তর করিলেন,—"ও-সকল কথা বলিবার দিন এখনও আসে নাই। যখন দেখিব, শত্রুগণকে আমার স্বদেশবাসীগণ, আমার ন্যায় বন্দী অবস্থায় এইরূপ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে, তখনই এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় মনে করিব। তদ্ভিন্ন, কোনরূপেই উত্তর পাইবার আশা তোমরা আর করিও না।" এই বলিয়াই রেঞ্জী নিরুত্তর হইলেন।

তার পর, আরও দুই এক দিন কাটিয়া গেল। তখনও রেঞ্জীর মুখ হইতে কোন উত্তর নাই। কিন্তু দুরন্তগণ উত্তর পাইবার তখন এক নূতনতর উপায় স্থির করিয়া, সশস্ত্র রেঞ্জীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কি উপায়ে, কি কৌশলে রেঞ্জীর নাবালক ভ্রাতা ও অসহায়া ভগ্নীকে রেঞ্জীর সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিল,—"দেখ রেঞ্জী, আজ তোমার নিকট হইতে উত্তর পাইবার এই এক চূড়ান্ত উপায় স্থির করিয়াছি। যদি তুমি উত্তর দেও, তবে তোমাদের রক্ষা; তোমার জীবন বাঁচিবে, তোমার ভ্রাতা-ভগ্নীরও জীবন বাঁচাইব; আর, তোমাকে অস্ত্রীয়-রাজ-সংসারে সম্মানিত রাখিব। তদ্ভিন্ন, তুমি জানিও, এখনই তোমার সম্মুখে তোমার প্রিয়-তম ভাই-ভগ্নীকে হত্যা করিব, ও উহাদের রক্তে তোমাকে স্নান করাইব। আর, এও জানিও, তার পর, তোমার সংসারে তোমার আপনার বলিতে কাহাকেও রাখিব না। এই-রূপে তোমার স্নেহময়ী মাতা ও তোমার প্রাণ-সমা প্রণয়ণীকেও তোমার সম্মুখে বলী দিব।"

রেঞ্জী সকলই শুনিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নী করযোড়ে, তাঁহার চরণে ধরিয়া, কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"দাদা, প্রাণে বাঁচাও। তুমি না বাঁচাইলে আজ আর আমাদের রক্ষা নাই।" এই বলিয়া রেঞ্জীর ভ্রাতা ও ভগ্নী কাঁদিতে লাগিল।

রেঞ্জী কিন্তু তাহাতেও টলিলেন না। ভ্রাতা ও ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তোমরা এজন্য আমায় আর অনুরোধ করিও না। আমি আপনার সামান্য ভাই ও বোনের মায়ায়, আমার দেশের শত শত ভাই ও বোনকে কোন ক্রমেই হত্যা করিতে পারিব না। আর, তোম-

রাও যদি পরকালে আপনাদের মঙ্গল-কামনা কর, তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি,—আমায় আর অনুরোধ করিও না। প্রকৃত বীরের ন্যায়-ধার্ম্মিকের মত, ধর্ম্মকে স্মরণ করিয়া জীবন-উৎসর্গে অগ্রসর হও। তোমাদের প্রাণের বিনিময়ে যদি তোমাদের শত শত ভাই-বোনের প্রাণ রক্ষা হয়, তবে তাহা অপেক্ষা তোমাদের আর অধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে?" এই বলিয়া রেঞ্জী নীরব হইলেন ও কাহাকেও আর কোন উত্তর দিলেন না।

তখন কাজেই রেঞ্জীর সম্মুখে দুরন্তগণ রেঞ্জীর সেই আদরের ভ্রাতা ও ভগ্নীর জীবন নষ্ট করিল। রেঞ্জীকে বুঝাইল যে, তাহা অপেক্ষাও যদি কিছু গর্হিত কর্ম্ম করিতে হয়, তবে রেঞ্জীর মুখ হইতে উত্তর পাইবার জন্য, তাহাও তাহারা করিতে স্বীকৃত আছে। কিন্তু তথাপিও রেঞ্জীর অটল হৃদয় টলিল না। রেঞ্জী উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, তোমাদের যতদূর যা সাধ্য, কর।"

এই ঘটনার পর দিন, রেঞ্জীর সম্মুখে আরও এক ভয়ানক দৃশ্য উপস্থিত হইল। দুরন্তগণ সত্য সত্যই, কি জানি কিরূপ উপায়ে, রেঞ্জীর প্রাণসমা প্রণয়ণীকে তাঁহার সম্মুখে, সেই বধ্য-ভূমিতে আনয়ন করিল। বলিল,—"দেখ রেঞ্জী! এবারও যদি বল, তবেও রক্ষা আছে; নতুবা তোমার প্রণয়িণীকেও পূর্ব্ববৎ তোমার-সমক্ষে এখনই বলিদান করিব।" আর, সেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে রেঞ্জীর অভাগিনী প্রণয়ণীও তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "নাথ—নাথ, রক্ষা কর। তোমার জন্য, কি অপরাধে আমি মারা যাই? তোমার নিকট আমি তো কোন দোষেরই দোষী নই; আমি তো কখনও তোমায় কোন কষ্টও দিই নাই! তবে আমার প্রতি এ ব্যবহার কেন? বল না নাথ,—বল না উহাদিগকে, কোথায় হঙ্গেরীয় সৈন্যগণ কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত আছে! পরের জন্য নিজেদের এত লাঞ্ছনা-ভোগ কেন? অভাগিনী আমি, আমায় এত বিড়ম্বনা আর দিও না—আর দিও না—।"

পত্নী এই পর্য্যন্ত বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার কথায় বাধা দিয়া রেঞ্জী বলিতে লাগিলেন,—"ছি!—ছি! প্রিয়ে! একি বল? এই কি বিড়ম্বনা-ভোগ? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার যদি জীবন বাঁচে তবে তোমার মত আর কত অভাগীকে 'হা পুত্র!—হা পিতা! হা স্বামীন!' বলিয়া এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে! এখন তোমায় বাঁচাইয়া, বল দেখি, সে ক্রন্দন—সে গগন-ভেদী হাহাকার সহিব কিরূপে? আর, সেরূপ করিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া ধর্ম্মের নিকটই বা কি বলিয়া পরিচয় দিব? তাহা হইলে, জগতও কি গৃহ-শত্রুর দৃষ্টান্তে আমার নাম অগ্রে যোজনা করিবে না? কাজেই বলি, না—না—প্রিয়ে, আমায় আর অনুরোধ করিও না। যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি পরকালের ভয় থাকে, তবে এখনই অম্লান বদনে এই দস্যুদের হস্তেই জীবন অর্পণ কর।"—এই বলিয়াই রেঞ্জী অধোমুখ হইবেন; পত্নীর প্রতি বা বিপক্ষগণের দিকে আর নয়নও ফিরাইলেন না। তখনও কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে নানারূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ-ভিক্ষা চাহিলেন। অধিক কি, বিপক্ষগণকেও প্রাণদানের জন্য অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রেঞ্জীর ভ্রাতা ও ভগ্নীর ন্যায়, তাঁহার সম্মুখেই, তাঁহার প্রণয়ণীরও জীবন বিসর্জ্জিত হইল—তিনি চক্ষের উপর সে প্রাণান্তক দৃশ্যও সহ্য করিয়া গেলেন।

* * * *

তার পর—তার পর দিন। এই দিন রেঞ্জীর পরীক্ষার শেষ দিন। এ দিনের দৃশ্য পূর্ব্বা-

পেক্ষাও ভয়ঙ্কর—মৃত্যুপেক্ষাও প্রাণান্তক! এ দিন রেঙ্গীর স্নেহময়ী জননীকে লইয়া দুরন্তগণ সেই বধ্য-ভূমিতে উপনীত হইল। তাঁহাকে বলিল,—"আজ বীর, আজ তুমি কতদূর ধর্ম্ম-নিষ্ঠ দেখিব! তোমার গর্ভধারিণী স্নেহময়ী জননীকে আজ এই আনিয়াছি। যদি উত্তর দেও, তবে তোমার মঙ্গল। নতুবা মাতার প্রিয়-কার্য্যই করিলে, বুঝিবে! আর, তাহা হইলে তোমার সম্মুখে পূর্ব্ববৎ তোমার জননীকেও বধ করিব, এবং তার পর তুমিও—।"

এই পর্য্যন্ত শুনিতে শুনিতে, রেঙ্গী নিস্তব্ধ থাকিলেও, তাঁহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু আর সে কথা শুনিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া আসিল দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের কথায় বাধা দিয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"কি, কি! কি বলিস-আমার সমক্ষে আমার পুত্রের অমঙ্গলের কথা বলিস্! কঠিন হৃদয় আমার, তাই একথা শুনিয়া এখনও জীবিত রহিল। কিন্তু পাষণ্ডগণ, এরূপ, সুপুত্রের অমঙ্গল দেখিবার জন্য কখনই আর আমার প্রাণ বাঁচিতেছে না। তোরা বাঁচাইবার চেষ্টা পাইলেও, বিপক্ষ যখন তোরা তখন তোদের কথায় আমি আর বিশ্বাসও করিব না। যখন তোদের মনে এরূপ দুর্ভাবনার স্থান হইয়াছে, তখন তোরা নিশ্চিত জানিস, আমারও আর জীবন নাই—আমি মরিয়াছি। বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেও, পুত্রের অমঙ্গল দেখিতে, এ প্রাণ আমি আর রাখিব না।

"আর পুত্র রেঙ্গী, তোমাকেও বলি, আমার রক্তের বিন্দুমাত্রও যদি তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, আমার স্তন্য-দুগ্ধে যদি তুমি একদিন মাত্রও জীবন-ধারণ করিয়া থাক, আর আমাকে জননী বলিয়াও যদি তোমার অনুমাত্র ভক্তি থাকে, তবে কখনই তুমি প্রাণের মায়া করিও না। এ প্রাণ আর কয় দিনের জন্য? এখন, পরকালের 'অনন্ত প্রাণ' যাহাতে সুখে থাকে, পুত্র তুমি, অন্তিমে আমার তাই করা। আমি প্রাণত্যাগ করার পর, তোমার জীবন যায় যাউক; তাহাতে কোন ক্ষতি জ্ঞান করিও না। আজ আমি একেলা কাঁদিতেছি; কিন্তু প্রাণাধিক, যদি আজ আমার কান্নার নিবৃত্তি করি, তবে আমার মত কত শত অভাগীকে যে এই রূপে কাঁদিতে হইবে! তখন, তা' দেখিয়া প্রাণ রাখিব কিরূপে? কাজেই বলি, প্রাণের মায়া আর করিও না। আমার অন্তরের দিব্য, প্রাণের আশা আর রাখিও না।"

পুত্র রেঙ্গী এতক্ষণ সকলই স্থির ভাবে শুনিলেন; এবং জননীর বাক্য শেষ হইলে, উত্তর করিলেন,—"ধন্য আমি যে, এরূপ ধার্ম্মিকা জননীর গর্ভে স্থান পাইয়াছিলাম! যাইহোক, স্নেহময়ী মা আমার, এখন আমায় এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যেন আমি 'আপনার সন্তান' বলিয়াও জগতে পরিচয় দিতে পারি।"

উত্তরেই সুতরাং দস্যুগণ বুঝিল, আর উপায় নাই। কাজেই তাহারা সেইরূপ নৃশংসভাবে রেঙ্গীর সম্মুখে তাঁহার জননীকেও বধ করিল। রেঙ্গী তাহা ও দৃঢ়তার সহিত দেখিলেন। আর জগতও সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখিল, "অসাধারণ আত্মত্যাগ" কাহাকে বলে!

ফুল-রেণু।

হিমালয়।

(গান।)

মল্লার—মিশ্র।

ওহে হিমালয় নগপতি শান্তি-নিকেতন (চির)।
ঘরে ফিরে যেতে আর চাহে না যে মন।
যোগীন্দ্র-নিবাস তুমি, অনন্তের লীলা-ভূমি,
প্রশান্ত মূরতি তব নয়ন-রঞ্জন (চিত্ত-বিনোদন)।
তোমার উন্নত শিরে, শীতল নির্ঝর নীরে
শান্তি-সমীরণ সদা করে সঞ্চরণ।

তাহার পরশে হয়, চিদানন্দ রসোদয়;
হৃদয় আনন্দময়, অনন্তে মগন।
বিশাল বরাঙ্গে তব, আভরণ নব নব,
রজত তটিনী হার কুসুম রতন।
(কত বিচিত্র বরণ)
সুনীল আকাশ কোলে, সুমন্দ পবনে দোলে
শ্যামল সুন্দর ঘন নিকুঞ্জ কানন।
তুঙ্গ শৃঙ্গ গিরিবর, শুভ্রকান্তি মহীধর,
যেন জটাধারী হর ধ্যায় নিরঞ্জন।
চারি ধারে মেঘমালা, করে কত লীলা খেলা,
মধুর গম্ভীর তার ভীষণ গর্জ্জন।
পতঙ্গ বিহঙ্গগণে, গায় গীত বনে বনে;
বসিয়া বিজনে হরি করেন শ্রবণ।
ইচ্ছা হয় প্রাণ ভরি, হেরি সেরূপ মাধুরী;
ভেদ করি প্রকৃতির স্বচ্ছ আবরণ॥

দুঃখিনীর কথা।

চ'লে গেল, ছুঁয়ে গেল, কহিল না কথা;
নেতিয়ে পড়িল প্রাতে নত-মুখী লতা।
ঝরিয়া পড়িছে ফুল, ঝরিছে শিশির,
আকাশে উঠিছে মেঘ, কোথায় সমীর?
কোথা বিহঙ্গের কল, রবির কিরণ,
ষোড়শীর মৃদু হাসি কুসুম চয়ন;
কোথা পথিকের শ্রান্তি, রাখালের গান,
গেল—গেল, সব গেল, স্বপন সমান!
দুখ, দুখ, দুখ,
কোথা বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, কুঠার, কার্ম্মুক!

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

হিন্দুপ্রেস পঞ্জিকা।—দে ব্রাদার্স ক প্রকাশিত। সন ১২৯৬ সালের এই খানি নূতন পঞ্জিকা সম্প্রতি আমরা প্রাপ্ত ছি। পঞ্জিকাখানির আকার গুপ্ত-প্রেস কার ন্যায়; কিন্তু হরিদ্রাবর্ণ তুলোট কাগজে মুদ্রিত। পঞ্জিকাখানি দেখিয়া বোধ হইল যে, প্রকাশকগণ পঞ্জিকাখানির উন্নতির জন্য সমধিক চেষ্টা পাইয়াছেন; এবং এমন কি, তজ্জন্য বটতলা-অঞ্চল হইতে উহা মুদ্রিত হইলেও, সাহস করিয়া আমাদিগকে সমালোচনার জন্য প্রদান করিয়াছেন। যাইহোক, পঞ্জিকাখানির ছাপা ও কাগজ কিন্তু সাধারণ পঞ্জিকা হইতে ভাল; এবং দুই এক স্থল মিলাইয়াও ভুল তেমন পাওয়া গেল না। তবে কথা এই, পুস্তক খুঁজিয়া কোন স্থলেই তাহার দামের কথার উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। দাম বেশী হইলে কিন্তু ইহার কাটতির পক্ষে অন্তরায় ঘটিবে।

বিজ্ঞান বাবু।—বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি একখানি প্রহসন বলিয়া পরিচিত। আজ-কালকার নব্য সমাজ-সংস্কারক বাবুর দল "সংস্কার-সংস্কার" করিয়া যেরূপ দিশাহারা হইয়া বিড়ম্বিত হইতেছেন, এখানির উদ্দেশ্য, সংক্ষেপতঃ সেই চিত্র একবার লোকসমাজে দেখাইয়া লোকের চমক ভাঙা। লেখা-পড়া শিখিয়া, বিজ্ঞানে এম্, এ, পাস করিয়া, সংস্কারোন্মত্ত বাবুদিগের মতি যেরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া থাকে, তাহারই কএকটী ছবি গ্রন্থকার এই পুস্তকে আঁকিয়াছেন।

গ্রন্থকার এইরূপ কএকখানি চিত্র আঁকিয়াছেন, ভাল; অনেক স্থলে রঙও ফলিয়াছে। ফলতঃ তাঁহার এরূপ উদ্যম যে প্রশংসার্হ ও ও সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে কথা এই, চিত্রগুলি কিছু অতিরঞ্জিত; এবং ভাবের বৈজ্ঞানিকত্ব-হেতু সাধারণ পাঠকের পক্ষে উহা কিছু দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইল।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

এমারেল্ড থিয়েটার।—"আনন্দ-কুমার" নামক নূতন নাটক উক্ত রঙ্গালয়ে

আজকাল বেস সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে।) 'আনন্দ-কুমারের' ঘটনাটীও বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। 'আনন্দ-কুমার' একজন জমীদার সন্তান; ধার্ম্মিক ও প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচিত। তজ্জন্যই শাসনকর্ত্তাগণের রোষে পড়িয়া, এবং আর একজন তাঁহার স্বজাতি জমিদারের চক্রান্তে, বিনা অপরাধে রাজদরবার হইতে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সংক্ষেপতঃ এই আনন্দ-কুমারের স্থূল ঘটনা। ইহার মধ্যে চক্রান্তকারীগণের চক্রান্ত কৌশল ও আনন্দ-কুমারের ধর্ম্ম-প্রবণতার ছবি অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। এইরূপে একজন ধার্ম্মিকের প্রতি অধার্ম্মিকের অত্যাচার—বিশেষ একজন স্বজাতি জমিদারের যোগে, বড়ই প্রাণে লাগে। আর, এই জন্যই এ নাটকের জমজমা! বিশেষ, আনন্দ-কুমারের সেই ঘর-বিভীষণ-অপর জমিদারের তাঁহার প্রতি অত্যাচার—পাপীষ্ঠ কর্ত্তৃক আনন্দ-কুমারের সতী স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট পর্য্যন্তেরও চেষ্টা, বড়ই শোকাবহ। কাজেই (অভিনয় দেখিয়া অনেক স্থলেই মন অভিনয়-ভাবে আকৃষ্ট হয়। আর, অভিনেতা-অভিনেত্রী-সম্বন্ধে আনন্দ-কুমারের প্রতি-দ্বন্দী জমিদারের অভিনয়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পটুতা দেখা গেল। আর, বামা বৈষ্ণবীর গানগুলিও বেস মিষ্ট লাগিল। তবে অভিনয়ে দোষের ভাগও যে ছিল না, এমন নহে। কিন্তু সে দোষের দায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রী-গণ তত নহেন—নাটককারই তজ্জন্য বেশী দায়ী। আনন্দকুমারের দ্বারা প্রজার হিতকর কোন কার্য্য যদি প্রত্যক্ষে দেখান হইত, তবে তাঁহার প্রতি লোকের আরও অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারিত; কেবল "দেশের জন্য মরিলাম" একথা মুখে বলিলে তত প্রীতিপ্রদ হয় না। আর, সেই দুর্ব্বৃত্ত জমিদারের হস্ত হইতে তাঁহার স্ত্রীর ওরূপ উদ্ধারও কেমন কেমন অস্বাভাবিক ববিয়া বোধ হইল। এইরূপ আরও দুইএক স্থলে কিছু কিছু ত্রুটী আছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন মোটের উপর অভিনয় সুন্দর হইতেছে। শেষ কথা, আনন্দ-কুমারের অভিনয় দেখিয়া আমাদের সেই হতভাগ্য "নন্দ-কুমারকে" স্বতঃই মনে পড়ে।)

(জাতীয় নব-রঙ্গালয়।—আজকাল "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" ও "হিরন্ময়ী" নাটক উক্ত রঙ্গালয়ে বেশ অভিনীত হইতেছে। অদ্য স্থানা-ভাব; বিশেষ কথা বারান্তরে আলোচ্য।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

/ প্রতারণা প্রবঞ্চনা।

প্রতারণা নূতনতর!

'নিঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় বিএ (রাজবাটীর দেওয়ান) অনন্তপুর'।—এই নাম ও ঠিকানা দিয়া, 'নলিনী-প্রতিভা' নামক একখানি পুস্তকের মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন-সম্বলিত এক একখানি পোষ্টকার্ড আজকাল মফঃস্বলের অনেক ভদ্রলোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সে পোষ্টকার্ডের বিজ্ঞাপনের নানারূপ মন-মজান প্রাণ-ভুলান কথার মধ্যে লিখিত আছে,—"এই 'প্রতিভা' শ্রীযুক্ত মহারাজা নলিনীকান্ত রায় বাহাদুরের বংশজাত বংশ-গৌরব বর্দ্ধন-জন্য রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। এই গ্রন্থ অতি বৃহৎ সেই জন্য খণ্ডশঃ প্রকাশ্য। ৩৬ খণ্ডে ৯৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডের মাশুল ১০ হিসাবে মোট গ্রন্থের ১৶০ আনা।" সুতরাং পাঠক মহাশয়গণ বুঝুন বিজ্ঞাপনের ব্যাপার কিরূপ গুরুতর! যাইহোক, এই বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া গ্রাহকগণ কিরূপ ফল ভোগ করিতেছেন, দেখুন। এ সম্বন্ধে আমাদের পরিচিত মানভূম, পাতকুমের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যাদবলাল আদিত্য দেব মহাশয় লিখিয়াছেন,—"অত্রস্থানের শ্যাম নীরদ দাস গুপ্তের নামে একখানা কার্ড সহ উক্ত ভিঃ পিঃ প্যাকেট আসায়, লোভে পড়িয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন।

কিন্তু প্রথম প্যাকেট লওয়ার পর, অদ্য দুই মাস গত হইল, আর তিনি উক্ত পুস্তক এক খণ্ডও পাইলেন না। আর, পোষ্টকার্ডে পূর্ব্বরূপ নাম ধামের কারচুপী থাকিলেও, সে প্যাকেট এ, সি, সেন নামক এক ব্যক্তি ১৯২ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে পাঠাইয়াছে, জানা গেল।"

যাইহোক, এরূপ সকল কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া আমরা তো অবাক হইয়াছি। রাজা প্রভৃতি সকলই জাল বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। এরূপ সকল কি ঘটনা! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!—অদ্ভূত!

জগৎবাসী পত্রিকার বিরুদ্ধে

আজকাল অনুসন্ধান-সমিতিতে ও বঙ্গবাসী অফিসে রাশি রাশি অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তন্মধ্যে কেহ উপহার পাইবার লোভে গ্রাহক হইয়া উপহার পান নাই। কেহ টাকা দিয়া কাগজ ও উপহার কিছুই পান না, কেহ বা সাপ্তাহিক পত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া গ্রাহক হইয়া এখন পাক্ষিক জগৎবাসী পাইতেছেন, এবং কেহ কেহ বা জগৎবাসীর প্রকাশক (৯৮ নং গরাণহাটা বা টালার) রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষের নিকট অন্যান্য পুস্তকাদি কিনিতে গিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যাইহোক, রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষের নামে এরূপ সকল অভিযোগ নূতন নহে; আর, অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে আমরাও এ-সম্বন্ধে গ্রাহকদিগকে সতর্ক করিতে ত্রুটী করি নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, লোকে ঠকিলে আমরা আর কি করিব? অনুসন্ধানের কথায় প্রথম হইতে বুঝিয়া না চলিলে শেষে সকলকেরেই যে এই ফল অনিবার্য্য, ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে।

আদরিণী আপিসের আর এক কাণ্ড!

মেদিনীপুর হইতে বাবু শ্যামাচরণ রায় লিখিয়াছেন,—"আদরিণী-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বিশ্বাস মাসে মাসে এক এক খণ্ড করিয়া সম্পূর্ণ 'অধ্যাত্ম্য রামায়ণ' দিবেন বলিয়া গত বৎসর ফেব্রুয়ারিতে ১০ লইয়া দুই খণ্ড মাত্র দিয়া, পুস্তক দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ পত্র লেখাতেও আর পুস্তকও দেন না বা উত্তরও দেন না। বিশ্বাস মহাশয় এরূপ অবিশ্বাসের কাজ করিতেছেন কেন?'

বাগবাজার, আদরিণী-আপিসের বাবু রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস ও বাবু তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয়-দ্বয়-সম্বন্ধেও আমাদের আর অধিক কিছু বলিবার নাই। কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশের পক্ষে এই আশ্চর্য্য যে, বার বার তাঁহাদের প্রতারণার সংবাদ পাইয়াও লোকে আবারও তাঁহাদের নিকট ঠকিতেছে! 'অনুসন্ধান' সকলের হস্তে পড়ে না বলিয়াই হউক, অথবা লোভের আতিশয্য বশতঃই, লোকের এই দশা ঘটিতেছে, বোধ হয়।

গ্রাহকগণের দৌরাত্ম্য।

১। বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা-বৈঠকখানা-বাজারস্থিত বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক ও রাজপুর বৈদিকপাড়ার হরি-সভার সম্পাদক।—এই এক পণ্ডিতজী ও ধর্ম্মপরায়ণ হরিসভার সম্পাদক মহাশয় "অনুসন্ধানের গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে নানারূপে ক্ষতি গ্রস্ত করিয়াছেন। "আজ নয়, কাল" এইরূপে প্রথম কএক দফা হাঁটহাঁটি করাইয়া 'অনুসন্ধানের' দাম তো দেন নাই; তা ছাড়া শেষে আবার "আমি তো গ্রাহক হই নাই; করেন্সী-আফিসের কুঞ্জ বাবু যে অনুসন্ধানের গ্রাহক; তাঁহার নিকট বিল পাঠাইবেন।"—এইরূপ ভূয়া উত্তর দিয়া লোক ফিরাইয়া দিয়াছেন। অথচ বিলে সহি করিয়া নিজে বিল স্বীকার করিয়া শেষে আবার এই উত্তর! যাইহোক, অন্যে একরূপ ব্যবহার করিলে আমরা তত দুঃখিত হইতাম না, কিন্তু বালকদিগের শিক্ষাদাতা ও বিশেষ হরি-সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে এরূপ ব্যবহারে আমরা বড়ই কষ্ট বোধ করি। আও

এক কথা রাজপুর ও হরিনাভির আরও দুই একজন পদস্থ লোক আমাদিগের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন; তজ্জন্যও আমরা বড়ই দুঃখিত আছি। আশা করি, তাঁহাদিগের কথা আর কাগজে কহিতে হইবে না;—এই পণ্ডিত মহাশয়ের দৃষ্টান্তেই তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য-জ্ঞান হইবে।

সংবাদ

—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মিঃ বি, এল, গুপ্ত ফরিদপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ-পদে পাকা হইয়াছেন; এত দিন ছিলেন, একটীং।

—হরেন্দ্রবিহারী ঘোষ নামক একজন জুয়াচোর হামিল্টন কোম্পানীর আপিসে গিয়া, আপনাকে নড়াইলের রাজাদিগের একজন প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেয়: এবং উহাঁদিগের নিকট হইতে নয় শত টাকা মূল্যের একটি অঙ্গুরী কিনিয়া, সঙ্গে লোক পাঠাইলে বাসায় গিয়া টাকা দিতে স্বীকৃত হয়। কোম্পানীর এক-জন কেরাণী আপিস হইতে তাহার সঙ্গে আসেন। পরে দুরন্ত চাঁপাতলার গলিতে একটী বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া, গৃহিণীকে অঙ্গুরী দেখাইবার ভান করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তার পর একেবারেই ডুব। কেরাণী বাবু আর তাহার সন্ধানই পাইলেন না; সে বাড়ীরও কেহই তাহাকে চিনিলেন না। সে কোন গতিকে সকলের চক্ষে ধুলি দিয়া খিড়কি দিয়া পলাইয়াছিল। যাইহোক, কিছু পরে পুলিষের কৌশলে দুষ্ট ধরা পড়িয়াছে এবং বিচারে তাহার ছয়মাস জেল হইয়াছে।

—কাঠকে লৌহাপেক্ষাও দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার এক সুন্দর উপায় এই,—তিসির তেলে পাথরিয়া কয়লার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া কাঠের উপরে লাগাইতে হয়। তাহা হইলেই সেই কাঠ অনেক দিন অক্ষত ভাবে থাকে। মাটীতে পুতিয়া রাখিলেও এক পুরুষে তাহার কিছু হয় না।

—রবার গলাইতে হইলে এইরূপ প্রক্রিয়া করিতে হইবে। একটি জলপূর্ণ কড়ার উপর একটি হাঁড়ি স্থাপন কর; সেই হাঁড়িতে রবার রাখিয়া দাও; পরে জলপূর্ণ কড়ার নীচে অল্প উত্তাপ দিলেই রবার গলিয়া যাইবে। জুতাওয়ালার শিরিশও এই প্রক্রিয়ায় গলাইতে হয়।

—পারস্য দেশে একরূপ অদ্ভুত রকমের সাময়িক বিবাহ হইয়া থাকে। এক দিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, ছয়মাস বা তাহার অধিক কালের জন্য তথায় বিবাহ হইয়া থাকে। যাহারা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহারাই প্রায় এইরূপ বিবাহ করিয়া থাকে। কোন পুরুষে কোন রমণীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইলে সে কন্যার পিতাকে কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া বিবাহের বন্দোবস্ত করে। বন্দোবস্ত হইলেই পুরোহিত ডাকাইয়া বিবাহ-কার্য্য শেষ হয়। বিবাহের চুক্তির কাল ফুরাইয়া আসিলে স্বামীর হস্ত চুম্বন করিয়া স্ত্রী বিদায় হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

—রুষিয়ার সাইবিরিয়া প্রদেশে সম্প্রতি এক দিন এমন ভয়ানক শীত পড়িয়াছিল যে, অন্যূন দুইশত লোক রক্ত জমিয়া মারা পড়িয়াছে!

—দলীপসিংহ রুশিয়া ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ফ্রান্সে আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংরাজদিগকে তাড়াইবার জন্য উদ্যোগ হইতেছে; অধিকাংশ এতদ্দেশীয় রাজা বিপ্লব-পতাকা উড়াইতে প্রস্তুত আছেন। এখন এসব বাতুলতা মাত্র!

—যশোহরের মহারাজপুর নামক স্থানে এক গাঁইট-কাটা একদল বরযাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া রাত্রিকালে শাল, ঘড়ি, চেন প্রভৃতিতে হাজার টাকা হস্তগত করিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। লোকটা ভদ্র-বেশধারী জুয়াচোর।

—পৃথিবীর মধ্যে ইউনাইটেড ষ্টেটসেই অধিকসংখ্যক পোষ্ট অফিস আছে। প্রতি বৎসর তথায় দুই হাজার করিয়া পোষ্ট অফিস বাড়িতেছে।

—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান গির্জ্জা হইতেছে রোমের সেণ্ট পীটার। ইহাতে ৪৯ হাজার লোক ধরে। ইহার নীচে মিলানের গির্জ্জা, ইহাতে ৪৭ হাজার লোকের বসিবার স্থান হয়। তন্নিম্নে রোমের সেণ্ট পল, ইহাতে ৩২ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। তাহার নীচে লণ্ডনের সেণ্ট পল, ইহাতে ২৬ হাজর লেকের স্থান হইতে পারে। রোমের সেণ্ট পীটার গির্জ্জার ভিতর বাহিরে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার লোক ধরে।

—রুষিয়ার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, মানুষের চর্ব্বির বাতির আলোকে চোরে দেখিতে পায়; কিন্তু আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সম্প্রতি চারি জন কৃষক একটী বালককে সংহার করিয়া তাহার চর্ব্বির বাতিতে আলোক জ্বালাইয়া যেমন এক গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করে, অমনি সকলে পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে।

অনুসন্ধান।

—:•(০)•:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩০এ ফাল্গুন, ১২৯৫ সাল। [১৫শ সংখ্যা।

ভক্তের গান।

ভৈরবী—পোস্তা।

আমার মন ভুলা'লে যে কোথা আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে,
ফিরে চাই আশে পাশে।
পেলাম পেলাম দেখ্‌লাম তাঁরে,
এই সে বলে ধরি যাঁ'রে,
বুঝি সে নয়, সে হ'লে পরে
আর কি মন ফিরে আসে?
বল্ দেখি রে তরু লতা,
আমার জগৎজীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্ নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে?
বল্‌রে বল্ বিহঙ্গকুল,
তোরা কা'র প্রেমে হ'য়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে,
উড়ে যাস্ কার উদ্দেশে?
বল দেখি রে হিমাচল,
তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল,
কা'র অনুরাগে মিসে?
পেয়ে বুঝি রত্নবর
সিন্ধু নাম ধরেছিস্ রত্নাকর,
তা[illegible] তরঙ্গ তুলে,
[illegible]হইল।
নৃত্য করিস্ উল্লাসে॥
লুকিয়ে থেকে প্রেম করে
এমন প্রেম ত দেখি না রে,
দেখা পেলে সুধাই তা'রে,
কেন সে ভালবাসে!
কোথা আছ দেখা দেও,
করুণা নয়নে চাও,
হৃদয়-সখা সাধ পুরাও,
প্রকাশি হৃদিবাসে॥"

মহাপুরুষই বটে!

কলিকাতায় সম্প্রতি এই এক অদ্ভুত রকমের জুয়াচুরী হইয়া গিয়াছে। বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার কোন আপিসে কাজ করেন। সাধু সন্ন্যাসীগণের প্রতি তাঁহার বড়ই ভক্তি; কলিকাতায় কোন সাধু মহাত্মার সমাগম হইয়াছে শুনিলে, তিনি অগ্রে সে সাধু-দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। ইতিমধ্যে

একদিন তাঁহার নিকট কে যেন আসিয়া বলিল,—'কলিকাতার জগন্নাথ-ঘাটে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন; তাঁহার নিকট কাতারে কাতারে লোকজন গমন করিতেছে।' ইহা শুনিয়া শরৎ বাবুর আর আনন্দের সীমা রহিল না। আপিসের ফেরতা, আপিসের কাপড়-চোপড় পরিয়াই তিনি সাধু-দর্শনে বহির্গত হইলেন।

কিন্তু জগন্নাথ-ঘাটে গিয়া দেখিলেন, সাধু সেখানে নাই। একটী ভদ্রবেশ হিন্দুস্থানী বাবু সেই ঘাটের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি কিন্তু বলিলেন যে,—"সাধু মহাপুরুষ এতক্ষণ এখানে ছিলেন বটে; কিন্তু শুনিলাম, আমরা আসার ক্ষণেক পূর্ব্বেই তিনি ওই (অনতিদূরস্থ একটী রাস্তার প্রতি লক্ষ্য করাইয়া) রাস্তার ভিতর ৫৬ নম্বর বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছেন। চলুন মহাশয়, আমিও তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি,—এক [illegible] এখনই দেখিয়া আসিব। শুনিলাম মহাশয়, সেরূপ জ্ঞানী মহাপুরুষ নাকি বিরল।"

যাইহোক, হিন্দুস্থানী বাবুটীর কথায় শরৎ বাবুকে কিন্তু ভিজিতে হইল। তিনি সেই বাবুটীর সহিতই সাধু-দর্শনে চলিলেন। এই রূপে খানিক দূর যাইয়া তাঁহারা ক্রমে সেই নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর দরজায় একজন বেহারা বসিয়া ছিল; সে সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল; এবং বলিল,—"সাধু-সন্ন্যাসী-জী উপরমে হ্যায়।" কাজেই তাঁহারা দুইজনেই উপরে উঠিতে চলিলেন।

উপরে গিয়াই কিন্তু চক্ষুস্থির! সঙ্গের বাবুটী চকিতের ন্যায় যে সেই বাড়ীর মধ্যেই কোথায় অদৃশ্য হইলেন, তাহার আর স্থির হইল না। অধিকন্তু সাধু-দর্শনের পরিবর্ত্তে শরৎ বাবু দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব জিনিস! তিনি দেখিলেন, সে বাড়ীর চারিদিক নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ; কেবল তাঁহার সম্মুখের ঘরের মধ্যে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে, ও তত্রত্য একখানি খাটিয়ার উপর একটী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক শুইয়া রহিয়াছে—তাহার পার্শ্বে এক ধারে কতকগুলি মদের বোতল, একটী গ্লাস এবং সময়োপযোগী কিছু চাটনি শরৎ বাবুকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সে বলিল,—"আরে বাবু যে! আসুন,—আসুন।"

শরৎ বাবু তো বিষম বিপদে পড়িলেন! কি যে উত্তর দেন বা কি যে করেন, তাহা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। যাইহোক, ভ্রান্তি-ক্রমে কোন বেশ্যার বাড়ী আসিয়াছি, এই [illegible] অতঃপর সেখান হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন তাঁহাকে ছাড়ে কে? সেই স্ত্রীলোকটী তখন বিছানা হইতে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে শরৎ বাবুর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল,—"তা বাবু ভয় কি!—বসোই না এসে! আমি তো আর নতুন নই!"

শরৎ বাবু তখন আরও বিপদে পড়িলেন। কোন রূপে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; তাহাকে বলিলেন,—"আপনি আমার মা,—আমায় ছাড়িয়া দেন।" তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটী একটু রাগভাব প্রকাশ করিয়া উত্তর করিল,—"কি [illegible] আমোদ করিতে আসিয়াছিস্; কিন্তু টাকা দেবার নাম নাই! এখন, টাকা দেবার বেলায় 'মা—মা—মা'। যা', আমি তোর ওকথা শুনতে চাইনে। তোর কাছে যা' কিছু আছে, আগে দে; তারপর তোকে ছাড়িব।" বিষম বিভ্রাট! শরৎ বাবু আর কি করেন? সুতরাং পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেলেন। কিন্তু সে তা কিছুতেই শুনিল না; বলিল,—"এক টাকার কাজ নয়; তোর কাছে যা' কিছু আছে—কাপড়চোপড় পর্য্যন্তও ছাড়িয়া দিয়া যা'। নহিলে আমি কিছুতেই তোকে ছাড়িতেছি না। অধিক কি, কথা না শুনিলে, আমার দলবল ডাকাইয়া এখনই তোকে উচিত শাস্তি দিব।"

শরৎ বাবুর মুখে আর বাক্য নাই। তিনি আপিসের ফেরত সন্ন্যাসী দেখিতে আসিয়া [illegible]ভত বিপদে পড়িয়াছেন! যাইহোক, সঙ্গে যা' কিছু ছিল, সুতরাং তাঁহাকে সবই দিতে হইল। পাপীষ্ঠা স্ত্রীলোক সকলই গ্রহণ করিয়া অতঃপর তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইবার পথ দেখাইয়া দিল। শরৎ বাবু শেষে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিলেন। আর বলা বাহুল্য, [illegible] পাঠকগণও অবশ্যই ইহাতে মনে [illegible] লেন যে, এও একরূপ 'মহাপুরুষ দর্শন' বটে!

জুয়াচোরের তীর্থ-যাত্রা।

প্রথমাংশ।

মহাদেব প্রসাদ কানপুরের এক জন জমিদারের পুত্র। সপরিবারে তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া ইনি প্রথমে দ্বারকা, বদ্রিনারায়ণ, [illegible]বন্ধ প্রভৃতি তীর্থ সকল পরিভ্রমণ করিয়া [illegible]শেষে প্রয়াগ-তীর্থে আগমন করেন। [illegible]নি যখন স্বদেশ পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে [illegible]য় দুই সহস্র মুদ্রা সঙ্গে করিয়া বহির্গত হন। [illegible] অর্থের দ্বারা যদিও তাঁহার নিজের, পরি[illegible]রের ও দাস-দাসী সকলের সমস্ত খরচ-পত্রের [illegible]লান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি [illegible]হার উপর তাঁহার বৃদ্ধ পিতার আদেশ ছিল [illegible], যদি কোন প্রকারে আরও অধিক টাকার [illegible]য়োজন হয়, তাহা হইলে যে কোন প্রধান [illegible]রীতে কোন প্রধান ব্যবসায়ীর নিকট হুণ্ডি [illegible]খিয়া দিলেই, তথনই তিনি টাকা পাইতে [illegible]রিবেন।

মহাদেব প্রসাদ মহাতীর্থ প্রয়াগের সমস্ত [illegible]য্য সমাপন করিয়া, মৃজাপুরে বিন্দুবাসিনীকে [illegible]নি পূর্ব্বক পুণ্যভূমি ৺ কাশীধামে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার বাসোপযোগী একটী গৃহ ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থান পূর্ব্বক, সেই স্থানের আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এমন সময় গোবিন লাল নামীয় এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। গোবিন লালও এক জন তীর্থ ভ্রমণকারী বলিয়া মহাদেব প্রসাদের নিকট আপন পরিচয় প্রদান করিল; ও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার তাঁহারই অনুগত ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। মহাদেব প্রসাদ উহার ব্যবহারে দিন দিন অতিশয় সন্তুষ্টই হইতে লাগিলেন; এবং সেই সময় হইতে উহাকেও আপনার অনুচরবর্গের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন। গোবিন লাল তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের খরচেই অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, ক্রমে গয়া-ধামে উপনীত হইল। সেই স্থানের শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে সকলে অতঃপর বৈদ্যনাথ দর্শন-পূর্ব্বক কলিকাতায় আসাই স্থির করিলেন। মহাদেব প্রসাদেরও ইচ্ছা যে, কালীঘাটে গমন পূর্ব্বক কালীমাতাকে দর্শন করিয়া স্বদেশ-অভিমুখে প্রত্যাগমন করেন।

গোবিন লাল এত দিন পর্য্যন্ত মহাদেব প্রসাদের সহিত একত্র নানা স্থানে গমন, একত্রে রাত্রিদিন অবস্থান করিতে করিতে মহাদেব প্রসাদের সমস্ত খবর তাহার জানিতে কিছুমাত্র বাকি রহিল না। মহাদেব প্রসাদ কাহার পুত্র, তাঁহার পিতা এখন কি অবস্থায় কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের কি প্রকার বিষয়াদি আছে ও তাঁহাদের পিতাপুত্রে কিরূপ সদ্ভাব, তাহা সমস্তই ক্রমে সে জানিতে পারিল। অর্থাৎ এত দিন পর্য্যন্ত সে যে নিমিত্ত তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন পূর্ব্বক মহাদেব প্রসাদের সেবা সুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল, এখন তাহার সে সমস্ত ইচ্ছাই পূর্ণ হইল।

কলিকাতায় আগমন করিয়া মহাদেব প্রসাদ তাঁহার জানিত একটী স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোবিনলালও সেই স্থানে থাকিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোথায় যে বহির্গত হইয়া যাইত, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। তবে গোবিনলাল যতদিন মহাদেব প্রসাদের নিকট অন্যান্য স্থানে ছিল, ততদিন কিন্তু ক্ষণমাত্রও অনুপস্থিত থাকিত না; কেবল কলিকাতায় আসা পর্য্যন্তই এইরূপ মধ্যে মধ্যে অনুপস্থিত থাকিতে তাহাকে দেখা গেল।

ক্রমে মহাদেব প্রসাদের কলিকাতার সমস্ত কার্য্য সমাপন হইয়া গেল। কালীদর্শন প্রভৃতির আর কিছুই বাকি রহিল না। তখন তিনি সপরিবারে আপন দেশে গমন করিবার নিমিত্ত ষ্টেষণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিনলালও অদ্য তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্যান্য স্থানে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল; মহাদেব প্রসাদ অতিশয় কষ্টের সহিত তাঁহার বিদেশীয় বন্ধুকে বিদায় দিয়া সুতরাং গাড়িতে উঠিলেন। গোবিনলাল অতঃপর কলিকাতাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিল।

মহাদেব প্রসাদ পরিশেষে নিয়মিত সময়ে আপন দেশে উপস্থিত হইয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। পিতা তাঁহাদিগকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"যাহা হউক, তোমরা যে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছ, ইহাই মঙ্গল। কিরূপ বিপদে পড়িয়া আমাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছিলে! তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে না পারিয়া আমি অতিশয় ভাবিত ছিলাম। যাহা হউক, এখন যে নিরাপদে তোমাদের মুখ দেখিতে পাইলাম, ইহাই মঙ্গল।"

মহাদেব প্রসাদ এই কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"পিতঃ আপনি [illegible] শত টাকা ও বিপদের কথা যে কি বলিলেন, তাহার কিছুই আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

জীবের দায়িত্ব।*

পরে যখন বিড়াল-শিশুর চক্ষু ফুটিল এবং সে অল্প বড় হইল, তখন বানরী বোধ হয় তাহার নখের আঁচড় সহ্য করিতে পারিত না এই জন্যই, আর বিড়াল-শিশুকে স্তন দিত না। এই ঘটনা ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে ঘটে।

এখন, মনুষ্যের মধ্যে বিশেষতঃ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক ও বেশ্যার মধ্যে, বিড়াল পোষা, তাহাকে বুকে করিয়া রাখা, এমন কি স্তন দিতে দেখা যায় কি না, ও শুনাও যায় কি? বানরী যে ভাব দেখাইল, তাহা অনুকরণ-শক্তিরও কার্য্য হইতে পারে, বাৎসল্যেরও হইতে পারে। এই বাৎসল্য ভাব সকল জীবেই কিছু না কিছু পরিমাণে আছে। তবে বানরীর কথা কেন, তাহার সঙ্গে তো মনুষ্যের অনেক ভাবের সাদৃশ্য আছে! কেন কোন কীটেও ঐ ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। আমরা মাকড়সাকে দেখিয়াছি, দেওয়ালের এক স্থলে একাদিক্রমে এক পক্ষ কাল পর্য্যন্ত, বক্ষে ডিম্বের চারি লইয়া স্থির ভাবে, বোধ হয় অনাহারে থাকে। পতি-সোহাগিনী কপোতী যদি আপন কপোতকে অন্য কপোতীর নিকট গিয়া গলা ফুলাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রেমানুসন্ধান করিতে দেখে, তখন সে ডিম্বোপরি উপবিষ্টা থাকিলেও তাহা ছাড়িয়া, দ্বিতীয় কপোতীকে পাখসাট মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। ইহা যাঁহারা পায়রা পুষিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় কখন দেখিয়া থাকিবেন। হরিদ্রাবর্ণের প্রজাপতির মধ্যে দেখিয়াছি, যখন কোন পুষ্পে একটী মধুপান করিতে বসে, যদি সেই সময় আর একটী তাহার সেই পুষ্পের নিকটে আইসে, অমনি

সে দ্বিতীয়টীকে আক্রমণ করিতে যায়; এবং তাহার পিছনে পিছনে বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া একেবারে গাছ-ছাড়া করিয়া দেয়। এইরূপে নিম্ন জীবের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, সহানুভূতি, প্রেম, স্নেহ, এমন কি অল্প চিন্তা ভাব-বিকাশের ও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা পাঠক মহাশয়গণের সমক্ষে আনিতে পারি। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, যে সকল আধ্যাত্মিক ভাবের বলে মনুষ্য কার্য্য করিয়া আপনার দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করেন, সেই সমস্ত ভাবের মধ্যে অনেকেরই বিকাশ সকল প্রাণীর মধ্যে ইতর বিশেষে, পূর্ণরূপে কিম্বা অসম্পূর্ণ-রূপে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ কাহারও সুপ্ত, কাহারও জাগ্রত, কাহারও অর্দ্ধ-জাগ্রত। আমরা নিকৃষ্ট জীবের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া তাহাদের শক্তির অভাব দেখিয়া হাস্য করি, কিম্বা তাহাদের কার্য্য "পাশব জ্ঞানের" ফল বলিয়া উপেক্ষা করি। কিন্তু যদি অপর কোন জীব মনুষ্যের অপেক্ষাও অধিক উন্নত-ভাবাপন্ন থাকেন, তবে তাঁহারাও আমাদের দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য ও হিতাহিত জ্ঞানের কার্য্য দেখিয়া 'মানবীয় জ্ঞান' বলিয়া হাস্য করিয়া আমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন।

এইরূপে এক জীব অপর জীবের আধ্যাত্মিক ভাবের উপেক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির মূলে সাম্যভাব বিদ্যমান। বৈষম্য ভাব-প্রযুক্ত কার্য্য ও গতি উৎপন্ন হইতেছে। চৈতন্যের প্রাণ, জ্ঞানাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশও জীব জগতের প্রকৃত অবস্থা নহে; উহারাও সমভাবতার বৈষম্য ভাব মাত্র। এই বৈষম্য ভাবে জগতের কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে বলিয়াই, সকল জগতের কি আধ্যাত্মিক, কি পদার্থিক প্রাণ আবার সুপ্তাবস্থার দিকে যাইতেছে। অর্থাৎ বৈষম্যকে সমভাবে আনিতে এই সংসারে সমস্তই বন্দোবস্ত ঠিক আছে এবং তদনুসারে অহরহ কার্য্যও চলিতেছে সাম্যই সকলের মূল অবস্থা। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য্য নৈপুণ্য যে, বৈষম্য হেতু জীব দেহে চৈতন্যের বিকাশ হইলেও তাহাতেই আবার সামঞ্জস্য ও সাম্যের ভাব দেখাইয়াছেন। বাহ্যজগতে সাম্য ভঙ্গে যেরূপ শক্তির পরিদর্শন হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক সেই রূপে শক্তির ভাব প্রকাশ হয়। বহির্জগতে প্রক্রিয়া দ্বারা সাম্য ভঙ্গ করিয়া শক্তির ভাব দেখাইতে পারি, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান আমাদের অতি সঙ্কীর্ণ; সুতরাং আমরা উহাকে আয়ত্তাধীন করিতে কিম্বা উহার উপর প্রক্রিয়া চালাইতে পারি না। উত্তাপ সকল বস্তুতেই আছে, তড়িৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। আমরা প্রক্রিয়া দ্বারা বৈষম্য জন্মাইয়া ঐ দুই শক্তির কার্য্য দেখাইতে পারি; কিন্তু চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমরা ক্ষমতাহীন বলিয়া দেখাইতে পারি না। বৈষম্য না হইলে কখনই কার্য্য আরম্ভ কিম্বা ভাব প্রকাশ যে হয় না ইহা আমরা সাহস করিয়া কহিতে পারি। প্রাণই বলুন, কি অপরাপর আধ্যাত্মিক ভাবই বলুন, চৈতন্যের বৈষম্য না হইলে কখনই জাগ্রত বা প্রকাশ হয় না। চৈতন্যের বৈষম্য, কি রূপে, কি ভাবে ও কখন এবং কি হইলে যে কি ভাব দেখাইবে, তাহাতে মনুষ্য এ পর্য্যন্তও নিজের বুদ্ধিবলে অতদূর সূক্ষ্মদর্শী হয়েন নাই। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যেমন পাদার্থিক শক্তির বৈষম্য জনিত কার্য্য প্রকাশ হইতে গেলে একটী সীমা বা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ জীব-দেহে চৈতন্য ভাব বিকাশ হইতে গেলেও শক্তির একটী সীমা বা পরিমাণ আছে। অর্থাৎ শক্তি সেই পর্য্যন্ত সেই অবস্থায়, সেই ভাবে দাঁড়াইলে চৈতন্যের কোন বিশেষ ভাব জাগ্রত হইবে।

পাঠকবৃন্দ আমাদিগের "চৈতন্য" ও শক্তি"

---

* বর্ত্তমান বর্ষের ১৩শ ও ১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

এই দুইটী কথার প্রয়োগে পাছে গোলমাল দেখেন, এই জন্য কহিতেছি যে, "শক্তি" একটী সাধারণ কথা; এবং "চৈতন্য" জীব সম্বন্ধেই সর্ব্বদা প্রয়োগ করা যায়। আমরাও জীবের কথায়ই চৈতন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি; এবং প্রাণ, সংজ্ঞাদিকে তাহার ভাব বলিতেছি, তাহারাও কিছু চৈতন্য হইতে পৃথক্ বস্তু নহে।

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইল যে, জীব-দেহে চৈতন্যের যে কোন ভাবেরই হউক না কেন, যদি বিকাশ দেখা যায়, তাহাকে আধ্যাত্মিক শক্তির বৈষম্য ভাব কহিব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বাহ্য জগতে চৈতন্য আছে কি না, ও সেই চৈতন্য সুপ্ত না জাগ্রত? আমাদের এ প্রবন্ধে সেই সমস্ত বৃহৎ কথার সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া উদ্দেশ্য নহে। আমরা প্রথমেই কহিয়াছি যে, ঈশ্বরকে মূলে রাখিব। এবং শক্তির অস্তিত্ব আমরা তজ্জন্য অবশ্য স্বীকার করিব; এবং সেই শক্তি জীবদেহে যে বৈষম্য প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে (যথা সুপ্ত জাগ্রত, অৰ্দ্ধ-জাগ্রত,) প্রকাশিত হইতেছে তাহাই কহিতেছি।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে অতি সূক্ষ্ম বস্তু হইতে অতি বৃহৎ পদার্থ পর্য্যন্ত সকল বস্তুর মধ্যেই একটা আক্রোশের (ধস্তাধস্তির) কার্য্য চলিতেছে; বৃক্ষ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকল জীব-দেহেই সেই ধস্তাধস্তি নিরীক্ষিত হয়। এই সমস্ত ঘটনাই শক্তির সাম্য ভঙ্গের বিকাশ মাত্র। অথচ আবার দেখিতেছি, এই সাম্য-ভঙ্গের মধ্যেও আবার সুন্দর সম্বন্ধ ও ভাবের সাম্য ভাব দেদীপ্যমান আছে। আহা! সৃষ্টির মনোহারিত্ব তো এই সাম্যের মধ্যে বৈষম্য, ও বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ভাব! ইহা এক অদ্ভুত প্রহেলিকা, এবং ইহাই প্রকৃত দেখা যায়। আমাদের মতে শক্তি এক মাত্র। সেই শক্তি বৈষম্য প্রযুক্ত বাহ্য দুইটী পৃথক ভাবে প্রকাশিত, (১) পার্থিব শক্তি, (২) আধ্যাত্মিক শক্তি। উহারা কার্য্যে বিপরীত ভাব দেখাইলেও উহাদের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আধ্যাত্মিক শক্তিও এক মাত্র হইলে, বাহ্য দৃশ্যে পরস্পরের বিপরীত ভাবে তাহাতে বর্ত্তমান থাকিতে পরিদৃষ্ট হয়। ক্রোধ, করুণা, হিংসা, ভয়, সাহস, প্রেম বা স্নেহ, কঠোরতা, সমস্তই বিপরীত ভাব হইলেও, উহাদের এত সান্নিদ্ধ্য সম্বন্ধ যে, একটী ভাবের চূড়ান্ত সীমা পার হইলেই অপর ভাবে গিয়া সাম্য হয়। কারণ, যখন যাবতীয় ভাব, বিকার-হেতু অর্থাৎ সমতার বিনষ্ট-হেতু প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন তাহাকে সাম্যাবস্থায় আনিবার অবশ্য এক ভাব থাকা চাই। এবং সে ভাব যে প্রকৃত পক্ষে আছে তাহা আমরা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আধ্যাত্মিক ভাব সকলের কথা অতি জটিল, এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ এত সূক্ষ্ম যে, বহু চিন্তা করিয়াও মনুষ্য তাহার ঠিক করিতে সমর্থ হয়েন না। (ক্রমশঃ)

সাধু বামাচরণ।

সাধু-দর্শন চরিত্র-গঠনের একটি প্রধান উপায়। আমাদের বোধ হয় সর্ব্ব-প্রধান উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এক সাধু-দর্শন দ্বারা সমস্ত তমোরাশি বিলুপ্ত হয়। সাধু-মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ের জীবগণ এই পরম সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। শাস্ত্র বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সাধু-সহবাস লাভ করে তাহার কোন তপস্যা বা ব্রতাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। কেবলমাত্র সাধু-সহবাস ও তাঁহার সেবার দ্বারায় মোক্ষ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব সাধু-দর্শন একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে না। সাধুরা অধি-

কাংশই ছদ্মবেশী হইয়াছেন। সহজে আর কিছুতেই ধরা দিতে চাহেন না। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত সাধু অতি অল্পই ধরিতে পারিয়াছি। চারিদিকেই কেবল ভণ্ডের দৌরাত্ম্য। এই সাত নকলের মধ্য হইতে সাঁচ্চা দ্রব্য বাহির করিয়া লইতে হইবে! সুতরাং বিষম সমস্যা। অদ্য আমরা যাঁহার বিষয় আলোচনা করিব তিনি যে একজন আদর্শ পুরুষ, তাহাতে কোন মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করা একরূপ অসম্ভব।

তারাপুরের * বামাচরণ বলিলে বোধ হয় আমাদের ন্যায় অনেক সংসারীই তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন না। কারণ, বামাচরণ কখনও গগন-ভেদী বক্তৃতা দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিতে দেশ-বিদেশে বিচরণ করেন নাই। বরং পাছে লোকে জানিতে পাইয়া বিরক্ত করে এইজন্য বামাচরণ আরও পাগল সাজিয়াছেন। তারাপুরে তারামাকে দেখিবার জন্য সহস্র যাত্রী সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে; কিন্তু বামাচরণকে দেখিয়া আসে কয়জন? সকলেই জানে, বামা-ক্ষেপা। কিন্তু বামার মত যদি ক্ষেপা জুটে, তবে বামার ক্ষেপামি বুঝিতে পারে। আর তুমি পাষণ্ড হৃদয় হয়ত বামাচরণকে দেখিয়া অসভ্য বলিয়া চাবুক লাগাইতে চাহিবে; কিন্তু যদি তুমি একবার বামাচরণের সেই অভ্রভেদী তারা-শব্দ শ্রবণ কর, তুমি স্তম্ভিত হইবে; তোমার রোমাঞ্চ হইবে; যতই কেন পাষাণ হৃদয় হউক না, নিশ্চয়ই আর্দ্র হইবে। তুমি সাধুর সম্মান জান না; সুতরাং সাধু চিনিতে পার না।

তুমি বামাচরণকে চিনিতে পার চাই না পার, বামাচরণ কিন্তু তাহার তোয়াক্কা রাখে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বামাচরণের ইচ্ছাই যে, তাঁহাকে যেন কেহ কখন বিরক্ত না করে। সেই জন্যই বামাচরণ কখন নিবীড় জঙ্গলের মধ্যে গগনভেদী তারা তারা শব্দে অরণ্য বিকম্পিত করিতেছেন; কখন বা পূতিগন্ধ-পরিপূর্ণ শিবা-সারমেয়াদির আবাস-স্থল মহা-শ্মশান-ভূমিতে বসিয়া নরমুণ্ড-মালা স্কন্ধদেশে ধারণ করিয়া সদ্য-নিক্ষিপ্ত সবোপরি উপবেশন করিয়া অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিতেছেন; আর মুখে কেবল তারা নাম উচ্চারণ করিতেছেন। শিবাগণ নির্ভয়ে বামাচরণকে বেষ্টণ করিয়া মৃত দেহ অবলীলাক্রমে ভক্ষণ করিতেছে। বামাচরণের কোন দিকেই দৃষ্টি নাই। অনিমেষ নেত্রে যেন তিনি কি এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছেন আবার ঐ দেখুন, বামাচরণ এবার যথার্থই ক্ষেপিয়াছেন। বামাচরণ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য; যেন মত্তহস্তী লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নর-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মানব-দৃষ্টির বহির্ভূত কোন দুর্লক্ষ্য দেশে ছুটিতেছে। মুখে সেই 'মা তারা' শব্দ। দেখিতে দেখিতে বামাচরণ তারামন্দিরে যাইয়া উপস্থিত। তারা-মন্দির লোকে লোকারণ্য। একটি তিল ধারণেরও স্থান নাই। কিন্তু বামাচরণের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায় কে? সে গতি রোধ করে কে? সকলেই সসম্ভ্রমে বামাচরণকে পথ ছাড়িয়া দিল। কেহ অস্পৃশ্য পাগল বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কেহ বা তাঁহার অবস্থার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু স্ত্রীলোক-মাত্রেই ভক্তি ভরে বামাচরণের চরণ-প্রান্তে অবলুণ্ঠিতা হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল।

ধন্য ভারতবর্ষ! কেন না, এখনও এই ঘোর পাপের রাজ্যেও আমাদের মহামায়া-স্বরূপা ভারত-ললনাগণের হৃদয় আর্য্যজন-সুলভ ভক্তিরত্নে সুশোভিত রহিয়াছে। আর

* বীরভূম জেলান্তর্গত রামপুরহাট রেলওয়ে ষ্টেষণের সন্নিকটে তারাপুর অবস্থিত। তারাপুর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

ধন্য আমরা যে এখনও এই সমস্ত দেবী-প্রতীম স্ত্রী-মূর্ত্তীগণের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। আর, তাহাতেই আমরা ভরসায় বুক বাঁধিরা এখনও ভাবিতে পারিতেছি যে, কালে বুঝি বা ভারত-জননি আবার রত্ন-প্রসবিনী হইতে সক্ষমা হইবেন!

এত কাণ্ড হইয়া গেল তথাপি বামাচরণ সংজ্ঞা-হীন। তিনি বরাবর কাহাকেও কিছু না বলিয়া মণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মুল মালিকের আদেশ, বামাচরণকে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; বামাচরণ যথা-ইচ্ছা বিচরণ করিবেন। সুতরাং তিনি একেবারে মায়ের সিংহাসনের উপর উঠিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভক্তের কি অপূর্ব্ব সাহস! কি প্রবল প্রতাপ! সাধারণ মনুষ্য যে সিংহাসনের শত হস্ত দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ধীরে ধীরে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিতেও ভীত হয়, ভক্ত কিনা আজ নির্ভয়ে নিঃশঙ্কায় সেই অনন্ত-শক্তি-শালিনী জগতমাতার কোলে উঠিল। সে শোভা যে দেখিয়াছে, আমাদের মনে হয়, তাহাদের বুঝি আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। বামার দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে, আর বামা চুপি চুপি বলে—"মা! সকল সময় দেখা দিস্ না কেন মা! আমি যে তোরে এক মুহূর্ত্ত না দেখিয়া থাকিতে পারি না! এই যে শ্মশানে কোলে নিয়ে ব'সে ছিলি কিন্তু আমি যেই ঘুমিয়ে গেলেম, আর তুই ফেলে পালিয়ে এলি? তুই ছা'ড়লে আমি ত ছাড়ব না মা!" ক্ষণপরেই দেখি, বামাচরণ আরক্ত লোচনে ভীষণ মূর্ত্তিতে কোল ছাড়িয়া মায়ের হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইয়া মাকেই কাটিতে উদ্যত; যেন আব্‌দেরে ছেলে মায়ের উপর রাগ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে! আর, আপন মনেই কত কি বলিতেছে। এমনি ভাবে কথা কহিতেছেন যে, শুনিলে মনে হয়, মা জগদম্বা বুঝি কিছু বলিয়াছেন ও বামা তাহারই উত্তর দিতেছে। ঠিক যেন মাতা-পুত্রের কথোপকথন চলিতেছে। বামাচরণের প্রতি তাকাইলে নিশ্চয়ই মনে হয়, যেন মৃণ্ময়ী মা আজ চিন্ময়ীরূপে ভক্তের আব্‌দার শুনিতেছেন; এবং প্রতি আব্‌দারের যথোচিত উত্তর দিতেছেন। মায়ের সহিত কথার শেষ হইল ক্রমে বামাচরণ তখন সজোরে সিংহাসন হইতে এক লম্ফ প্রদান করিয়া হাস্য মুখে করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে আবার সেই শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

বামাচরণের নিত্য ক্রিয়া এইরূপ। তাঁহার যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তিনি সমস্তই মা জগদম্বার নিকট যাইয়া প্রার্থনা করেন। আহারের সময় মায়ের নিকটেই আহার যাচ্ঞা করেন; সাধনে কোন রূপে অক্ষম হইলে মায়ের নিকটেই যাইয়া বল প্রার্থনা করেন। সংক্ষেপতঃ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাঁহার প্রয়োজন বোধ হয়, তখন তাহাই তিনি তারা-মার নিকট মায়ের ছেলের মত আব্‌দার করিয়া ধরেন। মায়ের নিকট হইতে যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যেন মা তাঁহার আব্‌দার শুনিয়া যথোচিত প্রতিকার করিয়াছেন। বামাচরণ তারা-মা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, জানিতেও চাহেন না। মা ছাড়া আর কাহাকেও ভ্রূক্ষেপও করেন না। চাই তুমি মহারাজাধিরাজ হও, আর নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও দীনহীন হও, কাহারও সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসেন না। যাইহোক, তাঁহার সম্বন্ধে একটি অতি আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়াছি সেইটি উল্লেখ করিয়া অদ্যকার মত আমরা এইখানেই বামাচরণের ইতিহাস সমাধা করিব।

বামাচরণ প্রতিদিন ক্ষুধার সময় আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া থাকেন,—"মা

আমার খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দে।" এই সময় পূজকেরা প্রায় তথায় থাকিতেন। বামাচরণ আসিয়া দাঁড়াইলেই তাঁহারা তাঁহাকে প্রসাদ দিতেন। কিন্তু বামাচরণের ক্ষুধা না হইলে তিনি কখনই আসিতেন না। সুতরাং কোন কোন দিন তাঁহার আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইত। তজ্জন্য পূজকেরা বড়ই বিরক্ত হইতেন। একদিন বামাচরণের আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পূজকেরা সমস্ত প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিয়া আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তার পর বামাচরণ আপনার ইচ্ছামত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে ভব-কলুষনাশিনী ভক্ত-হৃদোন্মাদিনী জগতমাতা দণ্ডায়মানা। বামাচরণ ডাকিলেন—"মা! আমার বড় খিদে পেয়েছে। তোর প্রসাদ পাব বলে ছুটে এলাম, আমায় প্রসাদ দে না মা!" এইরূপে একবার, দুইবার, ক্রমে তিন বার আস্তে আস্তে বামাচরণ মাকে ক্ষুধা জানাইল। কিন্তু পূজকেরা আজ ত তথায় নাই! সুতরাং কে বামাচরণের কথা শুনিবে!—কেই বা তাঁহাকে প্রসাদ দিবে? প্রসাদ ত সব ফুরাইয়া গিয়াছে! যাইহোক, যখন বারম্বার; 'মা! মা!' বলিয়া ডাকিয়াও প্রসাদ পাইলেন না, তখন ভক্তের মুখ গম্ভীর হইল, চক্ষু দুইটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। বামাচরণ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মা! আমার বড়ই খিদে পেয়েছে। তুই ভিন্ন যে বামার আর কেহই নাই! তুই যদি আমার ক্ষুধার সময় চুপ করে থাকিবি, তবে আমায় আর কে খেতে দিবে!" এইরূপে নানা মতে মাকে বলিয়াও যখন মনোরথ পূর্ণ হইল না, তখন বামাচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন—"দেখ মা! তুই ত জানিস্ যে আমি তোর প্রসাদ না হইলে কিছুই মুখে তুলি না; আর তুই না দিলেও খাই না। জেনে-শুনে যখন আমায় খেতে দিলিনে, তখন [illegible] বামা পালালো, চল্লো! যখন তুই সেধে গিয়ে শ্মশান হতে আমায় ধরে এনে আদর করে খাইয়ে দিবি, তবে আমি আবার তোর প্রসাদ খাব। নইলে আর বামাচরণ এক গণ্ডুষ জলও মুখে দেবে না।"—এই বলিয়া বামাচরণ শ্মশানে যাইয়া বসিলেন। একাশনে এক মনে চক্ষু বুঁজিয়া বামাচরণ একবারে নিস্পন্দপ্রায় হইয়া বসিলেন। ক্রমান্বয়ে দিবস-ত্রয় অতিবাহিত হইল, তথাপি বামাচরণের সংজ্ঞা নাই।

তখন মা ভক্ত সন্তানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বুঝিলেন। তৃতীয় দিবস রাত্রিতে দিঘাপতিতে * নিদ্রাবস্থায় রাজা স্বপ্ন দেখিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়াই রাজা দাওয়ানকে ডাকাইয়া বলিলেন—"আমি গত রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন তারা মা তারাপুর হইতে আসিয়া আমায় জাগাইয়া বলিলেন যে, তুমি এখানে সুখে নিদ্রা যাইতেছ, আর আমি আজ তিন দিবস তারাপুরে উপবাসিনী। তোমার পূজকেরা আমার ভক্ত বামাচরণকে উপবাসী রাখিয়াছে। আমিও ভক্তের আহার না হইলে জলগ্রহণ করি না। সুতরাং আমি আজ তিন দিবস অনাহারে কাটাইতেছি। তুমি সত্বর যাহাতে আমার ভক্ত আর কষ্ট না পায়, তাহার সুব্যবস্থা কর।' স্বপ্ন-দর্শনাবধি আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে এবং মনে নানারূপ আশঙ্কার উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব তুমি অদ্যই তারাপুরে রওনা হও। তুমি যাইয়া বামাচরণের সুব্যবস্থা করিয়া আমায় সত্বর সংবাদ দিলে তবে আমি জল-গ্রহণ করি।"

দাওয়ানজী রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তারাপুরে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ক্ষোভে, বিস্ময়ে ও ভয়ে তাঁহার শরীর আতঙ্কিত হইল। তিনি অনেক সাধ্য-সাধনার পর বামা-

* দিঘাপতির রাজাই তারাপুরের অধিপতি এবং তারা মন্দিরেরও মূল সেবক।

চরণের ধ্যান ভঙ্গ করাইলেন। ধ্যান ভাঙ্গিবা-মাত্র বামাচরণ দাওয়ানজীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—'কেমন মা! এইবার তো সাধ্‌তে হলো। বামা কি তোর তেমনি ছেলে?"

দাওয়ানজী সেইবার হইতে বামাচরণের জন্য অতি সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসিলেন। বামাচরণ যখন যাহা বলিবেন, সকলকে তাহাই শুনিতে হইবে। বামাচরণের প্রতি কেহ কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না। বামাচরণের প্রতি কেহ কোন অত্যাচার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তারাপুর হইতে বহিস্কৃত করা হইবে। এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া দাওনাজী চলিয়া গেলেন।

ধন্য ভক্তের মহিমা! ভক্তের অসাধ্য সংসারে কিছুই নাই!

অদ্ভুত প্রত্যুপকার।

পরোপকার কখনই নিষ্ফল যায় না। উপকার করিলেই তাহার প্রত্যুপকার আছে। পৃথিবী যতই কেন পাপভারে ভারাক্রান্ত হউক না, কিন্তু উপকারীর প্রত্যুপকার জগৎ-পিতা জগদীশ্বর স্বয়ংই করিয়া থাকেন। অধিক কি, জগতের ইতিহাসে যেখানে যে দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহার প্রায় স্থলেই এই কথার সার্থকতা লক্ষিত হয়। সম্প্রতি এই কথার বিশিষ্ট-প্রতিপাদক, কোন সাধু-প্রমুখাৎ-শ্রুত, একটী গল্প এস্থলে প্রকটিত হইতেছে। দেখুন, পাঠক-পাঠিকে, সে গল্পের মধ্যে কি মহীয়সী শিক্ষা ও অকৃত্রিম জ্ঞানের বীজ নিহিত রহিয়াছে! সে গল্পটীর * সারাংশ এই ;—

এক ধর্ম্মভীরু দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি মাত্র পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণ মৃত্যুর সময় পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া যান যে, সুখে-দুঃখে, সম্পদে বিপদে যেন ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি থাকে; আর, পরোপকার যেন তাঁহার জীবনের ব্রত হয়। এইরূপ ভাবে সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে, তাঁহার ভাবী জীবন অতি সুখময় হইবে; এবং রাজসম্মানিত হইয়া তিনি রাজকন্যা লাভ করিবেন।

পুত্রকে রোরুদ্যমান দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সস্নেহে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন,—"বৎস, কাঁদিও না, পৃথিবীর নিয়মই এই! ধর্ম্মে মতি রাখিও, সাধ্যানুসারে পরোপকার করিতে কখন উদাসীন থাকিও না। অনেক কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গেলাম, গৃহের নিম্নে তাহা প্রোথিত আছে। তাহার উপসত্ত্ব হইতে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিও; পরলোকে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

যথা-সময়ে বৃদ্ধ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। যথা-বিহিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ-শান্তি সম্পন্ন করিয়া পুত্র অশৌচ হইতে মুক্তি হইলেন। বিশ্ব-সংসারে এখন তাঁহার আপন বলিতে কেহ নাই। গার্হস্থ্য-আশ্রম তাঁহার নিকট বড়ই অশান্তিময় বিরক্তিকর বোধ হইল। মন-প্রাণ সদাই হু-হু করিয়া জ্বলিতে থাকে! পিতৃশোকে পুত্র অধীর হইলেন। শিশু-বয়সেই তাঁহার প্রাণ উদাস হইল, মনে বৈরাগ্যের ছায়া পড়িল। মনে মনে শেষে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের বাসনাই বলবতী হইল। অদম্য সঙ্কল্প শেষে কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। স্বর্গীয় পিতার উপদেশানুসারে মৃত্তিকা হইতে সেই প্রোথিত টাকার অবশিষ্টাংশ দুইশত টাকা লইয়া যথা-সময়ে সেই সংসারবিরাগী বালক-রত্ন স্বদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইলেন। অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রজনীতে কাহার উদ্দেশে

* 'কর্ণধার' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এই গল্পটি কোন সাধক-প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া অনুসন্ধানের জন্য পাঠাইয়াছেন।

ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া মনে মনে কি প্রার্থনা করিলেন; সে ব্যক্তি যেন তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন,—সন্তান-ভাবে যেন ইঙ্গিতে কি প্রকাশ করিলেন। বালকের হৃদয়ে তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, দেহে বল আসিল, মন-প্রাণ শান্তি-রসে পরিপ্লুত হইল। আহা, ধর্ম্ম-ভীরু দরিদ্র জীবন কত মনোহর!

শিশু বৈরাগী ক্রমে পথ বাহিয়া চলিতেছেন। বহুদূর অতিক্রম করিয়া তিনি এক ভীষণ শ্মশানের সম্মুখীন হইলেন। তথায় একটী লোক-বিগর্হিত লোমহর্ষণ ঘটনা দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল; মনে যুগপৎ ক্রোধ, ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব উদয় হইতে লাগিল। শ্মশান-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কয়েক জন লোক একটি শব দাহ করিতে আসিয়াছে; চিতা প্রজ্বলিত, কিন্তু তাহাতে শব নাই—সে শব ভূমে পড়িয়া আছে। শব-দাহকারী ব্যক্তিগণ উল্লিখিত শব-দেহে অতি নিষ্ঠুর পিশাচের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। কখনও শ্মশানস্থ কতকগুলি অস্থি-কঙ্কাল আনিয়া শবের হৃদয়ে বিদ্ধ করিতেছে; কখনও অতি দুর্গন্ধ-ময় গলিত মাংসপেশী, মল-মূত্র প্রভৃতি ন্যক্কার-জনক অপবিত্র বস্তু তাহার মুখ-মধ্যে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা পাইতেছে, কখনও বা কঠিন বংশ-খণ্ড দ্বারা শবের সর্ব্বাঙ্গে অতি প্রচণ্ডরূপে প্রহার করিতেছে। এই দয়াবিহীন নর-চর্ম্মাবৃত পশুদিগের পৈশাচিক কার্য্য দর্শনে বালকের হৃদয় ব্যথিত হইল, ভীতকণ্ঠে তিনি পিশাচদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?—আর এই মৃত ব্যক্তিই বা কে? কি কারণ কেন এ শব-দেহের নির্য্যাতন করিয়া তাহাকে অপবিত্র করিতেছ?" রোষ-কষায়িত লোচনে—কর্কশস্বরে তাহাতে এক ব্যক্তি উত্তর করিল—"তুমি কে হে বাপু! যাও এখানে ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ কর না!"

বালক সন্ন্যাসী।—"বলিতে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার কৌতুহল নিবৃত্তি করুন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল,—'শুনবে?—এই ব্যক্তি আমাদের খাতক। বেটা জীবনকালে আমাদের নিকট হইতে দুই শত টাকা ধার লয়; কিন্তু তাহা পরিশোধ করিতে পারে নাই। টাকা গিয়াছে, আর তো তাহা পাইবার কোন উপায়ই নেই! এখন এই রকমে টাকার শোধ তুলি।''—এই বলিয়া সেই নরপিশাচ-মূর্ত্তি-চতুষ্টয় পুনর্ব্বার শবদেহে সেইরূপ নির্য্যাতন করিতে লাগিল।

তৃতীয় ব্যক্তি প্রহার করিতে করিতে শবের উদ্দেশে কহিল,—''বেটা, এই রকম 'নাস্তানাবুদ' করবার জন্যেই, ঘরের পয়সা খরচ ক'রে তোমার সৎকার করতে এনেছি। এখন ফলভোগ কর। কেমন বেটা!" চারিদিক হইতে শব-দেহে আবার প্রহার-বৃষ্টি হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য হতভাগ্যের আত্মীয়-স্বজন আর কেহই ছিল না।

দয়ার্দ্রচিত্ত, উদার হৃদয়, ধর্ম্ম-শিশু এই কথা শুনিয়া প্রাণে দারুণ বেদনা অনুভূত করিলেন। ব্যথিত হৃদয়ে, ভগ্নস্বরে কহিলেন, —"ভাইসব, ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। নিরর্থক 'মড়া উপর খাঁড়ার ঘা' দিবার আবশ্যক কি? উঁহাকে নিগ্রহ করিলে টাকা তো আর ফিরিয়া আসিবে না। আচ্ছা, আমি ইঁহার পরিবর্ত্তে তোমাদিগকে দুইশত টাকা দিতেছি। এখন তোমরা ইঁহার যথা-বিহিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন কর।" এই বলিয়া সেই মহান্ পরোপকার-ব্রতাবলম্বী বালক তাহাদিগকে সেই সঞ্চিত পিতৃধন দুই শত টাকা প্রদান করিলেন।

* * * * *

সমস্ত রাত্রি পর্য্যটন করিতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ-প্রযুক্ত ঠিক প্রদোষ-সময়ে শিশু সন্ন্যাসী এক স্রোতস্বতী-তীরে বসিয়া স্নিগ্ধ প্রাতঃ-সমীরণ সেবন করিতে লাগিলে ন

প[illegible] বন। এই সময়ে সেই অরণ্যানী ভেদ করিয়া—দিগ্মণ্ডল ব্যাপাইয়া একটী সুস্বর, তাললয়-সংযুক্ত মধুর গীতিধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। গভীর উদাত্ত-ভাব-পূর্ণ সাধন-সঙ্গীতে বিমোহিত হইয়া সেই ভক্ত শিশু অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কিছু দূর যাইয়া জানিতে পারিলেন যে, একটি সাধু সন্ন্যাসীর শ্রীমুখ হইতে উক্ত সাধন-সংগীত গীত হইতেছে। সম্মুখীন হইয়া গীত-সমাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর সাধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে যথাবিহিত স্বাগত কুশল সংবাদাদির পর উভয়ের অনেক কথা হইল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভক্তি ও স্নেহের উৎস খুলিয়া গেল। অতি অল্পকালের মধ্যে উভয়ের প্রণয় অতি গাঢ় হইল। যেন কতদিনের পরিচিত!—উভয়ের মধ্যে কত আত্মীয়তা!

* * * * *

এক বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে বসিয়া একটি বৃদ্ধা অজস্র ধারে কাঁদিতেছে, আমাদের পরিচিত সন্ন্যাসীদ্বয় সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। আমরা এখন হইতে ইঁহাদিগকে সত্যব্রত ও সত্যসখা আখ্যায়িকা প্রদান করিলাম। সত্যব্রত অরণ্যস্থ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, আর সত্যসখা আমাদের সুপরিচিত শিশু-সন্ন্যাসী। বৃদ্ধার পায়ে একটি তীক্ষ্ণ-ধার কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল। সত্যব্রত ইহা জানিতে পারিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভিক্ষার ঝুলি হইতে একটি ঔষধ-প্রলেপ দিলেন; দিবা-মাত্রই ঔষধের আশ্চর্য্য গুণে তৎক্ষণাৎ কণ্টক বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধা সুস্থ হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে কতই অনুনয়-বিনয় ভাব দেখাইতে লাগিল: শেষে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ আপন কাঠের ঝুড়িটী সন্ন্যাসীদ্বয়কে উপহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সত্যব্রত সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া তাহা হইতে মাত্র কি একটা গাছের কাঁচা ডাল—অনেক দ্রব্যগুণ জানিতে পারিয়া, তুলিয়া লইলেন; এবং কিছুদূর যাইয়াই একটা মৃত পাখীর পাখা কুড়াইয়া লইলেন। সত্যসখা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাই, এ দুই দ্রব্যে তোমার কোন্ সিদ্ধি হইবে?" সত্যব্রত কোন উত্তর করিলেন না। উভয়েই বহুদূর অতিক্রমে ক্রমে ভিন্নরাজ্যে উপনীত হইলেন।

রাজপথের একস্থানে বিস্তর জনতা দেখিয়া অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া জানিতে পারিলেন যে, স্থানীয় রাজকন্যা মহা আড়ম্বরে শিবপূজায় যাইবেন। তাহা দর্শনার্থ সকলে সমবেত হইয়া উৎসুকা-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য, ইঁহারাও রাজকন্যা দর্শনার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথা-সময়ে রাজনন্দিনী বিবধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া অসংখ্য মণিমুক্তায় সুসজ্জিত অগণ্য রূপদাসী সমভিব্যাহারে দর্শন দিলেন। আমাদের সত্যসখা কিন্তু রাজদুহিতা দর্শনে মোহিত হইলেন। স্বর্গীয় পিতার পূর্ব্বস্মৃতি সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল; মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আর, সত্যব্রতও মনে মনে ইহা বুঝিলেন, মনে মনে ঈষৎ হাস্যেরও উদয় হইল। সে ভাব গোপন করিয়া সত্যসখা-সমভিব্যাহারে উভয়ে ক্ষণ-কালের মধ্যে রাজ-অতিথিশালায় উপস্থিত হইলেন; এবং যথা-বিহিত আহারাদি করিয়া উভয়ে কিছুদিন তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

লোক-পরম্পরায় ক্রমে সত্যসখা অবগত হইলেন, রাজনন্দিনী এখনও কুমারী। তাঁহার তিনটি প্রশ্নের যিনি প্রকৃত উত্তর দিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ৯৯৯ জন ব্যক্তি তাহাতে অসমর্থ হইয়া রাজ-কন্যার প্রতিজ্ঞানুযায়ী সকলেই ফাঁসি-রজ্জুতে অবলম্বিত হইয়াছে

কত শত রাজপুত্রও ইহাতে বিফল মনোরথ হইয়া অকালে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া অবধি সত্যসখার অন্তরে রাজকন্যা লাভের বাসনা বলবতী হইল; মন উদাস হইয়া গেল। তিনি তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু সত্যব্রতকে এ সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিলেন। শেষে আরও কহিলেন যে, রাজকন্যা লাভ করিতে না পারিলে শেষে তিনি আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

জ্ঞানবৃদ্ধ সত্যব্রত সকলই বুঝিলেন। বালক সত্যসখার চিত্তোন্মাদ উপলব্ধি করিলেন। ভাবিলেন, যৌবনের প্রবেশ-মুখের এ স্রোতে বাধা দেওয়া অতীব কঠিন; ইহার গতি অনিবার্য্য। বন্ধুকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশ দিলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সত্যসখার মন টলাইতে পারিলেন না।

সত্যসখা রাজসমীপে স্বয়ং যাইয়া আবেদন করিলেন। নৃপতি তাঁহার মনোহর আকৃতি দেখিয়া স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন,—'আপনি বালক, কিন্তু আপনাকে এরূপ কঠোর সন্ন্যাস পথের পথিক দেখিতেছি কেন? আর সন্ন্যাসী হইয়াই বা পুনর্ব্বার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন কি জন্য? বুঝিলাম, আপনার এখনও চিত্ত-সংযম হয় নাই! আপনি বালক, পৃথিবীতে এখনও আপনার অনেক কায অবশিষ্ট আছে। আমার কন্যার বিবাহার্থী হইয়া কেন এমন অমূল্য মানব-জীবন অকালে নষ্ট করিবেন? দেখিয়া থাকিবেন, আমার শ্মশান-উদ্যানে কত শত লোক এই লোভে পড়িয়া ফাঁসি-রজ্জুতে অবলম্বিত আছে। কত রাজা, কত রাজকুমার, কত মহা মহা ব্যক্তি এই পথের পথিক হইয়া অমূল্য জীবন নষ্ট করিয়াছেন। অতএব আপনি ইহাতে নিরস্ত হউন। আমার সে কন্যা ডাকিনী, হৃদয়-বিহীনা রাক্ষসী। কি জানি, সে কি পিশাচ-মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া এবম্বিধ পৈশাচিক কার্য্যে অনুরক্তা! এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই। অতএব আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি ক্ষান্ত হউন।"

কিন্তু প্রণয়ের অনিবার্য্য গতি, কাহার সাধ্য তাহা উল্লঙ্ঘন করে? সত্যসখা পতঙ্গবৎ অগ্নিরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রণয়-তৃষ্ণা ও রূপতৃষ্ণা মানুষকে অসাধ্য সাধনেও পরাঙ্মুখ করে না। (ক্রমশঃ)

ফলরেণু।

ভক্তি-উপহার।

(কোনশিক্ষকের বিদায়-গ্রহণ-উপলক্ষে)

গুরুদেব!
'বিদায়'—উৎসব বটে!
কিন্তু, যে শোক-প্রবাহ ছুটে হৃদয়-কন্দরে
কি ক'রে নিবারি তায়!
লুকাইল প্রাণভরা আশা মেঘের ভিতরে
চমকি বিজলী-প্রায়!

(আহা!) হেন কারুণ্যের ছবি, দয়া-মায়াময়,
স্নেহ-সরলতা-মাখা কোমল হৃদয়,
পাব কি দেখিতে আর!
'প্রতিচ্ছায়া!'—সর্ব্বত্রই নহে মনোরম;
নিশীথে জোছনা-গায়ে বিকট বিষম!
সেই ভয় (শুধু) সবাকার।

কিন্তু ভাবিয়া কি ফল!
যাইবেন গুরুদেব, সুযশ সুনাম লয়ে,
আরো তাঁর বাড়িবে গৌরব।
এ সময় ক্ষুদ্রপ্রাণে, কেন বা কাতর হয়ে,
অধীর হইনু মোরা সব!

না—না, তা'হলে হবে না কর্ত্তব্য-পালন,
গুরুর কোমল প্রাণে বাজিবে দারুণ,
সে বেদনা, আরো ভয়ঙ্কর!
তেঁই ডাকি, জগবন্ধু দয়াল পিতায়,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তাঁর করুন ত্বরায়,
তিনি বিনা কেবা শুভকর?

প্রাণের প্রার্থনা, তিনি করুন মঙ্গল,
সুযশ সুনামে পূর্ণ হো'ক ধরাতল,
বলবীর্য্য বাড়ুক দ্বিগুণ।
মনোসুখ চিরকাল করুন বিধান,
চারিদিকে শোভে যেন কীর্ত্তির নিশান,
কোটী-কণ্ঠে গায় যশোগুণ।

পরিতাপীর রোদন।

১। পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

অন্তর-বেদনা নাথ! জানিতেছ, কি জানাব!
পাপের যাতনা প্রভো! কত বলহে সহিব!
শান্তিহীন মম মন, হু হু করে অনুক্ষণ,
উপায় না দেখি হেন, কেমনে তা' নিবারিব!
এই বলি প্রেমময়, (হে) প্রীতি-শান্তির আলয়,
তুমি হ'লে নিরদয়, কেমনে প্রাণে বাঁচিব!

২। জাজ্‌মল্লার—ঝাঁপতাল।

হায় বিধি কি ঘটিল মানব-কপালে।
উপায় না দেখি হেন, তরিতে পাতকীগণ,
ভীষণ পাপ-সলিলে।
হে ভবভয়-হরণ অকুল-কাণ্ডারী,
যেন সবে পায় কূল, লভি ঐ শ্রীপদতরী,
(এবে) একমাত্র তুমি গতি, এ অনলে শান্তি-বারি,
(ওহে) তব প্রেম না সিঞ্চিলে,
জ্বলে যাবে সমূলে।

পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি।

সমুদ্রের জল পান না করিয়া তন্মধ্যে লবণের অস্তিত্ব যেমন বলিতে পারা যায়, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, ব্রহ্মাণ্ডপতির অস্তিত্বও সেইরূপ নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে।

অপরকে বধ করিতে হইলে বিবিধ অস্ত্রের আবশ্যক হয়, কিন্তু আত্মহত্যা সামান্য একখানি নরুনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। লোক-শিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্র পাঠ আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু আপনার ধর্ম্ম-লাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে।

অল্প জল-বিশিষ্ট সরোবরের উপরিভাগে আস্তে আস্তে জল পান করিও; কেন না, তাহা পরিষ্কার। কিন্তু আলোড়ন করিওনা, তাহা হইলে ভিতর হইতে ময়লা নির্গত হইয়া জল ঘোলা করিয়া ফেলিবে। হে অল্প জ্ঞান-বিশিষ্ট মানব! পবিত্রতা লাভ করিতে যদি চাও, তবে তুমি বিশ্বাসের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, শাস্ত্রীয় বিচারে কভু নিযুক্ত হইও না।

যেমন সমুদ্র গর্ভে লুক্কায়িত চুম্বক প্রস্তর অকস্মাৎ জাহাজের সমুদায় লৌহ-নির্ম্মিত পেরেক প্রভৃতি টানিয়া লইয়া জাহাজখানিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞান-চৈতন্যের উদয় হইলে, অহঙ্কার-স্বার্থপরতা-পূর্ণ জীবনতরী মুহূর্ত্তের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া, ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

ময়লা আয়নাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ ময়লা অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখিতে পায় না; কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা পায়। অতএব বিশুদ্ধ হইবার চেষ্টা কর।

মেঘেতে যেমন সূর্য্যকে আবরণ করিয়া রাখে, মায়াতে সেইরূপ ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘ চলিয়া গেলে যেমন সূর্য্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হইলে সেইরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মায়াকে চিনিতে পারিলে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। যেমন কোন গ্রামে এক গুরু শিষ্য-বাড়ী যাইতেছিলেন। সঙ্গে ভৃত্য নাই।

পথিমধ্যে এক মুচিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"ওরে আমার সঙ্গে যাবি? উত্তমরূপে আহার করিতে পাবি এবং অতি আদরে থাকবি; চলনা?" মুচি বলিল,—"ঠাকুর মহাশয়, আমি অতি নীচ জাতি, আমি কিরূপে আপনকার দাস হইয়া যাইব?" গুরু বলিলেন—'তাহাতে তোর কোন চিন্তা নাই, তুই কাহাকেও আপনার পরিচয় দিস্ না; এবং কাহারও সহিত আলাপ করিস্ না।" মুচি সম্মত হইল। অপরাহ্নে শিষ্য বাড়ীতে গুরু সন্ধ্যা করিতেছেন, এমন সময় অপর একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই ভৃত্যকে বলিতেছে,—"অমুক স্থল হইতে আমার জুতা জোড়াটা আনিয়া দাও।" ভৃত্য কথা কহিল না। ব্রাহ্মণ আবার বলিল, ভৃত্য তথাপি নীরব। ব্রাহ্মণ তিন চারিবার বলিল; ভৃত্য তথাপি নড়িল না। অবশেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আরে ব্যাটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস না! তুই কি জাত, তুই মুচি নাকি?" ভৃত্য ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই গুরুর দিকে তাকাইয়া বলিল,—"ঠাকুর মহাশয় গো! আমায় চিনেছে, আমি পালাই;" এবং সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

হস্তীকে ছাড়িয়া দিলে চতুর্দ্দিকের বৃক্ষ সকলকে ভাঙ্গিয়া যায়। এবং তাহার মস্তকে ডাঙ্গস্ মারিলে সে নিরস্ত হয়। মনকে ছাড়িয়া দিলে সে নানা প্রকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় এবং বিবেক-রূপ ডাঙ্গস্ না মারিলে সে নিরস্ত হইবে না।

উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক, যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত হয়। হরিনাম শুনিলেই যাহার চক্ষে আপনা-আপনি জল আইসে, তাঁহার আর উপাসনা করিবার আবশ্যক হয় না।

সকল জল নারায়ণ বটে কিন্তু সকল জল পান করিবার যোগ্য নহে। সকল স্থলে [illegible] মান বটে, কিন্তু সকল স্থলে যাওয়া উ[illegible] না।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

সংসার-চক্র।—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিজ্ঞাপনমত 'সংসার-চক্র' ফাল্গুন মাসেই এক খণ্ড বাহির হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও ছবিগুলি বেস পরিপাটীই দেখা গেল। বিষয়টি ও হিন্দুমাত্রেরই আলোচ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রকাশক মহাশয় এবং তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহাঁদের দুজনেরই এ পুস্তক নির্ম্মিত প্রকাশে বেস উদ্যম ও যত্ন দেখা গেল। সুতরাং এ বৃহৎ ব্যাপারে উহাঁরা যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, নমুনা দেখিয়া, তাহা অনেকাংশে আশা করা যায়। তবে পুস্তকের অনুবাদ কিরূপ বিশদ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে, তাহা আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এখনও দেখি নাই। বারান্তরে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার আশা রহিল। আর এক কথা, এ খণ্ডে ছবি যেন কিছু কম আছে বলিয়া বোধ হইল; প্রকাশকগণকে অন্ততঃ ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াও কর্ত্তব্য ছিল।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

(বঙ্গ- ঙ্গ-ভূ ।—আজকাল উক্ত রঙ্গালয়ে শৈলজা নামক একখানি নূতন সামাজিক নাটকের অভিনয় হইতেছে। এ অভিনয়েও থিয়েটার-কোম্পানীর কিন্তু বেশ পারদর্শিতা দেখা গেল। অধিক কি, নাটকের প্রথমাংশে বরকর্ত্তার অভিনয়েই হৃদয়ে যেরূপ ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল, নাটকের শেষাংশেও ঠিক তাহার বিষময় ফল দর্শন করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। অধিকন্তু নররাক্ষস নররুদ্র ও তাহার 'যেমন দেবা তেমনি দেবী'-সদৃশা পত্নী যেমন হাসাইয়াছে, তেমনই তাহাদের দেখিয়া হৃদয় জ্বালিয়াছে। ফলতঃ অভিনয়াংশে অনেকেই বাহাদুরী দেখাইয়াছেন—তাঁহাদিগকে দেখিয়া অনেক সময় নাটকোচিত

ভাবেই প্রতিবিম্ব স্বতঃই মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়াছিল। তবে দুঃখের কথা এই, যদিও শৈলজার শেষ দৃশ্যে আমরা অনবরত কাঁদিয়াছি, তথাপি কিন্তু শৈলজার পূর্ব্বাপর কথাবার্ত্তা-গুলি যেন টান টান—সেই ভাঙ পদ্যে সুর করিয়া কথা কহার ন্যায়, বোধ হইয়াছিল। যাইহোক মোটের উপর অভিনয় দেখিয়া অনেকেই তুষ্ট হইবেন, আশা করা যায়। দৃশ্যের মধ্যে বালির রেলওয়ে ষ্টেষনটী বড়ই মনোরম হইয়াছিল উপসংহারে অভিনয়াংশে না হউক, অন্ততঃ নাটকাংশেও অভিনয়ের কিন্তু অনেক দোষ দেখা গেল। তবে সে দোষ নাটককারের; সুতরাং অভিনয় সমালোচনায় সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সময়ান্তরে তাহা উল্লেখ করিবার বাসনা রহিল।

(জাতীয় নব-রঙ্গালয়।—বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় উক্ত রঙ্গালয়েরও দিন দিন বেস পসার করাইতেছেন। ইতিমধ্যে 'নবীন-তপস্বিনীর' অভিনয় দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইয়াছি। জলধর, ঠিক যেন কবির অঙ্কিত জলধর বলিয়াই বোধ হইল। তদ্ভিন্ন অপরাপর অনেক অংশও বেস দক্ষতার সহিত আনীত হইয়াছিল) উপসংহারে আমরা উক্ত রঙ্গালয়ের উন্নতি প্রার্থনা করি।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

দৌরাত্ম্যের একশেষ!

আজকালকার প্রতারণার আর অবধি নাই। বিশেষ, এক 'কেমিকেল সোনা', 'ইলেক্ট্রো গ্যালভানিক অঙ্গুরী কবচ ও অনন্ত'—এই সকল জিনিসের বিজ্ঞাপনে আরও অধিক প্রতারণার গন্ধ অনুভূত হয়। এই সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে এক এক জন আবার 'চাঁই' আছেন। তাঁহাদের আবার আদৌ অস্তিত্ব নাই—তাঁহাদিগকে নিরাকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থাৎ নিরাকারত্ব-হেতু তাঁহাদিগের নিকট ঠকিলেও লোকের আর উদ্ধারের উপায় নাই। এই সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে আজ একজন মাত্র বিজ্ঞাপনদাতার নাম করিতেছি,—দেখুন পাঠক, তাঁহাদের কতদূর কারচুপী! আজকাল 'এচ সি, দাস এণ্ড কোং'—এই নাম দিয়া '৯ নং কালেজ ষ্ট্রীট বাই-লেন, কলিকাতা' হইতে ঐরূপ 'কেমিকেল সোনা', ইলেক্ট্রো-গ্যালভানিক অঙ্গুরী, কবচ ও অনন্ত' প্রভৃতির বড়ই জমকাল জমকাল বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনে আবার লেখা আছে,—"আমরা অকৃত্রিম বলিয়া কৃত্রিম বেচি না" ইত্যাদি। কিন্তু পাঠক মহাশয়গণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, '৯ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীট-বাই লেনে' আদৌ 'এচ, সি, দাস এণ্ড কোং' নামীয় কোন ফারম্‌ই নাই। যে বাড়ীর ঠিকানা দিয়া এই বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে, সে বাড়ীটি বৈষ্ণবদের বাড়ী বলিয়া পরিচয় পাওয়া গেল; এবং সেখানে ও-নামের কোন দোকান বা লোক নাই সম্ভবতঃ কোন প্রতারক অন্য ঠিকানা হইতে ঐ নামের টাকা-কড়ি গ্রহণ করিয়া লোক ঠকাইতেছে। যিনি প্রথমেই নাম ও ঠিকানার কারচুপী করেন, বুঝুন দেখি পাঠক, তিনি কেমন লোক! যাইহোক, এ-সম্বন্ধের অন্যান্য বিশেষ তত্ত্বও আমরা অবগত হইতেছি; আর সময়ান্তরে তাহাও বলিতে যে কুণ্ঠিত হইব না, তাহা বলা বাহুল্য।

প্রতারণা নূতনতরই বটে!

গত সংখ্যক অনুসন্ধানে, "শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় বিএ, রাজবাটীর দেওয়ান, অনন্তপুর"—এই নামীয় বিজ্ঞাপন-সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এবার আরও এক নূতন তত্ত্ব বাহির হইয়াছে; অর্থাৎ অনন্তপুর নামে কোন গ্রাম (যে গ্রামে অন্ততঃ পোষ্ট আপিসও আছে) বাঙ্গালার মধ্যে নাই। মোটে ভারতবর্ষে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে একটী মাত্র অনন্তপুর (অবশ্য পোষ্ট আপিস-ওয়ালা) আছে। কিন্তু ...ত্য নাই ...পুরে নলিনীকান্ত রায় এই বাঙ্গাল...

কোন মহারাজা থাকা সম্ভব কিনা, তাহা পাঠকগণই বিচার করুন। ফলকথা, ১৯২নং অপার চিৎপুরে বসিয়া এ, সি, সেন মহাশয়ই এই কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাস জন্মিতেছে। এবং তজ্জন্য, তাঁহার নিকট হইতে সাফাই জবাব পাইবার প্রার্থনা আমরা করিতেছি। যাইহোক, এখন হইতেও পাঠকগণ অতঃপর সাবধান যে, 'নিঃ শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় বিএ, (রাজবাটীর দেওয়ান) অনন্তপুর'—এই নাম ও ঠিকানা-যুক্ত "নলিনী-প্রতিভার" সম্বন্ধীয় কোন বিজ্ঞাপন বা পত্রে যেন প্রতারিত না হন।

ভট্টাচার্য্য-কোম্পানীর-দুর্ণাম।

ডাঙ্গা-গ্রাম, নাগরপুর পোঃ, টাঙ্গাইল হইতে বাবু উমাকান্ত চৌধুরী লিখিয়াছেন,—"মহাশয়, সম্প্রতি ১১৫ নং অপার চিৎপুর রোডের 'ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং' (অর্থাৎ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) এক নূতন ফাঁদ বিস্তার করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনখানি এরূপভাবে লিখিত যে, মফঃস্বল-বাসীগণ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়াই থাকিতে পারেন না। বিজ্ঞাপনখানি ডাকঘরের যোগে সর্ব্বত্র প্রেরিত হইতেছে; এবং তাহাতে লিখা আছে যে, উক্ত ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং 'সানুবাদ ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ' দেড় টাকা মূল্য লইয়া বিতরণ করিতেছেন। আমি তদৃষ্টে একখানি পুস্তক ভ্যালিউপেয়েবেল ডাকে পাঠানর জন্য লিখি। পুস্তকখানি যখন এখানে আইসে, তৎকালে আমি স্থানান্তরে গিয়াছিলাম; কিন্তু বাটীস্থ লোকে ১৸৶০ আনা দিয়া পুস্তক রাখে। এখন দেখিতে পাই, উক্ত পুস্তকে মূল সংস্কৃত শ্লোক নাই। কেবল বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক প্রস্তাবের শিরোভাগে একটি করিয়া সংস্কৃত শ্লোক। মহাশয়, ইহারই নাম কি 'সানুবাদ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ'? অথচ বিজ্ঞাপনে আছে, 'ইহার (অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের) মহোপ… । দর্শনে বহু ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক পাঁচ ছয় খানি আদি মূলগ্রন্থ আনাইয়া আদি সংস্কৃত শ্লোক সকল সন্নিবেশিতান্তর পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে সরল ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছি।' এখন, বলুন দেখি, ইহার প্রতিবিধান কি? এইরূপ যে কত শত ব্যক্তি প্রতারিত হইতেছে, তাহা সংখ্যা করা যায় না।" যাইহোক, আমাদের মতে ভট্টাচার্য্য কোম্পানী ইহার কোন সদুত্তর দেন, এই বাসনা। আর, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব।

এও বড় অল্প দোষের নহে!

পোঃ বিডন-স্কোয়ার, বাবুরাম ঘোষের লেন, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং—এই নাম ও ঠিকানা দিয়া "সানুবাদ কোকশাস্ত্র" শীর্ষক একটী বিজ্ঞাপন আজকাল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। অন্য নানা বোলচালের মধ্যে সে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে,—"আমাদের এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে অন্যের পুস্তকের মত বৃথা আড়ম্বর নাই। এবং কোন কারণ বশতঃ 'রতিশাস্ত্র' নাম-পরিবর্ত্তে কোকশাস্ত্র প্রয়োগ করা গেল, বুঝিয়া লইবেন।" এ বিজ্ঞাপন পড়িয়া আমরা তো অবাক হইয়াছি। প্রথমতঃ 'রতিশাস্ত্র' প্রকাশ আইন-অনুসারে দণ্ডনীয়; সুতরাং আদালতের ভয়ে প্রকাশকগণ রতিশাস্ত্র বাহির না করিতে পারিলে, রতিশাস্ত্র পাইবার আশায় মূল্য দিয়া পাঠকগণ যে প্রতারিত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ যদি পাঠকগণ প্রতারিত না হন, তবে প্রকাশকগণ আইনের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টায় আছেন, দেখিতেছি। যাইহোক, পুলিসেরও এ বিজ্ঞাপনের তদারক আবশ্যক। ফলকথা, যে পক্ষেই হউক, বিজ্ঞাপনদাতাগণ যে দোষী, তাহাতে আর আমরা তো কোন সন্দেহই করিতে পারি না।

সংবাদ।

—বিলাতী কাপড়ে এখন যে গজ-মার্কা থাকে, অনেক স্থলে কাপড় মাপিয়া সে মাপ পাওয়া যায় না; ৪০ গজের কাপড় ৩৮ গজ হয়, ৩৮ গজের কাপড় ৩৬ গজ হয়, ৫ গজের কাপড় সাড়ে চারি গজ হয়। এইরূপে উপরের মার্কায় যে মাপ লেখা থাকে, কাপড় মাপিয়া তাহা পাওয়া যায় না। ১লা এপ্রেল হইতে কিন্তু এরূপ কাপড় বিক্রয় করা আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে; যে এরূপ কাপড় বিক্রয় করিবে, তাহার তিন মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে। সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই সাবধান!

—"বেঙ্গলী" বলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান পরীক্ষকগণ নিম্নস্থ পরীক্ষকগণকে নাকি উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রশ্ন খুব কড়াকড় করিয়া দিবে এবং যত পার ফেল করিবে। এ অপেক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেলেঙ্কারির কথা আর কি হইতে পারে?

—এদেশে বহু শ্রেণীর সর্প আছে, তন্মধ্যে কেবল অল্প সংখ্যক সর্প যথার্থ বিষধর। এপর্য্যন্ত পরীক্ষায় এদেশে ২১৩ প্রকারের সর্প জাতির দেখা পাওয়া গিয়াছে। এই ২১৩র মধ্যে বিষধর জাতীয় সর্পের সংখ্যা ৩৩টী মাত্র।

—ওরিয়োগ নামে এক জন মার্কিন ডাক্তার দেখিয়াছেন, তালচটক পক্ষী অস্ত্র-চিকিৎসা জানে। তিনি বলেন, এক দিন একটী তালচোঁচ পাখীর বাসায় দেখিলাম, একটী বাচ্ছার পায়ে চুল জড়ান, ঠিক যেন ব্যাণ্ডেজ করা। কৌতূহলপরবশ হইয়া চুলগুলি খুলিয়া দিলাম; দেখি, ছানার পা-টি ভাঙ্গিয়া গিযাছে। বুঝিলাম, তাই এই ডাক্তার পাখীটি নিজের ছেলের নিজে চিকিৎসা করিয়াছে। বিস্ময়ে আমার শরীর পুলকিত হইল। নীড় ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। কতক পরে গিয়া দেখি, সেই ভগ্নপদ পক্ষিশাবকের পাদ তখনও কেশাবৃত। আবার খুলিয়া দিলাম; দেখিলাম, তখন পা সারিয়া গিয়াছে; ভাঙ্গা পা জোড়া লাগিয়াছে। ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই বিচিত্র নহে!

—কাঁথির কোন ডাক্তার বাবুর ডিস্‌পেনসারি হইতে তত্রত্য ডেপুটী বাবু ৵৫ পয়সার ঔষধ ধারে লইয়াছিলেন কিন্তু সম্ভবতঃ বিস্মৃতিক্রমে মূল্য দিতে অনেক দিন বিলম্ব হওয়ায় ডাক্তার বাবু ডেপুটী বাবুর নামে নালিশ রুজু করেন। কয়েক দিবস হইল, মকর্দ্দমা ডিক্রী হইয়া গিয়াছে। এ বড় অদ্ভুত সংবাদ বটে!

—চীন-সম্রাটের সর্ব্বশুদ্ধ ৪১০ জন পরিচারক আছে। তাঁহাকে বাতাস করিবার জন্য [illegible] জন বেহারা, ছাতা ধরিবার জন্য দশ জন, পীড়া হইলে বিশ জন ডাক্তার কাছে থাকে। ৭৫ জন বৈদ্য, [illegible] জন শিক্ষক এবং ৬০ জন পুরোহিত আছেন। [illegible] জন খানসামা, ৫০ জন বাটীর চাকর ও ১০০ জন অপরাপর চাকর আছে।

—ভারত-সচিবের নিদেশানুসারে ইণ্ডিয়া গেজেটে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে, ১৮৮৯।৯০ সালে বিলাতে এখানকার একটাকার মূল্য ১ শিলিং [illegible] পেনি অর্থাৎ ৷৷৶০ আনা হিসাবে ধরা হইবে।

—ইংলিশম্যান বলেন যে, জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রী ফেরত পাওয়ার অভিলাষে ফরিদপুরের মুন্সেফী আদালতে এক মকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। স্ত্রী এই বলিয়া স্বামীর সহবাস করিতে অসম্মত হন যে, তাঁহার স্বামী মুসলমানের অন্ন ও কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করিয়া পতিত হইয়াছেন; তিনি হিন্দু-শাস্ত্রের বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাঁহার সহবাস করিতে তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু মুন্সেফ এই বলিয়া স্বামীর পক্ষে ডিক্রি দিয়াছেন যে, ঐরূপ আহার করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নহে। যেমন ধর্ম্মধ্বজী বিচারপ্রার্থী তেমনি শাস্ত্রবাগীশ বিচারকও বটেন। নহিলে কলিকাল কেন?

—ফরাসী দেশে নারিকেলের দুধ হইতে মাখন তৈয়ার হইতেছে। ইহা সস্তা, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। ইহা দ্বারা রন্ধন কার্য্য চলে। বিলাতের লোকে ঘৃত ব্যবহার করিতে জানে না। ব্রহ্ম, শ্যাম [illegible] দেশেও ঘৃত ব্যবহার হয় না। ইংরাজেরা [illegible] দ্বারা রন্ধন কার্য্য করে; আমাদের মতন উহারা [illegible] খায় না। মান্দ্রাজে নারিকেল তৈল লোকে খায়। বোধ হয়, ফরাসীরা যে নারিকেলের মাখন তৈয়ার করিতেছে, তাহা নারিকেলের কাঁচা তৈল। ফরাসী দেশে নারিকেল জন্মে না, বিদেশ হইতে যায়।

—একজন জর্ম্মণ-বৈজ্ঞানিক আল্‌কাত্‌রা হইতে চিনি তৈয়ার করিতেছেন। আমরা যে চিনি ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা অপেক্ষা এই চিনি এক শত [illegible] মিষ্ট! অর্থাৎ আমাদের ১০০ ছটাক চিনিতে [illegible] কলসী জল মিষ্ট করা যায়, এই আল্‌কাত্‌রার চিনিতে এক ছটাকে তত কলসী জল ঠিক্ সেইরূপ মিষ্ট করা যাইবে। এই চিনি ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হইতে [illegible]

অনুসন্ধান।

—:•(০)•:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

[২য় খণ্ড।] ১৫ই চৈত্র, ১২৯৫ সাল। [১৬শ সংখ্যা।

প্রেমিকের গান।

বিভাস—একতালা।

"এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।
বিবিধ বরণে বিভূষিত ক'রে
তা'র উপরে তোমার নামটি দিয়েছ।
পত্র-পুষ্প-ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয়, তোমার দয়াল নামটি লেখা,
সুন্দর নামটি বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,
প্রেমানন্দ নামটি নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ-তুল্য গগন-মণ্ডল,
দীপালোক যেন করে ঝল মল,
তা'র মাঝে ইন্দু, ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু-নাম তায় অঙ্কিত ক'রেছ।
জলেতে লিখেছ জগৎ-জীবন,
পবন-হিল্লোলে হয় দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
জ্যোতির্ম্ময়-নামে জগৎ দেখা'তেছ।
ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে,
সর্ব্বব্যাপী-নাম লিখে'ছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে,
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ।
হৃদয়ে লিখেছ হৃদয়-বল্লভ,
প্রেম-সূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব,
তন্নামে অঙ্কিত তোমারিত সব,
হাতে কলমেতে ধরা যে প'ড়েছ।"

জুয়াচোরের তীর্থ-যাত্রা।

দ্বিতীয়াংশ।

মহাদেব প্রসাদের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন,—"সে কি! তুমি কি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছ? বিপদে পড়িয়া পাঁচ শত টাকা পাঠাইবার নিমিত্ত আমাকে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলে, তাহা কি তোমার মনে নাই? আমার প্রেরিত পাঁচ শত টাকাও কি তুমি তবে পাও নাই?"

মহাদেব।—"সে কি পিতঃ, আমি আজ পর্য্যন্ত তো আপনার নিকট কোন টেলিগ্রাম পাঠাই নাই। যখন আমার কোন সংবাদ পাঠাইবার আবশ্যক হইয়াছে, তখনই আপনাকে পত্র লিখিয়াছি। টেলিগ্রামের কথা আপনি কি বলিতেছেন? আর, আমি আপনার নিকট

কখনও পাঁচ শত টাকার নিমিত্ত টেলিগ্রাফ করি নাই বা কোন পত্রাদিও তো লিখি নাই! —উহা পাওয়া তো পরের কথা! আমার নিকটে যে টাকা ছিল, তাহাতেই প্রায় আমার সমস্ত কর্ম্ম সমাপন হয়। তবে কলিকাতা হইতে আসিবার কালীন আমার অতি অল্প টাকার আবশ্যক হওয়ায়, আমি একজন মহাজনের নিকট হইতে হুণ্ডি লিখিয়া দিয়া ঐ সামান্য টাকা গ্রহণ করি। আর, অতি শীঘ্রই বোধ হয়, ঐ হুণ্ডি আসিয়া আমাদিগের গদিতে পৌঁছিবে।"

বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া আর কোন কথা না বলিয়া চাকরকে তাঁহার বাক্স আনিতে বলিলেন। তাঁহার ভৃত্য সেই স্থানেই উপস্থিত ছিল; সে প্রভুর আদেশ পাইবামাত্র বাটীর ভিতর গমন করিল; ও দেখিতে দেখিতে একটী কাষ্ঠের হাতবাক্স সহিত আসিয়া উপনীত হইল। বৃদ্ধ তখনই তাহার কোমর হইতে এক চাবি বাহির করিয়া ঐ বাক্স খুলিলেন; ও তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া মহাদেব প্রসাদের হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—"পড়িয়া দেখ দেখি, ইহাতে কি লেখা আছে!"

মহাদেব প্রসাদ আগ্রহের সহিত ঐ কাগজ খানিকে আপনার হস্তে লইয়া দেখিলেন, উহা টেলিগ্রাম-আফিসের মোহর-সংযুক্ত খামে-বন্ধ একখানি টেলিগ্রাম। তখন তিনি উহা খুলিয়া এক এক বার করিয়া ক্রমে তিন বার পড়িলেন। পড়িয়া অতিশয় বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সে টেলিগ্রাম এই ঃ—

From Mohadeb Pursad
19/1 Cross Street, Calcutta.
To Sreecharon Pursad,
Merchant, Cawnpur.
I am in trouble with family. Send at once Rupees five hundred by telegraphic money-order.

মহাদেব প্রসাদ এই টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া কহিলেন,—"ইহা দেখিলে আমারই প্রেরিত টেলিগ্রাম বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এই টেলিগ্রাম আমি পাঠাই নাই। ১৯।১ নম্বর ক্রস্ ষ্ট্রীটেও আমি কখনও ছিলাম না। কোন জুয়াচোর জুয়াচুরি করিয়া এই প্রকারে পাঁচশত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। আর, যেরূপ ভাবে টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে, তাহাতেই বা আপনি টাকা না পাঠাইয়া কিপ্রকারে থাকিতে পারেন? আপনি টেলিগ্রাম পাইবা-মাত্রই কি টাকা পাঠাইয়াছিলেন?"

মহাদেব প্রসাদের এই কথা শুনিয়া শ্রীচরণ প্রসাদ কহিলেন,—"এরূপ বিপদের খবর পাইয়া কোন্ ব্যক্তি টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিতে পারে! আমি এই টেলিগ্রাম পাইবা-মাত্রই টেলিগ্রাফ আফিসে গমন করি, ও টেলিগ্রাম যোগে মনিঅর্ডার করিয়া তখনই ঐ টাকা পাঠাইয়াছি।"

এইরূপ ভাবে জুয়াচুরি করিয়া কে এই পাঁচশত টাকা আত্মসাৎ করিল, ইহা পিতা পুত্রে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। উভয়ে পরামর্শ-পূর্ব্বক শেষে টেলিগ্রাম-আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই জুয়াচুরির বিষয় বিবৃত করিয়া একখানি দরখাস্ত করিলেন। তিনি ইহার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

পুলিশ যে কিরূপ প্রকারে এই তদারক করিলেন, তাহা আমরা এই স্থানে প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ক্রমক এক মাস কাল অনুসন্ধানের পর ঐ জুয়াচোর ধরা পড়িল। ঐ জুয়াচোর তাহার অন্য আর এক জন সহকারীকে সঙ্গে করিয়া পুলিশ কানপুরে শ্রীচরণ প্রসাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব প্রসাদ সেই সময়ে বাড়ী ছিলেন না; তিনি কোন বিষয়-কর্ম্ম-উপলক্ষে স্থানান্তরে অব-

স্থিতি করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার নিকটও সংবাদ প্রেরিত হইল; এবং সংবাদ পাইবামাত্র তিনি বাটী আসিয়া উপনীত হইলেন ও জুয়াচোরদ্বয়কে দেখিবামাত্র তিনি একেবারেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাহাদের এক জনকে লক্ষ্য করিয়া মহাদেব প্রসাদ পুলিস কর্ম্মচারীকে কহিতে লাগিলেন,—"মহাশয়, এই কার্য্য যে এই ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ, যে সময় আমি তীর্থ পর্য্যটন-উপলক্ষে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সময়ে ইনি আমার যে কত উপকার করিয়াছেন তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারি না। ইনি যদি আমার নিকট পাঁচ শত টাকা চাহিয়া লইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনায়াসেই আমি ইহাঁকে দান করিতে পারিতাম। আপনি যদি প্রকৃত দোষী ব্যক্তিই পাইয়া থাকেন, এবং ইনিই যদি সেই প্রকৃত দোষী ব্যক্তিই হন, তাহা হইলে জানিলাম যে, বিশ্বাস করিতে পারি, এমন লোকই এ জগতে নাই।"

পাঠকগণ এতক্ষণ বোধ হয় জানিতে পারিলেন যে, মহাদেব প্রসাদের সেই বিদেশীয় বন্ধু গোবিনলাল ও তাহার এক জন অনুচর আজ পুলিশের হস্তে পতিত!

গোবিনলাল, মহাদেব প্রসাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল,—"মহাশয়, এই জুয়াচুরি আমার দ্বারাই যে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর ভুল নাই। আমি ভিন্ন বিশ্বাসী বন্ধুর আর কে এইরূপ সর্ব্বনাশ করিতে পারে! কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় এরূপ কার্য্য সম্পন্ন করি নাই; আমার সহকারী এই ব্যক্তির কথা-মতই আমি এইরূপ অপকৃষ্ট কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিয়াছিলাম বলিয়াই আজ পুলিশের হস্তে পড়িয়াছি। নতুবা আমার দশা এরূপ হইবে কেন?"

তখন পুলিশ-কর্ম্মচারী গোবিনলালকে কহিলেন,—"ভাল, তুমি এইবারই যেন তোমার সঙ্গীর পরামর্শ অনুযায়ী এই কার্য্য করিয়াছ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে তুমি আরও দুই তিন বার শ্রীমন্দিরে গমন করিয়াছিলে, তাহাও কি ইহার আদেশ মত?"

"না মহাশয়, সে সময় আমার সহিত আর কেহই ছিল না। আমি একলাই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম ও তাহার ফল-ভোগ একলাই করিয়াছি। কিন্তু এবারকার পরামর্শ ইহারই।"—এই বলিয়া অতঃপর গোবিনলাল চুপ করিল।

তখন পুলিশ-কর্ম্মচারী গোবিনলালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"গোবিনলাল, তুমি এবার যে কার্য্য করিয়াছ, তাহার নিমিত্ত ধরাও পড়িয়াছ। ইহাতে তোমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা তো হইবেই হইবে; কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে তুমি যে যে প্রকার জুয়াচুরির উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, ও যাহার উপযুক্ত ফল-ভোগও করিয়াছ, সেই সকল জুয়াচুরির উপায় জানিবার নিমিত্ত মহাদেব প্রসাদ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। এখন, তাহা প্রকাশ করিতে তোমার কোন প্রতিবন্ধক আছে কি? যদি না থাকে তবে মহাদেব প্রসাদের ইচ্ছা পূর্ণ কর।"

এই কথা শুনিয়া গোবিনলাল কহিল,—"যে সকল বিষয় গত হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে আর প্রতিবন্ধক কি? আমি সময়ান্তরে মহাদেব প্রসাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।"

জীবের দায়িত্ব। *

নিম্নশ্রেণীর জীবে, যাহাতে অতি অল্প মাত্রায়ও আধ্যাত্মিক কোন ভাব প্রকাশ আছে, তাহাতে যে তদ্বিপরীত ভাবও জাগ্রত আছে তাহা আমাদের উপর্যুক্ত কথায় উপ-

* পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

লক্ষি করা যায়। একটি কুকুর ক্রোধসহকারে আর একটি কুকুরকে কামড়াইতে গেলে, দ্বিতীয় কুকুরটী যদি লাঙ্গুল গুড়াইয়া, কুঁকুড়ি মারিয়া তাহার পদানত হয়, তবে অমনি তাহার রাগ গিয়া করুণায় সাম্য হইয়া থাকে। মনুষ্যে যেমন কতিপয় ভাব অন্যান্য জীবের অপেক্ষা অধিক থাকা প্রকাশ পায়, তেমনই তাহার বিপরীত ভাবও তাহাতে জাগ্রত আছে। এইরূপে জগতের জীব-সৃষ্টির আধ্যাত্মিক সমভাবতা রক্ষিত হইয়াছে। শুদ্ধ অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে কেন, জীবের অবস্থাও ঠিক সমভাবে আছে। এক বিষয়ে জীবের অভাব থাকিলে, সেই অভাব অপর রকমে সামঞ্জস্য হইয়া থাকে। মনুষ্য যে সকল মানসিক ভাবে ভূষিত হইয়া আপন জীবনে সুখ-ভোগ করেন, নিকৃষ্ট জীবে সে ভাব অল্প মাত্রায় থাকিলেও, তাহাদের জীবনের অভাব অপর রকমে পুর্ণিত হওয়াতে তাহারাও সেই সুখ-ভোগ করে। যদি মনুষ্যকে নিকৃষ্ট জীবের জীবনীশক্তি, ও তাহা রক্ষার্থে তদুপযুক্ত উপায় সমুদয় দিয়া, তাহাদিগকে উন্নত আধ্যাত্মিক ভাব সকল দেওয়া হইত, তাহা হইলে কি ফল হইত পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করুন! ফলে এই হইত, হয় মনুষ্য-বংশ লোপ হইত; আর না হয় সেই উন্নত ভাব সমুদয় জাগ্রত না থাকিয়া হয় সুপ্ত, হয় লুপ্ত, আর না হয় অর্দ্ধলুপ্ত হইত। বাঘের বাসায় মানুষ প্রতিপালিত হইলে, (যদিও উপরি-উক্ত কথা তাহাতে ঠিক প্রয়োগ হয় না, তথাপি) মনে করিয়া দেখুন সে কি হয়? তখন তাহার মানবদেহের উন্নত আধ্যাত্মিক ভাব সমুদায় কি ভাবে থাকে?—তাহার জীবন-রক্ষার জন্য আর তাহার বিবেক, কল্পনা, কৌশল, চিকির্ষা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় কি না? আমরা এতক্ষণ অবস্থার-উপযুক্ত উচ্চ দরের মনুষ্য-জীবনের জীব-সম্বন্ধে, চৈতন্য-সম্বন্ধে, জীবের আধ্যাত্মিক ভাবের কার্য্য-সম্বন্ধে মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে যে যে ভাব থাকাতে মনুষ্য নিজের কার্য্য-কলাপের দায়িত্ব অনুমান করেন, তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের প্রথম অংশের সমাপ্ত করিব।

মনুষ্য নিজের অভ্যন্তরে জীবাত্মা নামক এক আধ্যাত্মিক শরীর আছে বলিয়া কঁরিয়া থাকেন। তাহারই বিবেক, হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্মবোধ প্রভৃতি উন্নত দরের শক্তি আছে; এবং সেই সেই শক্তি বলে কার্য্য করিয়া মনুষ্য দায়ী অর্থাৎ ফলাফলের ভাগী হয়েন। এখন দেখা যাউক যে, মনুষ্যের কার্য্যে সকল প্রকার শক্তিরই (যথা কাম ক্রোধাদি, ও দয়া মমতাদির) প্রয়োজন হয় কি না? যদি প্রয়োজন হয়, তবে জীবাত্মার সেই সমস্ত শক্তিবলে কার্য্যের নিমিত্তও মনুষ্যের দায়ী থাকা উচিত। পূর্ব্বে নিম্ন-জীবের কথায় দেখাইয়াছি যে, তাহাদের মধ্যেও ক্রোধ, হিংসা, মমতা ও সহানুভূতির কার্য্য আছে। তবে সেই পরিমাণে তাহাদেরও দায়ী থাকা উচিত। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ভাবের না হয় অধিক পরিমাণে বিকাশ থাকাতে, তাঁহারা অন্যান্য নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা অধিক দায়ী। এখন জীবাত্মা, চৈতন্য ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ আকারের বস্তু হয় কি না, দেখা যাউক; এবং যদি হয়, তবে তাহার কার্য্যকারীতা ক্ষমতাই বা কত দর? আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, জীব-দেহে প্রাণের কার্য্য চলিতে না থাকিলে, আধ্যাত্মিক শক্তির ভাব প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা সেই জন্য প্রাণকে ও সংজ্ঞা-জ্ঞানাদিকে চৈতন্যের ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; এবং কোন স্থলে জীবাত্মা কথার প্রয়োগ না করিয়া চৈতন্য, আধ্যাত্মিক ভাব ইত্যাদি কথাই কহিয়া আসিতেছি। আধ্যাত্মিক শক্তি যদি সুপ্ত না থাকিয়া প্রাণবিশিষ্ট কোন জীব-দেহে জাগ্রত থাকে, তবেই সেই দেহে, ইচ্ছা ও জ্ঞানাদির কার্য্য নিরীক্ষিত হয়; তখন বটে আমরা বলিতে

পারি, জীবাত্মার কার্য্য হইতেছে। যদি প্রাচ্য আধ্যাত্মিক পণ্ডিতগণের মতে, জীবাত্মাকে প্রাণভাবের সহিত সংলগ্ন না রাখিয়া কার্য্য অর্পণ করা যায়, তাহা আমরা কখনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না। আবার যদি তাঁহারা কার্য্যের ছায়া, প্রাণ-ভাব লুপ্ত হইলেও (অর্থাৎ মরিলে), জীবাত্মাতে অর্পণ করেন, তাহা হইলেও সুপ্ত চৈতন্যেও প্রকারান্তরে কার্য্যভার ন্যস্ত করা হয়। কারণ, যখন কার্য্যের ছায়া কহিতেছি, তখন মূল কার্য্য সঙ্গে বিদ্যমান না থাকিলে কখনই তাহার ছায়া চলিতে পারে না।

আমরা সুপ্ত চৈতন্যের কার্য্য আছে কি না ও থাকিতে পাবে কিনা, সে বিচারে প্রবেশ করিব না, পূর্ব্বে কহিয়াছি। আবার জীবাত্মা ছাড়িয়া, আত্মা নামক প্রকৃত কোন আত্মা শরীর-দেহে আছে কি না, সে সব বিষয়েরও কোন মতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইতে চাহি না। তাহাতে যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস আছে, তিনি সেইরূপই ভাবুন বা যুক্তি দেখান; তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। তবে আমরা জীবাত্মা পর্য্যন্ত উঠিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম; এবং সেই জীবাত্মাকে কোন শরীর না দিয়া কেবল চৈতন্যের ভাব প্রকাশ বলিয়া কহিতেছি। বাস্তবিক যিনি যতই অন্বয় ও ব্যতিরেক নিয়মের তর্কে, আত্মার অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের সহিত তাহার ঐক্যভাব অনুমান করিতে প্রয়াশ পাউন, আমরা ফলে কহি যে, সেই তর্ক-শক্তি জীবাত্মার বলিয়া, আত্মার অস্তিত্ব থাকিলেও ততদূর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। আর, বিশেষতঃ আত্মার সংজ্ঞা কেহই সুন্দররূপে করিতে পারেন না, করিতে গেলেই জীবাত্মার ভাব বুদ্ধি, জ্ঞান, বোধ, অভিমান, দ্বেষ ইত্যাদির সঙ্গে জড়াইয়া ফেলেন।

পরমযোগীগণ ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য সাধন করিতে আধ্যাত্মিক যাবতীয় শক্তি সংযত করিয়া, নির্ব্বাত স্থলের দীপশিখার ন্যায় একাগ্র জ্ঞানে সেই ঐক্যতা দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করেন। আমরা সেই যোগী-প্রবরের জাগ্রত স্থির জ্ঞানকেও শক্তির বিষম-ভাবতা অর্থাৎ চাঞ্চল্য-ভাব কহি। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, পাদার্থিক শক্তির বিকাশ যেমন সম-ভাবতা ভঙ্গ না হইলে প্রকাশ পায় না, তেমনি অধ্যাত্মিক জ্ঞানাদি ভাবও আধ্যাত্মিক শক্তির বিষমভাব অর্থাৎ চাঞ্চল্য না হইলে কখনই প্রকাশ পাইতে পারে না। সুতরাং সেই যোগীর একাগ্রতাও স্বাভাবিক অবস্থা নহে। প্রদীপ স্থির হইয়া জ্বলিলে, তাহাতে অন্যান্য বর্ণের আলোক যেমন সংযুক্ত থাকে। অর্থাৎ প্রকাশ থাকে না, তেমনি চিত্তের কাম ক্রোধাদি, দয়া-করুণাদি বৃত্তিও যোগীর একাগ্রতাতে প্রকাশিত থাকে না। কিন্তু যেন এইটী স্মরণ থাকে যে, সে সকল বৃত্তি কখনই লোপ হয় না; আবার প্রদীপের কিম্বা সূর্য্যালোকের সপ্তবর্ণের ন্যায় (লাল, নীল ইত্যাদি) তাহাদিগকেও প্রকাশিত করা যাইতে পারে।

আমরা ঐ চিত্ত-সংযমকে, আধ্যাত্মিক "তীব্র দহন" ভিন্ন আর কিছু বলি না। ঐরূপ একাগ্রতায় অত্যন্ত আনন্দ হয় সত্য, কিন্তু সে আনন্দ, শক্তিবৈষম্যজনিত বলিয়া, কখনও নিত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কারণ পূর্ব্বে কহিয়াছি যে, বৈষম্যের সাম্যাবস্থার দিকেই সকলই প্রবণোন্মুখ। এ অবস্থায় সেই আনন্দ-ভাবও অপর ভাবের সহিত সমভাব হইবেই হইবে।

এইরূপ একাগ্রতা, কি বিষয়াদিতে, কি আত্মতত্ত্বে সমস্তই এক প্রকৃতির। বৈষম্য থাকাতে নিত্যানন্দ হইতেই পারে না; যদিও তাহার মধ্যেই আবার সাম্যের ভাব আছে, যাহা ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি পূর্ব্বে কহিয়াছি। আবার যদি সেই যোগীর একাগ্রতাকে স্থির দীপশিখার সহিত তুলনা করা যায়, তবে

জিজ্ঞাসা করি, দীপ শিখার ভিতর কি ফাঁপা অন্ধকার নাই? অবশ্যই আছে। ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি। সুতরাং সেই যোগীর একাগ্র জ্ঞানের ভিতরও অংশ্যই ফাঁপা অন্ধকারময় আছে। আর উহা থাকাও চাই; তাহা না থাকিলে সেই জ্ঞান-ভাবের শক্তি-চাঞ্চল্য কিসে সাম্যভাব পাইবে? দহন-কার্য্য সাম্য হইবার সময় দীপাভ্যন্তরস্থিত ফাঁপা অন্ধকার স্থল অগ্রসর হইতে থাকে। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক পরম জ্ঞানে সেই নিয়মই বা না থাকিবে কেন? পাঠক মহাশয়গণের নিকট জানাইতেছি যে, আমরা কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করিতে চাহি না; তবে নিম্ন জীবেও মনুষ্য-জ্ঞানাদির কার্য্য এবং যদি মনুষ্যের দায়িত্ব থাকিতে পারে, তবে নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণীদেরই বা কেন না থাকিবে! যদি মনুষ্যের আত্মা থাকে, তবে তাহাদেরও আত্মা না থাকিবে কেন?—ইত্যাদি সমস্ত কথা পর্য্যালোচনা করিতেই উপযুক্ত কথাগুলি বলিতে হইল। সালিক কিজন্য গুই-সালিকের (যে তাহার নিজের জাতি নহে) বিবাদ ভাঙ্গাইতে আসিয়াছিল; মনুষ্যই বা ঐরূপ ঘটনায় কেন অপরের বিবাদ ভঞ্জন করাইতে যায়!—এ সমস্ত বিষয় তো আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত! যদি মনুষ্য সেই কার্য্যের ফল-ভোগ করিতে স্বর্গে গমন করিবে বলিব, তবে গরীব সালিকেরই বা কেন এই জগতেই কর্ম্ম-ফলাফলের ভোগ এক আঘাতে সাঙ্গ করিয়া দিই? (ক্রমশঃ

জাতি-তত্ত্ব।

শুকুলি জাতি।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে কয়েকটী নূতন জাতি আছে। বঙ্গদেশের অপর কোন জেলার মধ্যে এই জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না*। যদিও অপর অপর স্থানে দুই এক ঘর এই শ্রেণীস্থ লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, উহাদিগের আদিম বাসস্থান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভূত। অদ্য এইরূপ একটী জাতির বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সাধারণ পাঠকগণের গোচর জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

* মধ্য-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কাস্থ, শুকুলি।

"শুকুলি" এই সম্প্রদায়স্থ লোক হিন্দু সমাজে অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। চণ্ডাল হাড়ি প্রভৃতি যে শ্রেণীর অন্তর্গত, উহারাও প্রায় সেই পর্য্যায় গণনীয়। হিন্দু-সমাজ এই জাতিকে এত ঘৃণায় চক্ষে অবলোকন করেন যে, ইহাদিগের জল পান করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করিলেও অপবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির মধ্যে যতদূর কদাচার বিদ্যমান আছে, ইহাদিগের মধ্যে তদ্রূপ কোন অসদাচরণ দেখা যায় না। বিশেষতঃ, নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ লোকদিগের যতদূর মানসিক অবনতি দেখিতে পাওয়া যায়, এই জাতি তদপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা বিলোকনে বুঝিতে পারা যায়, এই জাতির মধ্যে বহুকাল পূর্ব্বে শিক্ষা-বিস্তার হইয়াছে। আমাদিগের দেশে "নবশাখ" জাতি যেমন বিশুদ্ধাচার-সমন্বিত, এই জাতি তদপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। ইহারা মানসিক উন্নতিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে; এই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত লোক দেখিতে পাওয়া যায়। নীচ জাতির মস্তিষ্কে যেমন কোন একটী জটিল ভাব প্রবিষ্ট করা কঠিন, ইহাদের বুদ্ধি তদপেক্ষা অনেক সুমার্জ্জিত। আর্য্য-জাতির সহিত ইহাদিগের শারীরিক বর্ণগত অধিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে যতদূর কোমলতা ও ভীরুতা দেখিতে পাওয়া যায়, এই জাতির প্রকৃতি তদ্রূপ নহে। বরং ইহাদের স্বভাবে অনেকটা তেজস্বিতা ও উগ্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গ-সমাজ কেন এই জাতিকে এত ঘৃণায় চক্ষে অবলোকন করেন? সেই বৃত্তান্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। উৎকল ভাষায় একখানি হস্ত-লিখিত পুস্তকে এই জাতির বৃত্তান্ত যাহা লিখিত আছে, তদবলম্বনে নিম্নলিখিত ঘটনাটী বিবৃত করা যাইতেছে।

'শোলাঙ্কিং' রাজপুত নামে এক সম্প্রদায়স্থ লোক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বসতি করিতেন। উহার মধ্যে একদল লোক কোন কারণ-বশতঃ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইহাঁরা জগন্নাথ দেব দর্শন-মানসে এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে অপর কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই।

যে রাজপুত-সম্প্রদায় এ-প্রদেশে আসিয়াছিলেন, উহার দলপতির নাম বীরসিংহ রায়। ইহাঁরা রাজপুতনা হইতে এ প্রদেশে আসিয়া, এই জেলার কেদারকুণ্ড পরগণার অন্তর্গত একটী স্থানে আপনাদিগের বাসস্থান মনোনীত করেন। ইহাঁদের দলপতির নামানুসারে এই স্থানের নাম 'বীরসিংহপুর' নামে অভিহিত হইয়াছে।

এই সম্প্রদায়স্থ লোকে এ প্রদেশে বাসস্থান মনোনীত ও আধিপত্য সংস্থাপন করিলে এ-দেশের আদিম নিবাসী 'ঘোড়ুই' জাতীয় লোক, ইহাঁদিগের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। প্রায় ৬০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে এই দলস্থ লোকেরা এ প্রদেশে আগমন করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, বীরসিংহ রায় এ-দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া, উক্ত আদিম নিবাসী প্রায় ৬০০ শত লোকের প্রাণ বিনষ্ট করেন। ঘোড়ুই জাতিকে চিনিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করেন। খেজুরের চটাইকে 'হেঘা' বলে; কিন্তু এই সম্প্রদায়স্থ লোক উক্ত শব্দকে বিকৃত রূপে 'হাঁঘা' এই প্রকারে উচ্চারণ করিয়া থাকে। যে সকল লোকে উক্ত শব্দটী পরিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারিত না, বীরসিংহ উহাদিগকে ঘোড়ুই স্থির করিয়া প্রাণ-দণ্ডের আদেশ করেন। যে ৬০০ শত লোকের প্রাণ নষ্ট করা হয়, উহাদিগের মুণ্ড (মস্তক) এক স্থানে, গর্দ্দান (দেহ) অপর স্থানে প্রোথিত করা হয়। যে স্থানে গর্দ্দান পোতা হয়, উক্ত স্থান 'গর্দ্দান মারী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। অদ্যাপি উক্ত উভয় স্থানই বিদ্যমান আছে।

শোলাঙ্কি রাজপুত দল এ প্রদেশে আসিয়া ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল। ইহাদের অত্যাচারে এ প্রদেশের লোক একেবারেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু-সমাজ এই দলস্থ লোকদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জন্য এই সম্প্রদায়স্থ লোক হিন্দুর নিকটে এত ঘৃণিত। প্রকৃতপক্ষে উহারা নীচ জাতি নহে। 'শোলাঙ্কিং' এই নামের অপভ্রংশ "শুকুলি" নামে উক্ত সম্প্রদায়স্থ লোক অভিহিত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, মহারাষ্ট্রীয় কোন রাজা এই অত্যাচারী লোকদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, উহাদিগের উচ্ছেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই জনশ্রুতি প্রকৃত ঘটনামূলক কি না, বলা যায় না। রাজস্থানের ইতিবৃত্তে দেখা যায়, ১২২৮ খৃঃ অব্দে শোলাঙ্কিং-কুলের শেষ রাজা মূলদেব পরাজিত হন। আনুহালবারাপত্তনে উহাঁর রাজত্বের ধ্বংস হইয়াছিল।

আমাদিগের অনুমান হয়, স্বদেশে পরাজিত হইয়া শোলাঙ্কিদলের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের জগন্নাথ দেব-দর্শন জন্য এ প্রদেশে আগমন করা অসম্ভব নহে। সেই স্বদেশ-তাড়িত ও পরাজিত দল দেশের স্নেহমমতা পরিত্যাগ করিয়া এ দেশে বসতি করা বিচিত্র কি?

তুমি মরিবে না কেন ?

সংসারে শত সহস্র যাতনা ভোগ করিতেছ, সহস্র অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছ, তথাপি জীবনে এত মমতা কেন ? যাতনা নিবারণের জন্য, অত্যাচারের প্রতিকার জন্য, তুমি মরিতে চাওনা কেন ? কালে কষাঘাত করিতেছে, আদর্শ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তোমার আদরের সংসার বিকৃত হইয়া উঠিতেছে, তবু তুমি মরিতে চাওনা কেন ? তুমি কাহারও জন্য জীবন দিতে পারনা কেন ?

এই অনন্ত দুঃখরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে প্রকৃত মনুষ্যমাত্রেই পরিশ্রান্ত। যখন পদে পদে অপমান সহ্য করিতে হয়, যখন মানীর মান রক্ষা হয় না, যখন মূর্খের নিকট অপদস্থ হইতে হয়, যখন অবিচারে দণ্ডিত হইতে হয়, যখন অজ্ঞানীর অধিন হইতে হয়, আর যখন জীবন দিলে ইহাদের প্রতিকার হয়, তখন কি জীবন প্রার্থনীয় ? অহঙ্কারী বিদ্রুপ করিতেছে, প্রণয়ী ঘৃণা করিতেছে, রাজা প্রতারণা করিতেছে, বিচারালয়ে অবিচার হইতেছে, তখন আর কি যন্ত্রণার বাকি রহিল ? যখন গুণীর গুণগ্রহণ কেহ করে না, যখন নিজের নিজত্ব রক্ষা করিতে কেহ পারে না। যখন স্ত্রী-কন্যার সম্মান বজায় রাখিতে পারে না, তখন কি জীবন প্রয়োজনীয় ?

যখন দেশের সর্ব্বত্রই কু দেখিতেছ, যখন দেশে-শিক্ষক, কু ছাত্র, কু স্বামী, কু স্ত্রী, কু পিতা কু শিক্ষা, কু আচার, কু ব্যবহার, যখন দেশে ভাল-মন্দ বিচার হইল না, কর্ত্তব্যের অর্থ কেহ বুঝিল না, তখন জীবন কি জন্য ? ব্যভিচার মধ্যে পড়িয়া যখন নিজের এবং পারিবারিক ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পার না, তখন জীবন কার জন্য ? আমার মান-সম্ভ্রম অপেক্ষা কি আমার জীবন মূল্যবান ? আমার মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যার ধর্ম্মাপেক্ষা কি তাহাদের জীবনের মূল্য অধিক ?

যখন রোমে দশবতার (Decemvirs) রাজত্ব করিতেন, যখন দরিদ্র ভার্জিনিয়স শুনিল, তাহার কন্যার পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে, তখন কি কন্যার জীবনের উপর বৃদ্ধের মমতা জন্মিয়াছিল ? যদিও কন্যা ভার্জিনিয়া বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন-ঘোর কৃষ্ণ-মেঘ-পরিব্যাপ্ত আকাশমণ্ডলের মধ্যে বিন্দু-পরিমিত নির্ম্মেঘ স্থানে যেমন একটি ক্ষুদ্রোজ্জ্বল তারকা রোম-রাজ্যে শত-সহস্র রমণীর মধ্যে সেইরূপ বৃদ্ধের একমাত্র জীবন-তারকা ভার্জ্জিনিয়া। চঞ্চল হরিণ-শিশুর মত বালিকা নাচিয়া-নাচিয়া বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, অবতার এপিয়স ক্লডিয়সের চক্ষে এ জ্বলন্ত রূপরাশি পড়িল ; পাশব-বৃত্তি অদম্য হইল। বৃদ্ধ শুনিল কন্যার পবিত্রতা শাসনকর্ত্তার প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসাইয়া দিতে হইবে। পিতা কন্যাকে একবার দেখিতে চাহিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা পিতার নিকট মনোবেদনা জানাইল। বৃদ্ধের হৃদয় নড়িল না ; মন চঞ্চল হইল না। তিনি ধীর স্থির ভাবে কন্যাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। পিতার স্থির প্রতিজ্ঞা কন্যা বুঝিল না। সে স্নেহময় জনকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

চারিদিকে রোম-রাজ্যের বিপণি-শ্রেণি। নাগরিকেরা আপন কাজে ব্যস্ত। বৃদ্ধ তখন এক কসায়ের দোকানে প্রবেশ করিলেন। একখানি ক্ষুরধার অস্ত্র চাহিলেন। বৃদ্ধের মনোগত অভিপ্রায় কেহই বুঝিল না। তখন সংসারের অমূল্য রত্ন জীবনের একমাত্র সোহাগের সামগ্রী অনিন্দ্য রূপের ডালি প্রাণাধিকা দুহিতার শিরে শাণিত অসি ধীরে স্থিরে সন্নিবেশিত করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন'নৃশংস অত্যাচারীর প্রবৃত্তি-স্রোত হইতে তোমার পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য আর কি তোমায় দিব ? ইহাই গ্রহণ কর" শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু বৃদ্ধের চক্ষের জল পড়িল না। রক্তাক্ত অস্ত্র লইয়া বৃদ্ধ সর্ব্বসমক্ষে উপনীত হইলেন। সমবেত ব্যক্তিবর্গের

...দয়ে প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই অগ্নিতে ...সন-কর্ত্তার অত্যাচার দগ্ধিভূত হইল ; রোমে ...বতার-রাজত্বের অবসান হইল।

আর তুমি, বৃদ্ধ হিন্দু ! তোমার স্ত্রীকন্যার ...বিত্রতা রোমকের পবিত্রতা হইতে ন্যূন ...সে ? তুমি ভার্জিনিয়স্ হইতে হতমান কিসে ? ...পমানের ভয়ে নহে, অপবিত্রায়—শঙ্কায় নহে ! ...বু তুমি জ্বলন্ত অত্যাচার বক্ষে ধরিয়া, উলঙ্গিত ...ভিচার অঙ্গে মাখিয়া, সুখে জীবন কাটাই...ছ। তুমি মরিবে না কেন ?

...কিছুতেই মরিতে চাওনা কেন ? নিজ ...বন ঘৃণিত করিয়াছ, পারিবারিক দেবভাব ...ক্ষুন্ন রাখিতে পারিতেছ না ; শত সহস্র ...ত্যাচার, পদে পদে মানহানী, কেন তবু ...রিবার নামে ব্যাকুল ? তোমার জীবনে আর রহিল ...? যাহার মনুষ্যত্ব আছে, তিনি কখনও মনু...ত্ব ত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে প্রস্তুত ...হন। মানী মর্য্যাদাশালী মহৎ ব্যক্তি ...র্য্যাদা হারাইয়া জীবিত থাকিতে চান না।

আর তুমি ? প্রসিদ্ধ হিন্দুবংশোদ্ভূত, পিতৃ...মহ-সঞ্চিত অমূল্য সম্ভ্রম বিনাশ করি...তেছ ! ইহার জন্য জীবন ত্যাগ করিবার ...থায় তুমি ক্ষুন্ন, ভীত, নিতান্ত কাতর ! কেন ? ...মনুষ্য কাহার নাম ? পুরাতন হিন্দু-বংশে ...মিয়া কাল-মাহাত্ম্যে আজ তাহাও কি স্মরণ ...াইয়া দিতে হইবে ?

তুমি প্রতারণা করিতেছ, নিজের স্বার্থে ...িয়া উপকারীর অপকার করিতেছ, মিষ্ট ...য় লোক ভুলাইয়া, উপরে চাকচিক্য মাখা... ভিতরে নিজের স্বার্থ-সাধন করিতেছ ! তবু ...ন মরিতে কাতর ? নিজের ক্ষুদ্রত্ব সন্তোষের ...্য বন্ধুভাবে মিলিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, ...ই বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিতেছে ! তুমি মরিবে না ...ন ? শিক্ষা-বিবর্জ্জিত হইয়া, অমার্জ্জিত বুদ্ধি ...য়া, অশুদ্ধ চেতা হইয়া, ধর্ম্মের নাম করিয়া ...র্ম বিক্রয় করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিতেছ,—নিজের ব্যবসা চালাইতেছ ! তুমি মরিবে না কেন ?

সর্প দেখিলে আমরা বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না। কেন ? সর্প খল ; সর্প অনিষ্ট করে ! কিন্তু তুমি যে সর্পাপেক্ষা খল ! যে তোমার উপকার করিয়াছে, যে তোমায় স্থান দিয়াছে, তুমি যে তাহারও অপকার করিতে কুণ্ঠিত নও ! তবে তুমি মরিবেনা কেন ? এই ভারবহ জীবন লইয়াও যে ব্যক্তি মরিতে চায় না, মরিবার নামে বড়ই কাতর, সে ব্যক্তির মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় নয় কি ? ঘৃণিত পদার্থ ভিন্ন তোমার জীবনে অবলম্বন নাই। যেমন নরকের কীট নরক ভিন্ন থাকিতে চায় না, নরক ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিয়া সুখ পায় না, সেইরূপ তোমার পৃথিবী নরক-তুল্য হইয়াছে ; পরিবার-মধ্যে বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার, সমাজ-মধ্যে পদাঘাত, অরাজকতা। এ অপমান সহ্য করিতে তোমার ক্লেশ হয় না ; এ পারিবারিক কুৎসায় তোমার হৃদয় নড়ে না। সুতরাং তোমার মরণ শ্রেয় নয় কি ?

মনুষ্যত্ব হারাইয়া, মান-সম্ভ্রম ডুবাইয়া, বংশমর্য্যাদা বিনাশ করিয়াও, কি সুখে জীবিত ? অতি সুখে রহিয়াছ, সুখে আহার-বিহার করিতেছ, সুখে নিদ্রা যাইতেছ ; তুমি মনুষ্য কিসে ? আহার-বিহার-নিদ্রা তোমার জীবিতোদ্দেশ্য ! অভ্যাসের তৃণ বিছাইয়া কুকুরের মত তাহার উপর শয়ন করিয়া আছ ; নিজের শয়ন-স্থান নিজেই অপরিস্কার করিতেছ, আবার সেই খানেই আহার-নিদ্রা করিতেছ। ঐ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া, ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া, সুখে নিদ্রা যাইতেছ—নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছ ! সুতরাং তুমি কি মনুষ্য ? চন্দ্র উঠিলে কুকুর চীৎকার করে ; সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া তুমি বিদ্রুপ কর, চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও। তোমাদের স্বভাব এক নয় কি ?

তোমার নিদ্রা ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিলেও

তোমার নিদ্রা ভাঙ্গে না। একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়াই, গা হাত ভাঙ্গিয়া, চারি পা ছড়াইয়া, নাক ডাকাইয়া আবার ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হও। তুমি কি?

কুকুরকে এক মুষ্টি অন্ন দাও; যদি আর একটা কুকুর তাহা খাইতে আইসে, তবেই উভয়ে বিবাদ লাগে। তোমারও তাহা নয় কি? যে তোমার শিশ্নোদরের ব্যাঘাত দেয়, সেই তোমার হৃদয়ে আঘাত করে। তখনই তুমি তাহার উপর চীৎকার করিয়া উঠ। তুমি পশু নও কি? মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব বিনাশ করিয়া কেবল পশুত্বে আমোদ পাও; কেবল পশুত্বের জীবন পরিত্যাগ করিতে চাও না। তোমার মরা উচিত নয় কি! ধর্ম্ম অপেক্ষা তোমার জীবন মূল্যবান হইয়াছে; তোমার শিশ্নোদর গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; তুমি মরিবে না কেন? তোমায় সমক্ষে তোমার গুরুর অবমাননা হইল, তোমার ধর্ম্মের নিন্দা হইল; তোমার তাহাতে ক্লেশ নাই! অভ্যস্ত ধর্ম্মোপদেশ তোমার মুখেমাত্র রহিল, সভাগৃহে প্রতিধ্বনিত হইল; কিন্তু কখনও হৃদয়ে অনুভূত হইল না! কখনও চরিত্রে ফলিত হইল না, কখনও তোমাকে মানুষ করিয়া তুলিল না, কখনও জীবন ব্যবহার করিলে না! পশুর আবার অন্য ধর্ম্ম কি? তবে তুমি মরিবে না কেন?

যখন নানক-ধর্ম্ম সজীব ছিল, তখন এক বিধর্ম্মী শিখ-ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছিল। শিখের প্রাণের বর্জিত। শিখ দণ্ডাঘাতে বিধর্ম্মীর মস্তক চূর্ণ করিল। বিচারালয়ে শিখ বিচারপতির নিকট অবিচলিত চিত্তে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল,—"নিন্দুককো তিন ডাণ্ডা লাগানে হোগা; এক ডাণ্ডাসে বেচারা মর গিয়া, আউর দো ডাণ্ডা বাকী হের।" এখানে ধর্ম্মের নিকট জীবনের কি উৎকর্ষ!

রাবণ সীতা হরণ করিল। রাম চতুর্দ্দশ বৎসর বহিয়া নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া, রাবণ বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন। তুমি বলিবে, সীতার উদ্ধারের জন্যই রাম লঙ্কাকাণ্ড করিলেন; পতিপ্রাণা সীতার শোকে অভিভূত হইয়া, সংসার-ললাম-ভূতা পত্নী-বিরহে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া, রাম তাহা নিবারণের জন্য রাবণ বধ করিলেন। এভিন্ন অন্য চিন্তা তোমার মনে উদয় হয় না। কিন্তু ডাক তোমার বৃদ্ধ বাল্মীকিকে! তখন দুর্ব্বল শরীরে সিংহাধিক পরাক্রম ছিল, মানীর মান-জ্ঞান ছিল, বংশমর্য্যাদার বহু-মূল্য ছিল; সমাজ-নেতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাই উপযুক্ত কারণই দেখাইলেন।

লঙ্কাজয়ের পর রাম সীতাকে আনিতে পাঠাইলেন। সীতা রথারোহণে আসিতেছেন। বেত্রঝর্ঝরপাণি উষ্ণীষধারী কঞ্চুকিগণ সৈন্যগণকে অপসরিত করিতেছে। রাম সৈন্যদিগের ক্লেশ দেখিয়া সীতাকে রথাবরোহণ করিতে বলিলেন। লজ্জাশীলা, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা জনকনন্দিনী লজ্জা-বশতঃ স্বীয় শরীরেই যেন বিলীন হইয়া গেলেন। তাঁহার দুই চক্ষে দরবিগলিত ধারা পড়িতে লাগিল। যাঁহার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহার, যাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর জীবন, আজ তিনি অনাদর করিলেন!

স্ত্রীর চক্ষে জল দেখিলে তোমার কর্তব্যজ্ঞান থাকে কি? বিশেষ, সীতার মত স্ত্রী! কিন্তু সীতার চক্ষুজলে রামের হৃদয় আর্দ্র হইল না; তিনি নিজের অভিপ্রায় বিস্মৃত হইলেন না। যে কারণে এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া রাবণ বিনাশ করিয়াছিলেন, মৃগী-বৎ উৎফুল্ল-লোচনা অশ্রু-পরিপ্লুতা জানকী-সম্মুখে এখন সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বলিলেন,—

"অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্যমে সফলঃশ্রমঃ।
অদ্যতীর্ণ-প্রতিজ্ঞোহহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ॥
সংপ্রাপ্তমবমানং যস্তেজসা ন প্রমার্জ্জতি।
কস্তস্য পৌরুষেণার্থো মহতাপ্যল্পচেতসঃ॥

যৎকর্ত্তব্যং মনুষ্যেণ ধর্ষণাং পরিমার্জ্জিতা।
তৎকৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিণা॥
নিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোহয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্য্যান্নত্বদর্থং ময়াকৃতঃ॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদঞ্চ সর্ব্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গস্য পরিমার্জ্জিতা॥"

অর্থাৎ অদ্য আমার শ্রম সার্থক, অদ্য পৌরুষ সার্থক, অদ্য আমি তীর্ণপ্রতিজ্ঞ হইলাম; অদ্য আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিতেছি। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, তদ্দ্বারা আমার অপমানের কারণ উৎপাটিত করিয়াছি। যে অপমানিত হইয়া তাহা প্রমার্জ্জিত না করে, সেই লঘুচেতা পুরুষের পৌরুষের আবশ্যক কি? অভিলাষ না থাকিলেও রাবণ বধ করিয়াছি; সুহৃদগণের বীর্য্যবলে তোমাকে জয় করিয়াছি। কিন্তু জানিও, তাহা তোমার নিমিত্ত নহে। তাহা অপমান অপনয়ণের জন্য—প্রখ্যাত রঘুবংশীয়গণের বীর্য্যবত্তা প্রদর্শন করিবার জন্য।

এখন, সেই বংশ নয় তোমার? কিন্তু কই তোমার তো কিছুতেই অপমান বোধ হয় না! তবে তুমি মরিবে না কেন?

সীতার পরীক্ষা হইল; সীতা গৃহীতা হইলেন। সীতা সাধ্বী; সীতা রামগত-প্রাণা। কিন্তু লোকাপবাদ গুরুতর! তাই অন্তঃসত্বা অবস্থায় বনবাস-আজ্ঞা হইল। গুরুজন দুঃখিত হইলেন; বন্ধু-বান্ধব বিষণ্ন হইলেন। সকলেই বলিলেন,—যদি বনবাস দিবে, তবে রাবণ বিনাশ করিয়া কেনই বা উদ্ধার করিলে; কেনই বা অগ্নিপরীক্ষা করিলে! রাম উত্তর দিলেন,—

"রক্ষো ধোন্তো নচ মে প্রয়াসঃ।
অর্থঃ স বৈর-প্রতিমোচনায়॥
অমর্ষণঃ শোণিত-কাঙ্ক্ষয়া কিং।
পদাস্পৃশন্তং দশতি দ্বিজিহ্বঃ॥"

অর্থাৎ রাক্ষস-বিনাসে বৃথা পরিশ্রম করি নাই। সে আয়াস বৈরশোধের নিমিত্ত। পদাহত সর্প যে ক্রুদ্ধ হইয়া দলনকারীকে দংশন করে, সে-কি শোণিত-পানের অভিলাষে?

কিন্তু তোমার তো এ অপমান জ্ঞান নাই! তুমি তো কখন বলিলে না,—

"Yet I
A dull and muddy-mettled rascal, peak,
Like a John-a-dreams, unpregnant of
my cause.
And can say nothing; no not for a
society,
Upon whose property and most dear life
A damn'd defeat was made?"

কখন তো বলিলে না,—

* *"for it cannot be
But I am pigeon-livend and lack gall.
To make oppression bitter; or ere this
I should have fatted all the region kites
With these knaves' offal."

প্রতিজ্ঞা মুখের কথামাত্র নহে।

"নচলতি খলুবাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ"।

অভ্যস্থ থাকিলেই সজ্জন হওয়া গেল না। শতবার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ; তজ্জন্য ক্লেশ নাই! তুমি মরিবে না কেন?

ভীমের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর! দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর! দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিল; সে বেণী ত্রয়োদশ বৎসর উন্মুক্ত রহিল!—দুঃশাসনের রক্ত ভিন্ন সে বেণী বন্ধন হইল না। কেন?—কেবল প্রতিজ্ঞার জন্য।

দুঃশাসন রাজ-সভায় অপমান করিল; দুর্য্যোধন উরু দেখাইল। ভীমার্জ্জুন ক্রোধে স্রোতপ্রোথিত বংশদণ্ডবৎ কম্পিত হইতেছেন; কেবল অগ্রজের আজ্ঞাপেক্ষা! নহিলে কটাক্ষে জগৎ-সংসার গ্রাস করিতে পারেন। কিন্তু আজ্ঞা তো মিলিল না! ভীম দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যদি দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিতে না পারি, যদি দুঃশাসনের

রক্ত-শোষণ করিতে না পারি, তবে আর, কুরু-বংশজাত বলিব না।

রক্তপান কি কেবল প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য নহে? আর, তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইতেছ; সময় সময় প্রতিজ্ঞা করিতেছ! কিন্তু প্রতিজ্ঞা সাধন করিতে গেলে তোমার শিশ্নোদরের পথ রোধ হয়; তোমার চাকুরী যায়; তাই তুমি প্রতিজ্ঞা তুচ্ছ করিলে! প্রাণের কাছে, স্ত্রী-পুত্রের কাছে তোমার প্রতিজ্ঞা হীন হইল! মনে মনে চক্ষু টিপিয়া বলিলে, "নীচ যদি উচ্চ-ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" কিন্তু এখানে নীচ কে? এরূপ জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? তবু তুমি মরিবে না কেন?

লোকে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করে কেন? পিতা-মাতার নাম উজ্জ্বল হইবে, বংশের প্রতিপত্তি বাড়িবে। কিন্তু পরিবার-মধ্যে তোমার স্থান কোথায়, বংশের জন্য তোমার কর্ত্তব্য কি, তুমি তাহাও বুঝিলে না! তুমি কি?

তোমার মত পিতৃ-পুরুষের আত্মা তোমার প্রতিকার্য্যের দর্শক। তুমি কিরূপে শোক-দুঃখ পরিপ্লবিত সংসার-পথে নিজের নিজত্ব রাখিয়া চলিতে পার, বংশের বংশত্ব রাখিয়া চলিতে পার, সোৎসুক হইয়া, তাঁহারা তাহাই দেখিতেছেন। তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতীত তুমি নিজ-স্থান ত্যাগ করিতে পারিবে না। সংসারের উপর, বংশের উপর, পিতৃপুরুষগণের উপর, তোমার দায়িত্ব ত্যাগ করিতে পারিবে না।

কিরূপে নিজের স্থান রক্ষা করিতে হয়? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। শত্রু-পক্ষ জাহাজে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে; একটু একটু করিয়া জাহাজে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। সকলে পলায়ন করিতেছে। কেবল একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া।

পিতা আজ্ঞা দিয়াছেন, জাহাজের যোদ্ধা ও কামান-রক্ষকদিগকে উত্তেজিত করিতে। চারিদেকে অগ্নি জ্বলিতেছে, সকলে পলায়ন করিতেছে; বালক কিন্তু স্বস্থান ত্যাগ করিল না। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না। পিতৃ-আজ্ঞা অপেক্ষা কি জীবন গুরু?

ক্রমে অগ্নি সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে মৃত শরীর সমুদ্র-বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। অগ্নির উত্তাপ অঙ্গ স্পর্শ করিল। বালক পিতৃ-আজ্ঞা লাভ-জন্য চীৎকার করিয়া ডাকিল। কোন উত্তর নাই। দুই একবার কামানের গর্জ্জন-মাত্র শুনা গেল। বালক ভয় পাইল; কিন্তু নড়িল না।

আবার পিতার অনুমতি চাহিল। অগ্নি আরও সন্নিকট হইয়াছে; যেন জিহ্বা বাড়াইয়া তাহার কেশরাশি আঘ্রাণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে! সেই আলোকে সুন্দর মুখ-কান্তি আরও সুন্দর দেখাইল। বালক আবার ডাকিয়া বলিল,—"পিতঃ! এখনও কি আমার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই!" বালক জানিত না যে, পিতা রণাহত হইয়া জাহাজের নিম্নে পড়িয়া আছে।

"পিতঃ! আমি কি এখনও এ জাহাজ ত্যাগ করিব না!"—কেহ এ চীৎকার শুনিল না। অগ্নি, কামান ও বারুদ স্পর্শ করিয়াছে। কপালে অগ্নি-শিখা লাগিল; বালক তথাপি নড়িল না।

বালক আবার চীৎকার করিল। আবার ডাকিল,—"পিতঃ! তবে কি আমি এই স্থানেই থাকিব!" উপর হইতে মাস্তুল আসিয়া পড়িল; বারুদে অগ্নি লাগিল; জাহাজ শব্দ করিয়া শত খণ্ড হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের মৃত দেহও সমুদ্র-জলে ভাসিয়া গেল।

তুমি কি এইরূপে স্বস্থান রক্ষা করিতেছ? কৃতবিদ্য তুমি, শিক্ষাভিমানী তুমি, ভবিষ্যৎ বংশের আশা তুমি! কিন্তু উমেদারী করিতে

তোমার লজ্জা হয় না; অপমান, শ্লেষ-বাক্য তোমার গায়ে লাগে না; অপমান খাইয়া তুমি চাপিয়া রাখ। তুমি মরিবেনা কেন? ঘৃণিত পশুর মত তুমি নিজের রক্ত নিজে পান করিতেছ। তুমি বংশ-মর্য্যাদা রাখিবে কিরূপে? তুমি ধর্ম্ম-সমাজে চোর, কুলের কুলাঙ্গার, মনুষ্যজাতির কণ্টক, মানব-নামের অযোগ্য। তুমি জীবন লইয়া কি করিবে?

সদাশয় মহৎ অন্তঃকরণ ব্যক্তিদিগের মত যদি জীবন তোমার পক্ষে ভারবহ হইত, আমি তোমায় জীবন দিতে পারিতাম। কিন্তু হতভাগ্য তুমি, জীবনের শত-সহস্র অপমানে অপমানিত হইয়াও তুমি চোরের-মত ভদ্র-সমাজ হইতে দূরে যাইতেছ: ইহার দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছ, ইহার শত-সহস্র পাপে ডুবিয়া রহিয়াছ। তুমি জীবন ভোগ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু দেখ দেখি, তোমা হইতে মহদাত্মা ব্যক্তিগণ কত প্রকারে প্রতারিত! অজ্ঞাত-নামা অজ্ঞাত-কুলশীল পাষণ্ড তুমি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রতারণা করিয়া তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিতেছ! কসায়ের কুকুরের মত তুমি ঐ গলিত কীটব্যাপ্ত মাংসখণ্ড ভক্ষণ করিয়াও জীবিত থাকিবে! কিন্তু তোমার চারিধারে ধর্ম্মাত্মা, সাধুপুরুষেরা অপমানিত হইতেছেন, দণ্ডিত হইতেছেন; সুতরাং তোমারে এইরূপ সুখ-ভোগ করিতে আমি দিব না। ঘৃণিত পরিত্যক্ত কুকুর তুমি, ধর্ম্ম-সমাজে চোর তুমি, পিতামাতার কুলাঙ্গার তুমি, মনুষ্য-জাতির কণ্টক তুমি, মানব-নামের অযোগ্য তুমি! তোমার জীবন লইয়া কি হইবে? তাই বলি, মরিবার জন্য প্রস্তুত হও!

ঐ দেখিতেছ না, তোমার ভ্রাতৃবধু তোমার ভ্রাতৃত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তোমার বক্ষের উপর নৃত্য করিতেছে! ছি ছি!—তবু তুমি জীবিত? তোমার স্ত্রী তোমার কুকুর-স্বভাবে ন্যক্কার তুলিয়া তোমার চক্ষের উপরে অন্যকে আহ্বান করিতেছে; তথাপি তুমি জীবিত? দেখিতেছ না, তোমার কন্যা তোমার ন্যায়ান্যায় বিচারের উপর খড়্গহস্ত হইয়া, তোমার মনোনীয় বরে আত্ম-সমর্পণ করিতে অস্বীকৃতা হইয়া, তোমার সম্মুখেই তোমার অপমান করিতেছে; তথাপি তুমি জীবিত? দেখিতেছ না, তোমার পুত্র তোমার লাম্পট্যে ব্যথিত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছে; তথাপি তুমি জীবিত? দেখিতেছ না, তোমার জননী তোমার প্রখরা সহধর্ম্মিণীর অত্যাচারে লাঞ্ছিত হইয়া ও তদপেক্ষা তোমাকে সেই স্ত্রীর দাসত্ব করিতে দেখিয়া, জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন; তথাপি তুমি জীবিত? দেখিতেছ না, তোমার সহোদর তোমার স্বভাবে ধিক্কার দিয়া তোমার জন্য দেশত্যাগী হইতেছে; তথাপি তুমি জীবিত? দেখিতেছ না, তোমার কন্যা তাহার মাতার অস্বাভাবিক পশুত্বে জর্জ্জরিত হইয়া জগতের সমক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছে; আর তুমি তাহাই কাপুরুষের মত অর্থানুকূল্যে গোপন করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিতেছ! তথাপি তোমার জীবন প্রার্থনীয়?

কোন একটা সৎকার্য্যে জীবন নিযুক্ত কর; কোন একটা সৎকার্য্যে জীবন ক্ষয় কর; স্ত্রী-পুত্র মরে মরুক! তুমি তাহাদের কি করিবে? তুমি কপট, তুমি কর্ত্তব্যহীন, তুমি চুরি করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে; তদপেক্ষা কি তাহাদের মৃত্যু ভাল নয়! তুমি তাহাদের স্বভাব বিকৃত করিতেছ; তদপেক্ষা তাহাদের জীবন-নাশ শ্রেয়স্কর। তুমি মরিলে পুত্র-সন্তান মরিবে, এই দোহাই দিয়া বংশ কলঙ্কিত করিও না; তাহাদিগকে নরকের মধ্যে সুখভোগ করিতে পরামর্শ দিও না। এখনও পথ আছে। যাহাতে তাহাদের অপমান হয় দেখিতে পাও, যাহাতে বংশের অপমান হয় বুঝিতে পার, তাহা নিবারণের জন্য

বদ্ধ পরিকর হও, তাহার জন্য জীবন বলি দাও। তুমি চুপ করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে, তদপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুও বাঞ্ছনীয় নয় কি? তবে সংসারে এত আবদ্ধ কার জন্য? যদি মান-সম্ভ্রম যায়, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব যায়, যদি পুত্র-ভ্রাতা স্বেচ্ছা-চারী হয়, যদি বিধবা বধু তোমার অশৈথিল্যে ব্রহ্ম-চর্য্যায় অপারগ হইয়া কাল সর্পের মত তোমার বংশকে ধ্বংশ করিতে থাকে, তবে কি তুমি—যাহা ঐ সমস্ত বিপদের মূল, তাহা উচ্ছেদের জন্য, জীবন দিতে পার না? যে সংসারে মৃত, তাহাকে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞাপন *।

বিরাট উপহার !

অভাবনীয় উপহার !! সর্ব্বস্ব উপহার !!!
যাহা কখনও হয় নাই, কখনও হইবে না!

আজকাল উপহারের বড়ই ঢেউ! উপহার না পাইলে ক্রেতারও জিনিস কেনা হয় না, আর বিক্রেতাও উপহার না দিয়া আজকাল জিনিস বেচেন না! সুতরাং বাজারে 'উপহার উপহার!'—ভিন্ন আর কথা নাই! আর, 'উপ-হারেও' আজকাল সর্ব্বস্ব না পাইলে লোকের মন উঠে না; ঘড়ি, ঘড়ির চেন, ছবি, আংটি, শাল, দোশালা, শাস্ত্র, অশাস্ত্র, আজকাল কথায় কথায় এ সকল জিনিসই উপহারে বিতরিত হইতেছে। অধিক কি, শেষে মিসেস্ গাঙ্গুলী, মিসেস্ বসুও উপহারে বাহির হইয়াছেন।

কাজেই এখন আর উপহার দিবার জিনি-ষও দেশে খুঁজিয়া পাওয়া ভার! গ্রাহক ভুলিবে কিসে, সদাই মনে এই ভাবনা! অধিক কি, দিব্য করিয়া বলিতে পারি যে, কয় রাত্রি কয় দিন সে ভাবনায় আমাদের আর ঘুমটুকু পর্য্যন্তও হয় নাই। যাইহোক, ক্রমে এত পরিশ্রমের ফল ফলিয়াছে; অবশেষে কিন্তু উপহারের এক জিনিস খুঁজিয়া পাইয়াছি অথচ এপর্য্যন্ত যে জিনিস উপহার দেওয়া কাহারও কল্পনায় আসে নাই—যাহা কেহ কখনও ভাবিতেও পারেন নাই। অথচ সে জিনিস মফস্বলের লোকের পক্ষে অমূল্য—অপ্রাপ্য! অধিক কি, এমন উপাদেয় জিনিস জগতেই আর নাই!

এখন সুতরাং বলা আবশ্যক, উপহার কিসের!

উপহার—'অশান্তির!'

পাঠকগণ ইহার নূতন নাম শুনিয়া চমকা-ইবেন না; ভাবিবেন না যে,—'এ আবার কি এক উদ্ভট জিনিস!' কারণ, এ অপূর্ব্ব জিনিসের আস্বাদ অল্পাধিক পরিমাণে আপনারা সকলেই উপভোগ করিয়াছেন; সকলের ঘরে ঘরেই একটু না একটু এ তুষাগ্নি ধূমায়িত আছেই। কিন্তু হতভাগ্য আপনারা, তাই এপর্য্যন্ত ইহার পূর্ণ আস্বাদ আপনাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। সর্ব্বজ্ঞ আমি, তাই আপনাদের সে মনোকষ্ট বুঝিয়াছি; দয়ার আধার আমি, তাই দয়া করিয়া সেই চির-আকাঙ্কিত 'অশান্তিকে' আপনাদের ঘরে ঘরে পাঠাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে বাসনা করিয়াছি। অধিক কি, শুনিলেও চমকিত হইবেন যে, সে 'অশান্তি' কি!

---

* বড়ই ব্যথিত অন্তকরণে আমরা 'শ্রীবেকারচন্দ্র বয়াটে',-স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞাপনটী পত্রস্থ করিলাম। কতকগুলি বিজ্ঞপনদাতার দৌরাত্ম্যে আজ কাল প্রকৃতই উপহারের এইরূপ বাড়াবাড়ি হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এ বয়াটেরও উপহার নূতন নহে;—প্র-কৃতই এইরূপ ভাবে গ্রাহক-সংগ্রহের চেষ্টা হইয়া থাকে এ অপেক্ষা সমাজের অধঃপতন আর কাহাকে বলে?—সম্পাদক।

ইহা অষ্টাদশ মহাপুরাণ নহে, অথচ তাহা অপে-ক্ষাও বড়। মহাপুরাণগুলি পড়িতে যত সময় লাগুক না কেন, সত্য করিয়া বলিতেছি, ইহাতে তদপেক্ষা অধিক সময় কটিবেই কাটিবে। ইহা বেদ, কোরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, বাই-বেল সকলের অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। সংবাদ-পত্রের মধ্যে পৃথিবীতে ঋতুপত্র আছে, মাসিক পত্র আছে, পাক্ষিক পত্র আছে, সাপ্তা-হিক পত্র আছে, দৈনিক পত্র আছে; আবার দণ্ডে দণ্ডে 'দাণ্ডিক' পত্র ও ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'ঘাণ্টিক' পত্রও প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের এ 'অশান্তির' গ্রাহক হইলে একাধারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যাইবে; ঘাণ্টিক, দাণ্ডিক প্রভৃতি তো দূরের কথা, এক কথায় ইহা 'সার্ব্বক্ষণিক'; অর্থাৎ সকল সময়েই যেখানে সেখানে বসিয়া ইহার আস্বাদ উপভোগ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, স্বর্গ পর্য্যন্তও ইহাকে সাথী পাইবেন। সুতরাং কিছুকাল ধরিয়া ভাবুন সকলে, এহেন জিনিস কতই কষ্টে গ্রাহকের জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। এক কথায় বলিতে কি, ইহার মূল্য নাই; দাম লইয়া কেহ কখনও ইহা বেচিতে পারেন নাই ও পারিবেন না।

মূল জিনিস তো এই, তা'র উপর আবার

উপহার!

উপহারও আবার যেমন তেমন উপহার না। যেমন মূল জিনিস, উপহারও ঠিক তাহার অনুযায়ী উপহার!—একরূপ সর্ব্বস্বই উপহার। যেমন শ্রীরাধা নহিলে শ্রীকৃষ্ণ সাজে না, যেমন পার্ব্বতী নহিলে মহাদেব ভিখারী, যেমন চুম্বকের সহিত লৌহের সম্প্রীত, তেমনই এই মূল জিনিসের সহিত উপহারের সম্পর্ক। ফলে যেমন মূল জিনিস, তেমনই তাহার উপযোগী বিরাট উপহার! তাহা দেখিলে নয়নে তৃপ্তি জন্মে, আস্বাদে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয়, হাতে পাইলে যেন 'স্বর্গের চাঁদ!' গ্রাহকদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য এ হেন জিনিস, বহু কষ্টে—গ্রাহকদিগের বহু-জন্মজন্মান্তরের পুণ্যবলে, সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া আসিতেছি। আশা, অনেক গ্রাহক জুটিবে; লইবেন না, এমন লোকই জগতে নাই! তাই সেই অপূর্ব্ব জিনিস সংগ্রহ করিয়া, কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পল্লীতে স্তরে স্তরে গুদামজাত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি। ক্রয় করা না করা পরের কথা, একবার সকলে আসিয়া তাহা দেখিয়াও অন্ততঃ চক্ষুকর্ণের সার্থকতা সম্পাদন করুন। দেখুন, তাহাদের কি মন-মজান বাহার! কি প্রাণ-ভুলান চটক!

উপহার বিতরণের সময় কিন্তু অধিক নাই! বিজ্ঞাপন বাহির হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই, কি জানি কিরূপে আসমান হইতে সংবাদ পাইয়া, ইহার এত অধিক গ্রাহক জুটিয়াছে যে, আমরা উপহারের মাল আর আমদানী করিয়া উঠিতে পারিব কি না, সন্দেহ। আপাততঃ ডিপো বোঝাই হইয়াছে;—কলি-কাতায় আর স্থানাভাব। সুতরাং সকলে শীঘ্র টাকা পাঠান, আমরা তাঁহাদিগকে উপহার বিলি করিয়াও তৃপ্ত হই। নতুবা এত আমদানী যে, স্থানাভাবে তাহার ঘেঁসাঘেঁসীতে মেশামে-শিতে আমরা মারা যাই! যায়গা কুলাইতে পারিতেছি না!

উপহারের জিনিসটি কি, এত ব্যাখ্যাতেও যে সকল গর্দ্দভ গ্রাহক বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহারা এখন স্থিরচিত্তে এক একটী ফল হাতে করিয়া শুনুন; সে অপূর্ব্ব উপহারের নাম,—

'বারনারী'-উপহার।

তা'ও আবার যিনি ঘরবাড়ী শুদ্ধ উপহার চান, যিনি গহনা-পরান শুদ্ধ উপহার চান, যিনি খাট-বিছানা-বালিস-মশারী সহিত চান. অধিক কি, যিনি স্বয়ং সুরধনীকেও সঙ্গিনী করিতে চাহেন, তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া নামধাম লিখিয়া

সত্বর আবেদন করুন। এবং যাঁর যেটীকে ইচ্ছা, ডিপো হইতে বাছিয়া লউন। বিলম্বে ব্যাঘাত ঘটিবে;—ভাল জিনিস অপরে বাছিয়া লইবে। সুতরাং সত্বর—সত্বর!—গ্রাহকগণ আপনাদের চৌদ্দ পুরুষের দিব্যি, সত্বর—সত্বর! নহিলে শেষে পরিতাপ করিতে হইবে। অধিক কি, এ মাল ডাক ঘরেও খোয়া যাওয়ার সম্ভব; যে পোষ্টমাষ্টার বাবুরা পুস্তকের প্যাকেট হইতে পুস্তকগুলি আস্তে আস্তে লইয়া কাঠ পুরিয়া দিতে পারেন, তাঁহারা তো এ পাইলে কৃতার্থ হইবেন। এবং তার বদলে প্যাকেটে যে কি পুরিবেন, বলা যায় না।

বিশেষ, এ উপহারে আবার কিছুমাত্র প্রতারণা নাই; কিছুমাত্র ঠকামি নাই। মহারাজা সূর্য্যচন্দ্র কে, সি, এস, আই; বাহাদুর ক্রোড়পতি খাঁ জি, পি, এস, কে, ওয়াই, জেড; উপলাটের মন্ত্রী ঘনেশ্যামচন্দ্র এইরূপ ভারতের প্রধান প্রধান মুরুব্বিগণের তত্ত্ববধানেই উপহারগুলি 'রক্ষিত' আছে। সুতরাং নষ্ট হইবার ভয় নাই—কাহারও বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা নাই।

আরও স্বর্গে টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে। সেখান হইতে স্বয়ং উর্ব্বশী আসিয়া স্বহস্তে উপহার বিতরণ করিবেন। সুতরাং সত্বর—সত্বর! উপহারের মাল বুঝিবা ফুরাইয়া যায়!

বিজ্ঞাপনদাতা
স্বয়ং শ্রীবেকারচন্দ্র বয়াটে।
ঠিকানা, চুলো।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

গ্রাহকগণ সাবধান।

আগামী ৩১এ মার্চ্চের পর হইতে ডাক বিভাগের নিয়ম পরিবর্ত্তন হইবে, তখন আবার মনিঅর্ডার-ফি জমা না দিলে ভ্যালুপেয়েবলে প্যাকেট পাঠান যাইবে না। তজ্জন্য ঐ সময়ের মধ্যে মফঃস্বলের বিস্তর ভদ্রলোকের নামে প্রতারকগণ এক জিনিষ বলিয়া আর এক জিনিস ভ্যালুপেয়েবেলে পাঠাইবার যোগাড় করিতেছে। সুতরাং সকলে সাবধান; বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া তাহাদের এ মরসুমে কেহ না ঠকেন, এই বাসনা।

নূতন অভিযোগ।

রহমতপুর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু বিলাসচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মহাশয়, বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয় যে, শব্দার্থ-রত্নসার অভিধান বিনামূল্যে বিতরণ করিব। তদনুসারে আমাদের স্কুলের একটি ছাত্র উহা পাইবার জন্য পত্র লিখিয়া আমার ঠিকানায় পাঠাইতে বলে। এই উপায়ে আমার ঠিকানা জানিয়া বাগবাজার, আদারণী-কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস পূজার পূর্ব্বে ভ্যালুপেয়েবেল ডাকে আমার নিকট হিন্দুধর্ম্ম 'প্রকাশিকা' পত্রিকা পাঠান। একখানি মুদ্রিত পত্রও পাঠান, তাহাতে অনেক বিনয়ের কথাও আছে। আর, তাহাতে এই অঙ্গীকার লেখা আছে যে, যদি পত্রিকা কতক বাহির হইয়া আর বাহির না হয়, তবে যে পত্রিকার এক বৎসরের মূল্য দিবেন, তাহার বিনিময়ে তাঁহাদিগের প্রেরিত মূল্যের চতুর্গুণ মূল্যের আমাদের কার্য্যালয়ের প্রকাশিত যে কোন পুস্তক পাইবেন। ছয়মাস উপর্য্যুপরি কোন পত্রিকা না পাইলেই বন্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই পত্র দেখিয়া এবং হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা বলিয়া, অগত্যা পক্ষে এক বৎসরের মূল্য দিয়া গ্রাহক হইলাম। কিন্তু ভ্যালুপেয়েবেলে তিন সংখ্যা মাত্র পত্রিকা পাঠাইয়াছিলেন; সে তিন খানি ১২৯৪ সনের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের প্রকাশিত; যাহাহউক, গত আশ্বিন মাসে ঐ পত্রিকা তিন খানি দিয়াই প্রকাশক ডুব দিয়াছেন; আর দেখা দেন না। কার্ত্তিক মাসে হঠাৎ আবার উপন্যাসলহরী নামে কতকগুলি পত্রিকা ভ্যালুপেয়েবেলে পাঠাইয়াছিলেন। আমি

গরীব, আমি তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে অসামর্থ হইয়া তাহা ফেরত দিয়াছি। এই সময় আর একখানি মুদ্রিত পত্র প্রেরণ করেন; তাহাতে লেখা, আপনার 'হিন্দু ধর্ম্ম-প্রকাশিকা' শীঘ্রই মুদ্রিত হইতেছে। যাহাহউক, ইহার-পর যত পত্র লিখি, তাহার কিছুরই উত্তর নাই; পত্রিকার সঙ্গেও দেখা নাই। বাবু যে একজন প্রসিদ্ধ * *, তাহা বেশ জানিলাম।"

ছাপাই জবাব।

'পাগলিনী' কাগজ ও তাহার প্রকাশক লালমোহন বিশ্বাস-সম্বন্ধে অনুসন্ধানে যে সকল অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি সে কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই তাহার জবাব দিয়াছেন। কিন্তু দেখুন পাঠক, সে নিজের জবাবে তিনি নিজেই আবার কতদূর দোষী বলিয়া সাব্যস্থ হইতেছেন;—

"মহাশয়,—"পাগলিনী মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছে, সে জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আর্য্যাবর্ত্ত প্রেসের প্রিণ্টার বাবু বেচুলাল গুপ্ত মহাশয়ের দোষে পাগলিনীর ১ম সংখ্যায় অসংখ্য ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত প্রেসের কম্পোজিটারগণকে ধন্য! আমার অনবধানতা বশতঃ 'আমার সতী' ও 'চম্পকলতা' নামক দুইটী কুৎসিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রিণ্টার মহাশয় আমার বিনানুমতিতে ডাক্তার নিমোল দত্তের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তো পড়িবার যোগ্য নহে। এই সকল কারণে 'পাগলিনী' প্রকাশ বন্ধ করিয়াছি।"

কি অদ্ভুত জবাব! বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি যে কাগজে লিখিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপনে তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে কাগজের শেষ এই পরিণাম! যাইহোক, বেচুলাল ও লালমোহন বাবু ক্রমে এক দলস্থ হইয়া দাড়াইলেন, এই ক্ষোভ!

গ্রাহকগণের দৌরাত্ম্য।

১। বাবু শ্রীনাথ সরকার, ওসমানপুর, জনিপুর পোঃ, কুমারখালি। এই ঠিকানায় আমাদের একজন গ্রাহক আছেন, তাঁহার নামে কাগজও নিয়মিত বিলি হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের মূল্যের তাগাদা করিয়া ভ্যালুপেয়েবলে সে নামের কাগজ পাঠাইলে, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্যাকেট ফেরত আসিয়াছে; এবং আরও আশ্চর্য্যের কথা যে, প্যাকেটের উপর পিওনের সহি-সহিত আবার লেখা আছে,—"শ্রীনাথ সরকার, ওসমানপুর গেরামে কেহই না থাকায় ফেরত দিলাম।" যাইহোক, এরূপ সকল প্যাকেট ফেরত ডাক-বিভাগেরও বড়ই কলঙ্কের কথা! টাকার বেলাই কেহ থাকে না, আর কাগজ বিলির সময় লোক থাকে, এই আশ্চর্য্য!

২। বাবু বিহারীলাল দাস, রোটনা হাসপাতাল, সেলুর্ক পোঃ, আসাম।—এ নামের ভ্যালুপেবেলও পূর্ব্বে একবার ঐরূপে এবং দ্বিতীয় বার 'রিফিউজ' হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার বাবু ও পোষ্টমাষ্টার উভয়ের পক্ষেই ইহা অবশ্যই গৌরবের কথা বলিতে হইবে!

সংবাদ।

—আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কে সামান্য লোকের কিরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখুন। একজন লোক পথে পথে বৃহৎ বিজ্ঞাপন পত্র লটকাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লোকটী একটী বিজ্ঞাপন-পত্র মারিতে বাহির হইয়া এক স্থানে দেখে, একটী অশ্ব পথের উপর হঠাৎ পঞ্চত্ব পাইল। অবশ্যই অশ্ব দেখিবার জন্য অনেক লোক একত্রিত হইবে দেখিয়া, সে সেই ঘোটকটীর উপরে বিজ্ঞাপনের কাগজখানি খুলিয়া রাখিয়াছিল। যত লোক ঘোটক দেখিতে জুটিয়াছিল, সকলেই বিজ্ঞাপন পাঠ করিল। আমাদের দেশে এরূপ বুদ্ধিমান বিজ্ঞাপন মারিবার লোক আছে কি?

—ইদাহো প্রদেশে হেনরী হ্রদে একটী ভাসমান দ্বীপ

আছে। দ্বীপের ব্যাস ২০৫ হাত হইবে; এবং দ্বীপটী বাতাসে চলিয়া বেড়ায়। কখন হ্রদের তীরভূমে আসিয়া দ্বীপটী অনেক দিবস রহিল, তৎপরে হঠাৎ এক দিবস প্রাতে তীর-ভূমির লোক-জনেরা দেখে, দ্বীপ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে কতই আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

—ইতিপূর্ব্বে পারিসে সুন্দরীগণের প্রদর্শনী হইয়াছিল। কিন্তু এখন আবার এ শুনি কি? এখন আবার আমেরিকাতে নাকি একটী কুরূপের প্রদর্শনী বসিবে। সে প্রদর্শনীতে যে স্ত্রীর মুখ সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত বিচারিত হইবে, তিনি ৫০০০, হাজার ডলার পাইবেন। এবং সেই কুৎসিত নারীর ফটোগ্রাফ ইউনাইটেড ষ্টেটসের সমস্ত বড় বড় সংবাদপত্রে ছাপা হইবে।

—আমেরিকার সকলিই আশ্চর্য্য। ইউনাইটেড ষ্টেটে বি-হোটেল নামে একখানি বাড়ী একস্থান হইতে উঠাইয়া আর এক স্থানে স্থাপিত করা হইয়াছে। হোটেলের ওজন ২ লক্ষ মোন; ৫ তলা বাড়ী। ৪৮০ ফিট দৈর্ঘ্য, ২০০ ফিট প্রস্থ মাপ ছিল। কিন্তু বাড়ীর কোন অংশ খারাপ হয় নাই।

—মান্দ্রাজের ৫ জন দেশী খৃষ্টান, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্মে আসিবার জন্য হিন্দু-সমাজে আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা খৃষ্টায় ধর্ম্মের রহস্য বুঝিয়া এখন এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন।

—মগরার নিকট কোন স্কুলের শিক্ষক কোন ছাত্রকে প্রহার করায় হুগলির জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হন; বিচারে তাঁহার ২০, টাকা জরিমানা হইয়াছে।

—জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত মুক্তাগাহা গ্রামে কোন জমিদার বাবুর বাটীতে একজন চাকরাণী ছিল। এখনও সে জীবিত আছে। এক দিন অতি প্রত্যূষে সে তাহার নিজ বাড়ির পাশে মাঠে গিয়াছিল; হাতে একটিমাত্র জল-পূর্ণ গাড়ু ছিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার পশ্চাতে এক বাঘ দেখিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। আর, চীৎকার করিয়া অথবা দৌড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই বুঝিতে পারিয়া, স্থিরচিত্তে সে বাঘের দিকে সমুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল; এবং বাঘ কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করিয়া যেমন তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে, অমনি সে একটি ভীমনাদ করিয়া দুই হাতে গাড়ু ধরিয়া বাঘের ঠিক কপালে এক আঘাত করিল। আর, সেই এক আঘাতেই বাঘের জীবন শেষ! সেই অবধি "বেঘোভীমা" বলিয়া সে ময়মনসিংহ জেলায় প্রসিদ্ধ হইয়াছে

—কুষ্ঠরোগ সংক্রামক বলিয়া, লর্ড ল্যান্স ডাউনের গবর্ণমেণ্ট কুষ্ঠরোগিগণ যাহাতে সদর রাস্তার যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইতে না পায়, সে ব্যবস্থার চেষ্টা দেখিতেছেন।

—টীকা দেওয়া ইংলণ্ডে আইনবিধেয় কার্য্য। ফ্রান্সে তাহা নহে, তথায় লোকের ইচ্ছাধীন। তথাপি ফ্রান্সে বসন্তে অধিক মৃত্যু হয় না। তথাকার বড় বড় সহরে হাজার করা গড়ে বসন্তে ০.৩১ মাত্র মৃত্যু হইয়া থাকে।

—আলেকজাণ্ডর জ্যাক্‌স্ নামে একজন ফরাশি একাদিক্রমে ৩০ দিন উপবাস করিয়াছিল। কেবল জল মাত্র পান করিয়া বাঁচিয়াছিল।

—দুধে জল মিসাইয়া বিক্রয় করা অপরাধে সম্প্রতি কলিকাতা সহরের পাঁচজন দুগ্ধবিক্রেতার অর্থদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহারা নিরস্ত নহে।

—কাশ্মীর রাজ্যে মহা হাঙ্গামা বাধিয়াছে। প্রকাশ, মহারাজা নাকি ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং ভূতপূর্ব্ব রেসিডেণ্টকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিতেই কলিকাতায় আসিয়াছেন। কাশ্মীরের ভাগ্যে যে এরূপ ঘটিবে, তাহা আমরা অনেক দিনই বুঝিয়াছি।

—আজকাল সকল সংবাদ-পত্রেই "সঞ্জীবনী" নামক ব্রাহ্মদের কাগজখানিকে "ছিছি" করিতেছে। কাগজে মিথ্যা কথা লিখিয়া বাহাদুরী লইতে গিয়া, সেদিন একটা মকর্দ্দমায় পড়িয়া সঞ্জীবনীর অনেক রহস্য বাহির হইয়াছে। প্রকাশ্য আদালতে হলপ করিয়া সঞ্জীবনীর ম্যানেজার নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি প্রকাশকের অর্থ জানে না, সম্পাদকের তো কোন খোঁজ-খবরই রাখেন না। প্রকাশকের সহিতও সম্পাদকের কোন সম্বন্ধ নাই; কে কাপী দিল, কে কাগজ সম্পাদন করিল, প্রকাশক তাহার কোন খোঁজই রাখেন না। আর, এইরূপ এজাহার শুনিয়া বিচারক হাকিমও নাকি ম্যানেজারকে প্রকারান্তরে সর্ব্ব-সমক্ষে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। সঞ্জীবনীর সম্পাদক (অন্ততঃ আমরাও যাঁহাকে সম্পাদক বলিয়া জানি) তিনিও নাকি নিজের সম্পাদকত্ব গোপন করিয়া মকর্দ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছেন। এবং সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া শেষে গরিব প্রিণ্টারের ঘাড়ে দোষ চাপানয় তাহার দেড়শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। গরিব প্রিণ্টার ১০, কি ১২, টাকা বেতন পায়; দেখুন দেখি পাঠকগণ, ভায়ারা বাহাদুরী লইতে গিয়া তাহাকে কি বিপদে ফেলিয়াছেন!

অনুসন্ধান।

:০(০)০:

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩১এ চৈত্র, ১২৯৫ সাল। [১৭শ সংখ্যা।

শ্যামা-সঙ্গীত।

মূলতান—একতালা।

"দোষ কারু নয় গো মা!
স্ব-খাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!
ষড়রিপু হলো কোদণ্ড-স্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল কালরূপ জল, কাল-মনোরমা!
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
বিগুণ করে'ছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে;
বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি চরণ-তরী দিলে ক্ষমঙ্করী করি ক্ষমা।"

ওস্তাদী জুয়াচুরী।

"আচ্ছা, আপনারা কত কমিসন পেলে পারেন!"

"শতকরা পাঁচ টাকার কম কিছুতেই নহে!"

"২০ হাজার টাকার বিষয়ে, শতকরা পাঁচ টাকা ক'রে কমিশন—এ যে ঢের বেশী!"

"না, আমাদের বড় সাহেবের নিয়ম, এর কমে আমরা কিছুতেই পারিব না।"

একটি নিলাম-কোম্পানীর আপিসে, আপিসের বড় বাবুর সহিত একজন মাড়োয়ারী মহাজনের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে। মাড়োয়ারী মহাজনটীর কলিকাতার বড়বাজার পল্লীতে একটী বাড়ী আছে; এবং সেই বাড়ীটি তিনি নিলামে বিক্রয় করাইবেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে ঐ আপিসের সহিত সেইরূপ বন্দোবস্তের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা, তিনি ঐ নিলাম-কোম্পানীর উপর বাড়ী বিক্রয়ের সমস্ত ভার দেন; এবং কোম্পানী বাড়িটী বিক্রয় করিয়া দিয়া, নিজেদের পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু লইয়া, বক্রী টাকা তাঁহাকে ফেরত দেন, এই তাঁহার বাসনা।

নিলাম-কোম্পানী কিন্তু কিছুতেই শতকরা পাঁচ টাকার কমে বাড়ীটি বিক্রয়ের ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং অগত্যা মহাজনটী তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া ও বিক্রয়ের ভার তাঁহাদের উপর দিয়া, সে দিনের মত চলিয়া

গেলেন; কোম্পানীকে বলিয়া গেলেন,—"সপ্তাহ পরে আবার একদিন আসিবো! সে দিন যেন বাড়ী বিক্রয়ের টাকা পাই!"

এইরূপ বন্দোবস্তের পর, কোম্পানী চারিদিকে বিজ্ঞাপন জাহির করিলেন। বাড়ীটি বিক্রয় করিবার নানারূপ সন্ধান-সুলভ খুঁজিতে লাগিলেন। এক দিন দুই দিন করিয়া ক্রমে ৪।৫ দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু খরিদদার তেমন জুটিল না। অনেকেই কম দর দিতে লাগিল; কেহ কেহ বা সন্দেহ করিয়া দরই দিল না।

* * * *

ষষ্ঠ দিনে কিন্তু কোম্পানীর আপিসের দরজার একখানি জুড়িগাড়ি আসিয়া লাগিল। গাড়ীতে একজন বেশ সুসজ্জিত-বেশী হিন্দুস্থানী; এবং তাঁহার পারিষদ দুইটী বাঙ্গালী বাবু। গাড়ি হইতে নামিয়া আপিসে প্রবেশ করিয়া, প্রথমে তাঁহারা আপিসের বড় বাবুকে এবং শেষে সাহেবকে বাড়ীর বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। দরের বিষয় সাহেব বলিলেন,—"২০ হাজার টাকার কমে নহে।"

হিন্দুস্থানী।—"সে কি কথা! ১২।১৪ হাজার হয় না, ২০ হাজার বলেন কি করে!"

সাহেব।—"বাড়ী যাঁর, এ'র কমে তিনি দিতে বারণ করেছেন।"

হিন্দুস্থানী।—"যাইহোক, এখন ঠিক কি হ'ল হবে, বলুন দেখি!"

সাহেব।—"২০ হাজার।"

এইরূপ উত্তর দিয়া কিছুক্ষণ সাহেব মহাশয় যেন একটু গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন, হিন্দুস্থানী বাবুটীর সঙ্গের সেই বাঙ্গালী-বাবু দুইটি বলিলেন—"মেরে কেটে জোর ১৮ হাজারে ওঠা যায়। কিন্তু তাতেও ঠকা! তবে আপনি নেহাত ইচ্ছে করেছেন, তাই বল্‌ছি।"

সাহেব।—"আরে বলেন কি? তা' হবে না, আমাদের একই কথা।"

"তবে হবে না!"—এই বলিয়া অতঃপর হিন্দুস্থানী বাবুটী তাঁহার সঙ্গী দুইজনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"চলুন, ও হবে না।" এই বলিয়া তাঁহারা রাস্তার দিকে গাড়িতে চড়িতে যাইতেছেন, ইতিমধ্যে সাহেব ও তাঁহার বড় বাবুতে ক্ষণমাত্র কি যেন কি ইসারা করিয়া, এমন সময় তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আরে মহাশয়, চলেন কেন? আচ্ছা, পাঁচ শো কমই দেবেন।"

এইরূপ আরও দুই পাঁচবার চ'লে যাওয়ার উদ্যোগ ও তাহা হইতে নিরস্ত করার পর, ক্রমে দর স্থির হইল। অন্য সকলে পাঁচ হাজার, সাত হাজার টাকার বেশী দর দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় এবং অনেক কসা-মাজার পর বলিয়া, সাহেব সুতরাং সাড়ে আঠার হাজার টাকায় উহা বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং হিন্দুস্থানী বাবুটীও তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বাড়ীর বায়না-স্বরূপ দুই হাজার টাকা সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন—"বাকী টাকা তিন দিন পরে দিয়া যাইব, ও তখন বাড়ী-সম্বন্ধে পাকাপোক্ত লেখা-পড়া করিয়া লইব।" সাহেব অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন; ভাবিলেন,—"এই ঢের হইল। ইহাতেই সম্ভবতঃ বাড়ীওয়ালা সন্তুষ্ট হইবেন।"

* * * *

সপ্তম দিনে ক্রমে বাড়ীওয়ালা মাড়োয়ারী মহাজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই বলিলেন,—"কি সাহেব, কমিসন বাদও কি ২০ হাজার পাইব!"

সাহেব, একটু আহ্লাদসহকারে,—"না, না, অতদূর হয় নাই! আপনার বিষয়ের ঢের গোল ছিল। আর, দরেও ১০।১২ হাজার টাকারও যোগ্য নয়। যাইহোক, আমার অনেক যত্নে, অনেক খরচপত্রের যোরে, সাড়ে আঠার হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়েছি। এ শ্রমের জন্য আমাদিগকে

কিন্তু আরও কিছু বেশী কমিশন দিতে হ'বে!"

মাড়োয়ারী।—"সে কি কথা! সাহেব করোচো কি? এই আমিই একজন খদ্দের ঠিক ক'রেছি, সেই যে ২২ হাজার টাকা দিতে চায়! তবে মাথামুণ্ড তোমরা কল্লে কি? আমার সর্ব্বনাশটা কল্লে?"

সাহেব তো অবাক! বিস্তর পরিশ্রমে ও কসামাজায় তিনি কোথায় সাড়ে আঠার হাজারে তুলেছেন, কিন্তু তার উপরও আবার এই কথা! যাইহোক, ইহাতে সাহেব কিছু অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন,—"তাইতো, আমরা অনেক চেষ্টাতেও তো আর ওঠাতে পাল্লেম না। তা কি করবো! আপনি যদি তখন সব খোলসা করে বলতেন, তবেও হ'তো! না হয়, আরও বেয়ে-ছেয়ে দেখতাম। ফলে, আর যে বাড়তো তা তো বোধ হয় না!"

মাড়েয়ারী।—"যাক, যা'হ'বার হ'য়েছে। বুঝলাম, সাহেবেরা কেবলই কথার ভূষণ্ডি। কাজের কিছুই নয়! তা, যাইহোক বাবা, এখন টাকাগুলো দেও দেখি; আমি বুঝলাম, আর তোমাদের সঙ্গে কারবার চলবে না।"

সাহেব।—(বিশেষ লজ্জিত হইয়া) "টাকা তো এখনও সব পাই নাই—"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে তাঁহাকে বাধা দিয়া, মাড়োয়ারী বাবুটী বলিলেন,—"সে কি কথা! সে সব ফক্কুরি কথা আমি শুনচিনে। হয় আমার সব টাকা চুকিয়ে দেও, নয় আমার দলিলপত্র ফেরত দেও। দস্তুর মত কাজ কর। আমি আর কিছুই শুনবো না। একে তো আমার এতগুলো টাকা লোকসান গেল; তা'র উপর আবার এ কি কথা! যাই বল, আর যাই-কর, আমি আর কিছুই শুন্‌চিনে। আমার টাকা চাই-ই।"

ইহার পর সাহের আর কি বলেন? যাইহোক, প্রথমে দুই-একটা ওজর-আপত্তি করিলেও, মাড়োয়ারী বাবুটির বাক্য-বাণে তাঁহার সে সকলই কিন্তু ব্যর্থ হইল। অগত্যা আপিস হইতেই সমস্ত টাকা তাঁহাকে চুকাইয়া দিতে হইল। অতঃপর মাড়োয়ারী মহাজনটী গুণিয়া-গাঁথিয়া সমস্ত টাকাগুলি লইয়া প্রস্থান করিলেন। সাহেব ভাবিলেন,—"আপদ তো দূর হোক; তা'র পর না হয় যে বাবু বিষয় কিনিয়াছেন, তিনি সমস্ত টাকা দিয়া যাইলেই আমরা আমাদের টাকা লইব।"

আরও, সাহেব মনে মনে এও ভাবিলেন যে, সে বাবুকে ভাল করিয়া বলিয়া আরও কিছু লইবার চেষ্টা পাইবেন।

* * * *

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সাহেবের সকলই আকাশ-কুসুম। কোথায় টাকা, আর কোথায় বা সেই ক্রেতা! আর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সুতরাং বলা বাহুল্য, পাঠকগণ বুঝিয়া লউন যে, এই জুয়াচুরীতে সাহেবের কিই না হইল। এক কথায় কোম্পানী ফেল মারিল; সাহেবও পলাতক হইলেন।

এড়ি রেশমের চাস।

"সাঁওতাল পরগণা ও সাঁওতালগণ" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে যে সকল খনিজ পণ্য-দ্রব্যের নাম ও বিবরণ পাঠকগণকে জানাইয়াছি, সেই সকল দ্রব্য আহরণ করা ধনী বণিকগণের দ্বারাই হইতে পারে। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে যে এড়ি-রেশমের চাসের কথা লিখিতেছি, সেই চাস প্রত্যেক অর্থহীন গরীবের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারিবে; এবং তাহাতেই তাহারা আপনাপন জীবিকোপায়ের অনেক সুবিধা করিতে পারিবে। আমাদিগের দেশে এই চাস প্রবর্ত্তিত হইলে, কত অনাথিনী, ভিক্ষুক, বিনা ব্যয়ে ও অনতি-পরিশ্রমে দু'টাকা উপার্জ্জন করিয়া দুঃখের যে কত লাঘব করিবে,

তাহা বলা যায় না। বঙ্গদেশে মেদিনীপুর, রাজসাহী, বহরমপুর প্রভৃতি কতিপয় জেলায় রেশমের চাস হইয়া থাকে, এবং যে সকল পোকা হইতে ঐ রেশম উৎপন্ন হয়, তাহারা অধিকাংশ তুতপত্র-ভোজী। কুলপত্র-ভোজী পোকার রেশমও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অতি অল্প। যদিও আমাদের দেশের রেশম অতি উৎকৃষ্ট, তথাপি আমরা উহা দ্বারা প্রায়ই পরিধেয় বস্ত্রই প্রস্তুত করিয়া থাকি। শীতের উপযোগী রেশম আমাদের দেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশ উষ্ণপ্রধান দেশ। এইজন্য এখানে শীত-বস্ত্রের উপযোগী রেশমের প্রয়োজন নাই বলিয়াই, পূর্ব্বে এ দেশে তদুপযুক্ত রেশমের চাস কেহ প্রবর্ত্তিত করিয়া যান নাই। কিন্তু আজিকালি বাণিজ্য-প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বে যে চাস কেহ করিত না, তাহাও এই দেশে চাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে; পাট, গম, নীল ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

আমাদের দেশের লোক ভারতের অন্যান্য স্থলের লোক অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি ও কৌশলে নিপুণ, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এমন স্থলে তাঁহারা যদি মনোযোগের সহিত কোন কর্ম্মের প্রবর্ত্তন অথবা তাহার উন্নতি-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাহইলে ভারতের কোন স্থানের লোকই তাঁহাদিগকে উন্নতি-কল্পে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবেন না। বাঙ্গালায় অপর্য্যাপ্ত ধান্য হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাতে খাদকের সংখ্যা ও রপ্তানি এত বাড়িয়াছে যে, তণ্ডুলের মূল্য বৎসর বৎসরই প্রায় বৃদ্ধি হইতেছে বই কমিতেছে না। তাহাতে আমাদের দেশে ভূমি এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বহুপরিবারবিশিষ্ট কৃষকগণের মধ্যে সকলের অন্নসংস্থান করাই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে কৃষিজীবির সংখ্যাই অধিক। ২৪ পরগণা, হুগলি, নদিয়া প্রভৃতি জেলার অত্যল্প ব্যক্তিই চাকরির উপর নির্ভর করিয়া কষ্টে স্বষ্টে গুজরাণ চালাইতেছেন। তদ্ভিন্ন, অনেক অন্ধ, বিধবা, দীনদুঃখী আছে, যাহারা ভিক্ষায় দিনাতিপাত করিতেছে। এমন স্থলে আমাদের দেশে যত অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের চাস হয়, এবং যতই আমাদিগের বঙ্গসন্তানগণ অর্থোপায়ের ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করেন, তাহাই সমধিক অভিলষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

আসাম-দেশে 'এড়ি-রেশম' নামে একবিধ রেশম উৎপন্ন হয়। এই রেশম পূর্ব্বে লোকে তত আদর করিত না, কিন্তু আজিকালি তাহার দর বাজারে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। গত দুই বৎসর ধরিয়া আসাম হইতে এড়ি-রেশমের গুটি বহুল রপ্তানি হইতেছে। এই রেশম লাল ও সাদা দুই বর্ণের হইয়া থাকে। যখন আসামের বাজার নরম থাকে, তখন লাল এড়ি ৪০।৪৫। টাকা, ও সাদা এড়ি ৬০৲ টাকা মোন দরে বিক্রয় হয়। বাজার গরম হইলে; সাদা এড়ি ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে; ও লালের দর তাহা হইতে ১০।১৫। টাকা কম থাকে। এই গুটি হইতে রেসম বাহির করিয়া আসামীয়েরা "এড়ি-কাপড়" বুনিয়া শীত-বস্ত্র করে। উহা এত শক্ত যে, পাতিয়া শুইয়া ও গাত্রে দিয়া ব্যবহার করিলেও অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর উহা টিকিয়া থাকে। আমাদের দেশের কোন রেশম এত টেকসই হয় কি না, সন্দেহ। ঐ বস্ত্র আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, দুই ফর্দ্দ করিয়া গাত্রে দিলে শালের জোড়ার ন্যায় দিব্য শরীরের উষ্ণতা উৎপাদন করিয়া থাকে। আসামের লোকে সচরাচর ভাল করিয়া রেশমের পাট করিতে জানেন না বলিয়া, এড়ি-বস্ত্র দেখিতে ময়লা ও কদর্য্য দেখায়; কিন্তু উপর আসামে শ্বেত এড়িতে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহার কোন কোন জোড়া এমন উৎকৃষ্ট হয় যে, ধারে ফুল বসাইয়া লইলে দূর হইতে সাদা

শালের ন্যায় দেখায়। এই রেশম বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইলে ভাল কারিকরের হাতে যে উহা হইতে আসামের অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট কাপড় জন্মিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি আমাদের দেশের লোকে, যাঁহারা এই চাস করিবেন, কাপড় নাই বুনাইয়া লয়েন, তথাপি বাজারে এড়ির গুটি ওজন-দরে বিক্রয় করিলেও, আসামের দর অপেক্ষা সওয়া গুণ অধিক পাইবেন। এড়ি কাপড়ের আর এক গুণ এই যে, যত ধোপ দিবেন, ততই পরিষ্কার হইবে; এবং অন্যান্য রেশমের মত উহা পোকায় কাটে না।

আমাদিগের এই প্রবন্ধে গরীব রাইয়ৎ শ্রেণী, দীন, দরিদ্র, অনাথগণের যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগমের উপায় দেখাইয়া দেওয়ামাত্র উদ্দেশ্য; তদ্ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। যোত্রবান জমিদার কিম্বা চাকুরে অথবা স্বাধীনবৃত্তি-জীবি মধ্যবিত্ত লোক যে আমাদের এই প্রবন্ধ-লিখিত এড়ি রেশমের চাস করিতে যাইবেন, তাহা স্বপ্নেও মনে স্থান দিই না। সুতরাং যে সকল অধঃশ্রেণীর লোকের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদেরই জন্য আমরা এই চাসের বিষয় লিখিতেছি; তাহাদের দ্বারাই এই এড়ির চাস বাঙ্গালায় করান যাইতে পারিবে। মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা, গৃহস্বামীর গলগ্রহ ও ভারের কারণ হয়। কিন্তু অধঃশ্রেণী লোকের স্ত্রী-পুত্র তাহাদের সংসারের বরং সহায়। তাহাদের স্বামী মাথায় মোট করিয়া পয়সা সঞ্চয় করিতে যেমন চেষ্টা করে, তাহাদের স্ত্রী ও নাবালক বালক-বালিকা পর্য্যন্ত সেই রোজগারে সাহায্য করিয়া বরং আরও দু'পয়সা রোজগার বাড়াইয়া দেয়। এমন স্থলে আমরা সেই সকল অধঃশ্রেণীর লোকের এবং যাহাদের অন্নদান দিবার আর কেহ নাই ও যাহারা অভিভাবক-শূন্য, আমাদের এই এড়ির চাস এদেশে প্রবর্ত্তন করার জন্য তাহাদের মুখাপেক্ষী হইলাম। যেমন করিয়া এড়ি পোকা জন্মাইতে হয়, যেমন করিয়া পোকাকে অতি শৈশব হইতে খাওয়াইয়া বড় করিতে হয়, যেমন করিয়া ত্বরাতে গুটি বাঁধাইতে হয় ও প্রজাপতি বাহির করাইয়া পুনরায় তাহাকে দিয়া ডিম্ব পাড়াইয়া লইতে হয়, যেমন করিয়া পোকার পীড়া না হয় কিম্বা মরিয়া না যায় তাহার উপায় লইতে হয়, এবং যেমন করিয়া ভাল এড়ি-রেশম উৎপন্ন হইতে পারে, আমরা নিজে এড়ির চাস করিয়া তাহা দেখিয়াছি। যেরূপ দেখিয়াছি ও যে যে পরীক্ষা পোকার উপর চালাইয়াছি, তাহার যত কিছু প্রধান প্রধান বিষয় বিশেষ লক্ষ করিয়া জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি, এবং এড়ি-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আসামের লোককে জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা জানেন না বা কখনও শুনেন নাই; এরূপ বিবিধ বিষয় আমরা এই প্রবন্ধে লিখিয়া আমাদিগের বঙ্গ-ভ্রাতাগণকে জানাইব, আশা করিয়াছি। এখন, স্বদেশহিতৈষী যাবতীয় বঙ্গ-সম্পাদকগণ গরীবের মহোপকারক এই এড়ি-রেশমের চাসের কথা সাধারণকে জানাইয়া বাঙ্গালায় ইহার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, ও ইহা প্রবর্ত্তনে নিরুপায়গণের সহায়তা করেন, এই আমাদের বাসনা।

এড়ির চাস অতি সহজ, কেবল পরিশ্রমের মধ্যে রেড়ির পাত যোগাইয়া উঠা। বসতবাটীর এক-ধারে কতকগুলি রেড়ির গাছ করিয়া রাখিলেই পাত্রাহরণের আর তত কষ্ট থাকে না। আসামে নিম্ন-শ্রেণীর লোকই অধিক; তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের ঘরেই রেড়ির গাছ ও এড়ির চাস আছে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা যত পরিশ্রম করে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা তাহার অর্দ্ধেকও করে না বলিলে হয়। তাহাদিগকে নিজের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নিজে বুনিয়া পরিধান করিতে হয়; তৈল পর্য্যন্ত ঘানি গাছে ঘুরাইয়া পিষিয়া লইতে হয়; লবণের পরিবর্ত্তে উদ্ভিজ্জ পোড়াইয়া, গুলিয়া, শুকাইয়া,

বা সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এ সমস্ত গৃহ-কর্ম্ম সারিয়াও আসামের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই এড়ি-পোকায় চাস করিয়া থাকে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কহিতে গেলে তো রাজহালে থাকেন! ধান্য, চাউল, তরকারি, লবণ, তৈল, মাছ, বস্ত্র ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু তাঁহাদের প্রায় কাহাকেই নিজে প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় না। এমন স্থলে তাঁহাদের সাবকাশ আসামের স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক। সুতরাং তাঁহাদের অনেকেই যে দিনের মধ্যে দুই এক ঘণ্টা সময়ও পোকার প্রতি ব্যয় করিতে পারিবেন, তাহার আর সংশয় নাই।

এড়ির গুটী প্রায় কুড়ি পোনে, এবং কখন কখনও রেশম অল্প হইলে বাইশ-তেইশ পোনেও ওজনের এক সের হয়। এড়ির চাস শ্রেষ্ঠ—কল্পে ২৫ দিনে ও ন্যূন কল্পে ১৮ দিনে করা যায়। অর্থাৎ ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হওয়ার দিন হইতে ঘরা (গুটি) বাঁধার দিন পর্য্যন্ত এক চাস হয়। যদি একটী ১০।১১ বৎসরের বালিকা প্রতি চাসে ৮।৯ শত পোকা পুষিতে পারে, তবে সে এক চাসে আধ সের রেশম জন্মাইয়া উঠাইতে পারিবে। এইরূপে বৎসরের মধ্যে যদি সে অন্ততঃ ৯ সের রেসম তুলে, তবে সেই গুটী বিক্রয় করিয়া তাহার অন্ততঃ ১৫৲ পনের টাকাও আয় হইতে পারে। এইরূপে কোন গরীবের ঘরে যদি ৩।৪ জনে পৃথক পৃথক পোকা পুষে, তবে তাহাদের সংসারে কত আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা বলুন দেখি! বালক-বালিকাদিগের স্বল্পায়াস-লব্ধ উপার্জ্জন-সম্বন্ধে তো এই! সুতরাং সকলে বুঝুন যে, পরিণত বয়স্কগণ যদি ঐ চাসে সম্যক মস্তিষ্ক ও শ্রম প্রয়োগ করেন, তবে এ চাস কত সুফলপ্রদ হয়! অধিকন্তু ঐ এড়িতে গাত্র-বস্ত্র প্রস্তুত হইলে আরও লাভ আছে। আসামে ময়লা এড়ির ১৪ হাত লম্বা চাদর ১২৲।১৩৲ টাকায় বিক্রয় হয়; এবং ঐ চাদর সাদা রেশম দিয়া নির্ম্মিত হইলে, উহার দর ২৩৲।২৪৲ টাকা হইয়া থাকে।

এই 'এড়ি' কথা সংস্কৃত 'এরণ্ড' শব্দের অপভ্রংশ। অর্থাৎ এড়ি-পোকা এরণ্ড (রেড়ি) পাত খায় বলিয়া উহার রেশমকে আসামে 'এড়ি' কহে। এই পোকা যে শুদ্ধ রেড়িপত্র-ভোজী তাহাও নহে। অনুসন্ধানে জানিয়াছি, ইহারা পেঁপের পাত, ডুম্বুর পাত ও আসাম দেশীয় 'কোরং' নামক বৃক্ষের পত্রও খাইয়া থাকে। আমরা পেঁপের পাত কিম্বা ডুম্বুর পাত কখনও পোকাকে খাওয়াই নাই; তবে শুনিয়াছি যে, অতি শৈশব হইতে ঐ সকল পত্র খাওয়াইতে ধরাইলে তাহারা খাইয়া থাকে। কিন্তু রেড়িপাত প্রথমে খাওয়াইয়া ঐ সকল পত্র দিলে, তাহাতে তত স্পৃহা দেখায় না। আমাদের এক জন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একবার কচি কচি সোঁদাল পাতাও পোকাকে খাওয়াইয়াছিলেন। তবে তাহারা উহা ভাল করিয়া খায় নাই। ইহাতে দেখা যায় যে, যে সকল বৃক্ষের ফলে অল্প সারকতা গুণ আছে, কিম্বা যাহাতে ক্ষারাধিক্য আছে, সেই সকল পত্রই খাইবার সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা রেড়ি-পাতের যেরূপ প্রিয়, এমন আর কিছুরই নহে।

এই পোকা ডিম্ব হইতে প্রজাপতি হওয়া পর্য্যন্ত চারি অবস্থার ভিতর দিয়া গমন করে। যথা, (১) ডিম্বাবস্থা; (২) পোকা অবস্থা,—আসামে এই পোকাকে 'পোলু' কহে (বঙ্গদেশের 'পোলা' শব্দের সহিত সাদৃশ্য আছে); (৩) ঘরাভ্যন্তরাবস্থা,—এই অবস্থায় পোকাকে আসামে 'ল্যাটা' কহে; (৪) প্রজাপতি অবস্থা,—প্রজাপতি পুরুষ হইলে আসামে তাহাকে 'চক্‌রা' কহে এবং স্ত্রী হইলে তাহাকে 'রী' বলে – এই চক্‌রা শব্দ চকোরার অপ

ভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। আসামে প্রজাপতির নাম চক্‌রা। সুতরাং চকোর যেমন চন্দ্রের সুধাপান করে, প্রজাপতি পুষ্পের সুধা (মধু) পান করে বলিয়া, তাহাকেও চক্‌রা কহে। রেশমের পোকা সাধারণতঃ উপর্য্যুক্ত চারি অবস্থার ভিতর দিয়া গমন কালে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও রূপ ধারণ করে বলিয়া ঐ কীটকে আমরা মায়াবী-কীট (Metamorphic Insects) বলিলেও, বোধ হয় আমাদের কথায় কেহ দোষ ধরিবেন না। কারণ, যেমন শুনিয়াছি, মায়াবলে রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্যেরা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিত, আমরা তদনুসারে ঐ মায়াবী কথাটী কীটের বিশেষণ করিয়া দিলাম।

আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত মায়াবী কীটের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার নাম-করণ নিম্নলিখিতরূপে করিব, পাঠক মহাশয়গণকে জানাইতেছি! যথা, গুটিপোকাকে পোকাই বলিব। রেশমের যে বাসা প্রস্তুত করে তাহাকে 'ঘরা' বলিব। ঘরার ভিতরে যাইয়া যেরূপ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পোকাটি থাকে, সেই অবস্থাকে আমরা 'পুতুল' অথবা 'পুত্তলি' কহিব। এবং প্রজাপতি হইলে পুরুষ ও স্ত্রী-ভেদে তাহাকে আসামের নামানুসারে 'চকোর' ও 'চকোরী' কহিব। বাস্তবিক কহিতে গেলে, এড়ি প্রজাপতি, অন্যান্য প্রজাপতি-জাতীয় নহে; উহারা ভিন্ন জাতীয়। ইংরাজীতে (Moth) মথ, প্রজাপতির সহিত তাহাদের আকারের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এমন স্থলে ভ্রম নিবারণের জন্য স্বতন্ত্র নামকরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিশেষতঃ এই প্রবন্ধে যখন এড়ি-প্রজাপতির হাব, ভাব ও গতিবিধি যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা লিখা যাইবে, তখন এই নাম-করণের সার্থকতা পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। সেইরূপ আমাদের 'পুতুল' নামটী কেন দেওয়া হইল, তাহাও জানিবেন। ইংরাজীতে ঐ অবস্থাকে পিউপা (Pupa) কহে; তাহার অর্থ বালিকা। ফলতঃ একটী বালিকাকে ঘোমটা দিয়া কনে বৌ সাজাইয়া বসাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখায়, ঘরের মধ্যে যাইয়া পোকাটী দিন কয়েকের পর ঠিক সেই 'কনে বৌ'এর মত থাকে। আসামে স্ত্রী-এড়ি-প্রজাপতিকে সময়ে সময়ে কেহ কেহ 'বিধান' কহিয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় যে, সেই চকোরী হইতে আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয় বলিয়া, শাস্ত্রীয় 'প্রজাপতির বিধান' এই কথার ভাব হইতে আসামে 'বিধান' শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে।

জীবের দায়িত্ব।*

মনুষ্যের দায়িত্ব যদি তাহাদের চিত্ত-বৃত্তির কার্য্যের জন্য হয়, তবে যে সকল চিত্ত-বৃত্তির (যেমন ক্রোধ, দয়া, হিংসা ইত্যাদির) অল্পমাত্র ভাব-বিকাশহেতুও নিম্ন-শ্রেণীর জীববৃন্দ কার্য্য করে, তাহারাও তজ্জন্য দায়ী থাকিতে পারে। আবার যে মনুষ্যের (যেমন মাতৃগর্ভজাত উন্মাদের, অথবা ব্যাঘ্র পালিত মনুষ্যের) সমস্ত জীবনেও মনুষ্যোপযোগী উচ্চ ভাবের বৃত্তির (যথা দয়া, সহানুভূতি, ক্ষমা ইত্যাদির) একটীরও পরিস্ফুটন হইল না, তাহার দায়িত্বও সেই মত কোন কোন পশু-পক্ষীর দায়িত্ব অপেক্ষা কম হইতে পারে। আবার সদ্যোজাত শিশু যদি দুই একবার মাত্র 'হোয়া হোয়া' করিয়া মরিয়া যায়, তবে সেই মনুষ্যের দায়িত্ব আমাদিগের পূর্ব্বকথিত সালিকের কিম্বা বানরীর দায়িত্বের সঙ্গে তুলনা করিলে, কিছুই নাই বলিতে হইবে। এ সব কথা কিরূপ হইল? মনুষ্য হইয়াও পশু হইতে কম দায়ী থাকিবে?

এক কি নিকৃষ্ট জীবের "আত্মা নাই, হিতাহিত জ্ঞান নাই" বলিয়াই মনুষ্য নিজে নিজে

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

বড় হইবেন! তাঁহারই বা কি আত্মজ্ঞান, কি সম্বন্ধ-জ্ঞান, কি হিতাহিত জ্ঞানের ঠিক আছে? মনুষ্য আজি দশজনে মিলিয়া যাহা গড়িতেছেন, দুই দিন পরে অপর দশজনে তাহা উল্‌টাইয়া দিয়া হিতকে অহিত ও অহিতকে হিত করিতেছেন। তাঁহাদের কল্পনা বহু বিস্তৃত হইয়াও যেরূপ অধিক স্থিরতা-সম্বন্ধে দুর্ব্বল, বরং তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের কল্পনা অতি অল্প হইয়াও অনেক বলবান ও ঠিক ভাবে আছে। মনুষ্য "আমি, তুমি" এইরূপ কথা কহিতে শিখিয়া না হয় আত্মার কল্পনায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু যে উন্মাদ "আমি তুমি" ইত্যাদি কথা শিখিল না, তাহার আত্ম-জ্ঞানও যে আছে বলিয়া বোধ হয় না; এবং তাহার নিজের আত্মার অস্তিতে যে কতদূর বিশ্বাস, তাহা পাঠক মহাশয়গণই চিন্তা করিয়া দেখুন। যদি উন্মাদ মনুষ্য একটি জন্তু হয় এবং তাহার আত্মা আছে বলি, তবে তাহার অপেক্ষা প্রকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ভাবের কার্য্যকারী নিকৃষ্ট জন্তুর আত্মা যে নাই, তাহা বলাই বা কতদূর যুক্তিসঙ্গত? ফলে দেখা যায়, উদ্ভিদ ভিন্ন সকল জন্তু-দেহেই ইতর-বিশেষে শরীরাবস্থার তারতম্যানুসারে আধ্যাত্মিক শক্তির ভাব সংখ্যাতিরেকে পৃথক পৃথক বিকাশিত; এবং তজ্জন্যই যে মুনি কহিয়াছেন,—

"জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।"

আমরা তাঁহার সেই বাক্যকে প্রাণী-সম্বন্ধে মহাবাক্য বলিয়া গ্রহণ করি। তাঁহার এই বাক্যের উপর আমরা আরও এই কহি যে, শুদ্ধ জ্ঞান ভাব কেন, সেই ভাবের ও অপরাপর ভাবের বল-সাম্যের ও বেগের পরিমাণ নির্দ্দেশও শক্তি-বৈষম্যের সাধারণ নিয়মে আবদ্ধ এবং তাহাও সমস্ত জন্তুতেই আছে।

উপরিউক্ত কথাগুলি জীব-সম্বন্ধে বলিয়া, আমরা জীবের দায়িত্ব কি হইতে পারে, ও কি পরিমাণে, এখন তাহাই বলিব।

দায়িত্ব।

সাধারণ অর্থে 'দায়িত্ব' শব্দের মধ্যে দুইটি ভাব আছে; (১) বাধ্যবাধ্যকতা-সম্বন্ধ-ভঙ্গ, (২) দণ্ডার্হতা। প্রজা শান্তি-রক্ষার্থ স্বদেশের রাজার নিকট বাধ্য; সেই বাধ্যতা ভঙ্গ করিলে সে রাজার নিকট দায়ী ও দণ্ডার্হ। খাতক মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য, না করিলে সে দায়ী ও দণ্ডার্হ। পিতা সন্তানকে লেখা-পড়া শিখাইতে বাধ্য, না শিখাইলে সকলে কহেন, পিতা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তদ্রূপ সন্তান বৃদ্ধাবস্থায় পিতামাতাকে ভরণ-পোষণ করিতে বাধ্য, না করিলে তাহার দায়িত্ব আছে। আমরা রাজাকে দণ্ড দিতে দেখিতেছি; মহাজন, খাতকের দুর্দ্দশা করিতেছে, দেখিতেছি; তাই বলিতেছি, অমুক ব্যক্তি দায়ী। পিতাপুত্রের স্থলে চাক্ষুষ বা শ্রাবনিক কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে রাজা অথবা শাসনকর্ত্তা কল্পনা করিয়া এবং নিজেকে প্রজা কিম্বা খাতক ধরিয়া সম্বন্ধ-ভঙ্গ কল্পনা-পূর্ব্বক দণ্ডার্হ মনে করি। যদি তাহাই হয়, তবে এই দায়িত্ব শুদ্ধ মনুষ্যের সময় কেন, সকল জীবেই থাকা উচিত। শুদ্ধ এই ক্ষুদ্র আর পৃথিবীর জীবে কেন, অপরাপর গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য্যাদির জীবে এবং শেষে ব্রহ্মাণ্ডময়ই ঐ দায়িত্ব থাকা উচিত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বর কি জীবের জন্য রাজার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড-রাজ্য করিতেছেন না, তাঁহার অন্য কোন অভি-প্রায় আছে? যদি জীবের জন্যই রাজত্ব করিয়া থাকেন, এবং যখন বাহ্য জগতে দেখিতেছি যে, একটি জড় বালুকাকণার সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে, তখন মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীও যে সেই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। আর, এই সম্বন্ধ ধরিয়া এই পৃথিবীর জীবগণ অপর জগতের জীবগণের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে বাধ্য। নচেৎ সকল জগতের

জীবই সম্বন্ধ-ভঙ্গের জন্য দায়ী ও দণ্ডার্হ, ইহাও ফলে দাঁড়াইতেছে। যদি দায়িত্বের ভাব এরূপ হইল, তবে সেই ঈশ্বর, মনুষ্য ও নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীগণকে উক্ত অপর জগতের প্রাণীর সম্বন্ধ ভঙ্গ যাহাতে না হয়, এরূপ উপায় জানিবার ও কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতা দিয়াছেন কি? কই কাহারও তো তাহা নাই! যদি নাই, তবে পৃথিবীর জীব অপর জগতের সম্বন্ধ-ভঙ্গের জন্য দায়ী কিম্বা দণ্ডার্হও নহে। কিন্তু গণিত প্রমাণের ন্যায় ইহাও অসঙ্গত প্রমাণ হইতেছে। সুতরাং দেখা যায় যে, ঈশ্বর জীবকে দায়ী করিতে বিশ্ব সৃজন করেন নাই। যদি তিনি জীবকে ক্ষমতা না দিয়াও তাহাদিগকে দণ্ডার্হ করেন, তবে তিনি বড় কঠিন রাজা!! ঈশ্বর-প্রেমিক কোন ব্যক্তিই 'ঈশ্বর কঠিন' এই কথা সহ্য করিতে পারিবেন না।

রাজা, প্রজাকে সম্বন্ধ কহিয়া দিয়া ভঙ্গের দণ্ড দেন। ভগবানের কি তাহা উল্‌টা! যদি কেহ কহেন যে, যে সম্বন্ধ আমরা জানি না কিম্বা যে সম্বন্ধ রক্ষা করিতেও আমরা সক্ষম নহি, তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি। অর্থাৎ অজ্ঞান-কৃত কার্য্যের অথবা অজ্ঞানের দায়িত্ব নাই। তবে কথা হইতেছে যে, প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী, তিনিই কি কহিতে পারেন যে, এই পৃথিবীর মধ্যে জীব-সকলের পরস্পরের সঙ্গে কি আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সম্বন্ধ আছে? তিনিই কি জানেন, ঈশ্বর মনুষ্য-দেহে যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব দিয়াছেন, সেই ভাবসকলের সম্বন্ধ কি? তিনিই কি বলিতে পারেন, যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিজের শরীরের উপর বা বাহ্য জগতে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে কোন নৈতিক সম্বন্ধ গঠিত বা ভঙ্গ হইতেছে কি না? তিনিই কি লোককে বিদিত করিতে পারেন যে, যে সম্বন্ধ তিনি নিত্য গড়িতেছেন (যেমন বিবাহ-সম্বন্ধ, গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ) তাহাই ঈশ্বরের নৈতিক সম্বন্ধ? আমরা এই সকল সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথায় অনেক সন্দেহ রাখি; তবে সংসারে মনুষ্য, সমাজ-বদ্ধ হইয়া চলিয়া থাকেন ও সেই সমাজ-শাসনের সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয় বলিয়াই, ঐ সকল জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণের উপদেশ মানিয়া মনুষ্যের জীবন অতিবাহিত করা মাত্র। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ-বিষয়ে আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি, এবং আমাদের সমস্ত কার্য্যই অজ্ঞান-কৃত। উক্ত জ্ঞানাভিমানী মনুষ্য-প্রধানের কথা মতে ফলে এই গিয়া দাঁড়ায় যে, অজ্ঞানতাই দায়িত্ব এড়াইবার সুপন্থা। তবে কি সদ্যোজাত শিশু মরিলে সেই ধন্য হইল? তবে কি বিকৃতাবয়ব উন্মাদই ধন্য হইল? অসভ্য, অরণ্যবাসী প্রাকৃতিকগণই তবে কি ধন্য? তবে কি যে সকল চিন্তাশীল মুনি ঋষিগণ, যাঁহারা উক্ত নৈতিক সম্বন্ধ কি, তাহার অল্পমাত্রও অনুমানে জানিতে চেষ্টা করিয়া সেই সম্বন্ধ পাছে ভঙ্গ হয় এই ভয়ে জড়সড় হইলেন, তাঁহাদেরই যত পোড়া কপাল ঘটিল; তাঁহাদের স্কন্ধেই যত দায়িত্ব আসিয়া চাপিল? যখন সকল প্রাণীই পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে অজ্ঞতা দেখাইয়া শুদ্ধ যেন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছে দেখা যায়, তখন তাহাদের কোন কার্য্যকেই জ্ঞানকৃত বলিতে পারি না। বিশ্বাস যে সর্ব্ব-সময় সত্য হয় না, এ কথা আমাদের সঙ্গে অনেকে স্বীকার করিবেন। কারণ, শক্তি-বৈষম্য-নিবন্ধন জীব-দেহে কল্পনার ভাব এরূপ প্রবল যে, কি বাহ্য, কি আধ্যাত্মিক সকল কার্য্যেই, তাহাদের ঐ কল্পনা অতর্কিত ভাবে আসিয়া পড়ে। এই জন্য মনুষ্যের আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ে বিশ্বাস-সঙ্কুল হইয়াই প্রধান সম্বল।

(ক্রমশঃ)

বিদুষী আবিয়ার।

প্রাচীন ভারতে কত অসামান্যা বিদুষী জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

ভারতবাসীরা চিরকাল গুণের পক্ষপাতী। অসামান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রকেই ভারতীয়েরা দেবতার অবতার বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সে কথা কিছু অযথার্থও নয়।

মানুষ কি? জড় পদার্থগঠিত দেহ তো আর মনুষ্য-পদবাচ্য নয়। নর-দেহও দেহ; পশু-দেহও দেহ। তবে নরে আর পশুতে প্রভেদ কি?— নরে আর পশুতে যে টুকু প্রভেদ, সেই টুকুই দেবত্ব। জ্ঞান দেবত্বের অংশ বিশেষ। যাহাতে সেই জ্ঞানের যত অধিক স্ফূর্ত্তি, সেই তত অধিক দেবত্বের অধিকারী। যে নর অধিক দেবত্বের অধিকারী, তাঁহাকে দেবাবতার বলা কি অন্যায়?

আবিয়ারকে ভারতীয়েরা শাপভ্রষ্টা ব্রহ্মার পত্নী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিদুষী উক্কীর-পরুবরিথী পাণ্ড্য (Wkkira-peruverithi Pandian)-রাজের রাজত্ব-সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিখ্যাত হন। ইনি ব্রাহ্মণের কন্যা। কিন্তু ইহাঁর জননী নীচজাতীয়া ছিলেন। বিবাহ করিবার পর ইহাঁর পিতা-মাতার এইরূপ নিয়ম হয় যে, যদি তাঁহাদের কোন সন্তান জন্মে, তাহাহইলে জন্ম-মাত্র ঐ সন্তান মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। আবিয়ার ইহাঁদের দ্বিতীয়া কন্যা। ইনি জন্ম-মাত্র মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পানার (Panars) দিগের দ্বারা পালিতা ও শিক্ষিতা হইয়াছিলেন।

পানার জাতীয়েরা কতকটা বঙ্গীয় ভাটের ন্যায়। ইহাঁরা রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া রাজাদের স্তব গান করিতেন। এখন দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এই জাতীয় লোক আর বড় একটা দেখা যায় না।

আবিয়ার অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্র, রসায়ণ-শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ভূবিদ্যাতে ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত ইনি সুকবিত্ব-সম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁর যে যথেষ্ট প্রতিভা ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ ইহাঁর গ্রন্থাদিতেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সৎকার্য্যে ইহাঁর যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল; এবং ইহাঁর নীতিবুদ্ধিও বিশেষ প্রখর ছিল। ইহাঁর প্রণীত নীতি-শাস্ত্র অজিও সাদরে দাক্ষিণাত্যের তামিল বিদ্যালয়-সমূহে পঠিত হয়।

আবিয়ার-রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অথিচুবাড়ী-কন্দ্রে-বেন্থন (Aethichubadi-Kondre-Venthan) মুথুরী (Muthure) বা বাককন্দন (Vakkundan), নলবলী (Nal-vali), কলবি-অলকাম (Kalvi-Orluk-kam), অবে-কেরাও (Avvekerao), আবোকে বল (Avve-kovl), পিলাইয়ার-অগবল (Pilaiyar-Agaval), গণপতি-আসিরিয়া-বিরুথম (Gaı apathi-Asiria-Viruthan) এবং কতকগুলি কবিতা বর্ত্তমান আছে। অনুমান হয়, এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে।

এরূপ কথিত আছে যে, তিনি রসায়ণ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র মন্থন করিয়া এক প্রকার জীবন-রক্ষক ঔষধ আবিষ্কার করেন। উহার বলে তিনি ২৪০ বৎসর জীবিতা ছিলেন।

তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যখন যে প্রদেশে গমন করিতেন কি রাজা তখন কি ধনী, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান সকলেই তাঁহার প্রতি সমানা ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে সকল গ্রন্থ এইক্ষণে বর্ত্তমান আছে, সেই সকল গ্রন্থ সাধারণে সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পক্ষেও ঐ সকল গ্রন্থ বিশেষ উপকারী।

অদ্ভুত প্রত্যুপকার! *

বলা বাহুল্য, অনতিবিলম্বে সত্যসখার প্রণয়োন্মাদ রাজকুমারীর কর্ণে উপনীত হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে প্রতিজ্ঞা-জয়ের অভিপ্রায়ে কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সত্যব্রত কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সত্যসখার অবশ্যম্ভাবী আশু বিপদের কথা স্মরণ করিয়া তিনি প্রতিক্ষণ গভীর বিষাদ-হ্রদে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর মনে মনে কি একটা সঙ্কল্প আঁটিয়া সেইদিন অপরাহ্নে সত্যসখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভাই, তুমি ইচ্ছা করিয়া জীবনকে নষ্ট করিতে বসিয়াছ; বুঝিলাম, তোমার গ্রহ-বিড়ম্বনা, দৈব তোমার প্রতিকূল! নহিলে কে স্বেচ্ছায় পতঙ্গবৎ জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়? এত অনুরোধ করিলাম, এত উপদেশ দিলাম, কিছুতেই তুমি নিরস্ত হইলে না। ভাগ্য-ফল কে রোধ করিবে? বুঝিলাম, তোমার পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্ম-ফলও তোমার প্রতি অপ্রসন্ন!" সত্যসখা সুধীর হিতৈষী বন্ধুর এ অমূল্য উপদেশ শ্রবণে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন দূরে থাক, উপেক্ষা-ভাবে ক্ষিপ্তের ন্যায় বিকট হাস্যে তাহা উড়াইয়া দিলেন।

বহুদর্শী বিবেকী সন্ন্যাসী সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিলেন, বিষ ধরিয়াছে,—এ কাল ভুজঙ্গ-দংশনের আর ঔষধ নাই। পরে, কথা-প্রসঙ্গে সত্যব্রত আপন ভিক্ষার ঝুলি হইতে কি একটা দ্রব্য বাহির করিয়া তাহাতে একরূপ সরবৎ প্রস্তুত করিলেন; এবং সত্যসখাকে কহিলেন,—"বন্ধু, এই সরবৎটুকু পান কর। ইহা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইবে। রাজকুমারীর নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার সময়—আর কিছু না হ'ক—একটু ভাল করিয়া ভাবিতে-চিন্তিতেও পারিবে। ভাগ্যগুণে যদি প্রকৃত উত্তর দিতে পার, তার আর কথা কি!" সত্যসখা ইহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া হৃষ্টচিতে সেই সরবৎ পান করিলেন।

সরবতে কিন্তু কোনরূপ মাদক দ্রব্য ছিল। পান করিয়া সুতরাং সত্যসখা তাহাতে যেন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন, রজনী যখন দ্বিপ্রহর—সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ, তখন তিনি ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিলেন; আপনার ভিক্ষার ঝুলি হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই সরস বৃক্ষ শাখা ও সেই মৃত পক্ষীর ডালটী বাহির করিলেন। এ দুই দ্রব্যের অদ্ভুত গুণ সত্যব্রত বিদিত ছিলেন। অর্থাৎ এই দুই দ্রব্যের একত্র সম্মিলনে এবং ভৈরবী-সিদ্ধ মন্ত্রগুণে তিনি অবলীল-ক্রমে নিমেষমধ্যে বিহঙ্গজাতির ন্যায় শূন্যে উড্ডীন হইতে পারিলেন। এই দুই দ্রব্যের আর এক অপূর্ব্ব গুণ এই যে, যে ব্যক্তি ইহা ধারণ করিবে, সে সমস্তই দেখিতে-শুনিতে পাইবে; কিন্তু অন্য কেহই তাহার বিষয়ে কিছুই অবগত হইতে পারিবে না। কিছু দূর উড়িয়া তিনি এক সুবৃহৎ প্রাসাদে উপনীত হইলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের পরিচিতা রাজকুমারীই এই গৃহের মালিক।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারী দুগ্ধফেননিভ সুগন্ধিময় বিলাস-শয্যা ত্যাগ করিলেন। সহচরীদিগকে কহিলেন—"আজ আর আমোদ-প্রমোদ করিবার সময় নাই। জানই তো কাল প্রাতেই সে শিশু-সন্ন্যাসীর পরীক্ষার দিন! এক্ষণে আমি গুরুদেবের নিকট চলিলাম। আমাকে যথা-বিহিত বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দাও।"

অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তিনি সুসজ্জিতা হইলেন। পরিশেষে একাকী এক নিভৃত গৃহে যাইয়া আমাদের সত্যব্রত সন্ন্যাসীর ন্যায় যত্নে রক্ষিত কাঁচা বৃক্ষ শাখা ও একটি মৃত পক্ষীর ডানা সেই মত হৃদয়ে ধারণ করিলেন;

* দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫শ সংখ্যার শেষ অংশ।

এবং মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে অনন্ত শূন্যে উড্ডীন হইলেন। এই বৃক্ষ শাখা ও পক্ষীর ডানার আর একটি গুণ এই যে, সম-শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ যে যে ইহা ধারণ করিবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে, কেহ কাহাকে দেখিতে পাইবে না। সন্ন্যাসীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

এইরূপে রাজকুমারীর সহিত কিছুপথ অতিক্রম করিয়া তিনি দেখিলেন, এক স্থান বিবিধ মনোহর সজ্জায় সজ্জিত, শত শত লোক স্ব স্ব মণিমুক্তা-খচিত আসনে উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিক উৎসব ও আনন্দময়। অপ্সরীসদৃশ নর্ত্তকীগণ সুমধুর গীতসহকারে নৃত করিতেছে, সুগন্ধি দ্রব্যের তীব্র আঘ্রাণে সমস্ত স্থান পরিপূর্ণ। সভার মধ্যস্থলে বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত সিংহাসনে কিন্তু এক অতি কদাকার নরমূর্ত্তি বা প্রেত-যোনি বিভীষিকা দেখাইতেছে। এই সময় সত্যব্রতের অন্তরে বিলক্ষণ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। কিন্তু কেহই দেখিতে বা তাঁহার আগমন-বার্ত্তা কেহই জানিতে পারে নাই, এই তাঁহার শুভগ্রহ।

গীত-সমাপনান্তে সকলেই রাজকুমারীকে যথাবিহিত আদর-অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া রাজ-সিংহাসন-সন্নিকটে উপনীত হইলেন। সেই নর-পিশাচ প্রেতমূর্ত্তি রাজাও তাঁহার স্বাগত কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাদির পর স্বাভাবিক বিকৃত স্বরে কহিল,—"কল্যাণি, আজ কি মনে করে? এত দিনে আমাদের অভীষ্ট কি সিদ্ধ হইল?"

রাজকুমারী। "গুরুদেব, আপনি অন্তর্য্যামি। আপনার অবিদিত কি আছে? মা চণ্ডীর কৃপায় বুঝি এত দিনে আমরা পূর্ণমনোরথ হইলাম। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন। প্রভু, এই শেষবার; এইবার প্রতিজ্ঞা জয় করিতে পারিলেই আমাদের চিরদিনের আশা পূর্ণ হয়। গুরুদেব আপনার কৃপায় ৯৯৯ জনকে অকালে যমালয়ে পাঠাইয়াছি, বাকী আর একটিমাত্র। ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক এবং আপনারও অদ্ভুত কীর্ত্তি-লাভ হয়। অতএব দেব, ত্বরায় উপায় উদ্ভাবন করুন; ইহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই আপনি সপ্তসমাগরাধিপতি হন,—আর আমিও অমরীপদ লাভ করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি সত্যসখার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজা কহিলেন,—বৎসে, তার জন্য আর চিন্তা কি? অগ্রে শ্রম দূর কর; মন প্রফুল্ল হ'ক। আমি এখনই প্রশ্ন বলিয়া দিতেছি। মানুষের সাধ্য কি যে, আমার মনোভাব অবগত হইবে!"

কিছুক্ষণ আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়া গেল। তদনন্তর সেই অদ্ভুত নৃপতি রাজকুমারীকে কহিলেন,—"কল্য তোমার বিবাহ-সভায় সকলে সমবেত হইলে, তুমি সেই প্রণয়োন্মাদগ্রস্ত বাল-সন্ন্যাসীকে কহিবে যে, 'আমার মনের ভাব কি বল?'—উত্তর 'ঘেঁটু ফুল'। পৃথিবীর এত জিনিস থাকিতে 'ঘেঁটু' ফুলের নাম সে কখনই করিতে পারিবে না। আর, যদিই বা প্রথমটায় জিতিতে পারে, তিন দিনে তিন প্রশ্ন করিবে। দ্বিতীয় দিনে আমি এমন প্রশ্ন বলিয়া দিব, যাহা কিছুতেই তার মনে আসিবে না। বৎসে, নির্ভয়ে যাও, অমরী-পদ তোমার ভাগ্যে আছেই।"

"সে আপনারই কৃপা!"—রাজকুমারী গুরুদেবকে এই বলিয়া, প্রণাম করিয়া সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বিদায় লইলেন; গুরুদেবও বসিয়া থাকিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রশ্নের ফল কি হয় জানিতে চাহিয়া, বিদায় দিলেন। রাজকুমারী পূর্ব্বমত ক্রমে ক্রমে আবার সেই ভয়াবহ পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সত্যব্রতও গীর অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

বহুপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে উহাঁরা উভয়েই আপনাপন গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলেন। তখন নিশা প্রায় শেষ হইয়াছে। সত্যব্রত অতি অল্পক্ষণমাত্র শয্যায় বিশ্রাম করিয়া বন্ধু সত্যসখার নিদ্রাবসানের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইয়া গেল, তথাপিও তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে না দেখিয়া সত্যব্রত চেষ্টা করিয়া বন্ধু সত্যসখাকে জাগরিত করিলেন। এবং একটু উদ্গ্রীব ভাবে কহিলেন,—"ছি ভাই! তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান নাই! আজ নয় রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে বিবাহ-সভায় যাইবে?" "হ্যাঁ—তাইতো!"—এই বলিয়া অতি ব্যস্তভাবে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। তাঁহার বিবাহ-সভায় যাইবার কালীন সত্যব্রত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাই, বিবাহ সভায় তো যাইতেছ; কিন্তু রাজকুমারীর প্রশ্নের কি উত্তর দিবে বল দেখি?" "উত্তর আর কি দিব? সেখানে উপস্থিত যাহা মনে আসিবে, তাহাই বলিব!" সত্যব্রত একটু হাসিলেন; বলিলেন,—"ভাই; মজিতে তো বসিয়াছ, আর উপায় নাই। স্বেচ্ছায় কাল সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিলে কে জীবন রক্ষা করিতে পারে? এক্ষণে আমার একটী এই শেষ অনুরোধ রাখ। তুমি তো মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতে বসিয়াছ, আমার একটি কথা পালন কর; দেখ, ভাগ্যগুণে যদি সফল-মনোরথ হও।" সত্যসখা আগ্রহে বন্ধুর উপদেশ শুনিতে চাহিলেন। সত্যব্রত কহিলেন,—"দেখ, কাল রাত্রে যখন আমি তোমার আশু-বিপদের কথা ভাবিয়া মনে মনে না না অমঙ্গল আশা করিতেছিলাম এবং এক একবার ইষ্ট-দেবতা মা চণ্ডিকার উদ্দেশে তোমার মঙ্গলার্থ হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছিলাম, সেই সময় তিনি যেন স্নেহপরবশ হইয়া আমায় প্রত্যাদেশ করিলেন যে, তোর ভয় নাই। আমি তোর বন্ধুকে এ বিপদে উদ্ধার করিব। তোর বিবাহ-সভায় যাত্রা-কালীন তাকে কেবলমাত্র আমার আজ্ঞা জানাইয়া বলিস যে, যে সময় রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিবে,—'আমার মনের ভাব কি বল,—আমি কি মনে করিয়াছি?' তখন যেন তোর বন্ধু বলে যে, 'ঘেঁটুফুল' তাহাহইলেই তোর বন্ধুর প্রথম দিনের পরীক্ষায় জয় হইবে।' পরে আমি দেখি, কেউ কোথাও নেই। তাই বলছি ভাই, তুমি এম্‌নে তো মারা গিয়েইছ, দেখ মার প্রত্যাদেশে যদি উদ্ধার পাও।" সত্যসখাও হৃষ্টচিত্তে তাহাই করিবেন কহিলেন।

এক সুবিস্তৃত স্থানে বিরাট সভা সজ্জিত হইয়াছে। শত সহস্র লোক উদ্গ্রীব ভাবে বিবাহ সভা গুলজার করিতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলীতে বিবাহ-সভা পূর্ণ। মধ্যস্থলে সিংহাসনোপরি রাজ-পিতা উপবিষ্ট, দক্ষিণে বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিতা রাজকুমারী দণ্ডায়মানা। ক্ষণপরেই সত্যসখা ও সত্যব্রত বিবাহ সভায় দেখা দিলেন। দর্শকগণের কৌতুহল আরও বৰ্দ্ধিত হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে বিরাট সভা নিস্তব্ধ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। রাজা এই শেষবারও সত্যসখাকে এ বিষয়ে নিস্তব্ধ হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সত্যসখা অচল—অটল ভাবে পরীক্ষা-প্রশ্নের উত্তর দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজকুমারী প্রশ্ন করিলেন,—"আমি কি মনে করিয়াছি বল?" সত্যসখা উত্তর করিলেন,—"ঘেঁটু ফুল।" রাজকুমারীর মুখ ম্লান হইল। রাজপিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি উত্তর ঠিক হইয়াছে তো?" নতমুখে রাজকুমারী উত্তর করিলেন—"হাঁ।"

মুহূর্ত্তকালের জন্য সভামধ্যে জয় ধ্বনি পড়িয়া গেল। সকলেই সত্যসখাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এপর্য্যন্ত যত ব্যক্তিই আসিয়াছে, প্রথম উত্তরেই সমন-সদনে গিয়াছে; দ্বিতীয় উত্তর দিতে কাহারও অবসর হয় নাই। কিন্তু

উপস্থিত এই বালক সন্ন্যাসীর জয় হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইল। রাজপিতাও হৃষ্টচিত্তে মনে মনে কহিলেন,—"আঃ! এই দেবশিশু হইতেই বুঝি আমার রাজকুল রক্ষা হইল। এত দিনে বিধাতা বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।"

সত্যসখার উপর দিয়া এইরূপে আরও একটী পরীক্ষা অতিবাহিত হইল। সত্যব্রতের কৌশলে তিনি তাহাতেও উত্তীর্ণ হইলেন।

কিন্তু এইবার শেষ পরীক্ষা। এইবার বার বার তিনবার। এইবার হয় সত্যসখা রাজকুমারী-লাভে কৃতকার্য্য হইবেন, নয় তাঁহার মস্তক যাইবে। যাইহোক, রাজকুমারীর গুরু এবার কিন্তু তাঁহাকে কহিলেন,—"বৎসে, কল্য বিবাহ-সভার প্রশ্ন রহিল—'আমার মস্তক।' তুমি এই প্রশ্নেই সেই দুরাকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ বালককে ফাঁসি-রজ্জুতে আলম্বিত করিতে পারিবে। আর, আজ আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমি উপস্থিত না থাকাতেই দুই দিনই তোমার পরাজয় হইয়াছে। দেখিব, কার সাধ্য, আমার প্রশ্নের উত্তর আজ দিতে পারে।" এই বলিয়া রাজকুমারী-সমভিব্যাহারে গুরুও সভাস্থলে গমন করিলেন। কিন্তু পাঠক, এ দিকে আমাদের বৃদ্ধ সত্যব্রত সন্ন্যাসী কি করিতেছেন, দেখুন। তিনি যেই শুনিলেন যে, কল্যকার প্রশ্নের উত্তর—'রাজকুমারীর গুরুদেবের মস্তক' অমনি তিনি তথা হইতে অলক্ষিত ভাবে এক খানি তীক্ষ্ণধার অসি সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইলেন।

কিন্তু যখন তাঁহারা গন্তব্যস্থানে প্রায় উপনীত হন, এমন সময় সত্যব্রত সন্ন্যাসী চকিতের ন্যায় গুরুদেবের কেশাকর্ষণ করিয়া সেই তীক্ষ্ণধার তরবারীর সাহায্যে তাহার মুণ্ডটি কাটিয়া লইলেন; প্রাণহীন জড়দেহ ভূমে নিপতিত হইল। বলা বাহুল্য, অগ্রগামিনী রাজকুমারী ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, গুরুদেব পশ্চাতে পড়িয়াছেন; রাজসভাতেই সাক্ষাৎ হইবে। এইরূপে যথা-সময়ে উভয়েই স্ব স্ব আবাসে উপনীত হইলেন। সত্যব্রত অতি ব্যস্ততা-সহকারে সেই ছিন্ন মুণ্ডটি বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া একটী কাপড়ের মোটরূপে পরিণত করিলেন।

প্রভাত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও তিনি বন্ধু সত্যসখার নিদ্রা ভঙ্গ করাইলেন। সেই মত কালিকাদেবীর দোহাই দিয়া কহিলেন,—"দেখ, দুই দিন তুমি জিতিয়াছ। কল্য রাত্রে আমি গভীর ধ্যানে মা চণ্ডিকার আরাধনা করিতেছিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—তোর বন্ধুর জয় হইবে, ভয় নাই; এই বস্ত্রাবৃত যে জিনিসটি দিতেছি, এইটি তাহাকে প্রদান করিস্; তাহাকে বলিস্ যে, বিবাহ-সভায় যখন তাহাকে রাজকুমারী প্রশ্ন করিবে যে, আমার মনের ভাব কি বল!—তখন যেন সে মুখে কোন উত্তর না দিয়া বলে যে 'এই কাপড়ের বস্তার মধ্যে যাহা আছে, তুমি তাহাই মনে করিতেছ। তাহা হইলে আর কোন্ গোলযোগ হইবে না। কিন্তু সাবধান, যেন ভ্রমেও প্রশ্নের উত্তর দিবার অগ্রে কাপড়ের মোট না খুলে। তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইবে। তাহার প্রাণ যাইবে, তাই ভাই, তোমায় অনুরোধ করিতেছি, একবারের জন্যও যেন তুমি ভুলেও প্রশ্ন বলিবার অগ্রে কাপড়ের মোট না খোল!" সত্যসখা তাহাই স্বীকার করিলেন।

আজ তৃতীয় দিন। সমাগত দর্শকমণ্ডলী আজ সকলেই বিবাহ-সভার অধিকতর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। আজ শিশু সন্ন্যাসীর জীবন সংশয়। সকলেই দুঃখিত ও বিমর্ষ হইতেছেন। যথা-সময়ে সত্যসখা ও সত্যব্রত সন্ন্যাসী তথায় দর্শন দিলেন। সমস্ত গোলযোগ একেকালে মিটিয়া গেল। বহু জনাকীর্ণ

বিরাট বিবাহ-সভা এককালে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। রাজ-পিতা সত্যসখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আজ আপনার শেষ উত্তর। অতএব প্রস্তুত হউন।" তৎপরে রাজকুমারীকে প্রশ্ন করিতে বলিলেন। রাজকুমারী কহিলেন,—"আমার মনের ভাব কি বল! উপস্থিত আমি কি মনে করিতেছি?"

সত্যসখা কিছু না বলিয়া বন্ধুর উপদেশমত সেই বস্ত্রের মোটটি রাজপদতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন,—"এই কাপড়ের বস্তার মধ্যে যাহা আছে, আপনি তাহাই ভাবিতেছিলেন।" সমাগত সমস্ত লোক অধিকতর উৎসুকভাবে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিল। রাজপিতার আদেশে মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই বস্ত্রাবৃত দ্রব্যটি খোলা হইল। এক কর্ম্মচারী সেইটী হাতে করিয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলীর কৌতুহল চরিতার্থ করিতে লাগিল। সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও ভয় সহকারে "একি একি" রব করিয়া উঠিল। গুরুদেবের ছিন্ন মুণ্ড দেখিবামাত্র রাজকুমারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল; সর্ব্বশরীর সহসা ঘোর কালিমাবর্ণে পরিণত হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজকুমারীর মিথ্যা কথা কহিবার ইচ্ছা-সত্ত্বেও 'না' বলিয়া অস্বীকার করিবার কোন উপায় ছিল না। এ ব্রতের নিয়মই এই, প্রশ্ন-পরীক্ষায় কেহ যথার্থ উত্তর প্রদান করিলে তাহা কোন মতে তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না। যাইহোক, তখন কাহারও জানিতে অবিদিত রহিল না যে, সত্যসখার জয় হইয়াছে। চারিদিকেই জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। আনন্দের রোল গগনমার্গ ভেদ করিল।

এইবার সত্যসখা সর্ব্ব-সমক্ষে প্রাণের বন্ধু সত্যব্রতকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"আমায় সকলে অকারণ ধন্যবাদ দিতেছ। আমি নিমিত্ত-মাত্র। এই মহাত্মা সদাশয় বন্ধুর অনুগ্রহে আমি এ ভীষণ পরীক্ষা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। এ সকলেরই মূল ইনি!" সত্যব্রত নীরবে নতশিরে দণ্ডায়মান রহিলেন। সত্যসখা এইবার বন্ধু সত্যব্রতকে কহিলেন,—"ভাই, আমি এই মহাসভায় সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমার অকৃত্রিম উপকারের যৎকিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার-স্বরূপ আমি আমার প্রাপ্য অর্দ্ধ-রাজ্য হইতে তোমাকে তাহার অর্দ্ধেক দান করিয়া আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অতএব ভাই, সানন্দে আমার এই যৎসামান্য উপহার গ্রহণ কর।"

সত্যব্রত কহিলেন,—"তবে আমি বলিতেছি, সভাস্থ সকলে শ্রবণ করুন।' সকলে বিচার করুন যে, কে উপকারক—কে উপকৃত?' এই বলিতে বলিতে সত্যব্রত স্বশরীরে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন।

উঠিতে উঠিতে আবার সত্যসখার উদ্দেশে কহিলেন,—"প্রাণের বন্ধু, ভাই সত্যসখা, আমায় কি তুমি চিনিতে পারিতেছ না? তোমার গৃহ-ত্যাগের দিন স্মরণ কর দেখি! মনে আছে কি, সেই দিন গভীর রজনী যোগে ভয়াবহ শ্মশান-ক্ষেত্রে একটি শব-দাহ করিতে কতকগুলি লোক উপস্থিত হইয়াছিল! মনে হয় কি, সেই মৃত লোকটির দুইশত টাকা মাত্র ঋণ ছিল! আরও মনে আছে কি, সেই মাত্র দুই শত টাকার জন্য তাহার প্রতি সেই শবদাহকদিগের কি নিগ্রহ! শেষে সে নিগ্রহ দেখিয়া, দয়াবান বন্ধু তুমি, সেই দুই শত টাকার দান করিয়া মৃত ব্যক্তির সদ্গতি কর; সেকথা মনে পড়ে কি? টাকা পাইয়া তবে তাহারা সেই শবের যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করে, স্মরণ হয় কি? প্রাণের বন্ধু, ভাই সত্যসখা, এ অভাগায় চিনিতে পারিতেছ না! আমিই সেই শব-দেহ! তোমার প্রসাদে আমার আত্মা শান্তিলাভ করিয়াছে, তোমার কল্যাণেই আমি সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছি, ঋণের হাত এড়াইয়াছি। ভাই, পৃথিবীতে এই শিক্ষা দাও, যেন জীবনে কেহ ঋণ না করে! তোমাদ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু তোমাকে তো তাহার প্রত্যুপকারস্বরূপ কোন নিদর্শন দেখাইতে পারি নাই। তাই ভাই, শরীর-বেশে ছায়ার মত তোমার পাছে পাছে ছিলাম। এত দিন তোমারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলাম, কিসে তোমার সে উপকারের কিছুমাত্রও প্রত্যুপকার দেখাইতে পারি! কিন্তু ভাই, এতদিনে আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। আমি স্বলোকে প্রস্থান করিলাম—' এই বলিতে বলিতে সত্যব্রতের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়-দেশে অনন্ত নীলিমাময় ব্যোমপথে মিশিয়া গেল।

সত্যসখার মুখ হইতে জলদগম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল,—"অস্তত প্রত্যুপকার!" *

— --

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

সংসার-চক্র।—বাবু হেমচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। 'সংসার-চক্র'-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বারান্তরে বলিব, গত ১৫ শ সংখ্যক 'অনুসন্ধানে' আমরা এইরূপ বলিয়াছিলাম। এক্ষণে দুই এক কথা বলিয়া তাহার উপসংহার করিতেছি। প্রথমতঃ আমরা ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচারের বড়ই পক্ষপাতী। সুতরাং 'সংসার-চক্রের' এক খণ্ড আমাদের হস্তগত হওয়াতেই আমরা বিশেষ সন্তোষ-লাভ করিয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ এখন ইহা পাঠ করিয়া আমরা আরও সন্তুষ্ট হইয়াছি; এবং বুঝিয়াছি, সংসার-চক্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকৃতই তাহা হিন্দু-মাত্রেরই আলোচ্য। গ্রন্থারম্ভে 'ঋষিপ্রশ্ন' নামক প্রথম অধ্যায়ের কএকটী শ্লোকে সেই উদ্দেশ্যের কতক আভাস পাওয়া যায়। তাহার একটি শ্লোক ও তদনুবাদ এই:—

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব মৃতানং কর্ম্মণাংগতিং।
বেৎসি সর্ব্বং মুনে তেন পৃচ্ছামস্ত্বাং মহামতে॥

হে মহামতে! সম্প্রতি আমাদের প্রার্থনীয় এই যে, জীবগণ এই প্রপঞ্চ সংসার হইতে কর্ম্মানুসারে কিরূপে ধর্ম্মময় কৃতান্তদেবের সদনে উপনীত হয়, এবং কি কি কর্ম্মবশে সেখানে কি ভাবে অবস্থান করিয়া থাকে, ও কিরূপে জীবের উৎপত্তি, লয় ও মৃত ব্যক্তিদিগের স্বকৃতকর্ম্ম দ্বারা কিরূপ গতি হয়, তৎসমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন। এইহেতু আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে বিশেষ সমুৎসুক হইয়াছি।"

প্রথম অধ্যায়ের উপসংহার-শ্লোকটিও এইরূপ বড়ই ধর্ম্মোপদেশক। সেটী:—

"যা চিন্তা সকলপ্রপূ ভরণব্যাপারভারে সদা
যা চিন্তা ধনধান্যভূমিকীর্ত্তিলাভে সদা জাগতে।
সা চিন্তা যদি নন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দেক্ষণং।
কা চিন্তা যমরাজভীমভবনদ্বারে প্রয়াণে মম॥

এই জগতে পত্নী ও পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য যে চিন্তা চিত্তমধ্যে সমুদিত হয়; ধন, ধান্য ও কীর্ত্তি লাভের জন্য যে চিন্তা আমাদিগকে নিয়ত আকর্ষণ করে; যদি ক্ষণকাল সেই মায়াবিনী চিন্তা দেবীকে জগতের অচিন্তনীয় চিন্তামনি নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিয়োজিত করি; তাহা হইলে ভীষণ যমরাজ-ভবনে প্রবেশ করিবার আর চিন্তা কি!"

উল্লিখিত শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা হইতে এক পক্ষে যেমন 'সংসার-চক্র' যে কিরূপ উপাদেয় সামগ্রী তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যপক্ষে তেমনই পুস্তকের অনুবাদও কিরূপ ভাবোদ্দীপক ও মনোরম হইতেছে, তাহাও বুঝা যাইতেছে। ফলতঃ নরলোকে যেমন রাজা-প্রবর্ত্তিত আইন—যাহার অবমাননায় দণ্ডনীয় হইতে হয়, তেমনই পরলোকের কর্ম্ম-ফল-জ্ঞাপক এই 'সংসার-চক্র'ও একরূপ আইন। সুতরাং ইহাতে ভক্ত হিন্দুর কিরূপ প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

উপসংহারে আমরা ইহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বসু মহাশয়কেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। এই সাহিত্য-বিভ্রাটের বাজারে (জুয়াচুরীতে জুয়াচুরীতে ঠকিয়া যেখানে সহজে আর কেহই কিছু কিনিতে চাহেন না) এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, তিনি যে এই কীটদষ্ট পুঁথি-আকারে অবস্থিত শাস্ত্র প্রথম প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছেন, এই তাঁহার বাহাদুরী। আরও, তিনি যেরূপ পদস্থ লোক ও তাঁহার যেরূপ যত্ন দেখিতেছি, তাহাতে তিনি ইহা প্রকাশেও যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাও আশা করা যায়।

অনুসন্ধান সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সাধারণে সাবধান।

'কেমিক্যালসোনা' দেখিতে প্রায় স্বর্ণের মত। সুতরাং অনেক প্রতারক সোনার গহনা বলিয়া ঐরূপ গহনা বন্ধক দিয়া নিরীহ লোকের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইতেছে; এবং শেষে সে দেনা পরিশোধ না করায় বিক্রয়ার্থ জিনিস যাচাইয়া দেখিলে, গিল্টির বা কেমিক্যাল সোনার গহনা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। একটি-আদটি দৃষ্টান্ত নহে; আজকাল অনেক স্থলেই এরূপ ব্যাপার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং সকলে সাবধান, যেন এরূপ প্রতারণায় না পড়েন।

"আনন্দ"

এই নাম দিয়া 'ভড় এণ্ড কোম্পানি', ওল্ড পোস্তাগরের লেন ঠিকানা হইতে একখানি বড়ই ...কাল হ্যাণ্ডবিল মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ...তরিত হইতেছে। সে বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম ...ই যে, 'আনন্দ' নামে একখানি মাসিক পত্র ...লেখকগণের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে; এবং বার্ষিক মূল্য জমা দিয়া তাহার গ্রাহক হইলে গ্রাহকগণ শাল-দোশালা হইতে ঘড়ি, ঘড়ির চেন প্রভৃতি নানা জিনিস উপহার পাইবেন। এ বিজ্ঞাপনখানি দেখিয়া প্রথমেই আমরা সন্দিগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন আবার সে সন্দেহ কার্য্যেই পরিণত হইতেছে, দেখিতেছি। অর্থাৎ হরিদাস ভড় নামক একটী বালক এই খেলা খেলিয়া এখন কোথায় পলাইয়াছে; এবং তাহার ফটোগ্রাফ লইয়া এখন অপরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং সকলে বুঝুন, বিজ্ঞাপনের ব্যাপার খানা কি? হায় হায়! যেখানে যত প্রলোভন, সেইখানেই তত প্রতারণা!

এই এক নূতন কাণ্ড!

জেলা জৈনপুর, ও এণ্ড আর রেলওয়ের ...ন্তর্গত সাগঞ্জ ষ্টেসনের ষ্টেসন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত ...র অঘোরচন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছেন,—

...হাশয়! আপনারা মহানগরী কলিকাতার ...তারণা ও জুয়াচুরী দমনার্থে বদ্ধ-পরিকর ...য়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ...শ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপ...র পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি হউক। এক্ষণে ...বেদন এই যে, অল্প দিন গত হইল, Bee ...antern নামক একটী নূতন ধরণের বিজ্ঞা... এক খানি পোষ্টকার্ডে ছাপাইয়া Reynolds ... Gibbs নামক জনৈক ব্যবসায়ী আমাদের ...ট প্রেরণ করেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, এরূপ লণ্ঠন আর আবিষ্কার হয় নাই; যদি কোন ভদ্রলোক ইহা ক্রয় করেন, তাহাহইলে শতকরা ৮০ ভাগ তৈলের ব্যয় কমিয়া যাইবে। মূল্য ১৲ ইত্যাদি। ইহা দেখিয়া আমি ও আমার দুই বন্ধু একত্রে ৩টা লণ্ঠন পাঠাইতে পত্র লিখি। ইহার ২।৪ দিবস পরে ভ্যালু-পার্শেল আসিল। খুলিয়া দেখি যে, ৩টি পানীয় গ্লাশ কাটিয়া তিনটী লণ্ঠন প্রস্তুত করা হইয়াছে। মূল্যের বিষয় আর কি লিখিব! বাজারে দুই আনায় দিলেও কেহ উহা লইতে স্বীকৃত হয় না। সে যাহাহউক, কলিকাতার ইংরাজ-ব্যবসায়ীগণ যে এরূপ প্রতারণা-পূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াতেছেন, তাহা আমার ধারণা ছিল না। এক্ষণে যাহাতে আমার ন্যায় নিরীহ ভদ্রলোকগণ প্রতারণায় না পতিত হন, তাহার চেষ্টা করিবেন।"

সংবাদ।

—ডিটেক্‌টিভ-পুলিসের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম 'অনুসন্ধানের' পাঠকদিগের মধ্যে কাহারও অজানিত নাই। 'অনুসন্ধানের' প্রতি সংখ্যাতেই প্রায় পাঠকগণ তাঁহার রচিত সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু তাঁহার প্রণীত "পাহাড়ে মেয়ে বা পাপীর আত্মকথা", "ডিটেক্‌টিভ্ পুলিস ১ম ও ২য় কাণ্ড" প্রভৃতি পুস্তকও আজকাল 'অনুসন্ধানের' অধিকাংশ পাঠককেই পরিতৃপ্ত করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, ঈশ্বর কৃপায় এবার আবার তাঁহার নাম সর্ব্বত্রে প্রচারিত হইতে চলিল। হিলি ও ওয়ার্ণার নামক দুইজন ইংরাজ ডাকাইত জেল হইতে পলায়ন করে; সম্প্রতি প্রিয়নাথ বাবু বহু অনুসন্ধানে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছেন। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টে তাঁহার বড়ই খোসনাম হইয়াছে; তিনি পারিতোষিক পাইয়াছেন। এবং দেশের লোকেও জানিয়া বিস্মিত হইয়াছেন যে, এমন বাঙ্গালী এখন পর্য্যন্তও এ-দেশে আছেন, যিনি দুই-দুইজন ইংরাজ ডাকাইতকে বিনা অস্ত্র-সস্ত্রে ধরিয়া

* কাটিহর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "দুই সন্ন্যাসী" পুস্তক প্রকাশনে 'বিজ্ঞ' সম্পাদক মহাশয় এই প্রস্তাবটি লিখিয়া "অনুসন্ধানের" জন্য পাঠাইয়াছেন। গতবারে ভ্রমক্রমে এটি সাবকপ্রত্যুপকার হইয়া লিখিয়াছেন, টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছিল।

আনিতে পারেন। যাইহোক, প্রিয়নাথ বাবুর দিন দিন পদোন্নতি হউক, ঈশ্বর-সমীপে আমাদের এই প্রার্থনা।

—ভারতবাসীর প্রধান বন্ধু সারজন ব্রাইট সম্প্রতি ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত-বাসী-মাত্রেই পরিতপ্ত।

—ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের শিক্ষা-বিস্তারের সহিত আমাদের দেশের শিক্ষা-বিস্তারের তো তুলনাই হয় না। তথাকার ১৮৮৬।৮৭ সালের শিক্ষা-তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, তথাকার ৬ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক বালকদিগের মধ্যে ১কোটী ১২ লক্ষ ৪৭হাজার ৯ জন বিদ্যালয়ে যাইত। দশবৎসর পূর্ব্বে উহা অপেক্ষা ঐ বয়স্ক ২৫ লক্ষ, ২৮ হাজার ১০৫ জন ছাত্র কম ছিল। এই বালকদিগের শিক্ষার্থে ১৮৮৬। ৮৭ সালে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিয়া ছিলেন, ২২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৪১৪ টাকা। দশ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিতেন, ১৫ কোটী ৮৩ লক্ষ ১১ হাজার ১৮ টাকা।

—জর্ম্মান-ভূগোলবেত্তারা তাঁহাদের ভূগোলের বর্ত্তমান বর্ষের সংস্করণে লিখিয়াছেন,—"সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা ১ শত ৪০ কোটি ৫০ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ৩০৬৪ ভাষা প্রচলিত আছে, ১১০০ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিদ্যমান। এমন কোন জাতিই নাই, যে জাতির মধ্যে কোনরূপ ধর্ম্মভাব বিরাজিত নাই। খৃষ্টানের সংখ্যা ৪৩ কোটি ২৩ লক্ষ আছে; ইহুদি সংখ্যা ৮০ লক্ষ, মুসলমান ১২ কোটী, হিন্দু ১৩ কোটী ৮০ লক্ষ, বৌদ্ধ ৫০ কোটী ৩০ লক্ষ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ১৩ কোটী ৫০ লক্ষ আছে।

—রাজপুতনার অন্তর্গত রঘুনাথপুর নামক স্থানে সম্প্রতি দস্যু কর্ত্তৃক ডাক মারা গিয়াছে। রঘুনাথপুর বিরক্তিয়া ডাকঘর এবং ভীওয়ানী ডাকঘরের মধ্যবর্ত্তী একটী স্থান। ডাক লইয়া জনৈক অশ্বারোহী সৈনিক যাইতেছিল, পথিমধ্যে দস্যু হস্তে নিপতিত হয়, ও ডাক লুণ্ঠিত হয়। দস্যুরা এখনও ধৃত হয় নাই। এরূপ ডাকাইতি শাসন-কলঙ্কের পরিচায়ক।

—ব্রহ্মের ওদিকে যুদ্ধের এখনও বিরাম নাই। তিগিয়ান নামক স্থানে চীনদিগের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র সমর হইয়া গিয়াছে। শত্রুপক্ষের ২৫ জন হত ও ৫০ জন আহত হইয়াছে। ইংরাজপক্ষে একজন সেপাহী গুরুতর আঘাত পাইয়াছে, ও তিনজন সামান্যরূপ আহত হইয়াছে মাত্র।

—আজকাল পুরুষে, মেয়ে মানুষের বেশ ধরিয়া ট্রেণে ট্রেণে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সুযোগ পাইলে মেয়েদের কামরায় প্রবেশ করিয়া অলঙ্কার-পত্র চুরি করিবার চেষ্টা পায়। সম্প্রতি মৈমনসিংহে একটা স্ত্রীলোক বেশধারী পুরুষ চোরামাল শুদ্ধ ধরা পড়িয়াছে। কুলের বিদেশিনী বেশ কিন্তু বুঝা ভার!

—কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এপ্রেল হইতে এই হারে টেক্স আদায় করিবেন,—বাড়ীর টেক্স শতকরা ৯৷৷০ টাকা, জলের শতকরা ৬ টাকা, আলোর শতকরা ২ টাকা এবং ময়লার শতকরা ২ টাকা। মোট শতকরা ১৯৷৷ টাকা। সহরের মধ্যে মধ্যবিত্ত লোকের তিষ্ঠান কঠিন হইয়া উঠিল।

—এক সঙ্গে কলিকাতা হাইকোর্টের তিন জন জজ শয্যাশায়ী। চিফ জষ্টিশ সার কোমার পিথরাম সঙ্কট পীড়ায় পাড়িত। আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, এখন তাঁহার অবস্থা একটু শোধরাইয়াছে। জষ্টীশ রমেশচন্দ্র মিত্র একটু সুস্থ হইয়াছেন। জষ্টীশ চন্দ্রমাধবও অসুস্থ; তিনি ভগন্দরের জ্বালায় অস্থির। শুনিতেছি, অস্ত্রচালনায় তিনি একটু ভাল আছেন। যাইহোক, সকলেরই আরোগ্য প্রার্থনীয়।

—সঞ্জীবনীর প্রিণ্টার যে মকর্দ্দমায় দণ্ডিত হন, শুনিতেছি, তাহার আপিল রুজু হইয়াছে।

—১৮৮৯।৯০ অব্দে ভারবর্ষের ৮২,৯৩,৫৩,০০০ টাকা আয় এবং ৮৩,৪৫,৯৬,০০০ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে ৫৪, লক্ষ টাকা অকুলান পড়ে; কিন্তু সীমার নিকটে রুশিয়ার ভয়ে যে সকল রক্ষা-কার্য্য হইতেছে, তন্নিমিত্ত ১,১০,২০,০০০ টাকা পড়িবে। এই বালাই না থাকিলে কেবল উদ্বৃত্ত হইতে এমত নহে, ইন্‌কমটাক্সও রাখিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু রাজস্ব মন্ত্রী ১০,৬৩,০০০, টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইতেছেন। দেশের ধনাগার হইতে ৭৪ লক্ষ টাকা লইলে তবে ঐ টাকা হয়, এই তাঁহার মত। এ বড় মন্দ নয়!

—বড়ই দুঃখের সংবাদ প্রধান প্রধান আড়তে চাউলের দর ৪ টাকার উপর দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতায় চাউলের দর ৪ টাকার উপর। এক সময় লর্ড নর্থব্রুক বলিয়াছিলেন, এদেশে চাউলের দর ৫ টাকা হইলে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, এবার অন্ন কষ্ট দেশব্যাপী না হইয়া পড়ে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই বৈশাখ, ১২৯৬ সাল। [১৮শ সংখ্যা।

শ্যামা-সঙ্গীত।

প্রসাদী সুর—একতালা।

"ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়া'য়ে পা'বে,
শিব-যুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও,
ছোবে' না তা'র গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত
পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে,
মিল্‌বে রতন ফলে ফলে॥"

জুয়াচুরীর পরিচয়।

(জুয়াচোরের নিজের কথা)

"আমি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কখনও হাবড়া ষ্টেসনে, কখন বা সেয়ালদহের ষ্টেসনে ভদ্র লোকের বেশে গমন করিতাম; ও যে স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট দেওয়া হয় সেই স্থানেই উপস্থিত হইতাম। টিকিট লইবার সময় এই সকল স্থানে যে কিরূপ ভয়ানক ভিড় হয়, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সহজে তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া টিকিট খরিদ করা কাহার সাধ্য! বিশেষ, তাহার উপর রেলওয়ে-কর্ম্মচারীগণের আবার অত্যাচার আছে। যাঁহারা বলবান, তাঁহারা কোন গতিকে ঐ ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া টিকিট খরিদ করিতে সমর্থ হন। আর যাঁহারা বৃদ্ধ, রুগ্ন ও স্ত্রীলোক, তাঁহারা কোন ক্রমেই সেই ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা কোন ভদ্রলোককে টিকিটখরিদ করিতে যাইতে দেখিলে তাঁহাকেই খোসামদ করিয়া টিকিটের মূল্য দিয়া টিকিট খরিদ করিয়া আনিতে অনুরোধ করেন। সেই ভদ্র-লোকও তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিয়া দয়া করিয়া তাঁহাদিগের

কথিত-মত টিকিট খরিদ করিয়া আনিয়া দেন।

"ষ্টেসনে গিয়া এইরূপ কোন স্ত্রীলোক বা বৃদ্ধ প্রভৃতি কাহাকেও দেখিলে আমি তাঁহার নিকট গিয়া বসিতাম; এবং তিনি কোথায় যাইবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতাম। পরে আমিও সেই স্থানে গমন করিব বলিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিতাম; ও নানা প্রকার গল্প করিয়া আমার উপর তাঁহার বিশ্বাস-স্থাপনের চেষ্টা করিতাম। টিকিট লইবার সময় হইলে আমি আমার নিমিত্ত টিকিট লইতে যাইতেছি এই কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতাম; তিনিও আমার অনুগ্রহের প্রার্থনা করিতেন; তাঁহার টিকিট খরিদ করিবার মূল্য আমাকে প্রদান করিতেন। তখন, আমিও ঐ মূল্যসহ টিকিট খরিদ করিবার মানসে সেই ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিতাম। আমি ষ্টেসনের গতিক ভালরূপ জানিতাম বলিয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিতে আমার কোন কষ্টই হইত না। শীঘ্র টিকিটও পাইতাম। আমি যে স্থানের টিকিট খরিদ করিব বলিয়া যাইতাম, তাহা খরিদ না করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন এক ষ্টেসনের টিকিট অতি অল্প মূল্যে খরিদ করিতাম; ও বক্রী দাম সমস্তই আপন পকেটে রাখিতাম। পরিশেষে, সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া সেই টিকিট তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতাম। তাহাতে আমার উপর তাঁহার কতক বিশ্বাস হওয়ায়, তিনি আর কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া ঐ টিকিট আপন কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিতেন। আমি এদিক-ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে সেই স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইতাম। আমাকে সে দিবস আর কেহই সেই স্থানে দেখিতে পাইতেন না। তিনি তখন অন্য সকলের সহিত গাড়িতে উঠিতেন; ও তাঁহার নিরূপিত স্থানে গিয়া উপনীত হইতেন। কিন্তু যে ষ্টেসনে তিনি অবতরণ করিতেন, সেই স্থানে ঐ টিকিট দিবার সময় সমস্ত কথা প্রকাশ হইত। সুতরাং তখন তাঁহাকেই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইত, রেলওয়ে-কোম্পানী তাঁহার নিকট হইতেই পুনরায় মাসুল আদায় করিয়া লইতেন।"

আমায় এখানে কে আনিল?

আমি এখানে কেন? কৈ কোন কথাই তো স্মরণ হয় না? আমি কি স্ব-ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছি, অথবা অন্য কেহ আমায় এখানে আনিয়াছে? ইহা কি আমার বাসস্থান? এখানে আমায় কি করিতে হইবে? আমার আদি-বাস কোথায় ছিল? অথবা ইহাই কি আমার আদিম বাসস্থান! যদি তাহাই হয়, তবে এখানে আমার বলিবার কি কি পদার্থ আছে? এখানে যাহা রহিয়াছে, সমস্তই উন্নত, মহান; আমার পক্ষে সমস্তই অতি দুর্ব্বোধ্য। এই সমস্ত অনন্ত পদার্থের সহিত আমি কেন সম্বদ্ধ? আমি পুত্তলিকার মত চাহিয়া থাকি, অথচ কিছুই দেখিতে পাই না। সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, এক মহান্ শক্তি পবনরূপে প্রধাবিত হইতেছে; কিন্তু কে ইহার গতি দিতেছে, কিরূপে দিতেছে, দেখিতে পাই না। আকাশে গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাই; কিন্তু কিরূপে শূন্যে শূন্যে গর্জ্জন হইতেছে, কেন এরূপ করিতেছে, বুঝিতে পারি না। আমার চতুস্পার্শ্বে যাহারা দিবানিশি কথোপকথন করিতেছে; আমি তাহাদের কোন কথাই বুঝিতে পারি না। সম্মুখে লতাবেষ্টিত আম্র-শাখায় বসিয়া কপোত শব্দ করিতেছে। তাহার চারিপার্শ্বে শত শত বিহঙ্গ ডাকিতেছে। এত চিৎকারের মধ্যে ইহারা আপন মনে নিবিষ্ট-চিত্তে যেন কাহারও সহিত কথোপকথন করিতেছে। এক জন শব্দ করিতেছে, আর একজন উত্তর দিতেছে। কেহ কাহারও প্রতি বিরক্ত নহে; কেহ কাহারও প্রতিবন্ধক জন্মায় না। আমি এ সমস্তই শুনিতেছি; কিন্তু ইহারা কোন্ বিষয়ে আলাপ করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না। কেবল অস্পষ্ট ধ্বনি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে মাত্র; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। নানা-প্রকার পশু নানা ভাবে নানা ইঙ্গিতে কার্য্য করিতেছে, আমি দেখিতেছি; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বৃক্ষলতাদির নানা-প্রকার কার্য্য দেখিতেছি, কিন্তু কাহারও ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি না। এমন রাজ্যে আমায় কে আনিয়াছে? আমি স্ব-ইচ্ছায় এমন শঙ্কট-স্থানে আসি নাই। তবে যিনি আমায় এখানে আনিয়াছেন, তাঁহার কোন উদ্দেশ্য আছে! কিন্তু আমায় সে উদ্দেশ্য তিনি বলিয়া দেন নাই কেন? বলিয়া দিলে আমি প্রাণ-পণে নিবিষ্ট-চিত্তে আমার আপন কার্য্য করিতাম। তাহা হইলে আমায় তো এরূপ বৃথা পরিশ্রম করিতে হইত না! অদ্য মনে করিলাম, ইহাই আমার কর্ত্তব্য; ইহা নিত্য, অবিচলিত, চিরস্থায়ী। কিন্তু কল্য দেখিলাম, ইহা অনিত্য, অতি অস্থায়ী। সুতরাং আমার সবল পরিশ্রম পণ্ড হইল। মনে বড় যাতনা হইল; পরিশ্রমের ক্ষমতা শ্লথ হইয়া পড়িল। সে উৎসাহ নাই। যে উৎসাহে কার্য্য করিতেছিলাম, এখন তাহার চতুর্গুণ নিরুৎসাহ। আবার অন্য কার্য্য ধরিলাম; তাহাতেও আবার সেইরূপ ঘাত-প্রতিঘাত। এইরূপে কোথাও স্থির হইতে পারি না; কোথাও স্থির অবিচলিত পদার্থ ধরিতে পারি না। অবিরত চলিতেছি। রৌদ্র, জল, ঝড় সমস্ত সহ্য করিয়া চলিতেছি। কখনও উপবেশন করিতে পাইলাম না। শ্রান্তিঅপনোদনের ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হইলেই কে যেন তিরস্কার করিয়া বলিতেছে,—চল। কিন্তু কোথায় যাইব? অবিশ্রামে তো চলিতেছি; কিন্তু গন্তব্য স্থান কোথায়! আর, এক পথে শতবার ঘুরিতেছি; তথাপি প্রকৃত পথ ধরিতে পারিতেছি না। জীবন্ত উৎসাহে মনে করিলাম, এই পথে যাই। সেই পথেই চলিলাম। কিন্তু দেখি, শত শত ব্যক্তি সেই পথে গিয়াছেন। তাঁহারাও আমার মত অন্ধ, একথা তাঁহারাই বলিতেছেন।

কিন্তু এই চঞ্চল অস্থায়ী পদার্থের মধ্যে একটি বিষয় এপর্য্যন্ত স্থির-অধিকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। এখানে শত শত পন্থা দেখিতেছি! কিন্তু ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সুপথ ও কতকগুলি কুপথ. ইহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি। কোটি কোটি মনুষ্য ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যাঁহারা কুপথ ধরিয়া ছিলেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত কণ্টকাবৃত পথে অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছেন। প্রথমে যদিও তাঁহারা কুপথের প্রহরীগণ কর্ত্তৃক নানারূপে প্রলোভিত হইয়া কিছু দিন সেই পথে গিয়াছেন; কিন্তু শেষে প্রতারিত হইয়া তার-স্বরে সকলকে জানাইয়া গিয়াছেন,—এই সমস্ত প্রতারকের কথায় কেহ বিশ্বাস করিয়া কখনও কেহ এ পথে আসিও না। কিন্তু কুপথে ঐ সমস্ত প্রহরী কে রাখিল? উহারা প্রথমে প্রলোভন দেখাইয়া শেষে কেন বিনাশ-সাধন করে? আর, যে সুপথের কথা বলিতেছিলাম, সে পথেও অনেকে গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বিনষ্ট হন নাই। ইহাতেই প্রাণ হইতেছে, তাঁহারাও কোথাও গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন? তাঁহাদের গন্তব্য-স্থান কোথায়? কেহ জানে না, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন! তবে সেই পথেই যাইব! কিন্তু সুপথে যাইতেও যদি অধিক পরিশ্রম করি, যদি অতি শীঘ্র যাইবার চেষ্টা করি, তাহাহইলেও নানা-প্রকার যাতনা পাই! সুকার্য্য করিতেও এত শাস্তি কেন আসে? এ পথে পরিশ্রম করিলেও শরীর অবশ হইয়া নানা প্রকার শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। তবে এ পথে যাইতেও এত প্রতিবন্ধক কেন? এখানে যাইতে হইলে কিরূপে যাইতে হইবে? ইয়ুবারবেগ সুপথ ধরিয়া ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এ শাস্তি কেন হইল! শঙ্করাচার্য্য কেন অকালে প্রাণ হারাইয়া ছিলেন! মরিবার সময়ে তিনিও কেন আক্ষেপ

করিয়াছিলেন; আরও কিছু দিন জীবনের আশা কেন করিয়াছিলেন? তবে এখানে কি সকলেই অন্ধ? কেহ কি বলিয়া দিতে পার না, কোন্ পথে কিরূপ ভাবে চলিতে হইবে? সুপথে যাইব সত্য; কারণ, সে পথে যন্ত্রণা কম। কিন্তু কিরূপ ভাবে চলিতে হইবে? কিরূপে চলিলে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি কাহারও বিরাগভাজন হইব না! একথা কেহ কি বলিয়া দিতে পার না? যদি পার না, তবে এখানে আমায় কে আনিল? কে অবিরাম আমায় চালাইতেছে? কেন আমায় বিশ্রাম করিতে দেয় না! আমার সহিত এরূপ ব্যবহারে ইহার কি উদ্দেশ্য? সু বা কু যে পথই ধরি না কেন; কু ধরিলে সু প্রতিবন্ধক দিবে, সু ধরিলে কু আসিয়া বিবাদ করিবে। তাই আমি প্রাণপণে চলিতেছি, অথচ বেশী যাইতে পারি না। ইহারা বিবাদ বাধাইয়া আমায় যাইতে দেয় না। কিন্তু বোধ হয়, আমাদের গন্তব্য স্থানে যাইবার একটী সূক্ষ্ম পথ আছে। বোধ হয়, কেহ কেহ অজ্ঞাতসারে সেই পথে গিয়াছেন। সেটি কোন পথ? যে পথে গেলে কোন মানসিক প্রবৃত্তি প্রতিবন্ধক হয় না, যে পথে গেলে কোন মানসিক বিবাদ হয় না, সে পথে যাইবার উপায় কি? জানিবার উপায় কি কেহ বলিতে পারে না? তবে এরাজ্যে আমায় কেন আনিয়াছে? কেন এত ক্লেশ পাইয়া নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছি! তবুও কেহ তুলে না কেন?

জীবের দায়িত্ব।*

কেহ কেহ কহেন, জীবের দায়িত্ব কর্ম্মের উপর নির্ভর করে; এবং সেই কর্ম্ম-ফলে জীবগণ কখনও বা উচ্চ-যোনি, কখনও বা নিকৃষ্ট-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলে তাঁহাদের কথায় এই দাঁড়ায় যে, কোন ব্যষ্টি জীবের কর্ম্মের পুরস্কার অথবা দণ্ড তাহার জন্ম দেখিয়া ও তাহার কার্য্য কলাপে পরীক্ষিত হয়। জীবের সঞ্চালন অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম-ফলে দেহ-পরিবর্ত্তন, এই মতের সাপক্ষে ও বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি পূর্ব্বে মনিষীগণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই তর্ক-বলে পূর্ব্বে যে, যে দেশের লোক ঐ মতে বিশ্বাস করিতেন, এখন তদপেক্ষা অনেকের মন হইতে সে বিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরাও জীবের কর্ম্ম-ফল-জনিত জন্ম-গ্রহণ কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন যোনি-ভ্রমণ-মতের সাপক্ষ নহি। যদিও এক সময় সমাজের লোকের চিত্তবৃত্তি ও অবস্থা-অনুযায়ী এ মত প্রবর্ত্তিত হইয়া সমাজস্থ লোকদিগকে নিচ-যোনির ভয় দেখাইয়া তাঁহাদের দুর্দ্ধর্ষ চিত্ত-বৃত্তিকে শাসিত রাখিয়াছিল; এবং তাঁহাদের চিত্তের উপর একাধিপত্য করিয়া সামাজিক নিয়মের অনেক সহায়তা করিত; কিন্তু এখন আর জগতের সে অবস্থা নাই। এখন যে সমাজে, বিশেষতঃ যে সমাজের লোকেরা, শিক্ষা বলেই হউক অথবা সমাজের অবস্থান্তর হওয়া বশতঃ হউক, কিম্বা অপর যে কোন কারণেই হউক, আপন-আপন চিত্ত-বৃত্তির উপর অনেক শাসন করিতে শিখিয়াছেন; সে সকল সমাজে উক্ত কর্ম্ম-ফল-মত প্রবল থাকা কোন প্রকারেই বিধেয় নহে। উহাতে যতটুকু উপকার না করুক, অনেক সময় অপকারই করিয়া থাকে। মনুষ্যের চিত্তকে ভয়ে জড় সড় করাইয়া দিয়া, যে সকল আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত থাকাতে সে কার্য্য করিয়া দশ জনের উপকারে লাগিত, ঐ মত তাহার সেই কার্য্য-পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে: কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া মনুষ্যকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। মনুষ্যের উৎকৃষ্ট চিত্ত-বৃত্তিই যে কেবল তাঁহার উপকারী, তাহাও নহে। যাহাকে আমরা অপকৃষ্ট বৃত্তি বলি (যথা কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ), তাহারাও

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

সমান উপকারে লাগে। আবার অপকৃষ্ট বৃত্তি হইতে যেমন অপকার হয়, উৎকৃষ্ট হইতেও ঠিক তদ্রূপ হইয়া থাকে। ইহা সেই ঈশ্বরের সাম্য-নিয়মের একটী দৃশ্য।

যদি স্বীকারই করা যায় যে কোন বিশেষ কর্ম্ম করিলে জীবাত্মা কোন বিশেষ নীচ-যোনিতে গমন করে; তবে দন্তী ও পক্ষী-শ্রেণীস্থ হেস্পারর্নিস্ রিগ্যালিস্ (Hesperornis regalis) ও সরিসৃপের মধ্যে ইক্‌থিওসরাস (Ichthyosauri) জাতীয় নীচ যোনি-সম্ভূত যে সকল জীবগণ পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া গিয়াছে, এবং স্তন্যপায়ীর মধ্যে স্থূলচর্ম্মী ডাইনোথিরিয়ম্ ও ম্যাষ্টডন্ প্রভৃতি যে সকল জীবের যোনি ছিল, সেই সকল যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিবার কর্ম্ম সমস্ত কোথা গেল? তাহারাও কি এই কর্ম্ম-ক্ষেত্র পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া গিয়াছে? কোন মনুষ্য দুর্ভাগ্য-বশতঃ দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, মনুষ্যোচিত যে সকল চিত্ত-বৃত্তি এখনও আছে সেই সকল বৃত্তি-বলে কার্য্য করিয়া গিয়া, যদি ঐ লুপ্ত যোনিতে প্রবেশ-রূপ দণ্ড পাইয়া থাকে, তবে এখনই বা সেই মনুষ্য সেই বৃত্তি থাকা-সত্তেও কার্য্য করিয়া উপরি-উক্ত যোনি না পায় কেন? আরও যদি বলেন যে, ডাইনোথিরিয়ম প্রভৃতি জীবের কর্ম্ম লোপ হইয়াছে, সেই জন্য তাহাদের বংশ লোপ হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেই পারে না। প্রাণ থাকিলেই দেহের কার্য্য চলিবে! তাহাতে তাহাদের কার্য্য কেনই বা লোপ হইবে? তাহারাও ইচ্ছা করিয়া পান ভোজন, মৈথুন, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তির কার্য্য সমস্তই করিয়াছে। তবে তাহাদের কর্ম্মফলই বা কোথায় যায়? বহির্জগতের কর্তৃত্বাধীনে, কিম্বা অন্তর্জগতের যে মিল সম্বন্ধ বহির্জগতের সহিত আছে তজ্জন্য, কোন সম্প্রদায়স্থ প্রাণীর একটী বা দুইটীর বংশ লোপ হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি সেই সেই সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জীব একেবারে লোপ পাইবে? ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! আর, যখন দেখিতেছি যে, এই জগতে প্রত্যেক জীবের আকার, প্রকৃতি ও চিত্ত-বৃত্তির পরিস্ফুটতা কোন না কোন প্রকারে স্বতন্ত্র ও তাহাদের কর্ম্মও একরূপ হইতে পারে না; তখন অযৌক্তিক কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া ঐ কথা বলা কোন মতেই বিধেয় নহে।

আমাদের বোধ হয় পূর্ব্বজন্ম-বাদীগণ যাহা কহেন, তাহার অর্থ অতি অস্পষ্ট। এমন মনুষ্য পৃথিবীতে কেহই নাই, যিনি বলিতে পারেন যে, এই কর্ম্ম এই জন্মে করিলে, অমুক যোনি নিশ্চিত প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদি কেহ তাহা বলিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আমরা সর্ব্বজ্ঞ—মাংসল ভগবান বলিয়া নমস্কার করি। আমার কর্ম্ম লোপ হইলে তোমার কর্ম্ম লোপ হইবে কেন? অথবা পূর্ব্বজন্মের যে শ্রেণীর কর্ম্ম করিয়া আমি মনুষ্য হইয়াছি, কি আর এক জন মনুষ্য হইয়াছে, সেই কর্ম্ম সাধারণে বা কেন লোপ হইবে? আমি একাকী তো এক সম্প্রদায় নহি! অশ্বতর ও অশ্বতরীর সঙ্গমেও সন্তান হয় না। ইহাও কি তাহাদের কর্ম্মফল লোপ হইয়াছে বলিয়া হয় না? যদি তাহাই হয়, তবে সে কোন জন্মের, ও কি কার্য্যের? এবং সেই কার্য্য জ্ঞানকৃত না অজ্ঞানকৃত? মনুষ্য জন্মের কার্য্যকে যে পরিমাণে জ্ঞানকৃত স্বীকার করিতে পারি, নিকৃষ্ট জীবের অল্পসংখ্যক কার্য্য আমরা সেই পরিমাণে জ্ঞানকৃত বলিয়া ধরিতে পারি না। এমন স্থলে যখন মনুষ্যের জীবাত্মা নিকৃষ্ট যোনীতে কারাদণ্ড ভুগিয়া তাহার মনুষ্য-জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিল, তখন আবার সেই জীবাত্মা ঐ নীচ যোনিতে যে কর্ম্ম করিল, তাহা এক প্রকার অজ্ঞানকৃতই বলিতে হইবে। সুতরাং অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের যদি দায়িত্ব না থাকে, তবে সেইখানেই জীবের উদ্ধার হওয়া উচিত। আবার যদি অল্প-

জ্ঞানকৃত বলিয়া তাহাকে ফলভাগী হইতে হয়, তবে তাহার জন্য উচ্চ-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবদেহে সেই জীবাত্মা আর প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না।

এখন, পাঠক মহাশয়, বলুন, ঈশ্বরের যদি এই দণ্ডই হয়, তবে দণ্ডের যে উদ্দেশ্য, তাহা ফলিল কই! জীবাত্মা তো ক্রমেই তাহাতে অধোগামী হইতে চলিল! তখন তাহার আর নৈতিক উন্নতি (যদি থাকে) কোথায়? উপর্য্যুক্ত যাবতীয় কারণে আমরা কহি যে, ঈশ্বর রাজার ন্যায় জীবকে কখনই দণ্ড প্রদান করেন না; অথবা কর্ম্মফল লইয়া মৃত্যুর পর জীবাত্মা নীচ-যোনিতেও প্রবেশ করে না। আমাদের এই কথায় 'স্বাধীন ইচ্ছা'-বাদীগণ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি দণ্ড কিম্বা পুরস্কার না থাকে, তবে জীবের "স্বাধীন ইচ্ছা' কেন? তদুত্তরে আমরা কহি, জীবের প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য নাই। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড বিস্তৃত সম্বন্ধ দ্বারা সকলকেই সমভাবে রাখিয়াছে। এইজন্য সেই ইচ্ছা প্রকৃত কার্য্যকারীই নহে। আমরা যেরূপ স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য দেখি, তাহা ধীবরের জালাচ্ছাদিত মৎস্যের ধ্বস্তাধস্তি-সদৃশ। শুদ্ধ ইচ্ছাকেই বা তাঁহারা স্বাধীন বলেন কেন? ঐ অর্থে আমরা জীবের চৈতন্যের সকল ভাবই তো স্বাধীন বলিতে পারি! আমরা পূর্ব্বে যেমন জীবের কথায় জীবাত্মার উপর নির্ভর না করিয়া, শুদ্ধ 'চৈতন্যের ভাব' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি; এবং সেই ভাব-সকলকে যেমন শক্তির সাম্যভাবের বিনাশ-ব্যঞ্জক দৃশ্য কহিয়াছি; স্বাধীন ইচ্ছাকেও আমরা তাহাই বলি। আর এক কথা এই হইতেছে যে, যদি ঈশ্বরের শাসন বজায় রাখিবারই উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি তাহা করিতে পুরস্কারের লোভ দেখাইবেন কেন? পুরস্কারের লোভ কি কখনও শাসন ঠিক রাখিতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মনুষ্য দণ্ড ও পুরস্কারের কল্পনায় ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের সমতুল্য করিয়া ফেলিয়াছেন—যেন ঈশ্বর তাঁহার সম-জাতীয় নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাশালী জন্তু বা প্রাণী!

আর এক কথা এই, যদি জীবকে দণ্ড দিবার ইচ্ছাই ঈশ্বরের থাকে, তবে এমন চমৎকার সাম্যভাব, বৈষম্যের মধ্যে কেন রাখিয়াছেন? কেনই বা জীবদেহে, কিম্বা অধ্যাত্ম্য জগতে বৈষম্য হইয়া কোন এক ভাবের প্রকাশ হইলেই তাহাকে সাম্যে আনিতে সৃষ্টির যাবতীয় অন্যান্য বলকে তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে দিয়াছেন? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং বলিতেছি যে, এই সৃষ্টিতে অহোরাত্র ধ্বস্তাধস্তি চলিতেছে; যে বল শত্রুভাবে অপর বলকে সাম্যে আনিতে যাইতেছে, সেই আবার তাহারই পরম মিত্র হইতেছে। এই ধ্বস্তাধস্তিময় ব্রহ্মাণ্ডে, প্রাণ বলুন, আর কর্ম্মের কথাই বলুন, সমস্তই ধ্বস্তাধস্তি। এই জন্যই বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্য্য; মরণ অর্থাৎ চৈতন্য-সম্বলিত (ইহার মধ্যে গাছ ও প্রাণী দুই-ই আসে) দেহের, অধ্যাত্ম্য-ভাববিশিষ্ট হউক আর নাই হউক, ধ্বস্তাধস্তি-বিহীন অবস্থায় যাওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এই মৃত্যুকে আমরা কখন কখন চৈতন্যের সুপ্তাবস্থাও বলিয়াছি। এখানে পাঠক মহাশয়কে কহিতেছি যে, সেই অবস্থায় প্রাণের সঞ্চার, জ্ঞানের (যে জ্ঞানের মধ্যে যে সকল ভাবকে আমরা অধ্যাত্ম্য ভাব কহি) সমস্তই আসিয়া পড়িতেছে; এবং সে অর্থে আমরা 'চৈতন্য' ও 'আধ্যাত্মিক শক্তি' এবম্বিধ কথা যে বরাবর প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি, সেই সমুদায়েরই পরিদৃশ্যমান কার্য্য দেখাইবার কোন ক্ষমতা থাকে না, ও সে অবস্থায় আর জীব ও চৈতন্যের নাম-ভেদ থাকে না। এই সমস্ত উপায়ই বা তবে ঈশ্বর কেন করিয়াছেন? এই বা কেমন কথা যে, যে জীবকে দণ্ড দিতেছেন, তাহার শিক্ষা না হইতে হইতেই, তাহার প্রতিকার-উপায় আসিয়া উপস্থিত! বিশেষ,

আবার বিলম্বে নহে—তদ্দণ্ডেই! স্বীকার করি, জীবের দুঃখ কিয়ৎকাল থাকে বটে; কিন্তু যদি তাহাকেই দণ্ড বলি, তবে সেই জীব জানিল কই যে, তাহার দুঃখ দুষ্কর্ম্মে কি সুকর্ম্মে হইল? ইহাতে সেই জীবের দুঃখ-ভোগ যেন ভাটার গড়ান-গোছ হইল। ভাটা, শক্তি-বৈষম্যে যেন গড়াইয়া চলিল, আর সহস্র বল তাহাকে থামাইতে অমনি ব্যস্ত হইল! সে জানিল না যে, তাহাতে শক্তি-বৈষম্য কে করিল ও কেন করিল। সে ভাবিতেছে, মনে করুন,—"বা! এ বড় মজা! ছিলেম জড়, হলেম চলৎশক্তিবান! আমার দেহ যাহাতে নির্ম্মিত তাহারা পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু আমার কি বাহবা শক্তি জন্মিয়াছে!!" কিম্বা তখন যদি কোথায়ও গিয়া ঠোকর খায়, সে আপনার মন ঠাণ্ডা করিতে ভাবিতেছে, "উঃ আমার কি দুষ্কর্ম্মের ভোগ!" (ক্রমশঃ)

এড়ি-রেশমের চাস। ✓

এড়ি-চাসের সরঞ্জামী।

এড়ি চাসের সরঞ্জামীতেও পয়সা ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। এই চাসের জন্য প্রথমতঃ (১) একখানি কুলা, অথবা ডালা, অথবা যে কোন বিস্তৃত পাত্র হউক না কেন, পোকাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হয়। (২) একখানি ছিন্ন বস্ত্র বা ন্যাকড়া পোকাকে ঢাকিয়া রাখিতে। (৩) পোকার যৌবন কাল উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সে যখন বড় হইবে তখন, মাটী হইতে অল্প উচ্চ করিয়া আন্দাজ দুই হাত কিম্বা আড়াই হাত দীর্ঘে ও দেড় হাত প্রস্থে একটী মাচা প্রস্তুত করিতে হইবে; এবং সেই মাচার উপর, দড়িরই হউক কিম্বা বাঁকারিরই হউক, একটী আলনার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হইবে। পোকা বড় হইলে ঐ আলনায় রেড়ি-পাতের গুচ্ছ ঝুলাইয়া দিলে, পোকাগুলি ঐ মাচা হইতে পাতা বাহিয়া উঠিয়া পাতা খাইবে। (৪) ঐ মাচার উপর পাতিয়া দিতে এক টুকরা ছেঁড়া মাদুর অথবা ছেঁড়া থলে। কারণ, পোকাগুলি পাতা খাইতে খাইতে কখনও পড়িবে, ও কখনও উঠিবে। তজ্জন্য, ঐরূপ করিবার প্রয়োজন যে, উহারা মাটীতে না পড়িয়া যায়। আর, তাহার উপর বিষ্ঠা পড়িলে, সময়ান্তরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবারও সুবিধা হইবে। (৫) কতকগুলি শুষ্ক কলার পাত কিম্বা অপর গাছের পত্র কিম্বা খড়-কুটা, পোকার ঘরা বাঁধিবার সময় প্রয়োজন করে। (৬) কতকগুলি রেড়ির গাছ বাটীর এক পার্শ্বে করিয়া রাখা। (৭) কিছু উনানের ছাই কিম্বা ঘুঁটের ছাই, কিম্বা হরিদ্রার গুড়া; উক্ত মাচার পায়ার গোড়াতে ছড়াইয়া দিবার প্রয়োজন করে। কারণ, তাহা হইলে লাল পিপীলিকা মাচায় উঠিয়া পোকাকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে না।

উপরি উক্ত সাত দফা বস্তু গরীবের সংগ্রহ করা কিছুই কষ্টকর নহে। অথচ উক্ত পরিমাণ দীর্ঘ আলনায় ও মাচায় অন্ততঃ আট-দশ পোণ পোকা, অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি না হইয়াও, পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। যাঁহাদের খরচ করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহারা মাচার পরিবর্ত্তে তক্তাপোষ, কিম্বা তিন চারি থাক আলনার বন্দোবস্ত করিয়া ও মধ্যে মধ্যে তক্তা কিম্বা দরমা দিয়া মাচার বন্দোবস্ত রাখিয়া, কাষ্ঠের কিম্বা বাঁসের ফ্রেম্ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। তাহা হইলে এক এক থাকে ৮। ১০ পোন করিয়া পোকা প্রতিপালন করিতে পারিবেন। মাচা এরূপ আলমারীর মত থাকে থাকে উঠিলে স্থলেরও সঙ্কুলান হইবে; অথচ ইচ্ছা করিলে হাতে ধরিয়া ফ্রেমটী এক স্থান হইতে অপর স্থলেও লওয়া যাইতে পারিবে। আর, সেই ফ্রেমের তলে চারিটি বাটিতে জল দিয়া তদুপরে ফ্রেমটী বসাইলে

পিপীলিকা মাকড়সা প্রভৃতি অনিষ্টকর কীটও উঠিতে পারিবে না।

এই এড়ি-পোকার কতকগুলি শত্রু আছে। যাঁহারা ইহার চাস করিবেন, তাঁহাদিগকে সে সম্বন্ধেও সাবধান থাকিতে হইবে। সেই শত্রুগুলির মধ্যে পিপীলিকা, বড় বড় মাছি, মাকড়সা, কাক ও অন্যান্য কীট-ভোজী পক্ষীই প্রধান। আবার কতকগুলি বস্তু তাহাদের স্বাস্থের পক্ষে বড়ই অপকারক; যেমন গন্ধকের ধুম, তৈল, লবণ, কর্পূর, হিঙ্গু, অতিশয় রৌদ্র, প্রবল বায়ু, অতিরিক্ত শীত, তাহাদের নিজের বিষ্ঠা, অপরিচ্ছন্নতা। বৃষ্টিতে কিম্বা জলে উহাদের তত অপকার বা প্রাণ-হানি হয় না। দেখিয়াছি, পাঁচ মিনিট কাল একটি বড় পোকাকে জলে ডুবাইয়া রাখিলেও সে মরে নাই; ছাড়িয়া দিলেই ভাসিয়া উঠিয়াছে। অল্প বড় হইলে হাত দিয়া ধরিয়া ১০ ফীট উচ্চ হইতে মাটীতে ফেলিয়া দিলে কিম্বা সামান্য জোরে আছাড় মারিলেও মরে না। তবে সেই আছাড় যদি এমন জোরে লাগে যাহাতে ছাল ফাটিয়া যায়, তাহাহইলে ৫ ঘণ্টা পরে মরিয়া যায়।

আহার ২। ১ দিন না পাইলেও প্রাণত্যাগ করে না। তবে তাহাতে দুর্ব্বল হইয়া যায় ও সরু হইলে রেশম কম জন্মে। ডিম্ব হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে ৪৮ ঘণ্টা বিনা আহারে রাখিয়া দেখিয়াছি, পোকা মরিয়া যায় নাই। মক্ষিকা তাহাদের গাত্রে বসিয়া শরীর ফুটা করিয়া দিলেও মরে না। কিন্তু শিলপড়া আমের মত গাত্র টোল খাইয়া থাকে। মক্ষিকা গাত্রে ঐরূপ ফুটা করিলে আরও এক দোষ জন্মে। তাহা পাঠক মহাশয়গণকে শেষে পোকার পীড়া ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে লিখিবার সময় জানাইব। পোকা অঙ্গুলির মত দীর্ঘ হইলে তাহাকে হুমড়াইয়া আস্তে আস্তে রগড়াইলেও প্রাণ বহির্গত হয় না। সুতরাং দেখা যায়, এই কীটের প্রাণও কঠিন। (ক্রমশঃ)

বারমুখী বেশ্যা।

ঐকান্তিকী অনুরক্তি দ্বারা মানব অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে, অপ্রাপ্য লাভ করে, অঘটন ঘটাইয়া থাকে। যোগ সমাধি প্রভৃতি যাহা কিছু বল, সমস্তই ঐকান্তিক অনুরাগের ফল। যখন মানব হৃদয়ে ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মায়, তখন তাহাতে ভূতভাবন ভগবান আপনি আসিয়া উপস্থিত হন। ভগবান অনুরাগীর নিকট চির-ক্রীত। তাই কতশত অধম নীচ-যোনি-সম্ভূত ক্ষেত্রেও অনুরাগের আকর্ষণে তাঁহাকে আসিয়া বাঁধা পড়িতে হয়। এমনই অনুরাগের মাহাত্ম্য! কিন্তু সে অনুরাগ জন্মে কয় জনের? সে আত্মহারা অনুরাগ ক্ষণিক হৃদয়ে স্থান পাইলেও, প্রাণে যে অতুলনীয় শান্তি পাওয়া যায়, তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহার হৃদয়ে সে দেবভোগ্য অনুরাগ সঞ্চিত হয়, তিনিই ধন্য। চাই, তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করুন, অথবা ঘৃণ্য চণ্ডাল কুলোদ্ভবই হউন; তিনিই পরম প্রেমিক। এই ঐকান্তিকী অনুরাগ-বলে চির-বেশ্যা বারমুখীও অবশেষে ভগবানের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলেন।

ভক্তমাল-গ্রন্থে বারমুখীর সেই অপূর্ব্ব চরিত্র বিবৃত আছে। বারমুখী রূপসী যুবতী,—পরমা সুন্দরী; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। ভোগ-বিলাসের চরম স্থানে তিনি অধিরূঢ়া হইয়াছিলেন। কন্দর্পের সেবায় তাঁহার কখনও বিরক্তি ছিল না। কত শত বিপুল সম্পত্তিশালী যে তাঁহার মনোহর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া যথা-সর্ব্বস্ব হারাইছেন, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। কথিত আছে, বারমুখীর সৌন্দর্য্যে এইরূপই চমৎকারিত্ব ছিল যে, প্রথম দর্শনেই তিনি দর্শকের চিত্ত একবারে হরণ করিতে সমর্থা হইতেন। তাঁহার গৃহ দেখিলে মনে হইত, যেন

ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সুখপ্রদ দ্রব্যের ভাণ্ডার। বারমুখী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া সুখের সীমা দেখিতে প্রয়াসীনী। জগতে যাহা কিছু সুখের বলিয়া প্রখ্যাত, বারমুখী তাহাই আহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা যেন তাঁহার সহিত লুকাচুরি খেলিতে লাগিলেন। বারমুখী যতই সুখের চরম-সীমা-লাভে যত্নশীলা হইতে লাগিলেন, বিধাতা যেন ততই তাঁহার সুখ-স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় বারমুখী এক দিবস একাকিনী আপনার সুন্দর হর্ম্মের গবাক্ষ-পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক আপন মনে অনন্ত নীলকাশে দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া সুখের পরিণাম ভাবিতেছেন, এমন সময় মধুর-তান-লয়-সংযুক্ত সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সঙ্গীতের প্রত্যেক অঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে স্তরে স্তরে শেলসম বিদ্ধ করিতে লাগিল। সঙ্গীতটি একান্ত বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক। ঔদাসীন্যের মনোরম প্রতিমূর্ত্তি যেন সঙ্গীতাকারে তাঁহার সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইল। বারমুখী চমকিয়া উঠিলেন। উহাঁর যেন ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। অতীত জীবন স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পূর্ব্ব সুকৃতি বলে চিত্তস্থির করিয়া সঙ্গীত-শব্দ অনুসরণ পূর্ব্বক তিনি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন। সম্মুখে তাঁহারই নানাবিধ ফল-ফুলে সুশোভিত, পরিমল সমিরণ-ব্যজিত সুরম্য উদ্যান। উদ্যানের অনতিদূরে বৃক্ষতলে কষায়-বস্ত্র-পরিহিত বিভূত্যঙ্গ-ভূষিত, কমণ্ডলুধারী কএকজন সন্ন্যাসী। দেখিলেন, সন্ন্যাসীগণ নিমিলিত নেত্রে সমস্বরে ভগবানের নাম-গান করিতেছেন। তাঁহাদের প্রসন্ন মুখমণ্ডল, শান্তি-পূর্ণ মূর্ত্তি এবং ভক্তি-গদগদ ভাব দেখিয়া, তাঁহার যেন নবজীবন সঞ্চার হইল। গত জীবনে ধিক্কার জন্মিল। কৃত-পাপরাশি স্মরণ হইয়া হৃদয় ব্যথিত করিয়া দিল। তখন পরিণাম চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। কি উপায়ে পরিত্রাণ পাইব, তাই ভাবিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। মনে ভাবিলেন,—"হায়! আমি এই নশ্বর দেহের সচ্ছন্দ লাভের জন্যই কি না করিয়াছি; কিন্তু কৈ এক দিনের জন্যও তো সচ্ছন্দ পাইলাম না! মৃত্যু আসিয়া যখন আমায় গ্রাস করিবে, তখন এদেহের যত্ন কে করিবে? প্রজ্জ্বলিত চিতায় যখন এ সুন্দর কান্তি ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইবে, তখন এ সৌষ্ঠব কোথায় থাকিবে? হায়! এই প্রেমিক সন্ন্যাসীগণ যাঁহার প্রেমে পাগল হইয়া এত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, এক দিনের জন্যও যদি সেই প্রেমিক-বরের সেবা করিতাম, তাহা হইলে আর আমায় এত বিড়ম্বিত হইতে হইত না। আমি প্রেমপ্রার্থিনী হইয়া কাহার না সেবা করিয়াছি? এই অমূল্য জীবনকে কত জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছি! কিন্তু কৈ এক দিনের জন্যও তো বিনিময়ে সে প্রেম পাই নাই, যাহাতে আমার প্রাণের আশা মিটিয়া যায়! এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া, কত বিপুল সম্পত্তিশালী ধনপতিকে নিজ করায়ত্ত করিয়াও তো কৈ এক দিনও শান্তি পাইলাম না! হায়! যদি ক্ষণকালের জন্যও সন্ন্যাসীগণের লক্ষ্যে নিজ লক্ষ্য মিশাইতে পারিতাম, তাহাহইলে যে জীবন ধন্য হইত! আমার এই অর্থরাশি ইন্দ্রিয় চরিতার্থকর কার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে কত সাধু অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইত!" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নানাবিধ বহুমূল্য রত্নরাজি হস্তে করিয়া বারমুখী সন্ন্যাসীগণ সন্নিধানে উপনীত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো! এ অধিনী আজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত। ইহ-জীবন অবিশ্রান্ত কুক্রিয়ায় অতিবাহিত হইয়াছে। কখনও সুখ-আশে শান্তির আধার হরির নাম করি নাই। তাই এখন আমার প্রার্থনা, এই রত্নরাশি গ্রহণ করিয়া আপনাদের সেই

শ্যামল সুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাইবেন।"

সন্ন্যাসীগণ অপরূপ লাবণ্যময়ী কামিনীকে এতাদৃশভাবে সমাগতা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন; এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"মা তুমি কে! তোমার নামই বা কি, কোথায় অবস্থান কর, এসমস্ত আমাদের নিকট বলিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা নিবারণ কর।" বারমুখী সন্ন্যাসীগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং আপনার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া, লজ্জায়, ঘৃণায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সন্ন্যাসীগণের মধুর আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে আশান্বিতা হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের চরণে নিপতিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীহরির কৃপার প্রার্থিনী হইলেন। বারমুখীর শ্রীকৃষ্ণচরণে এবম্ভূত ঐকান্তিক অনুরাগ দেখিয়া তাঁহারা আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া সন্নিকটস্থ ৺ রঙ্গনাথ ঠাকুরের সেবায় সেই সমস্ত রত্নরাশি প্রদান করিতে উপদেশ দিলেন। অবিচলিত হৃদয়া বারমুখী সন্ন্যাসীদের বাক্যে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ৺ রঙ্গনাথ ঠাকুরের মন্দিরে যাইয়া উপনীত হইয়া পুরোহিতকে নিজ মানস জানাইলেন। পুরোহিত বেশ্যার দ্রব্য অস্পৃশ্য বোধে সমস্ত প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন। বারমুখীর আশা পূর্ণ হইল না। তখন তাঁহার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন,—"প্রভো! অদ্য আমি ঘৃণিত উপায় দ্বারা অর্জিত আমার যে কিছু সম্পত্তি তাহা, তোমার চরণে অর্পণ করিলাম! আমি অতি দীনা, হীনা, বিপথগামিনী, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু তুমি যে ঠাকুর পতিতেরই সম্বল! শরণাপন্ন, পতিতকেই উদ্ধার কর বলিয়া তোমার এত মর্য্যাদা! সাধুগণ আপনার সাধুতার বলে তোমার প্রসাদ লাভ করিবে, তাহাতে তোমার দয়ার প্রকাশ কোথায়? আমাদের ন্যায় হতভাগার উদ্ধার সাধন কর বলিয়াই তুমি দয়ার-আধার নাম পাইয়াছ। আজ দেখিব ঠাকুর, তুমি তোমার নামের সার্থকতা রক্ষা কর কি না!" এই বলিয়া বারমুখী অনাহারে অনিদ্রায় ধ্যানস্থ হইয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল হরি যে অনুরাগ-ডোরে বাঁধা! যখন বারমুখীর অনুরাগ চরম অবস্থায় উপনীত হইল, তখন আর তিনি থাকিবেন কোথায়? স্বয়ং আসিয়া বারমুখীর মনোভিলাষ পূরণ করিলেন। শ্রীহরির কৃপায় পুরোহিত বারমুখীর অকস্মাৎ অপূর্ব্ব অবস্থা দর্শন করিলেন। দেখিলেন, স্বয়ং হরি বারমুখীকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। বারমুখীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন জানিয়া তখন ৺রঙ্গনাথ ঠাকুরের মূর্ত্তি "বেশ্যার" রত্নে সুশোভিত করিলেন। অনুরাগের চরম ফল বিকশিত হইল। হরির কৃপায় অসাধ্য সাধিত হইল।

দুইখানি ছবি।

প্রথম-দৃশ্য।

দুর্দ্দৈবে।

"ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না!"

"ভয় কি!—তোমার ভালই হবে!"

"তা'র চেয়ে মরণ ভাল!"

"নিতান্ত মতিচ্ছন্ন! ছিলে ভিকারিণী, হ'তে রাজরাণী!"

"ভিকারীই আমার মস্তকের মণি—ভিকারীই আমার আরাধ্য। তেমন রাজা আমার বাম পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতেও স্থান পাইবার যোগ্য নয়।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে!"

আর কথা হইল না। "আচ্ছা, দেখা যাবে!"—বলিয়াই তাহারা তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিল। ধরিয়াই, ঊর্দ্ধশ্বাসে গন্তব্য-স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চৈত্রমাসের শেষাশেষী। গ্রামে বড়ই জল কষ্ট। গ্রামের নালা, ডোবা, পুকুর, খাল সকলই চৈত্রের রোদে 'ফুটি-ফাটা'। অনেক দূরে 'রাজার দীঘী'; সেখানে ভিন্ন চতুস্পার্শ্বের আর কোন গ্রামেই জল নাই;—সর্ব্বত্রেই জল বিনা হাহাকার! ঈশ্বর না করুন, কিন্তু গ্রামে যদি দৈব-বিপাকে কখনও আগুণ লাগে, তবে গ্রামের গরু, বাছুর, মানুষ, পাখী সকলকেই লইয়া ঝলসিতে হয়। আগুণ লাগে কেন! —লাগিতে আর বাকী কি? যে গ্রামের জমীদার তুচ্ছ 'রাজোপাধি' লাভের জন্য প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, লাট-উপলাটের চরণে অঞ্জলী দিতেছে; সে গ্রামে আগুণ লাগিতে আর বাকি কি? যে গ্রামের জমীদার প্রজাকে সপরিবার অনাহারে রাখিয়া, তাহাদের ধনধান্যে আপনার বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত করিতেছে; সে গ্রামে আর আগুণ লাগিতে বাকী কি? শেষে যে গ্রামের জমীদারের কুটীল দৃষ্টিতে কুলললনারও কুলমান রক্ষা হওয়া দুষ্কর হইয়াছে; গ্রামে জলাভাব-নিবন্ধন দূর মাঠ দিয়া জল লইয়া আসিবার সময় যে গ্রামের কুল-মহিলা এইরূপে পাশব উপায়ে আক্রান্ত হইতেছে; সে গ্রামে আগুণ লাগিতে আর বাকী কি? যাইহোক, গ্রামের এই জলাভাব-নিবন্ধন কামিনী আজ সন্ধ্যার প্রাকালে জল আনিতে গিয়া এইরূপে বিপদস্থ। জল লইয়া ফিরিবার সময়, নূতন রাজোপাধি-গ্রস্থ সেই গ্রাম্য জমীদারের ছলনায় তাঁহার অনুচরবর্গ কামিনীকে রাজ-ভবনে ধরিয়া লইয়া গেল।

কামিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা। নবগ্রামের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যের পরিণীতা পত্নী। শ্রীনাথ বড়ই দরিদ্র। গ্রাম্য কৃষক-মণ্ডলীর মধ্যে যজন-যাজন করিয়া ও শিষ্য-সেবকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণে কোনরূপে অতি কষ্টে দিনপাত করেন। আজ তিন দিন হইল, তিনি শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন। আর কেহ নাই, আজ কয়দিন হইতে কামিনীই বাড়ীতে একেলা। তা'র কামিনী আবার সুরূপা—যৌবন-শ্রী তাঁহাতে 'ঢল ঢল' করিতেছে। দারিদ্র-পীড়নে—অনশনে, অর্দ্ধাশনে, যদিও তাঁহার শরীর কতকাংশে বিশুষ্কপ্রায়; তৈলাভাবে যদিও তাঁহার মস্তকের কেশদাম রুক্ষাকৃতি; সহস্র গ্রন্থি স্থূল বস্ত্র যদিও তাঁহার পরিধান; তথাপি তাহার মধ্যেও তাঁহার এক অপূর্ব্ব জ্যোতি আছে। আর, সেই জ্যোতিতেই রাজা মজিয়াছেন। তিন দিন পূর্ব্বে তিনি যখন দীঘির পার্শ্বে বসিয়া কএকটী বন্ধুর সহিত মৎস্য ধরিতেছিলেন, সেই সময়ই কামিনী তাঁহার প্রথম নয়নগোচর হয়। সেই দিন হইতেই তিনি কামিনী-মালা গলায় পরেন, এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আজ দুই দিন তাহারই উদ্যোগ চলিতেছিল। আজ সে উদ্যোগের ফল ফলিয়াছে। ব্রাহ্মণও বাড়ীতে নাই; কামিনী একেলা জল আনিতে আসিয়াছেন। সুতরাং সুবিধা বুঝিয়া রাজ-অনুচরগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া অনায়াসে রাজ-ভবনে লইয়া গেল।

দ্বিতীয়-দৃশ্য।

প্রলোভনে।

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত-প্রায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আহারাদি সমাপনান্তে বৈঠকখানা-ঘরে গিয়া তামাকু ফুঁকিতে ফুঁকিতে নিদ্রিত হইলেন। ক্রমান্বয়ে বাড়ীর অপরাপর স্ত্রীলোকগণও আহারাদি সারিয়া, রৌদ্রাধিক্য-হেতু একটু একটু বিশ্রাম জন্য চেষ্টিত হইলেন। কেহ বা ভূমে আঁচল পাতিয়া, কেহ বা মাদুরটা টানিয়া, কেহবা স্ব স্ব শয়ন-ঘরে, কেহ বা এখনই আবার বাসন-কোসন মাজিতে হইবে ভাবিয়া অলক্ষণের দোহাই দিয়া রন্ধন-গৃহেই, একটু একটু গড়াইয়া লইতে গেলেন। ইতিপূর্ব্বে রৌদ্রাধিক্যের দোহাই দিয়া কর্ত্তা মহাশয়ের বড়মেয়েটি কিন্তু সকাল সকালই আহারাদি সারিয়া আপন শয়ন-মন্দিরে গমন করিয়া-

ছেন। ফলতঃ এখনও পর্য্যন্ত তিনিই কেবল তাঁহার ঘরটিতে একেলা। তদ্ভিন্ন অপর সকলে কথাবার্ত্তায় একত্রে আছেন।

কর্ত্তা মহাশয়ের বড় মেয়েটীর নাম চঞ্চলা। ছেলে বেলা হইতেই তাহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া কর্ত্তা মহাশয় সখ করিয়া তাহার ঐ নাম রাখিয়াছেন। খুরসিদপুরের হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত চঞ্চলার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার শ্বশুররাও বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক। অনেক দিন হইতে চঞ্চলা বাপের বাড়ী আসে নাই; সেখানেই সে বেশ এক-রকম মনের সুখে কাল কাটাইতেছিল। অধিক কি, মধ্যে একবার তার পিতা তাহাকে আনিতে যাইলে, সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে আসে নাই। যাইহোক, এবার কিন্তু অনেক চক্রে পড়িয়া তাহাকে আপনা-আপনিই পিত্রালয়ে পত্র দিয়া আসিতে হইয়াছে। কেন আসি-য়াছে, কি উদ্দেশ্য, তাহা এখন আর শুনায় দরকার নাই। সময়ে সে কথা আপনা-আপনিই জানিতে পারিবেন; সুতরাং ব্যগ্র হওয়ার প্রয়োজন নাই।

চঞ্চলা পিতার আদরের মেয়ে। বিশেষ, অনেক দিন পরে শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসি-য়াছে। সুতরাং সে যে সকাল সকাল আহা-রাদি সারিয়া বিশ্রাম করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? চঞ্চলা এতক্ষণেও কিন্তু নিদ্রিত নহে। পান চিবাইতে চিবাইতে শয়ন-ঘরে আসিয়াই, প্রথমে সে আয়নায় মুখ দেখিল, —ঠোঁটদু'টি তার টুকু টুকে হইয়াছে কি না! তারপর চিরুণি খানা একবার লইয়া সিঁথির যে অংশটি নড়িতে-চড়িতে একটু বেঁকিয়াছে, সেইটুকু আস্তে আস্তে ঠিক করিল। তারপর, পরণের কাপড়খানি ছাড়িয়া তাহার সাধের ফরেশডাঙ্গার পাতলা কালাপেড়ে কাপড়খানি পরিল। কাপড় ছাড়িয়া, আস্তে আস্তে পালঙ্কের একপার্শ্বে অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে মাথায় হাত দিয়া বসিল। যেন কার জন্য সে প্রতীক্ষা করিতেছে!

ক্রমে সে ভাবিতে লাগিল,—"সেদিন এক কথায় দু'শো টাকা! আজ আবার আমায় বাউটী-সুটের একসুট গহনা দেবার কথা! বিশেষ, শ্যামা পিসি বলেছে, সে রাজ-সংসার; আমি যখন যা ইচ্ছা করবো, তাই পাবো। আর এরূপ হইলে, এক কথায় আমিই তো সর্ব্বে-সর্ব্বা হব! আমার শ্বশুরেরা একে গরিব, তা'য় আবার স্বামীটাও মূর্খ। আমার সঙ্গেই ভাল করে কথাবার্ত্তা কইতে পারে না! শ্যামা পিসিই দেখে এসেছে, সেদিন নেমন্তনে গিয়ে ভাল করে কথাবার্ত্তা কইতে না পারায়, সকলেই তা'কে ছি ছি করেছে। পিসি যে বলে, তা বড় মিথ্যেও নয় যে সেটাকে নিয়ে ঘরকন্না করার চেয়ে মরণ ভাল! আমি যা লেখা-পড়া জানি, সেটা তাও জানে না। আমি যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সেটা তেমনও নয়! শ্যামা পিসির কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, এমন কু-ষণ্ডের হাতে কি কখনও মানুষ পড়ে! যা'ক, দেখি, শ্যামা পিসির চেষ্টায় যদি এখন কৃতকার্য্য হই! এক কথায় দু'শো টাকা!—আমার শ্বশু-রেরা বাপের জন্মে কখনও দেখেই নাই! আর, এমন দু'শো টাকা কথায় কথায় কত মিলবে! যাইহোক, এখন আমার অদৃষ্ট, আর শ্যামা পিসির হাত-যশ! শ্যামা পিসির পরামর্শে শশুরদেরও তো একরূপ চটিয়ে দিয়েই বাপের বাড়ী এসেছি। এখন, ঈশ্বর কৃপায় সে কৃত-কার্য্য হয়, এই আমার প্রার্থনা। এ দিকে দ'পুর তো হয়েছে! কিন্তু শ্যামা পিসি এলো কই?"

শ্যামা পিসি একজন বৈষ্ণবের মেয়ে বলিয়া পরিচিত। সে ভিক্ষা করিতে করিতে সকল দেশই ভ্রমণ করিয়া থাকে। সকলের বাড়ীর বৌ-ঝির সঙ্গেই তা'র বেস আলাপ। সে যে সুধু ভিক্ষা করে, তা'ও নয়। ভিক্ষায় বাহির

হইয়া সময়ে সময়ে ঘুনসি, ফিতে ও হরিনামের মালা প্রভৃতিও সে বিক্রয় করিয়া থাকে। আরও, একটি বিশেষ কাজের জন্য সে লোকের বৌ-ঝির নিকট বিশেষ পরিচিত। স্ত্রীলোকদিগের অনেক গহনাপত্র সে গাঁথাইয়া আনিয়া দেয়। আর সে জন্যই, সকলেই তাকে বিশেষরূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত সে অনে-কের গহনা গাঁথাইতে এবং সময়ে সময়ে রঙ করাইতে ও সারাইতে লইয়া গিয়াছে; কিন্তু কখনই কেহ তাহার দ্বারা প্রতারিত হন নাই। সুতরাং সকল মেয়ে-মহলেই তা'র বেশ নাম-ডাক।

শ্যামা পিসি চঞ্চলার শ্বশুর-বাড়িতেও ঐ উছিলায় মধ্যে মধ্যে যাইত; এবং চঞ্চলার বাপের বাড়ীতেও তার যে পোটপাট ছিল না, এমন নহে। ইতিপূর্ব্বে চঞ্চলার সহিত মধ্যে-মাঝেই তাহার সাক্ষাৎ হইত। চঞ্চলা বাড়ী আসাতে কয় দিন পূর্ব্বে সে এখানে আসিয়াও একবার চঞ্চলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে। আজ আবার তার আসিবার দিন। বাড়ীর সকলে জানিয়াছেন, শ্যামা পিসি আসিয়া আজ চঞ্চলার এক ছড়া মুরকি-মাদুলী ও কণ্ঠহার গাঁথিয়া দিয়া যাইবে; শীঘ্র দরকার, সেই জন্য সে চঞ্চলার ঘরে বসিয়াই, কাজ করিয়া দিয়া যাবে।

চঞ্চলাও শ্যামা পিসির জন্য একরূপ ব্যগ্র হইয়াছে। বাড়ীতে কাহারও পদশব্দ হইলেই, অমনি ঘরের দরজাটি খুলিয়া দেখিতেছে, শ্যামা পিসি আসিতেছে কি না! দেখিতে দেখিতে ক্রমে সেই সু-বেশ, সু-ঠাম, সু-নিতম্ব, সু-নাসিকা (আর কত সু-বিশেষণ বলিব!) শ্যামা পিসি আসিয়া দেখা দিলেন। আহা! কিবে তাঁহার রূপ! কিবে তাঁহার হাবভাব! গলায় কণ্ঠী, নাসায় তিলক!—মরি অপরূপ-রূপ মাধুরী! বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তিনি কোমল-কণ্ঠে গাহিলেন,—"জয় শ্রীরাধে!"

শ্যামার স্বর শুনিয়াই, বাড়ীর সকলেই যেন ব্যস্ত হইলেন। "শ্যামা পিসি আসিয়াছে —শ্যামা পিসি আসিয়াছে" সকলের মুখেই তখন এই কথা উঠিল। চঞ্চলার ঘরে যাইবার পূর্ব্বেই, বাড়ীর অপর সকল স্ত্রীলোকেই শ্যামাকে দালানে বসাইলেন। দালানে বসা-ইয়া, এ কথা সে কথার পর, সকলে শ্যামা পিসিকে একটী গান করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্যামা পিসি প্রথমে "আজ নয়—আর এক দিন হইবে ইত্যাকার ওজর আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাহইলেই বা তাঁহাকে সকলে ছাড়ে কেন? সুতরাং শেষে যেন অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি ধরিলেন*,—

"আ[illegible]কুলও [illegible]প রূপ দেখিছি রূপ সাগরের পারে;
ঐ ভু[illegible]হন রূপে পাগল করেছে আমারে।
আ[illegible] মানে না, আমার প্রাণ মানে না;
[illegible] আর যাব না, আর যাব না,
[illegible] যাব না ঘরে।
আমি কাঙ্গাল-বেশে, ঘুরে দেশে দেশে;
আমি প্রেম-নগরে এসে পেয়েছি তাঁহারে।
কেঁদে পথিক বলে, ভেসে নয়ন জলে;
আমি প্রাণারামে রাখব ভরে প্রাণের মাঝারে।"

নিত্য-প্রয়োজনীয় বিষয়।

টোটকা-টুটকি, মুষ্টিযোগ প্রভৃতি নাম দিয়া 'অনুসন্ধানে' মধ্যে মধ্যে অনেক আবশ্য-কীয় বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর, সে সকল বিষয়ে পাঠকগণেরও বড়ই আগ্রহ দেখা যায়। তজ্জন্য, এবারও কএকটী জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হইয়া নিম্নে প্রকটিত হইল। ভরসা, এগুলি সকলেরই প্রয়োজনে লাগিবে।

প্রথম প্রকার—টোট্কা-টুট্কি।

প্লীহা-যকৃত।—উষ্ট্রের মূত্র এক ছটাক পরি-মাণে সাত দিন প্রাতে এবং এক ছটাক শীতল জলে ২০ বিন্দু আকন্দ গাছের দুগ্ধ, সন্ধ্যায়

* বাউলের সুর—খেমটা।

খাইবে। প্রবল মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, শাক ও অম্বল না খাইলে ভাল হয়।

রাত্রান্ধতা (রাতকাণা)।—স্তন্য দুগ্ধে হরিতকী ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে ৫ দিন রাত্রে অঞ্জন দিবে; এবং পানের রসের সহিত কোমল বটপত্র বাটিয়া চক্ষুর চারি পার্শ্বে ৫ দিন প্রাতে প্রলেপ দিবে। ইহাতে ঐ পীড়া নিশ্চয়ই আরোগ্য-লাভ করিবে।

মাথা-ধরা।—ঘোলা গাছের মূল বাটিয়া মাথায় দুই পর্শ্বে লাগাইয়া দিবে; বাটিবার সময় জল মিশাইওনা। এই মূল বরফের ন্যায়, ইহা এক প্রকার লতা—শতমূলী ... ায় আকার।

হিক্কা।—ময়ূরের পুচ্ছ ভস্ম ক... লায় দিলে অথবা নারিকেলের জলে মুড়ি ... ইয়া ঐ জল খাইলে হিক্কা তদ্দণ্ডে প্রশমিত ...

ছুলি।—ছুলি হইলে আশ্‌-শ্যাওড়ার ... জল দ্বারা চন্দনের সহিত বাটিয়া ৭ ... প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

অর্শ।—গাঁদা ফুলের গাছের পাতা উত্তমরূপে ভাজিয়া অন্ততঃ তিন সপ্তাহ প্রাতঃকালে খাইতে হইবে। পরিমাণ এক তোলার ন্যূন না হয়। মলত্যাগ করিবার পক্ষে উষ্ণ জলে শৌচ করা অবশ্যক। অধিক দিনের অর্শ হইলে উক্ত পাতা কাঁচা অবস্থায় বাটিয়া তিন সপ্তাহ যথাস্থানে প্রলেপ দিবে।

বৃশ্চিক দংশন।—বিছায় কামড়াইলে বড় যাতনা হয়; এবং কখনও দুই দিন পর্য্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা থাকে। বৃশ্চিক দংশন করিয়াছে জানিতে পারিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুনে (ক্ষুদ্রনুনীয়া) নামক তৃণ দষ্ট স্থানে ঘসিয়া দিলে যন্ত্রণা তন্মুহূর্ত্তে লোপ পায়।

দ্বিতীয় প্রকার—সখের জিনিস।

Milk Powder—আমরা ২য় বর্ষের নবম সংখ্যক অনুসন্ধানের সংবাদ-স্তম্ভে বলিয়াছি যে, বিলাত হইতে এক প্রকার জমাট দুগ্ধ আসে, তাহা জলে গুলিলে উত্তম দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। অদ্য আমরা পাঠকবর্গকে উক্ত দুগ্ধ প্রস্তুত করণের উপায় উপহার দিতেছি। একখানি পরিস্কার কলাই-করা কটাহে এক সের খাটী দুধ মৃদু জ্বালে জ্বাল দিবে। দুধ যেন কড়ার গায়ে না লাগে; কারণ, ধরিয়া গিয়া দুর্গন্ধ হইবার সম্ভাবনা। যখন ক্ষীর হইয়া আসিবে, সেই সময়ে একখানি খুন্তী দ্বারা উহা কড়ার গায়ে লাগাইয়া দিবে। তৎপূর্ব্বে অর্দ্ধ-পোয়া পেস্তা উত্তমরূপে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ক্ষীর প্রস্তুত হইলে, ঐ পেস্তা-চূর্ণ তাহাতে উত্তমরূপে মিশাইয়া. বায়ু-বন্ধ (Air-tight) করিয়া, একটি বোতলের মধ্যে পুরিয়া রাখিবে। যখন আবশ্যক হইবে, ইহা জলে গুলিয়া জ্বাল দিলে উত্তম দুগ্ধ প্রস্তুত হইবে। যাঁহারা সর্ব্বদা যানাদিতে শিশু-সন্তানাদি লইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

চুলের কলপ।—লেদার্জ (Letharge) এক ছটাক, সোডা-কার্ব্ব (Soda-carb) ২ ছটাক, খড়ি (Chalk) দুই ভাগ একত্রে মিশ্রিত কর। ব্যবহার কালে গরম জলে গুলিয়া ছোট ব্রুস দ্বারা চুলে লাগাইয়া দুই ঘণ্টা কাল রাখিয়া ধুইয়া ফেলিলে, চুল অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ইহা প্রায় এক সপ্তাহ থাকে। সৌখিন বৃদ্ধেরা অল্প খরচে একবার এই কলপ ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

কল ব্যতীত সহজে লেমনেড প্রস্তুত।—চিনি অথবা মিছরি আড়াই ভরি, এসেন্স অব্‌ লেমন (Essence of lemon) তিন ফোটা, বাই-কার্ব অব্‌ পটাশ (Bi-carb of Potash) সওয়া দুই আনা ওজন। এই সমস্ত একটী সোডা ওয়াটারের বোতলে পুরিয়া সেই বোতল পরিষ্কার জলের দ্বারা পূর্ণ কর। জল গলা পর্য্যন্ত দিবে। এ সময়ে ঐ বোতলোপযোগী একটি ছিপি ঠিক করিয়া রাখিবে। তৎপরে সাইট্রিক এসিডের (Citric acid) চারি আনা

ওজন উহাতে দিবে। দিয়াই, ছিপি দ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিবে; এবং লৌহের তার অথবা শক্ত দড়ি দ্বারা ছিপিটিকে বোতলের গলায় বাঁধিয়া দিয়া বোতলের মুখ নীচু করিয়া শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। এই নিয়মে প্রস্তুত লেমনেড সুধু পিপাসা নিবারণ করে, এমন নহে; অজীর্ণ, বমন, উদাময় প্রভৃতি রোগেও উপকার করে।

ছার-পোকা মারিবার উপায়।—ক্লোরাইড অব্‌ জিঙ্ক (Chloride of zinc) অথবা ক্লোরাইড অব্‌ লাইম (Chloride of lime) জলে গুলিয়া পাখীর পালক দ্বারা খাট প্রভৃতিতে উহাদের বাসস্থানে লাগাইয়া দিলে সমস্ত মরিয়া যাইবে। প্রথমোক্ত দ্রব্যে কোন প্রকার গন্ধ নাই; এ জন্য ব্যবহার করা ভাল। কিন্তু উভয় দ্রব্যই সাবধানে রাখিবে। কারণ, উভয়ই বিষ।

পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি।

এক চিল মৎস্য মুখে করিয়া যাইতেছে; পশ্চাতে শত শত কাক চিল আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতেছে। সে যে দিকে যায়, শত শত কাক চীৎকার করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে ধাবিত হয়। অবশেষে, সে বিরক্ত হইয়া সেই মৎস্য ফেলিয়া দিল। অপর একটি চিল আসিয়া তাহা গ্রহণ করিল এবং সমুদয় কাক-চিল তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। প্রথম চিলটি নিরাপদে এক বৃক্ষে বসিয়া রহিল। অবধৌত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—"বুঝিলাম, এ সংসারে লঘুভার হইতে পারিলেই শান্তি, নতুবা বিপদ।"

প্রশ্ন হইল, সংসার ও ঈশ্বর, উভয় কার্য্য একত্র কিরূপে সম্ভবে? বলিলেন, একটি স্ত্রীলোক এক হস্তে ঢেঁকীতে চিড়া দিতেছে, অপর হস্তে সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া দুগ্ধপান করাইতেছে মুখেও হয় তো পথের কোন লোকের সঙ্গে চিড়ার হিসাব করিতেছে। এইরূপে সে অনেক কায করিতেছে বটে; কিন্তু তাহার মনের দৃষ্টি, যেন হস্তে ঢেঁকিটি পড়িয়া না যায়! সংসারে থাকিয়া সকল কার্য্য কর; কিন্তু দৃষ্টি রাখিও, যেন তাঁহার পথ হইতে দূরে না পড়িয়া যাও।

মনের একাগ্রতা আনয়ন করিবার জন্য, ধ্যান করিবার পুর্ব্বে হাততালি সহকারে কিয়ৎকাল "হরিবোল" "হরিবোল" বলিবে। বৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া হাততালি দিলে যেমন বৃক্ষস্থিত পক্ষী সকল উড়িয়া যায়, তেমনি তোমার মনরূপ বৃক্ষস্থিত চিন্তারূপ পক্ষী সকলও উড়িয়া যাইবে।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

গো-জীবন!—শ্রীযুক্ত মীর মোশারেফ হোসেন-প্রণীত। মীর মেশারেফ হোসেন মহাশয় স্বয়ং মুসলমান হইয়াও, গো-হত্যার প্রতিকার-বিষয়ে যেএই পুস্তক লিখিতে সাহসী হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে প্রকৃতই হৃদয়বান বলিতে হয়। তিনি তাঁহাদের শাস্ত্র হইতেও দেখাইয়াছেন যে, গোহত্যা তাঁহাদের শাস্ত্র-সিদ্ধও নহে। আরও, এদেশে গোমাংসের অপকারিতা এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে গোধনের উপকারিতা, গো-দুগ্ধের প্রাণদায়ক গুণ, এ সকল কথাও তিনি এ পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। উপসংহারে শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তিনি এই পুস্তকের দুই সহস্র কাপী বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

ষ্টার-থিয়েটারে "প্রফুল্ল"।

অনেক দিন পরে আবার এক খানি নাটকের মত নাটক ষ্টার-থিয়েটারে অভিনীত হইতে দেখিলাম। 'সরলা' নাটকের অভিনয়ে আমরা যতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, 'প্রফুল্ল' দেখিয়া যেন তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ অনুভূত হইল।

যে নাটকের অভিনয়ে এরূপ আত্মহারা করিতে পারে, তাহার প্রশংসা আর কি করিব?—(ফলতঃ প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় যিনিই দেখিবেন. তিনিই তাহাতে উন্মত্ত হইবেন)। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, ততই যেন আমাদের হৃদয় ফাটিয়া গিয়াছে; অভিনয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা অবিশ্রান্ত কাঁদিয়াছি। যোগেশ, সুরেশ জ্ঞানদা, প্রফুল্ল, যোগেশের মা, যাদব—ইহার যাহাকেই যখন দেখিয়াছি, তখনই হৃদয় শোক ক্রোধ প্রভৃতিতে উদ্বেলিত হইয়াছে। নরপিশাচ রমেশ, রাক্ষস-রাক্ষসী কাঙ্গালী ও জগমণি, আহা, এত ভয়ঙ্কর জীবও লোকালয়ে জন্মে! এইরূপ যেটিকে দেখিয়াছি, সেটিরই লক্ষ্য যেন মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ(এইরূপ হৃদয়-ঘাতী অভিনয় যেন এই নূতন দেখিলাম। অধিক কি, এ যাবৎ গিরীশ বাবু যত নাটক লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে 'প্রফুল্লই' যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। *)

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

আমরা যাহা বলিয়াছিলাম,

'ধর্ম্ম সুহৃৎ' পত্রিকার শেষ তাহাই গড়াইয়াছে। 'ধর্ম্মসুহৃৎ' বন্ধ করিয়া, তাহার অধিকারী মহাশয় এখন ডুব দিয়াছেন। তবে তাঁহাদের—

সিদ্ধ-কবচের বিজ্ঞাপন

এখনও অন্তর্হত হইল না, এই ক্ষোভ। সম্প্রতি 'শান্তি' কাগজে পূর্ব্বেকার নাম ও ঠিকানা বদলাইয়া (সম্ভবতঃ সে নাম ও ঠিকানায় সম্পূর্ণ অপযশ হওয়ায়) আবারও 'সিদ্ধ-কবচের' এক জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। বিজ্ঞাপনে আছে, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ব্রহ্মচারী নামীয় কোন মহাত্মা যেন সিদ্ধ-কবচের, আবিষ্কারক; এবং নিজে তিনি তীর্থাদি পর্য্যটন-মানসে স্থানান্তরে যাওয়ায়, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, ১৩ নং মুন্সি দিদার বক্সের লেন, তালতলা, কলিকাতা' ঠিকানাস্থ কোন ব্যক্তির উপর উহা বিক্রয়ের ভার দিয়া গেলেন! অর্থাৎ পূর্ব্বে হৃষীকেশ দত্ত বা কেয়ার অব্ কৈলাশচন্দ্র দে জমীদার এই নামে বংশী সাহার বাগান, বেলেঘাটা, হইতে উহা যে বিক্রয় হইত, এখন আর [illegible] ইয়া উক্ত ঠিকানা হইতে বিক্রয় [illegible] দিবে। পাঠকগণ পরিচয় শুনিলে আশ্চর্য্য [illegible] ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র কে? অর্থাৎ প্রথ[illegible] হৃষীকেশের পেটোয়াভাবে 'ধর্ম্মসুহৃদের [illegible]ানেজার ছিলেন। আরও, গত তিন বা আড়া[illegible]ৎসর পূর্ব্বে ইনিই টি, এন, মিত্র সাজিয়া [illegible]নিজেকে 'রিপণ লাইব্রেরীর' ম্যানেজার বলিয়া পরিচয় দিয়া, "হেমকুমার গ্রন্থাবলীর" বিজ্ঞাপন দেন; ও তজ্জন্য যাঁহারা মূল্য দেন, তাহা [illegible]আত্মসাৎ করিয়া কিছুদিন গা-ঢাকা থাকেন। [illegible]াইহোক, এখন আবার ইহাঁর প্রকাশে [illegible] শঙ্কিত হইলাম। আরও, যে 'সিদ্ধ[illegible]চের' বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া হৃষীকেশ ম্যাজি[illegible]ব্যর নিকট তাড়া খাইলেন, আবারও কোন্ [illegible] সাহসে তিনি ইহার বিজ্ঞাপন দিতেছেন!

বাবু যোগীন্দ্রনাথ দাস.

৩৯ নং মণ্ডল ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে আজকাল 'শান্তি'-পত্রে এক বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছেন যে, অলঙ্কার ও তৎসহ

নগদ পাঁচশত টাকা উপহার!

অর্থাৎ তিনি বলেন, ৪৲ চারি টাকা করিয়া দিয়া তাঁহার বিজ্ঞাপিত নাকছাবি ও বোতামের যিনি গ্রাহক হইবেন. তাঁহাদের জন্য "এক একটি নম্বর ঠিক করিয়া গালা দিয়া সিল করিয়া রাখা হইয়াছে। উক্ত নম্বর নিম্নের এই কয়টি অঙ্কে গঠিত, যথা,—৫, ৭, ৯, ও ২। উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্ক হইতে অনেকগুলি নম্বর হইতে পারে; কিন্তু যিনি ঐ পাঁচটি অঙ্কের বিভিন্ন সমাবেশ করিয়া ঠিক যে নম্বরটি রাখা

হইয়াছে, সেই নম্বরটী বলিতে পারিবেন, তাঁহাকেই উপহার দেওয়া যাইবে।" এ বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া স্বতঃই মনে লয় যে, ইহা লটারির রূপান্তর মাত্র। প্রকাশ্য লটারী বলিলে আইনে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাই বুঝি যোগীন বাবু রকম বদলাইয়াছেন! যাহিহোক, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে, একখানি কাগজ বাহির করিব বলিয়া যোগীন বাবু এইরূপ এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন; এবং সেবার হইতে কৃতকার্য্য না হওয়া প্রভৃতিতে, ও 'এস. এন, কোভ-কোম্পানী' প্রভৃতি কার্য্যে বাজারে ইহাঁর অপযশ আছে। সুতরাং আবারও তিনি এইরূপ লোভানি দিতেছেন. এই দুঃখের বিষয়। প্রকৃত জিনিস [illegible] হইলে এসব লোভানিতে দরকার কি [illegible]লোকে কি গ্রাহক সংগ্রহের এসব ফন্দি বুঝিতে পারেনই না!

সৎ ও অসৎ গ্রাহক।

সকল কাগজের প্রতিই গ্রাহকগণের দৌরাত্ম্য আছে। তবে কাহারও প্রতি কম; কাহারও প্রতি বা বেশী। আর, সেই দৌরাত্ম্যে অনুসন্ধানকেও যে ভুগিতে হয় না, এমত নহে। তবে সৌভাগ্যক্রমে অনুসন্ধানের সে ভোগান্তি কিছু কম। কারণ, দেশের সদাশয় ও সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ব্যক্তিগণই অনুসন্ধানের অধিকাংশ গ্রাহক। সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দৌরাত্ম্যের পরিবর্ত্তে, আমার অধিকাংশ স্থলেই, উপকৃত হই। মূল্য চাহিবার পূর্ব্বেই অনুসন্ধানের অনেক গ্রাহক স্ব স্ব মূল্য চুকাইয়া দেন; কেহ কেহ বা নিঃস্বার্থভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনুসন্ধানের জন্য গ্রাহক ও সাহায্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন। বলা বাহুল্য, আমরা তাঁহাদের সে গুণগরিমা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না—চিরদিনই আমাদের অন্তরে সেই সকল উপকারী মহাত্মাগণের নাম অঙ্কিত থাকিবে। অনুসন্ধানের উপকার-কল্পে যিনিই আমাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন, তাঁহাকেই আমাদিগের পালকস্বরূপ জ্ঞান করিব।

তবে দুরন্ত গ্রাহকগণও (অন্ততঃ মনে মনে যাঁহাদের এই কু-অভিসন্ধি আছে যে, আমাদিগকে ঠকাইবেন) অন্যপক্ষে এইরূপ আমাদের ঘৃণার পাত্র। কাগজ দিয়া মূল্য চাহিলে তাহা বন্ধ করিতে বলা (প্রাপ্য চুকাইয়া না দিয়াও), আজকাল করিয়া শেষে কিছুই উত্তর না দেওয়া প্রভৃতি গ্রাহকদিগের কতকগুলি রোগ আছে। আমরা দেখিয়াছি, শুধু আমাদের কেন, সে সকল গ্রাহক দেশের অনেক সম্পাদকগণকেই ঠকাইয়া থাকেন। যাইহোক, এরূপ সকল গ্রাহকদিগের জন্য (অন্ততঃ মূল্যের টাকা দিতে গরিমশি করায় যাঁহাদের প্রতি আমাদের সন্দেহ হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য) আরও একপক্ষ কাল আমরা অপেক্ষা করিয়া দেখিব; যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য প্রকৃতই সৎ হয়, তবে তাহার মধ্যে তাঁহারা স্ব স্ব দেয় মূল্য চুকাইয়া দিবেন। নতুবা বাধ্য হইয়া আমরা তাঁহাদের নাম ধাম ও প্রতারণার বিষয় সকলকে জানাইয়া দিব। এবং সে বিবরণ তাঁহাদের দেশেও যাহাতে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়েও চেষ্টিত হইব।

সংবাদ।

—বিগত ৩রা বৈশাখ বৈকালে উত্তর-বঙ্গ-রেলওয়ে একটি ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বেলা ৫।০ সওয়া পাঁচটার সময় একখানি ট্রেণ মাধানগরের নিকট একটি সেতুপার হইতেছিল। ঐ ট্রেণে মাল ও যাত্রী লইয়া সর্ব্ব সমেত ৩০ খানি গাড়ি ছিল। এই সময়ে প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছিল। ঝড়ের বেগে ট্রেণ খানি উলটাইয়া একবারে নদী-গর্ভে পতিত হয়। ১২খানি গাড়ীতে যাত্রী ছিল; তন্মধ্যে ১০ খানি গাড়ী জলে পড়ে। নদীতে জল অধিক ছিল না বটে, কিন্তু অত্যন্ত পাঁক ছিল। পতিত গাড়ীগুলি পাকে বসিয়া যায়; কত লোক যে হত ও আহত হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় সংবাদ পাওয়া যায় নাই। খাঁড়া-হাসপাতালে কয়েকজন

---

* এবার স্থানাভাব। সময়ান্তরে বিস্তারিত বিবরণ ও দোষ-গুণ [illegible] তন্ন তন্ন করিয়া প্রকাশের বাসনা রহিল।

আহত রোগী চিকিৎসার্থ আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মরিয়াছে; আর কতকগুলিরও জীবন সংশয়।

—কলিকাতায় সরিসার তৈলে বড়ই ভেজাল চলিতেছে। শুনা যায়, তাহাতে নাকি শোর-গুঁজোর তৈল মিশ্রিত করে। গুঁজোর তৈলে মূত্রাধারের পীড়া জন্মে। বোধ হয়, সেই জন্য বহুমূত্ররোগের এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মিউনিসিপালটির এসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

—কানপুরে দুইটী বালক আছে, ইহারা ব্যাঘ্রীপোষিত। চারি হাত-পায়ের সাহায্যে গমনাগমন করে- এবং কথাও কহিতে পারে না। পাদ্রী সাহেবেরা ইহাদিগকে জঙ্গল হইতে পাইয়াছিল।

—এক ব্রাহ্মণকন্যা ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করে; ও তাহার শবদাহ করিবার জন্য কলিকাতার দক্ষিণস্থ সা-পুরের শশ্মানে নীত হয়। ঘাটের চিত্রগুপ্ত মহাশয়ও মৃত-দেহ দেখিয়া পোড়াইবার হুকুম দেন। সব যখন ঠিকঠাক, তখন বিধবা কিন্তু মৃতু শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল। সকলে তো অবাক! শুনা যায়, হঠাৎ মুচ্ছাতেই তাহার এরূপ ঘটিয়াছিল।

—চোরবাগানের 'ইউরেকো-মেডিক্যাল-হলের সত্বাধিকরীগণ এই এক নূতনতর উপায়ে গরীব-দুঃখীগণের উপকারে সঙ্কল্প করিয়াছেন। অর্থাৎ গরীব-দুঃখীদিগের চিকিৎসার জন্য 'বিনা ভিজিটে তাঁহারা ডাক্তার দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কেবলমাত্র গাড়ী ভাড়াটী দিলে এবং ন্যায্য বাজার-দরে তাঁহাদের নিকট হইতে ঔষধ কিনিলে, একজন ডাক্তার তাঁহাদের ঔষধালয় হইতে অমনি গিয়া রোগী দেখিয়া ব্যবস্থা দিবেন। বিশেষ, ডাক্তার মহাশয়ও আবার বিচক্ষণ ও সুদক্ষ। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভাগলপুরের রাজ-চিকিৎসক ছিলেন; এবং শুনিলাম, তথায়ও তাঁহার বিশেষ নাম-ডাক ছিল। আরও, তিনি একজন মেডিক্যাল-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ—এম্ বি। সুতরাং ইউরেকো-হলের কর্ত্তৃপক্ষগণের এরূপ বন্দোবস্ত স্থায়ী হইলে ও সুপরিচর্য্যায় চলিলে, ইহাতে যে অনেকেরই উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কেবল গরিব-দুঃখী কেন, অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকও তাঁহাদের নিকট এরূপে উপকৃত হইতে যত্নপর হইবেন।

—সেদিন বার্লিন সহরে কোন সভা হইতে তথাকার সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পুরুষকে একটী পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। কয়েকজন সুন্দরী সৌন্দর্য্য বিচার করিবার ভার পাইয়াছিলেন। আবার বিয়েনা সহরের নিকটস্থ আর একটী নগরে এই এক অদ্ভুত পুরস্কারের প্রস্তাব হইতেছে। সেখানে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পুরুষ পারিতোষিক পাইবেন না। সেখানকার চারিটী পারিতোষিকের মধ্যে প্রথম পারিতোষিক সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পুরুষ পাইবেন; যাঁহার গোঁপ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক তিনি দ্বিতীয় পুরস্কার পাইবেন; সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নাসিকা-বিশিষ্ট পুরুষ তৃতীয় পুরস্কার পাইবেন; এবং যাঁহার মাথায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় টাক, তিনি চতুর্থ পারিতোষিক পাইবেন; স্থির হইয়াছে।

—সেণ্ট-পিটার্স বর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা-শিক্ষার বিভাগ হইতে প্রস্তাব হইয়াছে যে, তথায় হিন্দুস্থানি, জাপানি ও কোরিয়ার প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার এক একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়া উচিত।

—সম্প্রতি এলাবামা নামক স্থানে জেমস্ মার্টিন তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত একত্রে মার্টিন-বংশীয় প্রাচীন-বাটিতে বাস করিতেছিলেন। বিবি মার্টিন প্রথমে দুই এক দিন রাত্রিতে পার্শ্বের ঘরে ভূতের পদধ্বনি শুনিতে পান; স্বামীকে সেকথা বলাও, তিনি ইন্দুরের শব্দ বলিয়া উড়াইয়া দেন। পরে নাকি মার্টিন-পত্নী ভূত দেখিয়াছিলেন। মার্টিন সাহেবকে তাহাতে গৃহত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। সাহেব তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কাজেই মার্টিনপত্নী পতিত্যাগ করিয়া পিতৃ-ভবনে পলায়ন করেন। এক্ষণে তিনি দাম্পত্য-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের উপদেশ, পতিব্রতা মার্টিন-পত্নী এবার যেন যাহার বাটীতে ভূতের ভয় নাই এমন লোককে পতিত্বে মনোনীত করেন!

—চট্টগ্রামের রকিম নামক একজন মুসললান তের বৎসর যাবৎ মক্কাবাসী। দেশে তা'র পরিবার ও জননী। মক্কার যাইয়া অল্পদিন মধ্যেই ফকির-বেশী একজন মুসলমানের সহিত তাহার বড়ই বন্ধুত্ব জন্মে; সে মন খুলিয়া ফকিরকে আপনার সকল পরিচয়ই প্রদান করে। সেই পরিচয় পাইয়া, ফকির কিন্তু তলে তলে চট্টগ্রামে আসিয়া আপনাকে রকিম বলিয়া পরিচয় দিয়া, এযাবৎ ঘরকন্না করিতেছিল। চেহারার কিছু ব্যত্যয় ঘটিলেও ১৩ বৎসর গৃহ-ছাড়া প্রভৃতি-হেতু রকিমের স্ত্রী ও জননী প্রভৃতিও তাহাতে তত সন্দিহান হয় নাই। কিন্তু এখন এ কি দুর্দ্দৈব! এখন স্বয়ং রকিম আসিয়া বাড়ীতে উপস্থিত! কাজেই প্রবঞ্চক পুলিসের হস্তে পড়িয়াছে।

—বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী যুবক সম্প্রতি বেলুনারোহণে বড়ই সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

অনুসন্ধান।

—————:০(০)০:—————

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩১এ বৈশাখ, ১২৯৬ সাল। [১৯শ সংখ্যা।

প্রকৃতির লীলা।

মালকোষ—আড়াঠেকা।

বিফল জনম, বিফল জীবন,
জীবনের জীবন না হেরে।

সুখে ডালে বসে ডাকিছ পাখী রে!
ডাকিছ কি সেই দয়াল হরিরে?
কি বলে ডাকিস বলে দে আমারে,
ডেকে দেখি, যদি পাইরে।

গুঞ্জরি ভ্রমর করি গুণ গুণ
গাইছ কি সেই গুণাকর-গুণ
শিখাও আমারে আমিরে নিগুণ
কি গানে ভুলালে তাঁরে।

কেন কুল কুল হাসিছ সকলে,
পেয়েছ কি সেই পরম দয়ালে!
পায়ে ধরি, বল, কেমনে পাইলে,
কি ধনে তুষিলে তাঁরে!

কৈলাশ-সুমেরু ওহে বিন্ধ্যাচল,
গ্রীবা উচ্চ করি কি হেরিছ বল!
করেছ কি হেরে জনম সফল
বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে।

সুনীল গগন নীল আবরণে
আবরি রেখেছ বুঝি প্রাণধনে;
খোল আবরণ, বারেক নয়নে
হেরে, মন-প্রাণ জুড়াই রে।

জুয়াচোরের বাহাদুরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কালনা বর্দ্ধমান-জেলার ভিতর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। তরণী-যোগে ভাগীরথী বাহিয়া শান্তিপুর হইতে কাটোয়া-অভিমুখে যিনি কখনও গমন করিয়াছেন, অন্ততঃ এক দিবসের নিমিত্তও তাঁহাকে কালনায় থাকিতে হইয়াছে। কালনায় দেব-মন্দির প্রভৃতি দর্শন না করিয়া কাটোয়া-অভিমুখে গমন করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য এ-দেশে অতি বিরল।

এই প্রসিদ্ধ কালনার নিকটবর্ত্তী একটি ছোট পল্লীতে রজনীকান্ত গুহের বাসস্থান। রজনীকান্ত অতি শৈশব কাল হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া, তাহার মাতামহের যত্নে ও ব্যয়ে যেমন হউক এক প্রকার লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা

বলিতেছি, তখন এদেশে বি এ, এম এ, কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানিত না। সুতরাং রজনীকান্ত বি এ, এম এ, পাস করেন নাই। তবে সে কালের জুনিয়ার পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার মাতামহের পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় তাঁহার সঙ্কল্প পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-কর্ম্মের যোগাড় দেখিতে হয়।

রজনীকান্ত অতিশয় 'কপালে' পুরুষ ছিলেন। তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাতেই তাঁহার যশ ও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন হইত। রজনীকান্ত ব্যবসার-কার্য্য ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে এক দিবসের নিমিত্তও বসিয়া থাকিতে হইত না; কোন না কোন আপিসে তিনি নিযুক্তই থাকিতেন। এইরূপে তিনি উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার মৃত্যুকালে ঘর, বাড়ি, তৈজস-পত্র, ও ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি ব্যতীত, ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ রাখিয়া যান। তিনি এই সমস্ত কাগজই তাঁহার স্ত্রী সুন্দরীর নামে খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুন্দরী ইহার বিন্দু-বিসর্গও অবগত ছিলেন না। রজনীকান্তের অন্তিম কালে তাঁহার আর কেহই ছিল না; তখন, কেবল তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী ও একটী মাত্র ৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র গোপাল।

রজনীকান্তের বয়ঃক্রম যখন ৫০ বৎসর, সেই সময় তাঁহার অতিশয় পীড়া হয়। আর, সেই পীড়াই তাঁহার জীবনের শেষ পীড়া জানিতে পারিয়া এক দিবস তিনি তাঁহার প্রাণের একমাত্র বন্ধু গোলকচন্দ্র গুপ্তকে ডাকাইলেন; ও সকলের অসাক্ষাতে গোলকচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"গোলক, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এই পীড়াই আমার শেষ পীড়া। এ পীড়া হইতে যে আমি রক্ষা পাইব, আমার সে আশা নাই। আর, আমার মৃত্যুর পর আমার এই নাবালক পুত্র ও বিধবা রমণীর প্রতি দৃষ্টি রাখে, তুমি ভিন্ন এখানে আর এমন আমার কেহই নাই। আমার যাহা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাহা সমস্তই তুমি অবগত আছ। আমার স্ত্রীর হাতেও নগত দুই হাজার টাকা আছে। তোমার সাহায্য পাইলে ঐ টাকা ও বিষয়ের লাভ হইতে সে অনায়াসে আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও পুত্রটীকে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার এই সমস্ত বিষয় ব্যতিত, আমি আমার স্ত্রীর নামে আরও ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ করিয়াছি। কিন্তু তাহার বিন্দু-বিসর্গও সে অবগত নহে। আর আমি এখনও তাহাকে ইহার বিষয় সম্যক অবগত করাইতে বাসনা করি না। কারণ, স্ত্রীলোকের হস্তে এত টাকা আছে জানিতে পারিলে, তাহার সুখের ভাগ অপেক্ষা দুঃখের ভাগেরই সম্ভাবনা অধিক। কারণ, একে শত্রুপক্ষীয় লোকের অভাব নাই, তাহাতে স্ত্রীলোকের পেটের ভিতর কোন কথা থাকে না। সুতরাং তুমি এই ত্রিশহাজার টাকার কাগজ লও; গোপাল বড় হইলে উহাকে ইহা প্রদান করিও। তোমাকে আমি যতদূর বিশ্বাস করিতে পারি, আমার নিজের মনকেও বোধ হয়, আমি ততদূর বিশ্বাস করিতে পারি না। এই বলিয়া রজনীকান্ত ঐ তিন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ সেই নির্জ্জন স্থানে ও সকলের অলক্ষিত-ভাবে গোলকের হস্তে প্রদান করিলেন।

গোলক অনেক কষ্টে তাহার চক্ষুজল সম্বরণ করিয়া রজনীকে কত বুঝাইলেন; এবং এখন যে তাঁহার মৃত্যু হইবে না, ইহাও বলিলেন। কিন্তু রজনীকান্ত কোন ক্রমেই সে কথা শুনিলেন না; ও ঐ কাগজগুলি গোলকচন্দ্রের হস্ত হইতে ফেরত লইলেন না। গোলকচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া ও রজনীকান্তকে

আর অধিক বোঝান নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, কাগজগুলি আপনার পকেটে রাখিয়া দিলেন; ও মনে মনে ভাবিলেন, রজনীকান্তের পীড়া আরোগ্য হইলে তাঁহাকে উহা ফিরাইয়া দিবেন।

তখন রজনীকান্ত আপনার স্ত্রীকে ডাকিলেন। সুন্দরী সেই স্থানে আসিলেন। গোলকচন্দ্রের সম্মুখে সুন্দরী বাহির হইতেন; ও তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতেও লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইতেন না।

রজনীকান্ত আপন স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সুন্দরী, তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, যত সেবা-সুশ্রুষা কর না কেন, কিন্তু এযাত্রা আমাকে কোন প্রকারে বাঁচাইতে পারিবে না। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এবার আমার মৃত্যু নিশ্চয়। আমি তোমাকে এখন অধিক কিছু দিয়া যাইতে পারিলাম না। তবে তোমার নিকট যে সামান্য টাকা আছে, তাহা দ্বারাই গোপালকে ভরণ-পোষণ ও লেখা-পড়া শিখাইও। আর, যদি ঐ টাকায় সঙ্কুলান না হয়, তবে গোলকের কাছে যখন যাহা চাহিবে, তখনই তাহাই পাইবে। আমি তোমাদিগের নিমিত্ত তাঁহার নিকট কিছু অর্থ রাখিয়া যাইলাম। গোপাল বড় হইলে সমস্ত পাইবে। কিন্তু কত যে রাখিয়া গেলেম, তাহা এখন তোমাকে বলিলাম না। আবশ্যক হইলে, জানিতে পারিবে; তাহার কিছু না কিছু নিদর্শনও দেখিতে পাইবে। কিন্তু বিশেষ কষ্টে না পড়িলে জানিতে চেষ্টা করিও না। করিলেও জানিতে পারিবে না।" এই কথা বলিতে বলিতে রজনীর কথা বন্ধ হইয়া গেল। সুন্দরী কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে রজনীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। সুন্দরী বিধবা হইলেন। গোলক অতঃপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই কোম্পানীর কাগজ সকল গোলকচন্দ্রের নিকটই রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গোলকচন্দ্র গুপ্তের বাসস্থান ও রজনীকান্ত গুহের বাসস্থান একই গ্রামে। বাল্যকাল হইতেই উভয়ে একত্রে থাকিতেন, একত্রে লেখা পড়া করিতেন, একত্রে কর্ম্মকার্য্যও করিতেন। অনেক দিবস একত্রে থাকিতে থাকিতে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই, রজনীকান্ত তাঁহার স্ত্রীর অপেক্ষাও তাঁহাকে অধিক বিশ্বাস করিলেন। মৃত্যুকালেও সেই বিশ্বাসের নিমিত্ত ঐ ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ পর্য্যন্তও তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। গোলকচন্দ্র এখনও কলিকাতায় কর্ম্ম করেন। হাইকোর্টের ভিতর মোক্তারি করিয়া দিন যাপন করেন; এবং যেমন হউক, নিজেও বেশ দশ টাকার সংস্থান করিয়াছেন।

রজনীকান্ত তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কাগজগুলি গোলকচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্ত যখন স্থির করিয়াছিলেন, তখন একবার ইহাও ভাবিয়াছিলেন,—"কলিকাতায় যেরূপ হইয়া থাকে, যদি তাহাই হয়; প্রাণের অপেক্ষা যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকি, আমার মৃত্যুর পর যদি তিনিই আবার অবিশ্বাসীর কার্য্য করেন; এত টাকা হাতে পাইয়া যদি তাঁহারই অন্য লালসা বলবতী হয়; তাহাহইলে আমার অবর্ত্তমানে আমার স্ত্রীর দশা কি হইবে! আমার এই নাবালক পুত্রটীও যে পথের ভিখারী হইবে!"

এই ভাবিয়া তিনি গোলকচন্দ্রের অজানিত অন্য আর একটী উপায় স্থির করিয়াছিলেন। তাহা এই,—সেই সময় যে কয়েকখানি সংবাদ-পত্র বাহির হইত, ও যে সংবাদপত্র গোলকচন্দ্র পড়িতেন না বা তাহার বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারিতেন না, সেইরূপ একখানি অন্য দেশের সংবাদপত্রে, রজনীকান্ত এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞাপন বাহির করেন যে,—"আমার অমুক অমুক

নম্বরের যে সকল কোম্পানীর কাগজ আছে, তাহা আমি আমার বিশ্বাসী বন্ধু গোলকচন্দ্রের নিকট রাখিয়া দিলাম ; তিনি আমার মৃত্যুর পর সময় মত উহা আমার স্ত্রী সুন্দরী বা আমার পুত্র গোপালকে প্রদান করিবেন।”

এই বিজ্ঞাপনের বিষয় গোলকচন্দ্র কিন্তু কিছুই জ্ঞাত ছিলেন না।

রজনীকান্তের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার বাক্স খোলা হইল, তখন তাহার ভিতর অন্যান্য দ্রব্যের সহিত একখানি সুন্দরীর নামীয় খত পাওয়া গেল। উহার উপরে লেখা আছে,—“এই পত্র সুন্দরী অতি যত্ন করিয়া রাখিবে। কিন্তু বিশেষরূপ অর্থ-কষ্ট না হইলে কোন রূপেই খুলিবে না। ইহাই রজনীকান্তের শেষ অনুরোধ।”

সুন্দরী স্বামীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। অতিশয় যত্নের সহিত সেই পত্র রাখিলেন। উহা খুলিয়া দেখিলেন না যে, উহার ভিতর কি লেখা আছে ; অথবা জানিতেও পারিলেন না যে, পত্রের মর্ম্ম কি ? সুন্দরী জানিতে পারিলেন না বলিয়াই যে পাঠকগণও জানিতে পারিবেন না, তাহা নহে। কারণ, গোলকের উহা জানিতে-বাকি নাই। তিনি নিজ হস্তে উহা খুলিয়া দেখিয়াছিলেন ; ও উহা পড়িয়াছিলেন।

ঐ পত্রের মধ্যে একখানি হাজার টাকার নোট ছিল, ও এক টুকরা কাগজে লেখা ছিল,—“আপাততঃ এই হাজার টাকার দ্বারা তোমার অর্থকষ্ট দূর করিবে। ইহাতে তোমার যত দিন চলিবে, ততদিন আর কোন উপায় অবলম্বন করিও না। যদি পুনরায় অতিশয় কষ্ট হয়, তবে সংগ্রহ করিয়া অমুক তারিখের অমুক সংবাদ পত্র দেখিও ; তাহাহইলেই সমস্ত অবগত হইবে ও তোমাদিগের দুঃখ ঘুচিবে। (পাঠকগণকে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, এই পত্রে সেই সংবাদপত্রের নাম, ঠিকানা ও তারিখের উল্লেখ ছিল)। আর যদি কোনরূপ কষ্ট না হয় এবং গোলকচন্দ্র তোমাদিগের দুঃখ দূর করেন, তাহা হইলে এই সংবাদপত্র দেখিবার আর বিশেষ কিছু আবশ্যক হইবে না। তবে গোপাল বড় হইলে যেন একবার উহা দেখিয়া ভিতরের অবস্থা অবগত হয়।”

গোলকচন্দ্র ঐ কাগজগুলির কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। আপনার বাক্সের ভিতর একটী লেফাফায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

রজনীকান্তের শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে যাহা কিছু আবশ্যক হইল, তাহার সমস্তই সুন্দরী তাঁহার নিকটস্থিত সেই দুই সহস্র মুদ্রা হইতে সম্পন্ন করিলেন। বক্রি যাহা রহিল, তাহার দ্বারা কয়েক বৎসর নিজের ভরণ-পোষণ ও গোপালের লেখা-পড়া প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিলেন। পরিশেষে তাহাদিগের যে [illegible] প্রকার আবশ্যক হইত, তাহা সমস্তই গোলক চন্দ্র নির্ব্বাহ করিতেন ; তাঁহাদিগের কোন প্রকার কষ্টই হইত না। গোলকচন্দ্র তাঁহার পরলোকগত বন্ধুর কথা রক্ষা করিতে ত্রুটী করিলেন না। কাজেই সুন্দরীর কোন প্রকার অর্থের অনাটন হইল না বা তাঁহার সেই স্বর্গীয় স্বামীর পত্রও খুলিবার কোন আবশ্যক হইল না। গোলকচন্দ্রের বাক্সের ভিতর যেরূপ কোম্পানির কাগজগুলি পড়িয়া রহিল, সুন্দরীর বাক্সের ভিতরও সেইরূপ তাঁহার স্বামীর হস্ত লিখিত পত্রও রহিয়া গেল। এইরূপ ক্রমে ক্রমে ১০ বৎসর অতীত হইয়া গেল। গোপালের বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর অতিক্রম করিয়া ১৮ বৎসরে উপনীত হইল। এই বৎসর গোপাল এফ এ পরীক্ষা দিবেন। তিনি রাত্রিদিন মনো সংযোগে পাঠাভ্যাস করিতেই নিযুক্ত রহিলেন!

(ক্রমশঃ)

সত্যানন্দ।

(১)

‘আনন্দ-মঠের’ সন্ন্যাসী সত্যানন্দ মহাকবির একটি অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এরূপ স্বদেশানুরাগী সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মবীর জগতের কোন কাব্য-গ্রন্থে কল্পিত হইয়াছে কি না, জানি না। পরাধীন পরপদদলিত বঙ্গদেশের এ বিরাট কল্পনা, অন্যান্য স্বাধীন স্বদেশভক্ত সম্রাজ্যেরও আদর ও গৌরবের জিনিস। যে বলে বাঙ্গালীর দেশ-ভক্তি নাই, তাহাকে আমরা বঙ্গীয় কবির এই অলৌকিক সৃষ্টি দেখাইয়া সগর্ব্বে বলিতে পারি, অন্ততঃ আমাদিগের দেশে একজনও স্বদেশভক্ত আছেন। সত্যানন্দের ন্যায় স্বদেশভক্ত যিনি সৃজন করিতে সক্ষম, তাঁহার দেশভক্তিতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

‘আনন্দমঠের’ সর্ব্ব প্রথম অধ্যায়েই আমাদিগের সহিত এই সত্যানন্দের সাক্ষাৎ সঙ্ঘটিত হয়। এক গভীর অরণ্য-মধ্যে নিশীথ সময়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে, ভক্তবীর সত্যানন্দ স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন—যেন তপস্বী বিশ্বামিত্র নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-কামনায় ব্রহ্মার উপাসনায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ক্ষণপরে—

“সেই অন্তঃশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধমধ্যে শব্দ হইল,—

“আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?”

সে ধ্বনি সেই অন্ধকারেই মিলাইয়া গেল—কেহ কোন উত্তর করিল না। সলিলখণ্ডে হস্ত-চিহ্নবৎ তাহা সেই অন্ধকাররাশিতে মিশাইয়া গেল। আবার সেই শব্দ হইল—আবার সে ধ্বনি সে নিস্তব্ধতায় নির্ব্বিবাদে পরিণত হইল। আবার সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?’ এবারে কে উত্তর করিল—জিজ্ঞাসা করিল,—‘তোমার পণ কি ?’ সত্যানন্দ বলিলেন,—‘পণ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।’ প্রতিশব্দ হইল,—‘জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।’ সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘আর কি আছে ? আর কি দিব ?’ তখন উত্তর হইল,—‘ভক্তি।’

শস্য-রোপণের পূর্ব্বে যেরূপ কৃষকগণ মৃত্তিকাকে সেই শস্য-বর্দ্ধনের উপযোগী করিয়া লইয়া থাকে—উপন্যাস ও নাটককারগণও সেইরূপ তাঁহাদের গ্রন্থনিহিত রস-বিকাশ-জন্য গ্রন্থারম্ভে পাঠকের মন সেই রস গ্রহণের উপযোগী করিয়া লইয়া থাকেন। ‘হ্যামলেটের’ প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্য মনে কর—কথাটি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে। আমরা এইখানে বঙ্কিম বাবুর এই উপক্রমণিকা পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম, কোন গুরুতর বিষয় লইয়া পুস্তকখানি লিখিত হইবে। আমাদিগের অন্তঃকরণ সেই জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

অন্তরের এই ভাব লইয়া আমরা এই অদ্ভুত সন্ন্যাসী সত্যানন্দের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম। এ সন্ন্যাসীর আবার কি কামনা, জানিতে মন বড়ই কৌতূহলী হইল। ধীরে ধীরে গ্রন্থকারের সহিত কয়েক অধ্যায় উত্তীর্ণ হইলাম। মন আরও ব্যগ্র হইল—শেষে দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে সব জানিতে পারিলাম।

জানিলাম—সত্যানন্দের ব্রত, স্বদেশোদ্ধার। অত্যাচার-পীড়িত মুসলমানদিগের হস্ত হইতে জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য সত্যানন্দ সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু—সত্যানন্দের কিছুই নাই—বা কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। একমাত্র স্বদেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী হইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী হইয়াছেন। দেখিলাম, শুভ্রকায়, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্ত্তি সত্যানন্দ একটী অসহায়—ধন নাই, জন নাই, রাজ্য নাই, সম্পদ নাই, সেই তাঁহার অন্তরের আরাধ্য হইতে আরাধ্যতর মাতৃভূমির জন্য সাগরে বালির বাঁধ বাঁধিতেছেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া মহাপুরুষ ভ্রমে

শরীর কণ্টকিত হইল; কিন্তু তাঁহাকে এ অসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইল। কোথায় —মুসলমান শাসনকর্ত্তা—তাঁহার সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, বলপটু, শিক্ষিত, অস্ত্রধারী সেনানী-মণ্ডলী—কোথায় এই একা, নিরস্ত্র, অসহায় ব্রহ্মচারী! তাঁহার আকৃতিও আমাদিগকে তৎপ্রতি ভক্তি স্থির রাখিতে পারিল না। ভাবিলাম,—সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই উন্মাদগ্রস্ত।

পাগলের কার্য্য দেখিলে সকলেরই মন উৎসুকী হইয়া থাকে। আমরা সেই বর্দ্ধিত উৎসাহের সহিত সত্যানন্দের কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, এক নিবিড় অরণ্য-মধ্যে, অন্যের অগম্য প্রদেশে সত্যানন্দ সন্ন্যাসী হরিণ-চর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য একটি বিরাট ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ইংরাজ-কবি-কল্পিত আর্থরের বীর-সম্প্রদায়ের (Knights of the Round Table) ন্যায়, তাঁহার চতুস্পার্শ্বে এক সম্প্রদায় বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। ইহাদের নাম সন্তান-সম্প্রদায়। ইহারা সকলেই বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ, মায়াত্যাগী ব্রহ্মচারী। ইহাদিগের অন্য ধর্ম্ম নাই, অন্য কর্ম্ম নাই, অন্য প্রভু নাই, অন্য দেবতা নাই—মাতৃভূমিই ইহাদিগের সব। ইহারা সেই মাতৃভূমির মাতৃভক্ত সন্তান। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ ইহাদিগের মহাপ্রভু। ইহারা সকলেই এই মহাপ্রভুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—যে পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, বাড়ী, ঘর কিছুরই সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। এ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত, মৃত্যু। দেখিলাম, এ সন্তানগণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সেই কাননটিকে দুর্জ্জয় দুর্গে পরিণত করিয়াছে; চতুর্দ্দিক হইতে ধনরত্নাদি আনয়ন করিয়া, সেই দুর্গের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছে। দেখিলাম, সন্তানগণ সকলেই পণ্ডিত—সকলেই বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব—সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত। দেখিলাম, ইহারা বিপন্নের বন্ধু, অত্যাচারীর সাক্ষাৎ শমন। ইহাদের সকলই অপূর্ব্ব—ইহাদের দুর্গ অপূর্ব্ব, ইহাদিগের ধর্ম্ম অপূর্ব্ব, ইহাদের নাম অপূর্ব্ব, ইহাদের কার্য্য অপূর্ব্ব, সঙ্গীতও অপূর্ব্ব। 'আনন্দমঠ' ইহাদিগের দুর্গ, সন্তান-ধর্ম্ম ইহাদিগের ধর্ম্ম, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ ইহাদিগের নাম, যুদ্ধ ইহাদিগের কার্য্য, হরে মুরারে মধুকৈটভারে ইহাদিগের সঙ্গীত।

মনে বড়ই কৌতূহল হইল, কিরূপ করিয়া সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর একাকী এতটা কাণ্ড করিতে পারিয়াছে—কিরূপ করিয়া সত্যানন্দ একজন দুইজন করিয়া এতগুলি অনুবর্ত্তী সন্তান সংগ্রহ করিয়াছে। অনুসন্ধানে রহিলাম, ঠাকুর আবার যে দিন নূতন শিষ্য করিবে, সেই দিন সব দেখিয়া লইব। অনুসন্ধান সফল হইল। একদিন দেখিতে পাইলাম, অত্যাচার-প্রপীড়িত দুর্ভিক্ষ-গ্রাসিত পদচিহ্ন গ্রাম হইতে মহেন্দ্রলাল সিংহ নামক একজন ধনবান জমিদার সস্ত্রীক নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে মহেন্দ্র সিংহের পত্নী দুর্ভিক্ষ-প্রণোদিত দস্যু হস্তে পড়িলেন—সত্যানন্দ ঠাকুর তাঁহার উদ্ধার করিলেন। শোকে দুঃখে মহেন্দ্র সিংহ পত্নীর অন্বেষণে বনে গমন করিয়াছিলেন, পথে মুসলমানের সিপাহি তাঁহাকে নিরর্থক কারাবদ্ধ করিল। সন্তান ভবানন্দ তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন। উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাকে 'আনন্দমঠে' প্রভু সত্যানন্দের নিকট আনয়ন করিলেন। পথে ভবানন্দের সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহেন্দ্র এইখানেই সন্তান-সম্প্রদায়ের কিছু পরিচয় পাইলেন—অন্ততঃ তাঁহাদের অপূর্ব্ব মাতৃস্তবের মধুর রস তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল।

এইরূপ অবস্থায় ভবানন্দ মহেন্দ্রকে সত্যানন্দ-সমীপে উপস্থিত করিলেন।

(ক্রমশঃ)

জীবের দায়িত্ব।*

আহা! সর্ব্বশক্তিমানের এমনিই মহিমা যে, পাছে শক্তি-বৈষম্য-হেতু জীব উৎপন্ন হইয়া এই ধস্তাধস্তির মধ্যে পড়িয়া অভিভূত হইয়া পড়ে, অথচ বৈষম্যের বেগ না থাকিলে সৃষ্টি থাকিবে না, এই জন্য সেই প্রত্যেক দেহেই আবার সাম্যের সমস্ত উপায় বিদ্যমান রাখিয়া, সৃষ্টির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। জীব যতই ভাবুক না যে, সে দণ্ডিত অথবা পুরস্কৃত হইতেছে; কিন্তু ফলে তাহার কিছুই নহে। শক্তিবৈষম্যেই নানা ভাব ও ভঙ্গি দেখাইতেছে। তজ্জন্যই তাহার দেহের পার্থক্য; তাহাতেই তাহার মনের গতি বিভিন্ন; তাহাতেই তাহার তেজ ও চিত্তবৃত্তির বেগের পরিমাণও স্বতন্ত্র।

জীব তবে কেন সুখদুঃখের ভাগী হয়? যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের কথার মর্ম্ম চিন্তা করিলে এই মাত্র জানা যায় যে, ঐ জগতে সুখ-দুঃখের উপায় কেন পৃথক পৃথক হইল! কারণ, সুখও যেমন একটী ভাব, দুঃখও তেমনি একটী ভাব। সুতরাং সুখ কিম্বা দুঃখ কখন নানাবিধ ভাবের হয় না। উহাদের উৎপত্তির কারণ পৃথক পৃথক হইতে পারে। একজন ধনীলোক অর্থের অধীশ্বর হইয়াও দুঃখিত; একজন কাঙ্গাল অর্থ নাই বলিয়া ভগ্নমনা; একজনের সন্তান নাই বলিয়া কষ্ট হইতেছে; একজন বহু সন্তানের জন্য সর্ব্বদা ভীত মনে কষ্ট পাইতেছে। দুঃখ উভয়েরই এক, কিন্তু নিমিত্ত অর্থাৎ বস্তুগুলি পৃথক। এই নিমিত্তও পৃথক হয় কেন, তাহা আমরা শক্তি-বৈষম্যে দেখাইয়াছি। সুতরাং তাহার উপর একলা জীবের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা অসম্ভব। এই নিমিত্ত, প্রভেদে পাছে জীব সুখদুঃখ পায় তাহার নিবারণের উপায়ও আবার ঈশ্বর চিত্তের অপ্রীতি ও প্রীতি ভাবে রাখিয়া দিয়াছেন। যেমন নিমিত্ত ভেদে আধ্যাত্মিক ভাবের বৈষম্য প্রকাশ হইল, অমনি তদ্দণ্ডেই অপরাপর ভাব তাহাকে সাম্যে আনিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পরে যতটুকু বেগে সেই বৈষম্য জন্মাইয়াছিল, সেই বেগটুকু ধস্তাধস্তি-কার্য্যে নিরস্ত হইয়া গেলেই দুঃখ অথবা সুখ ভাবের সাম্য হইয়া গেল। সুতরাং জীব সুখ দুঃখ ভাগী হয় কেন, অর্থাৎ কেন ঈশ্বর চিত্তকে এই দুইটী বিপরীত ভাবে থাকিবার ক্ষমতা, দিয়াছেন, ইহার উত্তর করিতে গেলে, প্রথমে কহা উচিত, ভগবান কেন মূল শক্তি বৈষম্য-জনিত সৃষ্টির বেগ জন্মাইয়াছেন? এই "কেন" প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে সাহসী নহি। কারণ, আমরা ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ নহি। তবে আমরা যে দিক হইতে দেখিতেছি তাহাতেই বলিতেছি, সৃষ্টিই তাঁহার উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্যই তাঁহার ইচ্ছা। আমরা এতৎসম্বন্ধে আরও দুই এক কথা পরে বলিব।

জীবমাত্রেই যে সুখ দুঃখের ভাগী হয় একথাও আমরা সর্ব্বত্র স্বীকার করি না। কারণ, উদ্ভিদ ও বীজ, তাহাদেরও চৈতন্য আছে; তবে তাহাদের চৈতন্যের অপরাপর ভাব, যাহাকে আমরা আধ্যাত্মিক ভাব কহি, জাগ্রত থাকিবার উপায় নাই বলিয়া তাহাদিগকে সুখ দুঃখ ভাগী বলি না। কিন্তু যে সকল জীব প্রাণী-রাজ্যের অন্তর্গত, অথচ বৃক্ষাদির ন্যায় আকারে ও প্রকৃতিতে অনেকাংশে সমান, তাহাদেরও যে সুখ দুঃখ ভোগের ক্ষমতা অধিক মাত্রায় আছে, তাহাও বোধ করি না। তাহাদের হইতে উচ্চতর জীবে সুখ-দুঃখের কারণ যত অধিক দেখা

* পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

যায় ও যত বেগে সুখ দুঃখের ভাব উদয় হয়, ঐ সকল উদ্ভিদাকার প্রাণীর দেহে তাহার লক্ষাংশে কম হইতে পারে। পরিশেষে এই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ-প্রাণী মনুষ্যে চৈতন্যের যত অধিক ভাবের বিকাশের ক্ষমতা আছে, তাহাদের বেগেয় পরিমাণও তত অধিক আছে; এবং সেই সেই ভাবোদ্দীপক কারণেরও অভাব নাই। জীবের মধ্যে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান বৈষম্য স্বত্বেও তাহার মধ্যেই অবস্থার সাম্য ভাব রহিয়াছে। মনুষ্যের মধ্যেই দেখুন, বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা, এবং আধ্যাত্মিক ও অনাধ্যাত্মিক প্রভৃতি ভাবের বিকাশ। আবার তাহাদিগকে সামঞ্জস্যে আনিতে কি কি উপায় ঈশ্বর করিয়া রাখিয়াছেন, সমস্ত চিন্তা করুন; দেখিতে পাইবেন, এক ভাবের অভাবে আর এক ভাবে তাহা প্রতিপূরিত। এক অবস্থার লোপ হওয়াতে আর এক অবস্থায় তাহার প্রতিবলের উপায় হইতেছে। তাহাতেই সে সুখী ও তাহাতেই সে দুঃখী। তাহাতেই তাহার চিত্ত-প্রসাদ, তাহাতেই তাহার অসন্তোষ, এবং তাহাতেই আবার বেগের ন্যূনাতিরেক আছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, জীব হইলেই যে সুখ দুঃখের ভাগী হইতে হইবে, এমন কিছু কথা নহে। সুখ দুঃখ ভোগ চিত্তের ভাব-সমষ্টির বল ও নিমিত্ত-কারণের পরস্পর ধস্তাধস্তির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আমি যে কারণকে দারুণ কষ্টকর বোধ করিতেছি, আর একজন তাহাকে গ্রাহ্যই করিতেছে না। যখন ঐ ধস্তা-ধস্তিতে জয় হইল, তখনই আমরা কহিলাম, মনের সুখের অবস্থা। আর, যখন পরাজয় হইল, তখনই উহা দুঃখের অবস্থা। গাত্রের এক স্থান কাটিয়া গেল; চারিদিকের বায়ু-শীতে সেই স্থলকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বলিতে গেলে, দুর্ব্বল মন সেই জ্বালা বোধ করিয়া কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। তাহার নিজের দেহের রাজমিস্ত্রীগণ অমনি ক্ষত স্থান দাগরাজী করিতে ধরিল। বায়ু ও শীত প্রভৃতি বিপক্ষগণ আর কিছুই করিতে পারিল না। মনে জয়ের বোধ আসিল ও প্রীতি জন্মিল। তবে সেই ভাব যে সমান বেগে থাকে, তাহা কখনই নহে। আবার সে অপর কর্ত্তৃক বিধ্বস্তও হইয়া থাকে।

দেহের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সুখদুঃখকে মোটের উপর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ১ম প্রাণ-সম্বন্ধীয়; (২য়) কল্পনা-সম্বন্ধীয়। মনুষ্যে এই উভয়বিধ সুখ দুঃখই অধিক। কিন্তু নিকৃষ্ট জীবে তাহারা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। মনুষ্য দুই দিন আহার না পাইলে কিম্বা শীত-বস্ত্র বিহীন হইলে, কষ্ট পাইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাঘ্র, সর্প, ভেক, ভল্লুক, গৃধ্র প্রভৃতি জীব আহার না পাইয়াও বহু দিন বিনা কষ্টে থাকিতে পারে। এইরূপে প্রাণ-সম্বন্ধীয় দুঃখ কিম্বা সুখ ভোগ, আমরা যত নিম্ন-শ্রেণীস্থ জীবে যাইব, ততই ক্রমাগত অল্প মাত্রায় দেখিতে পাইবে। এমন কি ইহাও দেখিতে পাইব যে, তাহাদের শরীর কাটিয়া ফেলিলেও কোন সুখ-দুঃখের চিহ্ন তাহারা প্রকাশ করে না। আবার কল্পনা-সম্বন্ধীয় যে সকল সুখও দুঃখ ভোগ মনুষ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রায়ই মনুষ্যের নিজ কল্পনা-গঠিত। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সু, কু, ইত্যাদি যে সকল কাল্পনিক চিন্তা আছে, তাহাতেও মনুষ্য অধিক মাত্রায় সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সকল মনুষ্যই যে কাল্পনিক সম্বন্ধে সমান রূপে সুখ দুঃখ ভোগ করেন, তাহা বলিতেছি, না। কারণ, যে সকল মনুষ্য নিজের কল্পনা ততদূর বিস্তৃত না করেন, তাঁহারা অনেকাংশে অন্যের অপেক্ষা যে অল্প সুখদুঃখ ভাগী, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনুষ্য অন্যান্য নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা যেমন চিন্তায় ও স্মারকতা শক্তিতে কিয়ৎ পরিমাণে উচ্চ, তেমনি কল্পনা-তেও তাঁহার প্রাধান্য আছে। নিকৃষ্ট জীবে

কল্পনা শক্তি যেমন এক দিকে ও এক ভাবে চলিতে দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যে সেই কল্পনা নানা দিকে ও নানা ভাবে দৌড়িয়া থাকে। ইহাতে আমাদের পূর্ব্বের কথা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীবের দেহ গঠনের তারতম্যানুসারে চিত্তবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের, এমন কি তাহাদের পরিমাণেরও, বিভিন্নতা জন্মাইয়া থাকে। কোন জীবের বাল্যকালে যেরূপ ভাবের বিকাশ থাকে, যৌবনে দেহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ নূতন নূতন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বার্দ্ধক্যে শরীরের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সে সব ভাবের লোপ হইয়া থাকে। লোকে যে শুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট প্রভৃতি কথা বলেন, আমরা বিবেচনা করি, সেই সমস্ত ঘটনা কেবল শরীরের সূক্ষ্ম গঠনের তারতম্যানুসারে নিরীক্ষিত হয়। শরীরে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব্ব ঘটনাও প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে। যিনি রাজপুত্র, যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তাঁহারও কোন বয়সে শুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট ঘটিয়া থাকে। যিনি কাঙ্গালের পুত্র, তাঁহাকেও সেইরূপে জীবনের এক সময় শরীরের পরিবর্ত্তন জন্য রাজপুত্রের অদৃষ্ট ভোগ করিতে হয়। কারণ, সাম্য নিয়ম রাখিতে ঈশ্বর এইরূপ যে নিশ্চিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ ই বিশ্বাস আছে।

আমরা পূর্ব্বে যে ধস্তাধস্তির কথা কহিয়াছি, তাহা এই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত। কিন্তু কি জড়, কি চেতন সকল পদার্থেই এই ধস্তাধস্তি চলিতেছে। ইহার মূল কারণ, সেই শক্তি-বৈষম্য। চৈতন্য, দেহ-সম্বলিত হইলেই, আমরা জীব দেহে ঐ ধস্তাধস্তি দেখিতে পাই; এবং দেহ চৈতন্যহীন হইলেই আমরা জীব-দেহের ধস্তাধস্তি আর দেখিতে পাই না। এই শেষোক্ত "নিরস্ত" হওয়ার নাম মৃত্যু, অথবা আমরা সুপ্ত চৈতন্যে প্রয়াণ কহি। সেই সুপ্ত চৈতন্যই এই সৃষ্টিতে চৈতন্যের পরম প্রাকৃতিক অবস্থা। দেহাভ্যন্তরে চৈতন্যের জাগ্রতাবস্থা যদিও সৃষ্টিসম্ভূত বটে, তথাপি উহাকে শক্তি-বৈষম্যের এক জাগ্রত দৃশ্য বলিতে হইবে। তখন উহাকে জয় ও পরাজয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের জন্য ধস্তা-ধস্তি সহ্য করিতে হইবে। বস্তুতঃ সেই জয় ও পরাজয় কিছুই নহে। শক্তি-বৈষম্য-নিবন্ধন বলিয়া আকাশ-কুসুমের ন্যায় এক ভাবে দেখাইয়া আবার অপর এক ভাবে পরিণত হয়। মনে দুঃখ হইল; আধ্যাত্মিক শক্তির বেগের নিয়মানুসারে কিছুক্ষণও কিছু বলে সে কার্য্য করিল। সেই সময়েই অপর আধ্যাত্মিক ও অনাধ্যাত্মিক বলের সাহায্যে তাহাকে সাম্যের দিকে আবার আসিতে হইতেছে। সুতরাং জীবের সুখ দুঃখ ভোগ পূর্ব্ব জন্মের নিজকৃত কর্ম্ম-ফলে হইতেছে না। ইহার মূল কারণ, সেই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত শক্তি-বৈষম্য।

বারাঙ্গনার অভিসম্পাত।

(তাহার নিজের মুখে শুনিয়া)

কেন বেশ্যা হইয়াছিলাম, কেনই বা কুল ত্যাগ করিলাম! হায়, সংসারে সময়ে সময়ে যে দুঃখ পাইতাম, বেশ্যা-বৃত্তির যন্ত্রণার তুলনায় তাহাকে সুখ বলিয়া মনে হয়। আমার যাতনা যে আর ফুরায় না! ধন-অর্থ সবই হইয়াছে; কিন্তু আমার "আপনার" বলিবার যে কেহ নাই! পাতক করিয়া ধন উপার্জ্জন করিলাম কার জন্য? পিতা মাতার কুলে কালী দিলাম, স্বামীর নাম ডুবাইলাম। হায়, এই লাভের জন্যই কি এই করিয়াছিলাম? ভগবান, আর যে সহ্য করিতে পারি না!

কখনও ভগবানকে ডাকি নাই। ডাকিলে বুঝি আমার এ যাতনা হইত না! আমার আর সহ্য হয় না। কেহ যেন শত সহস্র বৃশ্চিক আমার মস্তিস্কের ভিতর ছাড়িয়া দিয়াছে। যেন

জ্বলন্ত অঙ্গার হৃদয় মধ্যে পুরিয়া কেহ বাতাস দিতেছে।

আজ আমার এ যাতনা কেন? কে আমায় এ পথে আনিল? আমি তো ইচ্ছা করিয়া আসি নাই! আমি তাহার কি অপরাধ করিয়াছি যে, জানিয়া-শুনিয়া পাপিষ্ঠ আমায় জীবিতাবস্থায় নরকে ফেলিয়া দিয়াছে! আজ আমার যত হৃদয় পুড়িতেছে, ততই প্রতিহিংসা জ্বলিয়া উঠিতেছে। আজ বেশ্যা হইয়া আমি দগ্ধপ্রাণে কাতর বচনে অশ্রুপূর্ণ মুখে ভগবানকে ডাকিতেছি। যাহারা আমার এই দুর্দ্দশার কারণ, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে আজ তাহাদের অভিসম্পাত করিতেছি। সহায়হীনা পতিতা বেশ্যার অভিসম্পাতও ফলিবে।

যাতনায় আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রতারক প্রবঞ্চক পুরুষের হাতে পড়িয়া আমি সব খোয়াইয়াছি। আমার পবিত্রতা ছিল, সতীত্ব ছিল; ইহারা পুরুষ হইয়া আমার স্ত্রীত্ব বিনাশ করিয়াছে। এখন আমি সহায়হীনা, ঘৃণিতা, স্ত্রী-নামের অযোগ্যা। যে আমায় প্রতারণা করিয়া কুলত্যাগ করাইয়াছে, দুর্ব্বল দেখিয়া যে বিশ্বাসঘাতক আমায় কুপথে আনিয়াছে, যাহারা আমার সর্ব্বস্ব বিনাশ করিয়াছে, ভগবান, তুমিই তাহাদের বিচার করিও।

বালিকা বয়সে নরকের কথা শুনিতাম, সেখানে রক্ত-পুজ-কৃমির মধ্যে পাপীকে ফেলিয়া দেয়। হায়, আজ আমার হৃদয়-মধ্যে সেই নরক দেখিতেছি। দুর্গন্ধে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে; বিষ্ঠা-বমন হইতে উত্থিত নানা-প্রকার পোকা জোর করিয়া আমার মুখ নাসিকা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। আমি নিবারণ করিতে পারি না; নরকের কীট নরক পাইয়া ভিতরে যাইতেছে। হায়, আমি কিসে নিস্তার পাইব! হায়, আমায় কে রক্ষা করিবে! ভগবান, আমি কেন এমন করিয়াছিলাম? কোন কদাচারী কু-চক্ষে কুভাবে চাহিয়া আমার সংসার ভুলাইয়া দিয়াছিল!

হায়, এই পাপাত্মাদিগকে কি কেহ শাস্তি দিতে পারে না! লোকে ঘৃণা করে না বলিয়া এই বেশ্যাশক্ত ব্যক্তিগণ আস্পর্দ্ধা পাইয়াছে। ইহারা কত লোকের কত সর্ব্বনাশ করিতেছে; কত প্রতারণা করিতেছে; ভগবান, তুমি ইহাদের বিচার করিও।

যাহারা পর-স্ত্রী দেখিলেই চাহিয়া থাকে, কুভাবে দৃষ্টি করে, ভুলাইবার চেষ্টা করে, তাহারা কিরূপ বিশ্বাসঘাতক, কতদূর নীচ, কতদূর স্বার্থপর, কি পাপিষ্ঠ! তাহারা বুঝে না যে, পর-স্ত্রীকে প্রলোভন দেখাইতে চেষ্টা করিলে, তাহাদের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী সকলেতেই দোষ বর্ত্তে।

পিতা মাতার মন যেরূপ, পুত্রেরও সেইরূপ হয়। পিতা মাতা যদি কেবল পাশব রিপুর আধিক্যে পুত্র জন্মাইয়া থাকেন, তবে সে পুত্রও নীচ হইবে বৈকি? যখন কেহ পরস্ত্রীতে লালসার সহিত দৃষ্টিপাত করে, তখন ইহাই বুঝা যায় যে, পুত্রটি পাশব-প্রবৃত্তি-জাত। যে এইরূপে কুভাবে অন্য স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া থাকে, সে নিজের চরিত্রে এই দেখায় যে, সে শূকরীর সন্তান। পিতা মাতার নিকট এত উপকার পাইয়া যদি তোমার ব্যবহারে তোমার উপকারিণী জননী শূকরী-পদ বাচ্য হন, তবে মাতাকে শূকরী বলা অপেক্ষা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করাই তোমার শ্রেয় নয় কি! হায়, তুচ্ছ রিপুর জন্য তুমি পরস্ত্রীতে কুদৃষ্টি করিবে! ইহাতে ভাবিলে না যে, পুত্র হইয়া তুমি মাতাকে পাশব-প্রবৃত্তি-পূর্ণা প্রতিপন্ন করিতেছ! একবার এইটি ভাবিয়া দেখ, আর কখনও পর-স্ত্রীতে কুভাবে চহিতে প্রবৃত্তি হইবে না। যে কুভাবে পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত করে, সে নিজের স্ত্রীকে বেশ্যা বলিয়া মনে করে। তাহা না হইলে যখন তাহার মনে হয় যে, তাহার স্ত্রীকেও

অন্যে এইরূপ ভাবে চাহিতে পারে, তখন আর কি তাহার কুদৃষ্টি থাকে!

যাহারা বেশ্যাসক্ত তাহাদিগকে আমি কি বলিয়া অভিসম্পাত করিব, বলিতে পারি না। হায়, ইহাদের কি মতিভ্রংশ! বেশ্যা দেখিলে যাহাদের প্রতিহিংসা প্রবল না হয়, তাহারা কি ভদ্র? বেশ্যা দেখিয়া যে একবারও ভাবে না,—হায়, কোন দুর্বৃত্ত একটা বংশকে কলঙ্কিত করিয়াছে, একটা জনক-জননীকে অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছে, একজন স্বামীর জীবনে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে, স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, সে কি আর মনুষ্য! হায়, একথা মনে করিয়া কোথায় প্রতিহিংসা লইবে, তাহা না হইয়া বেশ্যাশক্তি! ইহাতে কি বুঝায়? যে অন্যের পিতামাতার মর্ম্মান্তিক আঘাত বুঝে না, সে কি নিজ পিতা মাতাকে কখনও পিতা মাতা বলিয়াছে! যে অন্যের স্ত্রী দেখিয়া নিজের মা ভগ্নীর মত পবিত্র বলিয়া ভাবে না, অপিচ তাহাকে কুপথে আনিবার জন্য প্রলোভন দেখায়, সে কি কখন নিজের মাতা, ভগ্নীর সম্মান জানে? ভদ্র-সন্তান হইয়া যে মাতাকে পবিত্র বলিয়া না ভাবে, সে কি ভদ্র-সন্তান? যদি ইহারা নিজের স্ত্রী বা কন্যার মর্ম্ম বুঝিত, তবে কি পরের স্ত্রী, পরের কন্যার সুখাভিলাষী হয়; তবে কি পরস্ত্রীর প্রতি লালসাপূর্ণ হইয়া দৃষ্টিপাত করে!

যাহার স্ত্রী স্বামীকে বেশ্যালয়ে যাইতে দেখিয়া নিরস্ত থাকেন, তিনি বুঝেন না যে, তাঁহার নিজের চরিত্রে সেই দোষ আসিতেছে। যদি তাঁহার সতীত্বের জোর থাকে, তবে তিনি ঐ পশু-স্বভাববৎ স্বামীকে এক কথায় কুপথ হইতে ফিরাইতে পারেন। সতীত্বের জোর এইরূপ। যখন না পারেন, তখন দড়ি-কলসিই তাঁহার বিধান।

হায়! বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিদিগের মন কি ঘৃণিত! ইহাদিগের রূপ দেখিয়া আমি ভুলিয়াছিলাম। হা ভগবান, তখন কি তুমি আমার এই দুর্দ্দশা করিবে বলিয়া চক্ষে আবরণ দিয়াছিলে! হায়, শুধু গাড়ী, ঘুড়ী, ঘড়ির চেন গলায় দিলে, যে ভদ্র হয় না, তাহা বেশ্যাশক্ত বড়মানুষের সন্তান দেখিয়া বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। ইহাদের কি কুভাব—কি নীচ ইচ্ছা! ছাগ, শূকর প্রভৃতি জঘন্য পশুর প্রবৃত্তির বরং সীমা আছে; কিন্তু ইহাদের পশুত্বের সীমা নাই। ইহাদিগকে দেখিলে এখন আমার শতগুণ যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। ইহারা আমাদের দেখিয়া আপনার পরিবার-মধ্যে আমাদের বেশভূষা পরাইয়া দেখে। ইহারা কি পুরুষ! ইহারাও বেশ্যার মত বেশভূষা লইয়া ব্যস্ত থাকে। কখন কাহার সর্ব্বনাশ করিবে! ইহারা সামাজিক শত্রু।

হায়, একদিন যে আমার সব ছিল! আজ যাহারা আমার সম্মুখে, তাহারা কে? ইহারা বাবুর সন্তান, ধনির ছেলে, জমীদারের বংশধর। আগে ইহাদের দেখিয়া ভুলিতাম। কিন্তু হায়, এখন ইহাদিগকে যমদূতের মত দেখিতেছি; ইহারা আমাকে জোর করিয়া নরকে লইয়া যাইতেছে। হায়, আমার এক তিলও বিরাম নাই কি! ও! আমাকে কি যন্ত্রণা দিতেছে! দ্বার বদ্ধ করিয়া থাকিলেও আমার নিষ্কৃতি নাই! মাগো! আর আমি যে সহ্য করিতে পারি না! মা, আজ তুমি কোথায়? মা, তুমি যে আমায় কখন কাঁদিতে দেও নাই!—আমার কপালে কি এই ছিল বলিয়া! আমি নরকে, আমার হৃদয় পুড়িতেছে। ভগবান, বেশ্যাবৃত্তিকে বুঝি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম যাতনা করিয়া সৃজন করিয়াছ?

আমি মরি, তথাপি বাবুর সন্তানেরা আমার নিকটে আসিবে! ইহারাই আমায় যাতনা দিতেছে। ইহাদের বেশভূষা, ইহাদের চলন-ধরণ দেখিলে যেন কেহ শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ জ্বালাইয়া দেয়—ক্রোধে ইহা-

দের প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা করে। এই বাবুর সন্তানগণ আমার এই দশা করিয়াছে। মা চামুণ্ডে! তুমি দৈত্য-দানব বিনাশ করিয়া থাক; কিন্তু এই পশুবৃত্তিগত অবলার কলঙ্কের কারণ, পাষণ্ড, চণ্ডাল, লম্পট জমীদারের সন্তান, ধনীর পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে তুমি এখনও নিরস্ত কেন? যদি ইহাদের অন্তর থাকিত, তবে বলিতাম, আমার মত ইহাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী, বেশ্যা হইয়া ইহাদিগকে পুড়াইয়া মারুক। কিন্তু ইহাদের অন্তর নাই। যদি ইহাদের সদ্যখণ্ডিত রক্তাক্ত মুণ্ড শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ হয়, যে সৌন্দর্য্য দেখাইয়া ইহারা অবলা ভুলাইতে চেষ্টা করে সেই সুন্দর মুখের মাংস যদি ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল-কুক্কুর টানিয়া-ছিঁড়িয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে ভক্ষণ করে, সেই হৃদয়হীন কুচক্রীগণের বক্ষ ও উদর চিরিয়া পথনিক্ষিপ্ত বিড়াল-শিশুর মত নাড়ী মাংস টানাটানি করিতে করিতে যদি শকুনি গৃধিনী নৃত্য করিতে থাকে, চামুণ্ডে যদি এই সমস্ত আমাকে দেখাইতে পার মা, তবে আমার মনের কালী যায়।

হায়! ইহারা আমায় কি করিয়াছে? আমি যে রাজকন্যা ছিলাম! আমার ভাই, ভগ্নী যে সকলি আছে। হায়, আমার দেবসম স্বামী! আমি শূকরী, তাই তাঁহাকে চিনিলাম না। কেন আমার এমন প্রবৃত্তি হইল! কে আমায় এমন করিল! আকাশ, তোমার কি বজ্র ফুরাইয়া গিয়াছে! বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিদিগের মস্তক কি তুমি দগ্ধ করিতে পার না?

তখন আমার বারেক-তরেও সদ্বুদ্ধি হইল না। যদি জানিতাম, বেশ্যা-বৃত্তি এইরূপ, হায়, তবে কি আমার এই দশা হয়!

/ আমরা মতিহীনা অবলা। ভাল মন্দ বিচার শক্তি আমাদের নাই। প্রতারক, প্রবঞ্চক পুরুষজাতির প্রলোভনে আমরা ভুলিয়া যাই। তখন আমাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। যদি এ দুর্ব্বল হৃদয় না থাকিত, তবে আজ আমি রাজমাতা, রাজবধূ; আজ আমি স্বামী-পুত্রবতী; আজ আমি সকলের আদরের হইতাম। এখন, হায়, সব হারাইয়া বেশ্যা হইয়াছি।

হায়, পবিত্র থাকিলে, কুলের বাহির না করিলে, আমি কত সুখে থাকিতাম! আমার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেবর, পিতা মাতা, ভাই, ভগ্নী সকলি আছে। হায়, ছোট ভাইগুলির কথা মনে পড়িলে আমার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে থাকে। হায়, আমি পুত্রের মা হইতে পারিতাম। পুত্রনিধি বুকে লইলে আমার কি আর কোন যাতনা থাকিত! হাজার আমায় তিরস্কার করুক, তবু তাহারা 'আমার' ছিল। কিন্তু এখানে আমার বলিবার কিছুই নাই। এই অধম বেশ্যাশক্ত ব্যক্তিগণ প্রতিদিন নূতন নূতন পাপ সৃষ্টি করিতেছে। মা বসুন্ধরে, এখনও কতদিন ইহাদিগকে বক্ষে রাখিবে?

গহনা-অর্থের লোভ দেখাইয়াছিলে? যদি বলিতে ইহার পরিবর্ত্তে মানসিক যন্ত্রণা বিনিময় করিতে হইবে, তবে হায়, কোন্ নির্বুদ্ধি স্ত্রীলোক গৃহ ছাড়িয়া—আপনার ছাড়িয়া বেশ্যা হয়? কোন স্ত্রীলোক বেশ্যা হয়? যে সংসারে থাকিয়া যেরূপ যন্ত্রণা পাউক না কেন, বেশ্যাবৃত্তির যাতনার শতাংশের একাংশও তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। পিত্রালয়ে বা শ্বশুরালয়ে সময়ে সময়ে যাতনা পাইতাম বটে; কিন্তু স্বামীর একটি আদরের কথা, ভাইভগ্নীর আধখানি সোহাগের কথা, সমস্ত মর্ম্মব্যথা ভুলাইয়া দিতে পারিত।

কিন্তু এখানে! বেশ্যা হইয়া, কাহাকেও সরল বলিয়া ভাবিতে পারিলাম না। যাহাকে আজ মনে করি সরল, কাল দেখি, সে কি প্রতারক! কেহ শান্ত্বনা করিতে আসিলে ক্রোধ হয়। মনে হয়, বুঝি নিজের কিছু একটা স্বার্থের জন্য এই করিতেছে। হায়, আজ এই বেশ্যাহৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা তুষানলের মত এ ভিত্তি

পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে। ভগবান আমার যন্ত্রনার মূল যাহারা, তাহাদের দণ্ড কি তুমি বিধান করিবে না?

যে পিতামাতা বেশ্যাশক্ত পুত্রকে নিবারণ করিতে পারে না, তাহাদের কি বলিয়া অভিসম্পাত করিব! পুত্রের উপরে পিতা মাতার অধিকার আছে। সে সমাজ-দত্ত অধিকার যাহারা রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা কি পিতা মাতা? তোমার আপনার জিনিষ তুমি জোর করিয়া নিবারণ করিতে পার না! ছেলে মরিবার ভয় দেখাইল; তুমি গৃহিণীর কথায় ভয়ে চুপ করিলে? কি কাপুরুষ তুমি! সমস্ত মানবজাতির কণ্টক তোমার পুত্র মরিবে; তাহাতে তোমার ভয় কি? আর, তোমার বংশধর কি মরিতে পারে! বেশ্যাশক্তের মরিবার কি ক্ষমতা আছে, না অধিকার আছে? যে তোমার কলঙ্ক করিতেছে, তার মৃত্যুই উচিত নয় কি?

দেশের ভদ্র-সন্তানদিগকেও অভিসম্পাত করিতে আমার ইচ্ছা হয়। তাঁহাদেরও কি কিছুই শক্তি নাই? তাঁহারা পাপের প্রশ্রয় দিতেছেন কিরূপে? তাঁহারা সমাজে বেশ্যাশক্ত ব্যক্তির সহিত চলিতেছেন কিরূপে? ইহাদের সহিত সংশ্রবে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা তাঁহারা বুঝেন না কেন? একদিনকার ঘটনা বলিতেছি। আমার নিকটে, যে সমস্ত পাষণ্ড কুক্কুর-স্বভাববিশিষ্ট বাবুর ছেলে, জমীদারের ছেলে আসিত, তাহাদের একজনের সহিত এক দিন একজন জ্ঞানী আমার নরকে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু কথায় কথায় সেই টাকাওয়ালা পাষণ্ডের সহিত ঐ জ্ঞানীর বচসা হয়। তিনি দেখিতে সুন্দর নহেন; কিন্তু তাঁহার অবয়বে তাঁহার জ্ঞানের জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমি সেই তীব্র দৃষ্টি, জ্যোতিপূর্ণ মুখাবয়ব, এবং তীব্র উপদেশ মরিলেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তিনি যখন কথা কহিতেছিলেন, তখন আমার মনে হইতেছিল, যেন কোন দেবতা কথা কহিতেছেন। তিনি একজন বিলাতি কবির নাম করিলেন—টেনিশান না কি আমার তাহা মনে নাই—কিন্তু কথাগুলি ঠিক মনে আছে। যাহারা জানিয়া-শুনিয়া বেশ্যা-স্বভাববিশিষ্ট স্ত্রী লইয়া ঘর করিয়া থাকে, মনে মনে জানিয়াও যে তাহা উপেক্ষা করে, কবি তাহাদিগকে সাধারণের ভীষণ শত্রু বলিয়া গালাগালি দিতেছেন *। যে পুরুষ অসতী অথবা ব্যভিচারণী স্ত্রী জানিয়াও গোপন করিয়া রাখে, ঐরূপ স্ত্রীলোকের উপর গৃহের কর্ত্তৃত্ব দেয়, সে কেবল তাহার নিজের নিন্দা, পরিবারদিগের নিন্দার ভয়ে সে স্ত্রী বিসর্জ্জন করে না। কিন্তু সে বুঝিতে পারে না, তাহার কাপুরুষত্বে সমাজ কিরূপ কলঙ্কিত হইতেছে? ঐ ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে সকলে পবিত্র ভাবিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু গুপ্ত স্ফোটকের মত সমাজ-শরীরে তাহার ক্রিয়া হইতে থাকে। কেহ দেখিতে পায় না, কেহ সাবধান হয় না—ঐ স্ত্রীলোক সকল বাড়ীতে যাতায়াত করে; পাপ কটাক্ষ দ্বারা অন্য পুরুষের মন ভুলাইতে চেষ্টা করে, প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দেয়; এবং যুবকদিগের অন্তঃকরণে বিষ ঢালিয়া দেয়।

যাহারা বেশ্যাশক্ত পুরুষের সহিত আলাপও করে, মহাত্মা তাহাদের উপরও ঐ দোষ আরোপ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। তাহার পর আর তাঁহাকে দেখি নাই; দেখিবার জন্য যদিও পাপিষ্ঠের নিকট অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম।

(ক্রমশঃ)

* I hold that man the worst of public foes
Who either for his own or children's sake
To save his blood from scandal, lets the wife
Whom he knows false, abide and rule the house
For being through his cowardice allowed
Her station taken everywhere for pure
She like a new disease, unknown to men
Creeps, no precaution used, among the crowd
Makes wicked lightenings of her eyes and saps
The fealty of our friends stirs the pulse
With devil's leap and poisons half the tongue

Tennyson

কোথা যাই ?

এখন যাই কোথা! কোথা হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে এই সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, জীবনমরণ-রূপ উত্তালতরঙ্গাকুল বিশাল বিশ্বে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা তো জানিই না। যেখানে আসিয়াছি, সে স্থান আমার পক্ষে নূতন নহে; এখানে কতবার আসিয়াছি, কতবার গিয়াছি, আমি নিজেই তাহার সংখ্যা করিয়া উঠিতে পারি না। অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানেই লোকে ভয় করিয়া থাকে যে "কোথায় যাইতে হইবে" বা "কোথায় কি করিতে হইবে!" কিন্তু যেখানে অন্যূন লক্ষ লক্ষবার আসিয়াছি, আর গিয়াছি; সেখানে এবার আসিয়া যে ভয় ও ভাবনা হইয়াছে, তাহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। স্থান পরিচিত, দৃশ্যাবলীও একপ্রকার পূর্ব্ব-দৃষ্ট, পার্থিব সাধারণ ভাব সমুদায়ও অধিকাংশ পরিজ্ঞাত। কিন্তু তবুও স্থির করিয়া লইতে পারিতেছি না যে,—যাই কোথা! পূর্ব্বে যতবারই আসিয়াছি, ততবারই যেন যাইবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এবার তাহা নাই!—কেন নাই? কে বলিবে, কেন নাই?

জীব-স্রোতের গতি অবিশ্রান্ত; সুতরাং মানুষের গতিও অবিশ্রান্ত। মনুষ্য ভিন্ন অন্যান্য জীবের গতি কতকটা নিশ্চিতের মত—ক্রমোন্নোতির দিকে। কিন্তু জীব-সৃষ্টির চরম-বিকাশ মানুষের গতি অনিশ্চিতে। ইহার কারণ কি? সকল জীবে যাইবার স্থান যেন নিশ্চিত, কিন্তু মানুষের সেরূপ নিশ্চিয়তাটুকুও নাই কেন? নিকৃষ্ট জীবের পর ক্রমশঃ উন্নত জীবের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের পর আর উন্নত জীব কি? যদি কিছু না থাকে, তবে মানুষের গতির বিরাম হয় না কেন? আর, যদি গতিই রহিল, তবে সেই গতির স্ফূর্ত্তি পূর্ণরূপে মানুষেই হয় না কেন? মানুষের ক্ষমতার পূর্ণতা হয় না কেন?

পৃথিবীর সারাংশ সংসার। সংসারের মূল, কার্য্য। সেই কার্য্যই জগতের পূর্ণ অভিব্যক্ত জীব মানুষের স্কন্ধে অর্পিত। কিন্তু মানুষ সে কার্য্যভার পূর্ণরূপে সম্পাদন করিবে কি দিয়া? মানুষ জীবত্বের পূর্ণাধার বটে; কিন্তু তাহার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ কই? অসম্পূর্ণ ক্ষমতায় সকল কার্য্যসাধন হয় না; সেই জন্যই মানুষ কার্য্যভার স্কন্ধে পাইয়াও সকল কার্য্য করিতে পারে না। ঈপ্সিত সিদ্ধিই পূর্ণ ক্ষমতার লক্ষণ—তাহা সংসারী মানুষের নাই। আশা, উদ্যম, সাহস ও বুদ্ধি মানুষের আছে; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? কার্য্যকালে কোথা হইতে কি এক অতর্কিত বাধা সময়-স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বিফল-মনোরথ করিয়া দেয়, তাহা স্থির করা এক প্রকার অসাধ্য। শুনিয়াছি, মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনুষ্য-জীবনে ক্ষমতার পূর্ণত্ব লাভ করিতে গিয়া, ত্রিবিদ্যা সাধন করিতেছিলেন। প্রায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এমন সময় কোথা হইতে এক অতর্কিত বাধা আসিয়া উপস্থিত হইল; আর সমস্ত সাধননষ্ট হইয়া গেল। তখন মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আসিয়া প্রায় আয়ত্তিকৃত ত্রিবিদ্যা মোচন করিয়া দিলেন। এই উপাখ্যানের মধ্যে যেরূপই রূপক থাকুক না কেন, ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, মানুষের ক্ষমতা মানুষে পূর্ণ হইবার নহে। তাহার পর সকলে আবার বিশ্বামিত্রের পদবীতেও আরোহণ করিতে পারে না। তাহার কারণ, তাহাদের ইচ্ছা নাই বলিয়া নহে—সময় কঠোর ন্যায়বান বলিয়া। সময়ের ন্যায়পরতা এতদূর কঠোর যে, তাহার হৃদয় দুঃখে গলে না, মায়ায় মুগ্ধ হয় না! মানুষ অসম্পূর্ণ ক্ষমতার অভাবে পড়িয়া সময়ের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। যে আশায় মানুষ প্রথমে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়, সে আশা সময়ের শাসনে কাহারও কখন পুরিয়াছে কি না, সন্দেহ। নিজের বিবেচনায় যতটুকু

উপযোগী বোধ করে, সময় মানুষকে ততটুকু অবসর দেয়। আর, সেই অবসরটুকুর মধ্যেই মানুষকে কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং কার্য্য করিয়া মানুষের আত্মতৃপ্তি জন্মে না—কার্য্যও অসম্পূর্ণ থাকে। কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকে বলিয়াই সংসারে এত বিশৃঙ্খলা। যাহাদের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত, তাহাদের যদি স্বাধীন ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে কার্য্যে গোলযোগ না ঘটিবে কেন? গোলোযোগ থাকিলে অশান্তি আসিবে না তো কি!

কর্ত্তার অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু কার্য্য সম্পন্নের ভার ও উপায়াদি কর্ম্মচারীর হস্তে থাকে। সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে সময়ই কর্ত্তা; কর্ম্মচারী মনুষ্যকে ভারবাহীত্বে নিযুক্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত। কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে, কর্ম্মচারী সে বিষয়ে সক্ষম কিনা, তাহা কে দেখিবে? ভারবহনে বাহকের শক্তির অভাব হইলে ভার উঠিবে কিসে? সময়ের শাসনে অভাব হইবামাত্র পূর্ণ হয় না। কার্য্য-কারণ সূত্রে সময়ের গতিতে যখন আপনা-আপনি অভাব পুরিবে, তখন কার্য্য করিতে হইলে, সেই জন্যই মানুষের কর্ম্মে এত বিশৃঙ্খলা ঘটে। জীবত্ব-বিষয়ে মানুষ যেরূপ পূর্ণ সৃষ্টি, অন্যান্য বিষয়েও যদি তাহার সেই রূপ পূর্ণতা থাকিত, তাহা হইলে আজ আর আমাকে করতল-ন্যস্ত কপোল হইয়া ভাবিতে হইত না যে—"যাই কোথা!" কিন্তু সেরূপ না হইয়া এরূপ হইল কেন?—তাহার মীমাংশা কোথায়?

যখন সময়ের অধীনে থাকিয়া পৃথিবীর নিয়মিক অপ্রতিহত গতি কালস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া, "যতদূর হয়, যত দূর না হয়" এরূপভাবে আমাদিগকে সংসারে কার্য্য করিতে হইবে, তখন আমরা দাঁড়াই কোথা? যাই কোথা? কি বলিয়া কাহার নিকট প্রার্থনা করিব? পূর্ণ-জীব অথচ অক্ষম মানুষের স্কন্ধে কার্য্য-ভার চাপাইয়া দিয়া, তাহাকে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করাইবার উদ্দেশ্য কি? যে যাহাতে অপারক, তাহাকে সে কর্ম্মের-ভার কে দিল? কেন দিল? যদি দিল, তবে তদুপযোগী ক্ষমতা দিল না কেন? এ রহস্য কি? মহানুভব তুলসী-দাস একদিন বলিয়াছিলেন,—

> "চল্‌তি চাক্কি দেখ্ কর্
> দিয়া কবীরা কো।
> দো পাঠন্ কি বীচ্ আ
> সাবিৎ গায়া না কো॥"

অর্থাৎ মহাজন কবীর একদিন জাঁতায় কলাই ভাঙ্গিতে দেখিয়া বলিয়া ছিলেন যে, 'হায়! ক্ষমতা অভাবে প্রত্যেক জীবকেই এইরূপ কর্ম্মযন্ত্রে পিষ্ট হইতে হয়।' তবে মানুষের উপায় কি? সহায় কে? দিনের পর দিন হইবে, মাসের পরমাস হইবে, বৎসরের পর বৎসর হইবে, সূর্য্য উত্তাপ ও চন্দ্র শৈত্য দিবে, জলে শীতলতা থাকিবে, অগ্নি দাহক হইবে, ও নিকৃষ্ট পশুরা কেবলমাত্র আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি সামান্য ও সহজ বৃত্তি গুলি লইয়াই কালাতিপাত করিবে—এ সমস্তই নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু মানুষে করিবে কি, তাহার নির্দ্দেশ নাই কেন? পূর্ণ ও অপূর্ণের—জড় ও অজড়ের পার্থক্য-রক্ষাই কি ইহার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে মানুষ সর্ব্বক্ষম না হয় কেন? সংসার লোপ পাইবার ভয়ে মানুষকে কি অল্পক্ষম করা হইয়াছে! যদি তাহাই হয়, তবে এ পীড়নে কি জন্য? মনুষ্য এ সমস্ত সহজ করিবার ক্ষমতা পায় না কেন?

এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া কি বলিব! সর্ব্বক্ষমতাবান সর্ব্বনিয়ন্তাকে কি পক্ষপাতী বলিব? কে জানে, কি করিতে হইবে? কথা এই,—এরূপ ভিন্ন-দিগভিমুখী স্রোতদ্বয়ের মধ্যে পড়িয়া এখন যাই কোথায়? বোধ হয়, এই সকল ভাবি-

যাই সাধক-প্রধান রামপ্রসাদ সেন একদিন প্রাণের অসহ্য জ্বালায় জ্বলিয়া গাহিয়াছিলেন,—

"বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"

যাঁহারা আজ তাঁহার মত প্রাণের জ্বালায় জ্বলিতেছেন, যাঁহারা এই সংসারের দুইটী বিপরীত বন্ধনে পড়িয়া স্থির হইতে পারিতেছেন না, প্রাণে অদম্য উৎসাহ থাকিতেও যাঁহারা কার্য্য-কারণ-সূত্রে বাঁধা থাকিয়া সময়ের বলে পৃথিবীর গতি-স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছেন, আমার সহিত তাঁহারাও আজ সাধক-প্রধানের গীতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলুন,—

"বল্‌ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?"

পরহংস রামকৃষ্ণের উক্তি।

উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক, যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত হয়। হরিনাম শুনিলেই যাঁহার চক্ষে অমনি জল আইসে তাঁহার আর উপাসনা করিবার আবশ্যক হয় না।

এক-ডুবে রত্ন না পাইলে রত্নাকর রত্নহীন মনে করিও না। ধৈর্য্য-ধারণ পূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর অবতীর্ণ হইবেই হইবে।

এক ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন করিতে গিয়া দুই হাত মাটি কাটিয়াছে, এমন সময় অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল,—ভাই, তুমি বৃথা পরিশ্রম করিতেছ কেন ? ইহার নিম্নে জল পাইবে না ; কেবলই বালি বাহির হইবে। সে তৎক্ষণাৎ সে স্থল ত্যাগ করিয়া অপর এক স্থলে মাটি কাটিতে লাগিল। তথায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল,—ভাই, এখানে পূর্ব্বে পুকুর ছিল; বৃথা কষ্ট করিতেছ কেন ? কিঞ্চিৎ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া কাটিলে সুন্দর জল বাহির হওয়ার সম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। তথায় অপর একজন আসিয়া আবার তাহাকে নিষেধ করিল। এইরূপে সে যত স্থল মনোনীত করিয়াছিল, একে একে আবার সে সকল স্থলই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তাহার পুকুর আর কাটা হইল না। ধর্ম্মপথেও অনেকে এইরূপে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন। আজি যাহা বিশ্বাস করিলেন, বিপদে বা পরীক্ষায় পড়িয়া কল্য তাহা ত্যাগ করিলেন ; এবং অবশেষে হয় একেবারে নাস্তিক হইয়া পড়িলেন ; নতুবা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ জীবনে ধর্ম্ম-লাভ অসম্ভব"।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

"আনন্দ" পত্রের

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যাহাই অশঙ্কা করিয়াছিলাম, কার্য্যেও দেখিতেছি, তাহাই ঘটিল। 'আনন্দে' বিজ্ঞাপন ছিল, যিনি যে নম্বরের প্যাকেট পাইয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহাকে তদুপযোগী বিজ্ঞাপিত শাল, ঘড়ি, ইত্যাদি দ্রব্য উপহার প্রদত্ত হইবে। কিন্তু এখন আবার নানা স্থান হইতে এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, গ্রাহকগণ আদৌ নম্বরটি পর্য্যন্ত পান নাই। অর্থাৎ কোন নম্বর পাইলে তবে কোন্‌ দ্রব্য পাইবেন জানিবার সম্ভাবনা ছিল ; ও তার পর তাহা পাওয়া তো অন্য কথা ! কিন্তু এ দেখিতেছি, বিশ মোল্লাতেই গলদ ! অধিকন্তু, বার বার নম্বরের জন্য পত্র লিখিয়া গ্রাহকগণ যাহা উত্তর পাইয়াছেন, তাহাতেও চক্ষুস্থির ! সে উত্তরে না আছে ম্যানেজার, না আছে নম্বর। কেবল আছে, কাগজ বাহির হইলেই জানিতে পারিবেন। যাহাই হউক, যে-সে বিজ্ঞাপনে টাকা পাঠানর এই পরিণাম বটে !

রেণল্‌স্‌ এণ্ড কোম্পানী

নাম দিয়া বি-লর্ণ্ঠনের (Bec Lantern) প্রেরিত বিজ্ঞাপনে আরও যে অনেকে প্রতারিত হইতেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামকুমার দাস মহাশয় (মুলাধারী, পিরগঞ্জ পোঃ,

দিনাজপুর হইতে) যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও এস্থলে আবার প্রকাশিত হইল ; আশা করি, ইহাতেও সাধারণে সতর্ক হইবেন।

"মহাশয়,—আমিও রেণল্‌ডস্‌ এণ্ড জীবস্‌ কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ছড়া-ছড়িতে প্রলোভিত হইয়া ভি, পি, পোষ্টে তিনটী (Bee) লর্ণ্ঠন পাঠাইতে লিখি। বিজ্ঞাপনে ছিল, সাধারণ লর্ণ্ঠনে যেরূপ তৈল আবশ্যক হয়, এই লর্ণ্ঠন তাহার ৮০ভাগের এক ভাগ মাত্র লাগিবে ; এবং মূল্যও অতি সুলভ, ১ টাকা মাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়; বাক্স খুলিয়া দেখি, তিনটী পানীয় গ্লাস কাটিয়া লর্ণ্ঠন প্রস্তুত করিয়াছে। উহার এক একটার উচিত মূল্য কোন মতেই ।০ আনার বেশী হইতে পারে না। কলিকাতায় ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ যে এরূপ প্রবঞ্চনা-পূর্ণ বিজ্ঞাপন দ্বারায় প্রলভোন দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। এইক্ষণ মহাশয়ের নিকট এই প্রার্থনা যে, যাহাতে আমার ন্যায় নিরীহ ভদ্রলোক তাহার মায়া-জালে পতিত না হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন।"

এ রোগের ঔষধ কি !

'শান্তি' সংবাদ-পত্রে '১৭নং গরাণহাটা হইতে বিঃ কেঃ বন্দোপাধ্যায়' নামক এক ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন যে, 'কেমিকেল স্বর্ণের অঙ্গুরি' উপহার সহ 'ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন' পুস্তক ১৸০ সাত সিকায় দিবেন। আমরা সহজে বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করিয়া অনেক ঠকিয়াছি ; এজন্য বিজ্ঞাপনে, ভদ্র বা অভদ্র কিরূপে চিনিব বলিয়া, বিশ্বাস করি না। কিন্তু সংবাদ-পত্রাদিতে যাহার সমালোচনা ভাল দেখি, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় ক্রমেই সকল শ্রেণীরই লোকের কপাল পুড়িতেছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। 'শান্তি' সংবাদ-পত্রে "ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের" সমালোচনা দেখিয়া বিশ্বাস করিয়া পুস্তক ও আংটী পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু যথাসময়ে পুস্তক আসিয়া পৌঁছিলে ডাকঘরে ১৸০ টাকা দিয়া খুলিয়া দেখিয়াই চক্ষুস্থির ! পুস্তকে অন্য কিছু সার জিনিষ না থাকিলেও, বাদ্যের বোল ও গৎ কতকগুলি আছে ! কিন্তু সকলই চর্ব্বিত-চর্ব্বণের সার-গ্রহণ। আর অঙ্গুরির কথা কি বলিব ? কোথায় বা কেমিকেল স্বর্ণ, কোথায় বা কি ? অঙ্গুরিটি নির্জ্জলা খাঁটি পিতল। এক মিনিটের জন্য তাহা ব্যবহার করিতে হয় নাই। আপনাদের দৃষ্টি-জন্য অঙ্গুরিটি পাঠাইলে বুঝিতে পারিবেন। তাই বলি, এ রোগের ঔষধ কি ? সুসভ্য বৃটীশ শাসনে এরূপ প্রবঞ্চনা-ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি থাকিলে আমাদের আর উপায় নাই।
শ্রীউমা নাথ কবি চন্দ্রমণি। পোষ্ট—বাঁশদহা।"

প্রতারক গ্রাহকগণ।

গত বারের কথামত এবার কএকটী নির্লজ্জ গ্রাহকের, যাঁহারা তাগাদার পর কোন উত্তরও দেওয়া ভদ্রোচিত কার্য্য মনে করেন নাই তাঁহাদের, নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। অম্বিকাচরণ বসু, কলসকাটী এণ্ট্রেন্স স্কুল ২য় শ্রেণী, বরিশাল।

২। অনুকূলচন্দ্র দত্ত, মোচনা লাইব্রেরীর সম্পাদক, ফরিদপুর। ইনি পূজার পূর্ব্বেই মূল্য শোধ করিবেন বলিয়া কাগজ বন্ধ করিয়াছেন। কিন্তু পত্র লিখিয়াও এখন উত্তর নাই। এই সকলই লাইব্রেরী-নামের কলঙ্ক !

৩। কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য, গোয়ালবাথান, নহাটা পোঃ, যশোহর। ইহাঁরও কাগজ বন্ধ ; কিন্তু বাকী দেন না বা উত্তর নাই।

৪। ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চাঁদপাড়া, ডুনাগ্রাম পোঃ, বীরভূম। ইনিও ঐ শ্রেণীর।

এবার আর নহে ;—দেখি, এ দৃষ্টান্তেও যদি লোকের চক্ষু ফুটে !

সংবাদ।

—বৃষ্টির অভাবে দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাবড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর যশোহর, রাজসাহী, বগুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি সকল জেলাতেই জলের জন্য কাজ আটকাই-

তেছে। অনেক স্থলে চাস একেবারেই হইতেছে না; কোন কোন স্থলে বা চাস আরম্ভ হইয়াও, জলাভাবে অঙ্কুরেই শুখাইয়া যাইতেছে। চাউলের দর সর্ব্বত্রই মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে; দিন দিনই কলিকাতায় চাউলের দরও বাড়িতেছে। স্থানে স্থানে সম্পূর্ণই দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতার দক্ষিণবর্ত্তী ২৪-পরগণা-ভুক্ত স্থান-সমূহ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অন্নকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অধিক কি, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সংবাদদাতা বলেন যে, "বারিপুর, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতির এলাকাভুক্ত কোন কোন স্থলে লোকে অন্নাভাবে বৃক্ষপত্র ও ফলমূল সিদ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এবং দুর্ভিক্ষ-জনিত চুরি-ডাকাতির বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কোন ভদ্রলোক রাস্তাঘাটে বাহির হইলে, তাঁহার বস্ত্রাদি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন দুরূহ হইয়াছে।" যাইহোক, এসকল ঘটনা সত্য হইলে, বড়ই শোকাবহ বলিতে হইবে। এখন, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ও দেশের ধনী ব্যক্তিগণ ইহার প্রতি বিধানে যত্নবান হউন, এই বাসনা।

—আমেরিকার ডকেটা প্রদেশে প্রেরী নামক ঘাসের এক অতি বিস্তৃত মাঠ আছে। ঘাসগুলি দূরব্যাপী ও অত্যুচ্চ-হেতু তাহার উপর দিয়া সাঁকো করিয়া, তৎপ্রদেশে রেলগাড়ি যাতায়াত করে। সম্প্রতি রেল চলিবার সময় এরূপ একটি শুষ্ক প্রেরি-ক্ষেত্রে কি জানি কি কারণে, আগুন লাগিয়া যায়। উপরে রেল; এবং তাহার নিম্ন ও পার্শ্বে সুবিস্তৃত প্রেরী-ক্ষেত্র প্রচণ্ডবেগে জ্বলিতে থাকে। কাজেই ভয়ানক উত্তাপে রেল-চলা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। স্থানে স্থানে সাঁকোয়ও আগুন লাগিয়া যাওয়ায়, যাত্রীগণ হাহাকার করিতে থাকে। চালক প্রথমে গাড়ী থামাইয়া যদি লোকজনকে বাঁচাইতে পারেন, এরূপ চেষ্টা পান। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা—চারিদিকেই আগুন! অধিকন্তু, গাড়ি দাঁড়াইলেই সে আগুন তাহাতে ধরিয়া যায়! ক্রমে সে উত্তাপ আরোহীগণের একরূপ অসহ্যই হইল; সকলেই হাহাকার আরম্ভ করিলেন। যাইহোক, পরে চালক পুরাদমে সে অগ্নিক্ষেত্র পার হইয়া সেই অর্দ্ধদগ্ধ গাড়ি ও যাত্রিসহিত পরবর্ত্তী ষ্টেসনে পৌছাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দৈবে অনেকেরই জীবন সংশয়।

—নড়াইলের এক 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো' সম্প্রতি বড়ই জব্দ হইয়াছেন। কয়েকজন জুয়াচোর তাঁহার বিবাহ দিয়া দিবে বলিয়া, কলিকাতায় এক পাত্রী স্থির করে; এবং যথা-নিয়মে তাঁহার বিবাহ কার্য্যও সম্পন্ন হয়। কিন্তু এখন জানা যাইতেছে, সে স্ত্রীলোকটী কলিকাতার একজন বেশ্যা; দুষ্টেরা প্রতারণাপূর্ব্বক বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়া, বৃদ্ধের এইরূপে জাতি-মান ধ্বংশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর কলিকাতায় নাকি একটী পূর্ব্ব পক্ষের সন্তানও আছে।

—প্রসিদ্ধ দস্যু-সর্দ্দার তান্তিয়ার এক অদ্ভুত শক্তির পরিচয় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। একজন জমাদার একটী জঙ্গলের সম্মুখে বাসা লইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে তান্তিয়ার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। কিন্তু এমন সময় একদিন নাপিত-বেশে তান্তিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং জমাদার খেউরীর ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সে তৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তখন কথায় কথায় তান্তিয়ার কথা উঠিল; তাহাতে নাপিত-বেশী তান্তিয়া বলিল,—"আমি কিন্তু তান্তিয়াকে ধরিয়া দিতে পারি।" তখন জমাদার যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া বলিল,—'কিরূপে!' গোঁপ কামাইতে কামাইতে নাপিত তখন আস্তে আস্তে সেই খুরখানিকে জমাদারের নাকের উপর বসাইয়া বলিল,—'এইরূপে!" আর তার পরই চম্পট!

—বিলাতের ডিটেক্‌টিভ-পুলিসে ৬ জন স্ত্রীলোক কর্ম্ম করেন। শুনা যায়, তাঁহাদের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া অনেক চোর-বদমাইসই ফাঁদে পড়ে। রমণীর ফাঁদ বিষম ফাঁদ!

—পারিসে এক "মনুমেণ্ট" হইয়াছে, সেটী উচ্চ প্রায় ৯৮৪ ফিট। তার কাছে কোথায় লাগে, আমাদের কলিকাতার "মনুমেণ্ট"! কলিকাতার মনুমেণ্ট সবে ১৬৫ ফিট মাত্র।

—সভ্যদেশের সকলই বিটকেল! সম্প্রতি রুসিয়ার এক যুবতী এই মর্ম্মে সুরতি-খেলার এক বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন যে, সে খেলায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া যিনি জয়ী হইবেন, যুবতী স্বয়ং তাঁহার নাগরী হইবেন। যুবতী গ্রহণাকাঙ্ক্ষীগণকে এক একবার দেখিয়া লইয়া তো লটারিতে নাম উঠাইতে বসিবেন না?

—ফরাসী দেশে লুই গুঁন নামক একজন লোক আছে, তাহার দাড়ির কথা শুনিলে অবাক হইতে হয়। বার বৎসরের সময় হইতে তাহার দাড়ি বাহির হইতে থাকে, এবং দুই বৎসরের মধ্যেই এক ফুট হয়। এখন তাহার বয়সও ৫০ উত্তীর্ণ। দাড়িও ক্রমেই বাড়িয়া ছয় হাতেরও উপর হইয়াছে। সে নাকি হাঁটিবার সময় কাপড়ের কোঁচার মত দাড়ীধরিয়া চলে; এবং বসিয়া থাকিলে কম্ফর্টারের মত দাড়ী গুলিকে গলায় জড়াইয়া রাখে।

—হাবড়ার অধীন ডোমজুরে একজন মাতাল তাহার ভাইয়ের নিকট হইতে ঘর-বাড়ীর ভাগ চায়। কিন্তু সে সময় তাহার মাতাল অবস্থা দেখিয়া ভাই বলেন,—আচ্ছা, কাল ভাগ হ'বে। ভায়ার কিন্তু দেরী সহিল না; সে বলিল,—এখনই চাই। এই বলিয়া সে নিজে নিজেই বাড়ীতে যে কয়েক খানি ঘর ছিল, তাহার অর্দ্ধেক তাহার ভাগে এবং অর্দ্ধেক কনিষ্ঠের ভাগে চিহ্নিত করিল। ভাগ ঠিক হইলেই পরে কহিল,—আমার ভাগে আমার দখল আছে কিনা, সকলে দেখ; আমার জিনিষ আমি যা' ইচ্ছা, করিতে পারি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি একটি দেশালাই জ্বালিয়া ঘরে ধরাইতে গেল। ছোট ভাই বাধা দিতে যাইলে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিল,—আমার ঘর, খবরদার! কাজেই সে নিরুপায় হইয়া পাড়াপ্রতিবেশীগণকে ডাকিতে গেল। কিন্তু তখন ঘর ধূ—ধূ—ধূ!

অনুসন্ধান।

—:০(০)০:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬ সাল। [২০শ সংখ্যা

ঈশ-মহিমা।

বড় হংস সারঙ্গ—চৌতাল।

"(তাঁহার) আরতি করে চন্দ্রতপন,
দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-কারণ
তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা-মগন;
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগ-গীত গগন ছায়,
জলদ্ গায়, জলধি গায়,
মহাপবন হরষে ধায়,
গাহে গিরি-কন্দরে।
কত কত শত ভকত-প্রাণ,
হেরিছে পুলকে গাহিছে গান,
পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম,
টুটিছে মোহ-বন্ধ রে॥"

অদ্ভুত রাণী।

কলিকাতার বড়বাজার; লোকে লোকারণ্য। বেলা প্রায় দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তথাপি লোকের যাতায়াতের বিরাম নাই। মহাজন, খরিদ্দার, দালাল, ব্যবসাদার, ধনী, নির্ধন, গৃহস্থ, দেশী, বিদেশী, নানা প্রকার লোক গা-ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া চলিয়াছে; মানাপমান বোধ করিবার ক্ষমতা নাই। এরূপ সময়ে চারিজন অতিরিক্ত বেহারা সঙ্গে একখানি বড় জাঁকাল পাল্‌কি আসিয়া এক জহুরির দোকানের সম্মুখে রাস্তার উপর নামিল। সঙ্গের একজন চৌবে জমাদার জহুরির দোকানে গিয়া বলিল,—"অমুক স্থানের রাণী স্বয়ং মণিমুক্তাদি ক্রয় করিতে আসিয়াছেন; তিনি এই ফর্দ্দ অনুসারে জহরতগুলি কিনিবেন।"—এই বলিয়া সে একখানি ফর্দ্দ জহুরির হস্তে দিল। দোকানদার বলিল,—"তিনি কোথায় আছেন?" জমাদার উত্তর করিল—"তিনি সকলের সাক্ষাতে বাহির হইবেন না। নীচে রাস্তার উপর পালকির ভিতর আছেন। আপনারা দুই চারি প্রকার নমুনা দেন; আমি দেখাইয়া আসিয়া

আপনাদের সহিত দর চুক্তি করিব এবং রাণীর নিকট হইতে মূল্য আনিয়া দিব।"

জহুরি এই কথা শুনিয়া কয় প্রকার মণি-মুক্তাদির দর বলিয়া নমুনা সেই লোকের হস্তে দিল। দোকানদার দেখিল, জমাদার তাহা লইয়া রাস্তার উপরস্থিত পাল্‌কির আবরণ উন্মোচন করিয়া মুখ বাড়াইয়া সেই দ্রব্যগুলি দেখাইতে লাগিল। বাহকগণ এতক্ষণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মাথার পাগ্‌ড়ি খুলিয়া তাহা দ্বারা পাখার কার্য্য করিয়া লইতেছে, এবং তাহারা পাল্‌কি রাখিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে ছায়া-যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। অতিরিক্ত বেহারা কয়জন পালকির নিকটেই দাঁড়াইয়া আছে। যাহা হউক, জমাদার ফিরিয়া গিয়া জহুরির নিকট বলিল,—"রাণী পছন্দ করিয়া লইয়া অবশিষ্ট এইগুলি ফিরাইয়া দিয়াছেন; আর আর জিনিসগুলি দেন।" এইরূপে তিন চারিবার যাতায়াতের পর জমাদার বলিল,—"রাণী যে জহরতগুলি পছন্দ করিয়া লইয়াছেন, হিসাব করিয়া তাহার মূল্য স্থির করুন; ইত্যবসরে আমি গঙ্গা হইতে এক ঘটি জল আনি। রাণী বড় পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন। তিনি বড় নিষ্ঠাবান হিন্দু বিধবা; কাহারও জল পান করিবেন না। রাণী পালকির ভিতর বসিয়া রহিলেন; বেহারাগণ পালকির নিকট থাকিল। আমি শীঘ্র জল আনি।"—এই বলিয়া জমাদার পালকির ভিতর হইতে একটী ঘটি লইয়া জল আনিবার উদ্দেশে গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ইতিমধ্যে ক্লান্ত বেহারা চতুষ্টয়ও, বোধ হয় পিপাসা-নিবারণার্থ জলান্বেষণে অন্যত্রে গমন করিয়াছিল। অতিরিক্ত বেহারাগণ কেবল পালকির নিকট ছিল; বড় রৌদ্র বলিয়া তাহারাও ক্রমে পার্শ্বস্থিত ছায়াযুক্ত স্থানে গিয়া বসিতে লাগিল। ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতীত হইল; জমাদার জল লইয়া ফিরিয়া আসিল না। আবার এক ঘণ্টা গেল; তথাপি তাহার দেখা নাই। দোকানদারের মনে সন্দেহ হইল, পালকির বেহারাকে তথ্য জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পালকির নিকট বা অন্তরে ৮ জনের মধ্যে একজন বেহারাও নাই। দোকানদারের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। পাল্‌কির আবরণ তুলিয়া দেখিলেন, শূন্য পালকি; আরোহী এবং অন্য দ্রব্যাদি কিছুই নাই। পুলিসে রিপোর্ট গেল; অনুসন্ধানে লোক বাহির হইল। কিন্তু কোন ফল দর্শিল না। জমাদার-রূপী জুয়াচোর প্রায় ১০ হাজার টাকার মূল্যের জহরতাদি লইয়া জহুরির সর্ব্বনাশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।

জীবের দায়িত্ব।*

যখন জীব মূলে শক্তি-বৈষম্যের অধীন হইয়া, নিজ-দেহেও সেই বৈষম্য ক্ষণে ক্ষণে দেখাইতেছে, তখন আর তাহার কর্ম্মের দায়িত্ব কি? যদি দায়িত্ব-কথা আদৌ প্রয়োগ করা যায়, তবে আমরা কহি, এই শক্তি-বৈষম্যে উৎপাদিত হইয়া যে বস্তুতে যে কার্য্য দেখা যায়, ও যত টুকু পরিমাণে দেখা যায়, সেই তাহার দায়িত্ব। বৃক্ষের দায়িত্ব আর কি হইবে!—শুদ্ধ প্রাণভাবের কার্য্য মাত্র; আর কিছুই নহে। প্রোটোজোয়ার কি দায়িত্ব হইবে? তাহাদের মধ্যে যাহাদের দেহে যতটুকু চৈতন্য জাগ্রত আছে, ততটুকুর কার্য্যের নামই তাহাদের দায়িত্ব। ঐরূপ শেষে মনুষ্যে যাহার দেহে যতটুকু চৈতন্য জাগ্রত আছে ততটুকুতে যে কার্য্য সেই দেহে দেখাইবে, সেই তাহার দায়িত্ব। পৃথিবী ঘুরিতেছে, সূর্য্য রশ্মি দিতেছে; তজ্জন্য জীবের সুখ বা দুঃখ হউক, কাহারও কাছে তাহাদের জবাবদিহি হইতে হইবে না; অথচ তাহাদের দায়িত্ব হইয়া যাইতেছে, কেহই আটকাইতে পারি-

* পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তেছে না। সকলেই ধস্তাধস্তি করিতে করিতে, অথচ সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্য ভাবে, সেই পরম সুস্থির দিকে অথবা পরম সাম্য বা পরম শান্তির দিকে চলিতেছে। ব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধই আপন-আপন দায়িত্ব, চিত্রপট উদ্ঘাটনের ন্যায়, ক্রমে ক্রমে দেখাইতেছে; অথচ কিছুই জানিতেছে না।

আমাদের কথায় অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, কর্ম্ম করিলেই তো একটা ফল হওয়ার প্রয়োজন করে; এবং সেই ফল কখনও বা আমরা এই পৃথিবীতেই দেখিতে পাই। আর, াহার ফল আমরা দেখিতে পাই না, তাহা যে বিলম্বে (অর্থাৎ পরকালে গমন করিলে) ফলিতে পারে, তাহারও সঙ্কেত আমরা উক্ত পরিদৃশ্যমান ফল দেখিয়া কতক উপলব্ধি করি, এবং জীবের যে অনুতাপাদি হয়, তাহাতেও কতক জানিতে পারা যায়। পরকালের ফলভোগ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, জীবের চিত্তে তবে য়ে অনুতাপ হয় কেন? ঐ সকল কথার ত্তরে আমরা বলি, সত্য বটে কর্ম্ম হইলেই াহার ফলও থাকিতে পারে; কিন্তু সেই কর্ম্মকে আমরা বহির্জগতের সহিত ঘাত বলিয়াও কহিতে ারি। ঘাত হইলেই তাহার প্রতিঘাতও াছে, আবার সাম্যও আছে। কর্ম্মের ফলও াই বহির্জগতের প্রতিঘাত মাত্র। কর্ম্ম যদি তি বেগে হয়, তাহার ফল অর্থাৎ প্রতিঘাতও ান বেগে হইবে; এবং কর্ম্ম যদি অল্প বেগে হয়, ও অল্প প্রতিঘাতে তাহা উল্‌টাইয়া দিবে। র্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাত যেমন বাহ্য-শরীরে পন্ন হয়, অন্তর্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতও ন্তর্জগতের ভাবের সঙ্গে হইয়া থাকে। যেমন হ্য জগতে কর্ম্মফল দেখি, তেমনি অন্তর্জগতে নুতাপ' নামক প্রতিঘাতব্যঞ্জক দৃশ্যও খিয়া থাকি। ঐ অনুতাপ যত বেগে কোন র্য্য করিবে, তত বেগেই উৎপন্ন হইবে। কোন ভাবকে সাম্যে আনিবার পথ (Medium) মাত্র। শুদ্ধ অনুতাপ কেন, চিত্তের অনেকগুলি ভাব আছে, যাহারা কেবল পন্থার কার্য্য করে; যথা, আত্মগ্লানি, বিবেক ইত্যাদি। প্রকৃত প্রস্তাবে চিত্তের যে গুলি বিপরীত ভাব, তাহারাই পরস্পরকে সাম্য করিয়া থাকে। যে ভাব যখন প্রবল হয়, সেই পুংভাব ধারণ করে; এবং তাহার বিপরীত ভাব দুর্ব্বল থাকিয়া স্ত্রীভাবে থাকে। যদি ক্রোধ প্রবল হয়, তখন সেই তাহার পুংভাব; তাহার বিপরীত ক্ষমাভাবই স্ত্রীভাব। যখন ক্ষমা প্রবল, তখন সেই পুংভাব ও ক্রোধ স্ত্রীভাব ধারণ করে। এইরূপে প্রত্যেক আধ্যাত্মিক ভাব তন্ন তন্ন করিয়া যদি দেখা যায়, তবে অনুভূত হয় যে, আমাদের চিত্তেই ঐ দুই ভাব (পুং ও স্ত্রী-ভাব) আছে, এবং তাহাদের মিল হইতে যে পথের প্রয়োজন, তাহাও বিদ্যমান আছে। পদার্থ-শক্তিতেও যেমন সাম্যের পন্থার প্রয়োজন, এবং তাহাতেই ঘাত ও প্রতিঘাত নির্দ্দেশ হয়, অন্তর্জগতে অনুতাপাদি ভাবেও সেই ঘাত-প্রতিঘাত অনুভূত হয়। সুতরাং অনুতাপাদি কার্য্য যে, কোন ভাব প্রবল হইলে, অধিক বিলম্বে আরম্ভ হইবে, ইহা আমাদের চিত্তে ধারণা হয় না। স্বীকার করি, অনুতাপ অনুভব না হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাহার কার্য্য হয় না, এ কথা বলিতে পারি না। শুদ্ধ অনুতাপ কেন, অনেক ভাব, অনুভূত না হইয়াও, কার্য্য করিয়া থাকে। বোধ করুন, একজন মার খাইয়াই রাগিয়া উঠিল; তখন দেখুন, প্রহারের স্পর্শানুভবের পর হইতেই তাহার ক্রোধ হওয়া পর্য্যন্ত কতগুলি ভাব অনুভূত না হইয়াও, তাহাদের কার্য্য হইয়া যায়; যথা, আত্মাভিমান, বিবেক, প্রতিশোধ-ইচ্ছা, ইত্যাদি। চপেটাঘাতের জ্বালা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য জন্মাইয়া গেল; সেই বেগ তাড়িতের অপেক্ষাও দ্রুতবেগে পন্থার ভিতর দিয়া গমন করিতে করিতে কত

ভাবই দেখাইতে লাগিল। কোথায়ও বা উহার বেগ অনুভূত হইল, কোথায়ও বা হইল না। কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাত সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল; শেষে ক্ষমায় যাইয়া নিরস্ত হইতে চলিল। উচ্চ জীব-দেহে বৈষম্য হইলেই তাহার তরঙ্গ দুই দিকে ধাবিত হইতে থাকে;—এক দিক বহির্জগতে ও অন্য দিক আধ্যাত্মিক জগতে। এমন অবস্থায় যাঁহারা অনুতাপাদির জন্য পরকালে কর্ম্মফল-ভোগের সম্ভাবনা বলেন, তাঁহাদের প্রথমে দেখান উচিত যে, জীব-দেহে অধ্যাত্ম জগৎ যেরূপ বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধে সম্বন্ধ থাকে, প্রাণাত্যয়েও তাহার সেই সম্বন্ধ যায় না। যখন দেখিতেছি যে, সম্বন্ধ না থাকিলে কার্য্য ও ফল হয় না কিম্বা ফলের সঙ্গে অনুতাপও হয় না, তখন সম্বন্ধই প্রথমে প্রমাণ করা উচিত। তাহার পর যদি কেহ পরকালে অনুতাপ হওয়া না দেখাইতে পারেন, তবে ইহ-জন্মের, আধ্যাত্মিক বা অনাধ্যাত্মিক ভাবের ও কর্ম্মের ফলভোগ যে পরকালে হইবে, একথা তাঁহাদের পক্ষে বলা অযুক্ত। আমি আজি এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলাম, দশ দিন পরে সে মরিয়া গেল; আমার অনুতাপ হইল। আজি দয়া-পরবশ হইয়া দান করিলাম, দুই বৎসর পরে আমি নিজে খাইতে পাইলাম না; আমার অনুতাপ হইল। এরূপ স্থলে কর্ম্মফলের সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুতাপ হয় সত্য ও সেই অনুতাপ বিলম্বে ঘটিতে দেখা যায় বটে; কিন্তু মৃত্যুর পরও কি সেই সম্বন্ধ বজায় থাকে যে, অনুতাপ হইতে পারিবে? আমাদের কথা তাহা নহে। দেহে বৈষম্যের ভাব প্রকাশ হইতে ধরিলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তির উপায়ও চলিতে থাকে। সুতরাং অনুতাপাদি ভাব, ও সেই ভাবের বল কমিয়া আসিলেই চিত্তকে নিজ ভাবাপন্ন করে। ফলতঃ কহিতে গেলে আমরা যে কহি, কর্ম্মের ফল বিলম্বে ঘটিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ফল অর্থাৎ প্রতিঘাত সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে। পরে কর্ম্মের বেগ কমিলেই বিবৃদ্ধ গতিতে কিয়ৎক্ষণ ফল পরিদৃশ্যমান থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে; অন্যান্য বলের সাহায্যে সেই ফল বিলীন হইয়াও যায়। উপরে যে অনুতাপের দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহাকে অপরেও কর্ম্মের ফল বলিয়াও কহিতে পারি। অর্থাৎ মৃত্যু দেখিয়া চিত্তে ভয় হইল (রাজারই হউক আর ধর্ম্মেরই হউক)। পরে যখন অনুতাপ আসিল তখন জানা গেল যে, ভয় সাম্যে যাইতে ধরিবে, অর্থাৎ সাহসে গিয়া বিলীন হইবে।

এখানে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, এমনও দেখা যায় যে, ভাবের সাম্য অনুতাপ হইলেও তো হয় না! এটী ভ্রমের কথা। কারণ চিত্তের ভাবান্তর হইলেই প্রথম ভাবের উপশম হইবেই হইবে। চিত্ত দুইভাবে এক সময় কখনও থাকিতে পারে না। স্বীকার করি কর্ম্মের চিন্তা, ভীতির ও উদ্বেগের কারণ হয়, কিন্তু সে স্থলেও আবার দ্বিতীয়বার বৈষম্য নিবন্ধন ঘাত-প্রতিঘাতের কার্য্য আরম্ভ হয়; এইরূপে অবশ্য এক সময় মন-সাহসে গি দাঁড়ায়; তখন আর তাহার চিন্তা কিছুই করি পারে না। মোটের উপর কহিতে গেলে, পুং ভাবের সাম্য স্ত্রীভাবে, এবং স্ত্রীভাবের সা পুংভাবে হইয়া থাকে। পুংভাবই স্ত্রীভা উপাস্য এবং স্ত্রীভাবই পুংভাবের উপা চিত্তের আবার কতকগুলি ভাব আছে; যথা, ও তদ্বিপরীত মোহ; ইচ্ছা ও তদ্বিপরীত ঔ ইত্যাদি। ইহাদের বৈষম্যের ফল গুরুতর দেখা যায় না। কিন্তু সে গুলি চিত্তের অপর ভাবের অগ্র-পশ্চাৎ হইয়াও কখন কখন করিয়া থাকে।

বারাঙ্গনার অভিসম্পাত।

(শেষাংশ।)

যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদিগকে অভিস করিতে আরও ইচ্ছা হয়। তাঁহারা প

প্রশ্রয় দেন কেন? তাঁহারা চেষ্টা করিয়া এই সম্পত্তিশালী কুকুর-স্বভাববিশিষ্ট শূকরদিগকে নিবারণ করেন না কেন? কুকুর-স্বভাব বলিব না তো কি! তুমি জমীদারের ছেলে; তুমি টাকা অর্থ সমস্তই দিতেছ। কিন্তু তোমাকে দেখিলে আমার শরীর জ্বলিয়া যায়, তুমি পশুর মত আমাকে ছাড়িতে চাও না। তোমাকে কতবার পিতৃ-মাতৃ সম্বোধন করিয়া গালাগালি দিয়াছি; কিন্তু তবু তুমি—কি ঘৃণিত—আবার আমায় অধিক তোষামদ করিয়াছ! এখন আবার তোমাকে যে কি বলিয়া গালাগালি দিব, আমি তাহার কথা পাইতেছি না।

স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের চতুর্থ হেতু, কুশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-সম্প্রদায়। সকল যুবকের কথা বলি না। যে সকল শিক্ষিত যুবকের কথা আগে বলিয়াছি, তাঁহার মত সকলকে পিতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায় সেরূপ কয়টি? কত স্কুল-কালেজের বাবু আমার নিকট আসিয়াছেন; কিন্তু ধিক্ তাঁহাদের! তাঁহারা পশু হইতেও অধম। কি কৌশলে গৃহস্থের কন্যার সর্ব্বনাশ করিতে হয়, তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা রাস্তাঘাটে স্ত্রীলোক দেখিলেই স্থির থাকিতে পারেন না। পিতা সঙ্গে থাকিলেও পাশ কাটিয়া একবার দেখিতেই হইবে। ইহাঁদের প্রকৃতি ও লালসা অদম্য। যাহারা মূর্খ, তাহারা বরং ভাল; কিন্তু শিক্ষাগ্রস্থ বাবুগণ অতি ভয়ানক।

ইহাঁদের মধ্যে আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বেশ্যার নাম করিলে জ্বলিয়া যান; কিন্তু গৃহস্থের কন্যা, বধূ, স্ত্রীর প্রতি ইহাঁদের লালসা। নানা প্রকারে সুবিধা খুঁজিয়া তাহাদের মন ভুলাইতে ইহাঁরা চেষ্টা করেন। যদি গৃহস্থের গৃহের প্রতি দৃষ্টি করিতে ইহাঁদের নিবারণ করা যায়, ইহাঁরা তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দেন, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু এইরূপে দেখিতে দেখিতে ক্রমে চিন্তা করেন; আর, চিন্তা করিতে করিতে সমস্তই অল্পে অল্পে আসিয়া পড়ে। শুনিয়াছি,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহ, সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশে বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি, আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে চরম অবস্থা। ইহাদের মধ্যে আর কতকগুলি লোক এইরূপ দেখাকে দোষ মনে করেন; কিন্তু মনে মনে নানা-প্রকার ভাবিয়া থাকেন। পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, ইহাঁদিগকেও তাঁহারা বিমূঢ়াত্মা বলেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসাস্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥"

তাঁহারা বলেন, যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় সকল চিন্তা করিয়া থাকে, সে মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া অভিহিত।

স্ত্রীলোকের দোষ কি? আমি বেশ্যা হইয়া বিলক্ষণ জানিয়াছি, স্ত্রীলোক কখনও আপনা হইতে মন্দ হইতে পারে না। ভগবান আমাদিগকে লজ্জা দিয়াছেন। আমরা কখনও কোন পুরুষকে প্রথমে কিছুতেই প্রলোভন দেখাইতে পারি না। এমন কি, কোন স্ত্রীলোক কখনও স্বামীর সহিত প্রথমে কথা কহেন না। ইহাই আমাদের স্ত্রী-স্বভাব। কিন্তু পতঙ্গ যেমন আলো দেখিলে স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ আমাদের মধ্যে যাহারা পিতা-মাতার শাসনে নাই, তাহারা রূপ দেখিলে ছুটিয়া যায়। তথাপি আগে কিছুই দেখাইতে পারে না। দুষ্ট লম্পট পুরুষ যখন প্রলোভন দেখায়, তখন অনেকে সেই প্রলো-

ভনে পড়িয়া যায়; আর উঠিতে পারে না। সে দোষ আমাদের নহে। যদি পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব আমাদিগকে সাবধানে রক্ষা করেন, যদি পুরুষেরা আমাদিগকে প্রলোভন না দেখাইয়া জননীর মত ভাবেন, তবে কোনও স্ত্রীলোক কুপথগামী হয় না। আধুনিক সমাজে নানা-প্রকার বিকার ঘুটিয়াছে। তথাপি দেখিয়াছি, নির্ল্লজ্জ স্ত্রীলোকে দেখিয়াও যদি পুরুষ নিজের সম্মান রক্ষা করিয়া রমণীর দিকে না চাহিয়া, কোনরূপ প্রলোভন না দেখাইয়া চলিয়া যান, তবে রমণী অন্য পুরুষের নিকট নির্ল্লজ্জা হইয়াছে ভাবিয়া মৃতপ্রায় হয়। যদি পুরুষ ভাল হয়, তবে স্ত্রীলোক অতি সহজেই কর্ত্তব্যপরায়ণা হইতে পারে। স্ত্রীলোক পুরুষের দেখিয়া অতি সহজে চরিত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে। তাহা না হইয়া পিতা-মাতা আমাদিগকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে দেন। রাস্তা-ঘাটে যাইবার সময় গাড়ীর দোর খুলিয়া লইয়া যান; ছাদে উঠিয়া বেহায়া পুরুষের সম্মুখে বেড়াইতে আপত্তি করেন না। সুতরাং আমরা মন্দ হইব না তো কে হইবে? যদি অন্তঃপুরে রাখা দোষ মনে কর, তবে না হয় ইংরাজদের মত একবারে সমস্ত পরিবর্ত্তন কর। কিন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকের মঙ্গল কখন সাধিত হইবে না; চরিত্রের পবিত্রতা কখন রক্ষা হয় না। আর, যদি এরূপ স্বাধীনতা না দিতে চাও, যদি অন্তঃপুরে রাখাই উচিত বিবেচনা কর, তবে রাস্তা-ঘাটে সকলের সমক্ষে এরূপে বাহির করিও না। তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা! তোমরা যদি এরূপ নির্ল্লজ্জা হইতে বল, তবে আমাদের দোষ কি? তখন পুরুষের প্রলোভন আমরা দমন করিব কিরূপে?

আর একটা কথা। অনেক গৃহস্থ বলেন,—"ও বিদেশী লোক—ওর নিকট লজ্জা কি?" কিন্তু এটি কি দোষণীয় কথা! আমি একজন অচেনা লোকের নিকট নির্ল্লজ্জ ব্যবহার করিলাম, কিন্তু সে ব্যক্তি সমস্ত স্ত্রী-জাতির উপর সেই দোষারোপ করিল। কলিকাতা সহরে ইহা প্রায়ই দেখা যায়। এখানকার অধিবাসী অধিকাংশ ভদ্রবাড়ীর স্ত্রীলোক অন্য পুরুষকে প্রায়ই লজ্জা করেন না; বলেন.—"ও বিদেশী; উহাকে লজ্জা করিলে চলিবে কেন?" কিন্তু কতকগুলি নির্ল্লজ্জ পরিবারের জন্য কলিকাতার স্ত্রীলোক-মাত্রেরই নানা-প্রকার দোষ আছে, প্রায় অধিকাংশ লোকের মুখেই ইহা শুনা যায়। এক জনের দোষে কখন কখন সমস্ত দল পর্য্যন্ত দোষী হয়। এইরূপ যদি তোমার কার্য্যে অন্য পাঁচ জনের কতদূর ইষ্টানিষ্ট হইতেছে ইহা ভাবিয়া দেখ, আর সকল পুরুষে যদি নিজের পুরুষত্ব রক্ষা করিয়া চলে, তবে অল্প দিনেই সমস্ত স্ত্রীলোকের চরিত্র সৎ হয়। যদি স্ত্রীলোক পুরুষের সমালোচক হয়, পুরুষের চরিত্র ভাল কি মন্দ ইহা বিচার করে, তবে বোধ হয়, অতি পশুর চরিত্রও শীঘ্র সৎ হইয়া উঠে। যতদিন স্ত্রীলোক দেখিয়া লোকে প্রকৃত সম্মান করিতে না শিখিবে, ততদিন জাতির হিত সাধিত হয় না। স্ত্রী যদি স্বামীকে বলেন, আমার সন্তোষার্থ তোমাকে আমার গ্রামের ঐ কয়েকটি লোকের দুঃখ যাহাতে দূর হয় তাহাই করিতে হইবে, তখন স্বামীর চতুর্গুণ বল হয়, উৎসাহ হয়। যে স্ত্রীলোক দ্বারা সমাজের এত উপকার হইতে পারে, তাহাদিগকে যাহারা উৎসন্ন করে তাহাদের মত সামাজিক শত্রু আর কে হইতে পারে?

স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা, বুদ্ধিমতী হইলে স্বামীর নূতন উৎসাহ জন্মাইয়া দেয়। সমস্ত প্রবৃত্তি উগ্র, প্রচণ্ড। অথচ স্ত্রীর সন্তোষের জন্য তোমরা কেবল সেই সমস্ত প্রবৃত্তি চালিত করিতেছ। কেবল রিপু-চরিতার্থতায় তাহা পরিতৃপ্ত হইল না; কিন্তু সেই প্রচণ্ড বল কোন সামাজিক হিতের জন্য নিযুক্ত হইলে তাহাতে সমাজের কত উপকার সাধিত হয়, বল দেখি! স্ত্রীর সন্তোষের জন্য যখন লোকে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত

হয় না; এমন কি, বেশ্যার তৃপ্তির জন্য নিতান্ত কাপুরুষও যখন অসম সাহসিক কার্য্য করিতে পারে; তখন সতী গুণবতী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিতে সমাজ-হিতকর গ্রাম-হিতকর কার্য্য করা কি বড় দুঃসাধ্য?

যে অধম, যে চণ্ডাল, যে শূকর, সেই কেবল এইরূপ স্ত্রীকে অধঃপাতিতঃ করে। তাহাকে কি বলিয়া অভিসম্পাত করিব?

সংসারে যাহা যত সুন্দর, যত্ন না করিলে, তাহা তত শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। প্রভাতের শিশির-বিন্দু একটি ধূলিকণায় নষ্ট হয়—একটু বাতাসে ঝরিয়া পড়ে। যে ফুলের যত সৌন্দর্য্য, সেটি তত অল্প কারণে নষ্ট হয়। আবার পচিয়া উঠিলে সেইরূপ দুর্গন্ধ হয়। স্ত্রীলোক সংসারে ফুলের মত। যত্নে আদরে রাখিলে সমাজ সৎগন্ধে বিভোর হয়। নষ্ট করিলে দুর্গন্ধে কেহ তিষ্ঠাইতে পারে না। হায়, এই পশু-সন্তানগণ একথা বুঝে না কেন? কেন উহারা স্ত্রীলোকদিগকে নষ্ট করিয়া থাকে!

আমি বেশ্যা। কিন্তু এই কুশিক্ষিত যুবকদিগের কথায় আমারও লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইত। এখনও আমি এই দুর্দ্দান্ত জন্তুদিগকে যত ভয় করি, যমকেও এত ভয় করি না।

আমাদের সর্ব্বনাশের আর একটি হেতু, লেখা-পড়া। হায়, যদি বালিকা-কালে লেখা-পড়া না শিখিতাম, তবে আমার বুঝি এ সর্ব্বনাশ হইত না। যাহার সহিত বিবাহ হইবে, লেখা পড়া না জানিলে বিবাহ করিব না সে এই বলিয়া পিতা-মাতার সমক্ষে ভয় দেখায়। কিন্তু লেখা-পড়া কি কেবল চিঠি লেখার জন্য? ফলে, ইহাতে আমাদের হয় কি? যুবকগণ স্কুল-কালেজে পড়িয়া কতদূর চরিত্রসংযত রাখিতে পারে; তা আমাদের কর্ত্তব্য তো অন্য কথা! বালিকা বয়সের একটা কথা মনে পড়িল। আমার যখন ৯ বৎসর বয়স, তখন একজন ব্যক্তি আমায় পরীক্ষা করেন। আমি কিছু শিখিয়াছি কিনা, তাই জানা তাঁহার ইচ্ছা। প্রথমে 'চারুশিক্ষা' হইতে একটা দ্বীপের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে, তিনি আমাকে "দ্বীপটি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আধার" ইহা বুঝাইতে বলিলেন। তাহাতে আমি কথার মানে বলি। তিনি ভাল করিয়া বুঝাইতে বলিলে আমি পারি নাই। তাঁহার কথাগুলি আমার এখনও মনে আছে। তিনি সেই উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—"মা, গৃহধর্ম্মে তোমরা লক্ষ্মী; পতিভক্তি, গুরুজন-সেবা, সন্তান-প্রতিপালন প্রভৃতি গুরুতর ভার তোমাদের উপরে। এই দ্বীপের কয়টি গাছ আছে এ জানিয়া কখনও কোন উপকার হইবে না।" আর, যে সমস্ত স্কুল-ইন্স্পেক্টার এই সমস্ত পুস্তক ধরাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অনেক তিরস্কার করিলেন। আমার পণ্ডিত মহাশয়ের কাছেও দেশের দুরবস্থার কথা অনেক বলিলেন। পরে আমাকে রামায়ণ হইতে একটা স্থান পড়িতে বলিলেন। যেখানে রাম সীতাকে বনে যাইতে নিষেধ করিতেছেন ও সীতা স্ত্রীর ধর্ম্ম কি তাহাই রামের নিকট বলিতেছেন, সেই খানটা। আমি তখন নয় বৎসরের বালিকা। হায়, আমার এখনও বেশ মনে আছে, আমি প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, সেরূপ পুস্তকও আমাদের কেহ দেয় না, সেরূপ শিক্ষকও কেহ নাই। আমাদের মধ্যে যিনি বেশী পড়েন, তিনি নাটক-নভেল পাঠেই কাটাইয়া থাকেন।

এই নাটক-নভেল লেখকগণ আমাদের অসৎপথ-গামী করিবার আর একটি কারণ। যিনি প্রধান নভেল-লেখক, তাঁর বই পড়িয়া সমাজে যে কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহ দেখে না। তাঁর মতিবিবি পড়িতে আমি বড় ভাল বাসিতাম। মতিবিবি কেমন কপাল-কুণ্ডলাকে গহনা পরাইয়া গেল। বেশ্যা হইয়া যদি এরূপ হওয়া যায়, তবে মন্দ কি? তাঁর

শৈবলিনী পড়িতে পড়িতে ইচ্ছা হয়, শৈবলিনী হই। শৈবলিনী পাপীয়সী। তাহার যে নরক-ভোগটা দেখাইয়াছেন, সেটা মুখের কথা—ফাঁকা উপদেশ। সে উপদেশের জোর কিছুই নাই। আর, যে সব বাবু আমার কাছে আসিতেন, তাঁদের মুখে শুনিয়াছি, প্রতাপ সাজিতে অনেকেরই ইচ্ছা। যিনি জীবনে কখনও ভালবাসা উপলব্ধি করেন নাই, প্রতাপ পড়িয়া তিনি দুই একটি বাল্য-সখী খুঁজিয়া লন; আর তাঁহার প্রেমে আকুল হন। এই সব লোক প্রায়ই কবি। কবিতায় থাকে,—হা-হুতাশ। যদি বই-খানি কোন পরকীয়া স্ত্রীর হাতে পড়ে, তবে যার জন্য এত কাঁদি, সেই 'কঠিন রমণির হৃদয়ের পটে' ইহা প্রতিধ্বনিত হইবে। যদি ইহা না হইবে, তবে ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু-বান্ধব অগ্রাহ্য করিয়া, সমাজ পায়ে ঠেলিয়া, নিজ-স্ত্রী সত্বে 'পরের' স্ত্রীর জন্য প্রাণ যায়, বুক যায়—হায়! হায়! এ সব কেন? শুনিয়াছি, এই কবি-সম্প্রদায় বড় ভয়ানক লোক। ইহাদের কবিতা যদি কাহারও না ভাল লাগে, তবে তাঁহার হৃদয় নাই। ইহাদের মানসিক ব্যভিচার জন্য ইহাদিগকে পুরুষ-বেশ্যা বলিয়া সুবুদ্ধি লোকে কেন যে ঘৃণা না করেন, বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, নভেলে, উপন্যাসে আর এই কবিতায় পাপটা বড় রঞ্জিত করিয়া আঁকা হয়। আর, যাহাদের চরিত্রে দোষ আছে, যাহারা পাপের ভীষণতায় কখনও হৃদয় পুড়িতে দেখে নাই, তাহারা পাপকে যতই মন্দ বলুক, তাহারা মুখে মন্দ বলিবে, কিন্তু কাজে সুন্দর বলিয়া আঁকিয়া ফেলিবে। যদি পাপের চরিত্রে ঘৃণা জন্মাইতে না পার, তবে ঐরূপ চরিত্রে হাত দিও না।

আমি বেশ্যা। তুমি উপর হইতে আমার চাকচিক্য দেখিবে। মনে করিবে, আমি বড় সুখী। তুমি মুখে আমার নিন্দা কর, কিন্তু আমার যাতনা যদি অন্তরে অনুভব না কর, তবে এমন করিয়া পাপ আঁকিও না, যাহার সহিত লোকের সহানুভূতি হয়। অনেক কালেজের ছাত্র আমার কাছে আসিত। একদিন দুই জনের তর্কের সময় বিলাতি এক কবির কথা শুনি। এক রাজার তিন মেয়ে ছিল। প্রথম দুটি কপট, ব্যভিচারিণী; তৃতীয়টি ধীর, শান্ত, সরল। বৃদ্ধ-রাজা প্রথম দু'জনের চাতুরীতে ভুলিয়া গিয়া তৃতীয়টিকে কিছুই দিলেন না। কিন্তু সে কবি আঁকিয়াছেন, প্রথম দুজনের চিত্র—যেন জ্বলন্ত পাপ! স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের দাড়ী উপড়াইয়া লইল, নখ দিয়া চক্ষু তুলিয়া ফেলিল, কি ভীষণ চিত্র! কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে পড়িতে যেন মনে হয়, কখনও মতিবিবি হই, কখনও শৈবলিনী হই।

শুনিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী পুস্তকে পাপের চিত্র দেখিয়া নিজ-হৃদয়স্থিত পাপেচ্ছা পর্য্যন্ত দমিত হইয়া যায়!

সর্ব্বশেষে আমাদের জাতির প্রবৃত্তিকে দোষ দিই। হায়, আমরা প্রলোভনে কেন মুগ্ধ হই! জানি, পুরুষ কতরূপে প্রতারণা করে; তথাপি বুঝিয়াও বুঝি না।

যে সব স্ত্রীলোক বড় রহস্যপ্রিয়, আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সহজেই তাহাদের পতন হয়। যাহারা সকলের সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে ভাল বাসে, হাসিতে হাসিতে ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, ফলে যাহাদের একটুও গাম্ভীর্য্য নাই, তাহাদের মন্দ হইবার বিলক্ষণ আশঙ্কা।

যদি সমাজ এই সমস্ত কর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদিগকে শাসন না করেন, যদি প্রকৃত বেশ্যা কিরূপ ক্লেশ অনুভব করে ইহা স্ত্রীলোকদিগকে বেশ উপলব্ধি করিয়া না দেন, যদি জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খকে না উপদেশ দেন, তবে দেশ ক্রমে বেশ্যা-পূর্ণ হইবে। এই জাতির কলঙ্কে নাম ডুবিয়া যাইবে।

শ্রী— /

জুয়াচোরের বাহাদুরী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গোপাল যশোলাভের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। এই পৃথীবীতে ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা প্রভৃতি সমস্ত লোকই বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত লোলুপ; সকলেই বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনকাল পর্য্যন্ত কেবল বিদ্যা-শিক্ষায় কালাতিপাত করেন। আর, কেহ বা আজীবন বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বিদ্যা-শিক্ষার সহিত আমাদিগের বিদ্যা উপার্জ্জনের বিশেষ প্রভেদ আছে। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে বিদ্যা-শিক্ষা করেন, আমাদের উদ্দেশ্য তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তাঁহারা জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত বিদ্যা-শিক্ষা করেন; আর, আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষার মূলই, অর্থ-উপার্জ্জন। তাঁহারা অর্থ অপেক্ষা জ্ঞানকেই বহুমূল্য জ্ঞান করেন, আমরা অর্থকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। যে উপায় অবলম্বন করিয়া আপন হৃদয়কে জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে পারা যায়, তাঁহারা সেই উপায়ের অনুসন্ধান করেন; আর, আমরা তাহার পরিবর্ত্তে যে উপায় দ্বারা অর্থে বাক্স পরিপূর্ণ করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা দেখিতে থাকি।

গোপাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। বিনা ক্লেশে ও কাহারও বিনা সাহায্যে, কেবল মাত্র পরীক্ষার জোরে, তিনি কোন সরকারী আফিসে একশত টাকা বেতনে একটী চাকরির যোগাড় করিয়া লইলেন। পুস্তক সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কলম হস্তে তাঁহার উদ্ধতন কর্ম্মচারীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কেবল যত্ন করিতে লাগিলেন। সাহেব তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিল; সকলেই তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল।

গোলকচন্দ্র এই সকল দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; তাঁহার যত্নের উপযুক্ত ফল ফলিয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি একটী সদ্বংশজাত সুপাত্রীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার সহিত গোপালের পরিণয়-কার্য্য সমাধা করিয়া দিলেন।

এই সকল দেখিয়া সুন্দরীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; পুত্র ও পুত্রবধু লইয়া তিনি মনের সুখে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কোন ছুটি-উপলক্ষে আফিস বন্ধ হওয়ায়, এক দিবস গোপাল বাটী আসিলেন। গোলকচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গোলকও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং কহিলেন,--"গোপাল তুমি বাটী আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। আমি মনে করিতেছিলাম, তোমাকে একবার বাটী আসিবার নিমিত্ত লিখিব। যাইহোক অদ্য তুমি বাটীতে থাকিও; কোন স্থানে গমন করিও না। তোমার মাতাও যেন বাটীতে থাকেন। আমি আহারান্তে তোমাদিগের বাটীতে যাইব। বিশেষ আবশ্যক আছে, জানিও। কিন্তু উহা এখন বলিব না; সেই সময়েই সমস্ত জানিতে পারিবে।"

এই কথা শুনিয়া গোপাল বাটীতে আসিলেন; এবং তাঁহার মাতার নিকট গোলকের কথা বলিলেন। পরে আহারান্তে তাঁহারা বসিয়া গোলকচন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিবা দুইটা বাজিলে, কতকগুলি কাগজ হস্তে গোলকচন্দ্র আসিয়া গোপালের বাটীতে উপনীত হইলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া গোলককে অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক সেই স্থানে বসাইলেন। গোপাল ও সুন্দরী তাঁহার নিকট বসিলেন। গোপালের স্ত্রীও, অন্য সকলের অজানিত ভাবে, তাঁহাদের পশ্চাৎভাগের ঘরের ভিতর, দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিতে লাগিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে দরজার

সামান্য ফাকের ভিতর দিয়া একটীমাত্র চক্ষু বাহির করিয়া উহাঁদিগকে দেখিতেও ত্রুটি করিলেন না।

পরস্পরে অনেক প্রকার কথা-বার্ত্তা হওয়ার পর, গোলকচন্দ্র গোপালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"গোপাল, আজ আমি তোমাদিগের বাটীতে যে কার্য্যের নিমিত্ত আসিয়াছি, তাহার বিন্দুমাত্রও তুমি অবগত নহ। তোমার মাতা যদিও তাহার সামান্যমাত্র অবগত আছেন, কিন্তু সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জানেন না। আমি তোমার স্বর্গীয় পিতার নিকট ভয়ানক ঋণে জড়িভূত আছি; কিন্তু আজ আমি সেই ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি বলিয়া, আমার মনে আর সুখ ধরিতেছে না; হৃদয়ে আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। দেখ গোপাল, এখন আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্ দিন যে মৃত্যু আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিবে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আর, এখন তুমিও উপযুক্ত হইয়াছ; সংসারের উপর মায়া জন্মিয়াছে; ভাল মন্দ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছ। সুতরাং তোমাদিগকে আর এখন অন্ধকারে রাখা অনুচিত। এখন তুমি তোমার নিজের বিষয় বুঝিয়া লও; আমি তোমাদিগের ভার হইতে অবসর গ্রহণ করি।

"গোপাল, যখন তোমার বয়ঃক্রম সাত বৎসর, সেই সময় আমার একমাত্র প্রাণের বন্ধু ও তোমার পিতা রজনীকান্ত, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি আমাকে নিভৃতে ডাকাইয়া এই ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ আমাকে দিয়া যান; ও বলিয়া যান যে, এই সকল কাগজ তোমার মাতা সুন্দরীর নামে তিনি খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুন্দরী ইহার বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না। আমাকে ঐ সকল কাগজ দিয়া যান সত্য; কিন্তু আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া যান যে, যে পর্য্যন্ত তুমি বড় হইয়া আপন বিষয়াদি ভালরূপ বুঝিয়া লইতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ কাগজ যেন তোমাদিগের হস্তে দেওয়া না হয়। তবে তোমাদিগের যে কোন ব্যয় হইবে, উহা হইতে তাহা আমি নির্ব্বাহ করিব। আমিও তাহাই করিয়াছি। সেই সমস্ত কাগজগুলি এত দিন পর্য্যন্ত আমার নিকটে ছিল; যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা এখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, গ্রহণ কর। আর, আমি যে কেবল ঐ কাগজমাত্রই রাখিয়াছি, তাহা মনে করিও না। উহা আমার নিকট এই আঠার বৎসর আছে। ব্যাঙ্ক হইতে ঐ কাগজের সুদ গ্রহণ করিলে পাছে খরচ করিয়া ফেলি; বিশেষ, তোমার মাতা জানিতে পারিলে আমার নিকট হইতে ঐ সকল কাগজ চাহিয়া লইয়া পাছে কোনরূপে নষ্ট করিয়া ফেলেন;—এই নিমিত্ত এত দিবস আমি উহার সুদমাত্রও আনি নাই। এখন সুদে ও আসলে ঐ টাকা প্রায় ৫১,৬০০ শত হইয়াছে। এখন, তুমি ব্যাঙ্ক হইতে ঐ সকল টাকা আনয়ন করিয়া তোমার ইচ্ছামত স্থানে রাখিয়া দেও; ও পরম সুখে দিনযাপন কর। আমি আর যে কয় দিবস বাঁচি, তোমাদের ভাল অবস্থা দেখিয়া সুখী হই।

"আর, যখন তোমাদিগের যে টাকার আবশ্যক হইয়াছে, এই আঠার বৎসর পর্য্যন্ত তাহা যদিও আমি দিয়া আসিয়াছি সত্য; কিন্তু তাহার একটীমাত্র পয়সাও আমি আমার নিজ হইতে দেই নাই। তোমাদিগের যে কিছু বিষয় আছে, তাহারই উপস্বত্ব হইতে আমি সেই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছি। এই তাহার কাগজ-পত্র, এই তাহার হিসাব। তুমি সময়-মত সমস্ত নিজে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।"

এই বলিয়া গোলকচন্দ্র সেই হিসাবের কাগজ ও কোম্পানীর কাগজগুলি গোপালের হস্তে অর্পণ করিলেন। গোপাল তাঁহার অবস্থার হ[illegible] [illegible]রিবর্ত্তন দেখিয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট [illegible] বলিতে পারি না। সুন্দরীর

মুখ হইতে হঠাৎ কোন কথা বাহির হইল না; কিন্তু চক্ষু দিয়া যেন জলধারা পড়িল। সে জল পড়িবার কারণ কেহ বুঝিতে পারিল না। তবে কেহ বলিল, হঠাৎ অতিশয় আনন্দ হওয়ায় জলধারা বাহির হইল; কেহ বলিল, রজনীকান্তের নিমিত্ত সুন্দরীর শোক-সাগর হঠাৎ উথলিয়া উঠাতেই এই জলধারা বহিল।

গোলকচন্দ্র এইরূপে সমস্ত কাগজ-পত্র, গোপালকে ও সুন্দরীকে বুঝাইয়া দিয়া আপনার বাটীতে গমন করিলেন।

গোলকের চরিত্রের বিষয় যিনি শুনিলেন, তিনিই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গোপাল এই সকল কোম্পানির কাগজ নিজ হস্তে পাইয়া দেখিলেন, ইহা সমস্তই তাঁহার মাতা সুন্দরীর কাগজ; এবং ভাবিলেন,—যখন আমি নিজে যেমন হউক দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছি, তখন এই কাগজগুলি এখন আমার লওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। মাতার কাগজ মাতার নিকটই থাকুক; তিনি পরলোকগত হইলে আমি ভিন্ন উহা আর কে পাইবে! আর, ঐ কাগজের যে প্রায় ২১,৬০০ শত টাকা সুদ হইয়াছে, তাহা বাহির করিয়া ঐ টাকারও কাগজ মাতার নামে খরিদ করিব; এবং উহাও তাঁহারই নিকট রাখিয়া দিব। এই ভাবিয়া গোপালচন্দ্র একজন উকিলের নিকট ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। উকিল বাবু যদিও গোপাল বাবুর একজন বিশেষ বন্ধু বলিয়া পরিচিত, তথাপি তাঁহার বিষয়কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী তিনি গোপালের নিকট হইতেও উপযুক্তরূপ 'ফি' লইতে ভুলিলেন না। যাইহোক, তাঁহারই সাহায্যে গোপাল বর্দ্ধমান-জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে নিয়মিত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলেন; ও সেই সার্টিফিকেটের বলে বেঙ্গলব্যাঙ্কে সেই সকল কোম্পানির কাগজের সহিত আসিয়া আঠার বৎসরের সুদ পাইবার প্রত্যাশায় প্রার্থনা করিলেন। এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যেমন সুদের টাকাগুলি পাইবেন, অমনি তাহার সহিত আর কিছু টাকা তাঁহার নিজ হইতে দিয়া বাইস হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ খরিদ করিবেন; ও উহাও তাঁহার মাতার হস্তে অর্পণ করিবেন।

গোপালের মনে মনে যেরূপ আশা ছিল, অন্তরে যে আনন্দ হইয়াছিল, ব্যাঙ্কে সুদের প্রত্যাশায় দরখাস্ত করিয়া তাহার বিপরীত ফল ফলিল; তিনি ভয়ানক বিপদ জালে জড়িভূত হইলেন।

দেখিলেন, তাঁহার সেই ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ ব্যাঙ্কের একটী বাবুর হস্তে দিলেই, তিনি একখানি খাতার সহিত উহা মিলাইয়া দেখিলেন; এবং দেখিয়াই আর একটী বাবুকে কি বলিলেন। তিনিও কি দেখিলেন; পরে উভয়েই কি পরামর্শ হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ৪। ৫ জন আসিয়া একত্র হইলেন; এবং সকলে মিলিয়া কি পরামর্শ করিলেন। গোপাল এই সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে দেখিলেন, উহাঁদিগের ভিতর হইতে একটী বাবু ঐ কাগজগুলি ও কয়েকখানি কেতাব লইয়া একজন সাহেবের নিকট গেলেন। সাহেবও উহা উত্তমরূপ দেখিয়া-শুনিয়া একখানি পত্র লিখিয়া একজন চাপরাসিকে দিলেন; চাপরাসি পত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল। গোপাল সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতে, ঐ চাপরাসি একজন পুলিশ-কর্ম্মচারীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। পুলিশ-কর্ম্মচারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সাহেবের সহিত কি পরামর্শ করিয়া গোপালকে ডাকাইলেন। গোপাল গিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এই সকল কাগজ কোথায় পাইলে? ইহা চুরির দ্রব্য। সুন্দরীর ঘর হইতে এই সকল কাগজ

অনেক দিবস হইল চুরি গিয়াছিল; কিন্তু এত দিবস পর্য্যন্তও তাহার কোন সন্ধান হয় নাই। এখন দেখিতেছি, ইহা তোমার নিকট পাওয়া যাইতেছে। বোধ হইতেছে যে, তুমি নিজেই ঐ সকল কাগজ পূর্ব্বে চুরি করিয়াছিলে বা এই চুরির বিষয় অবগত আছ। এখন, যদি তুমি ইহার প্রকৃত অবস্থা সত্য করিয়া বল, তবেই মঙ্গল। নতুবা তোমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না।"

গোপাল এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া ও পুলিশ-কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া একেবারেই বিস্মিত হইলেন; ও বলিলেন,—"মহাশয়, এ কাগজ আমাদিগের। আমারই মাতার নাম সুন্দরী। তাঁহারই নামে এই সকল কাগজ আমার পিতা খরিদ করিয়া রাখিয়া যান। আমাদের এ সকল কাগজ কখনও চুরি যায় নাই। তবে নানা কারণে অনেক দিবস পর্য্যন্ত ইহার সুদ বাহির করা হয় নাই বলিয়াই যদি কোন প্রকার দোষ হইয়া থাকে, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

গোপালের এই সকল কথা পুলিশ-কর্ম্মচারী না শুনিয়া, ঐ সকল কাগজ ও গোপালকে সঙ্গে লইয়া ব্যাঙ্ক হইতে বহির্গত হইলেন। এবং গোপালকে কহিলেন,—"তুমি এই সকল কাগজ চুরি করিয়াছ কি না, বা এই সকল কাগজ চুরি হইয়াছে কি না, তাহা সুন্দরীর নিকট গেলেই এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখনই জানিতে পারিবে যে, তুমি দোষী কি না! আর, চুরি না হইলে সুন্দরী ঐ সকল কাগজের নম্বর কেনই বা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিবেন? এবং নিয়মিত কয়েক বৎসর পরে সেই সকল কাগজের পরিবর্ত্তে অন্য কাগজই বা কেন গ্রহণ করিবেন? আমি দেখিতেছি, যদি তুমি এখনও প্রকৃত কথা না বল, তাহা হইলে তোমার পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গল। বহু দিবস জেলের মধ্যে তোমাকে যে বাস করিতে হইবে, তাহার আর কিছুমাত্র ভুল নাই।"

সত্যানন্দ।

(২)

মহেন্দ্র সত্যানন্দের সমীপে উপস্থিত হইলে, "সত্যানন্দ সহাস্য বদনে মহেন্দ্রকে কহিলেন—'বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।' এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যানীর বৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তারপর বলিলেন যে,—'চল তাহারা যেখানে আছে তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।'

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণোদিত প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইলেন না—দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কৌস্তভশোভিত হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শন-চক্র ঘূর্ণমানপ্রায় স্থাপিত, মধুকৈটভস্বরূপ দুইটী প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি, রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িত কুন্তলা শতদল-মালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান রাগরাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বোপরি, বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুরত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ, তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীতস্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সকল

দেখিতে পাইতেছ?' মহেন্দ্র বলিলেন,—'পাইছি।'

ব্রহ্ম।—উপরে কি আছে, দেখিয়াছ?

মহে।—দেখিয়াছি, কে উনি?

ব্রহ্ম। মা।

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'আমরা যাঁর সন্তান!'

মহে। কে তিনি?

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল,—'বন্দে মাতরং।' এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—, 'ইনি কে?'

ব্রহ্ম। মা—যা' ছিলেন।

মহে। সে কি?

ব্রহ্ম। ইনি কুঞ্জরকেশরী প্রভৃতি বন্যপশু সকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্যপশুর আবাস-স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্ক বর্ণাভ, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইহাঁকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রী-রূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন,—'এই পথে আইস।' ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,'

"দেখ, মা যা হইয়াছেন?"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন,—"কালী?"

ব্রহ্ম। কালী—অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালীমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারী-চক্ষে দরদর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাতে খেটক খর্পর কেন?'

ব্রহ্ম।—আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র। বল, বন্দে মাতরং।

'বন্দে মাতরং' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'এই পথে আইস।' এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃ-সূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুরকণ্ঠ পক্ষিকুল গাইয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণ-নির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এই মা যা' হইবেন! দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু, বিমর্দ্দিত পদ্মাশ্রিত বীর-কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজ"—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদ্গদ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। 'দিগ্‌ভুজা—নানা প্রহরণধারিণী শত্রুমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য-সিদ্ধরূপী গণেশ। এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।' তখন দুই জনে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে, এক-কণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন,—"সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে।" উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্গদ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মার এ-মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে। সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায়?'

ব্রহ্ম। চল, দেখিবে চল।

মহে।—তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব?

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে?

মহে। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব?"

দেখিয়া কতক কতক বুঝিলাম, কেন এত লোকে এ 'সন্তান'-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। কতক দেশের অবস্থায় বাধ্য হইয়া প্রাকৃতিক নিয়ম-বলে, কতক ভক্তবীর সাত্যনন্দের অপূর্ব্ব প্রতিভা, অধ্যবসায় ও ধর্ম্মবলে, এ 'সন্তান'-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। মহেন্দ্রের কথাটি পরীক্ষা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

মহেন্দ্রের স্বদেশ পরিত্যাগের কারণ, দুর্ভিক্ষ। আবার রাজার অত্যাচারই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। মহেন্দ্র নির্ব্বোধ নহেন, এ সকলই বুঝিলেন। কাজেই রাজার উপরে তাঁহার একটু রাগ হইল। সে রাজা মুসলমান—সুতরাং মুসলমান রাজারই দোষে রাজ্য এত বিশৃঙ্খল—এ অনুমান তাঁহার স্বতঃই হইল। এ সকল ধারণা কবি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া না দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিলেন। মহেন্দ্রের মনে এ অসন্তোষের বীজ তাঁহার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে রোপিত হইল। হইতে হইতে পথিমধ্যে আবার আর এক অত্যাচার মহেন্দ্রকে প্রপীড়িত করিল—দস্যুতে কল্যানীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। ইহাও রাজার দোষে। রাজা দুষ্টের দমনে অক্ষম। ইহাতেও শেষ হইল না। মহেন্দ্র নিজে সেই মুসলমান রাজার সৈন্য কর্ত্তৃক বিনাদোষে আক্রান্ত হইলেন। এই সকল কার্য্যের ফলে—রাজার প্রতি মহেন্দ্রের বিরক্তি জন্মিল—বুঝি বা ঘৃণাও হইল।

রাজার প্রতি ঘৃণা হইলে, রাজবিদ্রোহীর প্রতি ঘৃণা দূর হয়। 'সন্তান'-সম্প্রদায় রাজার বিদ্রোহাচরণ বা ডাকাতি করিয়া সাধারণ ভাল-মানুষগণের বিরক্তিভাজন হইয়া উঠিয়াছিল; এই সকল ঘটনায় তাহাদের প্রতি মহেন্দ্রের বিরক্তি-ভাব কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইল। তারপরে যখন মহেন্দ্র দেখিলেন, সন্তান ভবানন্দ তাঁহাকে সিপাহীর হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন, তখন উপকৃত হইয়া তৎপ্রতি তাঁহার কিছু অনুরাগ স্বভাবতঃই জন্মিল। কিন্তু তবু মহেন্দ্র শীঘ্র তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিলেন না—সে সব মহেন্দ্রের চরিত্রের ভাব অন্যত্র ব্যাখ্যা করিব। যাহাহউক, ভবানন্দের প্রতিই যখন মহেন্দ্রের ঈষদনুরাগের উন্মেষ হইতেছিল, ভবানন্দ একে একে, আস্তে আস্তে, ধীর, মার্জ্জিত, সুললিত উপায়ে মহেন্দ্রকে রাজ্যের অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। রাজার অত্যাচার, প্রজার কষ্ট সবই বিশদ ভাষায় মহেন্দ্রের নিকট প্রকটিত হইল। মহেন্দ্র নিজেও তাহার কিছু টের পাইয়াছিলেন, কথাগুলি হৃদয়ে বড় লাগিল। তারপরে সম্মুখে ভবানন্দের সেই ভক্তিপূর্ণ মূর্ত্তি—সেই ভক্তিপ্রণোদিত সঙ্গীত, সেই ভক্তিপ্রচারিত উৎসাহ বাক্য, মহেন্দ্রকে অর্দ্ধেক 'সন্তান' করিয়া তুলিল। এখানেও কার্য্য শেষ হইল না। মহেন্দ্র শুনিলেন, সত্যানন্দ তাঁহার স্ত্রীকেও উদ্ধার করিয়াছেন—কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিস্কারিত হইল। কিন্তু এখনও তিনি 'সন্তান' ধর্ম্ম-গ্রহণে নারাজ—তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিতে হয়। শেষে যখন সত্যানন্দ তাঁহাকে প্রতিমারূপিণী সাকারা মাতৃভূমি দেখাইলেন, মহেন্দ্রের মতি ফিরিল; বলিলেন,—"আমি এ মন্ত্র গ্রহণ করিব।"

সত্যানন্দের সেই মূর্ত্তি স্থাপন—মূর্ত্তি প্রদর্শন ও তাহার ব্যাখ্যা-কথন সন্ন্যাসী ঠাকুরের এক অতি অদ্ভূত কৌশল। সন্ন্যাসী ঠাকুর জানিতেন, নিরাকারা মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি-স্থাপনা করিতে সকলে সক্ষম নহে। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহাদিগেরও ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই—সত্যানন্দের ন্যায় ভক্তেরও এতদ্দর্শনে ভক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আর যাহারা অক্ষম, তাহাদিগের ভক্তি-বিকাশের ইহা এক অমোঘ উপায়। ভারতবর্ষের বৈদিক ধর্ম্মে যে কারণে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রবেশ-লাভ করিল—একেশ্বরবাদ হইতে যে কারণে ভারতে তেত্রিশকোটী দেবতা কল্পিত ও পূজিত হইলেন, পরম ভক্ত, পরম প্রতিভাশালী সত্যানন্দও সেই কারণে মাতৃভূমির এইরূপ রূপ-প্রদর্শন আবশ্যক ও ফলপ্রদ মনে করিলেন। তোমার শত-শহস্র উপদেশে, বক্তৃতায় শ্রোতার মনে মাতৃভূমি-সম্বন্ধে যে ধারণা না জন্মিবে—সত্যানন্দের প্রতিষ্ঠিত ঐ মূর্ত্তি-দর্শনানন্তর তাঁহার দুই এক কথায় তাহার সে ধারণা জন্মিবে। তোমার ভাষা বাক্যময়ী—সত্যানন্দের ভাষা রূপময়ী। কি সুন্দর অপূর্ব্ব ভাষা! মহেন্দ্র ত তাহা দেখিয়া ভুলিবেই—মহেন্দ্র সাধু পুরুষ—উহা দেখিয়া তোমার আমার মনও কি কিয়ৎকালের জন্য বিত্রস্ত হয় না?

কথিত আছে, ভক্তের জন্যই নিরাকার পরংব্রহ্মের রূপ-ধারণ হইয়াছে। এ গভীর তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, সাধারণ ভক্ত রূপপূজা না করিয়া থাকিতে পারে না। ভক্ত সত্যানন্দ তাই আজ মনে মনে এ রূপ অধিষ্ঠিত রাখিয়া সন্তোষলাভ না করায়, এ অদ্ভুত মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই মূর্ত্তি-স্থাপন সত্যানন্দের স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তি-প্রণোদিত বটে—আবার এই মূর্ত্তি-স্থাপন তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যে অদ্ভুত সহায়ও বটে। যে মহেন্দ্র কিছুতে স্ত্রী-কন্যা ত্যাগ স্বীকার করিয়া সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহিলেন না, সেই মহেন্দ্র সেই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"আমি এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইব।"

হায় বঙ্গদেবী—তোমার বক্ষদেশে ভগবানের এত মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, কিন্তু এ মূর্ত্তি বিরাজিত নাই কেন? বাঙ্গালী তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা করে, এ দেবীর পূজা করে না কেন?

বাঙ্গালী চিরদিনই ধর্ম্মভীরু। যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া সহজে মনে করিতে পারে না। ইহাতে তাহাদিগের অপরাধ নাই। কৃষ্ণ-বন্ধু পরম বীর পার্থও একদিন যখন ইহাকে অধর্ম্ম কার্য্য মনে করিয়াছিলেন, তখন অধোবুদ্ধি, হীনবীর্য্য বাঙ্গালীর মনে ইহা ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে প্রতিপন্ন হইবেই। ইহার অন্য উপায় নাই দেখিয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে পরম-পণ্ডিত পাণ্ডবকে নীতিশাস্ত্র বুঝাইয়া সাংখ্যজ্ঞানে জ্ঞানী করিয়া, তাঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সত্যানন্দও সেইরূপ অনন্যগতি হইয়া এই দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি সঞ্চার দ্বারা হীনবীর্য্য বাঙ্গালীকে দেবী-বিরোধী-প্রতি অস্ত্র-গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। ভক্তি সুরা পান না করিলে বাঙ্গালী এ নৃসংস কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না। তাই ভক্ত সত্যানন্দ এই ভক্তি-প্রতিমা স্থাপন করিয়া দিন দিন ইহার সেবক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে আমরা সন্তান-সম্প্রদায়ের পরিবৃদ্ধির কারণ দেখিতে পাইলাম। ভাবিলাম, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মহেন্দ্র কেন, আমাদিগের ন্যায় পাষণ্ডগণও সেইরূপ সত্যানন্দের সেইরূপ আনন্দমঠে সেইরূপ মূর্ত্তি দেখিলে, 'সন্তান' না হইয়া থাকিতে পারে না।

তারপরে এই সন্তান-ধর্ম্ম কি, জানিবার জন্য ইচ্ছা হইল। ভাবিলাম, শুনিয়াছি এই মহেন্দ্র দীক্ষিত হইবে; সেই দিন সব বুঝিতে পারিব। সে দিন আসিল।

(ক্রমশঃ)

—

এড়ি-রেশমের চাস।

এড়ি-ডিম্ব।

চকোরীকে প্রথমে একটা কাঠি কিম্বা খড়ের নুড়ায় বাঁধিয়া রাখিয়া ডিম্ব পাড়াইয়া লইতে হয়। ডিম্ব পাড়িবার দুই দিনের মধ্যে ডিম্বের গাত্রে হস্ত দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, ডিম্বগুলির গাত্রে মোমের মত একপ্রকার আঠা লাগিয়া থাকে, তাহা বাতাসে না শুকাইলে ডিম্বগুলিকে কাঠির গাত্র হইতে ছাড়ান উচিত নহে; তাহাতে ডিম্ব সমস্ত না ফুটিতেও পারে। ঐ আঠা শুষ্ক হইয়া একটী ডিম্বের গাত্রে অপরটীকে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া রাখে। দুই দিন অতীত হইলে ডিম্বগুলিকে কাঠি হইতে ছাড়াইয়া লইয়া, একখানি ছিন্ন বস্ত্রে আলগা করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। যদি এরূপ বাঁধিয়া না রাখা যায়, তবে কাঠির গাত্রেই ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হইয়া থাকে। তখন কাঠি হইতে ছানাগুলিকে একত্র করা বড় কঠিন হইয়া উঠে। আর, ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া রাখিলে ডিম্বেও পিপীলিকা ধরিতে পারে না। যদি অত্যন্ত শীতের সময় হয়, তবে ন্যাকড়া-খানিকে ২।৩ পুরু করিয়া ডিম্বগুলিকে অল্প গরমে রাখা চাই; নচেৎ উহা ফুটিতে অধিক বিলম্ব হয়।

আসামে কেহ কেহ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে, যখন প্রবল শুষ্ক-বায়ু পশ্চিম হইতে বহিতে থাকে, তখন, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় অল্প শীতল জলে ডিম্বগুলিকে ধুইয়া ও জল ঝাড়িয়া আবার বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু আমরা তাহার কিছু প্রয়োজন দেখি না; জল না দিয়াও, অমনি কাঠির গাত্রে কিম্বা কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াও, ফাল্গুন-চৈত্র মাসের শুষ্ক বায়ুতে ডিম্বকে ফুটিতে দেখিয়াছি। ঐ ডিম্ব ১০ দিন হইতে ১২দিনের মধ্যে প্রায়ই ফুটিয়া থাকে। তবে শীতকালে ২।১ দিন অধিকও লাগে। ডিম্ব যদি 'বাওয়া' হয় অর্থাৎ চকোরের সঙ্গমে না হইয়া থাকে, তবে তাহাতে ছানা হয় না; অমনিই শুকাইয়া যায়। ডিম্বগুলি প্রথমে দেখিতে ঈষৎ হরিদ্রাভ শ্বেত সর্ষপের মত হয়। পরে যত ফুটিবার নিকটবর্ত্তী হয়, তত অল্প কৃষ্ণাভ হইয়া থাকে। ডিম্বগুলি ৪।৫ দিনে অল্প টোল খাইয়া যায়; এবং ৭।৮ দিনে উহা ভাঙ্গিলে, উহা হইতে ঘনীভূত পদার্থ নির্গত হয়।

ডিম্বের আবরণ এত কঠিন যে, দুই অঙ্গুলীর মধ্যে টিপিলেও ভাঙ্গিয়া যায় না। কিন্তু নখের উপর রাখিয়া নখ দিয়া চাপিলে পট্ করিয়া উহা হইতে রস বাহির হইয়া পড়ে। ডিম্ব ফুটিতে বহু দিন বিলম্ব হইলে, ঐরূপে ভাঙ্গিয়া দেখিতে হয়, শুকাইয়া গেছে কিনা। যদি একটা ভাঙ্গিয়া শুষ্ক হয় নাই বলিয়া জানা যায়, তবে আবার ডিম্বগুলিকে বাঁধিয়া রাখা উচিত। উহা শুকাইয়া গেলে যদি উহাকে নখের উপর রাখিয়া চাপা যায়, তবে উহা চেপটাইয়া গিয়া থাকে। ডিম্ব ফুটিলেই আর পোকাকে উপবাসী রাখা উচিত নহে। যদি ২।১ দিন খাইতে না পায়, তবে যদিও তৎকালে উহারা মরে না বটে, কিন্তু ঐ পোকা যখন বড় হইতে থাকে, সেই সময় রৌদ্র প্রখর হইলে, পোকার মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

আবারও "বিনামূল্যে!"

এম, ভট্টাচার্য্য নাম দিয়া, আন্দুলবেড়িয়া, নদীয়া ঠিকানা হইতে আবার এক প্রলোভনপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। বিজ্ঞাপনে লেখা— বিনামূল্যে বিতরণ! আমরা 'চিকিৎসা-দীপিকা' নামক এক খানি বৃহৎচিকিৎসাগ্রন্থ বিতরণ করিতেছি। ইহার মূল্য ৮৲ টাকা ও মাশুল ১৲ টাকা, মোট ৯৲ টাকা। তিন খণ্ডে ৯৬ পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে অবিলম্বে মাশুল ১৲ এক টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হউন। ভি, পি, পোষ্টেও পাঠান হয়।" ইত্যাদিরূপ তো বিজ্ঞাপনের কথা! অর্থাৎ বিজ্ঞাপনেই বুঝা যায় না যে, ৯৬ পৃষ্টার জন্য ঐ ১৲ এক টাকা মাশুল লওয়া হইতেছে, কি সমগ্র পুস্তকই উহাতে মিলিবে? আর, যদি তাই মিলে, তবে দাম ৮৲ টাকা ও মাশুল ১৲ টাকা ওরূপ-ভাবে উল্লেখেরই বা প্রয়োজন কি ছিল! আরও আশ্চর্য্য, অথচ 'বিনামূল্যে!' সুতরাং পাঠকগণ বুঝুন, সরল লোককে সহজে ভুলাইবার কি ফন্দি! অধিক কি, ঐ আন্দুলবেড়িয়া হইতে মধুসূদন ভট্টাচার্য্য (এম্ ভট্টাচার্য্য), সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি অনেক নামের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বারম্বার অনেক নিরীহ লোক প্রতারিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ সেই সকল কারণেই আমাদের আরও সন্দেহ হয়। তবে বিজ্ঞাপনদাতাগণ অভিযোগ সকলের স্পষ্ট উত্তর দিলে সুখী হইব।

নিরুত্তরেই আরও ক্ষোভ।

"বেঙ্গল-ব্যাঙ্কিং-করপোরেসান্" সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা কিছু আন্দোলন করিয়া, এক দল-ভুক্ত লোকের বড়ই বিরাগভাজন হইয়াছি। অধিক কি, তাঁহারা আমাদিগকে অনেকরূপে কষ্ট দিবার চেষ্টাও পাইয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্বাস যে, ন্যায়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই ভীত নই। শত বজ্র একসঙ্গে মস্তকে পড়িলেও ঈশ্বর কৃপায় আমরা যেমন, তেমনই থাকিব; মধ্য হইতে চক্রান্তকারীগণই কেবল অপদস্থ হইবেন। যাইহোক, নানা স্থান হইতে 'বেঙ্গল-ব্যাঙ্কিং-করপোরেসান' সম্বন্ধে আমরা আরও নানা অভিযোগ পাইয়া, আবারও সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথমতঃ ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত দিয়া লাভবান হইবেন আশায়, যাঁহারা টাকা দিলেন, তাঁহারা কি হিসাবটিও দেখিবার যোগ্যপাত্র নহেন? টাকা লোকসান যাইতে পারে, যাউক; তাহাতে অনেকে ক্ষতি মনে করেন না। কিন্তু বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বঙ্গের প্রধান প্রধান মুরুব্বিগণ যাহার অভিভাবক ছিলেন সেহেন সম্প্রদায়ের, এ কলঙ্ক দেখিয়া অনেককে বিস্মিত হইতে হয়। আরও, এই ব্যাপার দেখিয়া আর যে কেহ 'জয়েণ্ট-ষ্টক-কোম্পানী' স্থাপনে কখনও উৎসাহী হইবেন, এ আশাও সুদূর-পরাহত বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এখনও আমরা ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা ইহার সদুত্তর দেন। নতুবা আমাদের এ কলঙ্ক আর রাখিবার স্থান থাকিবে না।

সংবাদ।

—অত্যাচার ও অবিচারের দৃষ্টান্ত ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? ২৪ পরগণার অন্তর্গত গোচারণ গ্রাম। কতিপয় সিপাহী সহিত ফ্রাঙ্কস্ নামক একজন সাহেব ঐ গ্রাম জরিপ করিতে যান। জরিপ-কার্য্য শেষ হইলে, তাঁহাদের গ্রামান্তরে যাওয়ার আবশ্যক হয়; এবং সাহেব তাঁহার কর্ম্মচারীগণকে এরূপও আদেশ দেন যে, তাঁহাদের দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য যদি গাড়ি এখনই না পাওয়া যায়, তবে গাড়োয়ানদিগকে জোর করিয়াই যেন ধরিয়া আনা হয়। এই আদেশে, কএকজন সিপাহী, সম্পূর্ণ অত্যাচার করিয়া, একজন গাড়োয়ানকে ধরিয়া আনে। সে সংবাদ ক্রমে গ্রামের জমীদার শ্রীমান পূর্ণচন্দ্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের কর্ণে উপস্থিত হয়; প্রজার মায়ায় তাঁহারা সাহেবকে বুঝাইয়া গাড়োয়ানকে ফিরাইয়া আনিতে যান। অত্যাচারের সংবাদ শুনিয়া, গ্রামের আরও কএক জন লোক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তৎসঙ্গে গমন করেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! সাহেব তখন শীকারে গিয়াছিলেন; তাঁহার অধীনস্থ সিপাহীরা কিছুতেই গাড়োয়ানকে ছাড়িল না। উপরন্তু জমীদার পুত্রদ্বয়কে অপমানের কথা বলিল। কাজেই রক্তমাংসের শরীর তাঁহাদের, বিশেষতঃ সম্মুখে জমীদারকে অপমানিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদের প্রভুবৎসল প্রজাকুলের, সে অপমান সহ্য হইল না। কথায়-কথায় হাতাহাতি আরম্ভ হইল। তাহাতে কিন্তু সিপাহীদিগেরই

পরাজয় হইল; গাড়োয়ানকে লইয়া তাঁহারা প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে সন্ধ্যার সময় সাহেব শীকার হইতে ফিরিয়া, সে অপমান আর সহিতে পারিলেন না; দল বল লইয়া সেই রাত্রেই তিনি অসজ্জিত জমীদারের বাটী আক্রমণ করিলেন। জমীদারের চাকরগণ বাড়ীতে প্রবেশে বাধা দিলে, তিনি তাহাও শুনিলেন না। তাহাদের সকলকেও বিশেষরূপে ঘা'কতক দিয়া, বাড়ী হইতেই জমীদার দ্বয়কে ধরিলেন; এবং যাহাকে সম্মুখে পাওয়া গেল, রাজদ্রোহী বলিয়া, ধরিতে আদেশ দিলেন। অধিকন্তু এইরূপে ধরিয়া তাঁহাদিগকে পুলিসে দেন। এবং কি ন্যায্য বিচার যে, তাহাতে হতভাগ্য জমীদার-দ্বয়েরই আবার জেল হইয়াছে!

—তারকেশ্বরের মহান্তের আর এক কীর্ত্তি বাহির হইয়াছে। তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারীর স্ত্রীটি দেখিতে বেশ সুরূপা—নবযৌবনসম্পন্না। কাজেই মহান্ত বাবাজী আর সামলাইতে পারেন নাই। কলে, কৌশলে ও শেষে অভাগিনীর স্বামীর নিকট মুখ ফুটিয়া বলিয়াও, তিনি সেই রূপসীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সকলই বৃথা!—পবিত্র হিন্দু মহিলার সতীত্ব-রত্ন সহজে তাঁহার দ্বারা নষ্ট হইল না! এ ক্ষোভ কি 'মহারাজ' মহান্তের সহ্য হয়? কাজেই তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া নাটোর হইতে এক চুরী মকর্দ্দমার যোগাযোগে, সেই কর্ম্মচারীকে আসামী-শ্রেণীতে ভুক্ত করিলেন। এখন, কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে কিন্তু সাপ বাহির হইয়াছে; মহান্তের সকল ষড়যন্ত্র ও কীর্ত্তির কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যাই-হোক, সমগ্র হিন্দু-সমাজ এখনও সতর্ক হউন, এই প্রার্থনা। হতভাগ্য মহান্তকে আর এখন দেবালয় কলঙ্কিত করিতে না দেওয়া হয়, এজন্য সকলে কি চেষ্টিত হইবেন না?

—ভয়ানক ঝড়ে সম্প্রতি টাঙ্গাইল মহকুমা উৎসন্ন দশায় পড়িয়াছে! গত ৩১এ বৈশাখ, কালান্তক বাত্যায় টাঙ্গাইলের অন্তর্গত লাঙ্গলজোড়া, কেন্দুয়া, মমিননগর, খরসিলা, কাওয়াইলজানি, গিলাবাড়ী ও দরিয়াপুর একেবারে ছাড়খারে গিয়াছে! অধিক কি, কত লোক যে এ ঘটনায় মরিয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। রিপোর্টেই ১৩১ জনের মৃত্যু, ১৫১ জনের গুরুতর আঘাত, ৪৮০ খানা ঘর-ভাঙ্গা এবং ১২১ খানা নৌকা-ডুবির সংবাদ পওয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক দুঃসংবাদ! একে দুর্ভিক্ষে দেশে হাহাকার, তায় আবার একি নিগ্রহ? ভগবান, তোমার মনে না জানি আরও কত আছে!

—বিলাতে এক প্রকার সম্মার্জ্জনী-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা একখানি গাড়িতে লাগাইয়া দিলে ঘণ্টায় ৩ মাইল পথ ঝাঁট দেওয়া হইতে পারে। ইহার পশ্চাতে যে গাড়ি সংলগ্ন থাকে, তাহাতে পথের কর্দ্দমাদি উঠে।

—ঢাকা জেলার নরসিংদি গ্রামে এক ফকির এই মর্ম্মে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে যে,—"গত বৈশাখ মাসে ভারতেশ্বরীর রাজত্ব শেষ হইয়াছে; মির্জা মাবি এক্ষণে ভারতবর্ষের সম্রাট। ইংরাজকে আর গ্রাহ্য করা উচিত নহে, তাহাদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত।" ফকিরের সঙ্গে অনেক দুষ্ট মুসলমান জুটিয়াছে; আর ইহারা স্থানে স্থানে অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে। অধিক কি, ইহাদিগকে দমন করিতে ঢাকার মাজিষ্ট্রেটকে পুলিশ-প্রহরী পাঠাইতে হইয়াছে।

—জনরব, নিজাম স্বরাজ্যে (হাইদ্রাবাদে) সিকি পয়সার পোষ্টকার্ড প্রচলিত করিবেন।

—মগরায় একটি স্ত্রীলোক মদে উন্মত্তা হইয়া স্নান করিতে খালে নামে। কিন্তু সে আর ডাঙ্গায় উঠে নাই!

—গত এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই বলিয়া লাহোর এচিসন কলেজের হরনারায়ণ সিংহ নামক একটি বালক রেলে মাথা রাখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। বাঙ্গলায় এরূপ না হইলে বাঁচি!

—সম্প্রতি কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গায় এক ঘাসের গোলায় আগুন লাগিয়া প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকার ক্ষতি করিয়াছে। একজন ঘেসো মহাজনের প্রায় ১৩।১৪ হাজার টাকা লোকসান হওয়ায় সে পাগল হইয়াছে।

—বিলাতে এক ব্যক্তি প্যারাশূট ধরিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতে চেষ্টা করিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

—কেরোসিনের বাজার কিছু সস্তা হইলেও হইতে পারে। আমেরিকা হইতে এত কেরোসিন বোঝাই জাহাজ ছাড়িয়াছে যে, এক বজবজে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে না বলিয়া ডায়মণ্ডহারবারেও স্থান করা হইতেছে।

—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেলেঙ্কারীর কথা আর কহিতে নাই। এবার প্রায় সাত হাজার ছাত্র এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেয়; তন্মধ্যে মোটে চৌদ্দ শত ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। এলের দশাও তথৈবচঃ। পরীক্ষার ফল এরূপ উদ্ভট রকমের দেখিয়া, আর কোনরূপেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি ভক্তি থাকে না!

অনুসন্ধান।

:০(০):

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩১এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬ সাল। [২১ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

কে জানে মহিমা তব সর্ব্বশক্তিমান!
জলে স্থলে শূন্যদেশে গভীর গহ্বরে,
প্রতিরন্ধ্রে, মরুভূমে কূলে উপকূলে—
বসতি তোমার, নাথ, নাহি ব্যবধান।
অন্তরে বাহিরে দূরে তোমার প্রয়াণ।
কিন্তু তবু প্রাণমাঝে কি বিষম ভুল;
তোমাতে আমাতে যেন দূর—বহু দূর।
হইবে না দেখা পুনঃ, পাপেমগ্ন প্রাণ!
আমি আছি একধারে, তুমি যেন দূরে—
প্রেমের অনন্ত জ্যোতি মাঝে ঢল ঢল,
চলে না দৃষ্টির রেখা সদাই চঞ্চল;
কি সাধ্য আমার, ধরি' রাখিব তোমারে!
তবে কৃপাকণা যদি কর বিতরণ,
অসাধ্য কি আছে ভবে করিতে সাধন?

কলিকাতার ঝি।

কলিকাতার 'ঝি' বড়ই অদ্ভুত জিনিস। 'ঝি'র দ্বারা না হইতে পারে, এমন কাজই নাই। অনেক অনর্থ—অনেক লাম্পট্য, অনেক চুরী-জুয়াচুরী, অনেক জাল—কলিকাতার 'ঝি'র যোগাযোগেই সমাধিত হয়, জানা গিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার 'ঝি'র এই এক অপূর্ব্ব কাহিনী প্রাপ্ত হইয়া আমরা আরও আশ্চর্য্য হইলাম।

গত মাঘ মাসে, একদিন প্রাতঃকালে, একটী স্ত্রীলোক কলিকাতার চোরবাগানের সারদা বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। বাহিরের চৌবাচ্চার নিকট বসিয়া সারদা বাবু তেল মাখিতে-ছিলেন ও স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকটি আসিয়াই, সসম্মানে প্রণাম করিয়া, সারদা বাবুর হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। স্ত্রীলোকটির বয়স ৪০।৪৫ হইবে। বসন-পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল, সে বিধবা। বিধবা হইলেও, তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব কিন্তু নিন্দার নহে—চাল-চলন, ঢঙ-রঙ অনেকেরই পছন্দ-সই। যাইহোক, সারদাকণ্ঠ বাবু তাহাকে বসিতে বলিয়া তাঁহার পুত্রকে ডাকিলেন; এবং পত্রখানি তাহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"রমেশ পড়তো বাপু! শুনি, কে কি লিখেছে।"

রমেশ বাহিরের ঘরে বসিয়া স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতেছিল। বই রাখিয়া, সে তাড়াতাড়ি

পিতার নিকট আসিয়া পত্রখানি গ্রহণ করিল; এবং পড়িতে আরম্ভ করিল;—

"মহামহিম শ্রীযুক্ত সারদাকণ্ঠ চৌধুরী, মহাশয়, আমার শরীর দিন দিন বড়ই খারাপ হওয়ায়, আমি আর কোন মতে যাইতে পারিতেছি না। তবে 'ঝি'র জন্য আপনার সংসারে বড়ই কষ্ট হইয়াছে, পত্র পাইয়া, আমার বোন-ঝি মঙ্গলাকে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। উহাকেই আপনার বাড়ীতে রাখিবেন। ও আমার অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম বিশ্বাসী বা কম কার্য্যক্ষম হইবে না জানিবেন। আপনারা আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিবেন; এবং রমেশ, সুরেন, ছোট-বৌ-দিদি প্রভৃতি বাড়ীর কে কেমন আছেন, মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিবেন। অন্যান্য সংবাদ মঙ্গলার মুখে শুনিবেন। ইতি তারিখ ৪ঠা মাঘ।

নিঃ রামমণি ঝি,

সাং কাঁটালটোপতলা গ্রাম, ঘাটাল, মেদিনীপুর।"

পত্রখানি পড়িয়াই রমেশচন্দ্র বলিল,—'তা' বাবা, বেশ হ'য়েছে। যে কষ্ট যাচ্ছিল, ভালই হ'ল।"

সারদা বাবুও বিশেষ আহ্লাদ সহকারে বলিলেন,—"তা' বেশ। যাও বাছা, বাড়ীর ভিতর যাও। যা' রমেশ, ঝিকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা'তো। আর, মাকে বল্‌গে, রামমণি তার বোন-ঝিকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

মঙ্গলাকে সঙ্গে করিয়া অতঃপর রমেশচন্দ্র বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল; এবং ক্রমে মঙ্গলা বাড়ীর সকলের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত হইল। ঝিকে পাইয়া সকলেরই বিশেষ আনন্দ। অনেক কষ্টে দিন যাইতেছিল—ঝি আর মেলে নাই! বিশেষ এ সময়ে রামমণি একজন পরিচিতা ঝিকে পাঠাইয়াছে, এ অপেক্ষা আর কি আহ্লাদের বিষয় আছে? বাড়ীর বৌ-ঝিরা ভাবিতে লাগিলেন,—"রামমণির এখনও আমাদের মনে আছে। তা' থাকবেই তো! বহুকেলে পুরাতন ঝি কি না?" যাইহোক, এইরূপে সকলে সে দিনটি বেশ সুখে কাটাইলেন।

* * * *

একদিন, দুই দিন করিয়া ক্রমে সপ্তাহ অতীত হইল। মঙ্গলা বাড়ীর সকলের সহিতই যেন প্রাণের মেশা মিশিল। কাজ-কর্ম্মেই বা সে কি সুনিপুণ! বলিতে না বলিতে, দেখাইতে না দেখাইতে, সে সকল কাজই সারিয়া রাখিত। ভোর হইতে না হইতেই, সে শয্যাত্যাগ করিয়া, বাসন মাজিত, ঘর ঝাঁট দিত; এবং অন্যান্য সাংসারিক নানা কাজ সারিয়া রাখিত। অধিক কি, কাজ-কর্ম্ম করা-সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু তাহাকে বলিতে হইত না। এ সকল গৃহকার্য্য ছাড়া, বাজার করা, মুদীর দোকান হইতে চাল-ডাল আনা, খাবারের দোকান হইতে খাবার আনা, প্রভৃতি অনেক কাজও তাহাকে করিতে হইত। এইরূপে কয়দিনের মধ্যেই সে এতদূর বিশ্বাসী হইয়া পড়িল যে, বাড়ীর সকলেই তাহার প্রতি সমান সন্তুষ্ট হইলেন। অধিক কি, পাড়ার মধ্যেও তাহার নাম-ডাক বাহির হইল; সারদা বাবু তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে প্রায়ই বলিতে লাগিলেন,—"এমন কর্ম্মিষ্ঠা ঝি অতি কমই পাওয়া যায়। আমাদের রামমনির অপেক্ষাও এ যেন কর্ম্মিষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়।"

ক্রমে বাড়ীর ছেলেপিলেরাও মঙ্গলার বড়ই বশ হইয়া পড়িল। প্রায় সকল ছেলেই সর্ব্বদা মঙ্গলার সঙ্গে থাকে—মঙ্গলার কোলে কোলে বেড়ায়। মঙ্গলাও ছেলেপিলেকে বড়ই যত্ন করে। নিজের গাঁটের পয়সা দিয়া সে ছেলেপিলেকে খাবার কিনিয়া দেয়,—সুন্দর সুন্দর ছবি ও পুতুল আনিয়া তাহাদিগকে তুষ্ট করে। অধিক কি, এইরূপে তাহারা ক্রমে মঙ্গলার এতদূর বশ হইয়া পড়িয়াছে যে, মঙ্গলাকে ছাড়িয়া যেন তাহারা একদণ্ডও থাকিতে পারে না। মঙ্গলা বাজারে যাইবে; অমনি ছেলে-পিলে তার

সঙ্গে যাইব বলিয়া কান্না ধরে। মঙ্গলা খাবার আনিতে যাইবে; অমনি তাহারা তার হাত ধরিয়া বাহির হয়। মার কোলে বসিয়া ছেলেরা স্তন পান করিতেছে, কিন্তু মঙ্গলাকে দেখিলেই তাহারা অমনি মার কোল ছাড়িয়া মঙ্গলার কোলে যাইয়া উঠে। এমনই মঙ্গলার কুহক! বিশেষতঃ, সারদা বাবুর দৌহিত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলার অধিক ভক্ত। মঙ্গলার কোলে থাকিতেই যেন তাহার বড়ই আহ্লাদ। কি জানি, কোন্ মোহবলে মঙ্গলা তাহাকে এরূপ করিয়া তুলিয়াছে!

সারদা বাবুর দৌহিত্রটীর নাম রাজকুমার। রাজকুমারের বয়ঃক্রম ৪ বৎসর এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই,—এই শ্রাবণ আসিলে, তবে সে পাঁচ বৎসরে পড়িবে। গত আশ্বিন মাস হইতে সে তাহার মামার বাড়ী আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহার পিতা তাহাদিগকে লইয়া যাইতে আসিলেও, সারদা বাবু তাহাদিগকে এখনও পাঠান নাই—ফাল্গুণ মাসের তেসরা-চৌঠা নাগাইদ পাঠাইবেন, স্থির করিয়াছেন। রাজকুমারের পিতা বড়ই বড়লোক,—একরূপ রাজা বলিলেই হয়। দেশের মধ্যেও সকলে তাঁহাদিগকে 'রাজা' বলিয়াই ডাকিয়া থাকে। রাজকুমার এখন সেই সংসারের একমাত্র বংশধর—সুতরাং সংসারে তাহার বড়ই আদর। অধিক কি, অন্নপ্রাসনের সময় তাহার পিতা তাহাকে এত টাকার গহনা দিয়াছেন যে, কোন বড়লোকের ঘরেই অত গহনা সচরাচর থাকে না। তা' ছাড়া, সারদা বাবুও, যদিও ততদূর বিষয়বান নহেন তথাপি, তাহাকে অনেক টাকার গহনা দিয়াছেন! ফলতঃ বাড়ীর মধ্যে সকলেরই সেই ছেলেটির প্রতি অধিক যত্ন।

সারদা বাবুর কন্যা আবার এদিকে ছেলেটিকে বেশ সাজাইয়া-গুজাইয়া রাখিতেই ভাল বাসেন। সর্ব্বদাই ছেলেটির গায়ে তিনি গহনা পরাইয়া রাখেন; সর্ব্বদাই তাহাকে ভাল কাপড়-চোপড় পরাইয়া সুসজ্জিত করেন। আর, সে সম্বন্ধে তাঁহাকে কেহ কিছু বলিলে, তিনি তাহার প্রতি বিশেষ রুষ্ট হন; এবং বলেন,—"আর কতদিনই বা গহনা-গাঁটি পরিবে, তাই তোমরা অমন কর! এই আর দিনকতক পরেই তো উহাকে স্কুলে যেতে হবে! এই ক'টা দিনও একটু সাধ মিটাইব, তাহাতেও তোমরা বাদী হইবে!" কাজেই এইরূপ উত্তর পাইয়া, আজকাল আর বড় একটা কেহ কিছু তাঁহাকে বলিতে সাহসী হয় না।

* * * *

এইরূপেই দিন চলিয়া যায়। মঙ্গলাও বরং দুই এক দিন তাঁহাকে বলে,—"কলিকাতা সহর, শুনেছি, বড় খারাপ। এখানে গহনা-গাঁটি অমন করে পরাতে নেই।" বিশেষ, একদিন সে খাবারের দোকানে যাইতেছে, তখন ছেলেটি কাঁদিয়া তাহার সহিত যাইতে চাহিলে, সে বলিল,—"গহনাসুদ্ধ আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো না! কি জানি, রাস্তায় কত রকম লোক ফেরে।" তাহাতে কিন্তু সারদা বাবুর কন্যা একটু চটিয়া বলিলেন,—"ভালা যা'হোক বাবা! আমাদের গহনা; আমাদের যত আঁট না হৌক, মঙ্গলার দেখ্‌চি, সবচেয়ে আট! আচ্ছা, যায় যাবে গহনা, তুই নিয়ে যা'।" কাজেই মঙ্গলাকে সেদিন সঙ্গে লইতে হইল। সে রাজকুমারকে লইয়া খাবার আনিতে গেল। এইরূপে সে দিন হইতে তাহাকে নিত্য নিত্যই রাজকুমারকে সঙ্গে লইতে হইত। সে যেখানে যাইত, থাকুক না কেন রাজকুমারের গহনা-পরনে, সে তাহাকে লইয়া যাইত। কিন্তু বলা বাহুল্য, ইহাতে একদিনও কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই। কাজেই সারদা বাবুর কন্যা আর কিছুতেই ভুলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন সারদা বাবুর একটী

কে্‌গের বাড়ীতে সারদা বাবুর বাড়ীর মেয়েছেলেদের নিমন্ত্রণ হয়। তাঁহারা পাল্কী করিয়া ক্রমে বাড়ীর সকলকে লইয়া যান—বাড়ীতে কেবল সারদা বাবুর মা ও রমেশ মাত্র থাকেন। মঙ্গলাও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সারদা বাবুও আপিসের ফেরতা যাইবেন, স্থির ছিল। মেয়েদের যা'বার সময় তাঁহাদের লোক আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু আসিবার সময়, সে বাড়ীর তেমন পরিচিত লোক পাওয়া যায় নাই। কাজেই বাড়ীর কর্ত্তা মহাশয় তাঁহার বাড়ীর একজন চাকরকে (অবশ্য সে কাজ উপলক্ষে নূতন আসিয়াছে) ও মঙ্গলাকে সঙ্গে দিয়া পাল্কী পাঠাইতে থাকেন।

প্রথম পাল্কীতে সারদা বাবুর কন্যা ও দৌহিত্রটি আসে। মঙ্গলা ও সেই চাকরটি পাল্কীর সঙ্গে আসিয়া বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেয়। বাড়ীতে আসিয়া, মঙ্গলা একবার বাড়ীর ভিতরে যায়; যেন পান-তামাক খাইয়া আসিবে, এই তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করে। এদিকে পাল্কী হইতে নামিয়াই সারদা বাবুর কন্যা পায়খানায় গমন করিলেন। পূর্ব্বেই মঙ্গলাকে তিনি তাঁহার বাহে পাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন এবং মঙ্গলাও সেই জন্য তাঁহার পাল্কী আগে লইয়া আসিয়াছে। যাইহোক, তিনি পায়খানায় যাইলেই, যেন সকলকে লক্ষ্য করিয়া, মঙ্গলা বলিল, —"তবে আমি তাঁহাদের আনিতে যাই। রাজকুমার থাকিল।"

কিন্তু রাজকুমার তাহা শুনিল না। সে মঙ্গলার কাপড় ধরিয়া বসিল—তাহার সঙ্গে আবার যাইতে চাহিল। কিছুতেই যেন ছাড়িল না। বাড়ীর উপরের ঘরে সারদা বাবুর মা ও রমেশ ছিলেন। মঙ্গলা কিন্তু এরূপ ভাবে কথা কহিল যে, তাঁহারা কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অথচ সারদা বাবুর কন্যা যেন সবই শুনিলেন। যাইহোক, তিনি পায়খানা হইতেই বলিলেন,—"যা, মঙ্গলা—নিয়ে যা! কেন কাঁদাস আর!"

কাজেই মঙ্গলা সুযোগ পাইল। সে আর বিলম্ব করিল না। যেন পাল্কী চলিয়া যাইবে, এই ভান করিয়া তাড়াতাড়ি সে রাজকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া বাটির বাহির হইল। ইতিপূর্ব্বেই পাল্কী কিন্তু চলিয়া গিয়াছিল। কাজেই তাহার বেশ সুবিধা হইল। সেও বেশ একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

তবে বলা বাহুল্য, যেদিক হইতে পাল্কী আসিয়াছিল, সেদিকে নহে—তাহার বিপরীতে। রাজকুমার যদিও বলিল,—"দিদিমারা আছেন যেখানে, সে যে ওদিক দিয়ে যেতে হয়।" তা'তে সে বলিল,—"এদিক দিয়েই শীগ্‌গীর যাওয়া যায়।" কাজেই বালকের মন বুঝিল।

তা'র পর যা হইল, তা আর আজ নহে—আগামীবারে প্রকাশ্য। /

ভবিষ্যতের খেদ।

আমি ভবিষ্যৎ। আমার সহিত জগতের যতটা সংস্রব, এতটা আর কাহারও নয়। অতীত বল, বর্ত্তমান বল, সকলেই আমার জন্য জগতে আদর পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের নিজের-নিজের যেমন এক-একটা স্বতন্ত্র গতি আছে, আমার তাহা নাই; তাহারা যেমন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিয়া কঠোর ন্যায়ের সহিত মঙ্গলত্ব মিশাইয়া লইতে পারে, আমি তাহা পারি না। তাই আমার দুঃখ—তাই আমার খেদ!

যে অতীত আজ লোক-সমাজকে শিক্ষিত করিয়া জগতের উন্নতিকল্পে আত্মপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, যে বর্ত্তমান আজ অতীতের মৃতকায়ার উপর দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী-সঞ্চালনে জগৎকে পরিচালিত করিতেছে, তাহারাও একদিন ভবিষ্যৎ ছিল। কিন্তু তখন তাহাদের কে জানিত?—কে চিনিত? তারপর যে মুহূর্ত্তে তাহারা অতীত হইল, বর্ত্তমান হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা এক প্রকার জগতের উন্নতি-অবনতির নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইল। আমি—আমি ভবিষ্যৎ কি করিতেছি? আমিও অতীত-বর্ত্তমানের ন্যায় কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছি; কিন্তু আমি করিতেছি কি? আমি কেবল জগৎকে সুখের স্বপ্ন দেখাইয়া মাতাইয়া তুলিতেছি বৈত নয়! কিন্তু তাহাতে জগতের লাভ কি? আমি পরোক্ষে কার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত হই, পরে যাহা করায় তাই করি। আমার নিজের কার্য্য কিছুই নাই। তাই আজ আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে; হৃদয় দুঃখে গলিয়া যাইতেছে।

হায়! আমার দ্বারা জগতে কোনও কার্য্য হয় না, তবুও জগৎ আমারই ভরসা করে—আমারই ধ্যানে অতীতের ক্রোড়ে শিক্ষিত হয়, বর্ত্তমানের কঠোর ন্যায় শাসন নীরবে সহ্য করে। অতীতে কি হইয়া গিয়াছে, "গতানুশোচনায় ফল নাই" বলিয়া জগৎ তাহার আলোচনা করে না; বর্ত্তমানে কি হইতেছে তাহাও দেখিবার আবশ্যক নাই বলিয়া, ভাবিয়া দেখিতে চায় না। কেবল ভাবে আমার জন্য—ভবিষ্যতের জন্য!

হায়! এত করিয়া জগৎ আমার জন্য ভাবিয়া মরে; কিন্তু আমি তাহার কিছুই করিতে পারি না! যা'করে, তা' বর্ত্তমান আর অতীত। অতীত আর বর্ত্তমান পৃথিবীতে কার্য্য করে, আর আমি কিছু করিতে পারি না বলিয়া যে আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই, এমন নয়। তবে বর্ত্তমানের সহিত যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অতীতের সঙ্গে ততটা নয় বটে। কিন্তু বর্ত্তমানের মূল কে? আমি—আমি ভবিষ্যতই বর্ত্তমানের মূল—ভবিষ্যতের পরিস্ফুটাবস্থার নামই বর্ত্তমান। তবে ভবিষ্যৎ যতক্ষণ ভবিষ্যৎ থাকে, ততক্ষণ সে ভবিষ্যৎ। কিন্তু বর্ত্তমান হইয়া ফুটিয়া পড়িলে, তাহাতে কোথাও ভবিষ্যতের ছায়ামাত্র থাকে, কোথাও বা সেটুকুও থাকে না। সময়ে সময়ে অতীত হইতে বর্ত্তমানের জন্ম হয় বটে, কিন্তু সেখানেও আমিই তাহার গর্ভধারিণী—অতীত জনকমাত্র। জগতে সবাই বর্ত্তমান ভাল বাসে—সেও আমার জন্য। কেন না, তাহারা কল্পনায় যাহা ভাবে, মনে মনে যাহা আশা করে, তাহাই বর্ত্তমানে তাহাদের ভোগে হয় বলিয়া। কিন্তু আমি সকল সময়ে তাহাদের আশা পূর্ণ করিতে পারি না। আমি পরাধীন—আমার এতটুকু স্বাধীনতা নাই যে, কাহাকেও এক বিন্দু বাঞ্ছিত প্রদান করি! তাই আজ এতদিন পরে আমার দুঃখ-সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। তাই আজ আমি সকলের কাছে—জগতের কাছে, আমার নিজের অক্ষমতা জানাইতেছি।

আমাকে জানিবার জন্য—ভবিষ্যদ্-জ্ঞান লাভের জন্য, জগৎ কতই চেষ্টা করিতে থাকে। আমার পৃষ্ঠদেশের আবরণ উঠাইবার জন্য, আমাকে বর্ত্তমানে আনিয়া ফেলিবার জন্য, কল্পনার সাহায্যে কতই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। কিন্তু সে চেষ্টায়—সে উপায়ে কি হয়? হয় যাহা, তাহা আমার নিজের গর্ভেই থাকে। গর্ভ হইতে সে গুলি যেমন একে একে প্রসূত হইতে থাকে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে কাহারও আশা অতল জলে নিমগ্ন, কাহারও কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়; আবার কাহারও বা আশা প্রতি কথায় কথায় পূর্ণ হয়; কাহারও বা আশার অতিরিক্তও লাভ হয়। এ সকল ঘটিয়া থাকে বর্ত্তমানে; অথচ জগৎ হতাশমনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে আমাকেই নিষ্ঠুর বলিয়া গালি দেয়। হায়!—আমার কি দুঃখের কপাল!

জগৎ! তুমি হতাশই হও, আর আত্মহারা হইয়া আত্মধিক্কারই দাও বা আমাকেই গালি দাও; আমি কিন্তু তোমার কিছুই করিতে পারিব না। আমার হাত কি? কার্য্যকারণ-

শৃঙ্খলে আমার হাত-পা বাঁধা; শৃঙ্খল ধরিয়া আমায় যখন যাহা করাইয়া লইতেছে, আমি তাই করিতেছি। সুতরাং তোমার আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। জগৎ! তুমি ভাব, সুখ আমার প্রাণ; তাই সুখের আশায় উন্মত্ত হইয়া আমার ভাবনায় ভোর হইয়া থাক। বাঞ্ছিত লাভ হইবে বলিয়া প্রাণমনধন সবই আমার চরণে উৎসর্গ কর। কিন্তু হায়! আমি তোমার আশা বিন্দুমাত্রও পূর্ণ করিতে পারি না। পৃথিবীতে আমার মত জগৎ আর কাহাকে ভালবাসে? কিন্তু আমি ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারি না।

জগৎ! কেন আমায় ভালবাস?—কেন আমার জন্য ভাবিয়া মর? আমা হ'তে জগতে কাহারও উপকার বা অপকার হয় না। ভবিষ্যৎ যতক্ষণ বর্ত্তমান না হয়, বর্ত্তমান যতক্ষণ অতীত না হয়, আবার অতীত যতক্ষণ বর্ত্তমান না হয়, ততক্ষণ তাহার কার্য্যে জগতের কিছুই হয় না; ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ থাকিয়া কিছুই করিতে পারে না। হায়! আমি ভবিষ্যৎ; আমি কি কেবল জগৎ মাতাইতেই আসিয়াছি? জগতে আমার কার্য্যকারিতা কি কিছুই থাকিবে না? জগৎ আমার ক্রোড়ে শুইয়া, কেবল সুখের স্বপ্ন দেখিয়াই কি জীবন কাটাইবে? আমার গর্ভে জন্মিয়া, আমার অন্তর হইতে ছায়া লইয়া, বর্ত্তমান আর অতীতে মিলিয়া, আমার সাধের জগৎকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে নাচাইবে; আর আমি মূকের চিত্র-দর্শনের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিব? হায়! আমার এ দুঃখ ঘুচিবার নয়।

জগৎ! তুমি আমায় ভুলিয়া যাও—এ অক্ষমকে ভুলিয়া যাও। আমি তোমার কিছুই করিতে পারিব না। আমার চিন্তা ত্যাগ কর—ভবিষ্য চিন্তা ত্যাগ কর। ভাব, ভবিষ্যৎ নাই—ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ভরা। বর্ত্তমানের আলোকে সম্মুখে যতটুকু দেখিতে পাও, সেইটুকু দেখিয়াই তৃপ্ত হও, তার পরে আর কি আছে, তা' জানিতে যাইও না। আমি সুখময়, একথা তোমায় কে শিখাইল? একথা ভুলিয়া যাও। বরং আমি যাহাতে বাঁধা, সেই শৃঙ্খলের বিষয় ভাব; দেখিতে পাইবে,—আমি কিছুই না; বর্ত্তমানও কিছু না; আর অতীতও কিছু না। তুমিই আমাদের সত্বা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছ; নতুবা যাহা ঘটিয়াছে, যাহা ঘটিতেছে বা যাহা ঘটিবে, সে সবই সেই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলটি যাহার হাতে আছে তাঁহারই ইচ্ছায় হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। যাঁহার ইচ্ছায় সেই শৃঙ্খল সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাঁহার ইচ্ছা কে খণ্ডাইবে? তুমিও আমার ভাবনা ত্যাগ কর—সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর কর। এটা স্থির জেনো,—আমি ভবিষ্যৎ—আমি হস্তপদ সত্ত্বেও তোমাকে সুখ দিতে পারি না—তুমি আমার ভাবনায় জীবন ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিলেও আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারিব না। আমি পরাধীন; আমার কার্য্য,—সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তোমাকে সুখের স্বপ্ন দেখাইয়া মাতাইয়া রাখা। তাই আমি তোমায় সুখের স্বপ্ন দেখাই। আর, তাই তুমি আমার ভাবনায় সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইতে পার। কিন্তু যদি আমায় ভুলিতে পার—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে পার; তবেই দেখিতে পাইবে, বুঝিতে পারিবে, যে, ভবিষ্যৎ যথার্থই সুখে-ভরা। আর, যদি তা' না পার, তাহা হইলে আশাভঙ্গ হইয়া কষ্ট পাইতে হইবে। তাই বলি, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় নির্ভর কর—আমার ভাবনা ভুলিয়া যাও। তবে বুঝিতে পারিবে, ভবিষ্যতের খেদ কি?

শ্রীব্যোঃ—

নমঃশূদ্র জাতি।

(প্রাপ্ত।)

ইতিপূর্ব্বে কোন কোন সাময়িকপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল নমঃশূদ্র-জাতির প্রচলিত নিয়ম, জনরব ও কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মন্তব্যমাত্র। তাহাতে যুক্তি আদি কিছুই প্রদর্শন করা হয় নাই। যদিও শাস্ত্রীয় প্রমাণ না পাইলে কোন কথাই গ্রাহ্য নহে, তথাপি যুক্তিবিরুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রমাণে কোন সত্য প্রমাণিত হইতে পারে না। এ বিষয়ে ভগবান বৃহস্পতি কহিয়াছেন,—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য অর্থ নির্ণয় করিবে না;—যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়। অতএব যুক্তিসহ শাস্ত্রীয় প্রমাণে নমঃশূদ্র জাতির বিষয় আন্দোলন করা যাইতেছে।

চতুর্ব্বিধ প্রমাণে পদার্থের নিশ্চয় হয়; যথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দজ। এই চারি প্রমাণের অনেক প্রমাণ দ্বারা নমঃশূদ্র জাতির নির্ণয় হইতে পারে।

মনুসংহিতা পাঠে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি ভিন্ন শুদ্ধ পঞ্চম বর্ণ নাই। অতএব অনুমিত হইতেছে যে, নমঃশূদ্র জাতি কোন না কোন প্রকারে দূষিত জাতি হইবে, সন্দেহ নাই।

নমঃশূদ্র জাতিতে প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, ইহাদের অশৌচ দশ রাত্রি। শুদ্ধিতত্ত্ব-মতে বর্ণ-সঙ্করদিগের মাতৃবৎ অশৌচ হইয়া থাকে। অতএব ইহাদিগকে সঙ্করবর্ণ ধরিয়া লইলেও, প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্থিরীকৃত হইতেছে যে, যে জাতির অশৌচ দশ রাত্রি সেই জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে ইহাদের জন্ম।

"নমঃশূদ্র" এই শব্দটী "নমস্" ও "শূদ্র" এই দুই শব্দের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। 'নমস্' শব্দে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণকেই বুঝায়; আর, 'শূদ্র' চতুর্ব্বর্ণের শেষ বর্ণ। অতএব "নমঃশূদ্র" এই যৌগিক শব্দটীতে শব্দজ প্রমাণে স্থিরীকৃত যে, এ জাতি হয় ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে; না হয় ব্রাহ্মণ সন্তানই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় জন্মিয়াছে। সুতরাং যদিও দশ রাত্রি অশৌচধারিণী অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে ইহাদের জন্ম হওয়া সম্ভব ছিল, ইহাতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া শব্দজ ও অনুমাণ-প্রমাণে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম হওয়া স্থিরীকৃত হইল। যদি ইহারা শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মিত, তবে ইহাদের একমাস অশৌচ হইত। অতএব নমঃশূদ্র জাতির মাতা ব্রাহ্মণী, ইহা নিঃসন্দেহে নির্ণীত হইল।

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে যে, ইহাদের পিতা শূদ্র কিনা! অনেক জাতির শাস্ত্রীয় নাম হইতে ব্যবহার্য্য একটী ভিন্ন নাম থাকে; যেমন শাস্ত্রীয় অম্বষ্ঠ জাতির ব্যবহার্য্য নাম বৈদ্য। অতএব নমঃশূদ্র জাতিরও অপরবিধ শাস্ত্রীয় নাম থাকা সম্ভব হইতেছে। অনেকে "নমঃশূদ্র" এই যৌগিক ব্যবহার্য্য নামানুসারে ইহাদের জন্ম শূদ্রের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে বলিয়া অনুমান করেন। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় মত দেখা যাইতেছে। যথা,—

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃনাং।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

মনুসংহিতা (১০। ১২)

অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যা স্ত্রীতে আয়োগব, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়া-গর্ভে ক্ষত্তা এবং শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে মনুষ্যের অধম চণ্ডাল জাতির জন্ম হয়। ইহাতে জানা গেল, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল জাতির জন্ম হয়। অতএব নমঃশূদ্র জাতি চণ্ডাল কি না, তাহাই দেখা আবশ্যক হইতেছে।

চণ্ডাল জাতির ব্যবসা 'মনুসংহিতা' হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; যথা,—

"চণ্ডালশ্বপচানান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভঃ। (১০।৫১)
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনং।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারং পরিব্রাজ্য চ নিত্যশঃ ॥৫২ ॥
নতৈঃ সময়মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরন্।
ব্যবহারমিস্তেষাং বিবাহ সদৃশৈঃ সহ ॥ ৫৩ ॥
অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্নভাজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ৫৪ ॥
দিবা চরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতিস্থিতিঃ ॥ ৫৫ ॥
বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্ণীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ ॥ ৫৬॥"

অর্থাৎ চণ্ডাল ও শ্বপচ ইহারা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে ; এবং জলপাত্র রহিত হইয়া মৃতের বস্ত্র পরিধান, ভগ্নপাত্রে ভোজন ও লৌহ অলঙ্কার ধারণ করতঃ নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। ইহাদের ব্যবহার্য্য পাত্রাদি মার্জ্জন করিলে বা পোড়াইলেও শুদ্ধ হয় না। কুক্কুর ও গর্দ্দভ ইহাদের ধন জানিবে। ধর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে সাধুগণ ইহাদের মুখ দেখিবেন না। ইহারা স্বজাতির সহিত বিবাহ ও ব্যবহারাদি (টাকা-কর্জ্জ, দান-গ্রহণ প্রভৃতি) কার্য্য সমাধা করিবে। সাধুগণ ইহাদিগের অন্ন ভগ্নপাত্রে ভৃত্য দ্বারা পরিবেশন করাইবেন। ইহারা রাত্রিতে গ্রামে কি নগরে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে না। তবে রাজ-কর্তৃক চিহ্নিত হইয়া কার্য্যার্থে দিবসে বেড়াইতে পারিবে। যাহার বন্ধুবান্ধব নাই, এমন ব্যক্তির মৃত-দেহ ইহারাই গ্রাম হইতে বাহির করিবে। রাজার আজ্ঞানুসারে যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, ইহারাই তাহাকে বধ করিবে, এবং তাহার বস্ত্র, শয্যা ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিবে।

অপিচ, ভগবান্ বিষ্ণু কহিয়াছেন,—

"বধ্যঘাতিত্বং চাণ্ডালানাম্।" (বিষ্ণুসংহিতা)

অর্থাৎ রাজাজ্ঞানুসারে যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, তাহাকে বধ করাই চণ্ডাল জাতির ব্যবসা।

অপিচ, ভগবান্ মনু কহিয়াছেন,—

"ক্ষুধার্ত্তশ্চাত্তুমভ্যাগাৎ বিশ্বামিত্রশ্বজাঘনীম্।
চণ্ডাল হস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচক্ষণ ॥"

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞ ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে ঘৃণিত কুক্কুর মাংস আনিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটীতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চণ্ডাল কুক্কুরের মাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ঐ সকল ভিন্ন আরও যে কত প্রকার রীতিনীতি চণ্ডালের প্রতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বাহুল্য-ভয়ে এখানে উল্লিখিত হইল না।

উপরোক্ত বচনাদি দ্বারা চণ্ডালের আর্য্যধর্ম্মহীনতা স্পষ্টতরই প্রতিপন্ন হইতেছে। ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত আধুনিক জল্লাদ-জাতিই চণ্ডাল কি না, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণই বিবেচনা করিয়া দেখুন। আরও দেখুন, নমঃশূদ্র জাতি সর্ব্বদা আর্য্য-ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে। উল্লিখিত চণ্ডাল জাতির ব্যবসায়াদি নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে কেহই দেখাইতে না পারিয়াও যদি নমঃশূদ্রকে চণ্ডাল কহেন, তাহা একান্ত অসঙ্গত কি না! যাহা হউক, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দ্বারা নমঃশূদ্র যে চণ্ডাল নহে, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া দেখান যাইতেছে। যথা,—

"সঙ্করে জাতয়স্তেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ ॥"

অর্থাৎ ভগবান মনু কহিতেছেন, যে সকল জাতির পিতা-মাতার নাম জানা যায় না, তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিয়া জাতি-স্থির করিবে।

অপিচ,—

"অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজং ॥

পিত্রং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেবা।
নকথঞ্চন দুর্য্যোনি প্রকৃতিং স্বাং নিয়চ্ছতি ॥

(মনুসংহিতা)

অর্থাৎ অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা, ও বৈধকর্ম্মহীনতা প্রভৃতি কর্ম্ম লোকের আত্মপরিচারক। সঙ্কর-জাতিবা তাহার পিতা কি মাতা কি উভয়ের স্বভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা পিতৃস্বভাব কি মাতৃস্বভাব গোপন করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা স্বভাবতঃই পৈতৃক ব্যবসায় গ্রহণ কবিয়া থাকে। তাহা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

দুইখানি ছবি।

তৃতীয় দৃশ্য। *

অবরুদ্ধা।

মোহনপুরের জমীদারদিগের একটী ঠাকুর-বাড়ী আছে। ঠাকুর-বাড়ীটি গ্রামের সম্পূর্ণ উত্তরাংশে। তাহার উত্তরে আর কাহারও বসবাস নাই। অধিকন্ত আজকাল আবার ঠাকুর-বাড়ীর চতুস্পার্শ্বেও অনেক দূর পর্য্যন্ত লোকজনের বসবাস নাই। আগে যে দুই একঘর গরিব প্রজার বসবাস তথায় ছিল, বর্ত্তমান নবীন জমীদার নবীনবল্লভ রায় এখন তাহাদিগকেও গ্রামাভ্যন্তরে বা অন্যত্রে জমীজিরাৎ দিয়া, বাস করিতে দিয়াছেন। আর, ঠাকুর-বাড়ীর চতুস্পার্শ্বে সেই সকল যায়গায় এখন তাঁহার বাগান-বাটী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ এক সঙ্গে ঠাকুর-বাড়ী ও বাগান-বাটীর সমাবেশ হইয়াছে। মধ্যে একবার জমীদার মহাশয় ঠাকুর-বাড়ীর কারবার ওখান হইতে উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন সুযোগ্য বন্ধু নাকি পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, ঠাকুর-বাড়ীর সঙ্গেই বাগান-বাড়ী থাকা ভাল। কারণ, অনেক সময়-অসময় তাহাতে ঠাকুরের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে। যাইহোক, যে উদ্দেশ্যেই তিনি সে কথা বলুন, এখন কিন্তু সে কথার লক্ষণ কতক কতক ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই বাগান-বাটির একটী নিভৃত কক্ষে আজ দুইদিন যাবৎ কামিনী অবরুদ্ধা। এই দুই দিন যাবৎ তাঁহার উপর অনেক প্রলোভন, অনেক ভয়-প্রদর্শন, অনেক কাকুতি-মিনতি চলিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কামিনী সেই নরপিশাচ জমীদারের অঙ্কশায়িনী হন নাই ; অমূল্য সতীত্ব-রত্ন বিসর্জ্জন দিতে স্বীকার পান নাই। যাইহোক, আজ তাঁ'র পরীক্ষায় শেষ দিন। আজ জমীদার মহাশয় সকলের উপর খড়্গহস্ত হইয়া বলিয়াছেন, আজ একবার স্বয়ং দেখিবেন, কামিনী শোনে কিনা! না শোনে, তাহা হইলে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, অগত্যা তিনি জোর খাটাইয়া দেখিবেন।

কামিনীও এ সকলই জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু উপায় নাই। এক উপায়—আত্ম-হত্যা। কিন্তু দুরাচারের ষড়যন্ত্রে তাহাও হওয়া কিছু আয়াস-সাপেক্ষ। চারিদিকেই তাহার বন্ধু-বান্ধব লোকজন রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সে চেষ্টাও বৃথা। যাইহোক, পবিত্র হিন্দু-মহিলা সতীত্ব কিরূপ করিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানে। আত্মহত্যা, অভাবে ;— তারও সময় যায় নাই! সুতরাং দেখা যাক, কি ঘটে!

রাত্রি অধিক নহে—৯টা মাত্র বাজে বাজে। এমন সময় দুরাচার নবীনবল্লভ, বন্ধু-বান্ধব সকলকে বিদায় দিয়া, সেই নিভৃত কক্ষে, কামিনীর নিকট উপস্থিত হইল। তথায় গিয়া, আস্তে আস্তে ঘরের চাবি খুলিল। কামিনী চাবি খোলার শব্দ শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। তখন সে দুরাচার বলিল,—"ভয় নাই—আমি আসিয়াছি।"

* দ্বিতীয় বর্ষের ১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

"আমি' কে? ও! পাপিষ্ঠ নবীন-বল্লভ! —ধিক্ ধিক্ তোকে! এ পাপে তোর মস্তকে এখনও বজ্রাঘাত হইল না?"—উত্তরে রমণী-কণ্ঠ এই পর্য্যন্ত বলিতেছেন, এমন সময় তাহাতে বাধা দিয়া হতভাগ্য আবার বলিল,—"ছি সুন্দরি! গাল দিলে কি চলে? তোমার ভালোর জন্যই আমি এরূপ চেষ্টা পাচ্ছি। তোমাকে রাজরাণীর মত যত্নে রাখিব। এ সংসারে আমার যে সুখ না আছে, তা' তোমাকে দিব। দাসদাসী সকলই তোমারই। এখন সুন্দরী তুমি প্রসন্ন হও।"

কামিনী।—"ছি-ছি-ছি! আর বলো না! এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্তও নাই! লোকে শুনিলে তোমায় বলিবে কি? আমি হতভাগিনী, মহাপাপী; তাই তুমি এখনও কথা কহিতেছ। নতুবা তুমি আজ যে পাপে উদ্যত, ইহাতে তোমাকে শত খণ্ডে কাটিলেও ক্ষোভ যায় না। তুমি দূর হও—আমায় ছুঁয়ো না।"

পাপিষ্ঠ কথায় আবার বাধা দিল। বাধা দিয়া বলিল,—"সুন্দরি, যদি তুমি তোমার সেই অপগোণ্ড মূর্খ স্বামীটার ভয় কর, তবে তাও স্পষ্ট বল। আমার উপর তাহার কি কোন কিন্তু খাটে? যদি তুমি বল, তবে তাহার কাটা মস্তক আনিয়া আমি তোমাকে দেখাইতে পারি।"

স্বামীর 'কাটা মস্তক' শুনিয়া অভাগিনীর আর জ্ঞান রহিল না। কামিনী একরূপ উন্মত্তাবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন,—"ছি-ছি! আর যন্ত্রনা আমায় দিও না—আর সহ্য হয় না। হতভাগ্য ইহার ফলভোগ তোমাকে যে কি করিতে হইবে, তাহা কি তুমি একদণ্ডের জন্যও চিন্তা করিতেছ না! তুমি আজ অসহায়ে পাইয়া, আমার উপর যে অত্যাচার করিতেছ, মনে কর দেখি, তোমার মাতা-ভগ্নীর প্রতি যদি কেহ এরূপ অত্যাচার করে, তবে কি হয়? আমায় আর কষ্ট দিও না—আমার আর সহ্য হয় না।"

দুরন্তের আর বিলম্ব সহ্য হইল না। সে টলিতে টলিতে হাসিতে হাসিতে তখন অভাগিনীর হাত চাপিয়া ধরিতে গেল। "ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা! ভগবান্, রক্ষা কর; কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর—প্রাণ যায়।"—তখন এই বলিতে বলিতে কামিনীও আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হইলেন।

কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। দুরন্ত তখন কামিনীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—"এই তো বাবা! এখনও পথে এসো। আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়িতেছি না। টাকা দিতে গিয়াছি; তুমি অগ্রাহ্য করিয়াছি। আমার সকল বিষয়-সম্পত্তির তোমায় অধিকারী করিতে চাহিয়াছি, তুমি তাহাও উড়াইয়া দিয়াছ। কিন্তু দেখ, এখন বল!—বলের উপর কি কিছু আছে? কেমন বসে না আস, একবার দেখি।" এই বলিয়া কামিনীকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া পাষণ্ড কায়দা করিতে চেষ্টা পাইল।

কামিনীও তখন, আর সহ্য হয় না দেখিয়া, একবারমাত্র ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া ভগবানকে ডাকিলেন; এবং পরক্ষণেই কি জানি কি উত্তর পাইয়া, পাপিষ্ঠের হস্তদ্বয় অতি সজোরে কামড়াইয়া ধরিলেন। হাত দিয়া অবিরল রক্তধারা পড়িতে লাগিল। দুরন্ত কিছু ক্লিষ্ট হইয়া আসিল। কামিনী তখনও হাত ছাড়েন না। দুরন্ত তখন অনন্যোপায় হইয়া, তাঁহার বক্ষে এক পদাঘাত করিলেন।

পদাঘাতে অভাগিনীকে ভূতলশায়িনী হইতে হইল। কিন্তু তথাপিও তিনি হাত ছাড়িলেন না। পাপিষ্ঠ তখন, "ছাড়—ছাড়, প্রাণ যায়—প্রাণ যায়!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এবং শেষে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায়, সেও কামিনীর পূর্ব্বাবস্থার ন্যায়,—"কে কোথায় আছ—রক্ষা কর—প্রাণ যায়।"—বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কামিনীও পদাঘাতে ক্রমে সজ্ঞাশূন্যপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তথাপিও ছাড়িলেন না। ভাবিলেন,—প্রাণ যায়, সেও স্বীকার; তথাপি একবার দেখিব, কি হয়!

এমন সময়, সহসা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, ইষ্টক-কণ্টক পদ-দলিত করিয়া, ছুটিতে ছুটিতে কতকগুলি লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই চীৎকার-শব্দের দিকে আসিতে লাগিল। তাহারা কালান্তক যমদূতের ন্যায়। তাহাদের কাহারও হস্তে লাঠি, কাহারও হস্তে বল্লভ, কাহারও হস্তে বজ্রমুষ্টি। সকলেই যেন শশব্যস্তে ছুটিয়াছে। তাহাদের কি যেন কি মহারত্ন দস্যু-অপহৃত হইয়াছে, তাই তাহারা তাহা খুঁজিতে ছুটিয়াছে। সকলেই যেন প্রাণপণে—সকলেরই যেন এক উৎসাহ। ক্রমে সেই চীৎকার-ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া, তাহারা সকলে সেই বাগান-বাটীর সেই নিভৃত গৃহ-সমীপে উপস্থিত হইল। কিন্তু গৃহের দ্বার রুদ্ধ। যাইহোক, গৃহাভ্যন্তর হইতে "প্রাণ যায়—প্রাণ যায়" শব্দ শুনিয়া তাহাদিগকে তন্মুখীন হইতে হইল; এবং পদাঘাতে ক্রমে দ্বার ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। আর, সেই, সে দিনের শেষ ঘটনা।

তখন আর কিছুই কিন্তু শুনা গেল না। কেবল একবারমাত্র সকলে বলিল—"মা তোমার সন্তানগণ আসিয়াছে; একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ।" কিন্তু তখন দেখে কে? অভাগিনী তখন মূর্চ্ছিতা।—হতভাগ্য জমীদার গৃহের এক পার্শ্বে দণ্ডপ্রাপ্ত চোরের মত ম্রিয়মান; যমযন্ত্রণায় ক্ষণে ক্ষণে কেবল "উ-হু-হু,—প্রাণ যায়" এই বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

যাইহোক, যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কএকজন তখন কামিনীকে স্কন্ধে করিয়া প্রস্থান করিল। এবং অন্য কএক জন সেই হতভাগ্য জমীদারের শাস্তি-বিধানে ব্যপৃত হইল, আর, তাহাতেই হতভাগ্য কেবল—"আর নয়—আর নয়—প্রাণ যায়—একটু জল—"এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই ভূতলশায়ী হইল।

এড়ি-রেশমের চাস।

এড়ি-পোকা।

ডিম্ব হইতে পোকা বাহির হইলে, পূর্ব্বোক্ত ডালা কিম্বা একটি বিস্তৃত পাত্রে বস্ত্রখানি মেলাইয়া রাখিতে হয়। ঐ মেলন শব্দ হইতে আসামের স্ত্রীলোকেরা, পোকাকে লালন-পালন করার নাম, 'পোলু-মেলা' বলে। অনন্তর ঐ পোকাকে রেড়ির অত্যন্ত কচি পাতা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া অথবা হাতে রগড়াইয়া পোকার উপরে দিতে হয়। তবে এরূপ রগড়ান উচিত নহে, যাহাতে পাতার রস বাহির হইয়া পড়ে। রেড়ির অতি কোমল কচি পাতা লালাভ হয়। আমরা একেবারে লালাভ পাতা দেওয়া ভাল বোধ করি না। যে পত্রের লালাভ ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, অথচ যাহা অত্যন্ত কোমল আছে, তাহাই সরু সরু করিয়া ছিঁড়িয়া দেওয়া উচিত। পোকার গাত্রের উপর পত্র দিলে পোকাগুলি সেই পাতার উপর উঠিয়া আইসে ও পত্র খাইতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় তাহাদের গাত্রে হাত দিতে নাই। যদি তাহাদের বিষ্ঠাগুলি পরিস্কার করিতে হয়, তবে ঐ পাতায় পোকাগুলি উঠিলে পাতা ধরিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। প্রতিদিন একবার করিয়া ময়লা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট। ৫।৬ দিনের ময়লা জমিয়া আছে, অথচ তাহার উপরই যাহারা পাতা দিয়া থাকে, তাহাদের পোকার মৃত্যু-সংখ্যা অধিক দেখা যায়। কারণ, ঐ নব-প্রদত্ত পাতার গাত্রের জলে এবং তাহাদের বিষ্ঠায় ও পুরাতন পত্রে একত্র হইয়া, সমস্ত পচিয়া পোকার স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে থাকে।

আমরা এই মায়াবী কীটের সমস্ত জীবনকে অর্থাৎ ডিম্ব হইতে বাহির হওয়া হইতে প্রজাপতি (চকোর) হওয়া পর্য্যন্ত এই সময়কে, ছয় দশায় বিভক্ত করি। যথা, শৈশব, বাল্য, কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ। ইহা আমাদের

কল্পনা নহে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এই এই দশার এক-একটী সীমা আছে; এবং তদনুসারে তাহাদের আকারের ও বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। সেই সীমা পার হইবার সময়, এই পোকা এক-একবার খোলস ছাড়িয়া বড় হইতে থাকে। শৈশবের ৫।৬ দিন গত হইলে, একবার খোলস ছাড়ে। তাহার পর আবার বাল্যের ৪।৫ দিন গত হইলে, আর একবার ছাল কাটিয়া (খোলোস ছাড়িয়া) উঠে। তৎপরে ৪।৫ দিনের পর, কৈশরে; অনন্তর যৌবনে প্রবিষ্ট হইলে, এই পোকার মুখটী আর কৃষ্ণবর্ণ না থাকিয়া ঝকঝকে কাচের মত শুভ্র হইয়া যায়; এবং কৈশরে শরীর যত শ্বেত থাকে, ক্রমে তদপেক্ষা আরও শ্বেত হইয়া উঠে। এই যৌবনের ৪।৫ দিন গত হইলে, পুনরায় ইহারা খোলোস ছাড়িয়া প্রৌঢ় অবস্থায় প্রবিষ্ট হয়। এই শেষোক্ত দশায় ইহাদের বর্ণ পূর্ব্বোল্লিখিত নানা বর্ণের হইয়া থাকে; এবং ৪।৫ দিন প্রৌঢ়ায় থাকিয়া পোকা পুষ্ট হইয়া উঠে। তখন, পাতা না খাইয়া প্রায় একদিন যাবৎ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। তৎপর দিন তাহার মলদ্বার হইতে একবিধ ক্ষার-সংযুক্ত পীতাভ তরল রস নির্গত হইয়া যায়। পোকা এই সময় একেবারে কোমল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই ভাবে ২।৩ ঘণ্টা পড়িয়া থাকিয়া সে আপন নিভৃত আশ্রম-স্থল খুজিয়া বেড়ায়; এবং সেই নিভৃত স্থলে গিয়া 'ঘরা' বন্ধন করিয়া তন্মধ্যে যোগী তপস্বীর ন্যায় অবস্থান করিতে থাকে।

ঘরা বাঁধিবার ৫।৬ দিনের পরে, তন্মধ্যে আর একটী ছাল পরিত্যাগ করে। এইটিই তাহার প্রৌঢ়ার অর্থাৎ পঞ্চম খোলোস। এই খোলোস ছাড়িবার পর হইতেই তাহারা পুতুল অবস্থা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ তাহার পোকারূপ ফুটিয়া প্রজাপতির আকার ধারণ করিতে শরীরের যত কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়, তাহাই হইতে থাকে। তখন, তাহাদের গাত্র হইতে 'চিটিন্' নামক একবিধ রস বাহির হইয়া সমস্ত শরীরকে আবৃত করিয়া একটি আবরণ হইয়া থাকে (পুতুলের বিষয়ে দেখুন)। সেই আবরণকে যখন ফাটাইয়া চকোর হইয়া বাহির হয়, আমরা তখনকার সেই খোলাটিকে ইহার বৃদ্ধাবস্থার খোলোস বলি; এবং উহাই এই মায়াবী কীটের শেষ খোলোস। সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ঘরা বাঁধিবার পূর্ব্বে ইহারা চারিবারমাত্র খোলোস ছাড়ে। সুতরাং এক বারের চাস গড়ে ২১ দিন ধরিলে, ইহাদের এক এক দশার কাল গড়পড়তা কিঞ্চিদূর্দ্ধ পাঁচ দিন করিয়া পড়ে। যাহারা পোকা পুষিবেন, তাঁহারা আমাদের এই কথা শেষে দর্শন করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, যে পোকা আহার না পাওয়াতে বড় হইতে পারে না, সুতরাং পুষ্ট হইতে যাহাদের অধিক বিলম্ব হয়, তাহারা কখনও বা ঘরার পূর্ব্বে পাঁচবারও খোলোস পরিত্যাগ করে। কিন্তু সেরূপ ঘটনা প্রায়ই হয় না। যদি হয়, তাহাও শীতকালে। কারণ, শীতের সময় সকল জাতীয় পোকারই বৃদ্ধি কম হয়। সুতরাং এড়ি-পোকাও অধিক দিনে পুষ্ট হয়। মাঘের শেষ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত এড়ি বা এণ্ডি পোকা শীঘ্র বাড়ে। আমাদের দেশে অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ইহারা দিব্য বাড়িতে পারিবে। ভাদ্রমাসে যখন আসামে অত্যন্ত গরম ও গুমোট পড়ে, সেই সময় এই পোকা যেরূপ কমিয়া যায়, সেইরূপ চৈত্রমাসে যখন অত্যন্ত পশ্চিম-বায়ু বহে, তখনও এই পোকার মড়ক অনেক বৃদ্ধি হয়। এই সমস্ত বিষয়ে কিরূপে সাবধান লইতে হয়, তাহা পরে বিবৃত হইবে। আমাদের দেশে পশ্চিমে গরম বায়ুর ভয় নাই। শুদ্ধ গরম দক্ষিণে বায়ু হইতে বৈশাখ মাসে সাবধান রাখিতে পারিলেই আমাদের দেশে এই পোকা

যে আসাম দেশ হইতেও ভাল বাড়িবে, তাহা আশা করা যায়। আসামে শীত ও বর্ষা এবং শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের গুমোট বড়ই অসহনীয়। যখন এমন কঠিন জল বায়ুতে এই পোকা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখন আমাদের দেশে পোকাকে চৈত্র-বৈশাখে অল্প ঠাণ্ডা ঘরে, ও যেখানে বায়ু না লাগে এরূপ স্থলে রাখিলেই, আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইবে। পোকার কৈশর উত্তীর্ণ হইলে আর প্রায়ই মৃত্যুর ভয় থাকে না।

পোকার আকার ও বর্ণ দেখিয়া আমাদের উপর্য্যুক্ত কথা-মতে তাহার বয়স নির্ণয় করা যায়। গাত্রে কাল লোম থাকিলেই শৈশব দশা। অঙ্গুলির পর্ব্ব প্রমাণ দীর্ঘ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ, ও দেহ ঈষৎ হরিদ্রা-শুভ্র হইলে, বাল্য। পর্ব্বাধিক দীর্ঘ, অধিক শুভ্র ও অধিক চঞ্চল, মুখটী কৃষ্ণবর্ণ এবং কখন গাত্রে ফুটকি-দাগের চিহ্ন, এই কৈশর কাল। মুখ শুভ্র, প্রায় দুই পর্ব্ব দীর্ঘ, দুগ্ধের ন্যায় সাদা, কখনও বা পার্শ্বে ঈষৎ নীলাভা, এই যৌবনকাল। মুখ ছোলার ডাউলের ন্যায় পীত ও শরীর-বর্ণে রঞ্জিত, দীর্ঘে তর্জ্জনীর অপেক্ষা কিছু বড়, এই চিহ্ন, প্রৌঢ়ার। পুতুল অথবা বুড়ির চেহারা দেখিলেই সকলে বুঝিবেন। অতি বার্দ্ধক্যে যেমন চলশক্তি-হীন, স্পন্দরহিত হইয়া হাত-পা গুটাইয়া এক যায়গায় বসিয়া থকিতে হয়, ইহারও ঠিক তদ্রূপ মূর্ত্তি। (ক্রমশঃ)

ফুলরেণু।

বিরহে।

সখিরে কাহে মু ছোড়ল শ্যাম?
হাম যো মতিহীনা,   কাহে নাহি বুঝল,
আজু সখি! টুটব পরাণ!
হা! সখি! হিয়া মোর,   অনুখন ডাকই
শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম সুধা-নাম।
আজু পিয়া ছোড়ল,   দিবস রজনী কাহে
বোল বলি সো জন ঠাম?
সজনিরে সেইদিন   শ্যাম সন্ধ্যা আওয়ল
গগনে উদয় ভেল চান্দা,
হামারে কহল পিয়া   চললো যমুনা তীর
কো জানে করল কি ধান্দা।
হা হা! সহি সো দিন   যো খেল খেলল
যমুনাক সলিল সুহানে,
নীর যব ভগাই,   ধায়ল তহু পাছ
ফেরায়ল পুনু তাহে আনি।
আর দিন পিয়া হাম,   কোর বৈঠায়ল,
পেখল হামার বয়ান,
ইহ কুন্তর লই,   ঝাঁপল তুহু মুখ
"ভ্রমরে কমল মধু পান"।
গোপ কুঙারি হাম,   রূপ হামার পিয়া
কতমত করল বাখান,
অব সখি হামেরূপ,   সো আঁখি না যুড়াল,
অব রূপ করব ভসম।
রে সখি জীউ মোর,   অবরে নিকাষব
বোলত কাঁহা বৈঠে শ্যাম,
হাম যাওব পাশ,   চরণ পর ডারব
যাঁহা প্রাণ তাহে করু দান।

শ্রী রাঃ

বর্ষা।

মেঘ—চৌতাল।

বিধির কেমন বিধি জানিবে কেমনে নরে।
দেখিতে দেখিতে বরষা আসি মানষ মোহিত করে॥
নলিনী-নায়ক উঠিয়া গগণে,
তাপিছে ক্ষণেকে প্রখর কিরণে,
মৃদু মৃদু বায়ু বহে তার সনে, তাপিতে শীতল-তরে।
এই যে গগণ শোভিতেছিল,
সহসা নীরদ তা'য় আবরিল,
রবির কিরণ তখনি চলিল, ভেক-ভেকী রব ধরে॥
মাঝে মাঝে ঝরি বিমল সলিল,
সর আদি যত সকল পূরিল,
সরস বরষা আসিল জানিল, আছে যারা ধরা পরে।
নিশাতে যে ফুল ফুটিতেছিল,
প্রকৃতি সুন্দরী কাড়িয়া লইল,
মাঠেতে কেবল ওষধি রহিল, কৃষীগণে ফুল্ল ক'রে॥
থেকে থেকে আহা সুরষ-বদনি,
রবিদিকে চাহি লোহিত বরণী,
পতির আশায় শোভিছে অবনী, জগ-জন মন হরে।

জীবের দায়িত্ব। *

আমরা পূর্ব্বে জীব-সম্বন্ধে ও দায়িত্ব-সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইলাম, তাহাতে আমরা এ বলিতে চাহি না যে, জীবের কার্য্য দেখিয়া ভগবানের প্রীতি বা অপ্রীতি হইতেছে কি না! কারণ, আমরা সে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ। তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি, আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য হইয়াই বা তাহা কিরূপে জানিব? তবে তাঁহার এই বিশাল সৃষ্টিতে যে একটী অপূর্ব্ব সুন্দর ভাব প্রকটিত রহিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে আধ্যাত্মিক, ও অনাধ্যাত্মিক ভাবের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের জাগরণ, সাম্য ও বৈষম্য ইত্যাদি ঘটনা হইতেছে বলিতে পারা যায়। এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছাকে পরম সুন্দর বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদিগের প্রেম উথলিয়া উঠে; এবং জীব যে ভাবেই কার্য্য করুক না, তিনি যে তাহাকে অনন্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, এ বিশ্বাসও আমাদের কখনই হয় না। তাঁহার ইচ্ছায় আমাদের মনুষ্যের মধ্যে যাহার দেহে যেরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তাহার কার্য্য হইলেই দায়িত্ব সাঙ্গ হইল। মৃত্যুর পর জীবের চৈতন্য পুনরায় সুপ্তাবস্থায় চলিল, জীবনের ধস্তাধস্তি জীবের সমাপ্ত হইল। কিন্তু মূল শক্তি-বৈষম্য যতকাল বিদ্যমান থাকিবে, ততকালই চৈতন্যের ভাব এক রকমে জাগ্রত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। যখন সেই মূল শক্তি-বৈষম্য সাম্যাবস্থার এরূপ নিকটবর্ত্তী হইবে যে, সেই অবস্থায় আর চৈতন্য-বিকাশের সম্ভাবনা থাকিবে না, তখন ব্রহ্মাণ্ডে জীবের বীজ উঠিয়া যাইবে। শক্তি-বৈষম্যের পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া, এক এক সম্প্রদায়-জীব অন্তর্হিত হইতেছে; আবার এক সম্প্রদায় জীব, যাহারা শক্তির সেই অবস্থায় থাকিতে পারে, নূতন হইতেছে, এক জগৎ লোপ হইতেছে, আবার নূতন জগৎ হইতেছে। তখন এইরূপই হইতে থাকিবে। এইরূপে হয় ত এমন কাল আসিবে যে, এখন এই পৃথিবীতে যেরূপ দেহে চৈতন্য-বিকাশ দেখিতেছি, তখন সে দেহ আর থাকিবে না; আধ্যাত্মিক ভাব ও তাহাদের বেগ আজি কালির মত চলিবে না; নূতন বিধ দেহে নূতন ভাবের চৈতন্য বিরাজ করিবে। কার্য্য নূতন, দায়িত্ব নূতন, সকলই নূতন ধরণের হইবে! তবে যে চৈতন্য এখন জীব-দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়া সুপ্ত অবস্থায় যাইতেছে, তাহা কি এই পৃথিবীতেই থাকিবে; না, অপর জগতে দেদীপ্যমান হইবে? তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। কারণ, সুপ্তাবস্থায় সকল-শ্রেণী জীবের চৈতন্যই এক; তাহাতে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তাহার মূলে এক শক্তি রহিয়াছে। অ র, সেই শক্তি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী।

আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত কথাগুলির সারাংশ এই দাঁড়াইতেছে যে, মূলে শক্তি এক মাত্র; তাহার বিষমতা-নিবন্ধন এই সৃষ্টি বিরাজ করিতেছে। তজ্জন্যই পাদার্থিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির যাবতীয় বিভিন্ন দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে; তজ্জন্যই জীবের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি, আকার, হাবভাব, অবস্থা নিরীক্ষিত হয়; সেই হেতুই ধস্তাধস্তি, এবং বিভিন্ন অবস্থা ও কার্য্য দেখিতেছি। অথচ এই সমস্ত বৈপরিত্য-সত্বেও সকলের সাম্যভাব আছে। কেহ নিজের কর্ত্তা নহে; অথচ বৈষম্য-জনিত কর্ত্তৃত্ব-ভাব সকল বস্তুতেই প্রকাশিত।

দায়িত্ব অর্থে যে সম্বন্ধ-ভঙ্গ ও দণ্ডার্হতা, তাহা ঈশ্বর-সৃষ্টিতে প্রয়োগ করা উচিত নহে। উহা সমাজ-শাসন-পক্ষে বিধেয়। অনর্থক চিত্তে ভয় জন্মাইয়া দিয়া, জীবের অন্যান্য ভাবের কার্য্য বিকাশ হইতে না দেওয়া অযৌক্তিক কার্য্য। জীবের কর্ম্মফল সুপ্তাবস্থার

* পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সঙ্গে যাইবারও সম্ভাবনা নাই; এবং সেই কর্ম্মফলে মূল শক্তি-বৈষম্যেরও কিছু আসে-যায় না। যতকাল ঈশ্বরেচ্ছায় সেই বৈষম্য থাকিবে, ততকালই সৃষ্টির গতিবিধি, উৎপত্তি, স্বভাব-প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্য অনিবার্য্য। আধ্যাত্মিক ভাববিশিষ্ট জীবেরও সুখ-দুঃখ ও অবস্থার তারতম্য কেহই নিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন না। সকলেই সেই প্রধান শক্তির বেগে পরিচালিত হইয়া চলিয়া, সেই সুস্থ অথবা সাম্যাবস্থার দিকে চলিতেছেন। কেন ঈশ্বর এরূপ করিলেন, কেহই চিন্তা করিয়া উঠিতে পারেন না। যিনি যে ভাব দেখেন, তিনি সেই ভাবেরই কারণ দর্শাইয়া থাকেন। আমরা 'সৌন্দর্য্য' দেখিতেছি, তাই কহিতেছি, সৌন্দর্য্য-রক্ষার জন্য শক্তি-বৈষম্য; কারণ, একবিধ বস্তু কখনই সম্ভব হয় না। ভগবানের অসীম শক্তির বোধ মনুষ্যের অত্যল্প পরিমাণে এইরূপে হয়; তাহার উপর আর তাঁহার উঠিবার সাধ্য নাই। যদি কেহ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাহা আমরা নষ্ট করিতে চাহি না। যদি কেহ কোন কর্ম্মকে সুকর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া তাহার ফলভাগী হইতে প্রয়াসী হয়েন, তাহারও আমরা হন্তারক নহি। কিন্তু যাঁহারা জীবকে দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাহাদের শক্তির কার্য্যে বাধা দেন বা নিষেধ করেন, আমরা তাহার প্রতিবাদী হইলাম। আমরা তাঁহাদের সেই কার্য্যকে, মূল শক্তি-বৈষম্যের বিরোধী মনে করি। স্বভাবে যে বৈষম্যে মিল এবং সম্বন্ধ দেখিতেছি, জীবের সম্প্রদায়কে সেই মিলনে রাখিবার চেষ্টা করা জীবের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এবং যাহাতে জীব, বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের সহিত মিল রাখিয়া আপনাদিগের কার্য্য সুন্দররূপে করিতে পারে, তাহাতেও সযত্ন হওয়া উচিত। কারণ, সৌন্দর্য্য অত্যন্ত প্রীতিকর।

/ মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

মহামায়ার উক্তি।— শিবপুর-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর্য্যধর্ম্ম-সংরক্ষিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে পুস্তকখানিতে কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ দিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, লেখার দোষে সে চেষ্টা সকলই বিফল হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানি না পদ্য, না গদ্য— একরূপ খিচুরী-প্রায়! এরূপ পুস্তক ছাপাইতে ব্যয় করিয়া ধর্ম্ম-বিতরণ অপেক্ষা, সে পয়সাগুলি গরিব-দুঃখীদিগকে দান করিলে ততোধিক ধর্ম্মার্জ্জন হইতে পারিত।

হিন্দু-সৎকর্ম্ম-মালা।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।— শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সংক্ষেপতঃ এই পুস্তক দুই খানিতে হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা-বিধি ও ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম ভাগে সাম, যজুঃ ও তান্ত্রিকী মতের সন্ধ্যাবিধি এবং শিব, সূর্য্য, নারায়ণ প্রভৃতি পূজার বিষয় লিখিত আছে। এবং দ্বিতীয় ভাগে দেবতাদিগের নাম, স্তব স্তোত্রাদি নানা-বিষয় আছে। এরূপ সকল পুস্তক প্রকাশ বাঞ্ছনীয়; ধর্ম্মোদ্দীপনায় এরূপ সহায়তার জন্য প্রকাশক ধন্যবাদের পাত্র। তবে দাম কিছু কম হইলে যেন ভাল হইত— বিশেষ ধর্ম্ম-পুস্তক বলিয়া।

অভিনয়-সম্বন্ধে।

এমারেল্ড-থিয়েটারে 'রাসলীলা।'

(অকৃতকার্য্যতা ও অত্যাচার)

(গত শনিবার উক্ত রঙ্গালয়ে 'রাসলীলা' নামক নূতন নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। হ্যাণ্ডবিল, প্লাকার্ড ও বিজ্ঞাপনাদি দেখিয়া জানিয়াছিলাম, বঙ্গের প্রধান নাটককার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয়ের রচিত নাটক 'রাসলীলা'—তাঁহারই পরিচালকত্বে, বিশেষতঃ তাহার উপর আবার বহুদর্শী ও বিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত নূতন ম্যানেজার বাবু কেদারনাথ চৌধুরি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের দ্বারা অভিনীত হইবে। সুতরাং অভিনয় না জানি কতই মনোহর হইবে, সত্য সত্যই এই আশায়, আমরা অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, সে আশায় আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াছি) অধিক কি, বড়ই আনন্দিত হইবার আশায় উপস্থিত হইয়া, ক্রমেই (যত দৃশ্য পড়িয়াছে —যতই অঙ্ক আসিয়াছে, ততই ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়াছি; এবং শেষে অভিনয়-দর্শন অসহ্য হওয়ায়, শেষ না দেখিয়াই, উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। অভিনয়-দর্শন অসহ্য হওয়ার প্রথম কারণ,—অভিনয় আদৌ

ভাল হয় নাই; অধিক কি, কি হইতেছে না হইতেছে, অভিনয় দেখিতে গিয়া আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। শুধু আমারাই বা বলি কেন, পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া অনেকগুলি দর্শকও শেষে এরূপ বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'যদি কেহ অমনি আমাদের টিকিটগুলি লইয়া থিয়েটার দেখিয়া আমাদিগকে অব্যাহতি দেন, তবে আমরা রাত্রি-জাগরণের কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাই।" শুদ্ধ এইরূপ বলা নহে, অনেকে ক্রমে ক্রমে উঠিয়াও গিয়াছিলেন। 'রাসলীলা' পুস্তকখানি (Melo-Drama) নাট্ট-গীতি। কিন্তু. গানগুলি যখন গীত হইতে আরম্ভ হইল, তখন যেন বোধ হইল, 'ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা' এই যে সুন্দর প্রাচীন উপমাটি—এটি এস্থলেই ঠিক খাটিয়াছে। অর্থাৎ সচরাচর যাত্রার দলে যেমন কতকগুলো ছেলেয় গান ধরিলে, মাথামুণ্ড কি হইতেছে বুঝা যায় না, এও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। কুটিলার কথা বড়ই বিরক্তিকর হইয়াছিল। কৃষ্ণ ও রাধিকার গলা-ধরাধরি করিয়া পায়চারী করাটি ভাল দেখায় নাই। এইরূপ আর কি বলিব? ফলতঃ কোন অভিনেতার অংশই আমাদের আনন্দপ্রদ হয় নাই। এই তো অভিনয়ের কথা। তদ্ভিন্ন, এই নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় দর্শকদিগের জন্য এক একখানি পাখারও বন্দোবস্ত ছিল না। তাহার উপর আবার অত্যাচার-অবিচার! অভিনয় অপেক্ষা তাহা আরও বিরক্তিকর। বোধ হয়, সে কথা শুনিলে ভদ্রলোক মাত্রেই সহসা রঙ্গালয়ে যাইতে সঙ্কুচিত হইবেন। ('কর্ণধার'-পত্রিকার সম্পাদক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় সেই দিন অভিনয় দেখিতে যান। কএক দৃশ্য অভিনয় দেখিয়াছেন, এমন সময় থিয়েটারের একজন অভিনেতা আসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। হারাণ বাবুও তদনুযায়ী বাহিরে গেলেন। কিন্তু বাহিরে যাইলে, উক্ত রঙ্গালয়ের অপর আর একজন অভিনেতা হারাণ বাবুর হাত ধরিয়া, তাঁহাকে যথেচ্ছা গালাগালি দিতে লাগিলেন। শুনিলাম, হারাণ বাবু 'নববিভাকর-সাধারণীতে' 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয়-সম্বন্ধে কি সমালোচনা করিয়াছিলেন, এই তাঁহার অপরাধ। যাইহোক, এ অপরাধের জন্য তাঁহাকে অপমানের আর বাকী রহিল না।) আমাদের বোধ হইল, তদপেক্ষা হারাণ বাবুকে ঘা'কতক মারিলেও ভাল হইত। আরও, 'অনুসন্ধান-সমিতির' কোন প্রতিনিধি সেই সময় তাঁহাকে না আটকাইলে, বোধ হয় তাহাও ঘটিত। যাইহোক, (এ অপেক্ষা রঙ্গালয়ের অধঃপতন আর কি হইতে পারে? নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া, একজন সম্পাদকের প্রতি এরূপ অত্যাচার কি অল্প ক্ষোভের কথা? যাইহোক, আমরা মাননীয় বাবু গোপাললাল শীল মহোদয়কে ও রঙ্গালয়ের ডাইরেক্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয়কে এবং ম্যানেজার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়কে এবিষয়ে একবার তত্ত্ব লইতে অনুরোধ করি; এবং তত্ত্ব লইয়া, যেরূপ সুবিচার হয়, তাহা আমাদিগকে জানাইলে সুখী হইব। কারণ, একজন অভিনেতার দোষে তাঁহাদের রঙ্গালয়ের কোন কলঙ্ক হয়, আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে।)

বঙ্গ রঙ্গ-ভূমি—'জন্মাষ্টমী'।

সম্প্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে নূতন নাটক 'জন্মাষ্টমীর' অভিনয় দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। বিশেষতঃ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক হইতে—যখন সেই শিশু শ্রীকৃষ্ণের মনোহর নৃত্য, স্খলিত সঙ্গীত, বালোচিত কোমল হাবভাব, প্রথম আমাদের নয়ন-পথে পতিত হইল, তখন হইতেই—আমরা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আরও তখন আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিয়াছিলাম যে, অন্ততঃ দু'দণ্ডের জন্যও সে ভাব দর্শকবৃন্দকে যেন মুগ্ধ করিয়াছিল। (ফলতঃ পর পর যত দৃশ্য আসিয়াছে, যতই পটক্ষেপ হইয়াছে, ততই যেন সকলে আবার সে নৃত্য, সে সঙ্গীত শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এবং সেইজন্য, অন্ততঃ কালীয়-মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুত্থান সময়েও শ্রীকৃষ্ণের মুখে কোন সঙ্গীত শুনিলে যেন সকলের কতক তৃপ্তি হইত বলিয়া বোধ হইল—সম্ভবতঃ যেমন সঙ্গীত উক্ত রঙ্গালয়ে-অভিনীত 'প্রভাস-মিলনের' যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখে—" মা, মা, কোথা মা, কই মা" ইত্যাদিতে শুনিয়াছিলেন। দৃশ্যপটের মধ্যে যমুনা-কোলে কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্র ও চপলার চমক এবং বৃন্দাবনের নৈশ দৃশ্য বড়ই সুন্দর হইয়াছিল।) মোটকথা, দর্শকবৃন্দ নন্দ-বিদায়, প্রভাস-মিলন প্রভৃতি দেখিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী দেখিয়াও ততোধিক সন্তুষ্ট হইবেন।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বাবু কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

২১ নং নেউগীপুকুর ইষ্টলেন, তালতলা, কলিকাতা ঠিকানা হইতে আজকাল সঞ্জীবনী, নববিভাকর-সাধারণী প্রভৃতিতে নানা বোল্-বোলাওপূর্ণ, মন-ভুলান বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। সে বিজ্ঞাপন পড়িয়া আমরা তো অবাক হইয়াছি। যাইহোক, সে সম্বন্ধে আপাততঃ আমরা আর নূতন কিছু না বলিয়া, "শান্তির" কোন বিশ্বস্ত পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:——"সম্প্রতি 'সর্ব্বশাস্ত্র-সিন্ধু' নামক এক আড়ম্বর ও ধোঁকাযুক্ত বিজ্ঞাপন পাঠে ও তাহার আভ্যন্তরিক ব্যাপার অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে,—'এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিলে আর কোন অপ্রতুল থাকিবে না, আর কোন পুস্তকও ক্রয় করিতে হইবে না।' এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে গরু হারাইলে গরু মিলিবে, এই ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞাপনে আরো লেখা আছে যে, 'আমরা মাননীয়া শ্রীমত্যা রাণী দেবীর এবং ধর্ম্মসভার অর্থ-সাহায্য এবং অনেক ধনী ও পণ্ডিতগণের সাহায্য লইতেছি। সম্পূর্ণ পুস্তকের মূল্য ৮২৲ টাকা। কিন্তু আমরা তিন টাকা ছয় আনা খরচা মাত্র লইয়া এরূপ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি। এক্ষণে পঞ্চাশ হাজার মাত্র প্রকাশিত হইবে।' তা'ও আবার 'অগ্রিম ৩৲ টাকা পাঠাইলে ছয় আনা বাদ দেওয়া যায়।' কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল যে, কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বালক। তাহারই নামে চিঠিপত্র আইসে। আর, তথায় ধর্ম্ম-সভা বা উক্ত পুস্তকের অনুষ্ঠানের চিহ্ন-মাত্র নাই। শুনা গেল, ইহার মূলে বটতলার কোন পুস্তকওয়ালা আছে। কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্ম কেন? বিজ্ঞাপনদাতা লিখিয়াছেন, রয়াল ৮ পেজি আকারের চল্লিশ সহস্র পৃষ্ঠা সমগ্র পুস্তকে থাকিবে অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০০ ফর্ম্মা। আবার লিখিয়াছেন, এক্ষণে পঞ্চাশ হাজার মাত্র প্রকাশিত হইবে অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার করিয়া প্রত্যেক ফর্ম্মা এরূপ ৫০০০ ফর্ম্মা এক বৎসরে শেষ হইবে। দেখুন, যদি প্রত্যহ দশ হাজার করিয়া ছাপা হয়, তাহা হইলে ৫ দিনে একটী ফর্ম্মা নামে। এইরূপে দেখা যায় যে, ৩৬৫ দিন যদি অবিশ্রান্ত কোন মেশিন প্রেস কার্য্য করে, তবে এক বৎসরে ৭৩টী মাত্র ফর্ম্মা ছাপিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে লেখা যে, এক বৎসরে ৫০০০ ফর্ম্মা শেষ হইবে। আবার বিরাশি টাকা মূল্যের পুস্তকের খরচা ৩৶০ আনা লইয়া তিনি সকলকে পুস্তক দিবেন। এরূপ পুস্তকের খরচা ৩৶ আনা হওয়া দূরে থাকুক, তিন টাকার চারিগুণ অর্থাৎ প্রায় বার টাকা ডাক-মাশুলই লাগিবে। এক্ষণে ইহার সত্যাসত্য আপনারাই বিবেচনা করুন।"

আইন-প্রকাশকের এই কাজ!

মফঃস্বলবাসী আমাদের একজন উকীল-বন্ধু লিখিয়াছেন,—"মহাশয় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন্নগর হইতে জে, এম, সেন, এণ্ড কোং (J. M. Sen. & CO:.—Law-publishers.) একটী বিজ্ঞাপন জারী করেন যে, তাঁহারা ল'-ম্যাগাজিন্ ও লিগ্যাল্ কম্প্যানিয়ন (Law magazine and Legal companion) নামক মাসিক কাগজ (Law journal) বাহির করিবেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে,—'Anual sbuscription Rs 5; but a remittance of Rs 2-8 within Jully or August, 1888,' will entitle a subscriber to get a year's issues from April 1888.' অর্থাৎ বার্ষিক মূল্য ৫৲ টাকা; কিন্তু জুলাই বা আগষ্ট মাসের মধ্যে ২৷৷০ টাকা দিলে, এপ্রেল হইতে এক বৎসরের কাগজ পাইবেন। তদনুসারে আমি এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইলাম। জুন মাসের নম্বর পর্য্যন্ত পাইলাম। পরে দুই চিঠি লিখিলাম, জুলাই মাসের সংখ্যা পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোম্পানী মহাশয় চিঠির জবাবও দিলেন না; কিম্বা জুলাই মাসের সংখ্যা পাঠাইয়া দেন নাই। তা'র পরও কত পত্র দিলাম; কিন্তু সেই নীরব!" অভিযোগ তো এইরূপ! এখন আইন-প্রকাশক-কোম্পানী কি উত্তর দেন, তাই জানিতে বাসনা।

সংবাদ। ✓

—আজকাল অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ চারিদিক হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ২৪-পরগণার অন্ন-কষ্টের সংবাদ ইতিপূর্ব্বে অনুসন্ধানে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, ত্রিহুতেও আবার ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত। তজ্জন্য ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাতেই বা হইবে কি? এবার আবার আম-কাঁঠালও তথায় ভাল হয় নাই। সুতরাং অন্নকষ্টে বিস্তর লোক আসন্ন-মৃত্যু হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, কটক প্রদেশের দুর্ভিক্ষের সংবাদ আরও ভয়াবহ। সহচরের কোন সংবাদদাতা বলেন, —'কটকের ২০। ৩০ মাইল অন্তরে আঙ্গুন নামে একটী খাসমহল আছে। তথায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও কষ্টের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। অধিক কি, মানুষে মানুষ পর্য্যন্ত খাইতেছে। কিন্তু ইহা এখনও সাধারণের গোচর হয় নাই। প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে না।" কি ভয়ানক কথা! শুনিয়া তো প্রাণ শুকাইয়া আসিতেছে!

—কলিকাতায় অদ্ভুত কিছুই নাই। টাকা-চুরি জিনিষ-চুরি, জুয়াচুরি, এসব তো আছেই; আজকাল আবার 'মানুষ-চুরি' আরম্ভ হইয়াছে। শুধু 'মানুষ-চুরিই' বা বলি কেন, এ একরূপ 'বৌ-চুরি।' ভবানীপুরে একটী স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়। তাহার পিতা-মাতা কেহই ছিল না—তাহার মামা তাহার বিবাহ দেন। বউটি মামার নিকট পালিত হইত। নূতন শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া, সে তাহার মামাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হয়। তাহার মামার বাসা কলিকাতায়। একদিন একটী স্ত্রীলোক, তাহার এই মনের ভাব বুঝিয়া, তাহাকে মামার বাড়ী লইয়া যাইবে স্বীকৃত হয়; এবং তাহার স্বামীর অজ্ঞাতেই দুই জনেই বাহির হয়। বাহির হইয়া, সে কিন্তু বৌটিকে মামার বাড়ী না লইয়া গিয়া কলিকাতায় এক বেশ্যার বাড়ীতে ভুলাইয়া রাখিয়া আসে। এখন সন্ধানে সকল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেখুন পাঠক, কি অদ্ভুত কাণ্ড!

—অদ্ভুত হইলেও, অবিশ্বাস করিও না। চীন-সহরের একটী লোক মৃত্যুকালে তাঁহার স্ত্রীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া যান যে, স্ত্রী যেন আর বিবাহ না করে। স্ত্রীও তখন অন্তরের সহিত তাহাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন পরে, তাহার সুন্দরীত্বে মোহিত হইয়া একব্যক্তি তাহাকে বিবাহের জন্য চেষ্টা পান; আর, চীন-রমণীও প্রলোভনে পড়িয়া তাহাতে স্বীকৃতা হয়। কিন্তু বিবাহের সকল প্রস্তুত, এমন সময় একি বিভ্রাট! বিধবার মৃত স্বামীর প্রেত-যোনী যেন তখন সম্মুখীন হইয়া বিধবার ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, —'প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের এই-ই ফল!' বলা বাহুল্য, তাহাতেই কিন্তু চীন-মহিলার মৃত্যু হইল। কি অদ্ভুত ঘটনা!

—পাটনা-অঞ্চলের একব্যক্তি নূতন বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন, এমন সময় তত্রত্য পুলিস-কর্ত্তৃক বর-কন্যা সহিত পাল্কী আক্রান্ত হইল। অপরাধ, নব-বধূ পরমা সুন্দরী—তাঁবার রূপ-চ্ছটা দিগ্-বিভাসিত। কাজেই দারোগা বাবাজী আর সামলাইতে পারিলেন না; বরকন্যা আটক করিয়া, বরকে অন্য কাহারও হস্তে রাখিয়া, কোন রূপে কৌশলে আপন পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি দারোগা-বেশে সুসজ্জিত হইয়া, নিজের তরবারি-সহিত সাজিয়া, সেই রমণীকে এক নিভৃত ঘরে লইয়া আপন বাসনা পূর্ণ করিতে গেলেন। রমণী কিন্তু তখন এক মতলব খাটাইলেন; বলিলেন,—"আচ্ছা, তাই হবে। তবে আপনি বেশ ত্যাগ করুন।" কাজেই দারোগাকে তরবারি প্রভৃতি গৃহের এক প্রান্তে রাখিয়া রমণীর প্রেম-প্রার্থী হইতে হইল। রমণী তখন, শুনিলেও প্রাণে সাহস হয়, আস্তে আস্তে দারোগার-রক্ষিত সেই তরবারি লইয়া দারোগার মস্তকে এক কোপ মারিলেন। আর, দারোগার তাহাতেই জীবনান্ত! ধন্য সতীর বিক্রম!

—খিদিরপুরের দুইজন গুণ্ডা মুসলমান রাত্রিকালে একজনদের ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া তাহার স্ত্রীকে জাপটাইয়া ধরিয়া পলায়ন করে; এবং খানিক গিয়া একখানি গাড়িতে তাহাকে চড়ায়। গাড়ি চলিবার সময় অভাগিনী কিন্তু সুযোগ পাইয়া এক লম্ফ দেয় ও চীৎকার করে। তখন তাহার চীৎকারে দুষ্টেরা ধৃত হইয়াছে। ✓

—ধর্ম্মপ্রচারকে 'ধূমকি' নামক এক অদ্ভুত ভূতের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঘটনাটি তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দেখা; ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, সবজজ প্রভৃতি সকলেও দেখিয়াছেন। দুইটি অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক, একদিন রাত্রে আহারান্তে আঁচাইতে গিয়া, একটী শৃগালকে দেখিতে পায়; এবং তাড়া দেওয়ায়, শৃগালটী তাহাদিগকে আঁচড়াইয়া যায়। ইহাতে তাহারা ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হয়, ও নানা বিভিষিকা দেখিতে থাকে; এবং মাঝে মাঝে আতঙ্কে কাঁপিয়া ও কাঁদিয়া উঠে। বলে,—"ঐ ধূমকি!—হাত নাই—পা নাই—স্তম্ভের মত। ঐ এলো —ঐ এলো।" এইরূপেই দিন যায়। কিন্তু একদিন আবার কোন আত্মীয়ের নিকট বসিয়া থাকিতে থাকিতে চীৎকার করিল,—"ঐ কামড়াইল—কামড়াইল।" কাজেই চীৎকার শুনিয়া, তাহাদের আত্মীয় গায়ে হাত দিয়া দেখেন, তাহাদের গাত্রে কাপড়ের নিচে কামড়ের দাগ। আর একদিন একজন চিকিৎসক ঔষধ দিয়া বলিয়া যান যে,—"যেন ভুতে ইহা না লইতে পারে; বেশ ভাল করিয়া সন্তর্পণে রাখিবেন।" তাঁহারাও তাহাই করেন; যত্নসহ সিন্দুকের ভিতর চাবি দিয়া রাখেন। কিন্তু হঠাৎ বালিকারা বলিয়া উঠিল,—"ঐ সিন্দুক হইতে ভুত আদখানা ঔষধ কটিয়া লইয়া গেল।" কি আশ্চর্য্য, সিন্দুক খুলিয়াও তাহাই দেখা গেল। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা আরও অনেক সকলে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। যাইহোক, পরে কোন তান্ত্রিক পণ্ডিত তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের আরোগ্য করিয়াছেন। কি অদ্ভুত কাণ্ড!

অনুসন্ধান।

—:০(০)০:—

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ১৫ই আষাঢ়, ১২৯৬ সাল। [২২ সংখ্যা।

স্তোত্র।

বিভাস—একতালা।

"জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ-জীবন;
তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম আদি-অন্ত-কারণ,
মহিমার ইন্দ্র, দয়ার চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন:
(কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা)
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি,
দেও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষনাশন,
(একবার দেখা দেও হৃদয়-মাঝে)
তুমি দীনশরণ, ভকত-জীবন,
লজ্জাভয়-নিবারণ।"

জুয়াচোরের বাহাদুরী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মচারী গোপালের কথাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলেন; এবং একটী একটী করিয়া সমস্তগুলি লিখিয়া লইলেন। আর, গোপাল যাহা যাহা বলিলেন, তাহার সমস্তই যে মিথ্যা কথা, ইহাই তাঁহার মনে স্পষ্ট বিশ্বাস জন্মিল।

পুলিশ-কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই প্রথমে কাহারও অবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করেন না। কোন্ ব্যক্তি কি চরিত্রের লোক, তাহা প্রথমে প্রায়ই ভাবেন না; কাহার হৃদয় কিরূপ উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাও একবারের নিমিত্ত প্রথমে দেখেন না। যিনি যাহা বলেন, "মিথ্যা কথা" বলিয়া তাহা প্রথমে স্থির করিয়া লওয়াই পুলিশ-কর্ম্মচারীদিগের একটী প্রধান গুণ। এই গুণ ঈশ্বরদত্ত গুণ, কি কর্ম্মজনিত গুণ, তাহা স্থির করা সহজ নহে। ইনিও সেই গুণের নিমিত্তই গোপালের সমস্ত কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রথমে স্থির করিয়া লইলেন; ও মনে মনে সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, গোপালই এই ভয়ানক জুয়াচুরি-কাণ্ডে পরিলিপ্ত।

বলা বাহুল্য যে, সে দিবস গোপালচন্দ্র বিনা দোষে দোষী সাব্যস্থ হইলেন। আপনার অর্থের নিমিত্ত আপনিই চৌর্য্য-অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া রাত্রির নিমিত্ত চোরের মত বন্দীভাবে কয়েদ-গৃহে অবস্থান করিলেন।

পরদিবস প্রত্যূষে কর্ম্মচারী গোপালকে লইয়া সুন্দরীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

ক্রমে গোপালের গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সুন্দরী তাঁহার পুত্রের অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ গোলকচন্দ্র এই সংবাদ পাইবা মাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মচারীকে বিশেষ সমাদরের সহিত বসিতে দিলেন; এবং তাঁহার নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। মনে মনে অতিশয় ভয়ও পাইলেন। কারণ, কোম্পানির কাগজগুলি এতদিবস পর্য্যন্ত তিনিই রাখিয়াছিলেন; বিশেষ, এই কাগজ-ঘটিত যদি প্রকৃতই কোন বিপদ ঘটে, তাহা হইলে তিনিও তাহাতে জড়িভূত হইতে পারেন।

কর্ম্মচারী বিশেষ মনোযোগের সহিত গোলকচন্দ্রের কথাগুলি শুনিলেন। কিরূপে ঐ কাগজগুলি তাঁহার নিকট রাখা হয়, রজনীকান্তের মৃত্যুর পর গোপাল ও সুন্দরীর কিরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, এত দিন পর্য্যন্ত ঐ কাগজগুলি রজনীকান্ত কিরূপে আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন, কেনই বা উহার সুদ এতদিন পর্য্যন্ত লওয়া হয় নাই, এবং কেনই বা কাগজগুলি এখন গোপালের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, প্রভৃতি সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিলেন।

গোলকচন্দ্রের নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, কর্ম্মচারী সুন্দরীকেও ডাকাইলেন; এবং তাঁহাকে অন্তরালে রাখিয়া তাঁহারও সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কথাও গোলকচন্দ্র ও গোপালের কথার সহিত মিলিল। তখন কর্ম্মচারীর মনে গোপালের উপর যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মন হইতে অনেক দূরীভূত হইল। সেই সময় কর্ম্মচারী সুন্দরীর নিকট হইতে আরও একটী কথা জানিতে পারিলেন। গোলকচন্দ্র ও গোপালও সে কথা এপর্য্যন্ত জানিতেন না। পাঠকগণ কিন্তু তাহা অবগত আছেন; উহা রজনীকান্তের লিখিত ও তাঁহার মৃত্যুর অনতিবিলম্বে প্রাপ্ত সেই পত্রের কথা। সুন্দরী এতদিন পর্য্যন্ত উহা বিশেষ যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছিলেন। এখন, তিনি সেই পত্র আনিয়া কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। কর্ম্মচারী সর্ব্ব-সমক্ষে সেই পত্র খুলিলেন। পত্রের ভিতর প্রথমেই একখানি হাজার টাকার নোট পাইলেন; এবং তাহার সহিত যাহা কিছু লেখা ছিল, তাহাও ক্রমে পড়া হইল। পরে উহার অবশিষ্টাংশ তাঁহারা খুলিলেন; এবং তাহাতেও যাহা যাহা লেখা ছিল, তাহাও সকলে জানিতে পারিলেন।

গোলকচন্দ্র ও গোপাল সেই পত্রে-লিখিত সংবাদ-পত্রের বহু অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু সেই স্থানে উহা পাওয়া গেল না। না পাইয়া তখন কর্ম্মচারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া সেই সংবাদপত্রের বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যদিও প্রথমে হঠাৎ তাহা পাইলেন না; কিন্তু পরিশেষে অন্য আর একটী প্রধান সংবাদপত্রের আফিস হইতে সেই পুরাতন সংবাদপত্র বহুকষ্টে সংগ্রহ করিলেন। আর, ঐ সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন পাঠে গোপালের উপর আর কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না।

কর্ম্মচারী তখন গোপালকে একেবারে নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি দিলেন; এবং সেই সমস্ত কোম্পানির কাগজ যে তাঁহারই, তাহাও তাঁহার উদ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রকাশ করিলেন। এখন, সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল কাগজের নিমিত্ত কি একটী ভয়ানক জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ তখন এই সকল বিষয় উত্তমরূপে অবগত হইলেন; এবং তাঁহাদের মনেও গোপালের উপর আর কোন প্রকার সন্দেহ রহিল না। যাহাহোক, অতঃপর এই জুয়াচুরি কাণ্ডের গূঢ় রহস্য সকল বাহির করিবার নিমিত্ত ঐ কর্ম্মচারীই নিযুক্ত রহিলেন।

তিন চারি মাস কর্ম্মচারীর আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি যে কোথায় গেলেন, কি করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। ইহার মধ্যে একদিবস মাত্র তাঁহাকে বর্দ্ধমানের রেজেষ্টরি-আফিসে ও তিন চারি দিবস বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের ভিতর দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। উভয় স্থলেই তিনি কতকগুলি কাগজ-পত্র লইয়া, কি দেখিতেন।

চারি মাস পরে হঠাৎ এক দিবস ঐ কর্ম্মচারী গোলকচন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তিনি একাকী নহেন, সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক ও দুইটী পুরুষ; এবং হস্তে কতকগুলি কাগজ। গোলকচন্দ্র এই সংবাদ পাইবা মাত্র বাহিরে আসিয়া কর্ম্মচারীকে বিশেষ সমাদরের সহিত আপনার বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। সেই স্থানে সকলেই বসিলেন। গ্রামের অপরাপর কতকগুলি ভদ্রলোকও ক্রমে ক্রমে আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

তখন কর্ম্মচারী তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখুন, এখন আর মিথ্যা বলিয়া আপনাদিগের কোন লাভ নাই। আপনারা যে এ কার্য্য করিয়াছেন, এখন তাহার সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই কএকটী কাগজে যাহা যাহা লেখা আছে, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, আর বোধ হয় আপনারা কোন কথাই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।"

এই বলিয়া কর্ম্মচারী সকলের সমক্ষে একটী একটী করিয়া কএকটী কাগজ পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মচারী যে কএকটী কাগজ সেই স্থানে পড়িলেন, তাহার মধ্যে একখানি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বড় সাহেবের জবানবন্দী। তাহার মর্ম্ম এই:—"আমি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। প্রায় ২৫ বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত আছি। কোম্পানির কাগজঘটিত যে কোন কর্ম্ম আমিই সম্পাদন করিয়া থাকি। পনের বৎসর পূর্ব্বে এক দিবস আমি আফিসে বসিয়া কর্ম্ম করিতেছি, এমন সময় এক ব্যক্তি সুন্দরীর দস্তখতি এই আবেদন-পত্র আনিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল। আমি উহা পড়িলাম। পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে, 'সুন্দরীর বাড়ী হইতে আবেদন-পত্রে-লিখিত নম্বরের ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ চুরি হইয়া গিয়াছে; ও সুন্দরী প্রার্থনা করিতেছে যে, তাহার ঐ সকল কোম্পানির কাগজের দেনা পাওনা যেন একেবারে বন্ধ থাকে। কারণ, যদি ঐ সকল কাগজের কোন প্রকার সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের নিয়ম-মত নিয়মিত সময় অতীত হইলে তিনি ঐ সকল কাগজের পরিবর্ত্তে নূতন কাগজ গ্রহণ করিবেন।' আমি এই আবেদন-পত্র পাইয়া সুন্দরীর কথায় বিশ্বাস করিলাম; এবং কাগজের নম্বর স্থগিদ রাখিলাম। পরে বৎসর পর্য্যন্ত কাগজের আর কোন কথা শুনিলাম না। তাহার পর হঠাৎ এক দিবস রামধন গুপ্ত নামীয় একটী লোক আসিয়া ঐ সকল কাগজ পাইবার প্রত্যাশায় আমার নিকট আবেদন করিলেন। ঐ দরখাস্ত পড়িয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, ঐ ব্যক্তি সুন্দরীর মোক্তার। সুন্দরী ঐ কাগজগুলি বাহির করিয়া লইবার নিমিত্ত তাঁহাকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই দরখাস্ত এই! ইহার সহিত আরও একখানি কাগজ সংলগ্ন ছিল; তাহাও এই। ইহা বর্দ্ধমানের রেজেষ্টরী-আফিসের সহি-মোহর-যুক্ত ও রেজেষ্টরী করা মোক্তার-নামা। এই কাগজ দৃষ্টে আমি তাঁহাকে সুন্দরীর মোক্তার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলাম; এবং আমাদিগের আফিসের রীত্যনুসারে অন্যান্য লেখা-পড়া প্রভৃতি সমাধা করিয়া দিলাম। তবে তাঁহাকে ঐ টাকার নূতন কাগজ প্রদান করিবার

পূর্ব্বে, আমার মনে সন্দেহ হইল যে, এই মোক্তার-নামা প্রকৃত কি না! সুতরাং আমি তাঁহাকে ইহার কোন কথা না বলিয়া, ঐ মোক্তার-নামা বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট একবার পাঠাইয়া দিলাম। তিনিও সেই স্থানে নিয়মিত অনুসন্ধান করিয়া আমাকে লিখিলেন,—'এই মোক্তার-নামা প্রকৃতই এই স্থানে রেজেষ্টরী হইয়াছে।' তখন আমি আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে ঐ ত্রিশ হাজার টাকার নূতন কাগজ অর্পণ করিবার আদেশ দিলাম। মোক্তার ঐ কাগজ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এখন জানিতে পারিতেছি যে, প্রকৃত সুন্দরীর কাগজ চুরি হয় নাই বা তিনি নূতন কাগজ পান নাই। যে ব্যক্তি আমার নিকট সুন্দরীর মোক্তার-পরিচয়ে আসিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে ঐ ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ দেওয়া হইয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিব। আর, আমার আফিসের কর্ম্মচারীগণও তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবেন।"

কর্ম্মচারী এই কাগজের মর্ম্ম পড়াইয়া সকলকে অবগত করাইলেন; এবং পরে অন্য আর একখানি কাগজ লইয়া পড়িলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

"যে সময় এই দলিল রেজেষ্টরি হইয়াছে, সেই সময় বর্দ্ধমানের রেজেষ্টরি-আফিসে আমি রেজিষ্ট্রার ছিলাম। আমি এই দলিল রেজেষ্টরি করিয়াছি। সুন্দরী আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমি সুন্দরীকে চিনিতাম না; কিন্তু সেই স্থানের হরবল্লভ নামীয় একজন মোক্তারের নির্দ্দেশ-মত আমি এই মোক্তার-নামা রেজেষ্টরি করি। হরবল্লভ সুন্দরীকে চিনেন। আমি হরবল্লভের কথা বিশ্বাস করিয়াছিলাম; কারণ, তিনি সেই স্থানের একজন অতি বৃদ্ধ মোক্তার, এবং তাঁহার বাসস্থান পর্য্যন্তও আমি অবগত আছি। যদি আপনি হরবল্লভের সন্ধান না পান, তাহা হইলে আমি আপনার সহিত গমন করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিব।"

এই কাগজখানি পাঠ সমাপ্ত হইলে, কর্ম্মচারী তৃতীয় কাগজখানি বাহির করিয়া পড়িলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

"আমার নাম হরবল্লভ রায়। আমি এই স্থানের এক জন মোক্তার। আমার নির্দ্দেশমত এই মোক্তার-নামা রেজেষ্টরি হয়। আমিই রেজিষ্ট্রারের নিকট সুন্দরীকে সোনাক্ত করিয়াছিলাম। আমি কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতাম না। আমি রামধন গুপ্তকে চিনি; তাঁহার সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ আছে। আমি সময়ে সময়ে তাঁহার অনেক কার্য্যও করিয়াছি। আমি রামধনকে ভাল লোক বলিয়াই জানি, ও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া থাকি। সেই রামধনই আমাকে সুন্দরীর মোক্তার নিযুক্ত করেন। তিনিই একটী স্ত্রীলোককে আমার নিকট লইয়া আসেন; এবং তাঁহাকেই আমার নিকট সুন্দরী বলিয়া পরিচিত করিয়া দেন। আমি তাঁহারই কথায় বিশ্বাস করিয়া সুন্দরীকে চিনি বলিয়া রেজেষ্টরি-আফিসে তাঁহাকে সোনাক্ত করি। আমি রামধন গুপ্তকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম বলিয়া, এই গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। আমরা পরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া এইরূপ কার্য্য সর্ব্বদা করিয়া থাকি। সুন্দরী যখন আমার নিকট আসিয়াছিলেন, সেই সময় রেজেষ্টরি-আফিস ২।৩ দিন বন্ধ ছিল। এই নিমিত্ত সেই কয়েক দিবস তিনি আমার বাসাতেই ছিলেন। আমি তাঁহাকে উত্তমরূপ দেখিয়াছি। তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিব। আর, রামধনেরও বাড়ি পর্য্যন্ত আমি অবগত আছি। যদি আপনি তাঁহার কোন সন্ধান না পান, তাহা হইলে আমি আপনার সহিত গমন করিয়া তাঁহার বাড়ি দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।"

এই কাগজখানি পাঠ সমাপ্ত হইলে কর্ম্মচারী আর একখানি কাগজ বাহির করিয়া পড়িলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"আমি হরবল্লভ বাবুর মুহুরি। যখন এই মোক্তার-নামা রেজেষ্টরি হয়, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। রামধন বাবুই সুন্দরীর মোক্তার নিযুক্ত করেন। যে সময়ে রামধন বাবু এখানে আসিয়াছিলেন, সেই সময় অবিনাশ গুপ্ত নামীয় এক ব্যক্তিও তাঁহার সহিত এখানে আসিয়াছিলেন। রামধন এবং অবিনাশ উভয়কেই আমি চিনি। তাঁহাদের বাড়ি একই গ্রামে ও একই স্থানে। তাঁহাদের মোক্তার-নামা রেজেষ্টরি হইলে, কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আমি একবার তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়াছিলাম; এবং সুন্দরীকেও সেই স্থানে দেখিয়াছিলাম। আমার বোধ হয়, সুন্দরীর বাড়িও সেই গ্রামে। আমি তাঁহাদিগকে যখন দেখিব তখনই চিনিতে পারিব। আবশ্যক হইলে, আমি আপনার সহিত গমন করিয়া তাঁহাদিগের উভয়ের বাটী পর্য্যন্তও দেখাইয়া দিতে পারি।"

এই কয়েকখানি কাগজ পাঠ সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মচারী তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণকে বলিলেন,—"দেখিলেন, আপনাদিগের উপর কি প্রকার সাক্ষ্য এখন সংগ্রহ হইয়াছে! এবং ইহা অপেক্ষা আরও অন্যান্য সাক্ষ্য যে সংগ্রহ হইতে পারিবে, তাহারও ভুল নাই। এখন, আমার বিবেচনায় আপনাদিগের সকলেরই সত্য কথা বলা উচিত। কারণ, কোন গতিকে আপনাদিগের আর বাঁচিবার উপায় নাই। তবে যিনি প্রথমে সত্য কথা বলিবেন, আমি তাঁহাকে সাক্ষ্য-শ্রেণীতে গণিত করিয়া, তাঁহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিব।"

কর্ম্মচারীর এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ঐ তিনজন লোকের ভিতর স্ত্রীলোকটী তখন বলিলেন,—"আমি প্রথমে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কারণ, এই বিপদ হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করুন আর নাই করুন, আমি কিছুতেই মিথ্যা কথা বলিব না। আমি যাহা জানি, তাহা সমস্তই বলিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন।"

সত্যানন্দ।

(৩)

"সায়াহ্ন-কৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন.

'তোমার কন্যা জীবিত আছে।'

মহে। কোথায় মহারাজ?

সত্য। তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন?

মহে। সকলেই বলে তাই। মঠের অধিকারীদিগকে রাজ-সম্বোধন করিতে হয়। আমার কন্যা কোথায় মহারাজ!

সত্য। তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ!

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যতদিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, ততদিন, তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে? দেখিতে ত পাইবে না!

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ একাজের

উপযুক্ত নহে। মায়া রজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে-বাঁধা ঘুঁড়ির মত সে কখন মাটী ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী-পুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে ?

সত্য। পুত্র-কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তান-ধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে ?

মহে। তাহাকে না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব ?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তানমাত্রেই কি এইরূপ পুত্র-কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে ? তাহাহইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প।

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুটের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্য লাঠি-সড়কীওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি ? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন ? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে ?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন ?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন ? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের লক্ষণ, দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্ত্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংশ, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে, তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্মমাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়। কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে ?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিমবাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। সে ঐ রকম কথা সকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়, তোমরা যিশুকে প্রেম কর। এ যে সেই রকম কথা।

সত্য। যে রকম কথায় আমাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছে, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ ?

মহে। হাঁ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটি গুণের পৃথক পৃথক উপাসনা। সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি,—তাহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর, রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা। আমরা তাহাই করি। আর, তমোগুণ হইতে ভগবান শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রকচন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়,—সর্ব্ব সাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে ?

মহে। বুঝিলাম, সন্তানেরা তবে উপাসক-সম্প্রদায় মাত্র ?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহিনা—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।"

এ অদ্ভুত দীক্ষার তাৎপর্য্য স্বয়ং সত্যানন্দ ঠাকুরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অনন্যকার্য্য, অনন্যমনা, সর্ব্বত্যাগী না হইয়া এ ব্রত উদ্যাপন করিতে কেহ সমর্থ নহে। তাই পরম প্রতিভাশালী প্রজ্ঞাচক্ষু সত্যানন্দ সেই সন্তান সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া লইতেন। সকলকে নহে—সকলে ইহা পালন করিতে সক্ষম নহে—তাই দলের অন্য লোকের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ কূটবুদ্ধিতে কোন রাজনৈতিক অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

আমরা এতক্ষণ সত্যানন্দের সাধনা ও কার্য্য দেখিয়াছি। এখন তাঁহার সেই সাধনা ও কার্য্যের ফলাফল দেখিব। ফল না দেখিয়া কার্য্যের ভালমন্দ বিচার সকল সময়ে ঠিক হয় না।

সত্যানন্দের সঙ্কল্প, স্বদেশোদ্ধার। অত্যাচারী মুসলমান হইতে স্বদেশকে রক্ষা করা—হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা ও স্বদেশে দেশভক্তি প্রচার করাই সত্যানন্দের একমাত্র ব্রত। ইহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—একমাত্র হিন্দুরাজ্য স্থাপন ব্যতীত অন্য দুইটি সঙ্কল্প সত্যানন্দের সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার অদ্ভুত কৌশলে ও ঐকান্তিকী চেষ্টায় মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইল, ও স্বদেশে দেশভক্তিরও স্ফুরণ হইল। সত্যানন্দের যেরূপ ব্রত, যেরূপ সাধনা, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হওয়াই উচিত; কিন্তু সময়ের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থকার এরূপ আদর্শ চরিত্রের সম্যক ফল দেখাইতে অক্ষম হইলেন। কাহারও কাহারও মতে সত্যানন্দের সাধনার সম্যক্ সিদ্ধিই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন; কাহারও কাহারও মতে সেই সাধনা সময়োচিত যতটা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব, গ্রন্থকার তাহাই ফলে দেখাইয়াছেন। সময় ও ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পন্থা ছাড়াইয়া কার্য্য করিলে, ঐকান্তিকী চেষ্টা-যত্নও সফল হইবার নহে।

এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি এইরূপ। গ্রন্থকার চিকিৎসকের মুখে বলিতেছেন,—

'সত্যানন্দ! কাতর হইও না। যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরাজ আগে রাজা না হইলে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা আর্য্যধর্ম্ম নহে। সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম। তাহার প্রভাবে প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে, তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক; কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই আর্য্যধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কাজেই প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্নদেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত; লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরাজকে রাজা করিব। ইংরাজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া,অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনা-আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা' হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর ধনবান হয়, ততদিন ইংরেজ-রাজা অক্ষয় থাকিবে। অতএব হে বুদ্ধিমন্! ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।

"ইংরেজ এক্ষণে বণিক্—অর্থ-সংগ্রহেই মন, রাজ্য-শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান-বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে। কেননা, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।"

এই কথাগুলি লইয়া দুই দলের বড়ই মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কথাগুলি সরল ভাবেই লিখিত হউক, কি কপট ভাবেই লিখিত হউক, অতি গুরুতর সন্দেহ নাই। হয় ইহাতে গ্রন্থকারের সমগ্র গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য লিখিত আছে, নতুবা ইহাতে গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য গোপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে ভাবেই দেখা যায়, কথাগুলি গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং এ-সম্বন্ধে মতদ্বয়ের অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত উক্তি না উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

একদল বলেন, গ্রন্থকার রাজকর্ম্মচারী—রাজা ইংরাজ। সমস্ত গ্রন্থে রাজবিদ্রোহ ও স্বদেশোদ্ধারের কথাই লিখিত হইয়াছে। পাছে ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষগণ কিছু মনে করেন, এই জন্য গ্রন্থকার সত্যানন্দের সাধনার এইরূপই সিদ্ধি দেখাইয়াছেন। ইংরাজ-রাজত্বের এই জন্যই আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপিচ, গ্রন্থে যখন ইতিহাসের ছায়া আছে, তখন ইংরাজের সঙ্গে সত্যানন্দের বিরোধ দেখাইতে হইলে সত্যানন্দের জয় দেখান যায় না। এইজন্য একেবারে ইংরাজকে টানিয়া না আনিয়া, আংশিক তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়াছেন। আনিয়া, সন্তান-সম্প্রদায়ের হস্তে তাহাদিগের পরাজয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস বজায় রাখিয়া এতদপেক্ষা সত্যানন্দের সিদ্ধি প্রদর্শন অসম্ভব। বহিস্তত্ত্ব, অন্তস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথা কেবল বাগাড়ম্বর বক্তৃতামাত্র। গ্রন্থখানির স্থূল তত্ত্ব এই যে, স্বদেশোদ্ধার করিতে হইলে সত্যানন্দের ন্যায় সাধনা চাই। এইরূপ সাধনার সিদ্ধি অনিবার্য্য। ধন নাই, জন নাই, অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, ইহা কোন কাজের কথা নহে। অধ্যবসায় ও হৃদয়ের বল থাকিলে, অন্য সব ধনই করায়ত্ত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি একান্ত কায়মনে, ভক্তিভরে, দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত, সাধু ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সাধুকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, তাহার সিদ্ধি অপ্রতিহার্য্য। সত্যানন্দের সাধনার সম্যক্ সিদ্ধিই গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। তবে কতক ইতিহাস, কতক রাজশাসনের ভয়ে তাঁহাকে মনোভাব গোপন করিবার কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সত্যানন্দের যুদ্ধে জয় পর্য্যন্ত তোমরা মনে রাখ; পরের কথায় ভুলিও না। উহা গ্রন্থকারের মনের কথা নহে।

অন্যদল বলেন,—ইহা ঠিক নহে। রাজভয়ে গ্রন্থকারের মনোভাব স্থানে স্থানে গোপন

করিতে হইয়াছে বলিয়া, এরূপ গুরুতর স্থানে মনোভাব গোপনের পাত্র তিনি নহেন। যাহাতে লোকের মনে বিপরীত ভ্রান্তির সম্ভাবনা, তাহাতে গ্রন্থকার কোন দিনও হস্তক্ষেপ করেন না। বাস্তবিক কথা এই।

সকল বিষয়েরই ক্রম-বিকাশ আছে। অঙ্কুর হইতে একেবারেই বৃহৎ বৃক্ষ সঞ্জাত হয় না—সেই বৃক্ষের বিকাশের স্তর আছে। স্বদেশোদ্ধারই বল, স্বধর্ম্মোদ্ধারই বল, একবারে ধাঁ করিয়া তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পথ লঙ্ঘন করিয়া চলিলে, সত্যানন্দের ন্যায় সাধকেরও সিদ্ধি অসম্ভব। সত্যানন্দ দেশ-ভক্তিতে অন্ধ হইয়া চক্ষে যাহা দেখিতে পান নাই, চিকিৎসক তাহাই তাঁহাকে দেখাইলেন। সত্যানন্দের জ্ঞানের অভাব চিকিৎসক পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তবে গ্রন্থকার ইহাও দেখাইয়াছেন যে, সত্যানন্দের ন্যায় সাধকের সাধনা যতটুকু পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইয়াছে। সত্যানন্দের আকাঙ্ক্ষা অসময়োচিত হইলেও,মধ্যে মধ্যে এইরূপ লোক চাই। ইহাতে অন্ততঃ সময়োচিত আকাঙ্ক্ষাটুকুও পূর্ণ হইতে পারে। কতটা সময়োচিত, কতটা সময়োচিত নহে, তাহা দেখিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের নাই। সাধারণের পক্ষে সত্যানন্দের সাধনাই বিহিত।

উভয় পক্ষেরই কথা আমরা সংক্ষেপে বলিলাম। পাঠকগণ ইহার ভালমন্দ বিচার করিয়া লইবেন। কথাটি অতি গুরুতর। এমন কি, এই কথাগুলির উপরেই সমগ্র গ্রন্থখানি স্থাপিত। যদি সময় ও সুযোগ হয়, আমরা এসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

সত্যানন্দের সাধনা ও ফল সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ, তদবলম্বিত উপায় সম্বন্ধেও সেইরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। সে কথাটিও গুরুতর। আমরা তাহারও একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠকবর্গের সম্মুখে স্থাপিত করিলাম।

সত্যানন্দের কামনার সিদ্ধি সম্বন্ধে যাহাই হউক, দেখা গেল যে, তাঁহার বহুযত্ন-সৃজিত অদ্ভুত সন্তান সম্প্রদায় পরিণামে একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী নহে—সত্যানন্দের সেই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্তে। সেই আর্থরের বীর-সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রধান প্রধান সন্তানগণ সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিল না—বীর জীবানন্দ, ধীর ভবানন্দ সকলেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বিনষ্ট হইল। তবে সত্যানন্দের এরূপ পন্থা কি প্রকৃষ্ট পন্থা নহে?

একদল বলেন যে, সত্যানন্দের এরূপ পন্থা প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেই পারে না। সামাজিক নিয়মের বিপর্য্যয় সাধন করিয়া অথবা স্বয়ং গ্রন্থকারের ভাষায় বলিতে গেলে 'সমাজ-বিপ্লব' সংঘটন করাইয়া কোন প্রকার সুফল লাভ করা বড়ই দুরূহ। বিবাহিত ব্যক্তিবর্গকে—মায়াশীল ব্যক্তিবর্গকে, প্রতিজ্ঞা-দ্বারা স্ত্রী-পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া—মায়ার বস্তু হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া, কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সুফল আশা করা যাইতে পারে না। তাই জীবানন্দ ও ভবানন্দ প্রভৃতির দ্বারাও সত্যানন্দের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না—সন্তান-সম্প্রদায় এত যত্ন-সৃজিত হইলেও, স্বল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

অপর দল বলেন যে, ঠিক তাহা নহে। একদিকে ভবানন্দের কথা দেখিলে যেরূপ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা জন্মে, সেইরূপ মহেন্দ্রের কথা ভাবিলে অন্যরূপ সিদ্ধান্তে আসিতে ইচ্ছা হয় না কি?

মহেন্দ্র একদিন তাহার স্ত্রী-কন্যার মায়ার জন্যই সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চাহে নাই। কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল যে, তাহার স্ত্রী-

কন্যা বাঁচিয়া নাই, তখন সে একজন প্রকৃষ্ট সন্তান হইয়া দাঁড়াইল। আর ভবানন্দের কথাই বা এমন কি সূচিত করে? ভবানন্দের দ্বারা কি সত্যানন্দের কার্য্য হয় নাই? কে বলিবে? সেইদিন ভবানন্দ না থাকিলে— সত্যানন্দ-সৃষ্ট ভবানন্দ না থাকিলে, যুদ্ধে কি জয়লাভ হইত? তবে ভবানন্দ যুদ্ধে মরিল। তাহাতে ক্ষতি কি? এরূপ সম্প্রদায় কি চিরস্থায়ী থাকিতে পারে? ইহার উৎপত্তি সাময়িক কার্য্য সাধনের জন্য—চিরকালের জন্য নহে। ভবানন্দের ওরূপ প্রতিজ্ঞা না থাকিলে, তাঁহার কি ঐরূপ কার্য্য দেখিতে পাইতাম? ভবানন্দের মৃত্যু কি ভবানন্দের দুঃখসূচক পরিণাম? অন্যে যাহাই ভাবুক, আমরা এরূপ ভাবিনা। সত্যানন্দের প্রতিজ্ঞাই সকলের হৃদয়ে-রক্ষিত শক্তি (Reserved energy) স্বরূপ বর্ত্তমান ছিল। যথা-সময়ে তাহা কার্য্যকরী হইল। ভবানন্দের মৃত্যু দেখিয়া তোমরা সত্যানন্দের সৃষ্ট সন্তান-সম্প্রদায়ের দোষ দিওনা। সত্যানন্দ উহা দ্বারাই যতদূর সম্ভব কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারেন। তবে ও কথা কেন?

কার্য্যের ফল না দেখিয়া এমনি দেখিলেও এইরূপই দেখিতে পাইবে। সাধারণতঃ স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতিই আমাদিগকে কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিরত রাখে। সত্যানন্দ তাহাই জানিতেন বলিয়া ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জীবানন্দের স্ত্রীর মত স্ত্রী থাকিলে, তাহার সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখা সত্যানন্দের ইচ্ছা নহে। ইহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন।

সংক্ষেপে গ্রন্থকার ইহাই দেখাইয়াছেন যে, সত্যানন্দের উপায় মোটের উপরে কার্য্যকরী বটে। দুই একবার বা দুই এক জনার পদস্খলন হইবে বলিয়াই যে সে পথ অবলম্বনীয় নহে এরূপ বিবেচনা গর্হিত। ভবানন্দের পদস্খলনও সাধারণ লোকের ধর্ম্ম হইতে অনেক উচ্চে। উহা চন্দ্রের কলঙ্কস্বরূপই বটে।

এখন পরম সাধক সন্ন্যাসী সত্যানন্দের জীবনী একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক। যে যে কার্য্যই করুক না কেন, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মের একটা সংশ্রব না থাকিলে, সে কার্য্য প্রশংসার যোগ্য নহে। সত্যানন্দের কার্য্যের সহিত তবে ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধ প্রথমে দেখিতে হইবে। এই সম্বন্ধ-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কিছু ইঙ্গিত আছে। তিনি গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায় হইতে কয়েকটি শ্লোক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। শ্লোকগুলির অনুবাদ এইরূপ :—

"আর যাহারা মদেকহৃদয়ে আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম ন্যস্ত করত ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকাল-মধ্যেই এই মৃত্যু-পূষিত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। অতএব তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ কর। তাহাহইলে শরীরাবসানে আমাতে লীন হইবে। হে ধনঞ্জয়! অন্তঃকরণ আমাতে স্থির না হইলে প্রথমতঃ অনুধ্যানরূপ অভ্যাসযোগ-দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা কর।"

ইহার সহিত সত্যানন্দের সংশ্রব বুঝিতে পারিলাম না। সত্যানন্দ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছেন না — লাভালাভ জয়াজয় সম্বন্ধে তাঁহার সমজ্ঞান দেখিতে পাই না। সত্যানন্দের সহিত অভ্যাসেরও সম্বন্ধ বড় নিকট নহে। সত্যানন্দের এক কামনা ভিন্ন কামনান্তর দেখিতে পাই না। অভ্যাস দ্বারা ভগবানে মতি স্থির করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তবে অভ্যাস দ্বারা অনেকটা গুণ শিক্ষা হয়— সন্ন্যাসধর্ম্ম এই অভ্যাস জন্য—এই প্রকারে কষ্টকল্পনা দ্বারা শ্লোক কয়েকটিকে সত্যানন্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা না করিয়া ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকটির

সাহায্য গ্রহণ করিলে, কথাটি পরিস্কার হয়। সে শ্লোকটির অনুবাদ এই :—

"যদি তাহাতে অশক্ত হও, তাহাহইলে আমার প্রীতিপ্রদ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানে তৎপর হও।"

ভগবানের প্রীতিপ্রদ কার্য্য-মধ্যে, দুষ্টের দমন—অত্যাচারীর শাসন অন্যতম সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ এই কার্য্যেই ব্রতী। সুতরাং সত্যানন্দের ঐরূপ কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত ও শাস্ত্রসঙ্গত। 'অনন্দ মঠে' সত্যানন্দের কার্য্য সকাম—ভক্তিপূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

দুইখানি ছবি।

চতুর্থ দৃশ্য।

তাহাদের পরিচয়।

জমিদারের বাগান-বাটী হইতে কামিনীকে স্কন্ধে করিয়া যাহারা প্রস্থান করিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে তাহারা মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া নবগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবীন দাস নবগ্রামের এক জন প্রধান কৃষক। গ্রামের মধ্যে লাঙ্গল, গরু, জমিজিরাৎ, চাসবাস তাঁহারই বেশী। নবীন দাসের দুইটি পুত্র; তিনটি ভাগিনা। উহারা তো নবীন দাসের কার্য্যাদি করিয়াই থাকে; তদ্ভিন্ন তাঁহার বাড়ীতে আরও আটদশ জন 'কৃষাণ' আছে। গরুগুলিকে খাবার দেওয়া, মাঠে লাঙ্গল দেওয়া ও 'নিরান' প্রভৃতি কার্য্য কৃষাণেরাই করিয়া থাকে। পল্লীর অপরাপর কৃষকগণের সহিতও নবীন দাসের বড়ই সৌহার্দ্য আছে। তাঁহার অমায়িক গুণে, এবং সময়-অসময়ে সকলের কার্য্য-বিশেষে সাহায্যাদি করা হেতু, অনেকেই নবীন দাসের বিশেষ বাধ্য। নবীন দাসের বয়ঃক্রম এখন প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। কিন্তু এ বয়সের মধ্যে তাঁহার সহিত কখনও কাহারও বিবাদ হইতে শুনা যায় নাই।

যেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে জমিদারের লোক জোর করিয়া কামিনীকে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহার পর দিন বৈকালেই শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যবাড়ী হইতে প্রত্যাগত হন; এবং বাড়ীতে আসিয়াই পত্নীকে না দেখিতে পাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নবীন দাসের বাটীতে উপস্থিত হন। নবীনদাসও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একজন যজমান। কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণকে ঐরূপে আসিতে দেখিয়া, তাঁহারও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার পুত্রদ্বয় ও ভাগিনাদিগকে ডাকাইয়া এবং কৃষাণদিগকে সঙ্গে লইয়া, প্রথমতঃ গ্রামের অপরাপর কএকজন বিশ্বস্ত কৃষকের বাড়ীতে উপস্থিত হন। এবং তাহাদিগের সকলকে উৎসাহিত করিয়া কামিনীর সন্ধানে সকলে ব্যাপৃত হন। জমীদার নবীনবল্লভের গুণগান তাঁহাদের অনেকেরই কতক কতক পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। সুতরাং তাহাদের প্রথম সন্দেহই, ঐ পাপীষ্ঠের প্রতি উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ কএক বৎসর পূর্ব্বে একটী কৃষকের কন্যাকে বাহির করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়ায়, সকলেরই তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কাজেই যত কৃষক—প্রাণের মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ-কন্যা কামিনীকে যাহাতে অক্ষত শরীরে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বিষয়ে চেষ্টিত হইল। সকলেই কোমর বাঁধিয়া, যাহার যেরূপ অস্ত্র বা বল ছিল সে সেইরূপেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। নিরীহ কৃষকগণ সতীত্বের সম্মান রক্ষার্থে এইরূপে বীরসাজে সাজিল। শিক্ষিত জমিদার, তুমি একবার দেখ, তোমার পশু-প্রকৃতি অপেক্ষা মূর্খ কৃষকদিগের প্রাণেও কতদূর দেবত্ব বর্ত্তিতে পারে! যাইহোক, এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন, যাহারা গিয়াছিল—কামিনীকে উদ্ধার করিতে,

তাহারা কে? অর্থাৎ তাহারা নিরীহ, অথচ বীর; সহিষ্ণু অথচ কর্ম্মক্ষম; অজ্ঞান অথচ ধর্ম্ম-পরায়ণ; আহা, ঈশ্বরের এমন সৃজন-কৌশল আর কি আছে! শিক্ষিত-সমাজ! এরূপ অত্যাচার-অবিচার; এরূপে কতশত সতীর সতীত্ব নষ্ট মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমাদের চক্ষুর উপর হইতেছে। কিন্তু কই, সামান্য মূর্খ ঘৃণিত একদল চাসার প্রতি দৃষ্টিকর দেখি; আহা, তাহাদের কিরূপ প্রতিকার-চেষ্টা—কিরূপ একতা!– কিরূপ কর্ম্মক্ষমতা!

পঞ্চম দৃশ্য।

আর এক দিক!

চঞ্চলা ও শ্যামা পিসির কথা বোধ হয় এখনও পাঠক মহাশয়গণ বিস্মৃত হন নাই। সেদিন দু'পর বেলায় আসিয়া, শ্যামা পিসি ওরফে বৈষ্টবী দিদি চঞ্চলাকে আরও চঞ্চলা করিয়া গিয়াছে। সেদিন সে যে ফাঁদ পাতিয়া গিয়াছে, তাহা আরও কুহকপূর্ণ! সেদিন সে সব ঠিক-ঠাক করিয়া গিয়াছে; এখন যোগাড় করিয়া, বাহির হইলেই হয়! আজ সন্ধ্যার পর তা'র আবার আসিবার কথা আছে। তবে আসিয়া, সে আজ আর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে না। কেবল একবার বাড়ীর পশ্চাৎদিকের বাঁশতলা হইতে চঞ্চলার জানালায় উকি দিবে; ও চঞ্চলা তাহার পরই আস্তে আস্তে বাটীর বাহির হইয়া শ্যামার সঙ্গে যাইয়া যুটিবে। এইরূপই শ্যামার বন্দোবস্ত! তারপর, অনতিদূরে, যাঁর জন্য এতকাণ্ড সেই তিনি, পাল্কী লইয়া প্রস্তুত থাকিবেন; এবং ততদূর যাইলেই, পাল্কীতে চড়াইয়া চঞ্চলাকে অভিলষিত স্থানে লইয়া যাইবেন।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাত্রি ১০টা বাজিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর সকলেই আহারাদি সারিয়া শয়ন করিলেন; এবং দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত থাকায়, সকলেই অবিলম্বে নিদ্রিত হইলেন। তবে চঞ্চলাই কেবল জাগিয়া। সে মনে মনে নানা চিন্তা করিতেছে। একবার ভাবিতেছে,—"যাইব কিনা!" আবার ভাবিতেছে,—"না, সুখে থাকিব; যাই!" কখনও বা ভাবিতেছ,—"না, যাইব না; এ কথা পিতামাতা শুনিলে কি ভাবিবেন? লোকের নিকট মুখ দেখাইব কি করিয়া!" আবার পরক্ষণেই ভাবিতেছে,—"লোকে আর দেখিবে কি করিয়া! রাজার গৃহিণী, রাজ-পরিবার হইব; সুখৈশ্বর্য্যের চরম উপভোগ করিব। সুতরাং ভাবনা কি!" এইরূপ ভাবনা-চিন্তায় ক্রমেই রাত্রি বৃদ্ধি পাইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই প্রাণের শ্যামা পিসিও আসিয়া উকি দিলেন!

চঞ্চলা তখন, আস্তে আস্তে বাড়ীর বাহির হইলেন। কেহ বুঝিতে বা জানিতে পারিল না যে, কি হইতেছে। শ্যামা পিসির সহিত ক্রমে সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই আস্তে আস্তে বহির্গত হইলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর "পশ্চাৎ দিগেই একটি বিস্তৃত বাঁশ-বন। তৎপশ্চাতে কএকটি 'ডোবা' আছে। তাহার পরেই 'ডোম-পাড়া' বলিয়া কতকগুলি নীচজাতীয় লোকের বাস আছে। ডোমপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে শ্যামা পিসির অপেক্ষায় পাল্কী অপেক্ষা করিতেছিল।

প্রথমে বাঁশ-বন, পরে সেই সকল নালা-ডোবা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া শ্যামা বৈষ্ণবী চঞ্চলাকে হাত ধরিয়া আনিতেছিল। একে অন্ধকার রাত্রি, তা'র এরূপ বনের ভিতর! আসিবার কষ্টের আর তাঁহাদের অবধি রহিল না। চঞ্চলা তখন বলিল,—"না, তবে আমি আজ আর যাব না।" কিন্তু তখন তাহাকে ছাড়ে কে! শ্যামা হাত ধরিয়া

বলিল,—"আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি। ভয় কি!"

এইরূপে খানিক দূর অগ্রসর হইতে হইতেই,—"কিসে কামড়াইল—বড় জ্বলিতেছে!"—এই বলিরা বৈষ্ণবী বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। অধিকন্তু এই সময় আবার একটি বাঁশের গোড়ায় তাহার পায়ে বড়ই আঘাত লাগিল। সে তাগাতেই আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। চঞ্চলাও এতক্ষণ তাহার হাত ধরিয়া ছিল, সুতরাং শ্যামার পতনে তাহাকেও টলিতে হইল। টলিয়া পড়িয়া, অপর একটী বাঁশে তাহার মাথা ঠেকিয়া তাহাকে বড়ই ব্যাথা দিল—মাথা দিয়া দরদর বেগে রক্তধারা পড়িতে লাগিল। তখন চঞ্চলাও মাথায় হাত দিয়া—"উঃ গেলেম!"—বলিয়া বসিয়া পড়িল।

* * *

যাইহোক, শ্যামা কিন্তু আর উঠিতে পারিল না। "জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—একটু জল—জ্বলে গেল"—ঐ বলিয়াই সে ছটফট করিতে লাগিল। এদিকে চঞ্চলাও যে তাহাকে আর উঠিয়া দেখিবে, তাহারও সামর্থ্য নাই। চঞ্চলা মাথায় হাত দিয়া, শ্যামা ভূমে পড়িয়া এইরূপে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অথচ উভয়ের কাহারও চেঁচাইবার সামর্থ্য নাই—যে কাজে ব্রতী, পাছে লোকে তাহা জানে, এই ভয়! বিশেষ, শ্যামা বৈষ্ণবীর চেঁচাইবার শক্তিও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিল। দণ্ডেকের মধ্যেই তাহার স্বর যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল; সে কেবল ছটফট করিতে করিতে—"জ্বলে গেলেম—জ্বলে গেলেম" বলিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িল। অধিক কি অবশেষে,—"জ্বলে—জ্ব—জ—" এই কথাই তাহার শেষ কথা হইল। আর তাহাকে কোন উত্তর দিতে হইল না। চঞ্চলা যদিও এক আধবার তাহাকে ডাকিল, কিন্তু উত্তর ঐ পর্য্যন্তই।

দস্যুর আত্ম-কথা।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের শেসনজজ মেঃ প্রাট্ সাহেবের সুবিচারে কৃষ্ণ চৌধুরী নামক একজন ভয়ঙ্কর দস্যু যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। এই ব্যক্তির বাসস্থান, মেদিনীপুর জেলায় শালবনী থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপুর পরগণা। এই মকর্দ্দমার বিচার-কালীন এবং জনশ্রুতিতে, এই দস্যু-জীবনের যে সকল লোমহর্ষণ নিগূঢ় রহস্য বাহির হইয়াছে, অদ্য তাহাই বিবৃত করিব।

ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসন-সময়ে এমন ভয়ঙ্কর দস্যু কলিকাতা রাজধানীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, যে চতুর্দ্দিকে হত্যা ও দস্যু-বৃত্তি করিয়াছে, ইহাই সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। অদ্য এই প্রবন্ধে যে সকল কথা বলিব, অধিকাংশই উক্ত দস্যুর নিজ মুখের কথা। কৃষ্ণ বলে,—"এইক্ষণ আমার বয়ঃক্রম প্রায় ৫৫ বৎসর অতীত হইয়াছে; শরীরে আর শক্তি-সামর্থ্য নাই। কিন্তু যৌবনাবস্থায় আমার দেহে অপরিসীম বল ছিল; নিজের শক্তি নিজেই অনুমান করিতে পারিতাম না। আমার একটী লাঠির ঘা সহ্য করিয়া জীবিত আছে, এমন একটী লোকও দেখিতে পাই না। যৌবনারম্ভেই আমি ডাকাতের দলে প্রবিষ্ট হই। সেই সময়ে একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, স্ব-গ্রামে, স্বদেশে, এমন কি মেদিনীপুর জেলার লোকের, অনিষ্ট করিব না। প্রথমতঃ জাহানাবাদ সব-ডিবিজানের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাকাতি করিয়াছিলাম। সামান্য সামান্য দস্যুবৃত্তি দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা আপনাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে

লাগিল। তৎপরে একটী ধনী লোকের বাড়ী ডাকাতি করিয়া, আট-দশ হাজার টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলাম। সেবার ডাকাতিতে লিপ্ত জানিয়া পুলিশ আমাকে চালান দেয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব দায়রা-সোপর্দ্দ করেন। কিন্তু দায়রার বিচারে আমি নিরপরাধি প্রতিপন্ন হইয়া খালাস পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে পুলিশ ও বিচারালয়ের অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। এই মকর্দ্দমায় খালাস পাইবার পরে, আমার অত্যন্ত সাহস বৃদ্ধি হইল। সে সময় হইতে আমি নিজে দলপতি হইয়া, হুগলি বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, যশোহর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ডাকাতি আরম্ভ করি। আমি দলপতি; আমার দলে প্রায় শতাধিক লোক জুটিল। এই সকল লোক আমি পৃথক্ পৃথক্ দলে বিভক্ত করিয়া দিলাম। আমাদের অধীনে প্রায় ৮।১০টী ডাকাতের দল গঠিত হইল। কলিকাতাই আমাদের প্রধান আড্ডা হইল। একটা প্রকাণ্ড বাটী ভাড়া করিলাম। সেখানে আমরা যোগী, সন্ন্যাসী, মহান্ত বেশে অবস্থিতি করিতাম। কতকগুলি বিগ্রহ (দেবমূর্ত্তি) সেই বাটীতে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। দুইজন ব্রাহ্মণ বিগ্রহদিগের সেবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। এখানে প্রায় ৩০।৪০ জন ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী নিয়ত অবস্থিতি করিত। এক এক দল মফঃস্বলে বাহির হইয়া যাইত; উহারা প্রত্যাগত হইলে, অন্যদল প্রেরণ করিতাম। দিবাভাগে আমার অধিকাংশ চেলা সহরের চতুষ্পার্শ্বে কেহ বা ভিক্ষুকবেশে, কেহ বা যোগী-সন্ন্যাসী, কেহ বা ফকির উদাসীন গণকাদির বেশে গতিবিধি করিত। আমরা তীর্থযাত্রাচ্ছলে কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে ডাকাতি করিতে যাইতাম। আমার দলের বিষয় যদিও সাধারণে জানিতে পারে নাই; কিন্তু আমি যে একজন বিখ্যাত দস্যু এ বিষয় দেশের লোকে ও পুলিশাদিতে জানিতে বাকি থাকিল না।

আমি অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অবস্থিতি করিতাম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ২।১ মাস বাটীতেও থাকিতাম। একবার গ্রীষ্মকালে আমার শরীর বড়ই অসুস্থ—বিশেষতঃ কলিকাতা বড়ই গরম হইয়া উঠায়, কলিকাতায় থাকা বড়ই কষ্টকর মনে করিয়া, বাটীতে আসিলাম। এই সময় ঘাটাল সবডিবিজনের মধ্যে এক গৃহস্থের বাটীতে ডাকাতি হইয়াছিল। এখানে বলা আবশ্যক, আমি নিজে কখনই এই জেলার মধ্যে ডাকাতি করি নাই; অধীনস্থ লোকদিগকেও এ বিষয় সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। এই ডাকাতির বিষয়ও আমি বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতাম না। কিন্তু একদিন অতি প্রত্যূষে একজন লোক আমার বাড়ীতে আসিয়া বলিল,—'পথিমধ্যে একজন ভদ্রলোক দণ্ডায়মান আছেন, আপনার সহিত কি পরামর্শ করিবেন।' আমার মনে কোন সন্দেহ হইল না; ভাবিলাম, কত দেশের কত লোকের সহিত আলাপ-আত্মীয়তা আছে; অবশ্যই কোন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। আমি সেই লোকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সদর রাস্তায় আসিয়াছি, এমন সময় সহসা আমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে একজন লোক দ্রুতবেগে আসিয়া, আমার বাম পদের পশ্চাদ্ভাগে অস্ত্রাঘাত করিল। এবং তা'র পরেই অমনি ৮।১০ জন পুলিশের লোক আমায় চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া ফেলিল। আমার হস্তে হাতকড়ি এবং পায়ে বেড়ী লাগাইল"। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা, মেদিনীপুর।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

প্রকৃতি।—বাবু সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি একখানি কবিতা গ্রন্থ। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ প্রভৃতি ভাল।

দুই একটি কবিতা মিষ্টও বটে। নবীন গ্রন্থকার উৎসাহিত হন, এও আমাদের বাসনা। আর, তজ্জন্যই দোষগুণ আলোচনায় ইচ্ছুক নহি।

আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র।—ইহা একখানি ২৪ পৃষ্ঠা পরিমিত ক্ষুদ্র পুস্তক। লেখার উদ্দেশ্য ভাল। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বড়ই দুঃখে বলিয়াছেন,—"মূল্য নির্দ্দিষ্ট নাই। গ্রাহক অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন দুই হাত পাতিয়া লইব, আর আশীর্ব্বাদ করিব। * * * এত দিন মূল্য নির্দ্ধারণের ভার বিক্রেতার হাতে ছিল; কিন্তু বিক্রেতার দোষে বাঙ্গালার ঘোর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মন হইতে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। তাই ক্রেতার হাতে মূল্য নির্দ্ধারণের ভার দিয়া দেখি, তাঁহারা এই জাতীয় অনিষ্ট দূর করিতে কতদূর প্রস্তুত আছেন।" আয়োজন মন্দ নয়। কিন্তু বাঙ্গালার বিক্রেতা ও ক্রেতা দুই-ই সমান! তবে বিক্রেতা মহাশয় এই সুযোগে যদি অন্য সুবিধা পান, এই আশা!

যোগশাস্ত্র।—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক সংখ্যাক্রমে প্রকাশিত। রামায়ণের বিশুদ্ধ অনুবাদ সম্পাদন করিয়া এবং 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রভৃতি প্রকাশে, কৃষ্ণগোপাল বাবু সাহিত্যবাজারে সুপরিচিত আছেন। তাঁহার সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের আমরা অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। সম্প্রতি তিনি যোগ-সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান পুস্তকগুলি বঙ্গানুবাদসহ খণ্ডশঃ প্রকাশে অগ্রসর হইয়া, আর এক গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার অনুবাদক; এবং মাননীয় কৃষ্ণগোপাল বাবু তাহার প্রকাশক। সুতরাং এ অনুষ্ঠানে সর্ব্বতঃ সিদ্ধির আশা করা যায়। পুস্তকের সম্যক্ আলোচনা সময়ান্তরে করিবার বাসনা আছে। তবে এখন এসম্বন্ধের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে, প্রকাশক মহাশয়ের নিকট ১৫ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন, কলিকাতায়—পত্র লিখিলেই, বিস্তৃত অনুষ্ঠান-পুস্তিকা অমনি পাওয়া যাইবে।

রঙ্গ-ভূমি-সম্বন্ধে।

এমারেল্ড থিয়েটার।

গতবারে 'এমারেল্ড থিয়েটার' সম্বন্ধে দুই এক কথা আমরা বলিয়াছি। যাহা বলিয়াছি, প্রকৃতই তাহা রঙ্গালয়ের হিত-কামনায়—কর্ত্তৃপক্ষগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে 'রঙ্গালয়ের' দোষগুলি অতঃপরও যাহাতে সংশোধিত হয়, এই বাসনায়। এ ভিন্ন উক্ত রঙ্গভূমি-সম্বন্ধে অন্য বিদ্বেষভাব আমরা কিছু রাখিনা বা রাখিতে ইচ্ছাও করি না। যাইহোক, তাহাতে রঙ্গালয়ের কতদূর কি সুবন্দোবস্ত বা বেবন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন! তবে আমরা 'কর্ণধার'-পত্রের সম্পাদক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের নিকট এইটুকু মাত্র জানিয়াছি যে, উক্ত রঙ্গালয়ের অভিনেতা—সেদিন যিনি তাঁহাকে অপমান করিয়াছিলেন তিনি—হারাণ বাবুর নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়াছেন; এবং হারাণ বাবুও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। শুনিলাম, তত্ত্বাবধায়ক বাবু মনোমোহন বসু মহাশয়ের চেষ্টাতেই নাকি এইরূপে হারাণ বাবুর সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। মনোমোহন বাবুকে আমরা আন্তরিক সম্মান করিয়া থাকি। তবে রঙ্গভূমির নট-সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়াও, তিনি যে নিজের সে সম্মানটুকু সম্যক বজায় রাখিতে পারিবেন, এ আশায় আমরা হতাশ হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন, তাঁহার এ ব্যবহারে আমরা কতক পরিমাণেও আশ্বস্ত হইলাম; এবং এও ভরসা করিতে পারিতেছি যে, তাঁহার হস্তে সম্যক কর্ত্তৃত্ব থাকিলে ও তাঁহার মনের ভাব চিরকাল সমান থাকিলে, রঙ্গক্ষেত্রেও তাঁহার সে সম্মান বজায় থাকিতে পারে। কিন্তু রঙ্গালয়ের এখনও পর্য্যন্ত কোন

উন্নতি যে সাধিত হইয়াছে, এ কথা বলিয়া কোন ক্রমেই আমরা সত্যের অপলাপ করিতে পারি না। তবে পাশখানির মায়া ভুলিতে না পারিয়া—বিনা পয়সায় নাচতামাসা-রঙ্গরসে মন-মজাইবার সখটুকু বিস্মৃত হইতে না পারিয়া, যিনি এখনও উক্ত রঙ্গালয়ের গুণ-গান করিতে পারেন, করুন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা এখনও পর্য্যন্ত সেরূপ প্রকৃতি পাইতে পারি নাই। (বিশেষতঃ মরকত-রঙ্গালয়ের সুবন্দোবস্ত এখনও সুদূরপরাহত। কারণ, এ রঙ্গালয়ে "গোপাল বাবু" আছেন! অভিনয় যত হউক বা না হউক, দর্শক তত জুটুক আর নাই জুটুকু, কোনরূপে রাতটি পোহাইলেই—মাসটি কাটাইলেই মাহিনা!—'লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন!' অভিনয় ভাল হইলে, পাঁচজনে সুখ্যাতি করিলে, রঙ্গালয়ে লোক জুটিবে—আয় বাড়িবে; তবে মাহিনা পাইব—আহার হইবে;—এ ভাবনা তো আর এখানকার কাহারও নাই! কাজেই যেমন কথায় বলে, 'আলালের ঘরে দুলাল'—এও কতক সেইরূপেরই হইয়াছে। তাই তাহাদের মানুষকে মানুষ জ্ঞান নাই—মাটিতে পা পড়ে না; তাহাদের সকলেই 'ওয়ার্লড রিনাউণ্ড!' ফলতঃ এমারেল্ডের এ দোষটুকু যতদিন না ঘুচিবে, ততদিন ইহার আর উন্নতি নাই।) তবে এখন যিনি যা' বলেন বা বলিবেন, তা' সেই 'তাঁরই' খাতিরে! বিশেষ, আমাদের কএকজন সহযোগী হঠাৎ মত-পরিবর্ত্তন হওয়াতেই স্বতঃই আমাদের এই কথাই মনে হয়। যাইহোক, সহযোগীগণ! আমরা কি এতই হেয় যে, সামান্য একখানি 'পাশে' আমাদিগকে হাসাইবে-নাচাইবে! হায়! এ দুঃখ আর কাহাকে জানাইব?

(বীণা-রঙ্গভূমি।

সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাটককার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় পুনরায় স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার 'বীণারঙ্গভূমির' ভার লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। কএক মাস বন্ধে নূতন নাটক লিখিয়া—সুনিপুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের দ্বারা তাহা অভ্যস্থ করাইয়া, বর্ত্তমান মাসের শেষ তকই তিনি তাঁহার নিজের বঙ্গালয়টি আবার খুলিতেছেন। এবার স্ত্রীলোক লইয়া তাঁহার থিয়েটারে অভিনয় হইবে। অধিকন্তু আর্য্যনাট্যসমাজের সেই সুদক্ষ অভিনেতাগণও, শুনিলাম, উহাতে যোগ দিয়াছেন।)

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

মূল্য ফেরত দেওয়ার লোভানি।

ঔষধের বিজ্ঞাপনে মূল্য ফেরত দেওয়ার লোভনিটা প্রায়-স্থলেই ভড়ংমাত্র। প্রকৃত পক্ষে কেহ মূল্য ফেরত দেন কিনা, তাহাতে সর্ব্বত্রই সন্দেহ আছে। আর, সেই জন্যই সে সম্বন্ধে প্রায়ই আমরা অভিযোগ পাইয়া থাকি। দুই একজন সংব্যবসায়ী ছাড়া, যাঁহারাই মূল্য ফেরত দিবার লোভানী দেখান, তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে কোন না কোন অভিযোগ পাওয়া যায়। সম্প্রতি আমাদের মাননীয় মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু উতঙ্কলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঘনাপাড়া হইতে বড়ই দুঃখে এ সম্বন্ধ যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—"মহাশয়, জেলা মেদিনীপুর, চণ্ডিভেটী পোষ্ট ঠিকানা হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মাল নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে অনেক দিন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, এবং সংপ্রতিও 'সুরভি ও পতাকায়' বিজ্ঞাপন দিতেছেন, 'এক শিরার ঔষধ মূল্য ১/০ টাকা; তিন মাহা মধ্যে আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব।' কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কোন উপকার না

হওয়ায় মূল্য ফেরত পাঠাইতে ৪।৫ খানি পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। এখনও সেই নিরুত্তর।"—শুধু যোগেন্দ্রলালই বা, কেন, এইরূপ অনেক লালই যে এইরূপে লোক ঠকান, তাহা আর আমাদের জানিতে বাকী নাই। যাইহোক, এখনও সকলে এসম্বন্ধে সতর্ক হউন, এই বাসনা।

কে, সি, দাস এণ্ড কোম্পানি

এই নাম দিয়া ৭নং হাড়কাটা গলি, ঠিকানা হইতে সম্প্রতি কেমিক্যাল স্বর্ণের অলঙ্কার প্রভৃতির এক বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, উক্ত ঠিকানায় ঐ নামে কোন ফারম নাই। ঐ ঠিকানায় খোলার ঘরে কএকজন বেশ্যামাত্র আছে। আমরা তো ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। একে কেমিক্যাল সোনায় যে নানারূপের প্রতারণা চলিতেছে, তাহাতেই লোকে অস্থির, তাহার উপর আবার 'বিশ-মোল্লাতেই গলদ' হইলে, সে দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে! বিজ্ঞাপনদাতা অন্য ঠিকানায় বসিয়া, ডাকঘরের যোগাযোগে এইরূপে যে কত ব্যক্তিকে প্রতারিত করিতেছেন, তাহা বলা যায়, না। যাইহোক, বিজ্ঞাপনদাতার অপর যে স্থানেই অস্তিত্ব থাকুক, তিনি সদুত্তর দেন, এই বাসনা। কোন কোন লোকের পাওনা টাকা আদায়ের জন্য আমাদের লোকজন যাইয়া ঐ ঠিকানায় বিজ্ঞাপনদাতাদের কাহারও সন্ধান পান নাই, এই কথাটুকুই আমাদের বক্তব্য।

কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ,

১৮ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে 'যোগশাস্ত্র' ও 'ইন্দ্রজাল' প্রকাশ সম্বন্ধীয় নানা জমকাল বিজ্ঞাপন আজিকালিও আবার মফঃস্বলের নানা স্থানে বিতরিত হইতেছে। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের কীর্ত্তির কথা ইতিপূর্ব্বে আমরা একবার বলিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও বিজ্ঞাপনদাতা তলে তলে মফঃস্বলের লোকদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা পাইতেছেন, ইহাতেই আমরা অত্যধিক দুঃখিত হইলাম। বটতলার যে সে পুস্তকের জমকাল বিজ্ঞাপন দিয়া লোক-ঠকান যে কতদূর গর্হিত, তাহা আর বলিতে হইবে না।

'ইলেক্ট্রো-গ্যালভ্যানিক

অঙ্গুরী, অনন্ত ও কবচ' এবং 'কেমিক্যাল সোণা' প্রভৃতির বিজ্ঞাপন আজকাল যে কএকটি ফারম হইতেই বাহির হয়, তাঁহাদের সকলেই যে 'ভারতের একমাত্র বিক্রেতা'—"আদি আবিস্কারক" এইরূপ বিজ্ঞাপনে লেখেন। কিন্তু পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করুন যে, সকলেই 'ভারতে একমাত্র'ও'আদি-আবিস্কারক' কোন অদ্ভুত যুক্তি বলে হন! বিজ্ঞাপনদাতা মহাশয়দের (কে আদি, কে একমাত্র তাহা বলিতে চাহি না) যখন বিজ্ঞাপনের এই প্রথম কথাতেই এই কারচুপী, তখন তাঁহাদের ভিতরে কি আছে এ সন্দেহ কি হয় না! যাইহোক, এ কথার আর বাড়াবাড়ি করিতে বাসনা নাই।

সংবাদ।

—তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য এখনও যাহাতে রক্ষিত হয় এই সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া, সহযোগী 'বঙ্গবাসী' তারকেশ্বরের মহান্তের কীর্ত্তির কথা সাধারণে প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজের বড়ই উপকার করিতেছেন। এজন্য তাঁহাকে যে কি ধন্যবাদ দিব, তাহা বলিতে পারি না। মহান্ত হিন্দুর ধর্ম্মে কলঙ্ক স্থাপনা করিতেছেন; পবিত্র ধর্ম্মস্থানে বসিয়া পাপের স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন। অধিক কি, সেইজন্যই, এখন তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনিলেও, যেন কর্ণে অঙ্গুলি দিতে ইচ্ছা হইতেছে; তিনি আর একদণ্ড কালও যে বিশ্বেশ্বরের পবিত্রতা কলুষিত করেন, হিন্দুর প্রাণে তাহা কিছুতেই সহিতেছে না! দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই ইচ্ছা, মহান্তকে যেরূপেই

হউক, স্থানান্তরিত করা হয়; এই দণ্ডেই হইলে, কেহ আর বিলম্বে চাহেন না। ফলতঃ সহযোগী 'বঙ্গবাসী' এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেক হিন্দুরই সহানুভূতি পাইবার পাত্র। তিনি যে আন্দোলনে ব্যপৃত হইয়াছেন, তাহা কার্য্যতঃ সুসিদ্ধ হউক, এই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

—শুনিলাম, সহাযোগী 'বঙ্গবাসীর' নামে মহান্ত নাকি আবার মানহানীর মকর্দ্দমা আনিতে চান। আমরা কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তাঁহার কি মান তাহাতে আরও বাড়িবে, তিনি আশা করেন! যাহাহউক, মহান্ত যাহাই করুন, ধর্ম্মের জন্য—সমাজের জন্য—দেশের জন্য 'বঙ্গবাসী' যাহা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার মত সহস্র মহান্ত আসিলেও বঙ্গবাসীর যে কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবেন, এ দুরাশা যেন কেহ করেন না। ধর্ম্ম-প্রণোদিত "বঙ্গবাসী" অধার্ম্মিক মহান্ত হইতে এখনও অনেক উচ্চে আছেন।

—১৫ ই আষাঢ় সূর্য্যগ্রহণের কথা পঞ্জিকাতে যে লিখিত ছিল, তাহার কিছুই ঘটে নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

—কলিকাতার লক্ষাধিক গরুর গাড়ি গাড়োয়ান তিন দিন যাবৎ "ধর্ম্মঘট" করিয়া কাহারও মালপত্র বহে নাই। তাহাতে ব্যবসায়ীদিগের যে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, বলা যায় না। ধন্য একতা!

—১৪ বৎসর বয়স্ক একটী ক্ষেত্রী-বালক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া মূলতানে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করতঃ রেলে স্ত্রীলোকের কামরায় উঠে। স্ত্রীলোকের গাড়িতে এক সম্ভ্রান্ত বণিক-পত্নী ছিলেন; তিনি শিবি যাইতেছিলেন। পথে বণিক-পত্নীকে নিদ্রিতা দেখিয়া ক্ষেত্রীবালক বণিক-পত্নীর ৬০০, টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি অপহরণ করতঃ সক্কর ষ্টেষণে অবতরণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে সে পুলীশ কর্ত্তৃক ধরা পড়ে। কি ভয়ানক বালক!

—পাণ্ডুয়ার সন্নিকট ঠাকুরবেড়িয়া নামক স্থানে সম্প্রতি ভয়ানক ডাকাইতি হয়। দস্যুরা সেই বাটীর স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের কাণ হইতে মাকৃড়ি টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে। গুপী ডোম নামক এক ব্যক্তি দস্যুদলে ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। আর সকলে এখনও ধরা পড়ে নাই।

—আমেরিকার একটি সহরে কোন আফিসের কর্ম্মচারীরা আপন-আপন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ছুটি হইলে দ্বারদেশে আসিয়া হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল। কেহই গন্তব্যপথ চিনিতে পারে না। পরে প্রকাশ যে, আফিস-বাড়ী মায় কেরাণী, আফিসের সময় মধ্যে সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

—ইটালিতে এক সুন্দরীকে লইয়া দুই জনের মকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। উভয়েই সুন্দরীর পতি বলিয়া প্রার্থনা করেন। সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করায় বলেন, উভয়ের মধ্যে কেহই তাঁহার স্বামী নহেন। পরে আদালতের একজন যুবা উকীলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, উনিই আমার স্বামী। যুবক ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কাজেই সম্মতি জ্ঞাপন করায়, বিচারপতিকে তদনুসারেই রায় দিতে হয়। পত্নীপ্রার্থীদ্বয় ও আদালত-শুদ্ধ লোক তো অবাক!

—সিকিমের সহিত যে সন্ধি চলিতেছিল, তাহার ফল কিছুই হইল না। তিব্বতের পক্ষ হইতে ন্যায়সঙ্গত কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইবার আশা নাই।

—মার্কিণ-রাজ্যে নায়াগ্রার ভীষণ জলপ্রপাত সকলেরই বিদিত। জলস্রোত ১৬০ ফুট উচ্চ হইতে এক মাইলের অধিক পথ শূন্যে শূন্যে থাকিয়া ভীষণ বেগে নদীতে পড়িতেছে। তাহার শ্রবণবিদারী শব্দে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়, যুবকেরাও মূর্চ্ছিত হয়। কিন্তু লর্ড লন্সডেল সম্প্রতি আলাস্কা দেশে যে জলপ্রপাত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আরও ভীষণ। জলস্রোত ২০০ ফুট উচ্চে প্রায় ২ মাইল শূন্যে শূন্যে থাকিয়া তবে গিয়া সে নদীতে পতিত হইতেছে। ভাবিয়া দেখ দেখি, কি ভীষণ ব্যাপার!

—বীরভূম নারায়ণপুরে গত ২১ জ্যৈষ্ঠ বেলা ৬টার সময় একটু ঝড় উঠে। পরে উপরি উপরি ২০টী বজ্রাগ্নিতে একজন মুসলমানের ৮খানি ঘর, ২০টী খাসি, ৫০। ৬০টী ছাগল ও মুরগী পুড়িয়া মরিয়াছে। একটী শিশু ও একটী স্ত্রীলোক মরিয়াছে। অপর একটী স্ত্রীলোক মর-মর।

—পঞ্জাবের মোজাফরনগর জেল হইতে এক জন দায়মাল আসামী জেলের মধ্যস্থ এক উচ্চ বৃক্ষ হইতে বাহিরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলাইয়াছে। এই ব্যক্তি নাম গোলাব, গুণ্ডার চুড়ামণি। ত্রিশ জন লোকের প্রাণ নাকি ইহার হাতে উড়িয়াছে। পুলিশ বসিয়া মাথা চুলকাইতেছেন।

অনুসন্ধান।

:০(০):০

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

২য় খণ্ড।] ৩২এ আষাঢ়, ১২৯৬ সাল। [২৩ সংখ্যা।

মঙ্গলময় শ্রীহরি!

কেবলমাত্র শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া, দেখিতে দেখিতে, জীবনের আরও একটী বৎসর কাটিয়া গেল। কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত অত্যাচার, কত অবিচার জীবনে যে সহিলাম—সর্ব্বজ্ঞ আপনি—আপনার তা' জানিতে বাকী নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৃপা আপনার, যে, যদিও কার্য্যক্ষেত্রের তুলনায় ক্ষুদ্র কীটানুকীট আমরা, তথাপি বক্ষ পাতিয়া—অটল নিষ্পন্দ পাষাণের সমান—সকলই সহিতে পারিয়াছি। রোগে, শোকে, বিপদে, বিড়ম্বনায়, অত্যাচারে, প্রাণ জ্বলিয়াছে—হৃদয়ে হা-হুতাশ ফুটিয়াছে; কিন্তু অপূর্ব্ব আপনার মহিমা, যে, কখনও শূন্য-আশ হই নাই। তাই আজ জীবনের আর একটী অঙ্ক অতিবাহিত করিতে সক্ষম হইলাম। যদিও নিঃস্ব, যদিও অক্ষম, তথাপি গুরু ভার বহনে কখনও ক্লান্ত হই নাই। আর, এখনও আপনার সেই চরণই ভরসা। আমরা উপলক্ষ মাত্র—যা' করাইবেন আপনি, তাই হইবে; যা' কার্য্য আপনার, তাই সিদ্ধি। আমরা অধিক আর বলিব কি?

প্রার্থনা।

বাউলের সুর—একতালা।

"কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে,
পাপী-তাপীর তোমা বিনা গতি নাই।
মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,
সদা হৃদয়-মাঝে প্রেমফুলে নাথ পূজিব চরণ;
ঘুচাও পাপের জ্বালা, পুরাও আশা,
তোমার গুণ নিয়ত গাই।"

জুয়াচোরের বাহাদুরী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামীর নামও রজনীকান্ত গুপ্ত। কিন্তু ইনি পাঠকবর্গের পরিচিত সেই রজনীকান্তের স্ত্রী নহেন। আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই রজনীকান্ত হওয়াতেই, সহজেই এই জুয়াচুরীর সৃষ্টি হইয়াছে। যাইহোক, ঐ স্ত্রীলোকটী বলিতে লাগিলেন,—"মহাশয়, আমার নাম সুন্দরী নহে। আমার প্রকৃত নাম, তারা। প্রায় পনের বৎসর অতীত হইল, আমি বিধবা হইয়াছি। মৃত্যুকালে আমার স্বামী এমন কোন সংস্থান রাখিয়া যান নাই যে,

যাহার দ্বারা স্বচ্ছন্দে আমি আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি। তবে আমাদিগের দেশের লোকের যেমন অতি সামান্য জমি প্রভৃতি থাকে, আমার স্বামীর তাহাই ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারই উপস্বত্ব হইতে অতি কষ্টে আমি আমার জীবনধারণ করিয়া আসিতে-ছিলাম।

"এই রামধন ও অবিনাশ উভয়েই আমাদিগের গ্রামবাসী ও আমার দূর-কুটুম্ব। রামধন বিশেষ কোন কার্য্য করেন না; কিন্তু দেশের ভিতর কাহারও সহিত কোন প্রকার মামলা-মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই মকর্দ্দমার যোগাড় করিয়া থাকেন। অবিনাশ কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করেন। কিন্তু কোন্ ব্যাঙ্কে যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা আমি জানি না। কয়েক বৎসর অতীত হইল, পূজার বন্ধে যখন অবিনাশ বাড়ী আসিয়াছিলেন, সেই সময় আমি এক দিবস অবিনাশের বাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেই স্থানে রামধনও উপস্থিত ছিলেন। রামধন আমার অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখ-প্রকাশ করিয়া অবিনাশকে বলিলেন,—'ভাই, তুমি তো কলিকাতায় থাক; কিন্তু সেই স্থান হইতে এমন কোন উপায় বাহির করিতে পার না যে, যাহাতে ইহাঁর কষ্টের কোনরূপ লাঘব হয়! কলিকাতার তো অনেক বড়লোক শুনিয়াছি, এরূপ দরিদ্রদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন!' রামধনের এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, রামধন আমার উপর দেখিতেছি বড়ই সদয়।

"অবিনাশ শুনিয়া ক্ষণেক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন; ও আমার অবস্থা দৃষ্টে পরে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—'আচ্ছা, এবার আমি কলিকাতায় গিয়া যাহাতে আপনার বিশেষ উপকার করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিব।' অবিনাশের কথা শুনিয়া আমি মনে মনে উহাঁকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলাম।

"ইহার কিছু দিন পরে এক দিবস রামধন হঠাৎ আমার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় অবিনাশ বাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। সেই স্থান হইতে যাহা জানিয়া আসিলাম, তাহা শুনিলে, আপনি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। এবার বোধ হয় আপনার দুঃখ ঘুচিল।'

"রামধনের কথা শুনিয়া আমার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'অবিনাশ আমার নিমিত্ত কোন প্রকার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন কি?'

"ইহার উত্তরে রামধন কহিলেন,—'আপনার নিমিত্ত বিশেষ কোন যোগাড় করিতে হয় নাই। আপনার স্বামী যদিও অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে তিনি আপনার জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার কোন আফিসে তিনি আপনার নিমিত্ত প্রায় এক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া 'সুন্দরীর' নামে বেনামী করিয়া জমা রাখিয়া গিয়াছেন। এখন ঐ সহস্র মুদ্রা আপনি অনায়াসেই পাইতে পারিবেন। তবে আপনি স্ত্রীলোক; আপনি নিজে গিয়া কলিকাতা হইতে ঐ টাকা আনিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ, সেই স্থানের কেহই একে আপনাকে চিনে না; তাহাতে টাকা আপনার নামেও জমা নাই। উহা সুন্দরীর নামে জমা আছে। তবে আমি যেরূপ যোগাড় করিয়াছি, তাহাতে আপনাকে বিশেষ কোন কষ্টই করিতে হইবে না। কেবলমাত্র একবার আমার সহিত বর্দ্ধমান গিয়া আমার নামে একখানি মোক্তারনামা রেজেষ্টরি করিয়া দিলেই চলিবে। তাহাতে আপনার আপাততঃ কোন খরচই হইবে না; অথচ তাহাতে আপনি টাকাগুলি পাইবেন।

সেই স্থানে আমার জানিত একজন ভাল মোক্তার আছেন; এখন তিনিই সমস্ত খরচ নিজ হইতে দিবেন। পরে আপনি টাকা পাইলে তাঁহার টাকা মিটাইয়া দিবেন। তবে একটি কথা আপনাকে বিশেষ মনোযোগের সহিত মনে রাখিতে হইবে। সেই স্থানে তিনি বা অন্য কেহ যদি আপনার নাম জিজ্ঞাসা করেন, তাহাহইলে আপনি সুন্দরী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবেন। আপনার প্রকৃত নাম যে 'তারা', তাহা যেন কেহ জানিতে না পারে। তাহা জানিলে, আপনার স্বামীর গচ্ছিত ধন পাইবেনও না; আর ইহ-জীবনেও আপনার কষ্ট কোন প্রকারে দূর হইবে না। মোক্তার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যখন সমস্ত ঠিক হইবে, তখন এক দিবস আপনি আমার সহিত বর্দ্ধমান গমন করিবেন। এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। কারণ, এ জগতে কে শত্রু, কে মিত্র, তাহা বুঝিয়া লওয়া সহজ নহে।'—এই বলিয়া রামধন চলিয়া গেলেন। আমি মনে মনে কত কথা ভাবিলাম; মনের ভিতর কত আশা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার এই ভয়ানক কষ্টের যে একেবারে লাঘব হইবে, এই আনন্দে আমি দিন কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু এ কথা আর কাহাকেও বলিলাম না।

"ইহার কিছু দিবস পরে এক দিবস রামধন আসিয়া আমাকে বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন। ৺ তারকনাথ দর্শনে গমন করিতেছি গ্রামে এই কথা রাষ্ট্র করিয়া, রামধনের পরামর্শ মত আমরা বর্দ্ধমানে গমন করিলাম। সেই স্থানে একজন মোক্তারের বাসায় ২।৩ দিবস অবস্থান করিলাম। সেই সময় কলিকাতা হইতে অবিনাশও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ মোক্তারের বাসায় তাঁহারাই কি একটা লেখাপড়া করিলেন; এবং পরিশেষে আমাকে রেজেষ্টরি-আফিসে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহাদিগের পরামর্শ মত আপনাকে 'সুন্দরী' বলিয়া পরিচয় দিলাম; ও রামধনকে মোক্তার-নামা দিয়া, আপনার স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। এই পর্য্যন্তই তখনকার ঘটনা। তাহার পর আর কি হইল, তাহার কিছুই আমি জানি না। যাহাহউক, ইহার কিছু দিন পরে, রামধন একদিন ৫০০৲ টাকা আনিয়া আমাকে প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন,—'এই টাকা বাহির করিতে, আফিসের বাবুদিগকে ঘুস প্রভৃতি দিতে ও মোক্তারের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা প্রভৃতি মিটাইয়া দিতে, পাঁচ শত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।' আমি ঐ পাঁচ শত টাকাতেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাঁদিগকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলাম। ঐ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা আমার গুরুদেবকে প্রদান করি; এবং বক্রী টাকা দ্বারা এযাবৎ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি। এখনও আমার নিকট প্রায় এক শত টাকা আছে। যদি বলেন, তাহাও আনিয়া দিতে পারি। এখন, এই কার্য্যে আমি যতদূর দোষী, তাহা বলিলাম। ইহার পরে আমি আর কিছুই জানি না। এখন আপনাদিগের হস্তে পড়িয়াছি; যাহা হয়, করুন।" এই বলিয়া তারা নীরব হইলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু স্থির রহিল না; চক্ষু দিয়া ক্রমিক জলধারা পড়িতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তারা ওরফে সুন্দরী যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অবিনাশ ও রামধন এইরূপে এই অনাথা স্ত্রীলোককে প্রবঞ্চনা করিয়া যে তাঁহাকে বিপদ-জালে জড়িভূত করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

কর্ম্মচারী তখন, রামধন ও অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই সকল প্রমাণ দেখিয়াও, তাঁহারা বলিলেন,—"আমরা ইহার কিছুই জানি না।" তখন কর্ম্মচারী আর কি করিবেন? তাঁহাদের বিপক্ষে আরও যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ হইতে পারে,

তাহা সংগ্রহ করিয়া, অগত্যা তাঁহাদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করিলেন। তারার অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মচারীরও মনে মনে অতিশয় দুঃখ হইল। তিনি তাঁহাকে আসামী-শ্রেণীভুক্ত না করিয়া সাক্ষ্য-শ্রেণীভুক্ত করিলেন। তারা এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আরও যে সকল সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, তাহা বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিতে হইলে এই প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত তাহা না করিয়া উহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া এই জুয়াচুরি-কাণ্ডে কৃতকার্য্য হয়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

অবিনাশ বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের একজন কর্ম্মচারী। কোম্পানীর কাগজের সুদ প্রভৃতি হিসাব করা, লোকের সহিত কাগজঘটিত দেনা-পাওনা স্থির করা, প্রভৃতি কার্য্যের তিনি সাহায্য করিয়া থাকেন। যাঁহার নিকট সমস্ত কাগজের হিসাব থাঁকে, সমস্ত খাতাপত্র যিনি ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পান, তাঁহার ইহা জানিতে কোন প্রকারে বাকি থাকে না যে, কোন্ ব্যক্তি তাহার কাগজের সুদ গ্রহণ করিতেছে না। এক দিবস অবিনাশ কয়েকখানি কাগজের হিসাব করিতে করিতে দেখিলেন যে, যে ত্রিস হাজার টাকার সুদ সুন্দরীর নামে বাহির হইত, তাহা কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ইহা দেখিয়া অবিনাশ ভাবিলেন,—"বোধ হয় সুন্দরী মরিয়া গিয়া থাকিবেন; এবং তাঁহার অন্য কোন উত্তরাধিকারীও বোধ হয় নাই। এই নিমিত্ত কেহই ঐ টাকার সুদ লইতেছে না; যেখানকার কাগজ সেই স্থানেই পড়িয়া আছে বা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সুযোগে যদি আমি ইহার পরিবর্ত্তে আর কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কোন প্রকার ভাবনা থাকিবে না।"— এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ঐ সকল কাগজের নম্বরগুলি সংগ্রহ করিয়া লন; এবং সুন্দরীর বাড়ীতে চুরি হওয়ায় ঐ কাগজগুলি আর পাওয়া যাইতেছে না এই বলিয়া, রামধনের সাহায্যে প্রথমে ব্যাঙ্কে এক দরখাস্ত করেন, ও কাগজের দেনা-পাওনা কিছু দিবস বন্ধ করিয়া রাখেন। ইহার ভিতরও ঐ সকল কাগজের প্রকৃত অধিকারী না আসায় পরে তাঁহারা তারাকে চক্রান্তে জড়িভূত করিয়া ও অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া, তাঁহাকে মিথ্যা সুন্দরী সাজাইয়া আপনাদিগের কার্য্য উদ্ধার করিয়া লন। এইরূপ উপায়ে সেই সকল কাগজের পরিবর্ত্তে নূতন কাগজ পাইয়া তাহা ব্যাঙ্কেই পুনরায় বিক্রয় করিয়া ফেলেন; ও আপনারা যথা-নিয়মে বণ্টন করিয়া লন। ইহার মধ্য হইতে তারা কেবলমাত্র পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হন।

এই সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য-দ্বারা উপযুক্তরূপে প্রমাণিত হইলে, রামধন ও অবিনাশ উভয়েই উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। গোপাল তাঁহার কাগজের পরিবর্ত্তে অন্য কাগজ প্রাপ্ত হইলেন। আসামীদিগের নিকট যে সকল টাকা পাওয়া যায় এবং তাঁহাদিগের বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া যত টাকার সংস্থান হয়, তাহা ব্যতীত ঐ ত্রিস হাজার টাকা পূরণ করিতে আর যাহা লাগে, তাহা ব্যাঙ্কের লোকসান-খাতায় খরচ লিখিতে হয়।

মিথ্যা-সাক্ষী। ✓

(একটী সত্যঘটনা-অবলম্বনে লিখিত)

কলিকাতায় যে কত প্রকার জুয়াচোর আছে, তাহা বর্ণনা করা একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ একটী নূতন ধরণের জুয়াচুরির উদাহরণ দিব। ইহাকে জুয়াচুরি বলে, চতুরতা বলে, কি একপ্রকার ব্যবসা বলে, তাহা

আমরা জানিনা; কিন্তু ইহাদিগের কার্য্য-কলাপ এত জঘন্য, যে, ইহাদিগের দ্বারা প্রতিদিন কত নিরপরাধীর সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। মিথ্যা-সাক্ষী দিবার জন্য কত লোক ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়, সামান্য অর্থের জন্য প্রতিদিন কত মিথ্যা কথা কয়, কত 'হয়কে' 'নয়' করে, তাহা কে জানে? কে তাহার তত্ত্ব রাখে? ইহারা এত চতুর যে, বিচারপতি পর্য্যন্ত ইহাদিগের উপর কোন কথা কহিতে পারেন না। তোমায় একটি মকর্দ্দমা করিতে হইবে, উপযুক্ত সাক্ষী অভাবে তুমি তাহাতে অগ্রসর হইতে পারিতেছ না; কিন্তু সামান্য অর্থ খরচ করিয়া পেসাদার মিথ্যা-সাক্ষী যোগাড় কর, দেখিবে তোমার জয় অনিবার্য্য। তাহারা এমন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবে, যে, যেন যথার্থই সে সেই সময় উপস্থিত ছিল।

একদিন একজন লোক আদালতে অপর একজন লোকের নামে, ৭৫৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছিল। আসামী তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু ফরিয়াদী তিনজন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করাইয়া কেমন করিয়া জয়লাভ করেন, তাহা বলিতেছি। এইস্থানে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, উক্ত তিনজন সাক্ষী ফরিয়াদীর উকিলের দ্বারা বিশিষ্টরূপে শিক্ষিত হইবার সময়ও পায় নাই।

মকর্দ্দমা উঠিল। আসামীর পক্ষের উকিল, তাঁহার মক্কেলের দেনা অস্বীকার করিলেন। মকর্দ্দমা চলিতে লাগিল।

ফরিয়াদীর পক্ষের প্রথম সাক্ষীর ডাক হইলে সে আসিয়া কাটগড়ায় দণ্ডায়মান হইল।

আসামীর পক্ষীয় উকিল জেরা করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তুমি ইহাঁকে টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

স্থির, ধীর, প্রশান্ত বদনে পেসাদার সাক্ষী উত্তর প্রদান করিল,—"হাঁ, দেখিয়াছি?"

উকিল। তুমি বিচারপতির সম্মুখে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শপথ করিয়াছ, তাহা মনে আছে?

সাক্ষী। আছে।

উকিল। যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য বলিবে!

সাক্ষী। হাঁ, বলিব।

উকিল। তুমি বলিতেছ, টাকা দিতে দেখিয়াছ; আচ্ছা, এ টাকা কখন দেওয়া হইয়াছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, দিনের বেলায়।

উকিল। টাকা কোথায় ছিল?

সাক্ষী। একটা থলিতে।

উকিল। থলিটি কি রংএর?

সাক্ষী। আজ্ঞে, কাল রংএর।

উকিল। কোন্ স্থানে বসিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, ফরিয়াদী নিজ বাটীতে, বহির্ব্বাটীর ঘরে, এই টাকা প্রদান করেন।

উকিল। আচ্ছা, তুমি যাইতে পার।

প্রথম সাক্ষী চলিয়া গেল। পরে দ্বিতীয় সাক্ষীর ডাক হইলে, সে আসিয়া বিচারপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। যথাবিধি হলপ্ (শপথ) গ্রহণের পর, আসামীর পক্ষের উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

সাক্ষী। আজ্ঞে হাঁ। ফরিয়াদী আসামীকে অমুক দিবস, ৭৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছিল, আমি দেখিয়াছি।

উকিল। টাকা কখন দেওয়া হইয়াছিল।

সাক্ষী। আজ্ঞে, রাত্রিতে।

উকিল মৃদু হাসি হাসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টাকা কিসে ছিল?"

সাক্ষী। আজ্ঞে, একটি থলিতে।

উকিল। থলিটী কি রংএর?

সাক্ষী। আজ্ঞে, লাল রংএর।

উকিল। কোন্ স্থানে এই টাকা দেওয়া হইয়াছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, দালানে।

আসামীর পক্ষের উকিল বিচারপতির দিকে চাহিয়া, মৃদুমধুর হাসি হাসিলেন। তৎপরে আসামীর জয়লাভ অনিবার্য্য ভাবিয়া, দ্বিতীয় সাক্ষীকে বিদায় দিলেন। পরে তৃতীয় সাক্ষীর ডাক হইল। পাঠকগণ! স্মরণ রাখিবেন যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় সাক্ষী যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, তাহা উভয়ত সম্পূর্ণ বিপরীত।

উকিল তৃতীয় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা! তুমি কি এ টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

সাক্ষী। হাঁ, দেখিয়াছি।

উকিল। টাকা কিসে ছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, একটা থলিতে।

উকিল। থলিটি কি রংএর? লাল না কাল?

সাক্ষী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তা'রপর উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, থলিটার রং লাল বলিলেও হয়, কাল বলিলেও বলা যায়।"

বিচারপতি এবং আসামীর পক্ষীয় উকিল চমকিয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি রকম? পরিস্কার করিয়া বল।"

সাক্ষী। আজ্ঞে, থলির তো দু'পট থাকে?

উকিল। হাঁ থাকে, তাতে কি?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমিও তো তাই বল্‌চি যে, থলিটার একপিটে লাল রংএর কাপড়; আর, আর একপিটে কাল রংএর কাপড় ছিল। তাই বলিয়াছি, কাল বলিলেও বলা যায়, লাল বলিলেও বলা যায়। তা' ধর্ম্মাবতার! যে যে ভাবে গ্রহণ করে—

উকিল। আচ্ছা, টাকা কোথায় দেওয়া হইয়াছিল? দালানে না ঘরে?

সাক্ষী। আজ্ঞে, সে স্থানটাকে দালান বলিলেও বলা যায়, ঘর বলিলেও বলা যায়।

উকিল। সে কি রকম?

সাক্ষী। আজ্ঞে, ফরিয়াদীর বাড়ীতে যে দালান আছে, তাহার প্রত্যেক খাটালে দরজা বসান আছে। দরজা খুলিয়া ঠাকুর-পূজা করিলেই দালান বলা হয়। আর, পূজা ফুরাইয়া গেলে দরজা দিয়া তাহার ভিতরে বসিলেই বহির্ব্বাটীর ঘর হইল।

আসামীর পক্ষীয় উকিল আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, কোন্ সময়ে এই টাকা দেওয়া হইয়াছিল? রাত্রিতে না দিনমানে?'

সাক্ষী। আজ্ঞে, সময়টা—রাত্রি বলিলেও হয়, দিবস বলিলেও বলা যায়?

এই উত্তর শুনিয়া সকলেরই চক্ষুস্থির! আসামীর পক্ষের উকিলের আর উপায় নাই। তথাপি ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি রকম? খুলিয়া বল?"

সাক্ষী। আজ্ঞে, টাকাটা যখন আসামীকে দিবার জন্য আনা হইয়াছিল, তখনও দিন ছিল। কিন্তু কার্য্য শেষ হইতে রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে সময়টাকে দিনও বলা যাইতে পারে, রাত্রিও বলা যাইতে পারে। তবে যে যে ভাবে গ্রহণ করে, ধর্ম্মাবতার!

বিচারপতি তো অবাক! সেখানে যতগুলি লোক ছিল, তাহারাও অবাক। উকিল এবং আসামীর চক্ষুস্থির!!

নির্দ্দোষী আসামীর উকিল-খরচা গেল; ৭৫৲ টাকা অনর্থক অর্থদণ্ড হইল; লোকের নিকট প্রবঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইলেন। আর, ফরিয়াদী বক্ষ ফুলাইয়া—"কলিতে অধর্ম্মেরই জয়"—এই ভাবিয়া গরবভরে প্রস্থান করিল। বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল,—আবার কাহার বক্ষে ছুরিকা বসাইবে!

হায় বিধাত! এ পাপীর কি দণ্ড নাই? "আছে!" অন্তরাত্মা বলিতেছে,—"অবশ্যই আছে।" তবে তাহাই হউক—তাহাই হইবে। সামান্য ৭৫৲ টাকার জন্য সে একজন নির্দ্দোষীর মনে যে প্রকার ক্লেশ দিল, সে যেন তাহা

অপেক্ষা অধিক ক্লেশভোগ করে। পণ্ডিতগণ! বলিতে পারেন কি, এই সকল লোকের জন্য ধর্ম্মরাজ কি প্রকার নরক নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

সত্যানন্দ।

(৪)

ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করিয়া জীবন-কাল অতিবাহিত করাই ধার্ম্মিকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বহু-প্রকারের নির্দ্দিষ্ট আছে। এতন্মধ্য হইতে যে প্রকার কার্য্যে যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি সেই প্রকারের কার্য্য অবলম্বন করিয়া ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী কেহ বা সন্ন্যাস-যোগ, কেহ বা কর্ম্ম-যোগ, কেহ বা অন্যবিধ ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তদ্বিহিত অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমাদের সন্ন্যাসী সত্যানন্দ গীতোক্ত কর্ম্মযোগই স্বীয় মানসিক-বৃত্তি ও ক্ষমতার অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া তৎপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কর্ম্ম-যোগ-সম্বন্ধেও অনেক প্রকার ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্য হইতে ভগবানের প্রীতিপ্রদ কার্য্য সম্পন্ন করাই সত্যানন্দের ধর্ম্ম। ভগবানের প্রীতিপ্রদ কার্য্যের মধ্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন একটি অন্যতম। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ এই শেষোক্ত কার্য্যই স্বীয় কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া জীবনের লক্ষ্য স্থির করিলেন। তখন, বোধ হয়, তাঁহার মনে হইল —দুষ্ট ত জগতে অনেক—অত্যাচারও ত জগতে বহুপ্রকারের, তবে ইহার কোন্ প্রকারের দুষ্টের কোন্ প্রকার অত্যাচার নিবারণ করিতে হইবে? এই প্রশ্ন হৃদয়ে উদিত হইবা মাত্রই তাঁহার দেশের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেশে তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; সত্যানন্দ দেখিলেন, এ দুর্ভিক্ষের মূল কারণ, রাজার প্রজানুরাগের অভাব। রাজার প্রজানুরাগ নাই কেন, তাহাও বুঝিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইল না। রাজা বিদেশী—সত্যানন্দের দেশের লোকের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অসম্ভব। তবে স্বদেশী রাজা চাই। তাহা কিরূপে হইতে পারে! প্রতিষ্ঠিত রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া দূর না করিলে সে ত রাজ্য ছাড়িবে না!—তবে তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করা চাই। কাহারা তাহা করিবে? যাহাদের এ সম্বন্ধে স্বার্থ আছে। সে কাহারা?—না সত্যানন্দের স্বীয় দেশবাসীগণ। তাহারা তবে ইহা করে না কেন?—কারণ অনেক। তন্মধ্যে তাহাদের স্বদেশভক্তির অভাবই প্রধান। তাই সন্ন্যাসীর জীবনের লক্ষ হইল—স্বদেশে দেশভক্তির উদ্দীপনা ও তদ্দ্বারা স্বদেশে দেশীয় রাজ্য স্থাপন করা। সত্যানন্দ দেখিলেন, কার্য্যটি গুরুতর—এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অনন্যকার্য্য হওয়া চাই; তাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম ও জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যই হইল—দেশভক্তির প্রচার ও দেশীয় রাজ্য-স্থাপনা।

এই কার্য্য যখন তাঁহার জীবনের এক মাত্র অনুষ্ঠেয় সিদ্ধান্ত হইল, তখন তজ্জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; কিন্তু কিরূপ প্রস্তুত হইয়া তিনি কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। আমরা এখন তাহাই দেখাইয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

প্রথম দেখিতে হইবে—এ কার্য্যে চাহি কি? একাকী অসহায় সত্যানন্দের এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে চাহি কি? প্রশ্নটি গুরুতর—আমরা ইহার উত্তর করিতে প্রয়াসী রহিলাম।

সর্ব্বকার্য্যেই অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। কার্য্য আরম্ভ করিয়াই তাহা ছাড়িয়া দেওয়া, অথবা ২।৩ বা ১০ বার

তাহা সম্পন্ন করিতে অপারগ হইলাম বলিয়াই তাহা পরিত্যাগ করা—কার্য্যের ফলপ্রাপ্তির একান্ত পরিপন্থী। আবার কার্য্য আরম্ভ করিলে ভাসা ভাসা রূপে তাহা করিলেও চলিবে না। তাই কার্য্যে সর্ব্বপ্রথমই চাই, একান্ত অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা। সন্ন্যাসী সত্যানন্দ ইহা সম্যক্ বুঝিতেন; তাই তিনি প্রথমে নির্জ্জনে বনমধ্যে স্বকীয় মন সংযত করিয়া, স্বীয় কার্য্যোদ্ধারে ঐকান্তিক চিন্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার অন্য ধর্ম্ম ছিল না, অন্য কর্ম্ম ছিল না।

সত্যানন্দের এ সাধনা বুঝি একমাত্র বালক ধ্রুবের সাধনার সহিতই তুলনীয়। হরিচরণ-দর্শনাভিলাষে অজ্ঞান বালক নিরক্ষর ধ্রুবানন্দেরও যেরূপ তপস্যা দেখিয়াছি, স্বদেশোদ্ধার অভিলাষে অর্থহীন, বলহীন, একা, নিঃসহায় সত্যানন্দের সাধনাও সেইরূপই দেখিলাম। ইতিহাসের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপকেও ইঁহার কাছে মস্তক অবনত করিতে হয়। প্রতাপের একদিন রাজ্য ছিল, ধন ছিল, বল ছিল—একেবারে নিঃসহায় প্রতাপ কোন দিনও ছিলেন না — কিন্তু সত্যানন্দের সমস্তেরই অভাব। সত্যানন্দের ছিল কেবল সুদৃঢ় মন ও কর্ম্মঠ শরীর। সত্যানন্দের সাধনা প্রতাপের সাধনা হইতেও উচ্চশ্রেণীর। এরূপ সাধনা অন্যরূপে দেখিয়াছি—কূটবুদ্ধি খল চাণক্যের। যে চাণক্য পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া তাহা জগৎ হইতে বিলুপ্ত করণাভিলাষে এক একটি করিয়া তুলিয়া তন্মূলে তক্র ঢালিতেছিলেন; সেই চাণক্যের সহিতই অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতায় সত্যানন্দ তুলনীয়। ধ্রুবের সাধনাও বুঝি এতদপেক্ষা লঘু। ধ্রুবের কার্য্য ছিল না—ইঁহাদের কার্য্য ছিল।

এই অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা বজায় রাখিতে হৃদয়ের আর একটি বল চাই—হৃদয় ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া চাই। তোমার এখন যতই কেন অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা দেখা যাউক না, তুমি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে শিখিয়া না থাকিলে, আমি উহাদের চিরাস্তিত্ব-সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান থাকিব। ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছাই আমাদিগকে চারিদিকে মন বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। সুতরাং অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা রক্ষা করিতে হইলে ইন্দ্রিয় বসে থাকা চাই। সন্ন্যাসী সত্যানন্দেরও তাহাই ছিল। সেই শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তিটী দেখিলেই বোধ হয় যেন যোগীশ্বর শঙ্করের ন্যায় ইনিও ইন্দ্রিয়-জয়ী। সন্ন্যাসী অপনার বল না বুঝিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার লোক নহেন। তিনি এই ইন্দ্রিয়-জয়ে এতদূর সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়-জয়টী তাঁহার কাছে লঘু বলিয়াই মনে হইত। তাই তিনি দলের নেতৃবর্গকেও ইন্দ্রিয়-জয়ে পারগ করিবেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

সত্যানন্দের ন্যায় কার্য্যাবলম্বীগণের প্রথমে আরও একটী শিক্ষার দরকার। তাঁহাদিগকে আত্মোৎসর্গে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা চাই। এই আত্মোৎসর্গ অর্থে আমি আপনার স্বার্থ প্রভৃতির বলির কথা বলিতেছি না, সে কথা অন্যত্র বলিব—নিজের জীবন দেওয়ার কথা বলিতেছি। হইতে পারে, অনুষ্ঠিয় কার্য্যের ফল স্বীয় জীবনটী দান করিলেই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে সময়ে জীবনের মায়া পরিত্যাগ করা চাই। জীবনের মায়া পরিত্যাগ সহজ কথা নহে—কার্য্যে এক প্রকার "নেশা না হইলে তাহা পারা যায় না। নিরক্ষর, অকর্ম্মণ্য, মস্তিষ্কহীন সৈনিকগুলিও মদ্যপান না করিলে ভাল যুদ্ধ করিতে পারে না। সত্যানন্দের ন্যায় লোকের জীবন—যদ্দারা পৃথিবীর কত কার্য্য সুসাধিত হইতে পারে—কি অনায়াসে ত্যাগ করা যায়! তাই সত্যানন্দও একটি নেশা অভ্যাস করিয়াছিলেন—সেই নেশা তাঁহার দেশপ্রতি প্রগাঢ় অপ্রমেয় ভক্তি। এই ভক্তি-

বৃত্তি যেন তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রমাণ ছাড়াইয়াও অনুশীলন করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে একদিন মহাপুরুষের নিকট তিরস্কারও সহ্য করিতে হইয়াছিল। আমরা সে অপূর্ব্ব স্থলটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মহাপুরুষ অনেকানেক কথার পরে সত্যানন্দকে বলিতেছেন,—'এক্ষণে আইস—জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।' সত্যানন্দ উত্তর করিলেন,—'হে মহাত্মন্! আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।'

মহাপুরুষ বলিলেন,—'ব্রত সফল হইবে না—কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও? যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।'

"সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন,—'শত্রু শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।'

মহাপুরুষ। তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না—তোমার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে—তোমারও আর পরমায়ু নাই।

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিয়া দেহত্যাগ করিবে, চল! ইত্যাদি"

সত্যানন্দের ভক্তির নেশা ইহাতেই বেশ প্রতীয়মান হইবে। এখন মহাপুরুষ যেন ইহার নিন্দা করিলেন; কিন্তু আমাদিগের অজ্ঞান অন্তঃকরণ যে সত্যানন্দের দিকেই রহিয়া গেল।

এই ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন যেমন সত্যানন্দ নিজে করিয়াছিলেন, ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত, ভক্তি-উদ্দীপনকারী মূর্ত্তি ও অহর্নিশ ভক্তিরসাত্মক বিষয়ের চর্চ্চা দ্বারা সত্যানন্দ স্বীয় শিষ্যবর্গকেও সেইরূপে উক্ত বৃত্তির অনুশীলনে সহায়তা করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ফলতঃ এই নেশাটি না থাকিলে, সত্যানন্দ যেন কখনও সিদ্ধকাম হইতে পারিতেন না। কিন্তু আবার মহাপুরুষের তিরস্কারবাক্য শুনিয়া সাহস করিয়া একথাও বলিতে পারিতেছি না।

নিজে এইরূপে প্রস্তুত হইয়া সত্যানন্দ দলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিরূপে পরোপকার প্রভৃতি গুণে তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়াছি। এখন বলিব, কি গুণ অভ্যাস করিয়া সত্যানন্দ চিরদিন তাঁহার এই সৃষ্ট দলের নেতৃপদ স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ দলপতির কি কি গুণ আবশ্যক?

দলস্থ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি—নিজের জীবনের মত প্রত্যেকের জীবনে মমতা রাখা, দলপতির একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। দলপতি যদি মোড়ল হইয়া বসিয়া থাকেন ও আপনাকে দলস্থ অন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তবে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, সে দলপতিকে তাহারা আজ না হয় দুই দিন পরে তুচ্ছ করিবেই। তাই সন্ন্যাসী সত্যানন্দের দলে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচলিত। গুরু-লঘু ভেদের একটি প্রধান সূত্র জাতি-বিচার প্রথমেই ইহাতে ছিন্ন হইল। দলের সকলেরই ধর্ম্ম এক—সবই একজাতি। এতদ্দারা যেমন একপক্ষে দলের একতা সুনিবদ্ধ হইল, তেমনই আবার দলপতির স্বকীয় আসনও স্থির থাকিবার উপায় হইল।

তার পরে দলপতির নিজে নিঃস্বার্থপর ও নির্লোভী হওয়া চাই। ইহা না হইলেও দলপতির আসন স্থির রহিতে পারে না। সত্যানন্দের ন্যায় নিঃস্বার্থপর ও নির্লোভী ব্যক্তি কয়জন দেখিতে পাও? ক্ষুদ্র দলই বল, আর বড় দলই বল, দলপতির স্বার্থ ও লোভে দল

কিরূপে ছিন্ন বিছিন্ন হয়, ও দলের অনুষ্ঠেয় কার্য্য কিরূপ সম্পন্ন হয়, তাহা আধুনিক ভারত-ভক্তগণ অনেকেই জানিতেছেন। যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জীবানন্দ সত্যানন্দকে সিংহাসনে স্থাপিত করিতে চাহিলেন, সত্যানন্দ বলিলেন,—

"ছি! আমায় কি শূন্য কুম্ভ মনে কর? আমরা রাজা কেহ নহি। আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের রাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাঁহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয় রাজমুকুট পরাইও; কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আমি এই ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মে যাও।"

এরূপ স্থলে এরূপ ব্যবহার ইতিহাসে ২।১টি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আজ-কাল অনুকরণ-প্রিয়তার বলে, এরূপ কথা অনেক শুনা যায়। তাই বলিয়া এরূপ ব্যবহার আজ মনে করিও না। দলপতিগণের সে সব কথা কথার কথা!

ইহার পরে দলপতির আর একটি আবশ্যকীয় প্রধান গুণ ক্ষমা। দলস্থ লোকের ক্ষুদ্র বৃহৎ অপরাধ যে, সময় বুঝিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে না জানে, সে দলপতির আসন কখনও স্থির রাখিতে সমর্থ হয় না। সন্ন্যাসী সত্যানন্দের এই ক্ষমাগুণ কিরূপে বিকশিত ছিল, তাহা 'আনন্দমঠের' পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন। রাজ্য-লোলুপ, বিদ্রোহোন্মুখ, পাপমনা ভবানন্দকেও তিনি সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিয়াছিলেন। অত বড় ধর্ম্মানুরাগ—তাহাতে অত বড় পাপে ক্ষমা—বড় সহজ কথা কি? কিন্তু ইহা চাই—নতুবা দল থাকিবে কেন?

আমরা এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে স্বয়ং কিরূপে প্রস্তুত হইয়া কার্য্যারম্ভের জন্য দল বাধিতে হয়, তাহা দেখাইয়াছি; কিরূপে সেই দলের মধ্যে একতা স্থাপন ও দলপতির আসন বজায় রাখিতে হয়, তাহাও দেখাইয়াছি। এখন, সেই অনুষ্ঠেয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে আর কিসের আবশ্যক, তাহাই দেখাইতে চাহি।

পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রস্তুত হইলে, একমাত্র বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারাই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারা যায়। বুদ্ধি সকল কার্য্যেই আবশ্যক—যেমন তেমন লোক দলপতি হইয়া ওরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। উক্তরূপ দলপতিকে চাণক্য বা বিস্মার্কের ন্যায় কূটবুদ্ধিশালী হওয়া চাই। সত্যানন্দের তাহাতে কিছুমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হয় না। তদবলম্বিত কৌশল, সতর্কতা ও কার্য্য-প্রণালী গ্রন্থপাঠে সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

এহেন সত্যানন্দই এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত। নতুবা রাম, যদু, শ্যামের কি দেশোদ্ধার উপযুক্ত? ঐ যে কথায় বলে,—

"ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, চোখারাম সর্দ্দার।"

এখনকার দলপতিগণের আছে, কেবল বক্তৃতার ক্ষমতা। কোথায় সে অধ্যবসায়, কোথায় সে ঐকান্তিকতা, কোথায় সে ইন্দ্রিয়-সংযম, কোথায় সে স্বার্থত্যাগ-লোভত্যাগ, কোথায় সে ক্ষমতা, আর কোথায় সে আত্মোৎসর্গ?

কবি সুসময়েই গ্রন্থখানি প্রণয়ণ করিয়াছেন। যাঁহারা সত্যানন্দের ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্যানন্দের ন্যায় সাধনা করুন। শুধু বক্তৃতা অভ্যাস করিয়া সত্যানন্দের ধর্ম্ম অবলম্বন করা যায় না। *

* আর একটি অবস্থার কথা পাঠকবর্গকে এখানে বলিয়া রাখি। গ্রন্থকারের পূর্ব্ব-প্রণীত উপন্যাসের চরিত্রের সহিত, এই সত্যানন্দের চরিত্রে বড়ই প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব চরিত্রে মানবের ২।১টি বৃত্তি বা ২।১টি সৎকার্য্যের কথা বর্ণিত আছে; কিন্তু সত্যানন্দে একটা মানুষের সমগ্র জীবনের বক্তব্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি হইতেই কবির উপন্যাসের উদ্দেশ্য বিস্তৃত হইতে চলিল। এখান হইতেই কবি একটা মানুষের সমগ্র কর্ত্তব্য দেখাইবেন। ২।১ স্থলে কি করিতে হয়, সে ছোট কথায় আর তাঁহার নজর নাই। প্রবন্ধান্তরে এসব কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ফুল-রেণু।

কণ্টক-বৃক্ষে লতিকা।

নিদাঘ মধ্যাহ্ন কাল! সন্তপ্ত অন্তরে
না পাইয়া গৃহে স্থান, আইনু বিজনে।
বাহিরে দেখিনু, বিশ্ব পুড়ে ভানু-করে;
ভিতরে, দহিছে হৃদি, সংসার-দহনে।

দেখিলাম, তরু এক একাকী প্রান্তরে
রহিয়াছে অবস্থিত, লতিকা-বেষ্টিত।
হৃদয় হইল দ্রব, দেখিয়া তাহারে;
অশ্রুজলে গণ্ডদু'টি হইল প্লাবিত।

এ বৃক্ষে ফুটে না ফুল; কিন্তু তরুশিরে
ফুটেছে সহস্র পুষ্প সোণার বরণ।
গায়েতে কণ্টক, তবু লতিকা তাহারে
আদরে জড়ায়ে আছে, করি আলিঙ্গন।

আর তুমি, দৃষ্টিহীনা মানবী লতিকা!
ইচ্ছায় কেনবা কর সংসার শ্মশান?
শুষ্ক তরু ভাবি কেন, হও ভয়-ভীতা?
স্নেহেতে জড়ায়ে দেখো, ফুটিবে কুসুম। শ্রীরাঃ

গান।

সফর্দ্দা, আড়া।

কাটে না সময় আর, আসে না মরণ,
বেঁচে আছি—প'ড়ে আছি জড়ের মতন।
কিছুতে বসে না আশা,
ধরা যেন পর-বাসা;
কোথা পর-ভালবাসা, কোথা সে স্বপন?
কোথা সে সুখের সাধ,
সাধের সে অবসাদ,
সাধা-সাধি, কাঁদা-কাঁদি—রাখিতে জীবন!
স্রোত-হারা নদী মত
বেঁচে আর রব কত!
খাতেছি পলে পলে—মরিব কখন?

দুইখানি ছবি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিপদের উপর বিপদ।

এদিকে কামিনীরও বড়ই শঙ্কট অবস্থা। জমীদারের বাগান-বাটী হইতে তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া আসার পর, দিন দিনই তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। বাগান-বাটী হইতে সেইরূপ অচৈতন্য অবস্থাতেই তাঁহাকে নবীন দাসের বাটীতে লইয়া আসা হয়; এবং সেখানে আনিয়া, অনেক সেবা-সুশ্রুষা ও বাত-জল-সেকের পর, তিনি চেতনা প্রাপ্ত হন। চেতনামাত্র পাইয়াছেন বটে, কিন্তু আর উঠিতে পারেন নাই। দুর্ব্বৃত্তের পদাঘাতে —"উঃ গেলেম!"—বলিয়াই, তিনি যে শয়ন করিয়াছিলেন, সে শয়ন আর তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় নাই। আজ নবীন দাসের বাটীতে একটী ঘরের মধ্যে তিনি আসন্ন শয্যায় শায়িতা। অধিকন্তু কয়েক দিন হইতে তাঁহার মুখে আর কোন কথাই নাই; কেবল "পেট গেল—পেট গেল" এই মাত্র বুলি। অভাগিনী ৮ মাস অন্তঃসত্ত্বা; গর্ভে তাঁর পূর্ণাবয়ব শিশু—আর দিন কতক পরেই সে ভূমিষ্ঠ হইত। হতভাগ্য জমীদার—নরকের কীট—যার নাম করিলেও পাপ বর্ত্তে—সে সেদিন রাত্রে, সেই গর্ভে পদাঘাত করিয়াছিল। সেই নিষ্ঠুর পদাঘাতেই গর্ভস্থ শিশুসহ কামিনীকে লুণ্ঠিতা হইতে হয়; আর, তাই—"পেট গেল—পেট গেল"—এই তাঁর বুলি। গর্ভে যে কি গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে—গর্ভস্থ সন্তান-শুদ্ধ সে আঘাতে যে কিরূপ বিলোড়িত হইয়াছে, তাহা সেই অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। ফলতঃ তা'র পর হইতেই কামিনীর এই অবস্থা। তাঁহার শরীরে জ্বর ফুটিয়াছে; বিকার ঘটিয়াছে; মুখে কেবলই সেই একই বুলি—"পেট গেল—পেট গেল!"

নবীন দাস শুশ্রূষার ত্রুটী করিতেছেন না। তাঁর যেমন সম্বল, যা' কিছু আছে—প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ করিয়াও, তিনি কামিনীর শুশ্রূষায় ব্যাপৃত আছেন। যে যাহা বলিতেছে, যে ঔষধ যেখানে মিলিতেছে, তিনি তাই আনাইয়া কামিনীকে রোগমুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। বড় বড় কবিরাজ গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে আনাইয়া—রাজা-রাজারাও সহজে যাহাতে অগ্রসর হন না—ভিটামাটি বন্ধক দিয়াও, সেরূপ ব্যয়-বাহুল্যে, তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কেবল তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, কিসে ব্রাহ্মণ-কন্যা জীবন পায়! এতে যদি সর্ব্বস্বান্ত হন, প্রাণান্ত যায়, সেও তাঁ'র স্বীকার! তিনি একরূপ প্রতিজ্ঞাই করিয়াছেন,—কোনরূপে একবার কামিনীকে বাঁচাইয়া পোড়া দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। যে দেশে এত অত্যাচার—রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা জমীদার প্রজা-পুত্রের উপর যে দেশে এরূপ কদাচার করে, সেখানে কি আর মানুষের থাকিতে আছে! তাই বৃদ্ধ নবীন দাস অনেক মায়ার—অনেক যত্নের বাস্তুভিটা পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। ধন্য নবীন! মূর্খ কৃষক-জন্মও তোমার দেবত্ব-পরিচায়ক! আহা! এমন হৃদয় আর কি কোথাও মিলিবে!

আজ কিন্তু কামিনীর পীড়ার বড়ই বৃদ্ধি! যে কবিরাজ দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আজ তিনিও হতাশ্বাস হইয়াছেন। এমন কি, তিনি নাড়ী দেখিয়া এইরূপ বলিলেন,—"আজ আমি আর একটিমাত্র ঔষধ দিব। সে ঔষধটি আমার সঙ্গে নাই। আমার সঙ্গে একজন আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাইলে, আমি পৌঁছিয়াই সে ঔষধটি তাঁহাকে দিব। এবং শীঘ্র শীঘ্র আনিয়া, তাহা অন্ততঃ বেলা ১০টার মধ্যে সেবন করাইতে পারিলে, যদি কিছু উপকার হইবার হয়, তবে হইবে। অর্থাৎ সেই ঔষধের জোরে যদি আজ বৈকাল-পর্য্যন্তও রোগী বাঁচে, তবেই আমি আবার চেষ্টা পাইব। নতুবা এই-ই আমার শেষ বিদায়; যাইহোক, তোমরা এক-জন সত্বর আমার সঙ্গে আইস; ঔষধ খাওয়াইতে যেন বিলম্ব না হয়!" এই বলিয়া কবিরাজ পাল্কীতে উঠিলেন; এবং অন্য কাহারও ত্বরিত আগমনের প্রতি ততদূর বিশ্বাস করিতে না পারায়, স্বয়ং নবীন দাসই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

নবগ্রাম হইতে কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী প্রায় দেড় ক্রোশ অন্তরে। সে গ্রামের নাম বড়-গাঁ। নবগ্রাম হইতে বড়-গাঁ যাইতে হইলে মোহনপুরের পশ্চিমাংশের কুলগাছির মাঠ দিয়া যাইতে হয়। মাঠের রাস্তাঘাট বড়ই কদর্য্য। মধ্যে মধ্যে নালা ও 'আলি-'রাস্তা ভিন্ন সেখানে যাইবার আর কোন সুগম পথ নাই। বিশেষ এসময় অনেক জমী আবার ফাটিয়া চৌচির হইয়া আছে। তাহার উপর দিয়া বিশেষ দ্রুত চলিয়া যাওয়াও বড়ই কষ্টকর। কিন্তু এখনই বেলা প্রায় ৮টা; আর দুই ঘণ্টার মধ্যেই এতখানি রাস্তা গিয়া তবে ঔষধ আনিয়া, কামিনীকে খাওয়াইতে হইবে; যাইহোক, বৃদ্ধ নবীন দাস কিন্তু কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি পাল্কীর বেহারাদের সঙ্গেই ছুটিয়া চলিতে লাগিলেন।

ক্রমে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, অতি দ্রুত চলিয়া, পাল্কী বড়-গাঁয় পৌঁছিল। কবিরাজ ঔষধ দিলেন; নবীন দাস ঔষধ লইয়া তাড়াতাড়ি কবিরাজ-বাটী হইতে নবগ্রাম-অভিমুখে বহির্গত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় আপ্যায়িত করিয়া, তাঁহাকে কিছু জলযোগ করাইতে চাহিলেন; কিন্তু পাছে বাড়ী পৌঁছিতে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায় তিনি আর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। যেমন দ্রুত আসিয়াছিলেন, তেমনিই তিনি চলিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছেন; আর একটু আসিলেই কুলগাছির মাঠে পৌঁছেন। এমন

সময় একি বিঘ্ন! কএকটী লোক তত্রত্য একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া তামাকু খাইতেছিল। নবীন-দাসকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া তাহারা ডাকিল।

নবীন তাহাতে বলিলেন,—"আমার বাড়ীতে বড় ব্যায়ারাম। আমি তামাক খাইব না।"

উত্তরে,—"তামাক না খাও, শোনই না!"

নবীন।—"বড় ব্যায়ারাম—ঔষধ লইয়া যাইতেছি। দেরী করিতে পারিতেছি না। আপনাদের কি বলিবার, শীঘ্র বলুন।"

"আচ্ছা, তবে বল্‌চি!"—এই বলিয়া তাহাদের কএকজন তাড়াতাড়ি বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া আসিয়া নবীন দাসের হাত চাপিয়া ধরিল। হাত ধরিয়াই বলিল,—"বেটা চোর, ডাকাতের সর্দ্দার! পালাবি কোথায়? এইবার যমের হাতে পড়েছিস্, জানিস্ না। দীপান্তর হবে—তোকে জেলে পচ্‌তে হবে। ডাকাতি বেটা!"

"সে কি! তোমরা কি বলছ, কিছুই বুঝি-না যে! আমার বাড়ীতে যে বড়—" নবীন এই-পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে, তাহারা নবীনকে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিল; বলিল,—"চল, শালা, চল! অত ন্যাকামিতে আর কাজ নেই!"

"তোমরা কেন আমায় অমন কর্‌ছো! আমি তোমাদের তো কিছুই করিনি! আমায় ছাড়—আমায় ছাড়—আমার বাড়ীতে বড় বিপদ—দেরী হ'লে আমি বোধ হয় আর তাঁ'কে দেখ্‌তেও পাব না। ছেড়ে দেও—ছেড়ে দেও! তোমাদের পায়ে পড়ি—" এই বলিয়া নবীন দাস তাহাদের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন, তাহাদের মধ্যের সর্দ্দার মত একজন বলিল,—"বেটা ডাকাত! জমীদারের বাড়ীতে ডাকাতি করেছিস্। আমাদের কি এখনও চিন্‌তে পারিস্‌নি? আমরা সব জেনেছি! জানিস্, আমরা পুলিশের লোক! অনেক সন্ধানে সন্ধানে তো বেটাকে ধরেছি। এখনও আবার ছাড়্‌তে বলিস্! চল, বেটা চল—এখন থানায় চল!" এই বলিয়া, বৃদ্ধ নবীনের উপর তাহারা দুই একটি চড়-চাপড়ও দিতে লাগিল।

নবীন দাস তো অবাক! যাইহোক, তিনি আবারও কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা, তাই যেও। কিন্তু একবার আগে আমায় বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, এই ওষুধটি দিয়ে আস্‌তে দেও। তোমরা আমার সঙ্গে চল; আমি ওষুদটি বাড়ীতে দিয়েই, তোমরা আমার যেখানে নিয়ে যাবে, তাই যাব। দোহাই তোমাদের—দোহাই দারোগা মহাশয়! তোমাদের পায়ে পড়ি। আমাকে একবার বাড়ীতে নিয়ে চল। আমি না যেতে পারলে, হায় হায়! বুক ফেটে যায়, বল দেখি, ব্রাহ্মণ-কন্যার কি হবে! দোহাই—দোহাই তোমাদের! তোমাদের কি একটু মায়া-দয়াও নেই?"

"জান, আমরা পুলিশের লোক। আমাদের মায়া-দয়া নেই। এখন চল, আমাদের সঙ্গে চল!"—এইরূপ উত্তর দিয়াই, তাহারা নবীন দাসকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

"হায়! হায়! কি হলো! কি হলো!"—বলিয়া নবীন দাস কাঁদিতে কাঁদিতে অগত্যা তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

সপ্তম দৃশ্য।

বিপদ ক্রমেই বাড়ে!

"একটু জল দেও—একটু জল—"

"এত জল দিচ্ছি, তবু তেষ্টা ভাঙ্‌ছে না!"

"উহু! পেট গেল—জ্বলে গেল—একটু জল দেও!"

"দিচ্চি—একটু থাক্!"

"আর থাক্‌তে যে পারি না! জ্বলে গেল।—জ্বলে গেল।"

একটি পীড়িতা শয্যাশায়ী স্ত্রীলোক এইরূপ কাতর-কণ্ঠে জল চাহিতেছেন; আর, তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া একটী যুবক তাঁহাকে

বাতাস করিতেছেন। বার বার জল চাওয়ায়, যুবক আবারও একবার উঠিলেন ; এবং তাঁহার অপর পার্শ্ব হইতে ঢাকা খুলিয়া, দুধের বাটিটী নিকটে লইলেন। পরে একখানি ঝিনুকে করিয়া দুধের বাটী হইতে এক ঝিনুক দুধ তুলিয়া, সেই স্ত্রীলোকটির মুখে প্রদান করিলেন ; বলিলেন,—"এই জল দিতেছি ; খাও।"

স্ত্রীলোকটী যাতনায় অস্থির হইয়া চক্ষু বুজিয়াই কথা কহিতেছিলেন ; জল দিতে চাওয়ায়, কেবলমাত্র 'হা' করিলেন। যুবক সেই দুধ-ঝিনুকটি তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও স্ত্রীলোকটির যাতনার অবসান হইল না। তিনি সেই পূর্ব্বমত যাতনাই অনুভব করিতে লাগিলেন। যুবক গালে হাত দিয়া, নির্ব্বাকপ্রায় বসিয়া, বাতাস করিতে লাগিলেন। ক্রমেই যন্ত্রণা ও ছট্‌ফটানির আধিক্য হইতে লাগিল ; "গেলাম—মলাম" করিয়া স্ত্রীলোকটী কাঁদিয়া উঠিলেন। সে ক্রন্দনে যুবকেরও চক্ষু ছলছল হইয়া আসিল ; বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনিও যেন আর না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলেন না। কএক বিন্দু জল আস্তে আস্তে তাঁহারও চক্ষু বহিয়া পড়িল। কিন্তু কি জানি কি মনে করিয়া, পরক্ষণেই আবার তিনি আপন চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়াই, বলিলেন,—"ভয় কি ! সেরে যাবে !"

পাঠক ! এ যুবক-যুবতী কে, চিনিয়াছেন কি ? বোধ হয় আর বলিতে হইবে না যে, এই স্ত্রীলোকটি নবীন দাসের গৃহে আসন্নশায়ী সেই কামিনী ; আর যুবক সেই অভাগিনীরই স্বামী শ্রীনাথ। জমীদার-বাটী হইতে আনার পর হইতে, শ্রীনাথ কামিনীর সুশ্রূষাতেই নিযুক্ত আছেন ; এবং নবীন দাস অন্য সকলরূপে সাহায্য করিতেছেন।

কামিনীর যন্ত্রণা কিন্তু কিছুতেই কমিতেছে না। কামিনী ক্রমেই অধিকতর কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। এবং,—"ভয় কি ! সেরে যাবে। নবীনদাস এবার যে ঔষধ নিয়ে আস্‌চেন, তা' খেলে আর কোন যাতনাই থাক্‌বে না ! এই তিনি এলেন বলে !"—এইরূপ নানা কথায় শ্রীনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই ব্যায়ারাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর,—"এই নবীন দা' আসেন—এই আসেন"—বলিয়া শ্রীনাথ তাঁহাকে, ও নিজের মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু সকলেই বৃথা ! ১০ টা বাজিয়া গেল, তখনও নবীন দাস ফিরিলেন না। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই রোগের যাতনা ও তৎসঙ্গে শ্রীনাথের মনের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। বিশেষতঃ বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে এসময় তিনিই একেলা। নবীন দাস ঔষধ আনিতে কবিরাজের বাড়ী গিয়াছেন ; আর, তাঁহার পুত্রাদি সকলেই মাঠে কার্য্য করিতে গিয়াছে। পত্নীর নিকট বসিয়া তিনিই কেবল মাত্র ভাবিতেছেন,—নবীন দা' এই আসেন—এই আসেন।

এমন সময় বিপদের উপর একি বিপদ ! কতকগুলি পুলিশের কনেষ্টবোল, হটাৎ আসিয়া নবীন দাসের বাড়ী আক্রমণ করিল। পুলিশকে সহসা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বাড়ীর স্ত্রীলোকগুলি সকলেই স্ব স্ব কাজ ফেলিয়া, অপর একখানি ঘরে প্রবেশ করিলেন ; এবং বাড়ীর কর্ত্রী (নবীন দাসের স্ত্রী) ছুটিতে ছুটিতে শশব্যস্তে শ্রীনাথের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"দাদা ঠাকুর ! বাড়ীতে পুলিশ ঢুকেছে—একবার বেরিয়ে দেখুন। আমি কামিনীর কাছে বস্‌ছি।" কাজেই পত্নীর মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়াও, তাঁহাকে ঘরের বাহির হইতে হইল। তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়াই দেখিলেন, বাড়ীর মধ্যেই ৮।১০ জন কনেষ্টবোল ও চৌকিদার ; এবং তাহাদের সঙ্গে মোহনপুরের সেই জমীদারের একজন সরকার। শ্রীনাথ ঘর হইতে বাহির হইবামাত্রই সেই সরকারটা তাঁহার

প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এই বেটাকে আগে ধর—এই বেটাই সর্দ্দার। এ বেটা এখানে কোন রকম ভাগ-বকরা নিতেই বোধ হয় এসেছে।"

পল্লীগ্রামের পুলিশ একে পেলে আরে চায়। সরকারের কথামাত্রই তাহারা শ্রীনাথকে ধরিল ; এবং—"কেন—কি জন্য !" জিজ্ঞাসা করিতে যাইলে, তাহা না শুনিয়াই, তাঁহাকে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিল। বাঁধিয়াই, তাহাদের একজন বলিল,—"দেও, এ শালাকে এখনই থানায় চালান দেও !"

"কর কি ! ছাড়—ছাড় ! বড় বিপদ ! স্ত্রী—" আর কথা কহিতে দিল না। "চল্ শালা, থানামে চল্"—এই বলিয়া, তাহারা শ্রীনাথকে টানিয়া লইয়া চলিল।

"আর ঘণ্টাখানেক পরে যাব—একটু সময় দেও—পায়ে পড়ি — দোহাই তোমাদের—" বলিয়া শ্রীনাথ পথেও আরও কত কাঁদাকাঁদি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। কি জন্য, তাহাও আর বলিল না।

নবীন দাসের বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। স্ত্রীলোকগণ—"সর্ব্বনাশ হইল—সর্ব্বনাশ হইল—" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আর মাঝে মাঝে পুলিশ তাঁহাদিগকে তাড়া দিতে লাগিল।

দস্যুর আত্মকথা। *

"আমি মনে ভাবিলাম,—একি বিপদ ; আমি তো কোন অপরাধ করি নাই ! আমার উপর এত পীড়ন কেন ? দারোগা তখন সদর্পে ও সদম্ভে বলিলেন,—'বজ্জাত ! অনেকবার ফাঁকি দিয়াছিস্ ; কিন্তু এবার তোর আর নিস্তার নাই।' আমার পদে যে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল, সেই স্থানটায় একটু তেল-কালি মাখাইয়া, যেন কল্য ডাকাতির সময়ে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, এই ভাবে ক্ষতটা একটু পুরাতন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি দারগাকে বলিলাম,—'কাপুরুষ ! নিরপরাধীকে কেন এত পীড়ন কর ?' আমি একবার মনে মনে কল্পনা করিলাম, একটা চড়ে এক-একটা লোককে যমালয়ে পাঠাইয়া দেই। মনে করিলে একটী মোড়ায় হাত-কড়ি ভাঙ্গিতে পারিতাম। আবার ভাবিলাম, আমি তো নিরপরাধী ! যখন গুরুতর দোষ করিয়া বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছি, তখন এযাত্রা অবশ্যই খালাস পাইব ! দিনের বেলা একটা গুরুতর হত্যা করিয়া কেন অপরাধী হইব ? দারোগা আমাকে ধৃত করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—'তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি বুঝিয়াছি ; আর বীরত্বে প্রয়োজন কি ?' পরে ডেপুটীর নিকটে বিচারার্থ আনীত হইলাম। অন্যান্য যে সকল দস্যু ধৃত হইয়াছিল ; দেখিলাম, উহারা আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তীর লোক, জাতিতে বাগ্‌দী। আমি মনে মনে ভাবিলাম, শৃগালের সঙ্গে মারা গেলাম। ডেপুটী বাবুকে বলিলাম,—'আপনি আর কি করিবেন ? আপনি আমাকে দায়রা-সোপর্দ্দ করুন ; আমি প্রকৃতই নিরপরাধী।' আমি মনে করিলেই, তখনও কিন্তু হাতকড়ি ভাঙ্গিয়া জেল হইতে পক্ষীর মত উড়িয়া যাইতে পারি। যাহা হউক, অপরাপর আসামী-সহ আমি দায়রা-সোপর্দ্দ হইলাম। তবে সে যাত্রা কিন্তু অব্যাহতি পাইবার কোন সুবিধা হইল না ; বিচারে পরিশ্রম-সহ কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা হইল। আমি আদালতের ন্যায় বিচারে ধিক্কার প্রদান করিয়া জেলে গেলাম।

এত অত্যাচার — এত অবিচারের পরও, সে যাত্রা মুক্তি-লাভ করিয়াও, মনে মনে চিন্তা করিলাম, — আবার আমি সদুপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিব ; আর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইব না। কিন্তু পরে পুলিশের উৎপীড়নে আমাকে অগত্যা সেই কল্পনা

* ২য় খণ্ড, ২২ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের শেষ।

পরিত্যাগ করিতে হইল। আমি কারাগার হইতে অব্যাহতি পাইয়া এক বৎসর সংস্বভাবে বাড়ীতে ছিলাম। কিন্তু চৌকিদার বেটারা প্রতিদিন রাত্রিতে আমাকে ২। ৩ বার ডাকিয়া নিদ্রা-ভঙ্গ করিত। আর, কোন স্থানে চুরি-ডাকাতি হইবা মাত্রেই পুলিশ আসিয়া আমাকে অপমান ও উৎপীড়ন করিত। এইরূপে বারংবার বিরক্ত করায়, আমি বড়ই ব্যথিত হইলাম; আমার মনে হইল,—'যখন নিরপরাধী থাকিয়াও অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে, তখন আর সচ্চরিত্র থাকিবার লাভ কি? আমার অদৃষ্টে তো অত্যাচার, অপমান ও উৎপীড়ন সহ্য করিতেই হইবে!' এইরূপ চিন্তা করিয়াই আবার ডাকাতের দলে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্কল্প করিলাম। কলিকাতায় আসিয়া অত্যল্প দিনের মধ্যেই দলবল সংগ্রহ করিলাম। এই সময় হইতে হুগলি, হাওড়া, যশোহর, নদীয়া, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলায় ডাকাতি আরম্ভ করিলাম।

আমার উদ্দেশ্য ছিল,—'মারি তো হাতি লুটি তো ভাণ্ডার।' আমি কখনও চুনাপুঁটী মারি নাই। আমার দলস্থ সমস্ত লোকদিগকে আমি বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, কেহ যেন স্ত্রীলোকের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করে; আর যেন সতীর সতীত্বের প্রতি কদাচ আঘাত করা না হয়। বালক, বৃদ্ধ, অক্ষম লোককেও উৎপীড়ন করা যেন না হয়। আমি আর কখনও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ডাকাতি করি নাই, কিম্বা এই জেলার কোন লোকের তৃণটী মাত্র স্পর্শ করি নাই। কিন্তু এবার বড় দুঃখে, বড় রাগে পড়িয়া আমার চিরপোষিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলাম।"

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

পুণ্যের জয়। নৈতিক দৃশ্যরূপক কাব্য। শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার প্রণীত। অমিত্রাক্ষর ও অন্য দুই-এক রকমের মিশ্র কবিতায়, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দিতায় শেষে ধর্ম্ম-পক্ষের (পুণ্যের) জয়—এই নীতির অনুসরণে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত। সুতরাং বলিতে বাধ্য যে, উদ্দেশ্য ভাল; অধিকন্তু পুস্তকের কাগজ ও ছাপা পরিস্কার এবং দু'আনা মুল্যও বেশী নয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, লেখা বড়ই কাঁচা। বিশেষতঃ 'নৈতিক' 'দৃশ্য,' 'রূপক', 'কাব্য'—পুস্তকের এই যে চারিটি বিশেষণ গ্রন্থকার প্রদান করিয়াছেন, তাহার কোনটিরই সফলতা নাই। বিষয় গুরু হইলেও, পরিস্ফুটনের দোষে কোন দিকই বজায় থাকে নাই। আর, সেই দোষেই ইহা দৃশ্যকাব্য-মত রঙ্গালয়েও জমিবে না; বা পড়িতেও পাঠক তন্ময়ত্ব হইবেন না। তবে রচনা দেখিয়া মনে হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতে প্রয়াস পাইলে, গ্রন্থকার কালে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

জগদ্ধাত্রী।—নাট্যরঙ্গ।—শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নাট্যরঙ্গ বা প্রহসনের উদ্দেশ্য—'ইতরমি' নয়—উপদেশ-মিশ্রিত তীব্র কটাক্ষে যাহাতে লোকের শিক্ষা হয়। কিন্তু এখানিতে কেবল 'ঢলাঢলি' বই আর কিছুই নাই। এই শ্রেণীর পুস্তকের জন্যই বৃদ্ধ 'বঙ্গদর্শন' অগ্নি-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বোধ হয়।

অভিনয় সম্বন্ধে।

এমারেল্ড থিয়েটার।—সম্প্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে 'সরোজা' নামক একখানি নূতন সামাজিক নাটক" এবং 'বক্কেশ্বর' নামক একখানি 'প্রহসন' নূতন খুলিয়াছে। পাসের খাতিরে প্রকৃত কথা বলিতে যদি কাহাকেও কুণ্ঠিত হইতে না হয়, তবে এ অভিনয় দেখিয়াও সকলকে বলিতে হইবে যে, এবারও সেই অকৃতকার্য্যতা (ইংরাজিতে যাহাকে Grand or Total faliure বলে)। নাটকখানি অতি কাঁচা হাতের লেখা বলিয়া বোধ হইল—গ্রন্থকার সূত্র ধরিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু বজায় রাখিতে পারেন নাই। মনে তাঁহার ভাবের যতটুকু ছায়াও পড়িয়াছিল, কালি-কলমে তিনি সেটুকুও বাঁচাইতে যেন অক্ষম হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি নূতন ব্রতী বলিয়াই যেন এরূপ ঘটিয়াছে, বোধ হইল। যাইহোক, তাঁহারও তত দোষ নাই—এমারেল্ডের এ দুর্ণামের বাজারে নির্ব্বাচন-কর্ত্তাদের এখনও এ নাটকখানি নির্ব্বাচন না করিলে ভাল হইত; বিশেষ ভাল জিনিস ভিন্ন এখন আর চলিবে না। তা'রপর প্রহসন-খানি—এখানিকে 'প্রহসন' না বলিয়া 'ইতরমি' বলিলে বোধ হয় আরও লোক জুটিত? এরূপ অশ্লীল ভাষা-পূর্ণ 'প্রহসন' বোধ হয় কোন পুরাতন 'বক্কেশ্বরের' লিখিত। তিনি যে সমাজে এরূপ কথা কহিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ইহাই তাঁহার নামের পরিচায়ক। সুবিখ্যাত মনোমোহন বাবু থাকিতেও, এরূপ 'প্রহসন' অভিনয় করিতে দিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! এরূপ ব্যক্তিগত, অথচ জঘন্য প্রহসন ভদ্রলোকের দেখিবার জিনিস নহে। আমরা যদিও সুরুচির ধ্বজাধারী নহি, তথাপি আশ্চর্য্য হই যে, কানে আঙ্গুল দিতে হয়—এরূপ অশ্রাব্য ভাষা যে প্রহসনে, কর্ত্তৃপক্ষগণ কি করিয়া তাহা এত দর্শককে শুনাইতেছেন। ছি! ছি!! অনেক ভদ্রলোক পরিবারদিগকে সময়ে সময়ে থিয়েটার দেখান; এ কেলেঙ্কারী তাঁহারা কি করিয়া শুনিবেন, তাই আশঙ্কা। এ অভিনয় পিতা-পুত্রে একসঙ্গে বসিয়া দেখাও অসাধ্য! আমরা শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল শীল ও তাঁহার রঙ্গালয়ের শুভাকাঙ্ক্ষী; তজ্জন্যই এত কথা বলিতেছি; বিশেষ মনোমোহন বাবু যেখানকার ডাইরেক্টার! যাইহোক, এরূপ কেলেঙ্কারির অপেক্ষা গোপাল বাবু যদি থিয়েটার উঠাইয়া দেন, তাহাও মঙ্গল!

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

এ একরূপ দিনে-ডাকাতি!

শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় ঠন্‌ঠনিয়ার স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের পৌত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি অনুসন্ধান-সমিতিরও একজন মেম্বর; এবং আমাদিগের একজন উৎসাহদাতা বন্ধু। গত ৯ই জুন মন্মথ বাবুর নামীয় একখানি পত্র, 'পিওনবুকে' সহি লইয়া, একটি বেহারা তাঁহার বাড়ীতে দিয়া যায়; এবং মন্মথ বাবু তখন বাড়ীতে না থাকায়, তাঁহার কনিষ্ঠ সহি দিয়া সে পত্র গ্রহণ করেন। পত্রের সহিত একখানি 'হ্যাণ্ডবিল' থাকে; তাহার মর্ম্ম,—'বি, এম, ঘোষ এণ্ড কোং' নামক কলিকাতার কোন পুস্তক-প্রকাশক—বিলাতেও যাঁহাদের এজেন্ট আছে, এহেন একদল বর্দ্ধিষ্ট বিক্রেতা (Agents:— Trubner & Co. LONDON.) 'ওরিএণ্ট্যল- মিস্‌ল্যানি' (Oriental Miscellany) নাম দিয়া 'আইন-আকবারী', 'টডের রাজস্থান', 'রামায়ণ' ইত্যাদি ইত্যাদি রকমের বিখ্যাত ৩০ খানি ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন।

মন্মথ বাবু কিন্তু কোন উত্তর দেন নাই; ভাবিয়াছিলেন, পুস্তক আসিলেই যেমত হয়, করিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ গত ১৫ই জুন একজন উড়ে বেহারা তাঁহার নামের ৪০৲ টাকার একখানি বিল লইয়া আসিল। তাহাতে লেখা,—"Received from **Babu Monomotho Nath Mitra**, * * * the sum of Rs 40/ Fourty only, being the price of 5 copies of the—work delivered to him for patronage on the 9th. June and received by one "N. N. Mitter for M. N. Mitter" as the Receipt-Book will show.

CALCUTTA 15th. JUNE, 1889. } B. M. Ghose & &c."

অর্থাৎ গত ৯ই জুন 'এন, এম, মিত্র' সহি দিয়া যে ৫ সেট পুস্তক লইয়াছেন, তাহার দাম ৪০ টাকার এই বিল পাঠাই।

বিল পাইয়া মন্মথ বাবু তো অবাক্! পুস্তকের সঙ্গে খোঁজ নাই, অথচ উপর-চাপ দিয়া টাকার তাগাদা! যাইহোক, এ সম্বন্ধে সন্ধানের জন্য তিনি আমাদের আপিসে সংবাদ দিলেন। তদনুযায়ী আমাদের প্রেরিত প্রতিনিধিগণ যেরূপ সন্ধান পান, তাহা শুনিলে আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়। সন্ধানে সন্ধানে তাঁহারা গিয়া, ৪।১ নং নিতাই বাবুর লেন, চাঁপাতলার একখানি ক্ষুদ্র খোলার ঘরের ভিতর (সম্ভবত: সেটী বেশ্যার বাড়ী) দেখেন,—'বি, এম, ঘোষ এণ্ড কোং' সশরীরে একখানি ভগ্নপ্রায় তক্তাপোসে বসিয়া আছেন, পরণে একখানি ছিন্নপ্রায় কাপড়। আমাদের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তাঁহার নাম বেণীমাধব ঘোষ; বাড়ী ঐ ঝামাপুকুর পল্লীতেই। উক্ত পল্লীর স্বর্গীয় তারকনাথ ঘোষের ভ্রাতষ্পুত্র বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি, সম্ভবতঃ অপর কাহারও যোগাযোগে, 'বেণ্টিঙ্ক প্রেস'নাম দিয়া একটি ছাপাখানা খুলিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি একজন 'বেকার'। যাইহোক, হঠাৎ সকলকে দেখিয়া তিনি শশঙ্কিত হইলেন; তাঁহার গা-হাত যেন কাঁপিতে লাগিল। পুস্তকের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আরও অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন,—"ভুল হইয়াছে—ভুল হইয়াছে। পুস্তকগুলি প্রেসে আছে। আচ্ছা, আনাইয়া দিব; চিন্তা কি।" তদুত্তরে প্রেস কোথায় জিজ্ঞাসা করায়, প্রথমে আমতা-আমতা করিতে লাগিলেন; পরে বলিলেন, —"না, আমার প্রেস নাই। লালবাজারের 'নিউ-ইয়ার' প্রেসে আমার বই ছাপা হইয়াছে। টাকার জন্য তাহা আটক আছে। যাইহোক, আনাইয়া পাঠাইয়া দিব।" এইরূপ নানা কথায় পরিচয় লওয়ার পর, প্রতিনিধিগণ লালবাজারের প্রেসে পুস্তকের সন্ধান লন। কিন্তু পাঠকগণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে, সে প্রেসে আদৌ কোন পুস্তকই ছাপা হয় নাই। তার পর, আবার ওখানে আসিলে, বেণীমাধবের আর সাক্ষাৎ নাই! তিনি লুকাইয়াছেন। দেখুন পাঠক, কি অদ্ভুত প্রতারণার চেষ্টা! কত বড়-লোক এ প্রতারণায় যে ঠকিয়াছেন ও ঠকিবেন, তাহাও বলা যায় না।

সংবাদ।

—একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ৫০০ টাকা সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দুর্গাপুর ষ্টেশনে নামেন; এবং বাটী পৌঁছিতে রাত্রি অধিক হইবে বলিয়া, একটি মুদির দোকানে রাত্রি-যাপন স্থির করেন। কিন্তু টাকা সঙ্গে লইয়া মুদির দোকানে থাকা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া, সেখানকার পোষ্টমাষ্টারের নিকট টাকাগুলি রাখিয়া আসেন; কথা থাকে, টাকা রাখিবার জন্য তাঁহাকেও কিছু দিবেন। পোষ্টমাষ্টার কিন্তু সকল লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, মুদির সহিত যোগে ব্রাহ্মণকে হত্যা করা স্থির হইল। ঐ জন্য এক ডোমের সাহায্য লওয়া হইল। ব্রাহ্মণকে দোকান-ঘরের বারন্দায় শুইতে দেওয়া হয়। যাইহোক, সম্ভবতঃ অভিসন্ধি কোন গতিকে বুঝিতে পারায়, ব্রাহ্মণের নিদ্রা আসে না; তিনি বিছানায় পড়িয়া কেবল ছট্‌ফট্ করেন। ইহা দেখিয়া মুদির এক পীড়িত পুত্র, যে ঘরের মধ্যে শুইয়া ছিল সে, ব্রাহ্মণকে তাহার নিজের বিছানায় গিয়া শুইতে বলিল। ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডেই সেই ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। আর, মুদির পীড়িত পুত্র ব্রাহ্মণের শয্যায় শয়ন করিয়া ক্রমে নিদ্রিত হইল। পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডোম ও মুদি আসিয়া, ব্রাহ্মণ বোধে পীড়িত মুদিপুত্রের মস্তক ছেদন করিল। 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' ইহাকেই বলে!

—বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্কের কথা কহিবার নহে। এপ্রিল মাসে বি, এল পরীক্ষার ফল বাহির হয়। তাহাতে যাঁহারা ফেল হন, এখন আবার তার মধ্যেও পাঁচ জনের পাশের খবর বাহির হইয়াছে। পীড়াপীড়ি পড়িলে এরূপ আরও কত কি হয়, বলা যায় না।